সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

গৌতমসূত্র

বা

ন্যায়দর্শন

ও

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)

তৃতীয় খণ্ড

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

(লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ-ভাণ্ডারের অর্থে মুদ্রিত)

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত

১৩৩২ বঙ্গাব্দ

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ১॥০, শাখা-পরিষদের

সদস্য পক্ষে ১৸০, সাধারণ পক্ষে ২৲।

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী।

---o---

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষ্য। পরীক্ষিতানি প্রমাণানি, প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষ্যতে। তচ্চাত্মাদীত্যাত্মা বিবিচ্যতে—কিং দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-বেদনাসংঘাতমাত্রমাত্মা? আহোস্বিত্তদ্ব্যতিরিক্ত ইতি। কুতঃ সংশয়ঃ? ব্যপদেশস্যোভয়থা সিদ্ধেঃ। ক্রিয়াকরণয়োঃ কর্ত্রা সম্বন্ধস্যাভিধানং ব্যপদেশঃ। স দ্বিবিধঃ, অবয়বেন সমুদায়স্য, মূলৈর্বৃক্ষস্তিষ্ঠতি, স্তম্ভৈঃ প্রাসাদো ধ্রিয়ত[১] ইতি। অন্যেনান্যস্য ব্যপদেশঃ,—পরশুনা বৃশ্চতি, প্রদীপেন পশ্যতি। অস্তি চায়ং ব্যপদেশঃ,—চক্ষুষা পশ্যতি, মনসা বিজানাতি, বুদ্ধ্যা বিচারয়তি, শরীরেণ সুখদুঃখমনুভবতীতি। তত্র নাবধার্য্যতে, কিমবয়বেন সমুদায়স্য দেহাদিসংঘাতস্য? অথান্যেনান্যস্য তদ্ব্যতিরিক্তস্যেতি।

অনুবাদ। প্রমাণসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অর্থাৎ প্রমাণ পরীক্ষার অনন্তর প্রমেয় পরীক্ষিত হইতেছে। আত্মা প্রভৃতিই সেই প্রমেয়, এ জন্য (সর্ব্বাগ্রে) আত্মা বিচারিত হইতেছে। আত্মা কি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনা, অর্থাৎ সুখ-দুঃখরূপ সংঘাতমাত্র? অর্থাৎ আত্মা কি পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সমষ্টিমাত্র? অথবা তাহা হইতে ভিন্ন? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ আত্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়ের হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু, উভয় প্রকারে ব্যপদেশের সিদ্ধি আছে।

১। এখানে অবস্থানবাচক তুদাদিগণীয় আত্মনেপদী "ধৃ" ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হইয়াছে। "ধ্রিয়তে" ইহার ব্যাখ্যা 'তিষ্ঠতি'। "ধৃঙ্ অবস্থানে, ধ্রিয়তে"।—সিদ্ধান্তকৌমুদী, তুদাদি-প্রকরণ। "ধ্রিয়তে যাবদেকোঽপি রিপুস্তাবৎ কুতঃ সুখং?"—শিশুপালবধ। ২।৩৫।

বিশদার্থ এই যে, ক্রিয়া ও করণের কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধের কথনকে "ব্যপদেশ" বলে। সেই ব্যপদেশ দ্বিবিধ,—(১) অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ,—(যথা) "মূলের দ্বারা বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে"; "স্তম্ভের দ্বারা প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে।" (২) অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ,—(যথা) "কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে"; "প্রদীপের দ্বারা দর্শন করিতেছে"।

ইহাও ব্যপদেশ আছে (যথা)—"চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে," "মনের দ্বারা জানিতেছে," "বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে," "শরীরের দ্বারা সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে"। তদ্বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে" ইত্যাদি ব্যপদেশ-বিষয়ে কি অবয়বের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতরূপ সমুদায়ের ? অথবা অন্যের দ্বারা তদ্ব্যতিরিক্ত (দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন) অন্যের ? ইহা অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যপদেশ কি (১) অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ ? অথবা (২) অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ—ইহা নিশ্চিত না হওয়ায়, আত্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত-প্রকার সংশয় জন্মে।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ "প্রমাণ" পদার্থের পরীক্ষা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। আত্মাদি "প্রমেয়" পদার্থ-বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান। সুতরাং ঐ প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানই তদ্বিষয়ে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মোক্ষের কারণ হয়। তাই মহর্ষি গোতম মুমুক্ষুর আত্মাদি প্রমেয়-বিষয়ে মননরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য ঐ "প্রমেয়" পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "পরীক্ষিতানি প্রমাণানি প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষ্যতে"—এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষির "প্রমাণ" পরীক্ষার অনন্তর "প্রমেয়"পরীক্ষায় কার্য্য-কারণ-ভাবরূপ সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় পরীক্ষা হইবে। সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষিত না হইলে, তদ্দ্বারা প্রমেয় পরীক্ষা হইতে পারে না। প্রমাণ পরীক্ষা প্রমেয় পরীক্ষার কারণ। কারণের অনন্তরই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষার অনন্তর প্রমেয় পরীক্ষা সঙ্গত,—ইহাই ভাষ্যকারের ঐ প্রথম কথার তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার পরে প্রমেয় পরীক্ষায় সর্ব্বাগ্রে আত্মার পরীক্ষার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মা প্রভৃতিই সেই প্রমেয়, এজন্য সর্ব্বাগ্রে আত্মা বিচারিত হইতেছে। অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আত্মারই উদ্দেশ ও লক্ষণ হইয়াছে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে আত্মারই পরীক্ষা কর্ত্তব্য হওয়ায়, মহর্ষি তাহাই করিয়াছেন। যদিও মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বকথিত আত্মার লক্ষণেরই পরীক্ষা করিয়াছেন, তথাপি তদ্দ্বারা লক্ষ্য আত্মারও পরীক্ষা হওয়ায়, ভাষ্যকার এখানে আত্মার পরীক্ষা বলিয়াছেন। মহর্ষি যে আত্মার লক্ষণের পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা পরে পরিস্ফুট হইবে।

আত্মবিষয়ে বিচার্য্য কি ? আত্মবিষয়ে কোন সংশয় ব্যতীত আত্মার পরীক্ষা হইতে

পারে না। তাই ভাষ্যকার আত্মপরীক্ষার পূর্ব্বোক্ত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা কি দেহাদি-সংঘাত মাত্র? অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এবং সুখ ও দুঃখরূপ যে সংঘাত বা সমষ্টি, তাহাই কি আত্মা? অথবা ঐ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত কোন পাদার্থই আত্মা? ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের দশম সূত্রে ইচ্ছাদি গুণকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়া সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন করায়, আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছাদিগুণবিশিষ্ট ঐ আত্মা কি দেহাদি-সংঘাত মাত্র? অথবা উহা হইতে অতিরিক্ত? এইরূপে আত্মার ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় হইতে পারে। আত্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়ের কারণ কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকারে ব্যপদেশের সিদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয় হয়। পরে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়া ও করণের কর্ত্তার সহিত যে সম্বন্ধ-কথন, তাহার নাম "ব্যপদেশ"। দুই প্রকারে ঐ "ব্যপদেশ" হইয়া থাকে। প্রথম—অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের "ব্যপদেশ"। যেমন "মূলের দ্বারা বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে", "স্তম্ভের দ্বারা প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে"। এই স্থলে অবস্থান ক্রিয়া, মূল ও স্তম্ভ করণ, বৃক্ষ ও প্রাসাদ কর্ত্তা। ক্রিয়া ও করণের সহিত এখানে কর্ত্তার সম্বন্ধবোধক পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্যদ্বয়কে "ব্যপদেশ" বলা হয়। মূল বৃক্ষের অবয়ববিশেষ এবং স্তম্ভও প্রাসাদের অবয়ববিশেষ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ঐ "ব্যপদেশ" অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের "ব্যপদেশ"। উক্ত প্রথম প্রকার ব্যপদেশ-স্থলে অবয়বরূপ করণ, সমুদায়রূপ কর্ত্তারই অংশবিশেষ, উহা (মূল, স্তম্ভ প্রভৃতি) সমুদায় (বৃক্ষ, প্রাসাদ প্রভৃতি) হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন নহে—ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও ন্যায়মতে মূল ও স্তম্ভ প্রভৃতি অবয়ব বৃক্ষ ও প্রাসাদ প্রভৃতি অবয়বী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং ভাষ্যকারের ঐ উদাহরণও অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ, তথাপি যাঁহারা অবয়বীর পৃথক্ সত্তা মানেন না, এবং সমুদায় ও সমুদায়ীর ভেদ মানেন না, তাঁহাদিগের মতানুসারেই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে উহা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ হইতে পারে না। কারণ, মূল ও স্তম্ভ প্রভৃতি বৃক্ষ ও প্রাসাদ হইতে অন্য অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন নহে। দ্বিতীয় প্রকার 'ব্যপদেশ' অন্যের দ্বারা অন্যের 'ব্যপদেশ'। যেমন "কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে"; "প্রদীপের দ্বারা দর্শন করিতেছে"। এখানে ছেদন ও দর্শন ক্রিয়া। কুঠার ও প্রদীপ করণ। ঐ ক্রিয়া ও ঐ করণের কোন কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, ঐরূপ বাক্যকে "ব্যপদেশ" বলা হয়। ঐ স্থলে ছেদন ও দর্শনের কর্ত্তা হইতে কুঠার ও প্রদীপ অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ, এজন্য ঐ ব্যপদেশ অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ।

পূর্ব্বোক্ত ব্যপদেশের ন্যায় "চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে", "মনের দ্বারা জানিতেছে", "বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে", "শরীরের দ্বারা সুখদুঃখ অনুভব করিতেছে"—এইরূপও ব্যপদেশ সর্ব্বসিদ্ধ আছে। ঐ ব্যপদেশ যদি অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি করণ, দর্শনাদির কর্ত্তা আত্মার অবয়ব বা অংশবিশেষই বুঝা যায়। তাহা হইলে আত্মা যে ঐ দেহাদি সংঘাতমাত্র, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে—ইহাই সিদ্ধ হয়। আর যদি পূর্ব্বোক্তরূপ

ব্যপদেশ অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে ঐ চক্ষুরাদি যে আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং আত্মা দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যপদেশগুলি কি অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব্যপদেশ? অথবা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ, ইহা নিশ্চিত না হওয়ায়, আত্ম-বিষয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয় জন্মে। পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং মহর্ষি পরীক্ষার দ্বারা আত্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয় নিরাস করিয়াছেন।

দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, অথবা আত্মাই নাই, এই মত "নৈরাত্ম্যবাদ" নামে প্রসিদ্ধ আছে। উপনিষদেও এই "নৈরাত্ম্যবাদ" ও তাহার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়[১]। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে আত্মবিষয়ে মিথ্যা জ্ঞানের বর্ণন করিতে প্রথমে "আত্মা নাই" এইরূপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াছেন এবং সংশয়-লক্ষণসূত্র ভাষ্যে বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রযুক্ত সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে "আত্মা নাই" -- ইহা অপর সম্প্রদায় বলেন —এই কথাও বলিয়াছেন। শূন্য-বাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষই সর্ব্বথা আত্মার নাস্তিত্ব মতের সমর্থন করিয়াছেন, ইহা অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। "লঙ্কাবতার-সূত্র" প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থেও নৈরাত্ম্যবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকরও বৌদ্ধসম্মত আত্মার নাস্তিত্বসাধক অনুমানের বিশেষ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্ব মতের বিশেষরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি। উদ্দ্যোতকরের পরে বৌদ্ধমতপ্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে" বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে প্রথমতঃ "নৈরাত্ম্যবাদের" মূল সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন[২]। টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহামনীষিগণ বৌদ্ধমতে নৈরাত্ম্য-দর্শনই মুক্তির কারণ, ইহাও লিখিয়াছেন[৩]। মূলকথা, প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্ব সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত "নৈরাত্ম্যবাদের" প্রচার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উদ্দ্যোতকর উহা প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

উদ্দ্যোতকর প্রথমে শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেষের কথিত আত্মার নাস্তিত্বসাধক অনুমান প্রকাশ করিয়াছেন যে,[৪] আত্মা নাই, যেহেতু তাহার উৎপত্তি নাই, যেমন, শশশৃঙ্গ। আত্মবাদী আস্তিক

১। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।—কঠোপনিষৎ।১।২০।

নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈর্মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ।

ভ্রাম্যন্ লোকো ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরন্তু যৎ।—মৈত্রায়ণী উপনিষৎ।৭।৮।

২। তত্র বাধকং ভবদাত্মনি ক্ষণভঙ্গো বা বাহ্যার্থভঙ্গো বা গুণগুণিভেদভঙ্গো বা অনুপলম্ভো বা ইত্যাদি।

—আত্মতত্ত্ববিবেক।

৩। বৌদ্ধৈর্নৈরাত্ম্যজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বোপগমাৎ। তদুক্তং নৈরাত্ম্যদৃষ্টিং মোক্ষস্য হেতুং কেচন মন্যতে। আত্মতত্ত্বধিয়ন্ত্বন্যে ন্যায়বেদানুসারিণঃ।—আত্মতত্ত্ববিবেকের মাথুরী টীকা।

৪। ন নাস্তি অজাতত্বাদিত্যেকে। নাস্তি আত্মা অজাতত্বাৎ শশবিষাণবদিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

সম্প্রদায়ের মতে আত্মার উৎপত্তি নাই। শশশৃঙ্গেরও উৎপত্তি নাই, উহা অলীক বলিয়াই সর্ব্বসিদ্ধ। সুতরাং যাহা জন্মে নাই, যাহার উৎপত্তি নাই, তাহা একেবারেই নাই; তাহা অলীক—ইহা শশশৃঙ্গ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া শূন্যবাদী বলিয়াছেন যে, আত্মা যখন জন্মে নাই, তখন আত্মা অলীক। অজাতত্ব বা জন্মরাহিত্য পূর্ব্বোক্ত অনুমানে হেতু। আত্মার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব সাধ্য। শশশৃঙ্গ দৃষ্টান্ত। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "আত্মা নাই"—ইহা এই অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্য। কিন্তু আত্মা একেবারে অলীক হইলে পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ কোন কালে কোন দেশে জ্ঞাত নহে, যাহার সত্তাই নাই, তাহার অভাব বোধ হইতেই পারে না। অভাবের জ্ঞানে যে বস্তুর অভাব, সেই বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু আত্মা একেবারে অলীক হইলে কুত্রাপি তাহার কোনরূপ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায়, তাহার অভাব জ্ঞান কিরূপে হইবে? আত্মার অভাব বলিতে হইলে দেশবিশেষে বা কালবিশেষে তাহার সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। শূন্যবাদীর কথা এই যে, যেমন শশশৃঙ্গ অলীক হইলেও "শশশৃঙ্গ নাই" এইরূপ বাক্যের দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ করা হয়, দেশবিশেষে বা কালবিশেষে শশশৃঙ্গের সত্তা স্বীকার করিয়া দেশান্তর বা কালান্তরেই তাহার অভাব বলা হয় না, তদ্রূপ "আত্মা নাই" এইরূপ বাক্যের দ্বারাও অলীক আত্মার অভাব বলা যাইতে পারে। উহা বলিতে দেশবিশেষে বা কালবিশেষে আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার জ্ঞান আবশ্যক হয় না। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, শশশৃঙ্গ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই অত্যন্ত অসৎ বা অলীক বলিয়াই সর্ব্বসম্মত। সুতরাং "শশশৃঙ্গ নাই" এই বাক্যের দ্বারা শশশৃঙ্গেরই অভাব বুঝা যায় না, ঐ বাক্যের দ্বারা শশের শৃঙ্গ নাই, ইহাই বুঝা যায়—ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা শশশৃঙ্গরূপ অলীক দ্রব্যের নিষেধ হয় না। শৃঙ্গে শশের সম্বন্ধেরই নিষেধ হয়। শশ এবং শৃঙ্গ, পৃথক্‌ভাবে প্রসিদ্ধ আছে। গবাদি প্রাণীতে শৃঙ্গের সম্বন্ধ জ্ঞান এবং শশের লাঙ্গূলাদি প্রদেশে শশের সম্বন্ধ জ্ঞান আছে। সুতরাং ঐ বাক্যের দ্বারা শশে শৃঙ্গের সম্বন্ধের অভাব জ্ঞান হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা অত্যন্ত অসৎ বা অলীক হইলে কোনরূপেই তাহার অভাব বোধ হইতে পারে না। "আত্মা নাই" এই বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বথা আত্মার অভাব বোধ হইতে না পারিলে শূন্যবাদীর অভিমতার্থবোধক প্রতিজ্ঞাই অসম্ভব। এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমানে শশশৃঙ্গ দৃষ্টান্তও অসম্ভব। কারণ, শশশৃঙ্গের নাস্তিত্ব বা অভাব সিদ্ধ নহে। "শশশৃঙ্গ নাই" এই বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমানে যে, "অজাতত্ব" অর্থাৎ জন্মরাহিত্যকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন হয় না। কারণ, উহা সর্ব্বথা জন্মরাহিত্য অথবা স্বরূপতঃ জন্মরাহিত্য, ইহা বলিতে হইবে। ঘটপটাদি দ্রব্যের ন্যায় আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম না থাকিলেও অভিনব দেহাদির সহিত প্রাথমিক সম্বন্ধবিশেষই আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বথা জন্মরাহিত্য হেতু আত্মাতে নাই। আত্মাতে স্বরূপতঃ জন্মরাহিত্য থাকিলেও তদ্দ্বারা আত্মার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, নিত্য ও অনিত্যভেদে পদার্থ দ্বিবিধ। নিত্য পদার্থের স্বরূপতঃ জন্ম বা

উৎপত্তি থাকে না। আত্মা নিত্য পদার্থ বলিয়াই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, উহার স্বরূপতঃ জন্ম নাই—ইহা স্বীকার্য্য। আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম নাই বলিয়া উহা অনিত্য ভাব পদার্থ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ঐ হেতুর দ্বারা "আত্মা নাই" ইহা কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, স্বরূপতঃ জন্মরাহিত্য পদার্থের নাস্তিত্বের সাধক হয় না। উদ্দ্যোতকর আরও বহু দোষের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, উহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক হইলে, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া নাস্তিত্বের অনুমানই হইতে পারে না। কারণ, অনুমানের আশ্রয় অসিদ্ধ হইলে, "আশ্রয়াসিদ্ধি" নামক হেত্বাভাস হয়। ঐরূপ স্থলে অনুমান হয় না। যেমন "আকাশকুসুমং গন্ধবৎ" এইরূপে অনুমান হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্তমতে "আত্মা নাস্তি" এইরূপেও অনুমান হইতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন যে,[১] "জীবিত ব্যক্তির শরীর নিরাত্মক, যেহেতু তাহাতে সত্তা আছে"। যাহা সৎ, তাহা নিরাত্মক, সুতরাং বস্তুমাত্রই নিরাত্মক হওয়ায়, জীবিত ব্যক্তির শরীরও নিরাত্মক, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাদীর তাৎপর্য্য। উদ্দ্যোতকর এই অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "নিরাত্মক" এই শব্দের অর্থ কি? যদি আত্মার অনুপকারী, ইহাই "নিরাত্মক" শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ অনুমানে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, জগতে আত্মার অনুপকারী কোন পদার্থ নাই যদি বল "নিরাত্মক" শব্দের দ্বারা আত্মার অভাবই কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে কোন্ স্থানে আত্মা আছে এবং কোন্ স্থানে তাহার নিষেধ হইতেছে, ইহা বলিতে হইবে। কোন স্থানে আত্মা না থাকিলে, অর্থাৎ কোন বস্তু সাত্মক না থাকিলে, "নিরাত্মক" এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। "গৃহে ঘট নাই" ইহা বলিলে যেমন অন্যত্র ঘটের সত্তা বুঝা যায়, তদ্রূপ "শরীরে আত্মা নাই" ইহা বলিলে অন্যত্র আত্মার সত্তা বুঝা যায়। আত্মা একেবারে অসৎ বা অলীক হইলে কুত্রাপি তাহার নিষেধ হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর এইরূপ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উক্ত অন্যান্য হেতুর দ্বারাও আত্মার নাস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না—ইহা সমর্থন করিয়া, আত্মার নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, উহা অসম্ভব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে "আত্মন্" শব্দ নিরর্থক হয়। সুচির-কাল হইতে যে "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ হইতেছে, তাহার কোন অর্থ নাই—ইহা বলা যায় না। সাধু শব্দ মাত্রেরই অর্থ আছে। যদি বল, সাধু শব্দ হইলেই অবশ্য তাহার অর্থ থাকিবে, ইহা স্বীকার করি না। কারণ, "শূন্য" শব্দের অর্থ নাই, "তমস্" শব্দের অর্থ নাই। এইরূপ "আত্মন্" শব্দও নিরর্থক হইতে পারে। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "শূন্য" শব্দ ও "তমস্" শব্দেরও অর্থ আছে। যে দ্রব্যের কেহ রক্ষক নাই - যাহা কুক্কুরের হিতকর, তাহাই "শূন্য" শব্দের অর্থ[২]। এবং যে যে স্থানে আলোক নাই, সেই সেই স্থানে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম "তম" শব্দেরস্

১। অপরে তু জীবচ্ছরীরং নিরাত্মকত্বেন পক্ষয়িত্বা সত্ত্বাদিত্যেবমাদিকং হেতুং ব্রুবতে ইত্যাদি :—ন্যায়বার্ত্তিক।

২। বাদীর অভিপ্রায় মনে হয় যে, যাহাকে শূন্য বলা হয়, তাহা কোন পদার্থই নহে। সুতরাং "শূন্য" শব্দের কোন অর্থ নাই। বস্তুতঃ "শূন্য" শব্দের নির্জ্জন অর্থে প্রসিদ্ধি প্রয়োগ আছে। যথা—"শূন্যং বাসগৃহং"; "জনস্থানে

অর্থ। পরন্তু, বৌদ্ধ যদি "তমস্" শব্দ নিরর্থক বলেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তই বাধিত হইবে। কারণ, রূপাদি চারিটি পদার্থ তমঃপদার্থের উপাদান, ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত[১]। অতএব নিরর্থক কোন পদ নাই।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, কোন বৌদ্ধ "আত্মা নাই" ইহা বলিলে, তিনি প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের অপলাপ করিবেন। কারণ, "আত্মা নাই" ইহা প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই নহে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে[২] "রূপ", "বিজ্ঞান," "বেদনা", "সংজ্ঞা" ও "সংস্কার"—এই পাঁচটিকে "স্কন্ধ" নামে অভিহিত করিয়া ঐ রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধকেই আত্মা বলা হইয়াছে। পরে[৩] "আমি" 'রূপ' নহি, আমি 'বেদনা' নহি, আমি 'সংজ্ঞা' নহি, আমি 'সংস্কার' নহি, আমি 'বিজ্ঞান' নহি,"—এইরূপ বাক্যের দ্বারা

শূন্যে" ইত্যাদি। প্রতিবাদী উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "যস্য রক্ষিতা দ্রব্যস্য ন বিদ্যতে, তদ্দ্রব্যং শ্বভ্যো হিতত্বাৎ "শূন্য"মিত্যুচ্যতে"। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য মনে হয় যে, "শূন্য" শব্দের যাহা রূঢ়ার্থ, তাহা স্বীকার না করিলেও যে অর্থ যৌগিক, যে অর্থ ব্যাকরণশাস্ত্রসিদ্ধ, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "শ্বভ্যো হিতং" এই অর্থে কুক্কুর-বাচক "শ্বন্" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে "শুনঃ সম্প্রসারণং বাচ দীর্ঘত্বং" এই গণসূত্রানুসারে "শূন্য" ও "শুন্য" এই দ্বিবিধ পদ সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধান্তকৌমুদী, তদ্ধিত প্রকরণে "উগবাদিভ্যো যৎ"। ৫। ১। ২। এই পাণিনিসূত্রের গণসূত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে "শূন্য" শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দ্বারা যে যৌগিক অর্থ বুঝা যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

১। "তমস্" শব্দের কোন অর্থ নাই, ইহা বলিলে বৌদ্ধের নিজ সিদ্ধান্ত বাধিত হয়, ইহা সমর্থন করিতে উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "চতুর্ণামুপাদেয়রূপত্বাত্তমসঃ"। তাৎপর্য্যটীকাকার এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এই চারিটি পদার্থই ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, তমঃপদার্থ ঐ চারিটি পদার্থের উপাদেয়, অর্থাৎ ঐ চারিটি পদার্থ তমঃপদার্থের উপাদান, ইহা বৌদ্ধ বৈভাষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। সুতরাং তাঁহারা "তমস্" শব্দকে নিরর্থক বলিলে, তাঁহাদিগের ঐ নিজ সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয়।

২। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংসারী জীবের দুঃখকেই "স্কন্ধ" নামে বিভাগ করিয়া "পঞ্চ স্কন্ধ" বলিয়াছেন। "বিবেক-বিলাস" গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ॥"

বিষয় সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের নাম (১) "রূপস্কন্ধ"। আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-প্রবাহের নাম (২) "বিজ্ঞান-স্কন্ধ"। এই স্কন্ধদ্বয়ের সম্বন্ধ জন্য সুখদুঃখাদি জ্ঞানের প্রবাহের নাম (৩) "বেদনাস্কন্ধ।" সংজ্ঞাশব্দযুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহের নাম (৪) "সংজ্ঞাস্কন্ধ"। পূর্ব্বোক্ত "বেদনাস্কন্ধ" জন্য রাগদ্বেষাদি, মদমানাদি, এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নাম (৫) "সংস্কারস্কন্ধ"। ("সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" বৌদ্ধদর্শন দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্কন্ধ সমুদায়ই আত্মা, উহা হইতে ভিন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা বৌদ্ধ মত বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন মহাকবি মাঘ তৎকালে ঐ সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মতকে উপমানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—

সর্ব্বকার্য্যশরীরেষু মুক্ত্বাঙ্গস্কন্ধপঞ্চকং।
সৌগতানামিবাত্মাহন্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাম্॥—শিশুপালবধ।২।২৮।

৩। নাস্ত্যাত্মেতি চৈবং ব্রুবাণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে। কথমিতি? "রূপং ভদন্ত নাহং, বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো বিজ্ঞানং ভদন্ত নাহং" ইত্যাদি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

যে নিষেধ হইয়াছে, উহা বিশেষ নিষেধ, সামান্য নিষেধ নহে। সুতরাং ঐ বাক্যের দ্বারা সামান্যতঃ আত্মা নাই, ইহা বুঝা যায় না। সামান্যতঃ "আত্মা নাই", ইহাই বিবক্ষিত হইলে সামান্য নিষেধই হইত। অর্থাৎ "আত্মা নাই", "আমি নাই", "তুমি নাই"—এইরূপ বাক্যই কথিত হইত। পরন্তু রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের এক একটি আত্মা নহে, কিন্তু উহা হইতে অতিরিক্ত পঞ্চ স্কন্ধ সমুদায়ই আত্মা, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হয়, কেবল আত্মার নামভেদ মাত্র হয়। উদ্দ্যোতকর শেষে আরও বলিয়াছেন যে,[১] যে বৌদ্ধ "আত্মা নাই", ইহা বলেন—আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তিনি "তথাগতে"র দর্শন, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাক্যকে প্রমাণরূপে ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, বুদ্ধদেব স্পষ্ট বাক্যের দ্বারা আত্মার নাস্তিত্ববাদীকে মিথ্যা-জ্ঞানী বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ঐরূপ বাক্য নাই—ইহা বলা যাইবে না। কারণ, "সর্ব্বাভিসময়সূত্র" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবের ঐরূপ বাক্য কথিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের উল্লিখিত "সর্ব্বাভিসময়সূত্র" নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও সংবাদ পাই নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত বলিয়া নানাগ্রন্থে নানামতের উল্লেখ ও সমর্থন করিলেও বুদ্ধদেব নিজে যে, বেদসিদ্ধ নিত্য আত্মার অস্তিত্বেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থ "পোট্‌ঠপাদ সুত্তে" আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদের প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধদেব আত্মার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ঐ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেন নাই, ইহা পাওয়া যায়, এবং আরও কোন কোন গ্রন্থে আত্মার স্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বুদ্ধদেব মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা বুদ্ধদেব যে, আত্মার অস্তিত্বই মানিতেন না, নৈরাত্ম্যই তাঁহার অভিমত তত্ত্ব, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ, তিনি জিজ্ঞাসুর অধিকারানুসারেই নানাবিধ উপদেশ করিয়াছেন। "বোধিচিত্ত-বিবরণ" গ্রন্থে "দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ" ইত্যাদি শ্লোকেও ইহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদেও অধিকারি-বিশেষের জন্য নানাভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেখা যায়। বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে জিজ্ঞাসু পোট্‌ঠপাদকে "তোমার পক্ষে ইহা দুর্জ্ঞেয়" এই কথা প্রথমে বলিবেন কেন? সুতরাং বুঝা যায়, বুদ্ধদেব পোট্‌ঠপাদকে আত্মতত্ত্ববোধে অনধিকারী বুঝিয়াই তাঁহার কোন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন নাই। পরন্তু বুদ্ধদেবের মতে আত্মার অস্তিত্বই না থাকিলে নির্ব্বাণ লাভের জন্য তাঁহার কঠোর তপস্যা ও উপদেশাদির উপপত্তি হইতে পারে না। আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কাহার নির্ব্বাণ হইবে? নির্ব্বাণকালেও যদি কাহারই অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে কিরূপেই বা ঐ নির্ব্বাণ মানবের কাম্য হইতে পারে? পরন্তু বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে, তাঁহার কথিত জন্মান্তরবাদের উপদেশ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষতলে সম্বোধি লাভ করিয়া "অনেকজাতিসংসারং" ইত্যাদি যে গাথাটি পাঠ করিয়াছিলেন,

---

১। ন চাত্মানমনভ্যুপগচ্ছতা তথাগতদর্শনমর্থবত্তায়াং ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যং। ন চেদং বচনং নাস্তি। "সর্ব্বাভি-সময়সূত্রে"ঽভিধানাৎ। যথা—"ভারং বো ভিক্ষবো দেশয়িষ্যামি, ভারহারঞ্চ, ভারঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ, ভারহারশ্চ পুদ্গল ইতি। যশ্চাত্মা নাস্তীতি স মিথ্যাদৃষ্টিকো ভবতীতি সূত্রম্।—ন্যায়বার্ত্তিক।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ "ধম্মপদে" তাহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের উচ্চারিত ঐ গাথায় জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, এবং "ধম্মপদে"র ২৪শ অধ্যায়ে "মনুজস্স পমত্তচারিনো" ইত্যাদি শ্লোকে বৌদ্ধমতে জন্মান্তরবাদের বিশেষরূপ উল্লেখ দেখা যায়। বুদ্ধদেব জন্মান্তরধারার উচ্ছেদের জন্যই অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গের যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার মতে আত্মার অস্তিত্ব ও বেদসম্মত নিত্যত্বই আমরা বুঝিতে পারি। "মিলিন্দ-পঞ্‌হ" নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে রাজা মিলিন্দের প্রশ্নোত্তরে ভিক্ষু নাগসেনের কথায় পাওয়া যায় যে, শরীরচিত্তাদি সমষ্টিই আত্মা। সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থে অন্যান্য স্থানেও এই ভাবের কথা থাকায় মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক-গণ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ-বিশেষের সমষ্টিই বুদ্ধদেবের অভিমত আত্মা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বৈদিক সিদ্ধান্তে যাহা অনাত্মা, বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে তাহাকে আত্মা বলিয়াছেন। পরমপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও 'দেহাদি-সমষ্টিমাত্রই আত্মা'—এই মতকেই এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আত্মার নাস্তিত্বপক্ষই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করেন নাই। মূলকথা, কোন কোন বৌদ্ধ-বিশেষ আত্মার নাস্তিত্ব বা নৈরাত্ম্যই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন করিলেও উহা যে প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই নহে, ইহাও উদ্দ্যোতকর শেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ "আত্মা নাই"—এইরূপ সিদ্ধান্ত কেহ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেও, উহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না। আত্মার নাস্তিত্ব কোনরূপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, আত্মা অহং-প্রত্যয়গম্য। "অহং" বা "আমি" এইরূপ জ্ঞান আত্মাকেই বিষয় করিয়া হইয়া থাকে। "আমি ইহা জানিতেছি"—এইরূপ সার্ব্বজনীন অনুভবে "আমি" জ্ঞাতা, এবং "ইহা" জ্ঞেয়। ঐ স্থলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং যাহা অহং-প্রত্যয়গম্য, অর্থাৎ যাহাকে সমস্ত জীব "অহং" বা "আমি' বলিয়া বুঝে, তাহাই আত্মা। সর্ব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ ঐ আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন সংশয় বা বিবাদ হইতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব সর্ব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ না হইলে, "আমি নাই" অথবা "আমি আছি কি না", এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু কোন প্রকৃতিস্থ জীবের ঐরূপ জ্ঞান জন্মে না। পরন্তু যিনি "আত্মা নাই" বলিয়া আত্মার নিরা-করণ করিবেন, তিনি নিজেই আত্মা। নিরাকর্ত্তা নিজে নাই, অথচ তিনি নিজের নিরাকরণ করিতেছেন, ইহা অতীব হাস্যাস্পদ। পরন্তু আত্মা স্বতঃপ্রসিদ্ধ না হইলে, আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ-প্রশ্নও নিরর্থক। কারণ, আত্মা না থাকিলে প্রমাণেরই অস্তিত্ব থাকে না। 'প্রমা' অর্থাৎ যথার্থ অনুভবের করণকে প্রমাণ বলে। কিন্তু অনুভবিতা কেহ না থাকিলে প্রমারূপ অনুভবই হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ মানিতে হইলে অনুভবিতা আত্মাকে মানিতেই হইবে। তাহা হইলে আর আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ-প্রশ্ন করিয়া প্রতিবাদীর কোন লাভ নাই। পরন্তু আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্নই আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ বলা যাইতে পারে। কারণ, যিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিবেন, তিনি নিজেই আত্মা। প্রশ্নকারী নিজে নাই, অথচ প্রশ্ন হইতেছে, ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। বাদী না

থাকিলে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে না। পরন্তু আত্মা না থাকিলে জীবের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কারণ, আত্মার ইষ্ট বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইষ্টসাধনত্ব-জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ। "ইহা আমার ইষ্টসাধন" এইরূপ জ্ঞান না হইলে কোন বিষয়েই কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। আমার ইষ্টসাধন বলিয়া জ্ঞান হইলে, আমার অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। আত্মা বা "আমি" বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে "আমার ইষ্টসাধন", এইরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। শেষ কথা, জ্ঞানপদার্থ সকলেরই স্বীকার্য্য। যিনি জ্ঞানেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, তিনি কোন মত স্থাপন বা কোনরূপ তর্ক করিতেই পারিবেন না। যাঁহা'র নিজেরও কোন জ্ঞান নাই, যিনি কিছুই বুঝেন না, যিনি জ্ঞানের অস্তিত্বই মানেন না, তিনি কিরূপে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিবেন? ফলকথা, জ্ঞান সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পদার্থ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। জ্ঞান সর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলে, ঐ জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞাতাও সর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ হইবে। কারণ, জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার আশ্রয়—জ্ঞাতা নাই, ইহা একেবারেই অসম্ভব। যিনি জ্ঞাতা, তিনিই আত্মা। জ্ঞাতারই নামান্তর আত্মা। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে কোন সংশয় বা বিবাদ হইতেই পারে না। সাংখ্য-সূত্রকারও বলিয়াছেন, "অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ।"৬।১। অর্থাৎ আত্মার নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ না থাকায়, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং উহার একটির প্রমাণ না থাকিলে, অপরটি সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মীতেই বিপ্রতিপন্ন, অর্থাৎ আত্মা বলিয়া কোন ধর্ম্মীই যিনি মানেন না, তাঁহার পক্ষে উহাতে নাস্তিত্ব-ধর্ম্মের সাধনে কোন প্রমাণই নাই। কারণ, তিনি আত্মাকেই ধর্ম্মিরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে নাস্তিত্ব ধর্ম্মের অনুমান করিবেন। কিন্তু তাঁহার মতে আত্মা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া তাঁহার সমস্ত অনুমানই "আশ্রয়াসিদ্ধি" দোষবশতঃ অপ্রমাণ হইবে। পরন্তু সাধারণ লোকেও যে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে, সেই আত্মাকে যিনি অলীক বলেন, অথচ সেই আত্মাকেই ধর্ম্মিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে নাস্তিত্বের অনুমান করেন,—তিনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষকও নহেন, সুতরাং তিনি উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষণীয়। মূলকথা, সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় হয় না। আত্মা বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা সর্ব্বসিদ্ধ হইলেও উহা কি দেহাদিসংঘাত মাত্র? অথবা তাহা হইতে ভিন্ন?—এইরূপ সংশয় হয়। কারণ, "চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে," "মনের দ্বারা জানিতেছে," "বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে," "শরীরের দ্বারা সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে", এইরূপ যে "ব্যপদেশ" হয়, ইহা কি অবয়বের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতরূপ সমুদায়ের ব্যপদেশ? অথবা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ?—ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

ভাষ্য। অন্যেনায়মন্যস্য ব্যপদেশঃ। কস্মাৎ?

অনুবাদ। (উত্তর) ইহা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ। (প্রশ্ন) কেন?

সূত্র। দর্শন-স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ ॥১॥১৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু "দর্শন" ও "স্পর্শনের" দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা (একই জ্ঞাতার) এক পদার্থের জ্ঞান হয়।

বিবৃতি। দেহাদি-সংঘাত আত্মা নহে। কারণ, ঐ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়বর্গ আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত। ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলিতে হইবে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলি এককর্ত্তৃক হই:ব না। কিন্তু "আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পদার্থকে দর্শন করিয়াছি, সেই পদার্থকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি"—এইরূপে ঐ দুইটি প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐ মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা পূর্ব্বজাত সেই দুইটি প্রত্যক্ষ যে একবিষয়ক এবং এককর্ত্তৃক, অর্থাৎ একই জ্ঞাতা যে একই বিষয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত।

ভাষ্য। দর্শনেন কশ্চিদর্থো গৃহীতঃ, স্পর্শনেনাপি সোঽর্থো গৃহ্যতে, যমহমদ্রাক্ষং চক্ষুষা তং স্পর্শনেনাপি স্পৃশামীতি, যঞ্চাস্পার্ক্ষং স্পর্শনেন, তং চক্ষুষা পশ্যামীতি। একবিষয়ৌ চেমৌ প্রত্যয়াবেককর্ত্তৃকৌ প্রতিসন্ধীয়েতে, ন চ সঙ্ঘাতকর্ত্তৃকৌ, নেন্দ্রিয়েণৈক[১]-কর্ত্তৃকৌ। তদ্‌যোঽসৌ চক্ষুষা ত্বগিন্দ্রিয়েণ চৈকার্থস্য গ্রহীতা ভিন্ননিমিত্তা[২]বনন্যকর্ত্তৃকৌ[৩] প্রত্যয়ৌ সমানবিষয়ৌ[৪] প্রতিসন্দধাতি সোঽর্থান্তরভূত আত্মা। কথং পুনর্নেন্দ্রিয়েণৈককর্ত্তৃকৌ? ইন্দ্রিয়ং খলু স্ব-স্ব-বিষয়গ্রহণমনন্যকর্ত্তৃকং প্রতিসন্ধাতুমর্হতি নেন্দ্রিয়ান্তরস্য বিষয়ান্তরগ্রহণমিতি। কথং ন সংঘাতকর্ত্তৃকৌ? একঃ খল্বয়ং ভিন্ননিমিত্তৌ স্বাত্মকর্ত্তৃকৌ প্রতিসংহিতৌ প্রত্যয়ৌ বেদয়তে, ন সংঘাতঃ। কস্মাৎ? অনিবৃত্তং হি সংঘাতে[৫] প্রত্যেকং বিষয়ান্তরগ্রহণস্যাপ্রতিসন্ধানমিন্দ্রিয়ান্তরেণেবেতি।

১। "ইন্দ্রিয়েণ" এই স্থলে অভেদ অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝা যায়।

২। ভিন্নমিন্দ্রিয়ং নিমিত্তং যয়োঃ। ৩। "অনন্যকর্ত্তৃকৌ" আত্মৈককর্ত্তৃকৌ। ৪। "সমানবিষয়ৌ" দ্রব্যমেকং বিষয় ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা

৫। "সংঘাতে" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা অন্তর্গতত্ব অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কেবলাম্বয়ী অনুমানের ব্যাখ্যারম্ভে টীকাকার জগদীশ লিখিয়াছেন, "নির্দ্ধারণ ইব অন্তর্গতত্বেঽপি সপ্তমীপ্রয়োগাৎ" ভাষ্যের শেষে "ইন্দ্রিয়ান্তরেণ"

অনুবাদ। "দর্শনের" দ্বারা (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা) কোন পদার্থ জ্ঞাত হইয়াছে, "স্পর্শনের" দ্বারাও (ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও) সেই পদার্থ জ্ঞাত হইতেছে, (কারণ) "যে পদার্থকে আমি চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি," এবং "যে পদার্থকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছি,"। এইরূপে একবিষয়ক এই জ্ঞানদ্বয় (চাক্ষুষ ও স্পার্শন-প্রত্যক্ষ) এককর্ত্তৃকরূপে প্রতিসংহিত (প্রত্যভিজ্ঞাত) হয়, সংঘাতকর্ত্তৃকরূপে প্রতিসংহিত হয় না, ইন্দ্রিয়রূপ এককর্ত্তৃকরূপেও প্রতিসংহিত হয় না। [অর্থাৎ একপদার্থ-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, ঐ দুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্ত্তা—দেহাদিসমষ্টি উহার কর্ত্তা নহে ; কোন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ও উহার কর্ত্তা নহে।]

অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একপদার্থের জ্ঞাতা এই যে পদার্থ, ভিন্ন-নিমিত্তক (বিভিন্নেন্দ্রিয়-নিমিত্তক) অনন্যকর্ত্তৃক (একাত্মকর্ত্তৃক) সমান-বিষয়ক (একদ্রব্য-বিষয়ক) জ্ঞানদ্বয়কে (পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রত্যক্ষকে) প্রতিসন্ধান করে, তাহা অর্থান্তরভূত, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত বা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন আত্মা।

(প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়রূপ এককর্ত্তৃক নহে কেন ? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একবিষয়ক দুইটি প্রত্যক্ষ কোন একটি ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক নহে, ইহার হেতু কি ? (উত্তর) যেহেতু ইন্দ্রিয় অনন্যকর্ত্তৃক অর্থাৎ নিজ কর্ত্তৃক স্ব স্ব বিষয়জ্ঞানকেই প্রতিসন্ধান করিতে পারে, ইন্দ্রিয়ান্তর কর্ত্তৃক বিষয়ান্তরজ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন) সংঘাতকর্ত্তৃক নহে কেন ? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রত্যক্ষ দেহাদি-সংঘাত কর্ত্তৃক নহে, ইহার হেতু কি ? (উত্তর) যেহেতু এই এক জ্ঞাতাই ভিন্ননিমিত্ত জন্য নিজ কর্ত্তৃক প্রতিসংহিত অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত জ্ঞানদ্বয়কে (পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়কে) জানে, সংঘাত জানে না, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, ইহার হেতু কি ? (উত্তর) যেহেতু

এইরূপ তৃতীয়ান্ত উপমান পদের প্রয়োগ থাকায়, "প্রত্যেকং" এই উপমেয় পদও তৃতীয়ান্ত বুঝিতে হইবে। অপ্রতিসন্ধানের প্রতিযোগী প্রতিসন্ধান ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারকে ঐ স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে এবং ঐ প্রতিসন্ধান ক্রিয়ার কর্ম্মকারকে ("বিষয়ান্তরগ্রহণস্য" এই স্থলে) কৃদ্‌যোগে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে "উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি।"—পাণিনিসূত্র।২।৩।৬৬।

অন্য ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অন্য বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয়ান্তরের জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাবের ন্যায় দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) কর্ত্তৃক বিষয়ান্তরজ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাব নিবৃত্ত হয় না। [অর্থাৎ ঐ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই একে অপরের বিষয়জ্ঞানের প্রতিসন্ধান করিতে না পারায়, ঐ দেহাদিসংঘাত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য।]

টিপ্পনী। কর্ত্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। ক্রিয়ামাত্রেরই কর্ত্তা আছে। সুতরাং "চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে", "মনের দ্বারা বুঝিতেছে", "বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে", "শরীরের দ্বারা সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া ও চক্ষুরাদি করণের কোন কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ বুঝা যায়। অর্থাৎ কোন কর্ত্তা চক্ষুরাদি করণের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছে,—ইহা বুঝা যায়। ন্যায়মতে আত্মাই কর্ত্তা। কিন্তু ঐ আত্মা কে, ইহা বিচার দ্বারা প্রতিপাদন করা আবশ্যক। "চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারা ক্রিয়া ও করণের কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, উহার নাম "ব্যপদেশ"। কিন্তু ঐ ব্যপদেশ যদি চক্ষুরাদি অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের (সংঘাতের) ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে দেহাদিসংঘাতই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বা আত্মা, ইহা সিদ্ধ হয়। আর যদি উহা অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে ঐ দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা—আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে অতিরিক্ত, এই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। ভাষ্যকার বিচারের জন্য প্রথমে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যপদেশ বিষয়ে সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক ঐ ব্যপদেশ অন্যের দ্বারা অন্যের ব্যপদেশ, এই সিদ্ধান্তপক্ষের উল্লেখ করিয়া উহা সমর্থন করিতে মহর্ষির সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সূত্রে যদ্দ্বারা দর্শন করা যায়—এই অর্থে "দর্শন" শব্দের অর্থ এখানে 'চক্ষুরিন্দ্রিয়'। এবং যদ্দ্বারা স্পর্শ করা যায়—এই অর্থে "স্পর্শন" শব্দের অর্থ 'ত্বগিন্দ্রিয়'। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন পদার্থকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও ঐ পদার্থের স্পার্শন প্রত্যক্ষ করে। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পার্শন, এই দুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্ত্তা। দেহাদি-সংঘাতরূপ অনেক পদার্থ, অথবা কোন একটি ইন্দ্রিয়ই ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা নহে। সুতরাং দেহাদি-সংঘাত অথবা ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। একই ব্যক্তি যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "যে পদার্থকে আমি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি" ইত্যাদি প্রকারে একবিষয়ক ঐ দুইটি প্রত্যক্ষের যে প্রতিসন্ধান (মানস-প্রত্যক্ষ-বিশেষ) জন্মে, তদ্দ্বারা ঐ দুইটি প্রত্যক্ষ যে এককর্ত্তৃক, অর্থাৎ একই ব্যক্তি যে, ঐ দুইটি প্রত্যক্ষের কর্ত্তা, ইহা সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকে ভ্রম বলিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের এককর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে

না। পূর্ব্বোক্ত এক পদার্থ-বিষয়ক দুইটি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়রূপ এককর্ত্তৃক নহে কেন? অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দর্শনের কর্ত্তা, তাহাই স্পার্শনের কর্ত্তা, ইহা কেন বলা যায় না? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি ভিন্ন, এবং উহাদিগের গ্রাহ্যবিষয়ও ভিন্ন। সমস্ত পদার্থ কোন একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়কে দর্শনের কর্ত্তা বলা গেলেও স্পার্শনের কর্ত্তা বলা যায় না। স্পর্শ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় না হওয়ায়, স্পর্শের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ কর্ত্তাও হইতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষের কর্ত্তা বলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের কর্ত্তাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কোন একটি ইন্দ্রিয়ই সেই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের কর্ত্তা, ইহা আর বলা যাইবে না। তাহা বলিতে গেলে পূর্ব্বোক্তরূপ যথার্থ প্রতিসন্ধান উপপন্ন হইবে না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই যদি পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা বলা হয়, তাহা হইলে ঐ চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের প্রতিসন্ধানকর্ত্তা বলিতে হইবে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহার নিজ কর্ত্তৃক নিজ বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ দর্শনরূপ প্রত্যক্ষের প্রতিসন্ধান করিতে পারিলেও ত্বগিন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয়ান্তর-জ্ঞানকে অর্থাৎ স্পার্শন প্রত্যক্ষকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। কারণ, যে পদার্থের প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, তাহার স্মরণ আবশ্যক। স্মরণ ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। একের জ্ঞাত পদার্থ অন্যে স্মরণ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয় কর্ত্তৃক যে প্রত্যক্ষ, চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহা স্মরণ করিতে না পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং কোন একটি ইন্দ্রিয়ই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা নহে, ইহা বুঝা যায়। দেহাদিসংঘাতই ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা নহে কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একই জ্ঞাতা নিজকর্ত্তৃক ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের প্রতিসন্ধান করে, অর্থাৎ "যে আমি চক্ষুর দ্বারা এই পদার্থকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পদার্থকে স্পর্শন করিতেছি।" এইরূপে ঐ চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের মানস-প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা করে, দেহাদি-সংঘাত ঐ প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাত ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত্তা নহে, ইহা বুঝা যায়। দেহাদি-সংঘাত ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে, যেমন এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, কারণ, একের জ্ঞাত বিষয় অপরে স্মরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ একে অপরের জ্ঞাত বিষয়জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বহু পদার্থের সমষ্টিকে "সংঘাত" বলে ঐ "সংঘাতে"র অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ বা ব্যষ্টি হইতে সংঘাত বা সমষ্টি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। দেহাদি-সংঘাত উহার অন্তর্গত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে। সুতরাং দেহাদি-সংঘাত দেহাদি প্রত্যেক পদার্থ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ঐ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহ প্রভৃতি কোন পদার্থই একে অপরের বিষয়জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। দেহ কর্ত্তৃক যে বিষয়জ্ঞান হইবে, ইন্দ্রিয়াদি তাহা স্মরণ করিতে না পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক যে বিষয় জ্ঞান হইবে, দেহাদি তাহা স্মরণ করিতে

না পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। এইরূপে দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ যদি অপরের জ্ঞানের প্রতিসন্ধান করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ দেহাদি-সংঘাতও পূর্ব্বোক্ত দুই ইন্দ্রিয় জন্য দুইটি প্রত্যক্ষের প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, ইহ স্বীকার্য্য। কারণ, ঐ সংঘাত দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। প্রতিসন্ধান জন্মিলে, তখন প্রতিসন্ধানের অভাব যে অপ্রতিসন্ধান, তাহা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু দেহাদির অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ কর্তৃক বাদীর অভিমত যে বিষয়ান্তর-জ্ঞানের প্রতিসন্ধান, তাহা কখনই জন্মে না, জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই, সুতরাং সেখানে অপ্রতিসন্ধানের কোন দিনই নিবৃত্তি হয় না। ভাষ্যকার এই ভাব প্রকাশ করিতেই অর্থাৎ ঐরূপ প্রতিসন্ধান কোন কালেই জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, ইহা প্রকাশ করিতেই এখানে "অপ্রতিসন্ধানং অনিবৃত্তং" এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রানুসারে আত্মা ইন্দ্রিয় ভিন্ন, এই সিদ্ধান্তকেই প্রথম অধ্যায়ে "অধিকরণ সিদ্ধান্তে"র উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব প্রভৃতি অনেক আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয়। কারণ, ইন্দ্রিয় নানা, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ম আছে, এবং ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, এবং স্ব স্ব বিষয়-জ্ঞানই ইন্দ্রিয়বর্গের অনুমাপক, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধাদি গুণগুলি তাহাদিগের আধার দ্রব্য হইতে ভিন্ন পদার্থ, এবং যিনি জ্ঞাতা, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ববিষয়েরই জ্ঞাতা। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত না মানিলে, মহর্ষির এই সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্মা ইন্দ্রিয়-ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। ১ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

সূত্র। ন বিষয়-ব্যবস্থানাৎ ॥২॥২০০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়ম আছে।

ভাষ্য। ন দেহাদিসংঘাতাদন্যশ্চেতনঃ, কস্মাৎ? বিষয়-ব্যবস্থানাৎ। ব্যবস্থিতবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, চক্ষুষ্যসতি রূপং ন গৃহ্যতে, সতি চ গৃহ্যতে। যচ্চ যস্মিন্নসতি ন ভবতি সতি ভবতি, তস্য তদিতি বিজ্ঞায়তে। তস্মা-দ্রূপগ্রহণং চক্ষুষঃ, চক্ষূ রূপং পশ্যতি। এবং ঘ্রাণাদিষ্বপীতি। তানী-ন্দ্রিয়াণীমানি স্ব-স্ব-বিষয়গ্রহণাচ্চেতনানি, ইন্দ্রিয়াণাং ভাবাভাবয়োর্বিষয়-গ্রহণস্য তথাভাবাৎ। এবং সতি কিমন্যেন চেতনেন?

সন্দিগ্ধত্বাদহেতুঃ। যোঽয়মিন্দ্রিয়াণাং ভাবাভাবয়োর্ব্বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবঃ, স কিং চেতনত্বাদাহোস্বিচ্চেতনোপকরণানাং গ্রহণনিমিত্তত্বাদিতি সন্দিহ্যতে। চেতনোপকরণত্বেঽপীন্দ্রিয়াণাং গ্রহণনিমিত্তত্বাদ্ভবিতুমর্হতি।

অনুবাদ। চেতন অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। বিশদার্থ এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়; চক্ষু না থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষু থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়। যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, থাকিলেই হয়, তাহার তাহা, অর্থাৎ সেই পদার্থেই তাহার কার্য্য সেই পদার্থ জন্মে, ইহা বুঝা যায়। অতএব রূপজ্ঞান চক্ষুর, চক্ষু রূপ দর্শন করে। এইরূপ ঘ্রাণ প্রভৃতিতেও বুঝা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব বিষয় গন্ধাদি প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝা যায়। সেই এই ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ের গ্রহণ করায়, চেতন। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্তায় বিষয়জ্ঞানের তথাভাব (সত্তা ও অসত্তা) আছে। এইরূপ হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বর্গের চেতনত্ব সিদ্ধ হইলে, অন্য চেতন ব্যর্থ, অর্থাৎ অতিরিক্ত কোন চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক।

(উত্তর) সন্দিগ্ধত্ববশতঃ (পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রযুক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ উহা হেতুই হয় না। (বিশদার্থ) এই যে, ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্তায় বিষয়জ্ঞানের তথাভাব, তাহা কি (ইন্দ্রিয়গুলির) চেতনত্বপ্রযুক্ত? অথবা চেতনের উপকরণগুলির (চেতন সহকারী ইন্দ্রিয়গুলির) জ্ঞাননিমিত্তত্বপ্রযুক্ত, ইহা সন্দিগ্ধ। ইন্দ্রিয়গুলির চেতনের উপকরণত্ব হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি চেতন না হইয়া, চেতন আত্মার সহকারী হইলেও জ্ঞানের নিমিত্তত্ববশতঃ (পূর্ব্বোক্ত নিয়ম) হইতে পারে।

টিপ্পনী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি দর্শনাদি জ্ঞানের কর্ত্তা চেতন পদার্থ নহে, ইহা মহর্ষি প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা দেহাদি-সংঘাত দর্শনাদিজ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা নহে, এই সিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়ম থাকায়, ইন্দ্রিয়গুলিই দর্শনাদি জ্ঞানের কর্ত্তা চেতনপদার্থ, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং দেহাদিসংঘাত হইতে ভিন্ন কোন চেতনপদার্থ নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই আত্মা। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিলে কেহ রূপ দেখিতে পারে না, চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকিলেই রূপ দেখিতে পারে। এইরূপ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেই গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা হয় না। ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্তায় রূপাদি-বিষয়-জ্ঞানের পূর্ব্বোক্তরূপ সত্তা ও অসত্তাই এখানে ভাষ্যকারের মতে সূত্রকারোক্ত বিষয়ব্যবস্থা। তদ্দ্বারা বুঝা যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিই রূপাদি প্রত্যক্ষ করে। কারণ, যে পদার্থ না থাকিলে যাহা হয় না, পরন্তু থাকিলেই হয়, তাহা ঐ পদার্থেরই ধর্ম্ম, ইহা সিদ্ধ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিলে রূপাদি জ্ঞান হয় না, পরন্তু থাকিলেই হয়, সুতরাং রূপাদি-জ্ঞান

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরই গুণ—ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বা দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আর কোন চেতনপদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক।

মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিলেও ভাষ্যকার এখানে স্বতন্ত্রভাবে এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্ধত্ববশতঃ উহা হেতুই হয় না। ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্তায় বিষয়জ্ঞানের যে সত্তা ও অসত্তা, তাহা কি ইন্দ্রিয়গুলির চেতনত্বপ্রযুক্ত ? অথবা ইন্দ্রিয়গুলি চেতনের সহকারী বলিয়া উহাদিগের জ্ঞাননিমিত্তত্বপ্রযুক্ত ? পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়বশতঃ ঐ হেতুর দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির চেতনত্ব সিদ্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি চেতন না হইয়া চেতন আত্মার সহকারী হইলেও, উহাদিগের সত্তা ও অসত্তায় রূপাদি বিষয়-জ্ঞানের সত্তা ও অসত্তা হইতে পারে। কারণ, উহারা রূপাদি বিষয়জ্ঞানের নিমিত্ত বা কারণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্তায় রূপাদি বিষয়জ্ঞানের সত্তা ও অসত্তারূপ যে বিষয়-ব্যবস্থা, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিই চেতন, উহারাই রূপাদিজ্ঞানের কর্ত্তা, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রদীপ থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় ; প্রদীপ না থাকিলে অন্ধকারে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বলিয়া কি ঐ স্থলে প্রদীপকে রূপপ্রত্যক্ষের কর্ত্তা চেতনপদার্থ বলিতে হইবে ? পূর্ব্বপক্ষবাদীও ত তাহা বলেন না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি প্রদীপের ন্যায় প্রত্যক্ষকার্য্যে চেতন আত্মার উপকরণ বা সহকারী হইলেও যখন পূর্ব্বোক্তরূপ বিষয়-ব্যবস্থা উপপন্ন হয় তখন উহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। উহা অহেতু বা হেত্বাভাস ॥২॥

ভাষ্য। যচ্চোক্তং বিষয়-ব্যবস্থানাদিতি।

অনুবাদ। বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত (ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই) এই যে (পূর্ব্বপক্ষ) বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি বলিতেছেন)—

সূত্র। তদ্ব্যবস্থানাদেবাত্ম-সদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ ॥৩॥২০১॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্তই আত্মার অস্তিত্ববশতঃ প্রতিষেধ নাই [অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার প্রতিষেধ-সাধনে যে বিষয়-ব্যবস্থাকে হেতু বলিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বেরই সাধক হওয়ায়, উহা বিরুদ্ধ, সুতরাং উহার দ্বারা ঐ প্রতিষেধ সিদ্ধ হয় না]।

ভাষ্য। যদি খল্বেকমিন্দ্রিয়মব্যবস্থিতবিষয়ং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিষয়গ্রাহি চেতনং স্যাৎ কস্ততোঽন্যং চেতনমনুমাতুং শক্নুয়াৎ। যস্মাত্তু ব্যবস্থিত-বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, তস্মাত্তেভ্যোঽন্যশ্চেতনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিষয়গ্রাহী

বিষয়ব্যবস্থিতিতোঽনুমীয়তে। তত্রেদমভিজ্ঞানমপ্রত্যাখ্যেয়ং চেতনবৃত্তমুদাহ্রিয়তে। রূপদর্শী খল্বয়ং রসং গন্ধং বা পূর্ব্বগৃহীতমনুমিনোতি। গন্ধপ্রতিসংবেদী চ রূপরসাবনুমিনোতি। এবং বিষয়শেষেঽপি বাচ্যং। রূপং দৃষ্ট্বা গন্ধং জিঘ্রতি, ঘ্রাত্বা চ গন্ধং রূপং পশ্যতি। তদেবমনিয়তপর্য্যায়ং সর্ব্ববিষয়গ্রহণমেকচেতনাধিকরণমনন্যকর্ত্তৃকং প্রতিসন্ধত্তে। প্রত্যক্ষানুমানাগমসংশয়ান্ প্রত্যয়াংশ্চ নানাবিষয়ান্ স্বাত্মকর্ত্তৃকান্ প্রতিসন্ধায় বেদয়তে। সর্ব্বার্থবিষয়ঞ্চ শাস্ত্রং প্রতিপদ্যতেঽর্থমবিষয়ভূতং শ্রোত্রস্য। ক্রমভাবিনো বর্ণান্ শ্রুত্বা পদবাক্যভাবেন প্রতিসন্ধায় শব্দার্থব্যবস্থাঞ্চ বুধ্যমানোঽনেকবিষয়মর্থজাতমগ্রহণীয়মেকৈকেনেন্দ্রিয়েণ গৃহ্লাতি। সেয়ং সর্ব্বজ্ঞস্য জ্ঞেয়াঽব্যবস্থাঽনুপদং ন শক্যা পরিক্রমিতুং। আকৃতিমাত্রন্তূদাহৃতং। তত্র যদুক্তমিন্দ্রিয়চৈতন্যে সতি কিমন্যেন চেতনেন, তদযুক্তং ভবতি।

অনুবাদ। যদি অব্যবস্থিতবিষয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা অর্থাৎ বিভিন্ন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, চেতন একটি ইন্দ্রিয় থাকিত, (তাহা হইলে) সেই ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন চেতন, কোন্ ব্যক্তি অনুমান করিতে পারিত। কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে ; সকল ইন্দ্রিয়ই সকল বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে না—অতএব বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত সেই ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা চেতন (আত্মা) অনুমিত হয়।

তদ্বিষয়ে চেতনস্থ অপ্রত্যাখ্যেয় এই অভিজ্ঞান অর্থাৎ[১] অসাধারণ চিহ্ন উদাহৃত হইতেছে। রূপদর্শী এই চেতন পূর্ব্বজ্ঞাত রস বা গন্ধকে অনুমান করে। এবং গন্ধের জ্ঞাতা চেতন রূপ ও রসকে অনুমান করে। এইরূপ অবশিষ্ট বিষয়েও বলিতে হইবে। রূপ দেখিয়া গন্ধ ঘ্রাণ করে, এবং গন্ধকে ঘ্রাণ করিয়া রূপ দর্শন করে। সেই এইরূপ অনিয়তক্রম এক চেতনস্থ সর্ব্ববিষয়জ্ঞানকে অভিন্নকর্ত্তৃক-

১। অসাধারণং চিহ্নমভিজ্ঞানমুচ্যতে, তচ্চাপ্রত্যাখ্যেয়মনুভবসিদ্ধত্বাৎ। "অনিয়তপর্য্যায়ং" অনিয়তক্রমমিত্যর্থঃ। অনেকবিষয়মর্থজাতমিতি। অনেকপদার্থো বিষয়ো যস্যার্থজাতস্য তত্তথোক্তং। "আকৃতিমাত্রম্" ইতি। সামান্যমাত্রমিত্যর্থঃ। তদেতচ্চেতনবৃত্তং দেহাদিভ্যো ব্যাবর্ত্তমানং তদ্ব্যতিরিক্তং চেতনং সাধয়তীতি স্থিতং। নেচ্ছাদ্যাধারত্বং দেহাদীনামিতি'—তাৎপর্য্যটীকা।

রূপে প্রতিসন্ধান করে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাব্দবোধ) ও সংশয়রূপ নানাবিষয়ক জ্ঞানসমূহকেও নিজকর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিয়া জানে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয় অর্থ এবং সর্ব্বার্থবিষয় শাস্ত্রকে জানে। ক্রমোৎপন্ন বর্ণসমূহকে শ্রবণ করিয়া পদ ও বাক্য ভাবে প্রতিসন্ধান (স্মরণ) করিয়া এবং শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য—এইরূপে শব্দার্থ-সঙ্কেতকে বোধ করতঃ এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "অগ্রহণীয়" অনেক বিষয়, অর্থাৎ অনেক পদার্থ যাহার বিষয়, এমন অর্থসমূহকে গ্রহণ করে। সর্ব্বজ্ঞের অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা চেতনের জ্ঞেয় বিষয়ে সেই এই (পূর্ব্বোক্তরূপ) অব্যবস্থা (অনিয়ম) প্রত্যেক স্থলে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। আকৃতিমাত্রই অর্থাৎ সামান্যমাত্রই উদাহৃত হইল। তাহা হইলে যে বলা হইয়াছে, "ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য থাকিলে অন্য চেতন ব্যর্থ," তাহা অর্থাৎ ঐ কথা অযুক্ত হইতেছে।

টিপ্পনী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেই রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা হয় না, এইরূপ বিষয়-ব্যবস্থা হেতুর দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিই তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয় রূপাদি প্রত্যক্ষের কর্ত্তা—চেতনপদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় ভিন্ন চেতনপদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, তদুত্তরে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে, বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার প্রতিষেধ করা যায় না। কারণ, বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারাই ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার সদ্ভাব (অস্তিত্ব) সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিষয়-ব্যবস্থারূপ হেতু ইন্দ্রিয়াদির অচেতনত্বের সাধক হওয়ায়, উহা ইন্দ্রিয়াদির চেতনত্বের সাধক হইতে পারে না, উহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়ায়, "বিরুদ্ধ" নামক হেত্বাভাস। ভাষ্যকার মহর্ষির এই বক্তব্য প্রকাশ করিতেই "যচ্চোক্তং" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষসূত্রে যেরূপ বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন—এই সূত্রে সেরূপ বিষয়-ব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুই এই সূত্রে গৃহীত হয় নাই। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়বর্গের গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে। রূপাদি সমস্ত বিষয়ই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে রূপই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, এবং রসই রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, এইরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের ব্যবস্থা থাকায়, ঐ ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়। এইরূপ বিষয়-ব্যবস্থা হেতুর দ্বারা ব্যবস্থিত বিষয় ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন অব্যবস্থিত বিষয়, অর্থাৎ যাহার বিষয়-ব্যবস্থা নাই—যে পদার্থ সর্ব্ববিষয়েরই জ্ঞাতা, এইরূপ কোন চেতন পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। অবশ্য যদি অব্যবস্থিত বিষয় সর্ব্ববিষয়েরই জ্ঞাতা চেতন কোন একটি ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে অন্য চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক হওয়ায়, সেই ইন্দ্রিয়কেই চেতন বা আত্মা বলা যাইত, তদ্ভিন্ন চেতনের অনুমানও করা যাইত না। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ের

জ্ঞাতা কোন চেতন ইন্দ্রিয় না থাকায়, ইন্দ্রিয় ভিন্ন চেতনপদার্থ অবশ্যই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত-রূপ বিষয়-ব্যবস্থা হেতুর দ্বারাই উহা অনুমিত বা সিদ্ধ হয়।

একই চেতনপদার্থ যে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই যে একই চেতনের ধর্ম্ম, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে চেতনগত অভিজ্ঞান অর্থাৎ চেতন আত্মার অসাধারণ চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। যে চেতনপদার্থ রূপ দর্শন করে, সেই চেতনই পূর্ব্বজ্ঞাত রস ও গন্ধকে অনুমান করে এবং গন্ধ গ্রহণ করিয়া ঐ চেতনই রূপ ও রস অনুমান করে, এবং রূপ দেখিয়া গন্ধ আঘ্রাণ করে, গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া রূপ দর্শন করে। চেতনের এই সমস্ত জ্ঞান অনিয়তপর্য্যায়, অর্থাৎ উহার পর্য্যায়ের (ক্রমের) কোন নিয়ম নাই। রূপদর্শনের পরেও গন্ধজ্ঞান হয়, গন্ধ-জ্ঞানের পরেও রূপদর্শন হয়। এইরূপ এক চেতনগত অনিয়তক্রম সর্ব্ববিষয়জ্ঞানের এক-কর্ত্তৃকত্বরূপেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, ঐ সমস্ত জ্ঞানই যে এককর্ত্তৃক, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত কথাই প্রকারান্তরে সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দবোধ সংশয় প্রভৃতি নানাবিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই চেতনপদার্থ স্বকর্ত্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিয়া বুঝে। যে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই আমিই অনুমান করিতেছি, শাব্দবোধ করিতেছি, স্মরণ করিতেছি, এইরূপে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের একমাত্র চেতনপদার্থেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, এক-মাত্র চেতনই যে, ঐ সমস্ত জ্ঞানের কর্ত্তা, ইহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র দ্বারা যে বোধ হয়, তাহাতে প্রথমে ক্রমভাবী অর্থাৎ সেই রূপ আনুপূর্ব্বীবিশিষ্ট বর্ণসমূহের শ্রবণ করে। পরে পদ ও বাক্য-ভাবে ঐ বর্ণসমূহকে এবং শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থা বা শব্দার্থ-সঙ্কেতকে স্মরণ করিয়া অনেক বিষয় পদার্থসমূহকে অর্থাৎ যে পদার্থসমূহের মধ্যে অনেক পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং যাহা কোন একমাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, এমন পদার্থসমূহকে শাব্দবোধ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পদার্থই শাস্ত্রের বিষয় বা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য হওয়ায়, শাস্ত্র সর্ব্বার্থবিষয়। বর্ণাত্মক শব্দরূপ শাস্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, তাহার অর্থ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। নানাবিধ অর্থ শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য হওয়ায়, সেগুলি কোন একমাত্র ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং শব্দশ্রবণ শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য হইলেও, শব্দের পদবাক্যভাবে প্রতিসন্ধান এবং শব্দার্থসঙ্কেতের স্মরণ ও শাব্দবোধ কোন ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে না। পরন্তু শব্দশ্রবণ হইতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জ্ঞানগুলিই একই চেতনকর্ত্তৃক, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ-গুলিকে ঐ সমস্ত জ্ঞানের কর্ত্তা—চেতন বলা যায় না। কোন ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে না পারায়, প্রতি দেহে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা এক একটি পৃথক্ চেতনপদার্থ স্বীকার আবশ্যক। ঐ চেতনপদার্থে তাহার জ্ঞানসাধন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সমস্ত বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, ঐ চেতনই সেই সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই অর্থে ভাষ্যকার ঐ চেতন আত্মাকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়া "সর্ব্ববিষয়গ্রাহী" এই কথার দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। মূলকথা, কোন ইন্দ্রিয়ই পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে না পারায়, ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলির জ্ঞেয় বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে। সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা আত্মার জ্ঞেয় বিষয়ের

ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই প্রতি দেহে একচেতনগত। উহা প্রতিসন্ধানরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় অপ্রত্যাখ্যেয় অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানই যে, একচেতনগত (ইন্দ্রিয়াদি বিভিন্ন পদার্থগত নহে), ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা চেতন পদার্থের পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানরূপ অভিজ্ঞান বা অসাধারণ চিহ্ন দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিভিন্ন পদার্থে না থাকায়, তদ্‌ভিন্ন একটি চেতনপদার্থেরই সাধক হয়। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারাই অতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কারণত্বমাত্রই সিদ্ধ হইতে পারে, চেতনত্ব বা কর্তৃত্বসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এই সূত্রোক্ত বিষয়ব্যবস্থার দ্বারা মহর্ষি যে[১] ব্যতিরেকী অনুমানের সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে সৎপ্রতিপক্ষদোষেরও কোন আশঙ্কা নাই। পরন্তু এই অনুমানের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান বাধিত হইয়াছে ॥৩॥

ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

— ০ —

ভাষ্য। ইতশ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা, ন দেহাদি-সংঘাতমাত্রং—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ; দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে—

সূত্র। শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ ॥৪॥২০২॥

অনুবাদ। যেহেতু শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ প্রাণিহত্যা করিলে, পাতক হইতে পারে না। [অর্থাৎ অস্থায়ী অনিত্য দেহাদি আত্মা হইলে, যে দেহাদি প্রাণিহত্যাদির কর্ত্তা, উহা ঐ পাপের ফলভোগকাল পর্য্যন্ত না থাকায়, কাহারও প্রাণিহত্যাজনিত পাপ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী নিত্য আত্মা স্বীকার্য্য।]

ভাষ্য। শরীরগ্রহণেন শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসংঘাতঃ প্রাণিভূতো গৃহ্যতে। প্রাণিভূতং শরীরং দহতঃ প্রাণিহিংসাকৃতপাপং পাতকমিত্যুচ্যতে, তস্যাভাবঃ, তৎফলেন কর্ত্তুরসম্বন্ধাৎ অকর্ত্তুশ্চ সম্বন্ধাৎ। শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাপ্রবন্ধে খল্বন্যঃ সংঘাত উৎপদ্যতেঽন্যো নিরুধ্যতে। উৎপাদনিরোধসন্ততিভূতঃ প্রবন্ধো নান্যত্বং বাধতে, দেহাদি-সংঘাতস্যান্যত্বাধিষ্ঠানত্বাৎ। অন্যত্বাধিষ্ঠানো হ্যসৌ প্রখ্যায়ত ইতি। এবং সতি

১। আত্মা চেতনঃ স্বতন্ত্রত্বে সতি অব্যবস্থানাৎ। যো হ্যস্বতন্ত্রঃ ব্যবস্থিতশ্চ, স ন চেতনো যথা, ঘটাদিঃ, তথা চ চক্ষুরাদি তস্মান্ন চেতনমিতি।

যো দেহাদিসংঘাতঃ প্রাণিভূতো হিংসাং করোতি, নাসৌ হিংসাফলেন সম্বধ্যতে, যশ্চ সম্বধ্যতে ন তেন হিংসা কৃতা। তদেবং সত্ত্বভেদে কৃতহানমকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যতে। সতি চ সত্ত্বোৎপাদে সত্ত্বনিরোধে চাকর্ম্মনিমিত্তঃ সত্ত্বসর্গঃ প্রাপ্নোতি, তত্র মুক্ত্যর্থো ব্রহ্মচর্য্যবাসো ন স্যাৎ। তদ্‌যদি দেহাদিসংঘাতমাত্রং সত্ত্বং[1] স্যাৎ, শরীরদাহে পাতকং ন ভবেৎ। অনিষ্টঞ্চৈতৎ, তস্মাৎ দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মা নিত্য ইতি।

অনুবাদ। (এই সূত্রে) শরীর শব্দের দ্বারা প্রাণিভূত শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখদুঃখরূপ সংঘাত বুঝা যায়। প্রাণিভূত শরীর-দাহকের অর্থাৎ প্রাণহত্যাকারী ব্যক্তির প্রাণিহিংসাজন্য পাপ "পাতক" এই শব্দের দ্বারা কথিত হয়। সেই পাতকের অভাব হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই প্রাণিহত্যার কর্ত্তা আত্মা হইলে তাহার ঐ প্রাণিহিংসাজন্য পাপ হইতে পারে না)। যেহেতু, সেই পাতকের ফলের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু অকর্ত্তার সম্বন্ধ হয়। কারণ, শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখের প্রবাহে অন্য সংঘাত উৎপন্ন হয়, অন্য সংঘাত বিনষ্ট হয়, উৎপত্তি ও বিনাশের সন্ততিভূত প্রবন্ধ অর্থাৎ এক দেহাদির বিনাশ ও অপর দেহাদির উৎপত্তি-বশতঃ দেহাদি-সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহা ভেদকে বাধিত করে না, যেহেতু (পূর্ব্বোক্তরূপ) দেহাদি-সংঘাতের ভেদাশ্রয়ত্ব (ভিন্নত্ব) আছে। এই দেহাদি-সংঘাত ভেদের আশ্রয়, অর্থাৎ বিভিন্নই প্রখ্যাত (প্রজ্ঞাত) হয়। এইরূপ হইলে, প্রাণিভূত যে দেহাদি-সংঘাত হিংসা করে, এই দেহাদি-সংঘাত হিংসার ফলের সহিত সম্বদ্ধ হয় না, যে দেহাদি-সংঘাত হিংসার ফলের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই দেহাদি-সংঘাত হিংসা করে নাই। সুতরাং এইরূপ সত্ত্বভেদ (আত্মভেদ) হইলে, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতই আত্মা হইলে, ঐ সংঘাতভেদে আত্মার ভেদ হওয়ায়, কৃতহানি ও

১। জীব বা আত্মা অর্থে ভাষ্যকার এখানে "সত্ত্বং" এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "বৌদ্ধধিক্কারের" দীধিতির প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণিও "সত্ত্বং আত্মা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন পুস্তকে ঐ স্থলে "সত্ত্ব আত্মা" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারও "সত্ত্ব আত্মা বা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ সেখানে ঐ পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া "সত্ত্বমাত্মা বা" এইরূপ পাঠ কল্পনা করেন। কিন্তু ঐ পাঠ অশুদ্ধ নহে। কারণ, আত্মা অর্থে "সত্ত্ব" শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের ন্যায় পুংলিঙ্গ প্রয়োগও হইতে পারে। মেদিনীকোষে ইহার প্রমাণ আছে। যথা,—

"সত্ত্বং গুণে পিশাচাদৌ বলে দ্রব্যস্বভাবয়োঃ।
আত্মত্ব-ব্যবসায়াসু-চিত্তেষ্বস্ত্রী তু জন্তুষু।—মেদিনী। বত্রিকং, ২৭শ শ্লোক।

অকৃতের অভ্যাগম প্রসক্ত হয়। এবং আত্মার উৎপত্তি ও আত্মার বিনাশ হইলে অকর্ম্মনিমিত্তক আত্মোৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, (অর্থাৎ পূর্ব্বদেহাদির সহিত তদ্‌গত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনাশ হওয়ায় অপর দেহাদির উৎপত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মনিমিত্তক হইতে পারে না।) তাহা হইলে মুক্তিলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্যবাস (ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলবাস) হয় না। সুতরাং যদি দেহাদি-সংঘাতমাত্রই আত্মা হয়, (তাহা হইলে) শরীর-দাহে (প্রাণিহিংসায়) পাতক হইতে পারে না, কিন্তু ইহা অনিষ্ট, অর্থাৎ ঐ পাতকা-ভাব স্বীকার করা যায় না। অতএব আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি আত্মপরীক্ষারম্ভে প্রথম সূত্র হইতে তিন সূত্রের দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সাধন করিয়া, এই সূত্র হইতে তিন সূত্রের দ্বারা আত্মার শরীরভিন্নত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাই সূত্রপাঠে সরলভাবে বুঝা যায়। "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ব্ববর্ত্তী তিন সূত্রকে "ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকাত্ম-প্রকরণ" বলিয়া এই সূত্র হইতে তিন সূত্রকে "শরীরব্যতিরেকাত্ম-প্রকরণ" বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষের মত নিরাস করিতে প্রথম হইতেই মহর্ষির সূত্রের দ্বারাই আত্মা দেহাদির সংঘাতমাত্র, এই পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন ও নিত্য, এই বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম আত্মপরীক্ষায় যে সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে নৈরাত্ম্যবাদী অন্য সম্প্রদায়ের মতও নিরস্ত হইয়াছে। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়, শরীর আত্মা নহে; কারণ, শরীর অনিত্য, অস্থায়ী। মৃত্যুর পরে শরীর দগ্ধ করা হয়। যদি শরীরই আত্মা হয়, তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মা-ধর্ম্মও শরীরেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে। কারণ, শরীরই আত্মা; সুতরাং শরীরই শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। তাহা হইলে শরীর দগ্ধ হইয়া গেলে শরীরাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মও নষ্ট হইয়া যাইবে। শরীর নাশে সেই সঙ্গে পাপ বিনষ্ট হইলে উত্তরকালে ঐ পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলেই যথেচ্ছ পাপকর্ম্ম করিতে পারেন। যে পাপ শরীরের সহিত চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যাহার ফলভোগের সম্ভাবনাই থাকিবে না—সে পাপে আর ভয় কি? পরন্তু মহর্ষির পরবর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষসূত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ কাহারও শরীর নাশ বা প্রাণিহিংসা করিলে, সেই হিংসাকারী ব্যক্তির পাপ হইতে পারে না। কারণ, যে শরীর পূর্ব্বে প্রাণিহিংসার কর্ত্তা, সে শরীর ঐ পাপের ফলভোগ কাল পর্য্যন্ত না থাকায়, তাহার ঐ পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। মূলকথা, যাঁহারা পাপ পদার্থ স্বীকার করেন, যাঁহারা অন্ততঃ প্রাণিহিংসাকেও পাপজনক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা শরীরকে আত্মা বলিতে পারেন না। যাঁহারা পাপ পুণ্য কিছুই মানেন না, তাঁহারাও শরীরকে আত্মা বলিতে পারেন না, ইহা মহর্ষির চরম যুক্তির দ্বারা বুঝা যাইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের দ্বারাই তাঁহার পূর্ব্বগৃহীত বৌদ্ধমতবিশেষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন

যে, এই সূত্রে "শরীর" শব্দের দ্বারা প্রাণিভূত অর্থাৎ যাহাকে প্রাণী বলে, সেই দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখদুঃখরূপ সংঘাত বুঝিতে হইবে। প্রাণিহিংসাজন্য পাপ "পাতক" এই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। প্রাণিহিংসা পাপজনক, ইহা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরও স্বীকৃত। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ দেহাদি-সংঘাতকে আত্মা বলিলে প্রাণিহিংসাজন্য পাপ হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা দেহাদি-সংঘাত-মাত্র নহে। দেহাদি-সংঘাতমাত্র আত্মা হইলে প্রাণিহিংসাজন্যপাপ হইতে পারে না কেন? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, ঐ পাপের ফলের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধ হয় না, পরন্তু অকর্ত্তারই সম্বন্ধ হয়। কারণ, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখের যে প্রবন্ধ বা প্রবাহ চলিতেছে, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে এক দেহাদি-সংঘাত বিনষ্ট হইতেছে, পরক্ষণেই আবার ঐরূপ অপর দেহাদি-সংঘাত উৎপন্ন হইতেছে। তাঁহাদিগের মতে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণমাত্র স্থায়ী। এক দেহাদি-সংঘাতের উৎপত্তি ও পরক্ষণে অপর দেহাদি-সংঘাতের নিরোধ অর্থাৎ বিনাশের সন্ততিভূত যে প্রবন্ধ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট দেহাদি-সংঘাতের ধারাবাহিক যে প্রবাহ, তাহা একপদার্থ হইতে পারে না। উহা অন্যত্বের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ ভেদাশ্রয় বা বিভিন্ন পদার্থই বলিতে হইবে। কারণ, ঐ দেহাদি-সংঘাতের প্রবাহ বা সমষ্টি, উহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘাত বা ব্যষ্টি হ'তে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। অতিরিক্ত কোন পদার্থ হইলে দেহাদি-সংঘাতই আত্মা, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাতরূপ আত্মা বিভিন্ন পদার্থ হওয়ায়, যে দেহাদি-সংঘাতরূপ প্রাণী বা আত্মা, প্রাণি-হিংসা করে সেই আত্মা অর্থাৎ প্রাণি-হিংসার কর্ত্তা পূর্ব্ববর্ত্তী দেহাদি-সংঘাতরূপ আত্মা পরক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায়, তাহা পূর্ব্বকৃত প্রাণি-হিংসাজন্য পাপের ফলভোগ করে না, পরন্তু ঐ পাপের ফলভোগকালে উৎপন্ন অপর দেহাদি-সংঘাতরূপ আত্মা (যাহা ঐ পাপজনক প্রাণিহিংসা করে নাই) ঐ পাপের ফলভোগ করে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার ভেদবশতঃ কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ প্রসক্ত হয়। যে আত্মা পাপ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ঐ পাপের ফলভোগ না হওয়া "কৃতহানি" দোষ এবং যে আত্মা পাপকর্ম্ম করে নাই, তাহার ঐ পাপের ফলভোগ হওয়ায় "অকৃতাভ্যাগম" দোষ। কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না করা কৃতহানি। অকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ করা অকৃতের অভ্যাগম। পরন্তু দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্মা বলিলে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশবশতঃ পূর্ব্বজাত আত্মার কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ঐ আত্মার বিনাশেই বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে অপর আত্মার উৎপত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মজন্য হইতে পারে না, উহা অকর্ম্মনিমিত্তক হইয়া পড়ে। পরন্তু দেহাদি-সংঘাতই "সত্ত্ব" অর্থাৎ আত্মা হইলে, ঐ আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়ায়, মুক্তিলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্যর্থ হয়। কারণ, আত্মার অত্যন্ত বিনাশ হইয়া গেলে, কাহার মুক্তি হইবে? যদি আত্মার পুনর্জ্জন্ম না হওয়াই মুক্তি হয়, তাহা হইলেও উহা দেহনাশের পরেই স্বতঃসিদ্ধ। দেহাদির বিনাশ হইলে তদ্গত ধর্ম্মাধর্ম্মেরও বিনাশ হওয়ায়, আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্মা বলিলে মুক্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হয়। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ও মোক্ষের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান

করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা এই যে, দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ সংঘাত-সন্তান, অর্থাৎ একের বিনাশ ক্ষণেই তজ্জাতীয় অপর একটির উৎপত্তি, এইরূপে ঐ সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহা বিনষ্ট হয় না। ঐ সংঘাত-সন্তানই আত্মা। সুতরাং মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব থাকায়, মুক্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই। এতদুত্তরে আত্মার নিত্যত্ববাদী আস্তিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঐ দেহাদি-সংঘাতের সন্তানও ঐ দেহাদি ব্যষ্টি হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে। সুতরাং ঐ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থই প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলে, ঐ সংঘাত বা উহার সন্তান স্থায়ী পদার্থ হইতে পারে না। কোন পদার্থের স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয় আহ্নিকে ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥৪॥

সূত্র। তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেঽপি তন্নিত্যত্বাৎ ॥ ॥৫॥২০৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ)—সাত্মক শরীরের প্রদাহ হইলেও সেই আত্মার নিত্যত্ববশতঃ সেই (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) পাতকের অভাব হয় [অর্থাৎ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিলেও, ঐ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ হইতে পারে না, সুতরাং এ পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত পাতক হইতে পারে না]।

ভাষ্য। যস্যাপি নিত্যেনাত্মনা সাত্মকং শরীরং দহ্যতে, তস্যাপি শরীর-দাহে পাতকং ন ভবেদ্দগ্ধুঃ। কস্মাৎ? নিত্যত্বাদাত্মনঃ। ন জাতু কশ্চিন্নিত্যং হিংসিতুমর্হতি, অথ হিংস্যতে? নিত্যত্বমস্য ন ভবতি। সেয়মেকস্মিন্ পক্ষে হিংসা নিষ্ফলা, অন্যস্মিংস্ত্বনুপপন্নেতি।

অনুবাদ। যাহারও (মতে) নিত্য আত্মা সাত্মক শরীর অর্থাৎ নিত্য-আত্মযুক্ত শরীর দগ্ধ করে, তাহারও (মতে) শরীরদাহে দাহকের পাতক হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) আত্মার নিত্যত্ববশতঃ। কখনও কেহ নিত্যপদার্থকে বিনষ্ট করিতে পারে না, যদি বিনষ্ট করে, (তাহা হইলে) ইহার নিত্যত্ব হয় না। সেই এই হিংসা এক পক্ষে, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতমাত্রই আত্মা, এই পক্ষে নিষ্ফল, অন্য পক্ষে কিন্তু, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্য, এই পক্ষে অনুপপন্ন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন নিত্য আত্মা স্বীকার করিলেও সে পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত

দোষ অপরিহার্য্য। কারণ, আত্মা নিত্যপদার্থ হইলে দাহজন্য তাহার শরীরেরই বিনাশ হয়; আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাতই আত্মা হইলে যেমন প্রাণিহিংসা-জন্য পাপের ফলভোগকাল পর্য্যন্ত ঐ দেহাদি-সংঘাতের অস্তিত্ব না থাকায়, ফলভোগ হইতে পারে না— সুতরাং প্রাণিহিংসা নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্যপদার্থ হইলে, তাহার বিনাশরূপ হিংসা অসম্ভব হওয়ায়, উহা উপপন্নই হয় না। প্রথম পক্ষে হিংসা নিষ্ফল, আত্মার নিত্যত্ব পক্ষে হিংসা অনুপপন্ন। হিংসা নিষ্ফল হইলে অর্থাৎ হিংসা-জন্য পাপের ফলভোগ অসম্ভব হইলে যেমন হিংসা-জন্য পাপই হয় না, ইহা বলা হইতেছে, তদ্রূপ অন্য পক্ষে হিংসাই অসম্ভব বলিয়া হিংসা-জন্য পাপ অলীক, ইহাও বলিতে পারিব। সুতরাং যে দোষ উভয় পক্ষেই তুল্য, তাহার দ্বারা আমাদিগের পক্ষের খণ্ডন হইতে পারে না। আত্মার নিত্যত্ববাদী যেরূপে ঐ দোষের পরিহার করিবেন, আমরাও সেইরূপে উহার পরিহার করিব। ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম তাৎপর্য্য ॥৫॥

সূত্র। ন কার্য্যাশ্রয়কর্ত্তৃবধাৎ ॥৬॥২০৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অতিরিক্ত নিত্য আত্মার স্বীকার পক্ষে পাতকের অভাব হয় না। কারণ, কার্য্যাশ্রয় ও কর্ত্তার, অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের অথবা কার্য্যাশ্রয় কর্ত্তার, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতেরই হিংসা হইয়া থাকে।

ভাষ্য। ন ক্রমো নিত্যস্য সত্ত্বস্য বধো হিংসা, অপি ত্বনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকস্য সত্ত্বস্য কার্য্যাশ্রয়স্য শরীরস্য স্ববিষয়োপলব্ধেশ্চ কর্ত্তৃণামিন্দ্রিয়াণামুপঘাতঃ পীড়া, বৈকল্যলক্ষণঃ প্রবন্ধোচ্ছেদো বা প্রমাপণলক্ষণো বা বধো হিংসেতি। কার্য্যন্তু সুখদুঃখসংবেদনং, তস্যায়তনমধিষ্ঠানমাশ্রয়ঃ শরীরং, কার্য্যাশ্রয়স্য শরীরস্য স্ববিষয়োপলব্ধেশ্চ কর্ত্তৃণামিন্দ্রিয়াণাং বধো হিংসা, ন নিত্যস্যাত্মনঃ। তত্র যদুক্তং "তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেঽপি তন্নিত্যত্বা"দিত্যেতদযুক্তং। যস্য সত্ত্বোচ্ছেদো হিংসা তস্য কৃতহান-মকৃতাভ্যাগমশ্চেতি দোষঃ। এতাবচ্চৈতৎ স্যাৎ, সত্ত্বোচ্ছেদো বা হিংসা-ঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকস্য সত্ত্বস্য কার্য্যাশ্রয়কর্ত্তৃবধো বা, ন কল্পান্তরমস্তি। সত্ত্বোচ্ছেদশ্চ প্রতিষিদ্ধঃ, তত্র কিমন্যৎ? শেষং যথাভূতমিতি।

অথবা "কার্য্যাশ্রয়কর্ত্তৃবধা"দিতি—কার্য্যাশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধি-সংঘাতো নিত্যস্যাত্মনঃ, তত্র সুখদুঃখপ্রতিসংবেদনং, তস্যাধিষ্ঠানমাশ্রয়ঃ, তদায়তনং তদ্ভবতি, ন ততোঽন্যদিতি স এব কর্ত্তা, তন্নিমিত্তা হি সুখ-

দুঃখসংবেদনস্য নির্ব্বৃত্তিঃ, ন তমন্তরেণেতি। তস্য বধ উপঘাতঃ পীড়া, প্রমাপণং বা হিংসা, ন নিত্যত্বেনাত্মোচ্ছেদঃ। তত্র যদুক্তং—"তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেঽপি তন্নিত্যত্বা"দেতন্নেতি।

অনুবাদ। নিত্য আত্মার বধ হিংসা—ইহা বলি না, কিন্তু অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মক সত্ত্বের, অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ বা বিনাশ নাই, এমন আত্মার কার্য্যাশ্রয় শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্ত্তা (করণ) ইন্দ্রিয়বর্গের উপঘাতরূপ পীড়া, অথবা বৈকল্যরূপ প্রবন্ধোচ্ছেদ, অথবা মারণরূপ বধ, হিংসা। কার্য্য কিন্তু সুখ দুঃখের অনুভব, অর্থাৎ এই সূত্রে "কার্য্য" শব্দের দ্বারা সুখ-দুঃখের অনুভবরূপ কার্য্যই বিবক্ষিত; তাহার (সুখ-দুঃখানুভবের) আয়তন বা অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় শরীর, কার্য্যাশ্রয় শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্ত্তা (করণ) ইন্দ্রিয়বর্গের বধ হিংসা, নিত্য আত্মার হিংসা নহে। তাহা হইলে "সাত্মক শরীরের প্রদাহ হইলেও, সেই আত্মার নিত্যত্ববশতঃ সেই পাতকের অভাব হয়"—এই যে (পূর্ব্বপক্ষ) বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত। যাহার (মতে) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, তাহার (মতে) কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম—এই দোষ হয়। ইহা অর্থাৎ হিংসাপদার্থ এতাবন্মাত্রই হয়, (১) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, (২) অথবা অনুচ্ছেদধর্ম্মক আত্মার কার্য্যাশ্রয় ও কর্ত্তার অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিনাশ হিংসা, কল্পান্তর নাই, অর্থাৎ হিংসা-পদার্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কল্প ভিন্ন আর কোন কল্প নাই। (তন্মধ্যে) আত্মার উচ্ছেদ প্রতিষিদ্ধ, অর্থাৎ আত্মা নিত্যপদার্থ বলিয়া তাহার বিনাশ হইতেই পারে না, তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কল্পদ্বয়ের মধ্যে প্রথম কল্প অসম্ভব হইলে অন্য কি হইবে? যথাভূত শেষ অর্থাৎ আত্মার শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিনাশ, এই শেষ কল্পই গ্রহণ করিতে হইবে।

অথবা—"কার্য্যাশ্রয়কর্ত্তৃবধাৎ"—এই স্থলে "কার্য্যাশ্রয়" বলিতে নিত্য আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘাত, তাহাতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, তাহার অর্থাৎ ঐ সুখ-দুঃখানুভবরূপ কার্য্যের অধিষ্ঠান আশ্রয়, তাহার (সুখ-দুঃখানুভবের) আয়তন (আশ্রয়) তাহাই (পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই) হয়, তাহা হইতে অন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আর কোন পদার্থ (সুখ-দুঃখানুভবের আয়তন) হয় না। তাহাই কর্ত্তা, যেহেতু সুখ-দুঃখানুভবের উৎপত্তি তন্নিমিত্তক, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাত-নিমিত্তকই হয়, তাহার অভাবে হয় না। [অর্থাৎ সূত্রে "কার্য্যাশ্রয়কর্ত্তৃ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, সুখ-দুঃখানু-

ভবরূপ কার্য্যের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপ কর্ত্তা দেহাদি-সংঘাত] তাহার বধ কি না উপঘাতরূপ পীড়া, অথবা প্রমাপণ, (মারণ) হিংসা, নিত্যত্ববশতঃ আত্মার উচ্ছেদ হয় না, অর্থাৎ আত্মার বিনাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাকে হিংসা বলা যায় না। তাহা হইলে "সাত্মক শরীরের প্রদাহ হইলেও আত্মার নিত্যত্ববশতঃ সেই পাতকের অভাব হয়"—এই যে (পূর্ব্বপক্ষ) বলা হইয়াছে, ইহা নহে ; অর্থাৎ উহা বলা যায় না।

টিপ্পনী। আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নিত্যপদার্থ, কারণ, আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র হইলে প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ সূত্রের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া পরবর্ত্তী পঞ্চম সূত্রের দ্বারা উহাতে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন নিত্য, এই সিদ্ধান্তেও প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না। কারণ, দেহাদির বিনাশ হইলেও নিত্য আত্মার বিনাশ যখন অসম্ভব, তখন প্রাণি-হিংসা হইতেই পারে না। সুতরাং পাপের কারণ না থাকায়, পাপ হইবে কিরূপে? মহর্ষি এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, নিত্য আত্মার বধ বা কোনরূপ হিংসা হইতে পারে না—ইহা সত্য, কিন্তু ঐ আত্মার সুখ-দুঃখভোগরূপ কার্য্যের আশ্রয় অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ যে শরীর, এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্ত্তা বা সাধন যে ইন্দ্রিয়বর্গ, উহাদিগের বধ বা যে কোনরূপ হিংসা হইতে পারে। উহাকেই প্রাণিহিংসা বলে। অর্থাৎ প্রাণিহিংসা বলিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার বিনাশ বুঝিতে হইবে না। কারণ, আত্মা "অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মক", অর্থাৎ অনুচ্ছেদ বা অবিনশ্বরত্ব আত্মার ধর্ম্ম। সুতরাং প্রাণি-হিংসা বলিতে আত্মার দেহ বা ইন্দ্রিয়বর্গের কোনরূপ হিংসাই বুঝিতে হইবে। ঐ হিংসা সম্ভব হওয়ায়, তজ্জন্য পাপও হইতে পারে ও হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাণি-হিংসাই শাস্ত্রে পাপজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মনাশকেই প্রাণিহিংসা বলা হয় নাই। কারণ, তাহা অসম্ভব। যে শাস্ত্র নির্ব্বিবাদে আত্মার নিত্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রে আত্মার নাশই প্রাণিহিংসাও পাপজনক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশেষ যেমন আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ সম্বন্ধবিশেষের বা চরমপ্রাণ-সংযোগের ধ্বংসই আত্মার মরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার ধ্বংসরূপ মুখ্য মরণ নাই। বৈনাশিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা এই যে, আত্মার ধ্বংসরূপ মুখ্য হিংসা ত্যাগ করিয়া, তাহার গৌণহিংসা কল্পনা করা সমুচিত নহে। আত্মাকে প্রতিক্ষণবিনাশী দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিলে, তাহার নিজেরই বিনাশরূপ মুখ্য হিংসা হইতে পারে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যাঁহার মতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আত্মার উচ্ছেদই হিংসা, তাঁহার মতে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার ইহার বিবরণ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মাকে অনিত্য বলিয়া তাহার উচ্ছেদ বা বিনাশকে হিংসা বলা যায় না। আত্মাকে নিত্যই বলিতে হইবে। আত্মার উচ্ছেদ, অথবা আত্মার দেহাদির কোনরূপ বিনাশ—এই দুইটি কল্প ভিন্ন আর কোন কল্পকেই প্রাণি-হিংসা বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত কৃতহানি প্রভৃতি দোষবশতঃ আত্মাকে যখন নিত্য বলিয়াই

স্বীকার করিতে হইবে, তখন আত্মার উচ্ছেদ এই প্রথম কল্প অসম্ভব। সুতরাং আত্মার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে কোনরূপ বিনাশকেই প্রাণিহিংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শরীরের নাশ করিলে যেমন হিংসা হয়, তদ্রূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাটন করিলেও হিংসা হয়। এজন্য ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "বধ" শব্দের ব্যাখ্যায় "উপঘাত", "বৈকল্য" ও "প্রমাপণ" এই তিন প্রকার বধ বলিয়াছেন। "উপঘাত" বলিতে পীড়া। "বৈকল্য" বলিতে পূর্ব্বতন কোন আকৃতির উচ্ছেদ। "প্রমাপণ" শব্দের অর্থ মারণ। আত্মা সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ কার্য্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশ্রয় হইলেও নিজ শরীরের বাহিরে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারেন না। সুতরাং আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগরূপ কার্য্যের আয়তন বা অধিষ্ঠান শরীর। শরীর ব্যতীত যখন সুখ-দুঃখ ভোগের সম্ভব নাই, তখন শরীরকেই উহার আয়তন বলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ আয়তন বা অধিষ্ঠান অর্থে "আশ্রয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূত্রে "কার্য্যাশ্রয়" শব্দের দ্বারা মহর্ষি শরীরকে গ্রহণ করিয়াছেন। শরীর আত্মার "কার্য্য" সুখ দুঃখ ভোগের "আশ্রয়" বা অধিষ্ঠান এজন্যই শরীরের হিংসা, আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহর্ষি ইহা সূচনা করিতেই "শরীর" শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, শরীর বুঝাইতে কার্য্যাশ্রয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যায় সূত্রে "কার্য্যাশ্রয়কর্তৃ" শব্দটি দ্বন্দ্বসমাস। করণ অর্থে "কর্তৃ" শব্দের প্রয়োগ বুঝিয়া ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রোক্ত "কর্তৃ" শব্দের দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির করণ ইন্দ্রিয়বর্গকেই গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয় বুঝাইতে "কর্তৃ" শব্দের প্রয়োগ সমীচীন হয় না। "করণ" বা "ইন্দ্রিয়" শব্দ ত্যাগ করিয়া মহর্ষির "কর্তৃ" শব্দ প্রয়োগের কোন কারণও বুঝা যায় না। পরন্তু যে যুক্তিতে শরীরকে "কার্য্যাশ্রয়" বলা হইয়াছে, সেই যুক্তিতে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘাত অর্থাৎ দেহ বহিরিন্দ্রিয় এবং মনের সমষ্টিকেও কার্য্যাশ্রয় বলা যাইতে পারে। শরীর ইন্দ্রিয় ও মন ব্যতীত আত্মার কার্য্য সুখ-দুঃখভোগের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সূত্রোক্ত "কার্য্যাশ্রয়" শব্দের দ্বারা শরীরের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে ইন্দ্রিয়েরও বোধ হইতে পারায়, ইন্দ্রিয় বুঝাইতে মহর্ষির "কর্তৃ" শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক। ভাষ্যকার এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শেষে সূত্রোক্ত "কার্য্যাশ্রয়-কর্তৃ" শব্দটিকে কর্ম্মধারয় সমাসরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা "কার্য্যাশ্রয়" অর্থাৎ নিত্য-আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘাতরূপ যে কর্ত্তা, এইরূপ প্রকৃতার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্তে দেহাদিসংঘাত বস্তুতঃ সুখ-দুঃখভোগের কর্ত্তা না হইলেও অসাধারণ নিমিত্ত। আত্মা থাকিলেও প্রলয়াদি কালে তাঁহার দেহাদি-সংঘাত না থাকায়, সুখ-দুঃখভোগ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ দেহাদি-সংঘাত কর্তৃতুল্য হওয়ায়, উহাতে "কর্তৃ" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে ও হইয়া থাকে। আত্মার দেহাদিসংঘাতের যে কোনরূপ বিনাশই আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত হয় কেন? ইহা সূচনা করিতে মহর্ষি "কার্য্যাশ্রয়" শব্দের পরে আবার কর্তৃ শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। যে দেহাদিসংঘাত ব্যবহারকালে কর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহার যে কোনরূপ বিনাশই প্রকৃত কর্ত্তা নিত্য আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ নিত্য আত্মার কোনরূপ বিনাশ বা হিংসা নাই। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সাধনের কোন হেতু নাই।

বার্ত্তিককারও শেষে ভাষ্যকারের ন্যায় কর্ম্মধারয় সমাস গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

শরীরব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত ॥২॥

———০———

ভাষ্য। ইতশ্চ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা।

অনুবাদ। এই হেতু বশতঃও আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন।

সূত্র। সব্যদৃষ্টস্যেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥৭॥২০৫॥

অনুবাদ। যেহেতু "সব্যদৃষ্ট" বস্তুর ইতরের দ্বারা অর্থাৎ বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা হয়।

ভাষ্য। পূর্ব্বাপরয়োর্ব্বিজ্ঞানয়োরেকবিষয়ে প্রতিসন্ধিজ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানং, তমেবৈতর্হি পশ্যামি যমজ্ঞাসিষং স এবায়মর্থ ইতি। সব্যেন চক্ষুষা দৃষ্টস্যেতরেণাপি চক্ষুষা প্রত্যভিজ্ঞানাদ্যমদ্রাক্ষং তমেবৈতর্হি পশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়চৈতন্যে তু নান্যদৃষ্টমন্যঃ প্রত্যভিজানাতীতি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তিঃ। অস্তি ত্বিদং প্রত্যভিজ্ঞানং, তস্মাদিন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তশ্চেতনঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্ব ও পরকালীন দুইটি জ্ঞানের একটি বিষয়ে প্রতিসন্ধিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, (যেমন) "ইদানীং তাহাকেই দেখিতেছি, যাহাকে জানিয়াছিলাম, সেই পদার্থই এই।" (সূত্রার্থ) যেহেতু বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর অপর অর্থাৎ দক্ষিণচক্ষুর দ্বারাও "যাহাকে দেখিয়াছিলাম, ইদানীং তাহাকেই দেখিতেছি"—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই দর্শনের কর্ত্তা হইলে, অন্য ব্যক্তি অন্যের দৃষ্ট বস্তু প্রত্যভিজ্ঞা করে না, এজন্য প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। কিন্তু এই (পূর্ব্বোক্তরূপ) প্রত্যভিজ্ঞা আছে, অতএব চেতন অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন।

টিপ্পনী। ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় ভিন্ন নিত্যপদার্থ,—এই সিদ্ধান্ত অন্য যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য মহর্ষি এই প্রকরণের আরম্ভ করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে,

১। তত্র মানসমনুব্যবসায়লক্ষণং প্রত্যভিজ্ঞানং ভাষ্যকারো দর্শয়তি "তমেবৈতর্হী"তি। ব্যবসায়স্তু বাহ্যেন্দ্রিয়জং প্রত্যভিজ্ঞানমাহ "স এবায়মর্থ" ইতি। অস্যৈব চানুব্যবসায়ঃ পূর্ব্বঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

"সব্যদৃষ্ট বস্তুর অপরের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা হয়।" সূত্রে "সব্য" শব্দের দ্বারা বাম অর্থ গ্রহণ করিলে "ইতর" শব্দের দ্বারা বামের বিপরীত দক্ষিণ অর্থ বুঝা যায়। এই সূত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়বোধক কোন শব্দ না থাকিলেও পরবর্ত্তী সূত্রে মহর্ষির "নাসাস্থিব্যবহিতে" এই বাক্যের প্রয়োগ থাকায়, এই সূত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, "সব্যদৃষ্ট" অর্থাৎ বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণচক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা হয়। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয় আত্মা নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় চেতন বা আত্মা হইলে, উহাকে দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিতে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্রষ্টা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়েই ঐ দর্শন জন্য সংস্কার উৎপন্ন হইবে। বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইটি। বামচক্ষু যাহা দেখিয়াছে, বামচক্ষুতেই তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, বামচক্ষুই পুনরায় ঐ বিষয়ের স্মরণপূর্ব্বক প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু উহার প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না। কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত। কোন পদার্থবিষয়ে ক্রমে দুইটি জ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বজাত ও পরজাত ঐ জ্ঞানদ্বয়ের এক বিষয়ে প্রতিসিন্ধরূপ যে জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ ঐ জ্ঞানদ্বয়ের একবিষয়কত্বরূপে যে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে, উহাই এই সূত্রে "প্রত্যভিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার প্রথমে ইহা বলিয়া, উহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। "তমেবৈ তর্হি পশ্যামি" অর্থাৎ "তাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি," এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার প্রথমে ঐ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞাত বিষয়ের বহিরিন্দ্রিয় জন্য ব্যবসায়রূপ প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে। ভাষ্যকার "স এবায়মর্থঃ" এবং কথার দ্বারা শেষে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার পূর্ব্বে "যমজ্ঞাসিষং", অর্থাৎ "যাহাকে জানিয়াছিলাম"—এই কথার দ্বারা শেষোক্ত ব্যবসায়রূপ প্রত্যভিজ্ঞার অনুব্যবসায় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান "প্রতিসন্ধি", "প্রতিসন্ধান" ও "প্রত্যভিজ্ঞান" এই সকল নামেও কথিত হইয়াছে। উহা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষবিশেষ এবং স্মরণ জন্য। স্মরণ ব্যতীত কুত্রাপি প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। সংস্কার ব্যতীতও স্মরণ জন্মে না। একের দৃষ্ট বস্তুতে অপরের সংস্কার না হওয়ায়, অপরে তাহা স্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং অপরে তাহা প্রত্যভিজ্ঞাও করিতে পারে না। কিন্তু বামচক্ষুর দ্বারা কোন বস্তু দেখিয়া পরে (ঐ বাম চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া গেলেও) দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা ঐ বস্তুকে দেখিলে, "যাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই দেখিতেছি"—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বজাত ও পরজাত ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের একবিষয়ত্বরূপে যে প্রত্যভিজ্ঞা, তদ্দ্বারা ঐ প্রত্যক্ষদ্বয় যে এককর্ত্তৃক, অর্থাৎ একই কর্ত্তা যে, একই বিষয়ে বিভিন্নকালে ঐ দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। বামচক্ষু প্রথম দর্শনের কর্ত্তা হইলে দক্ষিণচক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না। কারণ, একের দৃষ্ট বস্তু অপরে প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না। ফলকথা, চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা আত্মা নহে। আত্মা উহা হইতে ভিন্ন, এ বিষয়ে মহর্ষি এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্রমে ইহা পরিস্ফুট হইবে। ৭ ॥

সূত্র। নৈকস্মিন্নাসাস্থিব্যবহিতে দ্বিত্বাভিমানাৎ ॥৮॥২০৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ, নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত একই চক্ষুতে দ্বিত্বের ভ্রম হয়।

ভাষ্য। একমিদং চক্ষুর্মধ্যে নাসাস্থিব্যবহিতং, তস্যান্তৌ গৃহ্যমাণৌ দ্বিত্বাভিমানং প্রযোজয়তো মধ্যব্যবহিতস্য দীর্ঘস্যেব।

অনুবাদ। মধ্যভাগে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এই চক্ষু এক। মধ্য-ব্যবহিত দীর্ঘ পদার্থের ন্যায় সেই একই চক্ষুর অন্তভাগদ্বয় জ্ঞায়মান হইয়া (তাহাতে) দ্বিত্বভ্রম উৎপন্ন করে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর কথা এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় এক। বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্তুতঃ দুইটি নহে। যেমন, কোন দীর্ঘ সরোবরের মধ্যদেশে সেতু নির্ম্মাণ করিলে ঐ সেতু-ব্যবধানবশতঃ ঐ সরোবরে দ্বিত্বভ্রম হয়, বস্তুতঃ কিন্তু ঐ সরোবর এক, তদ্রূপ একই চক্ষুরিন্দ্রিয় ভ্রূনিম্নস্থ নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত থাকায়, ঐ ব্যবধানবশতঃ উহাতে দ্বিত্ব ভ্রম হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বই বাস্তব, দ্বিত্ব কাল্পনিক। নাসিকার অস্থির ব্যবধানই উহাতে দ্বিত্ব কল্পনা বা দ্বিত্বভ্রমের নিমিত্ত। চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে বাম চক্ষুর দৃষ্ট বস্তু দক্ষিণ চক্ষু প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে। কারণ, বাম ও দক্ষিণ চক্ষু বস্তুতঃ একই পদার্থ। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। ॥ ৮ ॥

সূত্র। একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশান্নৈকত্বং ॥৯॥২০৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) একের বিনাশ হইলে, দ্বিতীয়টির বিনাশ না হওয়ায় (চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের) একত্ব নাই।

ভাষ্য। একস্মিন্নুপহতে চোদ্ধৃতে বা চক্ষুষি দ্বিতীয়মবতিষ্ঠতে চক্ষু-র্বিষয়গ্রহণলিঙ্গং, তস্মাদেকস্য ব্যবধানানুপপত্তিঃ।

অনুবাদ। এক চক্ষু উপহত অথবা উৎপাটিত হইলে, "বিষয়গ্রহণলিঙ্গ" অর্থাৎ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ বা সাধক, এমন দ্বিতীয় চক্ষুঃ অবস্থান করে, অতএব একের ব্যবধানের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষু নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত আছে, ইহা বলা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইতে পারে না। কারণ, কাহারও এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু থাকে। দ্বিতীয়

চক্ষু না থাকিলে, তখন তাহার বিষয়গ্রহণ অর্থাৎ কোন বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু কাণ ব্যক্তিরও অন্য চক্ষুর দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু আছে, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার ঐ দ্বিতীয় চক্ষুতে প্রমাণ-সূচনার জন্যই উহার বিশেষণ বলিয়াছেন, "বিষয়গ্রহণ লিঙ্গং"। ফলকথা, যখন কাহারও একটি চক্ষু কোন কারণে উপহত বা বিনষ্ট হইলে অথবা উৎপাটিত হইলেও, দ্বিতীয় চক্ষু থাকে, উহার দ্বারা সে দেখিতে পায়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইটি, ইহা স্বীকার্য্য। চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্তুতঃ এক হইলে কাণ-ব্যক্তিও অন্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং একই চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যবহিত আছে, ইহা বলা যায় না ॥ ৯ ॥

সূত্র। অবয়বনাশেঽপ্যবয়ব্যুপলব্ধেরহেতুঃ ॥১০॥২০৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অবয়বের নাশ হইলেও অবয়বীর উপলব্ধি হওয়ায়, অহেতু— অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা হেতু হয় না।

ভাষ্য। একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশাদিত্যহেতুঃ। কস্মাৎ? বৃক্ষস্য হি কাসুচিচ্ছাখাসু ছিন্নাসূপলভ্যত এব বৃক্ষঃ।

অনুবাদ। একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়টির অবিনাশ—ইহা হেতু নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু বৃক্ষের কোন কোন শাখা ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ উপলব্ধই হইয়া থাকে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, এক চক্ষুর বিনাশ হইলেও দ্বিতীয়টির বিনাশ হয় না, এই হেতুতে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব সমর্থন করা হইয়াছে, উহা করা যায় না। কারণ, উহা ঐ সাধ্য-সাধনে হেতুই হয় না। যেমন, বৃক্ষের অবয়ব কোন কোন শাখা বিনষ্ট হইলেও বৃক্ষরূপ অবয়বীর উপলব্ধি তখনও হয়, শাখাদি কোন অবয়ববিশেষের বিনাশে বৃক্ষরূপ অবয়বীর নাশ হয় না, তদ্রূপ একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোন অবয়ব বা অংশবিশেষের বিনাশ হইলেও, একেবারে চক্ষুরিন্দ্রিয় বিনষ্ট হইতে পারে না। একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আধার দুইটি গোলকে যে দুইটি কৃষ্ণসার আছে, উহা ঐ একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দুইটি অধিষ্ঠান। উহার অন্তর্গত একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের এক অংশ বিনষ্ট হইলেই তাহাকে "কাণ" বলা হয়। বস্তুতঃ তাহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অন্য অংশ বিনষ্ট না হওয়ায়, একেবারে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিনাশ হইতে পারে না। কোন অবয়বের বিনাশে অবয়বীর বিনাশ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব সমর্থন করা যায় না, উহা অহেতু ॥১০॥

সূত্র। দৃষ্টান্তবিরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥১১॥২০৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) দৃষ্টান্ত-বিরোধ-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না।

ভাষ্য। ন কারণদ্রব্যস্য বিভাগে কার্য্যদ্রব্যমবতিষ্ঠতে নিত্যত্ব-প্রসঙ্গাৎ। বহুম্ববয়বিষু যস্য কারণানি বিভক্তানি তস্য বিনাশঃ, যেষাং কারণান্যবিভক্তানি তান্যবতিষ্ঠন্তে। অথবা দৃশ্যমানার্থবিরোধো দৃষ্টান্ত-বিরোধঃ। মৃতস্য হি শিরঃকপালে দ্বাববটৌ নাসাস্থিব্যবহিতৌ চক্ষুষঃ স্থানে ভেদেন গৃহ্যেতে, ন চৈতদেকস্মিন্ নাসাস্থিব্যবহিতে সম্ভবতি। অথবা একবিনাশস্যানিয়মাৎ দ্বাবিমাবর্থৌ, তৌ চ পৃথগাবরণোপঘাতা-বনুমীয়েতে বিভিন্নাবিতি। অবপীড়নাচ্চৈকস্য চক্ষুষো রশ্মিবিষয়সন্নিকর্ষস্য ভেদাদ্দৃশ্যভেদ ইব গৃহ্যতে, তচ্চৈকত্বে বিরুধ্যতে। অবপীড়ননিবৃত্তৌ চাভিন্নপ্রতিসন্ধানমিতি। তস্মাদেকস্য ব্যবধানানুপপত্তিঃ।

অনুবাদ। (১) কারণ-দ্রব্যের বিভাগ হইলে, কার্য্য-দ্রব্য অবস্থান করে না, অর্থাৎ অবয়বের বিভাগ হইলে, অবয়বী থাকে না। কারণ, (কার্য্যদ্রব্য থাকিলে তাহার) নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বহু অবয়বীর মধ্যে যাহার কারণগুলি বিভক্ত হইয়াছে, তাহার বিনাশ হয় ; যে সকল অবয়বীর কারণগুলি বিভক্ত হয় নাই, তাহারা অবস্থান করে [অর্থাৎ বৃক্ষরূপ অবয়বীর কারণ ঐ বৃক্ষের অবয়বের বিভাগ বা বিনাশ হইলে বৃক্ষ থাকে না—পূর্ব্বজাত সেই বৃক্ষও বিনষ্ট হয়, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। দৃষ্টান্ত-বিরোধবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব প্রতিষেধ হয় না।] (২) অথবা দৃশ্যমান পদার্থের বিরোধই "দৃষ্টান্ত-বিরোধ"। মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চক্ষুর স্থানে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত দুইটি "অবট" (গর্ত্ত) ভিন্ন-রূপেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এক চক্ষু হইলে, ইহা (পূর্ব্বোক্ত দুইটি গর্ত্তের ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ) সম্ভব হয় না। (৩) অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে, তাহার বিনাশের নিয়ম থাকে না, এ জন্য, ইহা (চক্ষুরিন্দ্রিয়) দুইটি পদার্থ এবং সেই দুইটি পদার্থ পৃথগাবরণ ও পৃথগুপঘাত, অর্থাৎ উহার আবরণ ও উপঘাত পৃথক্, (সুতরাং) বিভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। এবং এক চক্ষুর অবপীড়নপ্রযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বারা নাসিকার মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়া ধরিলে, তৎপ্রযুক্ত রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের ভেদ হওয়ায়, দৃশ্য-ভেদের ন্যায়, অর্থাৎ একটি দৃশ্য বস্তু দুইটির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়, তাহা কিন্তু (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) একত্ব হইলে বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে

অবপীড়নপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ এক বস্তুর দ্বিত্বভ্রম হইতে পারে না ; অবপীড়ন নিবৃত্তি হইলেই (সেই বস্তুর) অভিন্ন প্রতিসন্ধান হয়—অর্থাৎ তখন তাহাকে এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব এক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যবধানের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত আছে—ইহা বলা যায় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের নিরাস করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের তিন প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, কারণ-দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বের বিনাশ হইলেও, যদি কার্য্য-দ্রব্য (অবয়বী) থাকে, তাহা হইলে ঐ কার্য্য-দ্রব্যের কোনদিনই বিনাশ হইতে পারে না ; উহা নিত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বৃক্ষাদি অবয়বী জন্য-দ্রব্য, উহা নিত্য হইতে পারে না, উহার বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং অবয়বের নাশ হইলে, পূর্ব্বজাত সেই অবয়বীর নাশও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অবয়ব-বিশেষের নাশ হইলেও, অবিনষ্ট অন্যান্য অবয়বগুলির দ্বারা তখনই তজ্জাতীয় আর একটি অবয়বীর উৎপত্তি হওয়ায়, সেখানে পরজাত সেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বৃক্ষের শাখাবিশেষ নষ্ট হইলে, সেখানে পূর্ব্বজাত সেই বৃক্ষও নষ্ট হইয়া যায়, অবশিষ্ট শাখাদির দ্বারা সেখানে যে বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই, উহা বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, বৃক্ষাদি কার্য্য-দ্রব্যের অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, ঐ বৃক্ষাদিরও নাশ হইয়া থাকে। নচেৎ উহার কোনদিনই নাশ হইতে পারে না, উহা নিত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় একটিমাত্র কার্য্য-দ্রব্য হইলে, উহারও কোন অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, সেখানে উহারও নাশ স্বীকার্য্য। কিন্তু সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একেবারে বিনাশ না হওয়ায়, উহা বাম ও দক্ষিণ ভেদে দুইটি, ইহা সিদ্ধ হয়। উহা বিভিন্ন দুইটি পদার্থ হইলে, একের বিনাশে অপরটির বিনাশ হইতে পারে না, কাণ ব্যক্তি অন্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি বৃক্ষাদিস্থলে অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, পূর্ব্বজাত সেই বৃক্ষাদির নাশ স্বীকার করিয়া, তজ্জাতীয় অপর বৃক্ষাদির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থলেও তাহাই হইবে। সেখানেও একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোন অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, অবশিষ্ট অবয়বের দ্বারা অন্য একটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হওয়ায়, তদ্দ্বারাই তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইবে, বিভিন্ন দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বীকারের কারণ কি ? ভাষ্যকার এই কথা মনে করিয়া, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা দৃশ্যমান পদার্থ-বিরোধই এই সূত্রে মহর্ষির অভিমত "দৃষ্টান্ত-বিরোধ"। শ্মশানে মৃত ব্যক্তির যে শিরঃকপাল (মাথার খুলি) পড়িয়া থাকে, তাহাতে চক্ষুর স্থানে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত দুইটি পৃথক্ গর্ত্ত দেখা যায়। তদ্দ্বারা ঐ দুইটি গর্ত্তে যে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয় ছিল, ইহা বুঝা যায়। চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে, মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চক্ষুর আধার দুইটি পৃথক্ গর্ত্ত দেখা যাইত না। ঐ দুইটি গর্ত্ত দৃশ্যমান পদার্থ হওয়ায়, উহাকে "দৃষ্টান্ত"

বলা যায়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বপক্ষে ঐ "দৃষ্টান্ত-বিরোধ" হওয়ায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না, উহার দ্বিত্বই স্বীকার্য।—ইহাই দ্বিতীয় কল্পে সূত্রকারের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আধার দুইটি গর্ত্ত দেখা গেলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বের কোন বাধা হয় না। একই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত দুইটি গোলকে থাকিতে পারে। গোলক বা গর্ত্তের দ্বিত্বের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বের কোন বিরোধ নাই। ভাষ্যকার এই কথা মনে করিয়া, তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত পৃথগাবরণ ও পৃথগুপঘাত দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ই বিভিন্নরূপে অনুমানসিদ্ধ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে বাম চক্ষুরই বিনাশ হইয়াছে, দক্ষিণ চক্ষুর বিনাশ হয় নাই, এইরূপ বিনাশ-নিয়ম থাকে না। বাম চক্ষুর বিনাশে দক্ষিণ চক্ষুরও বিনাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ বিনাশ-নিয়ম অর্থাৎ বাম চক্ষুর নাশ হইলেও দক্ষিণ চক্ষুর বিনাশ হয় না, এইরূপ নিয়ম দেখা যায়। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয় পরস্পর বিভিন্ন দুইটি পদার্থ এবং ঐ দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আবরণও পৃথক্ এবং উপঘাত অর্থাৎ বিনাশও পৃথক্, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে বাম চক্ষুর উপঘাত হইলেও, দক্ষিণ চক্ষুর উপঘাত হইতে পারে না। বাম ও দক্ষিণ বলিয়া কেবল নামভেদ করিলে, তাহাতে বস্তুতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভেদ না হওয়ায়, বাম চক্ষুর নাশে দক্ষিণ চক্ষুরও নাশ হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ বিনাশ-নিয়ম থাকে না। পূর্ব্বোক্তরূপ বিনাশ-নিয়ম দৃশ্যমান পদার্থ বলিয়া—"দৃষ্টান্ত", উহার সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না, ইহাই এইপক্ষে সূত্রার্থ। ভাষ্যকার এই তৃতীয় কল্পেই শেষে মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, এক চক্ষুর অবপীড়ন করিলে, অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বারা নাসিকার মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়া ধরিলে, তখন ঐ চক্ষুর রশ্মিভেদ হওয়ায়, বিষয়ের সহিত উহার সন্নিকর্ষের ভেদবশতঃ একটি দৃশ্য বস্তুকে দুইটি দেখা যায়। ঐ অবপীড়ন নিবৃত্তি হইলেই, আবার ঐ এক বস্তুকে একই দেখা যায়। একই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত থাকিলে, উহা হইতে পারে না। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয় পরস্পর বিভিন্ন দুইটি, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য মনে হয় যে, যদি একই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত থাকিত, তাহা হইলে বাম নাসিকার মূলদেশে অঙ্গুলির দ্বারা বাম চক্ষুকে জোরে টিপিয়া ধরিলে, ঐ বাম গোলকস্থ সমস্ত রশ্মিই নাসিকার মূলদেশের নিম্নপথে দক্ষিণ গোলকে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সেখানে এক বস্তুকে দুই বলিয়া দেখিবার কারণ হইত না। কিন্তু যদি নাসিকার মূলদেশের নিম্নপথ অস্থির দ্বারা বদ্ধ থাকে, যদি ঐ পথে চক্ষুর রশ্মির গমনাগমন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেই কোন এক চক্ষুকে অঙ্গুলির দ্বারা জোরে টিপিয়া ধরিলে, তাহার সেই গোলকের মধ্যেই পূর্ব্বোক্তরূপ অবপীড়নপ্রযুক্ত রশ্মির ভেদ হওয়ায়, একই দৃশ্য বস্তুর সহিত ঐ বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন সন্নিকর্ষ হয়। সুতরাং সেখানে ঐ কারণ জন্য একই দৃশ্য বস্তুকে দুই বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং বুঝা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয় একটি নহে। নাসিকার মূলদেশের নিম্নপথে উহার রশ্মিসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। পৃথক্ পৃথক্ দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ দুইটি গোলকেই

থাকে। অঙ্গুলিপীড়িত চক্ষুই এই পক্ষে দৃষ্টান্ত। উহার সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না, ইহাই এই চরমপক্ষে সূত্রার্থ।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বসিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও, বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর উহা খণ্ডন করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বসিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইটি হইলে একই সময়ে ঐ দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত অতি সূক্ষ্ম মনের সংযোগ হইতে পারে না। মনের অতি সূক্ষ্মতাবশতঃ এক সময়ে কোন একটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিতই উহার সংযোগ হয়, ইহা গৌতম সিদ্ধান্তানুসারে স্বীকার্য্য। তাহা হইলে কাণ ব্যক্তি ও দ্বিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের কোন বৈষম্য থাকে না। যদি দ্বিচক্ষু ব্যক্তিরও একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগ হয়, তাহা হইলে একচক্ষু ব্যক্তিরও ঐরূপ মনঃসংযোগ হওয়ায়, ঐ উভয়ের সমভাবেই চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাণ অথবা যে ব্যক্তি দ্বিচক্ষু হইয়াও একটি চক্ষুকে আচ্ছাদন করিয়া অপর চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, ইহারা কখনও দ্বিচক্ষু ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু একই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দুইটি অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে, দুইটি অধিষ্ঠান হইতে নির্গত তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইতে পারায়, অবিকলচক্ষু ব্যক্তি কাণ ব্যক্তি হইতে বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ঐ উভয়ের প্রত্যক্ষের বৈষম্য উপপন্ন হয়। পরন্তু মহর্ষি পরে ইন্দ্রিয়নানাত্ব-প্রকরণে বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের একত্বই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইটি হইলে, বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত থাকে না। সুতরাং মহর্ষির পরবর্ত্তী ঐ প্রকরণের সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বসিদ্ধান্ত তাঁহার অভিমত বুঝা যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উদ্দ্যোতকরের মতানুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমোক্ত "সব্যদৃষ্টস্য" ইত্যাদি সূত্রটিকে পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব কাল্পনিক, একত্বই বাস্তব, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনপূর্ব্বক পরে ভাষ্যকারের মতানুসারেও পূর্ব্বোক্ত সূত্র-গুলির সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকারের নিজের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বই সিদ্ধান্ত এবং উহা তাৎপর্য্যটীকাকারের অভিপ্রায়সিদ্ধ, ইহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য "ন্যায়সূচী-নিবন্ধে" বাচস্পতি মিশ্র এই প্রকরণকে "প্রাসঙ্গিকচক্ষুরদ্বৈত-প্রকরণ" বলিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকার কথার দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বই যে, তাঁহার নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝা যায় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। এখানে সর্ব্বাগ্রে ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে, মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে বিভিন্ন প্রকরণ দ্বারা আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য-পদার্থ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্তুতঃ দুইটি হইলেই ঐ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া "সব্যদৃষ্টস্য" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে আত্মা ইন্দ্রিয়ভিন্ন, চক্ষুরিন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না, ইহা মহর্ষি সমর্থন করিতে পারেন। চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে উহা সমর্থিত হয় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রথমে এই প্রকরণকে প্রাসঙ্গিক বলিয়াও শেষে আবার বলিয়াছেন যে, যাহারা (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া) বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ

ইন্দ্রিয়ভিন্ন চিরস্থায়ী এক আত্মার সিদ্ধি বলেন, তাঁহাদিগের ঐ যুক্তি খণ্ডন করিতেই মহর্ষি এখানে এই সূত্রগুলি বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে মহর্ষির সাধ্য বিষয়ে অন্যের যুক্তি নিরাস করিবার বিশেষ কি কারণ আছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব সাধন করিতে যাইয়া মহর্ষির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একত্বসাধন করিবারই কি কারণ আছে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু পরবর্ত্তী "ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ" এই সূত্রটির পর্য্যালোচনা করিলেও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মহর্ষি এই প্রকরণ দ্বারা বিশেষরূপে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্বই সাধন করিয়াছেন, উহাই তাঁহার এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বপ্রকরণের দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সাধন করিলেও, অন্য হেতুর সমুচ্চয়ের জন্যই অর্থাৎ প্রকারান্তরে অন্য হেতুর দ্বারাও আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সাধনের জন্যই যে মহর্ষির এই প্রকরণের আরম্ভ, ইহা মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝিতে পারা যায়। উদ্দ্যোতকর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্তকে যুক্তিবিরুদ্ধ ও মহর্ষির পরবর্ত্তী প্রকরণান্তরবিরুদ্ধ বলিয়া এই প্রকরণের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতে এই প্রকরণের প্রয়োজন কি, প্রকৃত বিষয়ে সঙ্গতি কি, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বখণ্ডনে উদ্দ্যোতকরের কথায় বক্তব্য এই যে, কাণ ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে এক মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়েই তাহার মনঃসংযোগ থাকে। দ্বিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে একই সময়ে দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত অতিসূক্ষ্ম একটি মনের সংযোগ হইতে না পারিলেও, মনের অতি দ্রুতগামিত্ববশতঃ ক্ষণবিলম্বে পুনঃ পুনঃ দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়েই মনের সংযোগ হয় এবং দৃশ্য বিষয়ের সহিত একই সময়ে দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, এই জন্যই কাণ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে দ্বিচক্ষু ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের প্রতি ঐরূপ কারণবিশেষ কল্পনা করা যায়। কাণ ব্যক্তির প্রত্যক্ষস্থলে ঐ কারণবিশেষ নাই। উদ্দ্যোতকরের মতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই এক চক্ষু হইলে, তাঁহার কথিত প্রত্যক্ষবৈশিষ্ট্য কিরূপে উপপন্ন হইবে, ইহাও সুধীগণ চিন্তা করিবেন। একজাতীয় এক কার্য্যকারী দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়কে এক বলিয়া গণনা করিয়া বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা বলা যাইতে পারে। সুতরাং উদ্দ্যোতকরোক্ত প্রকরণ-বিরোধের আশঙ্কাও নাই। যথাস্থানে এ কথার আলোচনা হইবে (পরবর্ত্তী ৬০ম সূত্র দ্রষ্টব্য)॥ ১১ ॥

ভাষ্য। অনুমীয়তে চায়ং দেহাদি-সংঘাত-ব্যতিরিক্তশ্চেতন ইতি।

অনুবাদ। এই চেতন (আত্মা) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমিতও হয়।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ ॥ ১২ ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ। যেহেতু ইন্দ্রিয়ান্তরের বিকার হয়। [অর্থাৎ কোন অম্লফলের রূপ বা গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হওয়ায়, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, সুতরাং দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।]

ভাষ্য। কস্যচিদম্লফলস্য গৃহীততদ্রসসাহচর্য্যে রূপে গন্ধে বা কেনচিদিন্দ্রিয়েণ গৃহ্যমাণে রসনস্যেন্দ্রিয়ান্তরস্য বিকারো রসানুস্মৃতৌ রসগর্দ্ধি-প্রবর্ত্তিতো দন্তোদকসংপ্লবভূতো গৃহ্যতে। তস্যেন্দ্রিয়চৈতন্যে-ঽনুপপত্তিঃ, নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতি।

অনুবাদ। কোন অম্লফলের "গৃহীত-তদ্রসসাহচর্য্য" রূপ বা গন্ধ অর্থাৎ যে রূপ বা গন্ধের সহিত সেই অম্লফলের অম্লরসের সাহচর্য্য বা সহাবস্থান পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল, এমন রূপ বা গন্ধ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) গৃহ্যমাণ হইলে, রসের অনুস্মরণবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বাস্বাদিত সেই অম্লরসের স্মরণ হওয়ায়, রসলোভজনিত রসনারূপ ইন্দ্রিয়ান্তরের দন্তোদকসংপ্লবরূপ অর্থাৎ দন্তমূলে জলের আবির্ভাবরূপ বিকার উপলব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ই রূপরসাদির অনুভবিতা আত্মা হইলে, তাহার (পূর্ব্বোক্তরূপ বিকারের) উপপত্তি হয় না। (কারণ,) অন্য ব্যক্তি অন্যের দৃষ্ট (জ্ঞাত) পদার্থ স্মরণ করে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত "সব্যদৃষ্টস্য" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মা ইন্দ্রিয়ভিন্ন, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে "অনুমীয়তে চায়ং" ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন[১]।

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টবস্তুকে পরে দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে, "আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন আবার তাহাকেই দেখিতেছি"—এইরূপে ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের এক-বিষয়ত্বরূপে যে মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাতে একই কর্ত্তা বিষয় হওয়ায়, প্রত্যক্ষের কর্ত্তা আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে, উহা ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষবশতঃ বুঝা যায়। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় একটি মাত্র হইলে, উহাই পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের এক কর্ত্তা হইতে পারায়, পূর্ব্বোক্ত-রূপ প্রত্যক্ষবলে আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত "সব্যদৃষ্টস্য" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মা ইন্দ্রিয়ভিন্ন, এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলে, তিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্বকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে যাঁহারা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য-করিয়া মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার সাধ্য-বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, মহর্ষি আবার বিশেষরূপে আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্নত্বসাধন

১। তদেবং প্রতিসন্ধানদ্বারেণাত্মনি প্রত্যক্ষং প্রমাণমিত্বা অনুমানমিদানীং প্রমাণয়তি, অনুমীয়তে চায়মিতি। —তাৎপর্য্যটীকা।

করিতেই যে "সব্যদৃষ্টস্য" ইত্যাদি ৮ সূত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহা এই সূত্র দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ভাষ্যকারের "অনুমীয়তে চায়ং" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকাকারও এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

সূত্রে "ইন্দ্রিয়ান্তরবিকার" এই শব্দের দ্বারা এখানে দন্তোদকসংপ্লবরূপ রসনেন্দ্রিয়ের বিকার মহর্ষির বিবক্ষিত[১]। কোন অম্লরসযুক্ত ফলাদির রূপ বা গন্ধ প্রত্যক্ষ করিলে, তখন তাহার অম্লরসের স্মরণ হওয়ায়, দন্তমূলে যে জলের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম "দন্তোদকসংপ্লব"। উহা জলীয় রসনেন্দ্রিয়ের বিকার। যে অম্লরসযুক্ত ফলাদির রূপ, গন্ধ ও রস পূর্ব্বে কোন দিন যথাক্রমে চক্ষু, ঘ্রাণ ও রসনা দ্বারা অনুভূত হইয়াছিল, সেই ফলাদির রূপ বা গন্ধের আবার অনুভব হইলে, তখন তাহার সেই অম্লরসের স্মরণ হয়। কারণ, সেই অম্লরসের সহিত সেই রূপ ও গন্ধের সাহচর্য্য বা একই দ্রব্যে অবস্থান পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। সহচরিত পদার্থের মধ্যে কোন একটির জ্ঞান হইলে, অন্যটির স্মরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে পূর্ব্বানুভূত সেই অম্লরসের স্মরণ হওয়ায়, স্মর্ত্তার তদ্বিষয়ে গর্দ্ধি বা লোভ উপস্থিত হয়। ঐ লোভ বা অভিলাষবিশেষই সেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ দন্তোদকসংপ্লবের কারণ। সুতরাং ঐ দন্তোদকসংপ্লবরূপ রসনেন্দ্রিয়ের বিকার দ্বারা ঐ স্থলে তাহার অম্লরসবিষয়ে অভিলাষ বা ইচ্ছার অনুমান হয়। ঐ ইচ্ছার দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহার স্মৃতির অনুমান হয়। কারণ, ঐ অম্লরসের স্মরণ ব্যতীত তদ্বিষয়ে অভিলাষ জন্মিতে পারে না। তদ্বিষয়ে অভিলাষ ব্যতীতও দন্তোদকসংপ্লব হইতে পারে না। এখন ঐ স্থলে অম্লরসের স্মর্ত্তা কে, ইহা বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে রূপাদি বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা বলিলে উহাদিগকেই সেই সেই বিষয়ের স্মর্ত্তা বলিতে হইবে। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-ব্যবস্থা থাকায়, কোন বহিরিন্দ্রিয়ই সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, সুতরাং স্মর্ত্তাও হইতে পারে না। চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রূপ বা গন্ধের অনুভব করিলেও তখন অম্লরসের স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কখনও অম্লরসের অনুভব করে নাই, করিতেই পারে না। সুতরাং চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অম্লরসের স্মরণ হইতে না পারায়, উহাদিগের তদ্বিষয়ে অভিলাষ হইতে পারে না। চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কোন অম্লফলের রূপ বা গন্ধের অনুভব করিলে, তখন রসনেন্দ্রিয় তাহার পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে অভিলাষী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, রূপ বা গন্ধের সহিত সেই রসের সাহচর্য্য-জ্ঞানবশতঃই ঐ স্থলে রূপ বা গন্ধের অনুভব করিয়া রসের স্মরণ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি সকল বিষয়ের অনুভব করিতে না পারায়, ঐ স্থলে রূপ, গন্ধ ও রসের সাহচর্য্য জ্ঞান করিতে পারে না। যাহার সাহচর্য্য জ্ঞান হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্বোক্ত স্থলে রূপ বা গন্ধের অনুভব করিয়া রসের স্মরণ হইতে পারে। মূলকথা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে চেতন আত্মা বলিলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে অম্লফলাদির রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণের পরে রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হইতে পারে না।

১। রসতৃষ্ণাপ্রবর্ত্তিতো দন্তান্তরপরিস্রুতাভিরদ্ভী রসনেন্দ্রিয়স্য সংপ্লবঃ সম্বন্ধো বিকার ইত্যুচ্যতে।
—ন্যায়বার্ত্তিক।

কিন্তু রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা এক আত্মা হইলে, ঐ এক আত্মাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই পূর্ব্বানুভূত অম্লরসের স্মরণ করিয়া, তদ্বিষয়ে অভিলাষী হইতে পারে। তাহার ফলে তখন তাহারই দন্তোদকসংপ্লব হইতে পারে। এইরূপে দন্তোদকসংপ্লবরূপ রসনেন্দ্রিয়ের বিকার, তাহার কারণ অভিলাষের অনুমাপক হইয়া তদ্দ্বারা তাহার কারণ অম্লরস-স্মরণের অনুমাপক হইয়া তদ্দ্বারা ঐ স্মরণের কর্ত্তা ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিষয়ের জ্ঞাতা—এক আত্মার অনুমাপক হয়। সূত্রোক্ত ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকার রসনেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, উহা ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার অনুমানে হেতু হয় না। উহা পূর্ব্বোক্তরূপে একই আত্মার স্মৃতির অনুমাপক ব্যতিরেকী হেতু ॥১২॥

সূত্র। ন স্মৃতেঃ স্মর্ত্তব্যবিষয়ত্বাৎ ॥১৩॥২১১॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ স্মৃতির দ্বারা ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয় না। কারণ, স্মরণীয় পদার্থই স্মৃতির বিষয় হয়। [অর্থাৎ যে পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, সেই স্মর্ত্তব্য বিষয়-জন্যই স্মৃতির উৎপত্তি হয়। স্মরণের কর্ত্তা আত্মা স্মৃতির বিষয় না হওয়ায়, স্মৃতির দ্বারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না]।

ভাষ্য। স্মৃতির্নাম ধর্ম্মো নিমিত্তাদুৎপদ্যতে, তস্যাঃ স্মর্ত্তব্যো বিষয়ঃ, তৎকৃত ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারো নাত্মকৃত ইতি।

অনুবাদ। স্মৃতি নামক ধর্ম্ম, নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, স্মরণীয় পদার্থই সেই স্মৃতির বিষয়; ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকার তৎকৃত, অর্থাৎ স্মর্ত্তব্য বিষয় জন্য, আত্মকৃত (ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মজন্য) নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে ব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকারস্থলে স্মৃতির অনুমান করিয়া তদ্দ্বারা যে ঐ স্মৃতির কর্ত্তা বা আশ্রয় সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মার সিদ্ধি করিয়াছেন, ইহা এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে,—স্মৃতি আত্মার সাধক হইতে পারে না। কারণ, স্মৃতির কারণ সংস্কার এবং স্মরণীয় বিষয়। ঐ দুইটি নিমিত্তবশতঃই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আত্মা স্মৃতির কারণও নহে, স্মৃতির বিষয়ও নহে। সুতরাং স্মৃতি তাহার কারণরূপেও আত্মার সাধন করিতে পারে না; বিষয়রূপেও আত্মার সাধন করিতে পারে না। অম্লরসের স্মরণে রসনেন্দ্রিয়ের যে বিকার হইয়া থাকে, উহা ঐ স্থলে ঐ অম্লরসজন্য, উহা আত্মজন্য নহে। সুতরাং ঐ স্মৃতি ঐ স্থলে স্মর্ত্তব্য বিষয় অম্লরসের সাধক হইতে পারে, উহা আত্মার সাধক হইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

সূত্র। তদাত্ম-গুণত্বসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ ॥১৪॥২১২॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সদ্ভাববশতঃ অর্থাৎ স্মৃতি আত্মার গুণ হইলেই, তাহার সত্তা থাকে, এজন্য (আত্মার) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। তস্যা আত্মগুণত্বে সতি সদ্ভাবাদপ্রতিষেধ আত্মনঃ। যদি স্মৃতিরাত্মগুণঃ ? এবং সতি স্মৃতিরুপপদ্যতে, নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি। ইন্দ্রিয়চৈতন্যে তু নানাকর্ত্তৃকাণাং বিষয়গ্রহণানামপ্রতিসন্ধানং, প্রতিসন্ধানে বা বিষয়ব্যবস্থানুপপত্তিঃ। একস্তু চেতনোঽনেকার্থদর্শী ভিন্ননিমিত্তঃ পূর্ব্বদৃষ্টমর্থং স্মরতীতি একস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাৎ। স্মৃতেরাত্মগুণত্বে সতি সদ্ভাবঃ, বিপর্য্যয়ে চানুপপত্তিঃ। স্মৃত্যাশ্রয়াঃ প্রাণভৃতাং সর্ব্বে ব্যবহারাঃ। আত্মলিঙ্গমুদাহরণমাত্রমিন্দ্রিয়ান্তরবিকার ইতি।

অনুবাদ। সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সদ্ভাববশতঃ আত্মার প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, যদি স্মৃতি আত্মার গুণ হয়, এইরূপ হইলেই স্মৃতি উপপন্ন হয় (কারণ,) অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ই চেতন হইলে নানা-কর্ত্তৃক বিষয়জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বাদীর মতে চক্ষুরাদি নানা ইন্দ্রিয় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়জ্ঞানের কর্ত্তা, সেই রূপাদিবিষয়জ্ঞানগুলির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ; প্রত্যভিজ্ঞা হইলেও বিষয়-ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-নিয়মের উপপত্তি হয় না। কিন্তু ভিন্ন-নিমিত্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবিশিষ্ট অনেকার্থদর্শী এক চেতন পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থকে স্মরণ করে, যেহেতু অনেকার্থদর্শী এক চেতনের দর্শনের প্রত্যভিজ্ঞা হয়। স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সদ্ভাব, কিন্তু বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মগুণত্ব না থাকিলে (স্মৃতির) অনুপপত্তি। প্রাণিবর্গের সমস্ত ব্যবহার স্মৃতিমূলক, (সুতরাং) ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকাররূপ আত্মলিঙ্গ উদাহরণমাত্র [অর্থাৎ স্মৃতিমূলক অন্যান্য ব্যবহারের দ্বারাও এক আত্মার সিদ্ধি হয়, মহর্ষি যে ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপকরূপে ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা একটা উদাহরণ বা প্রদর্শনমাত্র]।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, স্মৃতি এক আত্মার গুণ হইলেই স্মৃতি হইতে পারে, নচেৎ স্মৃতিই হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিষয়ের জ্ঞাতা ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক আত্মার প্রতিষেধ করা যায় না, উহা অবশ্যস্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, স্মৃতি গুণপদার্থ, গুণপদার্থ নিরাশ্রয় হইতে পারে না। গুণত্ববশতঃ স্মৃতির আশ্রয় বা আধার অবশ্যই আছে। কেবল স্মর্ত্তব্য বিষয়কে স্মৃতির কারণ বা আধার বলা যায় না। কারণ, অতীত পদার্থেরও স্মৃতি হইয়া থাকে। তখন অতীত পদার্থের সত্তা না থাকায়, ঐ স্মৃতি নিরাশ্রয় হইয়া

পড়ে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকেও ঐ স্মৃতির আধার বলা যায় না। কারণ, ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ সকল বিষয়ের অনুভব করিতে না পারায়, সকল বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় রূপ বা গন্ধের স্মরণ করিতে পারিলেও রসের স্মরণ করিতে পারে না। শরীরকেও ঐ স্মৃতির আধার বলা যায় না। কারণ, স্মৃতি শরীরের গুণ হইলে, রামের স্মৃতি রামের ন্যায় শ্যামও প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। কারণ, শরীরের প্রত্যক্ষ গুণগুলি নিজের ন্যায় অপরেও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। পরন্ত, বাল্য-যৌবনাদি অবস্থাভেদে শরীরের ভেদ হওয়ায়, বাল-শরীরের দৃষ্ট বস্তু বৃদ্ধ-শরীর স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, একের দৃষ্ট বস্তু অপরে স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে দৃষ্টবস্তুর বৃদ্ধকালেও স্মরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষবাদী ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের চৈতন্য স্বীকার করিয়া ঐ ইন্দ্রিয়রূপ নানা আত্মা স্বীকার করিলে, "যে আমি রূপ দেখিতেছি, সেই আমিই গন্ধ গ্রহণ করিতেছি ; রস গ্রহণ করিতেছি" ইত্যাদিরূপে একই আত্মার ঐ সমস্ত বিষয়জ্ঞানের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ই রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে না পারায়, স্মর্ত্তা হইতে পারে না। স্মরণ ব্যতীতও প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি করিতে গেলে, ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-ব্যবস্থার অনুপপত্তি হয়। অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপেরই গ্রাহক হয়, রসাদির গ্রাহক হয় না এবং রসনেন্দ্রিয় রসেরই গ্রাহক হয়, রূপাদির গ্রাহক হয় না, এইরূপ যে বিষয়-নিয়ম আছে, উহা উপপন্ন হয় না, উহার অপলাপ করিতে হয়। সুতরাং যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইয়া স্মর্ত্তা হইতে পারে, এইরূপ এক চেতন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বত্রই স্মৃতির উপপত্তি হয়। ঐরূপ এক-চেতনকে স্মৃতির আধাররূপে স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ স্মৃতিকে ঐরূপ এক-চেতনের গুণ না বলিলে, স্মৃতির উপপত্তিই হয় না ; স্মৃতির সদ্ভাব বা অস্তিত্বই থাকে না। কারণ, আধার ব্যতীত গুণপদার্থের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং স্মৃতি যখন সকলেরই স্বীকার্য্য, তখন ঐ স্মৃতি রূপ গুণের আধার এক চেতন দ্রব্য বা আত্মা সকলকেই মানিতে হইবে, উহার প্রতিষেধ করা যাইবে না। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা স্মৃতি আত্মার গুণ, আত্মা জ্ঞানবান্, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বা নিগুর্ণ নহে—এই ন্যায়দর্শনসিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। সূত্রে "তদাত্মগুণসদ্ভাবাৎ" এইরূপ পাঠ প্রচলিত হইলেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা "তদাত্মগুণত্বসদ্ভাবাৎ" এইরূপ পাঠই তাঁহার সম্মত বুঝা যায়। "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"ও "তদাত্মগুণত্বসদ্ভাবাৎ" এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"-কারও ঐরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্য। **অপরিসংখ্যানাচ্চ স্মৃতিবিষয়স্য**[১]। অপরিসংখ্যায় চ স্মৃতিবিষয়মিদমুচ্যতে, "ন স্মৃতেঃ স্মর্ত্তব্যবিষয়ত্বা"দিতি। যেয়ং

১। এই সন্দর্ভকে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ মহর্ষির সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেও, অনেকের মতে উহা সূত্র নহে, উহা ভাষ্য, ইহাও শেষে লিখিয়াছেন। প্রাচীন বার্ত্তিককার উহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার "শেষং ভাষ্যে" এই কথার দ্বারাও তাঁহার মতে এই সমস্ত সন্দর্ভই ভাষ্য—ইহা বুঝা যাইতে পারে। "ন্যায়সূচী-

স্মৃতিরগৃহ্যমাণেঽর্থেঽজ্ঞাসিষমহমমুমর্থমিতি, এতস্যা জ্ঞাতৃ-জ্ঞানবিশিষ্টঃ পূর্ব্বজ্ঞাতোঽর্থো বিষয়ো নার্থমাত্রং, জ্ঞাতবানহমমুমর্থং, অসাবর্থো ময়া জ্ঞাতঃ, অস্মিন্নর্থে মম জ্ঞানমভূদিতি। চতুর্ব্বিধমেতদ্বাক্যং স্মৃতিবিষয়-জ্ঞাপকং সমানার্থম্। সর্ব্বত্র খলু জ্ঞাতা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ গৃহ্যতে। অথ প্রত্যক্ষেঽর্থে যা স্মৃতিস্তয়া ত্রীণি জ্ঞানান্যেকস্মিন্নর্থে প্রতিসন্ধীয়ন্তে সমান-কর্ত্তৃকাণি, ন নানাকর্ত্তৃকাণি নাকর্ত্তৃকাণি। কিং তর্হি? এককর্ত্তৃকাণি। অদ্রাক্ষমমুমর্থং যমেবৈতর্হি পশ্যামি অদ্রাক্ষমিতি দর্শনং দর্শনসংবিচ্চ, ন খল্বসংবিদিতে স্বে দর্শনে স্যাদেতদদ্রাক্ষমিতি। তে খল্বেতে দ্বে জ্ঞানে। যমেবৈতর্হি পশ্যামীতি তৃতীয়ং জ্ঞানং, এবমেকোঽর্থস্ত্রিভির্জ্ঞানৈ-র্যুজ্যমানো নাকর্ত্তৃকো ন নানাকর্ত্তৃকঃ, কিং তর্হি? এককর্ত্তৃক ইতি। সোঽয়ং স্মৃতিবিষয়োঽপরিসংখ্যায়মানো বিদ্যমানঃ প্রজ্ঞাতোঽর্থঃ প্রতি-ষিধ্যতে, নাস্ত্যাত্মা স্মৃতেঃ স্মর্ত্তব্যবিষয়ত্বাদিতি। ন চেদং স্মৃতিমাত্রং স্মর্ত্তব্যমাত্রবিষয়ং বা, ইদং খলু জ্ঞানপ্রতিসন্ধানবৎ স্মৃতিপ্রতিসন্ধানং, একস্য সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ। একোঽয়ং জ্ঞাতা সর্ব্ববিষয়ঃ স্বানি জ্ঞানানি প্রতিসন্ধত্তে, অমুমর্থং জ্ঞাস্যামি, অমুমর্থং বিজানামি, অমুমর্থমজ্ঞাসিষং, অমুমর্থং জিজ্ঞাসমানশ্চিরমজ্ঞাত্বাঽধ্যবস্যত্যজ্ঞাসিষমিতি। এবং স্মৃতিমপি ত্রিকালবিশিষ্টাং সুস্মূর্ষাবিশিষ্টাঞ্চ প্রতিসন্ধত্তে।

সংস্কারসন্ততিমাত্রে তু সত্ত্বে উৎপদ্যোৎপদ্য সংস্কারাস্তিরোভবন্তি, স নাস্ত্যেকোঽপি সংস্কারো যস্ত্রিকালবিশিষ্টং জ্ঞানং স্মৃতিঞ্চানুভবেৎ। ন চানুভবমন্তরেণ জ্ঞানস্য স্মৃতেশ্চ প্রতিসন্ধানমহং মমেতি চোৎপদ্যতে দেহান্তরবৎ। অতোঽনুমীয়তে, অস্ত্যেকঃ সর্ব্ববিষয়ঃ প্রতিদেহং স্বজ্ঞানপ্রবন্ধং স্মৃতিপ্রবন্ধঞ্চ প্রতিসন্ধত্তে ইতি, যস্য দেহান্তরেষু বৃত্তে-রভাবান্ন প্রতিসন্ধানং ভবতীতি।

অনুবাদ। স্মৃতির বিষয়ের অপরিসংখ্যানবশতঃই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের অভাববশতঃই (পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে)। বিশদার্থ এই যে, স্মৃতির

নিবন্ধে" এবং "ন্যায়তত্ত্বালোকে"ও উহা সূত্ররূপে গৃহীত হয় নাই। বৃত্তিকার উহাকে ন্যায়সূত্ররূপে গ্রহণ করিলেও তাঁহার পরবর্ত্তী "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য উহাকে ভাষ্যকারের সূত্র বলিয়াই লিখিয়াছেন।

বিষয়কে পরিসংখ্যা না করিয়াই অর্থাৎ কোন্ কোন্ পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে না বুঝিয়াই, "ন স্মৃতেঃ স্মর্ত্তব্যবিষয়ত্বাৎ" এই কথা বলা হইতেছে। অগৃহ্যমাণ পদার্থে অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ পদার্থবিষয়ে (১) "আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম" এইরূপ এই যে স্মৃতি জন্মে, ইহার (ঐ স্মৃতির) জ্ঞাতা ও জ্ঞানবিশিষ্ট পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও পূর্ব্বজ্ঞাত সেই পদার্থ, এই তিনটিই বিষয়, অর্থ মাত্র অর্থাৎ কেবল সেই পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থটিই (ঐ স্মৃতির) বিষয় নহে। (২) "আমি এই পদার্থকে জানিয়াছি", (৩) "এই পদার্থ আমা কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে", (৪) "এই পদার্থ বিষয়ে আমার জ্ঞান হইয়াছিল,"—স্মৃতির বিষয়ের বোধক এই চতুর্ব্বিধ বাক্য সমানার্থ। যেহেতু সর্ব্বত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার চতুর্ব্বিধ স্মৃতিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় গৃহীত হয়।

এবং প্রত্যক্ষপদার্থবিষয়ে যে স্মৃতি জন্মে, তদ্দ্বারা একপদার্থে এককর্ত্তৃক তিনটি জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, (ঐ তিনটি জ্ঞান) নানাকর্ত্তৃক নহে, অকর্ত্তৃক নহে, (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) এককর্ত্তৃক, (উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন) "এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম,যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি।" "দেখিয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞানে (১) দর্শন ও (২) দর্শনের জ্ঞান, (বিষয় হয়) যে হেতু স্বকীয় দর্শন অজ্ঞাত হইলে, "দেখিয়াছিলাম"—এইরূপ জ্ঞান হয় না। সেই এই দুইটি জ্ঞান। [অর্থাৎ "দেখিয়াছিলাম" এইরূপে যে স্মৃতি জন্মে, তাহাতে সেই অতীত দর্শনরূপ জ্ঞান, এবং সেই দর্শনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান বিষয় হয়]; "যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি"—ইহা তৃতীয় জ্ঞান। এইরূপ তিনটি জ্ঞানের দ্বারা যুজ্যমান একটি পদার্থ অর্থাৎ ঐ জ্ঞানত্রয়বিষয়ক একটি স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা পদার্থ অকর্ত্তৃক নহে, নানাকর্ত্তৃক নহে, (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) এককর্ত্তৃক। স্মৃতির বিষয় হইয়া প্রজ্ঞাত সেই এই বিদ্যমান পদার্থ (আত্মা) অপরিসংখ্যায়মান হওয়ায়, অর্থাৎ স্মৃতির বিষয়রূপে জ্ঞায়মান না হওয়ায়, "স্মৃতির স্মর্ত্তব্য বিষয়ত্ববশতঃ আত্মা নাই" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (অর্থাৎ অনুভব হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান যে আত্মা স্মৃতির বিষয় হইয়া প্রজ্ঞাত বা যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে স্মৃতির বিষয় বলিয়া না বুঝিয়াই পূর্ব্বপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীর যুক্তি অস্বীকার করিয়া, "আত্মা নাই" বলিয়াছেন) এবং ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার জ্ঞান স্মৃতিমাত্র নহে, অথবা স্মরণীয় পদার্থমাত্র বিষয়কও নহে, যেহেতু ইহা জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের ন্যায় স্মৃতিরও প্রতিসন্ধান। কারণ, একের সর্ব্ববিষয়ত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞেয়,

এমন এই এক জ্ঞাতা, স্বকীয় জ্ঞানসমূহকে প্রতিসন্ধান করে, (যথা) "এই পদার্থকে জানিব," "এই পদার্থকে জানিতেছি," "এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম"—এই পদার্থকে জিজ্ঞাসাকরতঃ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের পরে "জানিয়াছিলাম" এইরূপ নিশ্চয় করে। এইরূপে কালত্রয়বিশিষ্ট ও স্মরণেচ্ছাবিশিষ্ট স্মৃতিকেও প্রতিসন্ধান করে।

"সত্ত্ব" অর্থাৎ আত্মা বা জ্ঞাতা সংস্কারসন্ততি মাত্র হইলে কিন্তু সংস্কারগুলি উৎপন্ন হইয়া উৎপন্ন হইয়া তিরোভূত হয়, সেই একটিও সংস্কার নাই, যে সংস্কার কালত্রয়-বিশিষ্ট জ্ঞান ও কালত্রয়বিশিষ্ট স্মৃতিকে অনুভব করিতে পারে। অনুভব ব্যতীতও জ্ঞান এবং স্মৃতির প্রতিসন্ধান এবং "আমি", "আমার" এইরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না, যেমন দেহান্তরে (ঐরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না)। অতএব অনুমিত হয়, প্রতিশরীরে "সর্ব্ববিষয়" অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, এমন এক (জ্ঞাতা) আছে, যাহা স্বকীয় জ্ঞানসমূহ ও স্মৃতিসমূহকে প্রতি-সন্ধান করে, যাহার দেহান্তরসমূহে অর্থাৎ পরকীয় দেহে বৃত্তির (বর্ত্তমানতার) অভাব-বশতঃ প্রতিসন্ধান হয় না।

টিপ্পনী। কেবল স্মরণীয় পদার্থই স্মৃতির বিষয় হওয়ায়, আত্মা স্মৃতির বিষয় হয় না, সুতরাং স্মৃতির দ্বারা আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, স্মৃতি আত্মার গুণ হইলেই স্মৃতির উপপত্তি হয়। আত্মাই স্মৃতির কর্ত্তা, সুতরাং আত্মা না থাকিলে স্মৃতির উপপত্তিই হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের মূল খণ্ডন করিয়া, উহা নিরস্ত করিয়াছেন। স্মৃতি স্মরণীয় পদার্থবিষয়কই হয়, আত্মবিষয়ক হয় না, (আত্মা স্মরণীয় বিষয় না হওয়ায়, তাহাকে স্মৃতির বিষয় বলা যায় না,) পূর্ব্বপক্ষবাদীর এইরূপ অবধারণই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের মূল। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্মৃতির বিষয়কে পরিসংখ্যা না করিয়াই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে আত্মাও স্মৃতির বিষয় হওয়ায়, স্মৃতি কেবল স্মরণীয় পদার্থবিষয়কই হয়, এইরূপ অবধারণ করা যায় না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রথমে অগৃহ্যমাণ পদার্থে, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে অনুভূত হইতেছে না, এইরূপ পদার্থবিষয়ে "আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম"—এইরূপ স্মৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটিই উহার বিষয়, কেবল জ্ঞেয় অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞাত সেই পদার্থ-মাত্রই ঐ স্মৃতির বিষয় নহে। "আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম", এইরূপে আত্মা সেই পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থ এবং সেই অতীত জ্ঞান এবং সেই অতীত জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা, এই তিনটিকেই স্মরণ করে, ইহা স্মৃতির বিষয়বোধক পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে পূর্ব্বোক্তরূপ স্মৃতির বিষয়বোধক আরও তিনটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই চতুর্ব্বিধ বাক্য সমানার্থ। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকার চতুর্ব্বিধ স্মৃতিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ঐ চতুর্ব্বিধ স্মৃতিরই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকাশকত্ব সমান। ফলকথা, কোন পদার্থের জ্ঞান হইলে পরক্ষণে ঐ জ্ঞানের যে মানসপ্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) হয়, তাহাতে ঐ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা (আত্মা) বিষয় হওয়ায়, সেই মানসপ্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারও ঐ তিন বিষয়েই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সংস্কার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ চতুর্ব্বিধ স্মৃতিতেও ঐ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটিই বিষয় হইয়া থাকে, কেবল সেই পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থ বা জ্ঞেয় মাত্রই উহাতে বিষয় হয় না। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিতে জ্ঞাতা আত্মাও বিষয় হওয়ায়, স্মৃতির বিষয়রূপেও আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নির্ম্মূল।

ভাষ্যকার পরে প্রত্যক্ষপদার্থবিষয়ে স্মৃতিবিশেষ প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারাও এক আত্মার সাধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিয়াছেন। কোন পদার্থকে পূর্ব্বে দেখিয়া আবার দেখিলে, তখন "এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি"—এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, ইহাতে সেই পদার্থের বর্ত্তমান দর্শনের ন্যায় তাহার অতীত দর্শন এবং ঐ দর্শনের মানস-প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, যাহা পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, তাহাও বিষয় হইয়া থাকে। দর্শনরূপ জ্ঞানের জ্ঞান না হইলে, "দেখিয়াছিলাম"—এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং "দেখিয়াছিলাম" এই অংশে দর্শন ও তাহার জ্ঞান এই দুইটি জ্ঞানই বিষয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য। "যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি" এইরূপে যে তৃতীয় জ্ঞান জন্মে, তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত অতীত জ্ঞানদ্বয়, এই তিনটি জ্ঞান এককর্ত্তৃক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই পদার্থকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল এবং সেই দর্শনের মানসপ্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আবার ঐ পদার্থকে দেখিতেছে, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ অনুভববলেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত তিনটি জ্ঞানের মানস অনুভবজন্য সংস্কারবশতঃ উহার স্মরণ হওয়ায়, তদ্দ্বারা ঐ জ্ঞানত্রয়ের মানস প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে, এবং ঐ স্মরণেরও মানস অনুভব জন্য সংস্কারবশতঃ মানসপ্রতিসন্ধান হইয়া থাকে। "এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি" এইরূপে যেমন ঐসকল জ্ঞানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসন্ধান বা মানসপ্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে। একই জ্ঞাতা নিজের ত্রিকালীন জ্ঞানসমূহ ও ত্রিকালীন স্মৃতিসমূহকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে, এবং সেই স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞায় ঐ জ্ঞাতা বা আত্মাও বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং উহাও কেবল স্মর্ত্তব্যমাত্র বিষয়ক নহে। পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মাও যে স্মৃতির বিষয় হয়, ইহা না বুঝিয়াই পূর্ব্বপক্ষবাদী স্মৃতিকে স্মর্ত্তব্যমাত্র বিষয়ক বলিয়া আত্মা নাই এই কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞায় আত্মাও বিষয় হওয়ায়, পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐ কথা বলিতেই পারেন না। পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিকালীন জ্ঞানত্রয় এবং স্মরণের অনুভব ব্যতীত তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। সুতরাং ঐসমস্ত জ্ঞান ও স্মরণ এবং উহাদিগের মানস অনুভব ও তজ্জন্য উহাদিগের স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা করিতে সমর্থ এক আত্মা প্রতি শরীরে স্বীকার্য্য। একই পদার্থ পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী এবং সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা হইলেই পূর্ব্বোক্ত স্মরণাদি জ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে। পরন্তু পূর্ব্বজ্ঞাত কোন পদার্থকে পুনর্ব্বার জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞাতা বহুক্ষণ উহা না

বুঝিয়াও, অর্থাৎ বিলম্বেও ঐ পদার্থকে "জানিয়াছিলাম" এইরূপে স্মরণ করে এবং স্মরণের ইচ্ছা করিয়া বিলম্বে স্মরণ করিলেও পরে ঐ আত্মাই ঐ স্মরণেচ্ছা এবং সেই স্মরণ জ্ঞানকেও প্রতিসন্ধান করে। সুতরাং আত্মা যে পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী একই পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, আত্মা অস্থায়ী বা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইলে একের অনুভূত বিষয়ে অন্যের স্মরণ অসম্ভব হওয়ায়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান জন্মিতে পারে না।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, "সত্ত্ব" অর্থাৎ আত্মা সংস্কারসন্ততিমাত্র হইলে প্রতিক্ষণে ঐ সংস্কারের উৎপত্তি এবং পরক্ষণেই উহার বিনাশ হওয়ায়, কোন সংস্কারই পূর্ব্বোক্ত ত্রিকালীন জ্ঞান ও স্মরণের অনুভব করিতে পারে না। অনুভব ব্যতীত ও ঐ জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। যেমন, একদেহগত সংস্কার অপরদেহে অপর সংস্কার কর্ত্তৃক অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, ইহা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, তদ্রূপ এক দেহেও এক সংস্কার তাহার পূর্ব্বজাত অপর সংস্কার কর্ত্তৃক অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, ইহাও তাঁহাদিগের স্বীকার্য্য। কারণ, একের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী সমস্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতেই এমন একটিও সংস্কার নাই, যাহা পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী হইয়া পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে। সুতরাং বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসন্ততি অর্থাৎ প্রতিক্ষণে পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন সংস্কারের নাশ এবং তজ্জাতীয় অপর সংস্কারের উৎপত্তি, এইরূপে ক্ষণিক সংস্কারের যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহা আত্মা নহে। ভাষ্যকার "সংস্কারসন্ততিমাত্রে" এই স্থলে—"মাত্র" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসন্ততির অন্তর্গত প্রত্যেক সংস্কার হইতে ভিন্ন "সংস্কারসন্ততি" বলিয়া কোন পদার্থ নাই। কারণ, ঐ সন্ততি ঐ সমস্ত ক্ষণিক সংস্কার হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত স্থায়ী আত্মাই স্বীকৃত হইবে। সুতরাং বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তাহা বলিতে পারিবেন না। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানাত্মবাদ খণ্ডন করিতেও "বুদ্ধিভেদমাত্রে" এই বাক্যে "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যেরই সূচনা করিয়াছেন এবং বৌদ্ধমতে স্মরণাদির অনুপপত্তি বুঝাইয়াছেন। (১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসন্ততিও যে আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানসন্তান আত্মা হইতে পারে না, সেই যুক্তিতে ক্ষণিক সংস্কারসন্তানও আত্মা হইতে পারে না, ইহাও শেষে সমর্থন করিয়াছেন। কেহ বলেন যে, ভাষ্যকার এখানে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানকেই "সংস্কার" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ভাষ্যকার "সংস্কার" শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, ইহা বলা আবশ্যক। ভাষ্যকার অন্যত্র ঐরূপ বলেন নাই। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞানসন্ততির ন্যায় সংস্কারসন্ততিকেও আত্মা বলিতেন, ইহাও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ এখানে ঐ মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

চক্ষুরদ্বৈতপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

সূত্র। নাত্মপ্রতিপত্তিহেতূনাং মনসি সম্ভবাৎ ॥ ॥১৫॥২১৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন আত্মার প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত হেতুরই মনে সম্ভব আছে।

ভাষ্য। ন দেহাদি-সংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মা। কস্মাৎ? "আত্মপ্রতিপত্তিহেতূনাং মনসি সম্ভবাৎ।" "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা"-দিত্যেবমাদীনামাত্মপ্রতিপাদকানাং হেতূনাং মনসি সম্ভবো যতঃ, মনো হি সর্ব্ববিষয়মিতি। তস্মান্ন শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মেতি।

অনুবাদ। আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির মনে সম্ভব আছে। (বিশদার্থ)—যেহেতু "দর্শন ও স্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞানবশতঃ" ইত্যাদি প্রকার (পূর্ব্বোক্ত) আত্মপ্রতিপাদক হেতুগুলির মনে সম্ভব আছে। কারণ, মন সর্ব্ব বিষয়, অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর মতে আত্মার ন্যায় সমস্ত পদার্থ মনেরও বিষয় হইয়া থাকে। অতএব আত্মা—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রকরণের দ্বারা আত্মা—দেহ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, এখন মন আত্মা নহে; আত্মা মন হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে এই প্রকরণের আরম্ভে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রথম হইতে আত্মার সাধক যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, মনে তাহার সম্ভব হওয়ায়, মন আত্মা হইতে পারে। কারণ, রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানেই মনের নিমিত্ততা স্বীকৃত হওয়ায়, মন সর্ব্ববিষয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনের বিষয়নিয়ম নাই। সুতরাং চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা মন এক বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে। গোতমসিদ্ধান্তে মন নিত্য, সুতরাং অনুভব হইতে স্মরণকাল পর্য্যন্ত মনের সত্তার কোনরূপ বাধা সম্ভব না হওয়ায়, মনের আত্মত্বপক্ষে স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞার কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। মূলকথা, দেহাত্মবাদে ও ইন্দ্রিয়াত্মবাদে যে সকল অনুপপত্তি হয়, মনকে আত্মা বলিলে, তাহা কিছুই হয় না। যে সকল হেতুবলে আত্মা দেহ ও বহিরিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, মনের আত্মত্ব স্বীকার করিলেও ঐ সকল হেতুর উপপত্তি হয়। সুতরাং মন হইতে পৃথক্ আত্মা স্বীকার করা অনাবশ্যক ও অযুক্ত।

ভাষ্যকার প্রথম হইতে আত্মা দেহাদি-সংঘাত মাত্র, এই মতের খণ্ডন করিতে ঐ পূর্ব্বপক্ষেরই

অবতারণা করিয়া, মহর্ষির সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করায়, এখানেও ঐ পূর্ব্বপক্ষেরই অনুবর্ত্তন করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদ ও বিনাশবশতঃ উহারা কোন স্থলে স্মরণাদি করিতে না পারিলেও, উহার অন্তর্গত মনের নিত্যত্ব ও সর্ব্ববিষয়ত্ব থাকায়, তাহাতে কোন কালেই স্মরণাদির অনুপপত্তি হইবে না। সুতরাং কেবল দেহ বা কেবল বহিরিন্দ্রিয়, আত্মা হইতে না পারিলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সংঘাত আত্মা হইতে পারে। আত্মার সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুগুলির মনে সম্ভব হওয়ায় এবং ঐ দেহাদি-সংঘাতের মধ্যে মনও থাকায়, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না। ইহাই ভাষ্যকারের পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যার চরম তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে॥ ১৫॥

সূত্র। জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্॥ ॥১৬॥২১৪॥

অনুবাদ। (উত্তর)—জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধনের উপপত্তি থাকায়, নামভেদ মাত্র। [অর্থাৎ জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞানের সাধন—এই উভয়ই যখন স্বীকার্য্য, তখন জ্ঞাতাকে "মন" এই নামে অভিহিত করিলে, কেবল নামভেদই হয়, তাহাতে জ্ঞানের সাধন হইতে ভিন্ন জ্ঞাতার অপলাপ হয় না।]

ভাষ্য। জ্ঞাতুঃ খলু জ্ঞানসাধনান্যুপপদ্যন্তে, চক্ষুষা পশ্যতি, ঘ্রাণেন জিঘ্রতি, স্পর্শনেন স্পৃশতি, এবং মন্তুঃ সর্ব্ববিষয়স্য মতিসাধনমন্তঃকরণভূতং সর্ব্ববিষয়ং বিদ্যতে যেনায়ং মন্যত ইতি। এবং সতি জ্ঞাতর্য্যাত্মসংজ্ঞা ন মৃষ্যতে, মনঃসংজ্ঞাঽভ্যনুজ্ঞায়তে। মনসি চ মনঃসংজ্ঞা ন মৃষ্যতে মতিসাধনস্ত্বভ্যনুজ্ঞায়তে। তদিদং সংজ্ঞাভেদমাত্রং নার্থে বিবাদ ইতি। **প্রত্যাখ্যানে বা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিলোপপ্রসঙ্গঃ।** অথ মন্তুঃ সর্ব্ববিষয়স্য মতিসাধনং সর্ব্ববিষয়ং প্রত্যাখ্যায়তে নাস্তীতি, এবং রূপাদিবিষয়গ্রহণসাধনান্যপি ন সন্তীতি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিলোপঃ প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধনগুলি উপপন্ন হয়, (যেমন) "চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছে", "ঘ্রাণের দ্বারা আঘ্রাণ করিতেছে", "ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিতেছে"—এইরূপ "সর্ব্ববিষয়" অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, এমন মন্তার—(মননকর্ত্তার) অন্তঃকরণরূপ সর্ব্ববিষয় মতিসাধন (মননের করণ) আছে, যদ্দ্বারা এই মন্তা মনন করে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ মন্তার মননের সাধনরূপে

মনকে স্বীকার করিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতা বলিলে, জ্ঞাতাতে আত্মসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে না, মনঃসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে, মনেও মনঃসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে না, কিন্তু মতির সাধন স্বীকৃত হইতেছে। সেই ইহা নামভেদ মাত্র, পদার্থে বিবাদ নহে। প্রত্যাখ্যান করিলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিলোপাপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যদি সর্ব্ববিষয় মন্তার সর্ব্ববিষয় মতিসাধন, "নাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়—এইরূপ হইলে রূপাদি বিষয়-জ্ঞানের সাধনগুলিও অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গও নাই—সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিলোপ প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন তাহার জ্ঞানের সাধন উপপন্ন হওয়ায়, অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায়, মনকে জ্ঞাতা বা আত্মা বলিলে কেবল নামভেদ মাত্রই হয়, পদার্থের ভেদ হয় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্ববাদিসম্মত জ্ঞাতার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা করণ অবশ্য স্বীকার্য্য। জ্ঞাতার রূপ-জ্ঞানের সাধন চক্ষুঃ, রস-জ্ঞানের সাধন রসনা ইত্যাদি প্রকারে রূপাদি জ্ঞানের সাধনরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বীকার করা হইয়াছে। রূপাদি জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ সুখাদি জ্ঞানের ও স্মরণরূপ জ্ঞানের কোন সাধন বা করণও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। করণ ব্যতীত সুখাদি জ্ঞান ও স্মরণ সম্পন্ন হইলে রূপাদি জ্ঞানও করণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বিলোপ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ নিরর্থক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ করণ ব্যতীত রূপাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলিয়াই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সুখাদি জ্ঞান ও স্মরণের সাধনরূপে জ্ঞাতার কোন একটি অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য্য। উহারই নাম মন। ভাষ্যকার উহাকে "মতিসাধন" বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "মতি" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান। শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান সংস্কারাদি কারণবিশেষ-জন্যই হইয়া থাকে, তথাপি জন্যজ্ঞানত্ববশতঃ রূপাদি জ্ঞানের ন্যায় উহা অবশ্য কোন ইন্দ্রিয়জন্যও হইবে। কারণ, জন্য জ্ঞানমাত্রই কোন ইন্দ্রিয়জন্য, ইহা রূপাদি জ্ঞান দৃষ্টান্তে সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ঐ স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের কারণরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন 'মন' নামে একটি অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য্য। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও ঐ স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায়, ঐ সকল জ্ঞানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের অন্তর্গত সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানেই মনঃ সাক্ষাৎ সাধন বা করণ। যে কোনরূপেই হউক, স্মৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞানরূপ "মতি"মাত্রেই সাধনরূপে কোন অন্তরিন্দ্রিয় আবশ্যক। উহা ঐ মতির সাধন বলিয়া, উহার নাম "মনঃ"। ঐ মনের দ্বারা তদ্ভিন্ন জ্ঞাতা ঐ মতি বা মনন করিলে, তখন ঐ জ্ঞাতারই নাম "মন্তা"। রূপাদি জ্ঞানকালে যেমন জ্ঞাতা ও ঐ রূপাদি জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি পৃথক্‌ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে; এইরূপ ঐ মতির কর্ত্তা, মন্তা

তাহার ঐ মতিসাধন অন্তরিন্দ্রিয় পৃথক্‌ভাবে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে মন্তা ও মতিসাধন—এই পদার্থদ্বয় স্বীকৃত হওয়ায়, কেবল নাম মাত্রেই বিবাদ হইতেছে, পদার্থে কোন বিবাদ থাকিতেছে না। কারণ জ্ঞাতা বা মন্তা পদার্থ স্বীকার করিয়া, তাহাকে "আত্মা" না বলিয়া "মন" এই নামে অভিহিত করা হইতেছে, এবং মতির সাধন পৃথক্‌ভাবে স্বীকার করিয়া তাহাকে "মন" না বলিয়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা হইতেছে। কিন্তু মন্তা ও মতির সাধন এই দুইটি পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহাকে যে কোন নামে অভিহিত করিলে আমাদের মূল সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় না, পদার্থে বিবাদ না থাকিলে নামভেদমাত্রে কোন বিবাদ নাই। মূলকথা, মন মতিসাধন অন্তরিন্দ্রিয়রূপেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা জ্ঞাতা বা মন্তা হইতে পারে না। জ্ঞাতা বা মন্তা উহা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ॥ ৬ ॥

সূত্র। নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ ॥ ১৭॥২১৫॥

অনুবাদ। নিয়ম ও নিরনুমান, [অর্থাৎ জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধন আছে, কিন্তু সুখাদি প্রত্যক্ষের সাধন নাই। এইরূপ নিয়ম নির্যুক্তিক বা নিষ্প্রমাণ।]

ভাষ্য। যোঽয়ং নিয়ম ইষ্যতে রূপাদিগ্রহণসাধনান্যস্য সন্তি, মতিসাধনং সর্ব্ববিষয়ং নাস্তীতি। অয়ং নিয়মো নিরনুমানো নাত্রানুমানমস্তি, যেন নিয়মং প্রতিপদ্যামহ ইতি। রূপাদিভ্যশ্চ বিষয়ান্তরং সুখাদয়স্তদুপলব্ধৌ করণান্তরসদ্ভাবঃ। যথা, চক্ষুষা গন্ধো ন গৃহ্যত ইতি, করণান্তরং ঘ্রাণং, এবং চক্ষুর্ঘ্রাণাভ্যাং রসো ন গৃহ্যত ইতি করণান্তরং রসনং, এবং শেষেষ্বপি, তথা চক্ষুরাদিভিঃ সুখাদয়ো ন গৃহ্যন্ত ইতি করণান্তরেণ ভবিতব্যং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপদ্যলিঙ্গম্। যচ্চ সুখাদ্যুপলব্ধৌ করণং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপদ্যলিঙ্গং, তস্যেন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং প্রতি সন্নিধেরসন্নিধেশ্চ ন যুগপজ্‌জ্ঞানান্যুৎপদ্যন্ত ইতি, তত্র যদুক্ত- "মাত্মপ্রতিপত্তিহেতূনাং মনসি সম্ভবা"দিতি তদযুক্তম্।

অনুবাদ। এই জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধনগুলি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ) আছে, সর্ব্ববিষয় মতিসাধন নাই, এই যে নিয়ম স্বীকৃত হইতেছে, এই নিয়ম নিরনুমান, (অর্থাৎ) এই নিয়মে অনুমান (প্রমাণ) নাই, যৎপ্রযুক্ত নিয়ম স্বীকার করিব। পরন্তু, সুখাদি, রূপাদি হইতে ভিন্ন বিষয়, সেই সুখাদির উপলব্ধি বিষয়ে করণান্তর আছে। যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধ গৃহীত হয় না, এজন্য করণান্তর ঘ্রাণ। এইরূপ

চক্ষুঃ ও ঘ্রাণের দ্বারা রস গৃহীত হয় না, এজন্য করণান্তর রসনা। এইরূপ শেষগুলি অর্থাৎ অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিতেও বুঝিবে। সেইরূপ চক্ষুরাদির দ্বারা সুখাদি গৃহীত হয় না, এজন্য করণান্তর থাকিবে, পরন্তু তাহা জ্ঞানের অযৌগপদ্যলিঙ্গ। বিশদার্থ এই যে, যাহাই সুখাদির উপলব্ধিতে করণ, তাহাই জ্ঞানের অযৌগপদ্যলিঙ্গ, অর্থাৎ যুগপৎ নানা জাতীয় নানা প্রত্যক্ষ না হওয়াই তাহার লিঙ্গ বা সাধক, তাহার কোন এক ইন্দ্রিয়ে সন্নিধি (সংযোগ) ও অন্য ইন্দ্রিয়ে অসন্নিধিবশতঃ একই সময়ে জ্ঞান (নানা প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে অর্থাৎ সুখাদি প্রত্যক্ষের সাধনরূপে অতিরিক্ত অন্তরিন্দ্রিয় বা মন সিদ্ধ হইলে "আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির মনে সম্ভব হওয়ায়"—(মনই আত্মা) এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জ্ঞাতার রূপাদি বাহ্য বিষয়জ্ঞানেরই সাধন আছে, কিন্তু মতির সাধন কোন অন্তরিন্দ্রিয় নাই। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, করণ ব্যতীতই জ্ঞাতা বা মন্তা সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে মন নামে যে অতিরিক্ত দ্রব্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকেই সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের কর্ত্তা বলিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতা ও মন্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে মন্তা ও মতি-সাধন—এই দুইটি পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা না থাকায়, কেবল সংজ্ঞাভেদ হইল না, মন হইতে অতিরিক্ত আত্মপদার্থেরও খণ্ডন হইল। এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার রূপাদি বাহ্য বিষয়-জ্ঞানেরই সাধন আছে, কিন্তু সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের কোন সাধন বা করণ নাই, এইরূপ নিয়মে কোন অনুমান বা প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে উক্ত নিয়ম স্বীকার করা যায় না। পরন্তু সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণ আছে, এ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ থাকায়, উহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। রূপাদি বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষে যেমন করণ আছে, তদ্রূপ ঐ দৃষ্টান্তে সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ[১]। পরন্তু চক্ষুর দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, যেমন গন্ধের প্রত্যক্ষে চক্ষু হইতে ভিন্ন ঘ্রাণনামক করণ সিদ্ধ হইয়াছে এবং ঐরূপ যুক্তিতে রসনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন করণ সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ রূপাদি বাহ্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তর বা ভিন্ন বিষয় সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষেও অবশ্য কোন করণান্তর সিদ্ধ হইবে। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সুখাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উহার করণরূপে একটি অন্তরিন্দ্রিয়ই সিদ্ধ হইবে। পরন্তু একই সময়ে চাক্ষুষাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি না হওয়ায়, মন নামে অতি সূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হইয়াছে[২]। একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত অতি সূক্ষ্ম মনের সংযোগ হইতে না পারায়, একাধিক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহর্ষি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত পরে সমর্থন করিয়াছেন।

১। সুখদুঃখাদিসাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ, জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ রূপাদিসাক্ষাৎকারবৎ।
২। প্রথম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার এখানে শেষে মহর্ষির মনঃসাধক পূর্ব্বোক্ত যুক্তিরও উল্লেখ করিয়া মন আত্মা নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, মন সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরূপেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা জ্ঞাতা হইতে পারে না, এবং মন পরমাণু পরিমাণ স্থক্ষ্ম দ্রব্য বলিয়াও, উহা জ্ঞাতা বা আত্মা হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ অতি স্থক্ষ্ম দ্রব্য জ্ঞানের আধার হইলে, তাহাতে ঐ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। জ্ঞানের আধার দ্রব্যে মহত্ত্ব বা মহৎ পরিমাণ না থাকিলে ঐ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, জন্যপ্রত্যক্ষ মাত্রেই মহত্ত্ব কারণ, নচেৎ পরমাণু বা পরমাণুগত রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। কিন্তু "আমি বুঝিতেছি", "আমি সুখী", "আমি দুঃখী", ইত্যাদিরূপে জ্ঞানাদির যখন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তখন ঐ জ্ঞানাদির আধার দ্রব্যকে মহৎ পরিমাণই বলিতে হইবে। মনকে মহৎ পরিমাণ স্বীকার করিয়া ঐ জ্ঞানাদির আধার বা জ্ঞাতা বলিলে এবং উহা হইতে পৃথক্ অতি স্থক্ষ্ম কোন অন্তরিন্দ্রিয় না মানিলে জ্ঞানের অযৌগপদ্য বা ক্রম থাকে না। একই সময়ে নানা ইন্দ্রিয়জন্য নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। ফলকথা, সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে স্বীকৃত মন জ্ঞাতা বা আত্মা হইতে পারে না। আত্মা উহা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ। দ্বিতীয়াহ্নিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষায় ইহা বিশেষরূপে সমর্থিত ও পরিস্ফুট হইবে।

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ইউরোপীয় অনেক দার্শনিক মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও, ঐ মত তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উপনিষদেই পূর্ব্বপক্ষরূপে ঐ মতের স্থচনা আছে। অতি প্রাচীন চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ের কোন শাখা উপনিষদের ঐ বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং যুক্তির দ্বারা মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহা বেদান্তসারে সদানন্দ যোগীন্দ্রও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন[1]। এইরূপ দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, বিজ্ঞানাত্মবাদ, শূন্যাত্মবাদ প্রভৃতিও উপনিষদে পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থচিত আছে এবং নাস্তিকসম্প্রদায়বিশেষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ঐ সকল মতের সমর্থন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে ইহা যথাক্রমে দেখাইয়াছেন[2]। ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতম উপনিষদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য দেহের আত্মত্ব, ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব ও মনের আত্মত্বকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণপূর্ব্বক, ঐ সকল মতের খণ্ডন করিয়া, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা আত্মাকে দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের

১। অন্যস্তু চার্ব্বাকঃ "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ (তৈত্তি° ২য় বল্লী, ৩য় অনুবাক্) ইত্যাদিশ্রুতের্মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ অহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি।—বেদান্তসার।

২। অন্যশ্চার্ব্বাকঃ "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তি°, উপ° ২য় বল্লী, ১ম অনু° ১ম মন্ত্র) ইতি শ্রুতেঃ স্থূলোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ দেহ আত্মেতি বদতি।

অপরশ্চার্ব্বাকঃ "তেহ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" (ছান্দোগ্য ৫ অ০ ১ খণ্ড, ৭ মন্ত্র) ইত্যাদি শ্রুতেরিন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোঽহং বধিরোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণ্যাত্মেতি বদতি।

বৌদ্ধস্তু "অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (তৈত্তি°, ২ বল্লী, ৪ অনু°) ইত্যাদিশ্রুতেঃ কর্ত্তুরভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ বুদ্ধিরাত্মেতি বদতি।

অপরো বৌদ্ধঃ "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দোগ্য, ৬ অ০ ২ খণ্ড, ১ম মন্ত্র) ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ সর্ব্বাভাবাৎ অহং সুষুপ্তৌ নাসমিত্যুত্থিতস্য স্বাভাবপরামর্শবিষয়ানুভবাচ্চ শূন্যমাত্মেতি বদতি।—বেদান্তসার।

ঐ মতের খণ্ডনের জন্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম হইতে আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র—এই মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া মহর্ষিসূত্র দ্বারাই ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে এবং আত্মা মন নহে, ইহা বিভিন্ন প্রকরণ দ্বারা মহর্ষি সিদ্ধ করিলেও, তদ্দ্বারা আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রোক্ত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান আত্মা নহে, সংস্কার আত্মা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সমস্ত কথার দ্বারা ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং ন্যায়দর্শন বৌদ্ধ-যুগেই রচিত, অথবা তৎকালে বৌদ্ধ নিরাসের জন্য ঐ সমস্ত সূত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ কল্পনারও কোন হেতু নাই। কারণ, ন্যায়দর্শনে আত্মবিষয়ে যে সমস্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে, উহা যে উপনিষদেই সূচিত আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আত্মবিষয়ে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিলেও নব্য বৌদ্ধ মহাদার্শনিকগণ নিজপক্ষ সমর্থন করিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে তাহার বিশেষ সমালোচনা ও খণ্ডন পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগের পূর্ব্ববর্ত্তী বাৎস্যায়নের সময়ে বৌদ্ধ দর্শনের সেরূপ অভ্যুদয় হয় নাই, তিনি নব্য বৌদ্ধ মহাদার্শনিক-গণের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। দিঙ্‌নাগের পরবর্ত্তী বা সমকালীন মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথার উল্লেখ ও বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও আমরা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক কথা জানিতে পারি। উপনিষদে যে "নৈরাত্ম্যবাদে"র সূচনা ও নিন্দা আছে, উহা বৌদ্ধযুগে ক্রমশঃ নানা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে নানা আকারে সমর্থিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্ব বা অলীকত্বই সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও আমরা উদ্দ্যোতকরের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। উদ্দ্যোতকর ঐ মতের প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্তের খণ্ডনপূর্ব্বক উহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং "সর্ব্বাভিসময়-সূত্র" নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া উহা যে প্রকৃত বৌদ্ধমতই নহে, ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন।* এ সকল কথা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্ব, অর্থাৎ আত্মার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, নাস্তিত্বই নিশ্চিত—ইহা আমরা শূন্যবাদী মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না। আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না—ইহাই আমরা মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া বুঝিতে পারি।[১] উদ্দ্যোতকর পরে এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত "তদাত্মগুণত্ব-সদ্ভাবাদ-প্রতিষেধঃ" এই সূত্রের বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের দ্বারা স্মৃতি আত্মারই গুণ, ইহা স্পষ্ট বর্ণিত

১। "বুদ্ধৈরাত্মা ন বা নাত্মা কশ্চিদিত্যপি দর্শিতং"।
"আত্মনোঽস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ।
তং বিনাঽস্তিত্বনাস্তিত্বে ক্লেশানাং সিধ্যতঃ কথম্।"
—মাধ্যমিককারিকা।

হওয়ায়, স্মৃতির আধার আত্মার অস্তিত্বও সমর্থিত হইয়াছে। কারণ, স্মৃতি যখন কার্য্য এবং উহার অস্তিত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন উহার আধার আত্মার অস্তিত্বও অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। আধার ব্যতীত কোন কার্য্য হইতেই পারে না, এবং স্মৃতি যখন গুণপদার্থ, তখন উহা নিরাধার হইতেই পারে না। আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে আর কোন পদার্থই ঐ স্মৃতির আধার হইতে পারে না। সুতরাং শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় যে আত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব—কিছুই মানেন না, তাহাও এই সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর সেখানে উক্ত মতের একটী বৌদ্ধ-কারিকা[1] উদ্ধৃত করিয়াও উহার খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জ্জুনের "মাধ্যমিককারিকা"র মধ্যে ঐ কারিকাটি দেখিতে পাই নাই। ঐ কারিকার অর্থ এই যে, চক্ষুর দ্বারা যে রূপের জ্ঞান জন্মে বলা হয়, উহা চক্ষুতে থাকে না; ঐ রূপেও থাকে না। চক্ষু ও রূপের মধ্যবর্ত্তী কোন পদার্থেও থাকে না। সেই জ্ঞান যেখানে নিষ্ঠিত (অবস্থিত), অর্থাৎ সেই জ্ঞানের যাহা আধার, তাহা আছে—ইহাও নহে, নাই, ইহাও নহে। তাহা হইলে বুঝা যায়, এই মতে আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই। আত্মা সৎও নহে, অসৎও নহে। আত্মা একেবারেই অলীক, ইহা কিন্তু ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায় না। আত্মা আছে বলিলেও বুদ্ধদেব "হাঁ" বলিয়াছেন, আত্মা নাই বলিলেও বুদ্ধদেব "হাঁ" বলিয়াছেন, ইহাও কোন কোন পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। মনে হয়, তদনুসারেই শূন্যবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, ইহাই বুদ্ধদেবের নিজ মত বলিয়া বুঝিয়া, উহাই সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে যে আত্মার অস্তিত্বই মানিতেন না, ইহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক জন্মের বার্ত্তা বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে, আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধান্তেই বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ "নৈরাত্ম্যবাদ" সমর্থন করিয়াও জন্মান্তরবাদের উপপাদন করিতে চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। সে যাহা হউক, উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই—ইহা বিরুদ্ধ। কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই বলিলে, নাস্তিত্বই থাকিবে। নাস্তিত্ব নাই বলিলে, অস্তিত্বই থাকিবে। পরন্তু উক্ত কারিকার দ্বারা জ্ঞানের আশ্রিতত্ব খণ্ডন করা যায় না—জ্ঞানের কেহ আশ্রয়ই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু ঐ কারিকার দ্বারা জ্ঞানের আশ্রয় খণ্ডন করিতে গেলে উহার দ্বারাই আত্মার অস্তিত্বই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, আত্মার অস্তিত্বই না থাকিলে জ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং জ্ঞানের আশ্রয় নাই, এইরূপ বাক্যই বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর এইরূপে পূর্ব্বোক্ত যে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা উদ্দ্যোতকরের প্রথম-খণ্ডিত আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব মত হইতে ভিন্ন মত, এ বিষয়ে সংশয় হয় না। "নৈরাত্ম্যবাদে"র সমর্থন করিতে প্রাচীনকালে

১। ন তচ্চক্ষুষি নো রূপে নান্তরালে তয়োঃ স্থিতং।
ন তদস্তি ন তন্নাস্তি যত্র তন্নিষ্ঠিতং ভবেৎ॥

—বৌদ্ধকারিকা।

অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ সমুদায়কেই আত্মা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা উহা হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মা মানেন নাই। আত্মার সর্ব্বথা নাস্তিত্বও বলেন নাই। এইরূপ "নৈরাত্ম্যবাদ"ই অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর এই মতেরও প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ মতের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ মতের কোন স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি মহর্ষি-সূত্রোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা আত্মা দেহাদিসংঘাতমাত্র নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ঐ সকল যুক্তির দ্বারাই রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ সমুদায়ও আত্মা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যখন বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, আত্মাও ক্ষণিক, তখন ক্ষণমাত্রস্থায়ী কোন আত্মাই পরে না থাকায়, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে না পারায়, স্মরণের অনুপপত্তি দোষ অপরিহার্য্য। ভাষ্যকার নানা স্থানে বৌদ্ধ মতে ঐ দোষই পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়া, বৌদ্ধ মতের সর্ব্বথা অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের নিজমতেও স্মরণের উপপাদন করিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন বিশেষ আলোচনা বাৎস্যায়ন ভাষ্যে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় আহ্নিকে বৌদ্ধ মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে ঐ সকল কথার আলোচনা হইবে॥ ১৭॥

মনোব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত॥ ৪॥

ভাষ্য। কিং পুনরয়ং দেহাদিসংঘাতাদন্যো নিত্য উতানিত্য ইতি। কুতঃ সংশয়ঃ? **উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ সংশয়ঃ।** বিদ্যমানমুভয়থা ভবতি, নিত্যমনিত্যঞ্চ। প্রতিপাদিতে চাত্মসদ্ভাবে সংশয়ানিবৃত্তেরিতি।

আত্মসদ্ভাবহেতুভিরেবাস্য প্রাগ্‌দেহভেদাদবস্থানং সিদ্ধং, ঊর্দ্ধমপি দেহভেদাদবতিষ্ঠতে। কুতঃ?

অনুবাদ। (সংশয়) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন এই আত্মা কি নিত্য? অথবা অনিত্য?। (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ এখন আবার ঐরূপ সংশয়ের কারণ কি? (উত্তর) উভয় প্রকার দেখা যায়, এজন্য সংশয় হয়। বিশদার্থ এই যে, বিদ্যমান পদার্থ উভয় প্রকার হয়, (১) নিত্য ও (২) অনিত্য। আত্মার সদ্ভাব প্রতিপাদিত হইলেও, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সাধিত হইলেও (পূর্ব্বোক্তরূপ) সংশয়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় (সংশয় হয়)।

(উত্তর) আত্মসদ্ভাবের হেতুগুলির দ্বারাই, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের সাধক পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারাই দেহবিশেষের (যৌবনাদি বিশিষ্ট দেহের) পূর্ব্বে এই আত্মার অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, [অর্থাৎ যৌবন ও বার্দ্ধক্যবিশিষ্ট

দেহে যে আত্মা থাকে, বাল্যাদি-বিশিষ্ট দেহেও পূর্ব্বে সেই আত্মাই থাকে—ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।] দেহবিশেষের ঊর্দ্ধকালেও, অর্থাৎ সেই দেহত্যাগের পরেও (ঐ আত্মা) অবস্থান করে, (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ এবিষয়ে প্রমাণ কি ?

সূত্র। পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ-ভয়-শোকসম্প্রতিপত্তেঃ ॥১৮॥২১৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের স্মরণানুবন্ধবশতঃ (অনুস্মরণ বশতঃ) জাতের অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের সম্প্রতিপত্তি (প্রাপ্তি) হয়।

ভাষ্য। জাতঃ খল্বয়ং কুমারকোঽস্মিন্ জন্মন্যগৃহীতেষু হর্ষ-ভয়-শোক-হেতুষু হর্ষ-ভয়-শোকান্ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গানুমেয়ান্। তে চ স্মৃত্যনুবন্ধাদুৎপদ্যন্তে নান্যথা। স্মৃত্যনুবন্ধশ্চ পূর্ব্বাভ্যাসমন্তরেণ ন ভবতি। পূর্ব্বাভ্যাসশ্চ পূর্ব্বজন্মনি সতি নান্যথেতি সিধ্যত্যেতদবতিষ্ঠতেঽয়মূর্দ্ধং শরীরভেদাদিতি।

অনুবাদ। জাত এই কুমারক অর্থাৎ নবজাত শিশু ইহজন্মে হর্ষ, ভয় ও শোকের হেতু অজ্ঞাত হইলেও লিঙ্গানুমেয়, অর্থাৎ হেতুবিশেষ দ্বারা অনুমেয় হর্ষ, ভয় ও শোক প্রাপ্ত হয়। সেই হর্ষ, ভয় ও শোক কিন্তু স্মরণানুবন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। স্মরণানুবন্ধও পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীত হয় না। পূর্ব্বাভ্যাসও পূর্ব্বজন্ম থাকিলে হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং এই আত্মা দেহ-বিশেষের ঊর্দ্ধকালেও, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সেই দেহত্যাগের পরেও অবস্থিত থাকে—ইহা সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি প্রথম হইতে সপ্তদশ সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি প্রকরণের দ্বারা আত্মা দেহাদি সংঘাত হইতে অতিরিক্ত পদার্থ—ইহাঁ সিদ্ধ করিয়া (ভাষ্যকার-প্রদর্শিত) আত্মা কি দেহাদিসংঘাতমাত্র ? অথবা উহা হইতে অতিরিক্ত ? এই সংশয় নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ না হওয়ায়, আত্মা নিত্য কি অনিত্য ? এই সংশয় নিরস্ত হয় নাই। দেহাদিসংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের সাধক যে সকল হেতু মহর্ষি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী এক অতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, ঐরূপ আত্মা মানিলেও

বাল্যাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণাদি হইতে পারে। যে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তিবশতঃ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা মানিতে হইবে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী এক আত্মা মানিলেও ঐ স্মরণাদির উপপত্তি হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকে, ইহা সিদ্ধ হয় নাই। মহর্ষি এপর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ বলেন নাই। বিদ্যমান বস্তু নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার দেখা যায়। সুতরাং দেহাদিসংঘাত হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ আত্মাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্য আত্মা নিত্য কি অনিত্য?—এইরূপ সংশয় হয়। আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেই পরলোক সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপযোগী পরলোকের সাধনের জন্যও মহর্ষি এখানে আত্মার নিত্যত্বের পরীক্ষা করিয়াছেন। সংশয় পরীক্ষার পূর্ব্বাঙ্গ, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, এজন্য ভাষ্যকার প্রথমে সংশয় প্রদর্শন ও ঐ সংশয়ের কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক উহা সমর্থন করিয়া, ঐ সংশয় নিরাসের জন্য মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্বের সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুগুলির দ্বারাই দেহবিশেষের পূর্ব্বে ঐ আত্মাই থাকে—ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "দেহভেদ" শব্দের দ্বারা এখানে বালকদেহ, যুবকদেহ, বৃদ্ধদেহ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহবিশেষই বুঝিতে হইবে। কারণ, দেহাদি ভিন্ন আত্মার সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুগুলির দ্বারা সেই আত্মার পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা বাল্যকালে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে একই আত্মা প্রত্যক্ষাদি করিয়া তজ্জন্য সংস্কারবশতঃ স্মরণাদি করে, (দেহ আত্মা হইলে বাল্যাদি অবস্থাভেদে দেহের ভেদ হওয়ায়, বালকদেহের অনুভূত বিষয় বৃদ্ধদেহ স্মরণ করিতে পারে না,) সুতরাং বৃদ্ধদেহের পূর্ব্বে যুবকদেহে এবং যুবকদেহের পূর্ব্বে বালকদেহে সেই এক অতিরিক্ত আত্মাই অবস্থিত থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "দেহভেদাৎ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। তাঁহার মতে বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি-বিশিষ্ট দেহভেদ বিচারপূর্ব্বক প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মার পূর্ব্বে অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যার্থ। আত্মা দেহবিশেষের পরেও, অর্থাৎ দেহত্যাগ বা মৃত্যুর পরেও থাকে, ইহা সিদ্ধ হইলে আত্মার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম সিদ্ধ হইবে। তাহার ফলে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, পরলোকাদি সমস্তই সিদ্ধ হইবে এবং আত্মা নিত্য, কি অনিত্য, এই সংশয় নিরস্ত হইয়া যাইবে। ভাষ্যকার এইজন্য এখানে ঐ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া উহার প্রমাণ প্রশ্নপূর্ব্বক মহর্ষিসূত্রের দ্বারা ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে যে সুখের অনুভব হয়, তাহার নাম হর্ষ। অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা বিয়োগ জন্য যে দুঃখের অনুভব হয়, তাহার নাম শোক। ইষ্টসাধন বলিয়া না বুঝিলে কোন বিষয়ে অভিলাষ

১। ভাষ্যং "দেহভেদা"দিতি, ল্যব্ লোপে পঞ্চমী। বাল্য-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধকদেহভেদমভিসমীক্ষ্য প্রতিসন্ধানাদস্যাবস্থানং সিদ্ধমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

হয় না। যে জাতীয় বস্তুর প্রাপ্তিতে পূর্ব্বে সুখানুভব হইয়াছে, সেই জাতীয় বস্তুতেই ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান হইতে পারে ও হইয়া থাকে। "আমি যে জাতীয় বস্তুকে পূর্ব্বে আমার ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই বস্তুও সেই জাতীয়," এইরূপ বোধ হইলে অনুমান দ্বারা তদ্বিষয়ে ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান জন্মে, পরে তদ্বিষয়ে অভিলাষ জন্মে; অভিলষিত সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলে হর্ষ জন্মিয়া থাকে। এইরূপ অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে সেই বিষয়ের স্মরণজন্য শোক বা দুঃখ জন্মে। নবজাত শিশু ইহজন্মে কোন বস্তুকে ইষ্টসাধন বলিয়া অনুভব করে নাই, কিন্তু তথাপি অনেক বস্তুর প্রাপ্তিতে উহার হর্ষ এবং অপ্রাপ্তিতে শোক জন্মিয়া থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং নবজাত শিশুর ঐ হর্ষ ও শোক অবশ্য সেই সেই পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে সকল বিষয় বা পদার্থ পূর্ব্বে অনেকবার অনুভূত হইয়াছে, তাহাই এখানে পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়। পূর্ব্বানুভব জন্য সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, ঐ সংস্কার জন্য তদ্বিষয়ের অনুস্মরণ বা পশ্চাৎস্মরণ হয়, তাহাকে "স্মৃত্যনুবন্ধ" বলা যায়। বার্ত্তিককার এখানে "অনুবন্ধ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সংস্কার। স্মরণ সংস্কার জন্য। সংস্কার পূর্ব্বানুভব জন্য। নবজাত শিশুর ইহজন্মে প্রথমে সেই সেই বিষয়ের অনুভব না হওয়ায়, ইহজন্মে তাহার সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস বা অনুভব জন্য সংস্কারবশতঃ সেই সেই বিষয়ের অনুস্মরণ হওয়ায়, তাহার হর্ষ ও শোক হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ নবজাত শিশুর নানা প্রকার ভয়ের দ্বারাও তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অনুমিত হইয়া থাকে। কোন্ জাতীয় বস্তু হর্ষ, ভয় ও শোকের হেতু, ইহা ইহজন্মে তাহার অজ্ঞাত থাকিলেও হর্ষাদি হওয়ায়, পূর্ব্বজন্মের অনুভব জন্য সংস্কার ও তজ্জন্য সেই সেই বিষয়ের স্মরণাত্মক জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায়, পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হইবে। কারণ, পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে পূর্ব্বানুভব হইতে পারে না। পূর্ব্বানুভব ব্যতীতও সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার ব্যতীতও স্মরণ হইতে পারে না। নবজাত শিশুর ভয়ের ব্যাখ্যা করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, মাতার ক্রোড়স্থ শিশু কদাচিৎ আলম্বনশূন্য হইয়া স্খলিত হইতে হইতে রোদনপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে হস্তদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার কণ্ঠস্থিত হৃদয়লম্বিত মঙ্গলসূত্র গ্রহণ করে। শিশুর এই চেষ্টার দ্বারা তাহার ভয় ও শোক অনুমিত হয়। শিশু ইহজন্মে যখন পূর্ব্বে একবারও ক্রোড় হইতে পতিত হইয়া ঐরূপ পতনের অনিষ্টসাধনত্ব অনুভব করে নাই, তখন প্রথমে মাতার ক্রোড় হইতে পতনভয়ে তাহার উক্তরূপ চেষ্টা কেন হইয়া থাকে? পতিত হইলে তাহার মরণ বা কোনরূপ অনিষ্ট হইবে, এইরূপ জ্ঞান ভিন্ন শিশুর রোদন বা উক্তরূপ চেষ্টা কিছুতেই হইতে পারে না। অতএব তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মানুভূত পতনের অনিষ্টকারিতাই অস্ফুটভাবে তাহার স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শিশুর যে হর্ষ, ভয় ও শোক জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতে ভাষ্যকার ঐ তিনটিকে "লিঙ্গানুমেয়" বলিয়াছেন। অর্থাৎ যথাক্রমে স্মিত, কম্প ও রোদন—এই তিনটি লিঙ্গের দ্বারা শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক অনুমানসিদ্ধ। যৌবনাদি অবস্থায় হর্ষ হইলে স্মিত হয়, দেখা যায়; সুতরাং শিশুর স্মিত বা ঈষৎ হাস্য দেখিলে

তদ্দ্বারা তাহারও হর্ষ অনুমিত হইবে। এইরূপ শিশুর কম্প দেখিলে তাহার ভয় এবং রোদন শুনিলে তাহার শোকও অনুমিত হইবে। স্মিত, কম্প ও রোদন আত্মার ধর্ম্ম নহে, সুতরাং উহা আত্মার হর্ষাদির সাধক লিঙ্গ বা হেতু হইতে পারে না। বার্ত্তিককার এইরূপ আশঙ্কার সমর্থন করিয়া বাল্যাবস্থাকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্মিত-কম্পাদি হেতুর দ্বারা হর্ষাদিবিশিষ্ট আত্মবত্ত্বের অনুমান করিয়া, ঐ আশঙ্কার সমাধান করিয়াছেন[১] ॥ ১৮ ॥

সূত্র। পদ্মাদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকারবত্তদ্বিকারঃ ॥ ॥ ১৯ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) পদ্মাদিতে প্রবোধ (বিকাস) ও সম্মীলন (সঙ্কোচ)-রূপ বিকারের ন্যায়—সেই আত্মার (হর্ষাদিপ্রাপ্তিরূপ) বিকার হয়।

ভাষ্য। যথা পদ্মাদিষ্বনিত্যেষু প্রবোধঃ সম্মীলনং বিকারো ভবতি, এবমনিত্যস্যাত্মনো হর্ষ-ভয়-শোকসংপ্রতিপত্তির্ব্বিকারঃ স্যাৎ।

হেত্বভাবাদযুক্তম্। অনেন হেতুনা পদ্মাদিষু প্রবোধসম্মীলন-বিকারবদনিত্যস্যাত্মনো হর্ষাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি নাত্রোদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুর্ন চ বৈধর্ম্ম্যাদস্তি। হেত্বভাবাদসম্বন্ধার্থকমপার্থক-মুচ্যত ইতি। **দৃষ্টান্তাচ্চ হর্ষাদিনিমিত্তস্যানিবৃত্তিঃ।** যা চেয়-মাসেবিতেষু বিষয়েষু হর্ষাদিসম্প্রতিপত্তিঃ স্মৃত্যনুবন্ধকৃতা প্রত্যাত্মং গৃহ্যতে, সেয়ং পদ্মাদিপ্রবোধসম্মীলনদৃষ্টান্তেন ন নিবর্ত্ততে যথা চেয়ং ন নিবর্ত্ততে তথা জাতস্যাপীতি। ক্রিয়াজাতৌ চ পর্ণবিভাগসংযোগৌ[২]

১। বাল্যাবস্থা হর্ষাদিমদাত্মবতী, স্মিতকম্পাদিমত্ত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ। বাল্যাবস্থা বয়োধর্ম্মে যৌবনাবস্থাবৎ। এবং বাল্যাবস্থা স্মৃতিমদাত্মবতী, হর্ষাদিমদাত্মবত্ত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ। এবং বাল্যাবস্থা সংস্কারবদাত্মবতী স্মৃতিমদাত্মবত্ত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ। এবং বাল্যাবস্থা পূর্ব্বানুভববদাত্মবতী সংস্কারবদাত্মবত্ত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ। এবং বাল্যাবস্থা পূর্ব্বশরীর-সম্বন্ধবদাত্মবতী, পূর্ব্বানুভববদাত্মবত্ত্বাৎ যৌবনাবস্থাবৎ, ইত্যেবমনুমানপ্রয়োগাঃ।

২। এখানে প্রচলিত ভাষ্য পুস্তকগুলিতে (১) "ক্রিয়া জাতশ্চ পর্ণবিভাগঃ সংযোগঃ প্রবোধসম্মীলনে" (২) সংযোগপ্রবোধসম্মীলনে"। (৩) "সংযোগপ্রবোধঃ সম্মীলনে"। (৪) "ক্রিয়াজাতাশ্চ পর্ণসংযোগ-বিভাগাঃ প্রবোধসম্মীলনে," এইরূপ বিভিন্ন পাঠ আছে। কিন্তু উহার কোন পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝা যায় না। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাৎস্যায়ন ভাষ্য পুস্তকের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ মহামনীষী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সর্ব্বত্র প্রচলিত পাঠবিশেষ গ্রহণ করিলেও এখানে নিম্ন টিপ্পনীতে উল্লিখিত নূতন পাঠই সাধু বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায়, তদনুসারে মূলে তাঁহার উদ্ভাবিত পাঠই পরিগৃহীত হইল। সুধীগণ প্রচলিত পাঠের ব্যাখ্যা করিবেন।

প্রবোধসম্মীলনে, ক্রিয়াহেতুশ্চ ক্রিয়ানুমেয়ঃ। এবঞ্চ সতি কিং দৃষ্টান্তেন প্রতিষিধ্যতে।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যেমন পদ্ম প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ (বিকাস ও সংকোচরূপ) বিকার হয়, এইরূপ অনিত্য আত্মার হর্ষ, ভয় ও শোক-প্রাপ্তিরূপ বিকার হয়।

(উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, এই হেতু বশতঃ পদ্মাদিতে বিকাস ও সংকোচরূপ বিকারের ন্যায় অনিত্য আত্মার হর্ষাদি প্রাপ্তি হয়। এই স্থলে উদাহরণের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু নাই, এবং উদাহরণের বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতুও নাই। হেতু না থাকায় অসম্বদ্ধার্থ "অপার্থক" (বাক্য) বলা হইয়াছে, [অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুশূন্য ঐ দৃষ্টান্তবাক্য অভিমতার্থ-বোধক না হওয়ায়, উহা অপার্থক বাক্য]।

দৃষ্টান্তবশতঃ ও হর্ষাদির কারণের নিবৃত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিষয়-সমূহ আসেবিত (উপভুক্ত) হইলে, অনুস্মরণ জন্য এই যে হর্ষাদির প্রাপ্তি প্রত্যেক আত্মায় গৃহীত হইতেছে, সেই এই হর্ষাদিপ্রাপ্তি পদ্মাদির প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। ইহা যেমন (যুবকাদির সম্বন্ধে) নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ শিশুর সম্বন্ধেও নিবৃত্ত হয় না। ক্রিয়ার দ্বারা জাত পত্রের বিভাগ ও সংযোগ (যথাক্রমে) প্রবোধ ও সম্মীলন। ক্রিয়ার হেতুও ক্রিয়ার দ্বারা অনুমেয়। এইরূপ হইলে (পূর্ব্বপক্ষবাদীর) দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রতিষিদ্ধ হইবে ?

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আত্মার অনিত্যত্ববাদী নাস্তিক পূর্ব্বপক্ষীর কথা বলিয়াছেন যে, যেমন পদ্মাদি অনিত্য দ্রব্যের সংকোচ-বিকাশাদি বিকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনিত্য আত্মার হর্ষাদি প্রাপ্তি ও তাহার বিকার হইতে পারে। সুতরাং উহার দ্বারা আত্মার পূর্ব্ব-জন্ম বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, উহা নিত্যত্বসাধনে ব্যভিচারী। মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্র দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূক্ষ্মবিচার করিয়া এখানেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার অযুক্তত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত সাধ্য-সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি পদ্মাদির সংকোচ-বিকাসাদি বিকাররূপ দৃষ্টান্তকে তাঁহার সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাধর্ম্ম্য হেতু বা বৈধর্ম্ম্য হেতু বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী কোন হেতুই বলেন নাই, কেবল দৃষ্টান্তমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং হেতুশূন্য ঐ দৃষ্টান্ত আত্মার বিকার বা অনিত্যত্বাদির সাধক হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুশূন্য ঐ দৃষ্টান্তবাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অসম্বদ্ধার্থ হওয়ায়, "অপার্থক" হইয়াছে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্যই পূর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কেবল ঐ দৃষ্টান্তবশতঃ হর্ষ-শোকাদির দৃষ্ট কারণের প্রত্যাখ্যান করা যায় না। প্রত্যেক আত্মাতে উপভুক্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য যে হর্ষাদি প্রাপ্তি বুঝা যায়, তাহা পদ্মাদির বিকাস-সংকোচাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত বা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য হর্ষাদি প্রাপ্তি যেমন সর্ব্বসম্মতঃ, উহা কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা খণ্ডন করা যায় না, তদ্রূপ নবজাত শিশুরও হর্ষাদি প্রাপ্তিকে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা যুবকাদির হর্ষাদি স্থলে যে কারণ দৃষ্ট বা সর্ব্বসিদ্ধ, তাহার অপলাপ করা যায় না। সর্ব্বত্র হর্ষাদির কারণ ঐরূপই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্ষ-শোকাদি হইলে স্মিত ও রোদনাদি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং স্মিত-রোদনাদি হর্ষ-শোকাদি কারণ জন্য, ইহা স্বীকার্য্য। স্মিত রোদনাদির প্রতি যাহা কারণরূপে সিদ্ধ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিষ্প্রমাণ অপ্রসিদ্ধ কোন কারণান্তর কল্পনা সমীচীন হইতে পারে না। যুবক প্রভৃতির স্মিত রোদনাদি যে কারণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদি সে কারণে হয় না, অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হইয়া থাকে, এইরূপ কল্পনাও প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষদৃষ্ট না হইলেও ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়া হেতুর এবং ক্রিয়ার নিয়মের দ্বারা ঐ ক্রিয়া-নিয়মের হেতুর অনুমান হইবে। পদ্মাদি যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন পদ্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য ক্রমশঃ পত্রের বিভাগ হইয়া থাকে, এ বিভাগকেই পদ্মাদির প্রবোধ বা বিকাশ বলে এবং পদ্মাদি যখন সংমীলিত বা সঙ্কুচিত হয়, তখন আবার ঐ পদ্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য ঐ পত্রগুলির পরস্পর সংযোগ হইয়া থাকে। ঐ সংযোগকেই পদ্মাদির সম্মীলন বা সংকোচ বলে। ঐ উভয় স্থলেই পত্রের ক্রিয়া হওয়ায়, তদ্দ্বারা ঐ ক্রিয়ার হেতু অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমিত হইবে। নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদিও ক্রিয়া, তদ্দ্বারাও তাহার হেতু অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই। যুবকাদির স্মিত-রোদনাদির কারণরূপে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, নবজাত শিশুর স্মিত-রোদনাদি ক্রিয়ার দ্বারাও তাহার ঐরূপ কারণই অনুমিত হইবে, অন্য কোনরূপ কারণের অনুমান অমূলক ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। অথ নির্নিমিত্তঃ পদ্মাদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকার ইতি মত-মেবমাত্মনোঽপি হর্ষাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি তচ্চ—

অনুবাদ। যদি বল পদ্মাদিতে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ বিকার নির্নিমিত্ত, অর্থাৎ উহা বিনা কারণেই হয়, ইহা (আমার) মত, এইরূপ আত্মারও হর্ষাদি প্রাপ্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ বিনা কারণেই হয়,—

সূত্র। নোষ্ণ-শীত-বর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মক-বিকারাণাম্ ॥২০॥২১৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) তাহাও নহে, যেহেতু পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক পদ্মাদির বিকারের উষ্ণ শীত ও বর্ষাকাল নিমিত্তকত্ব আছে।

ভাষ্য। উষ্ণাদিষু সৎসু ভাবাৎ অসৎসু অভাবাৎ তন্নিমিত্তাঃ পঞ্চভূতানুগ্রহেণ নির্ব্বৃত্তানাং পদ্মাদীনাং প্রবোধসম্মীলন-বিকারা ইতি ন নির্নিমিত্তাঃ। এবং হর্ষাদয়োঽপি বিকারা নিমিত্তাদ্ভবিতুমর্হন্তি, ন নিমিত্তমন্তরেণ। ন চান্যৎ পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধান্নিমিত্তমস্তীতি। ন চোৎপত্তিনিরোধকারণানুমানমাত্মনো দৃষ্টান্তাৎ। ন হর্ষাদীনাং* নিমিত্তমন্তরেণোৎপত্তিঃ, নোষ্ণাদিবন্নিমিত্তান্তরোপাদানং হর্ষাদীনাং, তস্মাদযুক্তমেতৎ।

অনুবাদ। উষ্ণ প্রভৃতি থাকিলে হয়, না থাকিলে হয় না; এজন্য পঞ্চভূতের অনুগ্রহবশতঃ (মিলনবশতঃ) উৎপন্ন পদ্মাদির বিকাস-সঙ্কোচাদি বিকারসমূহ তন্নিমিত্তক, অর্থাৎ উষ্ণাদি কারণ জন্য, সুতরাং নির্নিমিত্তক নহে এবং হর্ষাদি বিকারসমূহও নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ হইতে ভিন্ন কোন নিমিত্তও নাই। দৃষ্টান্ত বশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের অনুমানও হয় না। হর্ষাদির নিমিত্ত ব্যতীত উৎপত্তি হয় না। উষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় হর্ষাদির নিমিত্তান্তরের গ্রহণ হইতে পারে না, [অর্থাৎ উষ্ণ প্রভৃতি যেমন পদ্মাদির বিকারের নিমিত্ত, তদ্রূপ নবজাত শিশুর হর্ষাদিতেও ঐরূপ কোন কারণান্তর আছে, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ উহাতে কারণ নহে, ইহাও বলা যায় না।] অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত অভিমত অযুক্ত।

টিপ্পনী। পদ্মাদির সংকোচ-বিকাসাদি বিকার বিনা কারণেই হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মারও হর্ষাদি বিকার বিনা কারণেই জন্মে, ইহাই যদি পূর্ব্বসূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত হয়, তদুত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষির এই উত্তর সূত্রের অবতারণা করিয়া তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উষ্ণাদি থাকিলেই পদ্মাদির বিকাসাদি হয়; উষ্ণাদি না থাকিলে ঐ বিকাসাদি হয় না, সুতরাং পদ্মাদির বিকাসাদি উষ্ণাদি কারণজন্য, উহা নিষ্কারণ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। অকস্মাৎ পদ্মের বিকাস হইলে রাত্রিতেও উহা হইতে পারে। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের নিম্নস্থ পদ্মের সংকোচ কেন হয় না? ফলকথা, পদ্মাদির বিকাসাদি অকস্মাৎ বিনাকারণেই হয়, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে হর্ষ-শোকাদি বিকারও অকস্মাৎ বিনাকারণেই হইয়া থাকে, উহাতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ অনাবশ্যক, সুতরাং নবজাত শিশুর পূর্ব্বজন্ম স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই, এ কথাও

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন না। পরন্তু হর্ষ-শোকাদি বিকার কারণ ব্যতীত হইতে পারে না, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ দ্বারাও উহা হইতে পারে না। উষ্ণাদির ন্যায় হর্ষ-শোকাদির কারণও কোন জড়ধর্ম্ম আছে, ইহাও প্রমাণাভাবে বলা যায় না। পরন্তু যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্ষ-শোকাদি যেরূপ কারণে জন্মিয়া থাকে, নবজাত শিশুরও হর্ষ-শোকাদি সেইরূপ কারণেই, অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণাদি কারণেই হইয়া থাকে, ইহাই কার্য্যকারণ-ভাবমূলক অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ অভিমত অযুক্ত বা নিষ্প্রমাণ। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, যাহা বিকারী, তাহা উৎপত্তিবিনাশশালী, যেমন পদ্ম; আত্মাও বিকারী, সুতরাং আত্মাও উৎপত্তিবিনাশশালী, এইরূপে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ বা অনিত্যত্বের অনুমান করাই (পূর্ব্বসূত্রে) আমার উদ্দেশ্য। এজন্য ভাষ্যকার এখানে ঐ পক্ষেরও প্রতিষেধ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বসূত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ পক্ষের উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা অমূর্ত্ত দ্রব্য। সুতরাং সর্ব্বদা অমূর্ত্ত দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায়, আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পারে না। পরন্তু আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার কারণ বলিতে হইবে। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেহাদি ভিন্ন অমূর্ত্ত আত্মার কারণ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ হর্ষ-শোকাদি আত্মার গুণ হইলেও তদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপের অন্যথা না হওয়ায়, উহাকে আত্মার বিকার বলা যায় না। সুতরাং তদ্দ্বারা আত্মার উৎপত্তি-বিনাশের অনুমান হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, যদি কোন ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের উৎপত্তিকেই বিকার বলা যায়, তাহা হইলে শব্দের উৎপত্তিও আকাশের বিকার হইতে পারে। তাহা হইলে ঐ বিকাররূপ হেতু আকাশে থাকায়, উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে। কারণ, আকাশের নিত্যত্বই ন্যায়সিদ্ধান্ত। পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীই পদ্মাদির উপাদান-কারণ; জলাদি চতুষ্টয় নিমিত্তকারণ,—এই সিদ্ধান্ত পরে পাওয়া যাইবে। পদ্মাদি কোন দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক হইতে পারে না, এজন্য ভাষ্যকার সূত্রস্থ "পঞ্চাত্মক" শব্দের ব্যাখ্যায় পঞ্চভূতের অনুগ্রহে বা সাহায্যে উৎপন্ন, এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। বার্ত্তিককারও পঞ্চাত্মক কিছুই হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকারের ব্যাখ্যারই সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পঞ্চভূতের দ্বারা যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়,—এইরূপ অর্থে মহর্ষি "পঞ্চাত্মক" শব্দের প্রয়োগ করিলে, উহার দ্বারা পাঞ্চভৌতিক বা পঞ্চভূতনিষ্পন্ন, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইলে উষ্ণাদি নিমিত্তবশতঃ তাহার নানারূপ বিকার হইতে পারে ও হইয়া থাকে। আত্মা ঐরূপ পদার্থ না হওয়ায়, তাহার কোনরূপ বিকার হইতে পারে না—ইহাই মহর্ষি "পঞ্চাত্মক" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকারের শেষোক্ত "তচ্চ" এই কথার সহিত সূত্রের আদিস্থ "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। ইতশ্চ নিত্য আত্মা—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্মা নিত্য।

সূত্র। প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ ॥ ॥২১॥২১৯॥

অনুবাদ। যেহেতু পূর্ব্বজন্মে আহারের অভ্যাসজনিত (নবজাত শিশুর) স্তন্যাভিলাষ হয়।

ভাষ্য। জাতমাত্রস্য বৎসস্য প্রবৃত্তিলিঙ্গঃ স্তন্যাভিলাষো গৃহ্যতে, স চ নান্তরেণাহারাভ্যাসং। কয়া যুক্ত্যা? দৃশ্যতে হি শরীরিণাং ক্ষুধা-পীড্যমানানামাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্মরণানুবন্ধাদাহারাভিলাষঃ। ন চ পূর্ব্ব-শরীরাভ্যাসমন্তরেণাসৌ জাতমাত্রস্যোপপদ্যতে। তেনানুমীয়তে ভূতপূর্ব্বং শরীরং, যত্রানেনাহারোঽভ্যস্ত ইতি। স খল্বয়মাত্মা পূর্ব্বশরীরাৎ প্রেত্য শরীরান্তরমাপন্নঃ ক্ষুৎপীড়িতঃ পূর্ব্বাভ্যস্তমাহারমনুস্মরন্ স্তন্যমভিলষতি। তস্মান্ন দেহভেদাদাত্মা ভিদ্যতে, ভবত্যেবোর্দ্ধং দেহভেদাদিতি।

অনুবাদ। জাতমাত্র বৎসের প্রবৃত্তিলিঙ্গ (প্রবৃত্তি যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক) স্তন্যাভিলাষ বুঝা যায়, সেই স্তন্যাভিলাষ কিন্তু আহারের অভ্যাস ব্যতীত হয় না। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ? (উত্তর) যেহেতু ক্ষুধার দ্বারা পীড্যমান প্রাণীদিগের আহারের অভ্যাসজনিত স্মরণানুবন্ধ জন্য, অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত পদার্থের অনুস্মরণ জন্য আহারের অভিলাষ দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্বশরীরে অভ্যাস ব্যতীত জাতমাত্র বৎসের এই আহারাভিলাষ উপপন্ন হয় না। তদ্দ্বারা অর্থাৎ জাতমাত্র বৎসের পূর্ব্বোক্ত আহারাভিলাষের দ্বারা (তাহার) ভূতপূর্ব্ব শরীর অনুমিত হয়, যে শরীরের দ্বারা এই জাতমাত্র বৎস আহার অভ্যাস করিয়াছিল। সেই এই আত্মাই পূর্ব্বশরীর হইতে প্রেত (বিযুক্ত) হইয়া, শরীরান্তর লাভ করিয়া, ক্ষুধাপীড়িত হইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারকে অনুস্মরণ করতঃ স্তন্য অভিলাষ করে। অতএব আত্মা দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন হয় না। দেহ-বিশেষের ঊর্দ্ধ কালেও অর্থাৎ সেই দেহ ত্যাগের পরে অপর দেহ লাভ করিয়াও (সেই আত্মা) থাকেই।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথমে নবজাত শিশুর হর্ষ-শোকাদির দ্বারা সামান্যতঃ আত্মার ইচ্ছা সিদ্ধ করিয়া নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। এই সূত্রের দ্বারা নবজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষকে বিশেষ হেতু-

রূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সুতরাং মহর্ষির এই সূত্র ব্যর্থ নহে। নবজাত শিশুর সর্ব্বপ্রথম যে স্তন্যপানে প্রবৃত্তি, তদ্দ্বারা তাহার স্তন্যাভিলাষ সিদ্ধ হয়। কারণ, স্তন্যপানে অভিলাষ বা ইচ্ছা ব্যতীত কখনই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; প্রবৃত্তির কারণ ইচ্ছা, ইহা সর্ব্বসম্মত, সুতরাং ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা স্তন্যাভিলাষ অনুমিত হওয়ায়, উহাকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "প্রবৃত্তিলিঙ্গ"। ঐ স্তন্যাভিলাষ আহারের অভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না, এই বিষয়ে যুক্তি বা অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণিমাত্রই ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইলে আহারে অভিলাষী হয়, ঐ অভিলাষ পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। কারণ, ক্ষুধাকালে আহারের পূর্ব্বাভ্যাস ও তজ্জনিত সংস্কারবশতঃই আহার ক্ষুধানিবৃত্তির কারণ, ইহা সকলেরই স্মৃতির বিষয় হয়। সুতরাং ক্ষুৎপীড়িত জীবের আহারের অভিলাষ হইয়া থাকে। জাতমাত্র বালকের স্তন্যপানে প্রথম অভিলাষ ও ঐরূপ কারণেই হইবে। যৌবনাদি অবস্থায় আহারাভিলাষ যেমন বাল্যাবস্থার আহারাভ্যাসমূলক, তদ্রূপ নবজাত শিশুর স্তন্যপানে অভিলাষও তাহার পূর্ব্বাভ্যাসমূলক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ উহা হইতেই পারে না। কিন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যাভিলাষের মূল পূর্ব্বাভ্যাস বা পূর্ব্বকৃত স্তন্যপানাদি ইহজন্মে হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্বজন্মকৃত আহারাভ্যাসবশতঃই তদ্বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য তাহার স্তন্যপানে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। মূলকথা, জাতমাত্র বালকের স্তন্যাভিলাষের দ্বারা "স্তন্যপান আমার ইষ্টসাধন"—এইরূপ অনুস্মরণ এবং ঐ অনুস্মরণ দ্বারা তদ্বিষয়ক পূর্ব্বানুভব ও তদ্দ্বারা ঐ বালকের পূর্ব্বশরীরসম্বন্ধ বা পূর্ব্বজন্ম অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। তাই উপসংহারে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "আত্মা দেহভেদাৎ (দেহভেদং প্রাপ্য) ন ভিদ্যতে", অর্থাৎ নবজাত বালকের দেহগত আত্মা তাহার পূর্ব্বপূর্ব্ব দেহগত আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। পূর্ব্বদেহগত আত্মাই শরীরান্তর লাভ করিয়া ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারকে পূর্ব্বোক্তরূপে অনুস্মরণ করতঃ স্তন্যপানে অভিলাষী হইয়া থাকে। দেহত্যাগের পরে অপর দেহেও সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত আত্মাই থাকে।

মহর্ষি এই সূত্রে কেবল মানবের স্তন্যাভিলাষ বা আহারাভিলাষকেই গ্রহণ করেন নাই। সর্ব্বপ্রাণীর আহারাভিলাষই এখানে তাঁহার অভিপ্রেত। কোন কোন সময়ে রাত্রিকালে নির্জ্জন গৃহে গোবৎস প্রসূত হয়। পরদিন প্রত্যূষে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গোবৎস বার বার মুখ দ্বারা মাতৃস্তন ঊর্দ্ধে প্রতিহত করিয়া স্তন্যপান করিতেছে। সুতরাং সেখানে ঐরূপ প্রতিঘাত করিলে স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, ইহা ঐ নবপ্রসূত গোবৎস জানিতে পারিয়াছে, তাহার তখন ঐরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু মাতৃস্তনে দুগ্ধ আছে এবং উহাতে প্রতিঘাত করিলে, উহা হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, এবং সেই দুগ্ধপান তাহার ক্ষুধার নিবর্ত্তক, এ সমস্ত সেই গোবৎস তখন কিরূপে জানিতে পারিল? মাতৃস্তনই বা কিরূপে চিনিতে পারিল? এখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মানুভূত ঐ সমস্ত তাহার স্মৃতির বিষয় হওয়াতেই তাহার ঐরূপ

প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য। অন্য কোনরূপ কারণের দ্বারা উহা হইতে পারে না। জাতমাত্র বালকের জীবন রক্ষার জন্য তৎকালে ঈশ্বরই তাহাকে ঐরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, এইরূপ কল্পনা করা যায় না। কারণ, ঈশ্বর কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া জীবের কিছুই করেন না, ইহা স্বীকার্য্য। কোন সময়ে দুষ্ট স্তন্য পান করিয়া বা বিষলিপ্ত স্তন চোষণ করিয়া শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়। ঈশ্বর তখন শিশুর কর্ম্মফলকে অপেক্ষা না করিয়া তাহার জীবননাশের জন্য তাহাকে ঐরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, ইহা অশ্রদ্ধেয়। কর্ম্মফল স্বীকার করিলে আত্মার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণে শিশু স্তন্যপান করে, স্তন চোষণ করে। স্তন্য দুষ্ট বা স্তন বিষলিপ্ত হইলে শিশুর অনিষ্ট হয়, ইহাই সর্ব্বথা সমীচীন কল্পনা। আমাদের পূর্ব্বাভ্যাস ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলবশতঃ যে সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরকে তজ্জন্য দায়ী করা নিতান্তই অসঙ্গত। সাধারণ মনুষ্য যেমন সদুদ্দেশ্যে ভাল কার্য্য করিতে যাইয়া বুদ্ধি বা শক্তির অল্পতাবশতঃ অনিষ্ট সংঘটন করিয়া বসে, জগদীশ্বরও সেইরূপ শিশুর জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার জীবনান্ত করেন, এইরূপ কল্পনার সমালোচনা করা অনাবশ্যক।

প্রতীচ্যগণ যাহাই বলুন, প্রাচ্যভাবে জিজ্ঞাসু হইয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত মনন করিলে, বেদমূলক পূর্ব্বোক্তরূপ আর্ষসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া বলিতেই হইবে যে, অনাদি সংসারে অনাদিকাল হইতে জীব অনন্ত যোনিভ্রমণ করিতেছে এবং অনন্ত বিচিত্র ভোগাদি সমাপন করিয়া তজ্জন্য অনন্ত বিচিত্র বাসনা বা সংস্কার সঞ্চয় করিয়াছে। অনন্ত বিচিত্র সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও জীব নিজ কর্ম্মানুসারে যখন যে দেহ পরিগ্রহ করে, তখন ঐ কর্ম্মের বিপাকবশতঃ তাহার তদনুরূপ সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয়, অন্যবিধ সংস্কার অভিভূত থাকে। মনুষ্য কর্ম্মানুসারে বিড়ালশরীর প্রাপ্ত হইলে, তাহার বহুজন্মের পূর্ব্বকালীন বিড়ালদেহে প্রাপ্ত সেই সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেক স্থলে অদৃষ্টবিশেষই সংস্কারের উদ্বোধক হইয়া স্মৃতির নির্ব্বাহক হয়। জাতমাত্র বালকের জীবনরক্ষক অদৃষ্টবিশেষই তৎকালে তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হয়। অন্যান্য সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত না হওয়ায়, তৎকালে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মানুভূত অন্যান্য বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। যোগবিশেষের দ্বারা সমস্ত জন্মের সংস্কার-রাশির উদ্বোধ করিতে পারিলে, তখন সমস্ত জন্মানুভূত সর্ব্ববিষয়েরই স্মরণ হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব নহে। যোগশাস্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণাদি পাওয়া যায়। প্রতীচ্যগণ আত্মার পূর্ব্বজন্মাদি সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও যোনিভ্রমণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ॥ ২১ ॥

সূত্র। অয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবৎ তদুপসর্পণম্ ॥ ॥২২॥২২০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) লৌহের অয়স্কান্তমণির অভিমুখে গমনের ন্যায়, তাহার উপসর্পণ অর্থাৎ জাতমাত্র বালকের মাতৃস্তনের সমীপে গমন হয়।

ভাষ্য। যথা খল্বয়োঽভ্যাসমন্তরেণায়স্কান্তমুপসর্পতি, এবমাহারাভ্যাসমন্তরেণ বালঃ স্তন্যমভিলষতি।

অনুবাদ। যেমন লৌহ অভ্যাস ব্যতীতও অয়স্কান্ত মণিকে (চুম্বক) উপসর্পণ করে, এইরূপ আহারের অভ্যাস ব্যতীতও বালক স্তন্য অভিলাষ করে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির প্রতি পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ কারণ নহে। কারণ, পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীতও লৌহের অয়স্কান্তের অভিমুখে গমন দেখা যায়। এইরূপ বস্তুশক্তিবশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসাদি ব্যতীতও নবজাত শিশুর মাতৃস্তনের অভিমুখে গমনাদি হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমাত্র পূর্ব্বাভ্যাসাদির ব্যভিচারী। ঐ ব্যভিচার প্রদর্শনই এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষবাদীর উদ্দেশ্য ॥ ২২ ॥

ভাষ্য। কিমিদময়সোঽয়স্কান্তাভিসর্পণং নির্নিমিত্তমথ নিমিত্তাদিতি। নির্নিমিত্তং তাবৎ—

অনুবাদ। লৌহের এই অয়স্কান্তাভিগমন কি নিষ্কারণ? অথবা কারণবশতঃ?

সূত্র। নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ ॥২৩॥২২১॥

অনুবাদ। (উত্তর) নির্নিমিত্ত নহে, যেহেতু অন্যত্র অর্থাৎ লৌহভিন্ন বস্তুতে (ঐ) প্রবৃত্তি নাই।

ভাষ্য। যদি নির্নিমিত্তং? লোষ্টাদয়োঽপ্যয়স্কান্তমুপসর্পেয়ুর্ন জাতু নিয়মে কারণমস্তীতি। অথ নিমিত্তাৎ, তৎ কেনোপলভ্যত ইতি। ক্রিয়ালিঙ্গঃ ক্রিয়াহেতুঃ, ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গশ্চ ক্রিয়াহেতুনিয়মঃ, তেনান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবঃ, বালস্যাপি নিয়তমুপসর্পণং ক্রিয়োপলভ্যতে, ন চ স্তন্যাভিলাষলিঙ্গমন্যদাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্মরণানুবন্ধান্নিমিত্তং দৃষ্টান্তেনোপপাদ্যতে, ন চাসতি নিমিত্তে কস্যচিদুৎপত্তিঃ। ন চ দৃষ্টান্তো দৃষ্টমভিলাষহেতুং বাধতে, তস্মাদয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনমদৃষ্টান্ত ইতি।

অয়সঃ খল্বপি[১] নান্যত্র প্রবৃত্তির্ভবতি, ন জাত্বয়ো লোষ্টমুপসর্পতি, কিং কৃতোঽস্যানিয়ম ইতি। যদি কারণনিয়মাৎ? স চ ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গঃ

১। খল্বপীতি নিপাতসমুদায়ঃ কল্পান্তরং দ্যোতয়তি।—তাৎপর্য্যটীকা।

এবং বালস্যাপি নিয়তবিষয়োঽভিলাষঃ কারণনিয়মাদ্ভবিতুমর্হতি, তচ্চ কারণমভ্যস্তস্মরণমন্যদ্বেতি দৃষ্টেন বিশিষ্যতে। দৃষ্টো হি শরীরিণামভ্যস্ত-স্মরণাদাহারাভিলাষ ইতি।

অনুবাদ। যদি নির্নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ লৌহের অয়স্কান্তাভিমুখে গমন যদি বিনা-কারণেই হয়, তাহা হইলে লোষ্ট প্রভৃতিও অয়স্কান্তকে অভিগমন করুক? কখনও নিয়মে অর্থাৎ লৌহই অয়স্কান্তমণির অভিমুখে গমন করিবে, আর কোন বস্তু তাহা করিবে না, এইরূপ নিয়মে কারণ নাই। যদি নিমিত্তবশতঃ হয়, অর্থাৎ লৌহের অয়স্কান্তাভিমুখে গমন যদি কোন কারণবিশেষ জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহা কিসের দ্বারা উপলব্ধ হয়? ক্রিয়ার কারণ ক্রিয়ালিঙ্গ এবং ক্রিয়ার কারণের নিয়ম ক্রিয়ানিয়ম-লিঙ্গ [অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার কারণের এবং ঐ ক্রিয়ার নিয়মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়মের অনুমানরূপ উপলব্ধি হয়] অতএব অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না [অর্থাৎ অন্য পদার্থ লোষ্ট প্রভৃতিতে অয়স্কান্তাভিমুখে গমনরূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার) কারণ না থাকায়, তাহাতে ঐরূপ প্রবৃত্তি হয় না]।

বালকেরও নিয়ত উপসর্পণরূপ ক্রিয়া উপলব্ধ হয় [অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত শিশু ইহ-জন্মে আর কোন দিন স্তন্য পান না করিয়াও প্রথমে মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে; অন্য কিছুর অভিমুখে গমন করে না। তাহার এইরূপ নিয়মবদ্ধ উপসর্পণক্রিয়া প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ] কিন্তু আহারাভ্যাসজনিত স্মরণানুবন্ধ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের স্তন্য-পানাদির অভ্যাসমূলক তদ্বিষয়ক অনুস্মরণ ভিন্ন স্তন্যাভিলাষলিঙ্গ নিমিত্ত (নবজাত শিশুর সেই প্রথম স্তন্যপানের ইচ্ছা যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক, এমন কোন নিমিত্তান্তর) দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করা যায় না, নিমিত্ত (কারণ) না থাকিলেও কিছুরই উৎপত্তি হয় না, দৃষ্টান্ত ও অভিলাষের (স্তন্যাভিলাষের) দৃষ্ট কারণকে বাধিত করে না, অতএব লৌহের অয়স্কান্তাভিগমন দৃষ্টান্ত হয় না।

পরন্তু লৌহেরও অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না, কখনও লৌহ লোষ্টকে উপসর্পণ করে না, এই প্রবৃত্তির নিয়ম কি জন্য? যদি কারণের নিয়মবশতঃ হয় এবং সেই কারণ নিয়ম ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার নিয়ম যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক এমন কারণ-নিয়ম-প্রযুক্তই যদি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার) নিয়ম হয়, এইরূপ হইলে বালকেরও নিয়ত-বিষয়ক অভিলাষ (প্রথম স্তন্যাভিলাষ) কারণের নিয়মবশতঃই হইতে পারে,

সেই কারণও অভ্যস্তবিষয়ক স্মরণ অথবা অন্য, ইহা দৃষ্ট দ্বারা বিশিষ্ট হয়। যেহেতু শরীরীদিগের অভ্যস্তবিষয়ক স্মরণ বশতঃই আহারাভিলাষ দৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, লৌহের অয়স্কান্তের অভিমুখে গমন হইলেও লোষ্টাদির ঐরূপ প্রবৃত্তি (অয়স্কান্তাভিগমন) না হওয়ায়, লৌহের ঐরূপ প্রবৃত্তির কোন কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকারের মতে লৌহের অয়স্কান্তাভিগমন নিষ্কারণ বা আকস্মিক নহে, ইহাই মহর্ষি এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়া লৌহের ঐরূপ প্রবৃত্তির ন্যায় নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপান প্রবৃত্তিও অবশ্য তাহার কারণ জন্য, ইহা সূচনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়াছেন। এই সূত্রের অবতারণায় ভাষ্যকারের "নির্নিমিত্তং তাবৎ" এই শেষোক্ত বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। লৌহেরই অয়স্কান্তাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া জন্মে এবং লৌহের অয়স্কান্ত ভিন্ন লোষ্টাদির অভিমুখগমন রূপ ক্রিয়া জন্মে না, এইরূপ ক্রিয়া নিয়মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়ম বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্তরূপ ক্রিয়ার দ্বারা যেমন ঐ ক্রিয়ার কারণ আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্তরূপ ক্রিয়া নিয়মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়মও অনুমানসিদ্ধ হয়। সুতরাং লোষ্টাদিতে সেই নিয়ত কারণ না থাকায়, তাহাতে অয়স্কান্তাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি জন্মে না। এইরূপ নবজাত শিশু যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে, তখন তাহার ঐ নিয়ত উপসর্পণরূপ ক্রিয়ারও কোন নিয়ত কারণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। পূর্ব্বজন্মে আহারাভ্যাসজনিত সেই বিষয়ের অনুস্মরণ ভিন্ন আর কোন কারণেই তাহার ঐরূপ প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। নবজাত শিশুর ঐরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার যে স্তন্যাভিলাষ বুঝা যায়, তদ্দ্বারাও তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ কারণই অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী লৌহের অয়স্কান্তাভিগমনরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা নবজাত শিশুর সেই স্তন্যাভিলাষের অন্য কোন কারণ সমর্থন করিতে পারেন না। ঐ দৃষ্টান্ত সেই স্তন্যাভিলাষের দৃষ্ট কারণকে বাধিত করিতেও পারে না। সুতরাং কোনরূপেই উহা দৃষ্টান্তও হয় না। ভাষ্যকার পরে পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়াছেন যে, লৌহের কখনও লোষ্টাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি না হওয়ায়, ঐ প্রবৃত্তির ঐরূপ নিয়মও তাহার কারণের নিয়ম প্রযুক্তই হইবে। তাহা হইলে নবজাত শিশু যে সময়ে স্তন্যেরই অভিলাষ করে, তখন তাহার নিয়ত বিষয় ঐ অভিলাষও উহার কারণের নিয়মপ্রযুক্তই হইবে। সে কারণ কি হইবে, ইহা বিচার করিতে গেলে দৃষ্টানুসারে অভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণই উহার কারণরূপে নিশ্চয় করা যায়। কারণ, প্রাণি-মাত্রেরই আহারাভ্যাসজনিত অভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্যই আহারাভিলাষ হয়, ইহা দৃষ্ট। দৃষ্ট কারণ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট কোন কারণ কল্পনায় প্রমাণ নাই ॥ ২৩॥

ভাষ্য। ইতশ্চ নিত্য আত্মা, কস্মাৎ ?

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্মা নিত্য, (প্রশ্ন) কোন্ হেতুবশতঃ ?

সূত্র। বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ ॥২৪॥২২২॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু বীতরাগের (সর্ব্ববিষয়ে অভিলাষশূন্য প্রাণীর) জন্ম দেখা যায় না, অর্থাৎ রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মলাভ করে।

ভাষ্য। সরাগো জায়ত ইত্যর্থাদাপদ্যতে। অয়ং জায়মানো রাগানুবন্ধো জায়তে। রাগস্য পূর্ব্বানুভূতবিষয়ানুচিন্তনং যোনিঃ। পূর্ব্বানুভবশ্চ বিষয়াণামন্যস্মিন্ জন্মনি শরীরমন্তরেণ নোপপদ্যতে। সোঽয়মাত্মা পূর্ব্বশরীরানুভূতান্ বিষয়াননুস্মরন্ তেষু তেষু রজ্যতে, তথা চায়ং দ্বয়োর্জ্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধিঃ[1]। এবং পূর্ব্বশরীরস্য পূর্ব্বতরেণ পূর্ব্বতরশরীরস্য পূর্ব্বতমেনেত্যাদিনাঽনাদিশ্চেতনস্য শরীরযোগঃ, অনাদিশ্চ রাগানুবন্ধ ইতি সিদ্ধং নিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। রাগবিশিষ্টই জন্ম লাভ করে, ইহা (এই সূত্রের দ্বারা) অর্থতঃ বুঝা যায়। (অর্থাৎ) জায়মান এই জীব অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত জীব রাগযুক্তই জন্মগ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ রাগের যোনি, অর্থাৎ সেই বিষয়ে অভিলাষের উৎপাদক। বিষয়সমূহের পূর্ব্বানুভব কিন্তু অন্য জন্মে (পূর্ব্বজন্মে) শরীর ব্যতীত উপপন্ন হয় না। সেই এই আত্মা অর্থাৎ শরীর পরিগ্রহের পরে রাগযুক্ত আত্মা পূর্ব্বশরীরে অনুভূত

১। এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য অতি দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ "অয়ং আত্মা দ্বয়োর্জ্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধিঃ সম্বন্ধবান্" এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা এখানে সুসঙ্গত হইলেও "প্রতিসন্ধি" শব্দের ঐরূপ অর্থের প্রমাণ কি এবং এখানে ঐ শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। "বিশ্বকোষে" "প্রতিসন্ধি" শব্দের পুনর্জ্জন্ম অর্থ লিখিত হইয়াছে। পরন্তু, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নিজেও চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে "ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্য" এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "প্রতিসন্ধিস্তু পূর্ব্বজন্মনিবৃত্তৌ পুনর্জ্জন্ম।" সুতরাং এখানে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াই ভাষ্য ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। আত্মার বর্ত্তমান শরীরের পূর্ব্ব-শরীর সিদ্ধ করিয়া পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ করাই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য, বুঝা যায়। তাহা হইলে "দ্বয়োর্জ্জন্মনোঃ অয়ং প্রতিসন্ধিঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মার জন্মদ্বয় নিমিত্তক এই পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হয়, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। "দ্বয়োর্জ্জন্মনোঃ" এই স্থলে নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা জ্ঞাপকস্বরূপ নিমিত্ততা বুঝিলে আত্মার পূর্ব্বজন্ম ও বর্ত্তমান জন্ম এই জন্মদ্বয় আত্মার "প্রতিসন্ধির" (পুনর্জন্মের) জ্ঞাপক, ইহা বুঝা যাইতে পারে। একই আত্মার দুই জন্ম স্বীকার্য্য হইলে, তাহার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতেই হয়। আত্মার বর্ত্তমান জন্মে সর্ব্বপ্রথম রাগের উপপত্তির জন্য ইহার পূর্ব্বজন্ম অবশ্য সিদ্ধ হইলে, উভয় জন্মের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম বুঝা যায়। সুতরাং আত্মার ঐ জন্মদ্বয় তাহার পুনর্জ্জন্মের জ্ঞাপক, সন্দেহ নাই। সুধীগণ এখানে ভাষ্যার্থ চিন্তা করিবেন।

অনেক বিষয়কে অনুস্মরণ করতঃ সেই সেই (অনুস্মৃত) বিষয়ে রাগযুক্ত হয়। সেইরূপ হইলেই (আত্মার) তুই জন্ম নিমিত্তক এই "প্রতিসন্ধি" অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম (সিদ্ধ হয়)। এইরূপে পূর্ব্বশরীরের পূর্ব্বতর শরীরের সহিত, পূর্ব্বতর শরীরের পূর্ব্বতম শরীরের সহিত ইত্যাদি প্রকারে আত্মার শরীরসম্বন্ধ অনাদি এবং রাগসম্বন্ধ অনাদি, এ জন্য নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আত্মার শরীরসম্বন্ধ ও রাগসম্বন্ধের অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, বীতরাগ অর্থাৎ যাহার কোন দিন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা জন্মে না, এমন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না। মহর্ষির এই কথার দ্বারা রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে, ইহাই অর্থতঃ বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমে ইহাই বলিয়া মহর্ষির যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, বিলক্ষণ শরীরাদি সম্বন্ধই জন্ম। যে প্রাণীই ঐ জন্ম লাভ করে, তাহাকেই যে কোন সময়ে বিষয়বিশেষে রাগযুক্ত বুঝিতে পারা যায় এবং উহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সংসারবদ্ধ জীবের ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়ায় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়ে ইচ্ছা জন্মিবেই, নচেৎ তাহার জীবনরক্ষাই হইতে পারে না। কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ জন্মের অব্যবহিত পরে অনেক জীবের রাগাদির উৎপত্তি না হইলেও তাহার জীবন থাকিলে কালে ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়ায় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়ে রাগ অবশ্যই জন্মিবে। নবজাত শিশু প্রথমে স্তন্য বা অন্য দুগ্ধ পান না করিলেও প্রথমে তাহার মুখে মধু দিলে সাগ্রহে ঐ মধু লেহন করে, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং নবজাত শিশুর যে সময়েই কোন বিষয়ে প্রথম অভিলাষ পরিলক্ষিত হয়, তখন উহার কারণরূপে তাহার পূর্ব্বজন্মানুভূত সেই বিষয়ের অনুস্মরণই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ তদ্বিষয়ে অভিলাষের কারণ। যে জাতীয় বিষয়ের ভোগবশতঃ আত্মার কোন দিন সুখানুভব হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিষয় আবার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়েই আত্মার পুনর্ব্বার অভিলাষ জন্মে, ইহা প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ। কোন ভোগ্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, তাহার সজাতীয় পূর্ব্বানুভূত সেই বিষয় এবং তাহার ভোগজন্য সুখানুভবের স্মরণ হয়। পরে যে জাতীয় বিষয়ভোগজন্য সুখানুভব হইয়াছিল, এই বিষয়ও তজ্জাতীয়, সুতরাং ইহার ভোগও সুখজনক হইবে, এইরূপ অনুমানবশতঃই তদ্বিষয়ে রাগ জন্মে। সুতরাং নবজাত শিশুর স্তন্যপান বা মধুলেহনাদি যে কোন বিষয়ে প্রথম রাগও পূর্ব্বোক্ত কারণেই হয়, ইহাই বলিতে হইবে। ঐ স্থলেও পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্য-কারণভাবের ব্যতিক্রমের কোন হেতু নাই। অন্যত্র ঐরূপ স্থলে যাহা রাগের কারণ বলিয়া পরীক্ষিত ও সর্ব্বসিদ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত শিশুর স্তন্যপানাদি বিষয়ে প্রথম রাগের কোন অজ্ঞাত বা অভিনব সন্দিগ্ধ কারণ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই।

এখন যদি নবজাত শিশুর প্রথম রাগের কারণরূপে তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলে উহার সেই জন্মের পূর্ব্বেও অন্য জন্ম ছিল, সেই জন্মে

তাহার তজ্জাতীয় বিষয়ে অনুভব জন্মিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ইহজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়ে তাহার তখন কোন অনুভবই জন্মে নাই। সুতরাং আত্মার বর্ত্তমান জন্মের প্রথম রাগের কারণ বিচারের দ্বারা পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হইলে, ঐ জন্মদ্বয়প্রযুক্ত আত্মার "প্রতিসন্ধি" অর্থাৎ পুনর্জন্ম সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ দুই জন্ম স্বীকার করিলেই পুনর্জন্ম স্বীকার করাই হইবে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, "তথা চায়ং দ্বয়োর্জ্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধিঃ"। ভাষ্যকার আত্মার বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপেই অর্থাৎ ঐ একই যুক্তির দ্বারা আত্মার পূর্ব্বতর, পূর্ব্বতম প্রভৃতি অনাদি জন্ম সিদ্ধ হইবে। কারণ, প্রত্যেক জন্মেই শিশুর প্রথম রাগ তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীত জন্মিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক জন্মের পূর্ব্বেই জন্ম হইয়াছে। জন্মপ্রবাহ অনাদি। পূর্ব্বশরীর ব্যতীত বর্ত্তমান শরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বতর শরীর ব্যতীতও পূর্ব্বশরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না এবং পূর্ব্বতম শরীর ব্যতীতও পূর্ব্বতর শরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক জন্মের শরীরের সহিতই ঐ আত্মার পূর্ব্বজাত শরীরের পূর্ব্বোক্ত-রূপ সম্বন্ধ স্বীকার্য্য হইলে আত্মার শরীর সম্বন্ধ অনাদি, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব, পূর্ব্বতর, পূর্ব্বতম প্রভৃতি শরীরের ঐরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই আত্মার শরীরসম্বন্ধ সমর্থনপূর্ব্বক আত্মার শরীরসম্বন্ধ ও রাগসম্বন্ধ অনাদি, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, তদ্দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা আত্মার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া, তদ্দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন—ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য। অনাদি ভাবপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। মহর্ষি গোতম এই প্রসঙ্গে এই সূত্রের দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহেরও অনাদিত্ব সূচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রলয়ের পরে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে ও হইবে, তাহারই আদি আছে। শাস্ত্রে সেই তাৎপর্য্যেই অনেক স্থলে সৃষ্টির আদি বলা হইয়াছে। কিন্তু সকল সৃষ্টির পূর্ব্বেই কোন না কোন সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল। যে সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কোন দিন সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টি নাই। তাই সৃষ্টিপ্রবাহকে অনাদি বলা হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রবাহকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, দার্শনিক সিদ্ধান্তের কোনরূপেই উপপাদন করা যায় না। বেদমূলক অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি মহাসত্যের আশ্রয় না পাইয়া চিরদিনই অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাই মহর্ষিগণ সকলেই একবাক্যে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব ঘোষণা করিয়া সকল সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণ "অবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।" ২।১।৩৫। এই সূত্রের দ্বারা সৃষ্টি-প্রবাহের অনাদিত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বে নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যাভিলাষকেই গ্রহণ করিয়া আত্মার পূর্ব্বজন্মের সাধনপূর্ব্বক নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। এই সূত্রে সামান্যতঃ জীবমাত্রেরই প্রথম রাগকে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বজীবেরই শরীরসম্বন্ধ ও রাগসম্বন্ধের অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া, আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাও এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক।

পরন্তু জীবমাত্রই যেমন রাগবিশিষ্ট, একেবারে রাগশূন্য প্রাণীর যেমন জন্ম দেখা যায় না, তদ্রূপ জীবমাত্রেরই মরণভয় সহজধর্ম্ম। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত ১৮শ সূত্রে নবজাত শিশুর পূর্ব্বজন্মের সাধন করিতে তাহার হর্ষ ও শোকের ন্যায় সামান্যতঃ ভয়ের উল্লেখ করিলেও সর্ব্বজীবের সহজধর্ম্ম মরণভয়কে বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন,—"স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"২।৯। অর্থাৎ বিজ্ঞ, অজ্ঞ—সকল জীবেরই "অভিনিবেশ" নামক ক্লেশ সহজধর্ম্ম। "অভিনিবেশ" বলিতে এখানে মরণভয়ই পতঞ্জলির অভিপ্রেত এবং উহাই তিনি প্রধানতঃ সর্ব্বজীবের জন্মান্তরের সাধকরূপে সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের কৈবল্যপাদে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, "তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ।"১০। অর্থাৎ সর্ব্বজীবেরই আমি যেন না-মরি, আমি যেন থাকি, এইরূপ আশীঃ (প্রার্থনা) নিত্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সংস্কারসমূহ অনাদি। যোগদর্শন-ভাষ্যকার ব্যাসদেব ঐ সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলির তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন যে, "আমি যেন না মরি"—ইত্যাদি প্রকারে সর্ব্বজীবের যে আশীঃ অর্থাৎ অস্ফুট কামনা, উহা স্বাভাবিক নহে—উহা নিমিত্তবিশেষ-জন্য। কারণ, মরণভয় বা ঐরূপ প্রার্থনা বিনা কারণে হইতেই পারে না। যে কখনও মৃত্যুযাতনা অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে ঐরূপ ভয় বা প্রার্থনা কোনরূপেই সম্ভব নহে। সুতরাং উহার দ্বারা বুঝা যায়, সর্ব্বজীবই পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুযাতনা অনুভব করিয়াছে। তাহা হইলে সর্ব্বজীবের পূর্ব্বজন্ম ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যগণ মরণভয়কে জীবের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন, কিন্তু জীবের ঐ স্বভাব কোথা হইতে আসিল, পিতামাতা হইতে ঐ স্বভাবের প্রাপ্তি হইলে তাহাদিগের ঐ স্বভাবেরই বা মূল কি? সর্ব্বজীবেরই ঐরূপ নিয়ত স্বভাব কেন হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহাদিগের মতে সদুত্তর পাওয়া যায় না। সর্ব্বজীবের মরণ-বিষয়ে যে অস্ফুট সংস্কার আছে, যাহার ফলে মরণভয়ে সকলেই ভীত হয়, ঐ সংস্কার একটা স্বভাব হইতে পারে না। উহা তদ্বিষয়ে অনুভব ব্যতীত জন্মিতেই পারে না। কারণ, অনুভব ব্যতীত সংস্কার জন্মে না। পূর্ব্বানুভবই সংস্কার দ্বারা স্মৃতির কারণ হয়। অবশ্য অনেকে মরণভয়শূন্য হইয়া আত্মহত্যা করে এবং অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে, অনেকে অসহ্য দুঃখ বা শোকে অভিভূত হইয়া অনেক সময়ে মৃত্যু কামনাও করে। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থলেও উহাদিগের সেই সহজ মরণভয় কোন সময়েই জন্মে নাই, ইহা নহে। শোকাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ কালবিশেষে উহার উদ্ভব না হইলেও, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদিগেরও ঐ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মহত্যাকারীর মৃত্যু নিশ্চয় হইলে তখন তাহারও মরণভয় ও বাঁচিবার ইচ্ছা জন্মে। রোগ-শোকার্ত্ত মুমূর্ষু বৃদ্ধদিগেরও মৃত্যুর পূর্ব্বে বাঁচিবার ইচ্ছা ও মরণভয় জন্মে। চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহা অবগত আছেন।

এইরূপ জীববিশেষের স্বভাব বা কর্ম্মবিশেষও তাহার পূর্ব্বজন্মের সাধক হয়। সদ্যঃপ্রসূত বানরশিশুর বৃক্ষের শাখায় অধিরোহণ এবং সদ্যঃপ্রসূত গণ্ডারশিশুর পলায়ন-ব্যাপার ভাবিয়া দেখিলে, তাহার পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পশুতত্ত্ববিৎ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও

বলিয়াছেন যে, গণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া থাকে। প্রসূত ঐ শাবকটি ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ স্থান হইতে পলায়ন করে। অনেক দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের অন্বেষণ করিয়া মিলিত হয়। গণ্ডারীর জিহ্বায় এমন তীক্ষ্ণ ধার আছে যে, ঐ জিহ্বার দ্বারা বলপূর্ব্বক বৃক্ষলেহন করিলে, ঐ বৃক্ষের ত্বক্‌ও উঠিয়া যায়। সুতরাং বুঝা যায়, গণ্ডারশিশু প্রথমে তাহার মাতা কর্তৃক গাত্রলেহনের ভয়েই পলায়ন করে। পরে তাহার গাত্রচর্ম্ম কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলেই তখন নির্ভয়ে মাতার নিকটে আগমন করে। সুতরাং গণ্ডারশিশু তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃই ঐরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মাতা কর্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের কষ্টকরতা বা অনিষ্টকারিতা স্মরণ করিয়াই জন্মের পরেই পলায়ন করে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে গণ্ডারশিশুর ঐরূপ স্বভাব বা সংস্কার আর কোন কারণেই জন্মিতে পারে না।

পরন্তু এই সূত্রের দ্বারা জীবমাত্রের বিষয়বিশেষে রাগ বা অভিলাষ বলিতে মানববিশেষের শাস্ত্রাদি বিষয়ে অনুরাগবিশেষও এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। মহর্ষি গোতমের উহাও বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। কারণ, উহাও পূর্ব্বজন্মের সাধক হয়। অধ্যয়নকারী মানবগণের মধ্যে কেহ সাহিত্যে, কেহ দর্শনে, কেহ ইতিহাসে, কেহ গণিতে, কেহ চিত্রবিদ্যায়, কেহ শিল্প-বিদ্যায়—এইরূপ নানা ব্যক্তি নানা বিভিন্ন বিদ্যায় অনুরক্ত দেখা যায়। সকলেরই সকল বিদ্যায় সমান অনুরাগ বা সমান অধিকার দেখা যায় না। যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক অনুরাগবিশেষ থাকে, তাহার পক্ষে সেই বিষয়টি অতি সহজে আয়ত্তও হয়, অন্য বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত হয় না, ইহাও দেখা যায়। ইহার কারণ বিচার করিলে, পূর্ব্বজন্মে সেই বিষয়ের অভ্যাস ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যত্ব-রূপে সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার প্রকর্ষ ও অপকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। মনোযোগপূর্ব্বক শাস্ত্রাভ্যাস করিলে তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা সেরূপ করেন না, তাঁহাদিগের তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ শাস্ত্রবিষয়ে অভ্যাস তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধাবৃদ্ধির কারণ—ইহা নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু যাহাদিগের ইহজন্মে সেই শাস্ত্রবিষয়ে অভ্যাসের পূর্ব্বেই তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ দেখা যায়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ে জন্মান্তরীণ অভ্যাস উহার কারণ বলিতে হইবে। যাহার প্রতি যাহা কারণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অভাবে সে কার্য্য কিছুতেই হইতে পারে না। মূলকথা, ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে অনুরাগের ন্যায় মানবের শাস্ত্রাদি বিষয়ে অনুরাগবিশেষের দ্বারাও আত্মার পূর্ব্বজন্ম ও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। পরন্তু অনেক ব্যক্তি যে অল্পকালের মধ্যেই বহু বিদ্যা লাভ করেন, ইহা বর্ত্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে। আবার অনেক বালকেরও সংগীত ও বাদ্যকুশলতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পঞ্চমবর্ষীয় বালকেরও সংগীত ও বাদ্যে বিশেষ অধিকার দেখিয়াছি। ইহার দ্বারা তাহার তদ্বিষয়ে জন্মান্তরীণ অভ্যাস-জন্য সংস্কারবিশেষই বুঝিতে পারা যায়। নচেৎ আর কোনরূপেই তাহার ঐ অধিকারের উপপাদন করা যায় না। সুতরাং অল্পকালের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ বিদ্যালাভের কারণ বিচার করিলেও তদ্দ্বারাও আত্মার

জন্মান্তর সিদ্ধ হয়। মহর্ষিগণও ঐরূপ স্থলে জন্মান্তরীণ সংস্কারবিশেষকেই পূর্ব্বোক্তরূপ বিদ্যালাভের কারণ বলিয়াছেন। তাই মহাকবি কালিদাসও ঐ চিরন্তন সিদ্ধান্তানুসারে কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে পার্ব্বতীর শিক্ষার বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন,—"প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।"

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে,—আত্মার জন্মান্তর থাকিলে অবশ্যই সমস্ত জীবই তাহার প্রত্যক্ষ করিত। পূর্ব্বজন্মানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারিলে, পূর্ব্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়ই স্মরণ করিতে পারিত এবং জন্মান্ধ ব্যক্তিও তাহার পূর্ব্বজন্মানুভূত রূপের স্মরণ করিতে পারিত। কিন্তু আমরা যখন কেহই পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, তখন আমাদিগের পূর্ব্বজন্ম ছিল, ইহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে জন্মান্তরবাদী পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথা এই যে, আত্মার পূর্ব্বজন্মানুভূত বিষয়বিশেষের যে অস্ফুট স্মৃতি জন্মে, (নচেৎ ইহজন্মে তাহার বিষয়বিশেষে রাগ জন্মিতে পারে না, স্তন্যপানাদি-কার্য্যে প্রথম অভিলাষ উৎপন্ন হইতেই পারে না) ইহা মহর্ষি গোতম প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু যাহার কোন বিষয়ের স্মরণ হইবে, তাহার যে সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। যে বিষয়ে যে সময়ে স্মরণের কারণসমূহ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে সেই বিষয়েরই স্মরণ হইবে। যে বিষয়ে স্মরণের কার্য্য দেখা যায়, সেই বিষয়েই আত্মার স্মরণ জন্মিয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়। আমরা ইহজন্মেও যাহা যাহা অনুভব করিতেছি, সেই সমস্ত বিষয়েরই কি আমাদিগের স্মরণ হইয়া থাকে? শিশুকালে যাহার পিতা বা মাতার মৃত্যু হইয়াছে, ঐ শিশু তাহার ঐ পিতা মাতাকে পূর্ব্বে দেখিলেও পরে তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পারে না। গুরুতর পীড়ার পরে পূর্ব্বানুভূত অনেক বিষয়েরই স্মরণ হয় না, ইহাও অনেকের পরীক্ষিত সত্য। ফলকথা, পূর্ব্বজন্ম থাকিলে পূর্ব্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ হইবে, সকলেরই পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বার্ত্তা স্বচ্ছ স্মৃতিপটে উদিত হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। অদৃষ্টবিশেষের পরিপাকবশতঃ পূর্ব্বজন্মানুভূত যে বিষয়ে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়েই স্মৃতি জন্মে। জন্মান্তরানুভূত নানাবিষয়ে আত্মার সংস্কার থাকিলেও ঐ সমস্ত সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত না হওয়ায়, ঐ সংস্কারের কার্য্য স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। নচেৎ ইহজন্মে অনুভূত নানা বিষয়েও সর্ব্বদা স্মৃতি জন্মিতে পারে। এই জন্যই মহর্ষি গোতম পরে স্মৃতির কারণ সংস্কারের নানাবিধ উদ্বোধক প্রকাশ করিয়া যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তি নিরাস করিয়াছেন। নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার অনুকূল অদৃষ্টবিশেষই তখন তাহার পূর্ব্বজন্মানুভূত স্তন্য পানাদি বিষয়ে "ইহা আমার ইষ্টসাধন" এইরূপ সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে সুতরাং তখন ঐ উদ্বুদ্ধ সংস্কারজন্য "ইহা আমার ইষ্টসাধন" এইরূপ অস্ফুট স্মৃতি জন্মে। নবজাত শিশু উহা প্রকাশ করিতে না পারিলেও তাহার যে ঐরূপ স্মৃতি জন্মে, তাহা ঐ স্মৃতির কার্য্যের দ্বারা অনুমিত হয়। কারণ, তখন তাহার ঐরূপ স্মৃতি ব্যতীত তাহার স্তন্যপানাদিতে অভিলাষ জন্মিতেই পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে রূপ দর্শন করিলেও ইহজন্মে তাহার ঐ সংস্কারের উদ্বোধক অদৃষ্টবিশেষ না থাকায়, সেই রূপ-বিষয়ে তাহার স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। এবং

অনেক স্থলে অদৃষ্টবিশেষই সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম থাকিলে সকল তাহা প্রত্যক্ষ করিত—পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বার্ত্তাই সকলে বলিতে পারিত, এইরূপ আপত্তিও কোনরূপে সঙ্গত হয় না। প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্ব্বতন বিষয়ের অপলাপ করিলে প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষবর্গের অস্তিত্বেরও অপলাপ করিতে হয়। আমাদিগের ইহজন্মে অনুভূত কত বিষয়রাশিও যে বিস্মৃতির অতলজলে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে, ইহারও কারণ চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু সাধনার দ্বারা পূর্ব্বজন্মও স্মরণ করা যায়, পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বার্ত্তা বলা যায়, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ। যোগিপ্রবর মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিবিজ্ঞানম্।"৩।১৮। অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা ও সমাধির দ্বারা দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে, তখন পূর্ব্বজন্ম জানিতে পারা যায়। তখন তাহাকে "জাতিস্মর" বলে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব পতঞ্জলির ঐ সূত্রের ভাষ্যে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ভগবান্ আবট্য ও মহর্ষি জৈগীষব্যের উপাখ্যান বলিয়াছেন। মহর্ষি জৈগীষব্য ভগবান্ আবট্যের নিকটে তাঁহার দশমহাকল্পের জন্মপরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন। সুখের অপেক্ষায় দুঃখই অধিক, সর্ব্বত্রই জন্ম বা সংসার সুখাদি সমস্তই দুঃখ বা দুঃখময়, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে (পঞ্চম কারিকার টীকায়) শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও যোগদর্শন ভাষ্যোক্ত আবট্য ও জৈগীষব্যের সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, সাধনার দ্বারা শুভাদৃষ্টের পরিপাক হইলে পূর্ব্বজন্মানুভূত সকল বিষয়েরও স্মরণ হইতে পারে, উহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বকালে অনেকেই শাস্ত্রোক্ত উপায়ে জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পুরাণশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তপস্যাদি সদনুষ্ঠানের দ্বারা যে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জন্মে, ইহা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন[১]। সুতরাং এই প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অসম্ভব বলিয়া কোনরূপেই উপেক্ষা করা যায় না। বুদ্ধদেব যে তাঁহার অনেক জন্মের বার্ত্তা বলিয়াছিলেন, ইহাও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জাতকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরন্তু আস্তিক সম্প্রদায়ের ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক যে, আত্মার জন্মান্তর বা নিত্যত্ব না থাকিলে শরীরনাশের সহিত আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিয়া, "উচ্ছেদবাদ"ই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে জীবের ইহজন্মে সঞ্চিত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। পুণ্যপাপের ফলভোক্তা বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহার সহিত তদ্‌গত পুণ্য ও পাপও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং কারণের অভাবে পরলোকে উহার ফলভোগ হওয়া অসম্ভব হয়। পরলোক না থাকিলে পুণ্যসঞ্চয় ও পাপকর্ম্ম পরিহারের জন্য আচার্য্যগণের এবং মহাত্মগণের উপদেশও ব্যর্থ হয়। "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদে" মহর্ষিগণের উপদেশ ব্যর্থ হয়, এ কথা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পরে বলিয়াছেন। চতুর্থ অ° ১ম আ° ১০ম সূত্রের ভাষ্য ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১। বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্॥
—মনুসংহিতা। ৪।১৪৮।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে[১] পরলোক সমর্থনের জন্য উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পরলোক উদ্দেশ্যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে আস্তিকগণের যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, উহা নিষ্ফল বলা যায় না। দুঃখভোগও উহার ফল বলা যায় না। কারণ, ইষ্টসাধন বলিয়া না বুঝিলে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। দুঃখভোগের জন্যও তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ ও তজ্জন্য ধনাদি লাভের জন্যই তাহাদিগের বহুকষ্টসাধ্য ও বহুধনব্যয়-সাধ্য যাগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যাহারা ঐরূপ খ্যাতি-লাভাদি ফলের অভিলাষী নহেন, পরন্তু তদ্বিষয়ে বিরক্ত বা বিদ্বেষী, তাঁহারাও ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। অনেক মহাত্মা ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্য ও গিরিগুহাদি নির্জ্জন স্থানে সঙ্গোপনে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। পরলোক না থাকিলে তাঁহারা ঐরূপ কঠোর তপস্যায় নিরত হইতেন না। পরলোক না থাকিলে বুদ্ধিমান্ ধনপ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে বহুকষ্টার্জ্জিত ধন দানও করিতেন না। সুখের জন্যই লোকে ধন ব্যয় করিয়া থাকে। কোন ধূর্ত্ত বা প্রতারক ব্যক্তি প্রথমে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিলে পরলোকে স্বর্গাদি হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং লোকের বিশ্বাসের জন্য নিজে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করায়, সকল লোকে ঐ সকল কর্ম্মে তখন হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এইরূপ কল্পনা চার্ব্বাক করিলেও উহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, দৃষ্টানুসারেই কল্পনা করিতে হয়, তাহাই সম্ভব। স্বর্গ ও অদৃষ্টাদি অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক পদার্থ, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগের কল্পনাই হইতে পারে না। পরন্তু ঐ কল্পিত বিষয়ে লোকের আস্থা জন্মাইবার জন্য প্রথমতঃ নানাবিধ কর্ম্মবোধক অতি দুঃসাধ্য দুরূহ বেদাদি শাস্ত্রের নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদনুসারে বহুকষ্টার্জ্জিত প্রভূত ধন ব্যয় ও বহুক্লেশসাধ্য যজ্ঞাদি ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে একান্ত পরিক্লিষ্ট করা ঐরূপ শক্তিশালী বুদ্ধিমান্ ধূর্ত্তদিগের পক্ষেও একান্ত অসম্ভব। লোকে সুখের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কাতর হয় না, ইহা সত্য, কিন্তু ঐরূপ প্রতারকের এমন কি সুখের সম্ভাবনা আছে, যাহার জন্য ঐরূপ বহুক্লেশ-পরম্পরা স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইবে না। প্রতারণা করিয়া প্রতারক ব্যক্তির সুখ হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সুখ এত গুরুতর নহে যে, তজ্জন্য বহু বহু দুঃখভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "নহ্যেতাবতো দুঃখরাশেঃ পরপ্রতারণসুখং গরীয়ঃ।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রতারকের এত বহুলপরিমাণ দুঃখরাশি অপেক্ষায় পরপ্রতারণা-জন্য সুখ অধিক নহে। ফলকথা, চার্ব্বাকের উক্তরূপ কল্পনা ভিত্তিশূন্য বা অসম্ভব। সুতরাং নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরলোক থাকিলেই পারলৌকিক ফলভোক্তা আত্মা তখনও আছে, ইহা স্বীকার্য্য। দেহসম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান দেহনাশের পরেও সেই আত্মারই দেহান্তরসম্বন্ধ স্বীকার্য্য। এইরূপে আত্মার

১। ১ম স্তবকের ৮ম কারিকা ও তাহার উদয়নকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনাদিপূর্ব্ব শরীরপরম্পরা এবং অপবর্গ না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তর শরীরপরম্পরাও অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু কোন ব্যক্তি সহসা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় প্রভূত ধনের অধিকারী হয়, কোন ব্যক্তি সহসা রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দারিদ্র্য-সাগরে মগ্ন হয়, আবার কোন ব্যক্তি ইহজন্মে বস্তুতঃ অপরাধ না করিয়াও অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়া দণ্ডিত হয় এবং কোন ব্যক্তি বস্তুতঃ অপরাধ করিয়াও নিরপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া মুক্তি পায়, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ঐ সকল স্থলে তাদৃশ সুখ দুঃখের মূল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই মানিতে হইবে। কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিয়া আর কোনরূপেই উহার উপপত্তি করা যায় না। সুতরাং ইহজন্মে তাদৃশ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পূর্ব্বজন্মে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেও সেই আত্মার অস্তিত্ব ও শরীরসম্বন্ধ ছিল, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, কর্ম্মকর্ত্তা আত্মার অস্তিত্ব ও শরীরসম্বন্ধ ভিন্ন তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মজনক কর্ম্মের আচরণ অসম্ভব। আত্মার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলেও তদ্দারা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্তরূপে আত্মার শরীরপরম্পরার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, আত্মা অনাদি ও অনন্ত। অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার প্রাথমিক সংযোগবিশেষের নাম জন্ম, এবং তথাবিধ চরম সংযোগের ধ্বংসের নাম মরণ। তাহাতে আত্মার উৎপত্তি বিনাশ বলা যাইতে পারে না। আত্মা চিরকালই বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আত্মার জন্ম-মরণ আছে, কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশ নাই—এইরূপ কথায় বস্তুতঃ কোনরূপ বিরোধও নাই। মূলকথা, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট অবশ্যস্বীকার্য্য হইলে, আত্মার পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতেই হইবে, সুতরাং ঐ যুক্তির দ্বারাও আত্মার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব অবশ্য সিদ্ধ হইবে ॥২৪॥

ভাষ্য। কথং পুনর্জ্জ্ঞায়তে পূর্ব্বানুভূতবিষয়ানুচিন্তনজনিতো জাতস্য রাগো ন পুনঃ—

সূত্র। সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবত্তদুৎপত্তিঃ ॥২৫॥২২৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কিরূপে জানা যায়, নবজাত শিশুর রাগ, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণজনিত, কিন্তু সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় তাহার (আত্মা ও তাহার রাগের) উৎপত্তি নহে ?

ভাষ্য। যথোৎপত্তিধর্ম্মকস্য দ্রব্যস্য গুণাঃ কারণত উৎপদ্যন্তে, তথোৎপত্তিধর্ম্মকস্যাত্মনো রাগঃ কুতশ্চিদুৎপদ্যতে। অত্রায়মুদিতানুবাদো নিদর্শনার্থঃ।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যেমন উৎপত্তিধর্ম্মক দ্রব্যের গুণগুলি কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ উৎপত্তিধর্ম্মক আত্মার রাগ কোন কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়।

এখানে এই উক্তানুবাদ নিদর্শনার্থ, [অর্থাৎ অয়স্কান্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঘটাদির রূপাদিকে নিদর্শন (দৃষ্টান্ত)-রূপে প্রদর্শনের জন্য সেই পূর্ব্বপক্ষেরই এই সূত্রে অনুবাদ হইয়াছে।]

টিপ্পনী। নবজাত শিশুর স্তন্যপানাদি যে কোন বিষয়ে প্রথম রাগ তাহার পূর্ব্বানুভূত সেই বিষয়ের অনুস্মরণ-জন্য, ইহা আত্মার উৎপত্তিবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে ঘটাদি দ্রব্যে যেমন রূপাদি গুণের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আত্মার উৎপত্তি হইলে, তাহাতে রাগের উৎপত্তি হয়। উহাতে পূর্ব্বজন্মের কোন আবশ্যকতা নাই। সুপ্রাচীন কালে নাস্তিক-সম্প্রদায় ঐরূপ বলিয়া আত্মার নিত্যত্বমত অস্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্যগণ জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিবার জন্য ঐ প্রাচীন কথারই নানারূপে সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম শেষে এই সূত্রের দ্বারা নাস্তিক-সম্প্রদায়-বিশেষের ঐ মতও পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা উহারও খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মার উৎপত্তিবাদীর প্রশ্ন এই যে, নবজাত শিশুর প্রথম রাগ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য, কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় কারণান্তর জন্য নহে, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? উহা ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় কারণান্তর জন্যই বলিব ? ভাষ্যকার ঐরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের অবতারণা করায়, ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "ন পুনঃ" ইত্যন্ত সন্দর্ভের সহিত এই সূত্রের যোগই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়। সুতরাং ঐ ভাষ্যের সহিত সূত্রের যোগ করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষেরই অনুবাদ। অর্থাৎ এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ("অয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবৎ তদুপসর্পণং" এই সূত্রে) অয়স্কান্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া মহর্ষি যে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন, এই সূত্রে উৎপদ্যমান ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ঐ পূর্ব্বপক্ষেরই পুনর্ব্বার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটাদি নিদর্শনের জন্যই অর্থাৎ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ঘটাদি সগুণ দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, ঐ পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিতেই পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। তাই ঐ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ পূর্ব্বপক্ষের পুনরুক্তি সার্থক হওয়ায়, উহা অনুবাদ। সার্থক পুনরুক্তির নাম "অনুবাদ", উহা দোষ নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদপ্রামাণ্য বিচারে ভাষ্যকার নানা উদাহরণের দ্বারা এই অনুবাদের সার্থকতা বুঝাইয়াছেন। সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা আত্মা ও তাহার রাগ—এই উভয়ই বুদ্ধিস্থ, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যের দ্বারা বুঝা যায়॥ ২৫ ॥

সূত্র। ন সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাং ॥২৬॥২২৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ বলা যায় না। কারণ, রাগাদি সংকল্পনিমিত্তক।

ভাষ্য। ন খলু সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবদুৎপত্তিরাত্মনো রাগস্য চ। কস্মাৎ? **সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাং**। অয়ং খলু প্রাণিনাং বিষয়ানাসেবমানানাং সংকল্পজনিতো রাগো গৃহ্যতে, সংকল্পশ্চ পূর্ব্বানুভূতবিষয়ানুচিন্তনযোনিঃ। তেনানুমীয়তে জাতস্যাপি পূর্ব্বানুভূতার্থানুচিন্তনকৃতো রাগ ইতি। আত্মোৎপাদাধিকরণাত্তু রাগোৎপত্তির্ভবন্তী সংকল্পাদন্যস্মিন্ রাগকারণে সতি বাচ্যা, কার্য্যদ্রব্যগুণবৎ। ন চাত্মোৎপাদঃ সিদ্ধো নাপি সংকল্পাদন্যদ্রাগকারণমস্তি, তস্মাদযুক্তং সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবত্তয়োরুৎপত্তিরিতি। অথাপি সংকল্পাদন্যদ্রাগকারণং ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমদৃষ্টমুপাদীয়তে, তথাপি পূর্ব্বশরীরযোগোঽপ্রত্যাখ্যেয়ঃ। তত্র হি তস্য নির্ব্বৃত্তির্নাস্মিন্ জন্মনি। **তন্ময়ত্বাদ্রাগ ইতি**, বিষয়াভ্যাসঃ খল্বয়ং ভাবনাহেতুস্তন্ময়ত্বমুচ্যত ইতি। **জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষ ইতি**। কর্ম্ম খল্বিদং জাতিবিশেষনির্ব্বর্ত্তকং, তাদর্থ্যাৎ তাচ্ছব্দ্যং বিজ্ঞায়তে। তস্মাদনুপপন্নং সংকল্পাদন্যদ্রাগকারণমিতি।

অনুবাদ। সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় আত্মা ও রাগের উৎপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু রাগাদি, সংকল্পনিমিত্তক। বিশদার্থ এই যে, বিষয়সমূহের সেবক (ভোক্তা) প্রাণিবর্গের এই রাগ অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ে অভিলাষ বা স্পৃহা সংকল্পজনিত বুঝা যায়। কিন্তু সংকল্প পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ-জন্য। তদ্দ্বারা নবজাত শিশুরও রাগ (তাহারই) পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ-জন্য, ইহা অনুমিত হয়। কিন্তু আত্মার উৎপত্তির অধিকরণ (আধার) হইতে অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তিবাদীর মতে যে আধারে আত্মার উৎপত্তি হয়, আত্মার যাহা উপাদানকারণ, উহা হইতে জায়মান রাগোৎপত্তি, সংকল্পভিন্ন রাগের কারণ থাকিলে—কার্য্যদ্রব্যের গুণের ন্যায়—অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের উৎপত্তির ন্যায় বলিতে পারা যায়। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি (প্রমাণ দ্বারা) সিদ্ধ নহে, সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণও নাই। অতএব "সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় সেই আত্মা ও রাগের উৎপত্তি হয়" ইহা অযুক্ত।

আর যদি সংকল্প ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকে রাগের কারণরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলেও (আত্মার) পূর্ব্বশরীরসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করা যায় না, যেহেতু সেই পূর্ব্বশরীরেই তাহার (ধর্ম্মাধর্ম্মের) উৎপত্তি হয়, ইহজন্মে হয় না। তন্ময়ত্ব-

বশতঃ রাগ উৎপন্ন হয়। ভাবনার কারণ অর্থাৎ বিষয়ানুভব-জন্য সংস্কারের জনক এই (পূর্ব্বোক্ত) বিষয়াভ্যাসকেই "তন্ময়ত্ব" বলে। জাতিবিশেষপ্রযুক্তও রাগ-বিশেষ জন্মে। যেহেতু এই কর্ম্ম জাতিবিশেষের জনক (অতএব) "তাদর্থ্য"বশতঃ "তাচ্ছব্দ্য" অর্থাৎ সেই "জাতিবিশেষ" শব্দের প্রতিপাদ্যত্ব বুঝা যায় [অর্থাৎ যে কর্ম্ম জাতিবিশেষের জনক, তাহাকেই ঐ জন্য "জাতিবিশেষ" শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়], অতএব সংকল্প হইতে ভিন্ন পদার্থ রাগের কারণ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, রাগাদি সংকল্পনিমিত্তক, সংকল্পই জীবের বিষয়বিশেষে রাগাদির নিমিত্ত, সংকল্প ব্যতীত আর কোন কারণেই জীবের রাগাদি জন্মিতেই পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, বিষয়ভোগী জীবগণের সেই সেই ভোগ্য বিষয়ে যে রাগ জন্মে, তাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ-জনিত সংকল্প-জন্য, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং নবজাত শিশুর যে প্রথম রাগ, উহাও তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণজনিত সংকল্পজন্য, ইহা অনুমানসিদ্ধ। উদ্দ্যোতকর এই "সংকল্প" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনা। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সর্ব্বশেষেও "ন সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাং" এইরূপ সূত্র আছে। সেখানেও উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "অনুভূতবিষয়প্রার্থনা সংকল্প ইত্যুক্তং"। সেখানে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয়—এই ত্রিবিধ মিথ্যা-সংকল্প হইতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বানুভূত কোন বিষয়ের ধারাবাহিক স্মরণপরম্পরাকে চিন্তন বলে। উহা পূর্ব্বানুভবের পশ্চাৎ জন্মে, এজন্য উহাকে "অনুচিন্তন" বলা যায়। ঐ অনুচিন্তন বা অনুস্মরণ তদ্বিষয়ে প্রার্থনারূপ সংকল্পের যোনি, অর্থাৎ কারণ। সংকল্প ঐ অনুচিন্তনজন্য। পরে ঐ সংকল্পই তদ্বিষয়ে রাগ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ জীব মাত্রই এইরূপে তাহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে প্রার্থনারূপ সংকল্প করিয়া রাগ লাভ করে। এ বিষয়ে জীব মাত্রের মনই সাক্ষী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে "সংকল্প" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, ইষ্টসাধনত্বজ্ঞান। কোন বিষয়কে নিজের ইষ্ট-সাধন বলিয়া বুঝিলেই, তদ্বিষয়ে ইচ্ছারূপ রাগ জন্মে। ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। সুতরাং নবজাত শিশুর প্রথম রাগের দ্বারা তাহার ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অনুমান করা যায়। তাহা হইলে পূর্ব্বে কোন দিন তদ্বিষয়ে তাহার ইষ্টসাধনত্বের অনুভব হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পূর্ব্বে ইষ্টসাধন বলিয়া অনুভব না করিলে ইষ্টসাধন বলিয়া স্মরণ করা যায় না। ইহজন্মে যখন ঐ শিশুর ঐরূপ অনুভব জন্মে নাই, তখন পূর্ব্বজন্মেই তাহার ঐ অনুভব জন্মিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। "সংকল্প" শব্দের এখানে যে অর্থই হউক, উহা যে রাগাদির কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও উহা স্বীকার করিয়াছেন[১]।

১। সংকল্পপ্রভবো রাগো দ্বেষো মোহশ্চ কথ্যতে।—মাধ্যমিককারিকা।

আত্মার উৎপত্তিবাদীর কথা এই যে, আত্মার যে আধারে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্মার যাহা উপাদান-কারণ, উহা হইতে যেমন আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করি, তদ্রূপ উহা হইতেই আত্মার রাগের উৎপত্তিও স্বীকার করিব। ঘটাদি দ্রব্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদি হইতে যেমন ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে ঐ মৃত্তিকাদি দ্রব্যের রূপাদি গুণ জন্য ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আত্মার উপাদান-কারণের রাগাদি গুণ হইতে আত্মারও রাগাদি গুণ জন্মে, ইহাই বলিব। ভাষ্যকার এই পক্ষ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণ থাকিত, অর্থাৎ যদি সংকল্প ব্যতীতও কোন জীবের কোন বিষয়ে কোন দিন রাগ জন্মিয়াছে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে আত্মার ঐরূপ রাগোৎপত্তি বলিতে পারা যাইত। কিন্তু ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার উৎপত্তি হয়, এ বিষয়েও কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ আত্মার উপাদানকারণ স্বীকার করিয়া মৃত্তিকাদিতে রূপাদির ন্যায় আত্মার উপাদান-কারণেও রাগাদি আছে, ইহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না। আত্মার উপাদান-কারণে রাগাদি না থাকিলেও, ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় আত্মাতে রাগাদি জন্মিতেই পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পরিগৃহীত দৃষ্টান্তানুসারে আত্মাতে রাগোৎপত্তি প্রতিপন্ন করা যায় না। আত্মার উপাদান-কারণ কি হইবে, এবং তাহাতেই বা কিরূপে রাগাদি জন্মিবে, ইহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। আধুনিক পাশ্চাত্যগণ এসকল বিষয়ে নানা কল্পনা করিলেও আত্মার উৎপত্তি ও তাহার রাগাদির মূল কোথায়, ইহা তাঁহারা দেখাইতে পারেন না। দ্বিতীয় আহ্নিকে ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী আস্তিক মতানুসারে শেষে যদি বলেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই জীবের ভোগ্য বিষয়ে রাগের কারণ। উহাতে সংকল্প অনাবশ্যক। নবজাত শিশু অদৃষ্টবিশেষবশতঃই স্তন্যাদিপানে রাগযুক্ত হয়। ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নবজাত শিশুর রাগের কারণ সেই অদৃষ্টবিশেষ ও তাহার বর্ত্তমান জন্মের কোন কর্ম্মজন্য না হওয়ায়, পূর্ব্বশরীরসম্বন্ধ বা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং অদৃষ্টবিশেষকে রাগের কারণ বলিতে গেলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কোন ফল হইবে না, পরন্তু উহাতে সিদ্ধান্তবাদীর পক্ষই সমর্থিত হইবে। কেবল অদৃষ্টবিশেষবশতঃই রাগ জন্মে, ইহা সিদ্ধান্ত না হইলেও, ভাষ্যকার উহা স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বপক্ষের পরিহারপূর্ব্বক শেষে প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে তন্ময়ত্বকে রাগের মূল কারণ বলিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ যে বিষয়াভ্যাসবশতঃ তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মে, সেই বিষয়াভ্যাসের নাম "তন্ময়ত্ব"। ঐ তন্ময়ত্ব বশতঃ তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিলে তজ্জন্য তদ্বিষয়ের অনুস্মরণ হয়, সেই অনুস্মরণ জন্য সংকল্পবশতঃ তদ্বিষয়ে রাগ জন্মে, সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ তন্ময়ত্বই রাগের মূল। নবজাত শিশুর পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে, ইহজন্মে প্রথমেই তাহার ঐ বিষয়াভ্যাসরূপ তন্ময়ত্ব সম্ভব না হওয়ায়, প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন জীব মনুষ্যজন্মের পরেই উষ্ট্রজন্ম লাভ করিলে, তাহার তখন অব্যবহিতপূর্ব্ব মনুষ্যজন্মের অনুরূপ মনুষ্যোচিত রাগাদি না হইয়া বিজাতীয় সহস্রজন্মব্যবহিত উষ্ট্রজন্মের অনুরূপ রাগাদিই জন্মে কেন? এতদুত্তরে

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,—জাতিবিশেষপ্রযুক্তও রাগবিশেষ জন্মে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষের দ্বারা পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণাদি জন্য রাগাদি জন্মে। যে কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উষ্ট্রজন্ম হয়, সেই কর্ম্মই বিজাতীয় সহস্রজন্মব্যবহিত উষ্ট্রজন্মের সেই সেই সংস্কারবিশেষকেই উদ্বুদ্ধ করায়, তখন তাহার তদনুরূপ রাগাদিই জন্মে। উদ্বোধক না থাকায়, তখন তাঁহার মনুষ্যজন্মের সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ না হওয়ায়, কারণাভাবে মনুষ্যজন্মের অনুরূপ রাগাদি জন্মে না। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন[১]।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে অদৃষ্টবিশেষকে পূর্ব্বোক্ত স্থলে রাগবিশেষের প্রয়োজক না বলিয়া, ভাষ্যকার জাতিবিশেষকেই উহার প্রয়োজক কেন বলিয়াছেন? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মই জাতিবিশেষের জনক, সুতরাং 'জাতিবিশেষ' শব্দের দ্বারা উহার নিমিত্ত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট-বিশেষকেও বুঝা যায়। অর্থাৎ কর্ম্মবিশেষ বুঝাইতেও "জাতিবিশেষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, কর্ম্মবিশেষ জাতিবিশেষার্থ। জাতিবিশেষ অর্থাৎ জন্মবিশেষই যাহার অর্থ বা ফল, এমন যে কর্ম্মবিশেষ, তাহাতে "তাদর্থ্য" অর্থাৎ ঐ জাতিবিশেষার্থতা থাকায়, "তাচ্ছব্দ্য" অর্থাৎ উহাতে "জাতিবিশেষ" শব্দের প্রতিপাদ্যতা বুঝা যায়। "তাদর্থ্য" অর্থাৎ তন্নিমিত্ততাবশতঃ যাহা যে শব্দের বাচ্যার্থ নহে, সেই পদার্থেও সেই শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন কটার্থ বীরণ "কট" শব্দের বাচ্য না হইলেও, ঐ বীরণ বুঝাইতে "কটং করোতি" এই বাক্যে "কট" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে (৬০ম সূত্রে) নিজেও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার কর্ম্মবিশেষ বুঝাইতেই "জাতিবিশেষ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের অবকাশ নাই। উপসংহারে ভাষ্যকার প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, সংকল্প ব্যতীত আর কোন কারণেই রাগাদি জন্মিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব অনাদিত্ব ও পূর্ব্বজন্মাদি অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। বস্তুতঃ কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রণিধান-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহের চিন্তা করিলে এবং শিশুর স্তন্যপানাদি নানাবিধ ক্রিয়ায় বিশেষ মনোযোগ করিলে পূর্ব্বজন্মবিষয়ে মনস্বী ব্যক্তির কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

মহর্ষি ইতঃপূর্ব্বে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব সাধন করিয়া, শেষে এই প্রকরণের দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে বিশেষরূপে ভূতচৈতন্যবাদের খণ্ডন করিয়া, পুনর্ব্বার আত্মার দেহভিন্নত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এখানে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্দ্বারাও আত্মা যে দেহাদি-ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, দেহাদি আত্মা হইলে, আত্মা নিত্য হইতে পারে না। পরন্তু আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; আত্মা নিত্য, ইহা বেদ ও বেদমূলক সর্ব্ব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" ২।৩।১৭। অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তি নাই, যে হেতু উৎপত্তি-প্রকরণে শ্রুতিতে আত্মার উৎপত্তি

১। "ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্ব্বাসনানাং"। "জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ"।—যোগদর্শন, কৈবল্যপাদ। ৮।৯ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কথিত হয় নাই। পরন্তু শ্রুতিতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্বই বর্ণিত হওয়ায়[1] "আত্মা নিত্য" এই প্রতিজ্ঞা আগমমূলক, আত্মার নিত্যত্বের অনুমান বৈদিক সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। সুতরাং কেহ আত্মার অনিত্যত্বের অনুমান করিলে, উহা প্রমাণ হইবে না। উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান হওয়ায়, "ন্যায়াভাস" হইবে। (১ম খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পরন্তু মহর্ষি আত্মা দেহাদি-ভিন্ন ও নিত্য, এই শ্রুতিসিদ্ধ "সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তের" সমর্থন করিতে যেসকল যুক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বহু এবং জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মারই গুণ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। আত্মাই জ্ঞাতা ; আত্মাই স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয় এবং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মাই প্রত্যক্ষ করে। ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ—ইত্যাদি কথার দ্বারা তাঁহার মতে জ্ঞানাদি আত্মারই গুণ, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। "এষ হি দ্রষ্টা স্পর্ষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতা শ্রোতা" ইত্যাদি (প্রশ্ন উপনিষৎ ৪।৯) শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি গোতম ও কণাদ জ্ঞান আত্মারই গুণ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। আত্মার সগুণত্ববাদী আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতিও ঐ শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ" ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন—বহু, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও পূর্ব্বোক্ত "নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ" এই সূত্রের "বার্ত্তিকে" ইহা লিখিয়াছেন[2]। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৬৬ম ও ৬৭ম সূত্রের দ্বারাও মহর্ষি গোতমের ঐ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেখানে আত্মার নানাত্ব বা প্রতি শরীরে বিভিন্নত্ব সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিতেই মহর্ষির সমাধানের ব্যখ্যা করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ সূত্র ভাষ্যের শেষে এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের ৩৭শ সূত্র ও ৫০শ সূত্রের ভাষ্যে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা মহর্ষি গোতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকেও অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ন্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ প্রথমে "সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যং" (৩।২।১৯) এই সূত্র দ্বারা আত্মার একত্বকে পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, পরে "ব্যবস্থাতো নানা" (৩।২।২০) এই সূত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ বহুত্বই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অভিন্ন এক আত্মাই প্রতি শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, অর্থাৎ সর্ব্ব-শরীরবর্ত্তী জীবাত্মা বস্তুতঃ অভিন্ন হইলে, একের সুখ-দুঃখাদি জন্মিলে সকলেরই সুখ-দুঃখাদি জন্মিতে পারে। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা আছে, একের জন্মাদি হইলেও

১। ন জীবো ম্রিয়তে।—ছান্দোগ্য।৬।১১।৩। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম।
—বৃহদারণ্যক।৪।৪।২৫।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।—কঠোপনিষৎ।২।১৮।

২। বহুত্বঞ্চ অতএব "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ" নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি "শরীরদাহে পাতকাভাবা"দিতি। নৈবং সর্ব্বা ব্যবস্থা শরীরভেদে সতি সম্ভবতীতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

অপরের জন্মাদি হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা বা নিয়মবশতঃ আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং বহু ইহা সিদ্ধ হয়। সাংখ্যসূত্রকারও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারাই আত্মার বহুত্ব সমর্থন করিতে সূত্র বলিয়াছেন, "জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং" (১।১৪৯)। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও আত্মার বহুত্বসাধনে পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিতে পারেন যে, আত্মার একত্ব শ্রুতিসিদ্ধ, সুতরাং আত্মার বহুত্বের অনুমান করিলেও ঐ অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, প্রমাণ হইতে পারে না। এই জন্যই মহর্ষি কণাদ পরে আবার বলিয়াছেন, "শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" (৩।২।২১)। কণাদের ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার বহুত্বপ্রতিপাদক যে শাস্ত্র আছে, তাহা জীবাত্মার বাস্তব বহুত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ। কিন্তু আত্মার একত্বপ্রতিপাদক যে শাস্ত্র আছে, তাহা জীবাত্মার একত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ নহে। ঐ সকল শাস্ত্র দ্বারা পরমাত্মারই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে এক বলা হইলেও সেখানে একজাতীয় অর্থেই এক বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কারণ, জীবাত্মার বহুত্ব, শ্রুতিও অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। সুতরাং জীবাত্মার একত্ব বাধিত। বাধিত পদার্থের প্রতিপাদন করিতে কোন বাক্যই সমর্থ বা যোগ্য হয় না। বহু পদার্থকে এক বলিলে সেখানে "এক" শব্দের একজাতীয় অর্থই বুঝিতে হয় এবং ঐরূপ অর্থে "এক" শব্দের প্রয়োগও হইয়া থাকে। সাংখ্য-সূত্রকারও বলিয়াছেন, "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ"। ১।১৫৪। কণাদ-সূত্রের "উপস্কার"-কর্ত্তা শঙ্কর মিশ্র কণাদের "শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" এই সূত্রে "শাস্ত্র" শব্দের দ্বারা "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" এবং "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি (মুণ্ডক) শ্রুতিকেই গ্রহণ করিয়া জীবাত্মার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার ভেদ প্রতিপন্ন হওয়ায়, জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ নহে, সুতরাং জীবাত্মা এক নহে, ইহা বুঝা যায়। জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ না হইলে, আর কোন প্রমাণের দ্বারা জীবাত্মার একত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থনে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, কঠ, এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[১] "চেতনশ্চেতনানাং" এই বাক্যের দ্বারা এক পরমাত্মা সমস্ত জীবাত্মার চৈতন্যসম্পাদক, ইহা কথিত হওয়ায়, উহার দ্বারা জীবাত্মার বহুত্ব স্পষ্ট বুঝা যায়। "চেতনশ্চেতনানাং" এবং "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" এই দুইটি বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন এবং "বহু" শব্দের দ্বারা জীবাত্মার বহুত্ব সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, এবং উক্ত উপনিষদে নানা শ্রুতির দ্বারা পরমাত্মারই একত্ব বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং জীবাত্মা বহু, পরমাত্মা এক, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার একত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে জীবাত্মার একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া বুঝিয়া বেদের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে, উহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবে না। অবশ্য "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এবং "সোঽহং" এই চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা বাস্তবতত্ত্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ধ্যান করিলে, ঐ ধ্যানরূপ উপাসনা মুমুক্ষুর রাগদ্বেষাদি দোষের ক্ষীণতা সম্পাদন দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সাহায্য করিয়া মোক্ষলাভের সাহায্য

১। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।—কঠ।২।১৩। শ্বেতাশ্বতর।৬।১৩।

করে, তাই ঐরূপ ধ্যানের জন্যই অনেক শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ অভেদ বাস্তবতত্ত্ব নহে। কারণ, অন্যান্য বহু শ্রুতি ও বহু যুক্তির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সিদ্ধ হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে (১ম আ০ ২১শ সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনীতে) এই সকল কথায় বিশেষ আলোচনা পাওয়া যাইবে। মূলকথা, জীবাত্মার বাস্তব বহুত্বই মহার্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ইহাদিগের মতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা বস্তুতঃ বহু, তাহা এক অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। পরন্তু ভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতমত-পক্ষপাতী অধুনিক কোন কোন মনীষী মহর্ষি কণাদের পূর্ব্বোক্ত "সুখ-দুঃখ-জ্ঞান" ইত্যাদি সূত্রটিকে সিদ্ধান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, কণাদও যে জীবাত্মার একত্ববাদী ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন[১]। কিন্তু ঐ অভিনব ব্যাখ্যা সম্প্রদায়বিরুদ্ধ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও কণাদসূত্রের ঐরূপ কোন ব্যাখ্যান্তর করিয়া তদ্দ্বারা নিজ মত সমর্থন করেন নাই। বেদান্তনিষ্ঠ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (২য় অ০ ১৪শ সূত্রের) টীকায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতির ন্যায় বৈশেষিকমতেও আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা মহর্ষি গোতমের ন্যায় তাঁহার মতেও যে, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি আত্মারই গুণ, মনের গুণ নহে, ইহা বুঝা যায়। এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরে কারণত্বাৎ"। ৫। এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার মতে আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন এবং সগুণ, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং কণাদের মতে আত্মার একত্ব ও নির্গুণত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু মহর্ষি কণাদের 'ব্যবস্থাতো নানা" এই সূত্রে "ব্যবহারদশায়াং" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া ব্যবহারদশায় আত্মা নানা, কিন্তু পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, কণাদের অন্য কোন সূত্রেই তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্যসূচক কোন কথা নাই। পরন্তু "ব্যবস্থাতো নানা" এই সূত্রের পরেই "শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" এই সূত্রের উল্লেখ থাকায়, "ব্যবস্থা"বশতঃ এবং "শাস্ত্রসামর্থ্য"বশতঃ আত্মা নানা, ইহাই কণাদের বিবক্ষিত বুঝা যায়। কারণ, শেষ সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বসূত্রোক্ত "ব্যবস্থা" রূপ হেতুরই সমুচ্চয় বুঝা যায়। অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত সন্নিহিত পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া "চ" শব্দের দ্বারা অন্য সূত্রোক্ত হেতুর সমুচ্চয় গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং "ব্যবস্থাতঃ শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ আত্মা নানা" এইরূপ ব্যাখ্যাই কণাদের অভিমত বলিয়া বুঝা যায়। কণাদ শেষসূত্রে "সামর্থ্য" শব্দ ও "চ" শব্দের প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু আত্মার

১। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় কৃত বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য ও "ফেলোসিপের লেক্‌চর" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

একত্বই কণাদের সাধ্য হইলে এবং তাঁহার মতে শাস্ত্রসামর্থ্যবশতঃ আত্মার নানাত্ব নিষেধ্য হইলে তিনি "ব্যবস্থাতো নানা" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে আত্মার নানাত্ব সমর্থন করিয়া "ন শাস্ত্র-সামর্থ্যাৎ" এইরূপ সূত্র বলিয়াই, তাঁহার পূর্ব্বসূত্রোক্ত আত্মনানাত্ব পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতেন, তিনি ঐরূপ সূত্র না বলিয়া "শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" এইরূপ সূত্র কেন বলিয়াছেন এবং ঐস্থলে তাঁহার ঐ সূত্রটি বলিবার প্রয়োজনই বা কি, ইহাও বিশেষরূপে চিন্তা করা আবশ্যক। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া কণাদ-সূত্রের অদ্বৈতমতে নবীন ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন।

বস্তুতঃ দর্শনকার মহর্ষিগণ অধিকারি-বিশেষের জন্য বেদানুসারেই নানা সিদ্ধান্তের বর্ণন করিয়াছেন। সমস্ত দর্শনেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অথবা অন্য কোন একই সিদ্ধান্ত বর্ণিত ও সমর্থিত হইয়াছে, ইহা কোন দিন কেহ ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, ইহা পরম সত্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিক আচার্য্যগণ কেহই ষড়্‌দর্শনের ঐরূপ সমন্বয় করিতে যান নাই। সত্যের অপলাপ করিয়া কেবল নিজের বুদ্ধিবলে বিস্ময়জনক বিশ্বাসবশতঃ পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহই ঐরূপ অসম্ভব সমন্বয়ের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেন নাই। পূর্ব্বাচার্য্য মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থে সমন্বয়ের একপ্রকার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। "জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ[১]" ইত্যাদি সুপ্রাচীন শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২১শ সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনীতে উদয়নাচার্য্যের ঐ সমস্ত কথা এবং দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতির আলোচনা দ্রষ্টব্য। পরন্তু অদ্বৈতমতে সকল দর্শনের ব্যাখ্যা করা গেলে, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্বৈতমত সমর্থন করিবার জন্য বিরুদ্ধ নানা মতের খণ্ডন করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ২য় অ° ১৪শ সূত্রের টীকায় মধুসূদন সরস্বতী আত্মবিষয়ে যে নানা বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না। ঋষিগণ সকলেই অদ্বৈতসিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারিলে ভগবান্ শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ কেন তাহা বলেন নাই, এ সকল কথাও চিন্তা করা আবশ্যক। ফলকথা, ঋষিদিগের নানাবিধ বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়াই ঐ সকল মতের সমন্বয়ের চিন্তা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন সমন্বয়ের আর কোন পন্থা নাই। স্বয়ং বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতের একস্থানে নিজের পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ বাক্যের ঐ ভাবেই সমন্বয় সমর্থন করিয়া অন্যত্রও ঐ ভাবেই বিরুদ্ধ ঋষিবাক্যের সমন্বয়ের কর্ত্তব্যতা সূচনা করিয়া গিয়াছেন[২] ॥ ২৬ ॥

আত্মনিত্যত্বপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৫॥

১। জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা।
উভৌ চ যদি বেদজ্ঞৌ ব্যাখ্যাভেদস্তু কিং কৃতঃ ॥

২। ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতং।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনং।—শ্রীমদ্ভাগবত।১১।২২।২৫।

ভাষ্য। অনাদিশ্চেতনস্য শরীরযোগ ইত্যুক্তং, স্বকৃতকর্ম্মনিমিত্তঞ্চাস্য শরীরং সুখদুঃখাধিষ্ঠানং, তৎ পরীক্ষ্যতে—কিং ঘ্রাণাদিবদেকপ্রকৃতিকমুত নানাপ্রকৃতিকমিতি। কুতঃ সংশয়ঃ? বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি সংখ্যাবিকল্পেন[1] শরীরপ্রকৃতিরিতি প্রতিজানত ইতি।

কিং তত্র তত্ত্বং?

অনুবাদ। চেতনের অর্থাৎ আত্মার শরীরের সহিত সম্বন্ধ অনাদি, ইহা উক্ত হইয়াছে। সুখদুঃখের অধিষ্ঠানরূপ শরীর এই আত্মার নিজকৃত কর্ম্মজন্যই, সেই শরীর পরীক্ষিত হইতেছে, (সংশয়) শরীর কি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একপ্রকৃতিক? অথবা নানা প্রকৃতিক? অর্থাৎ শরীরের উপাদান-কারণ কি একই ভূত? অথবা নানা ভূত? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ কি কারণে শরীর-বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হয়? (উত্তর) বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। সংখ্যা-বিকল্পের দ্বারা অর্থাৎ কেহ এক ভূত, কেহ দুই ভূত, কেহ তিন ভূত, কেহ চারি ভূত, কেহ পঞ্চ ভূত, এইরূপ বিভিন্ন কল্পে পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ শরীরের উপাদান—ইহা (বাদিগণ) প্রতিজ্ঞা করেন।

(প্রশ্ন) তন্মধ্যে তত্ত্ব কি?

সূত্র। পার্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ ॥২৭॥২২৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) [মনুষ্যশরীর] পার্থিব, যেহেতু (তাহাতে) গুণান্তরের অর্থাৎ পৃথিবীমাত্রের গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। তত্র মানুষং শরীরং পার্থিবং। কস্মাৎ? গুণান্তরোপলব্ধেঃ। গন্ধবতী পৃথিবী, গন্ধবচ্চ শরীরং। অবাদীনামগন্ধত্বাৎ তৎপ্রকৃত্যগন্ধং স্যাৎ। ন ত্বিদমবাদিভিরসংপৃক্তয়া পৃথিব্যারব্ধং চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ভাবেন কল্পতে, ইত্যতঃ পঞ্চানাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি। ভূত-সংযোগো হি মিথঃ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ইতি। আপ্যতৈজসবায়ব্যানি লোকান্তরে শরীরাণি, তেম্বপি ভূতসংযোগঃ পুরুষার্থতন্ত্র ইতি। স্থাল্যাদিদ্রব্যনিষ্পত্তাবপি নিঃসংশয়ো নাবাদিসংযোগমন্তরেণ নিষ্পত্তি-রিতি।

[1] এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-প্রকৃতিকতামাস্থিষত শরীরস্য বাদিনঃ, সোঽয়ং সংখ্যাবিকল্পঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনুবাদ। তন্মধ্যে মানুষশরীর পার্থিব, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু গুণান্তরের (গন্ধের) উপলব্ধি হয়। পৃথিবী গন্ধবিশিষ্ট, শরীরও গন্ধবিশিষ্ট। জলাদির গন্ধশূন্যতাবশতঃ "তৎপ্রকৃতি" অর্থাৎ সেই জলাদি ভূতই যাহার প্রকৃতি বা উপাদান-কারণ, এমন হইলে (ঐ শরীর) গন্ধশূন্য হউক ? কিন্তু এই শরীর জলাদির দ্বারা অসংযুক্ত পৃথিবীর দ্বারা আরব্ধ হইলে চেষ্টাশ্রয়, ইন্দ্রিয়াশ্রয় এবং সুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়রূপে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ ঐরূপ হইলে উহা শরীরের লক্ষণাক্রান্তই হয় না, এজন্য পঞ্চভূতের সংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই শরীর হয়। কারণ, পঞ্চভূতের পরস্পর ভূতসংযোগ (অন্য ভূতচতুষ্টয়ের সহিত সংযোগ) নিষিদ্ধ নহে, অর্থাৎ উহা সকলেরই স্বীকৃত। লোকান্তরে অর্থাৎ বরুণাদি লোকে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ আছে, সেই সমস্ত শরীরেও "পুরুষার্থতন্ত্র" অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার উপভোগ-সম্পাদক "ভূতসংযোগ" (অন্য ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ) আছে। স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও জলাদির সংযোগ ব্যতীত (ঐ সকল দ্রব্যের) নিষ্পত্তি হয় না, এজন্য (পূর্ব্বোক্ত ভূতসংযোগ) "নিঃসংশয়" অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি আত্মার পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে অবসরসঙ্গতিবশতঃ শরীরের পরীক্ষা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষায় আর একপ্রকার সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, আত্মার শরীরসম্বন্ধ অনাদি, ইহা আত্মনিত্যত্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আত্মার ঐ শরীর তাহার সুখ-দুঃখের অধিষ্ঠান, সুতরাং উহা আত্মারই নিজকৃত কর্ম্মজন্য। অতএব শরীর পরীক্ষিত হইলেই আত্মার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়, এজন্য মহর্ষি আত্মার পরীক্ষার পরে শরীরের পরীক্ষা করিয়াছেন। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, এজন্য ভাষ্যকার শরীরবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি-প্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, বাদিগণ কেহ কেহ কেবল পৃথিবীকে, কেহ কেহ পৃথিবী ও জলকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল ও তেজকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে, কেহ কেহ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকেই ঐরূপ সংখ্যাবিকল্প আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-শরীরের উপাদান বলেন এবং হেতুর দ্বারা সকলেই স্ব স্ব মত সমর্থন করেন। সুতরাং মনুষ্য শরীরের উপাদান বিষয়ে বাদিগণের পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকায়, ঐ শরীর কি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এক জাতীয় উপাদানজন্য ? অথবা নানাজাতীয় উপাদানজন্য ? এইরূপ সংশয় হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে তত্ত্ব কি, তাহা বলা আবশ্যক। কারণ, যাহা তত্ত্ব, তাহার নিশ্চয় হইলেই পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি হয়। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তত্ত্ব বলিয়াছেন, "পার্থিবং"। শরীরপরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি "পার্থিব" শব্দের দ্বারা শরীরকেই পার্থিব বলিয়াছেন, ইহা প্রকরণবশতঃ বুঝা যায়, এবং মনুষ্যাধিকার শাস্ত্রে মুমুক্ষু মনুষ্যের শরীরবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই শরীরের পরীক্ষা

করায়, মনুষ্য-শরীরকেই মহর্ষি পার্থিব বলিয়া তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমে "মানুষং শরীরং" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনুষ্যলোকস্থ সমস্ত শরীরই মানুষ-শরীর বলিয়া এখানে গ্রহণ করা যায়। মনুষ্য-শরীরের পার্থিবত্ব-সাধনে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন,—গুণান্তরোপলব্ধি। অর্থাৎ জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ হইতে বিভিন্ন গুণ যে গন্ধ, তাহা মনুষ্য-শরীরে উপলব্ধ হয়। গন্ধ পৃথিবীমাত্রের গুণ, উহা জলাদির গুণ নহে, ইহা কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্ত। সুতরাং তদনুসারে মনুষ্য শরীরে গন্ধ হেতুর দ্বারা পার্থিবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। যাহা গন্ধবিশিষ্ট, তাহা পৃথিবী, মনুষ্য-শরীর যখন গন্ধবিশিষ্ট, তখন তাহাও পৃথিবী, এইরূপ অনুমান হইতে পারে। উক্তরূপ অনুমান সমর্থন করিতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, জলাদিতে গন্ধ না থাকায়, জলাদিকে মনুষ্য-শরীরের উপাদান বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ঐ শরীরও গন্ধশূন্য হইয়া পড়ে। অবশ্য মনুষ্য-শরীরের উপাদান কেবল পৃথিবী হইলেও, ঐ পৃথিবীতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও সংযোগ আছে। নচেৎ কেবল পৃথিবীর দ্বারা উহার সৃষ্টি হইলে, উহা চেষ্টাশ্রয়, ইন্দ্রিয়াশ্রয় ও সুখদুঃখের অধিষ্ঠান হইতে পারে না,—অর্থাৎ উহা প্রথম অধ্যায়োক্ত শরীরলক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। কারণ, উপভোগাদি সমর্থ না হইলে, তাহা শরীরপদবাচ্যই হয় না। সুতরাং মনুষ্যশরীরে পৃথিবী প্রধান বা উপাদান হইলেও তাহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও সংযোগ থাকে। পঞ্চভূতের ঐরূপ পরস্পর সংযোগ হইতে পারে। এইরূপ বরুণলোকে, সূর্য্যলোকে ও বায়ুলোকে দেবগণের যথাক্রমে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় যে সমস্ত শরীর আছে, তাহাতে জল, তেজ ও বায়ু প্রধান বা উপাদান কারণ হইলেও তাহাতে অন্য ভূতচতুষ্টয়ের উপষ্টম্ভরূপ বিলক্ষণ সংযোগ আছে। কারণ, পৃথিবীর উপষ্টম্ভ ব্যতীত এবং অন্যান্য ভূতের উপষ্টম্ভ ব্যতীত কোন শরীরই উপভোগ-সমর্থ হয় না। পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোন ভূতের কাঠিন্য নাই। সুতরাং শরীরমাত্রেই পৃথিবীর উপষ্টম্ভ আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকারের "ভূতসংযোগঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পৃথিব্যুপষ্টম্ভঃ"। যে সংযোগ অবয়বীর অজনক হইয়া তাহার সহিত বিদ্যমান থাকে, সেই বিলক্ষণ-সংযোগকে "উপষ্টম্ভ" বলে। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের উৎপত্তিতেও উহার উপাদান পৃথিবীর সহিত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগ আছে, এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই। কারণ, ঐ জলাদির সংযোগ ব্যতীত ঐ স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের যে উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ব-সিদ্ধ। সুতরাং ঐ স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যদৃষ্টান্তে মনুষ্যদেহরূপ পার্থিব দ্রব্যেও জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাষ্যকারের শেষকথার মূল তাৎপর্য্য ॥ ২৭ ॥

সূত্র। পার্থিবাপ্যতৈজসং তদ্গুণোপলব্ধেঃ ॥

॥২৮॥২২৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) মনুষ্য-শরীর পার্থিব, জলীয়, এবং তৈজস, অর্থাৎ

পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই মনুষ্যশরীরের উপাদান। কারণ, (মনুষ্য-শরীরে) সেই ভূতত্রয়ের গুণের অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ এবং জলের গুণ স্নেহ এবং তেজের গুণ উষ্ণস্পর্শের উপলব্ধি হয়।

সূত্র। নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসোপলব্ধেশ্চাতুর্ভৌতিকং ॥২৯॥২২৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের উপলব্ধি হওয়ায়, মনুষ্য-শরীর চাতুর্ভৌতিক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই মনুষ্য-শরীরের উপাদান।

সূত্র। গন্ধ-ক্লেদ-পাক-ব্যূহাবকাশদানেভ্যঃ পাঞ্চ-ভৌতিকং ॥৩০॥২২৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) গন্ধ, ক্লেদ, পাক, ব্যূহ অর্থাৎ নিঃশ্বাসাদি এবং অবকাশ-দান অর্থাৎ ছিদ্রবশতঃ মনুষ্য-শরীর পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ পঞ্চভূতই মনুষ্য-শরীরের উপাদান।

ভাষ্য। ত ইমে সন্দিগ্ধা হেতব ইত্যুপেক্ষিতবান্ সূত্রকারঃ। কথং সন্দিগ্ধাঃ? সতি চ প্রকৃতিভাবে ভূতানাং ধর্ম্মোপলব্ধিরসতি চ সংযোগাপ্রতিষেধাৎ সন্নিহিতানামিতি। যথা স্থাল্যামুদকতেজো বায়্বাকাশানামিতি। তদিদমনেকভূতপ্রকৃতি শরীরমগন্ধমরসমরূপমস্পর্শঞ্চ প্রকৃত্যনুবিধানাৎ স্যাৎ; ন ত্বিদমিত্থম্ভূতং; তস্মাৎ পার্থিবং গুণান্তরোপ-লব্ধেঃ।

অনুবাদ। সেই এই সমস্ত হেতু সন্দিগ্ধ, এজন্য সূত্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত হেতুত্রয়কে সাধ্যসাধক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) সন্দিগ্ধ কেন? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুত্রয়ে সন্দেহের কারণ কি? (উত্তর) পঞ্চভূতের প্রকৃতিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরে পঞ্চভূত উপাদানকারণ হইলেও (তাহাতে পঞ্চভূতের) ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়, না থাকিলেও (পঞ্চভূতের প্রকৃতিত্ব না থাকিলেও) সন্নিহিত অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরে সংযুক্ত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগের অপ্রতিষেধ (সত্তা) বশতঃ সন্নিহিত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়। যেমন স্থালীতে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগের সত্তাবশতঃ (জলাদির) ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়।

সেই এই শরীর অনেক-ভূতপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি বিজাতীয় অনেক ভূত শরীরের উপাদান হইলে, প্রকৃতির অনুবিধানবশতঃ অর্থাৎ উপাদান-কারণের রূপাদি বিশেষগুণজন্যই তাহার কার্য্যদ্রব্যে রূপাদি জন্মে, এই নিয়মবশতঃ (ঐ শরীর) গন্ধশূন্য, রসশূন্য, রূপশূন্য ও স্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে, কিন্তু এই শরীর এবম্ভূত অর্থাৎ গন্ধাদিশূন্য নহে, অতএব গুণান্তরের উপলব্ধিবশতঃ পার্থিব, অর্থাৎ মনুষ্যশরীরে পৃথিবীমাত্রের গুণ—গন্ধের উপলব্ধি হওয়ায়, উহা পার্থিব।

টিপ্পনী। মহর্ষি শরীর-পরীক্ষায় প্রথম সূত্রে মনুষ্য-শরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনপূর্ব্বক পরে পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা ঐ বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করতঃ পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরের উপাদানবিষয়ে ভাষ্যকার পূর্ব্বে যে বিপ্রতিপত্তি প্রকাশ করিয়া তৎপ্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বুঝা গেলেও কোন্ হেতুর দ্বারা কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য-শরীরের উপাদান বিষয়ে কিরূপ মতভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক। মহর্ষি শরীরপরীক্ষা-প্রকরণে আবশ্যকবোধে তিন সূত্রের দ্বারা নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের কথা এই যে, মনুষ্য-শরীরে যেমন পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ জলের অসাধারণ গুণ স্নেহ ও তেজের অসাধারণ গুণ উষ্ণ স্পর্শেরও উপলব্ধি হয়। সুতরাং মনুষ্য-শরীর কেবল পার্থিব নহে, উহা পার্থিব, জলীয় ও তৈজস অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতত্রয়ই মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ। দ্বিতীয় সূত্রের কথা এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ের সহিত চতুর্থ ভূত বায়ুও মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ। কারণ, প্রাণবায়ুর ব্যাপারবিশেষ যে নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস, তাহাও ঐ শরীরে উপলব্ধ হয়। তৃতীয় সূত্রের কথা এই যে, মনুষ্য-শরীরে গন্ধ থাকায় পৃথিবী, ক্লেদ থাকায় জল; জঠরাগ্নির দ্বারা ভুক্ত বস্তুর পাক হওয়ায় তেজ, ব্যূহ[১] অর্থাৎ নিঃশ্বাসাদি থাকায় বায়ু, অবকাশ দান অর্থাৎ ছিদ্র থাকায় আকাশ, এই পঞ্চ ভূতই উপাদান-কারণ। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মতান্তরবাদীদিগের এই সমস্ত হেতু সন্দিগ্ধ বলিয়া মহর্ষি উহা উপেক্ষা করিয়াছেন। সন্দিগ্ধ কেন? এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যশরীরে যে পঞ্চভূতের ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়, তাহা পঞ্চভূত উহার উপাদান হইলেও হইতে পারে, উপাদান না হইলেও হইতে পারে। কারণ, মনুষ্য-শরীরে কেবল পৃথিবী উপাদান-কারণ, জলাদি ভূতচতুষ্টয় নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তেও উহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয় সন্নিহিত অর্থাৎ বিলক্ষণসংযোগবিশিষ্ট থাকায়, মনুষ্যশরীরের অন্তর্গত জলাদিগত স্নেহাদিরই উপলব্ধি হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন পৃথিবীর দ্বারা স্থালী নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও বিলক্ষণ সংযোগ থাকে, উহাতে ঐ ভূতচতুষ্টয় নিমিত্তকারণ হওয়ায়, ঐ সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য—উহা প্রতিষেধ করা যায় না, তদ্রূপ কেবল পৃথিবীকে মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ বলিলেও, তাহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগও

১। ব্যূহো নিঃশ্বাসাদিঃ, অবকাশদানং ছিদ্রং।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

অবশ্য আছে, ইহা প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং জলাদি ভূতচতুষ্টয় মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ না হইলেও স্নেহ, উষ্ণস্পর্শ নিঃশ্বাসাদি ও ছিদ্রের উপলব্ধির কোন অনুপপত্তি নাই। সুতরাং মতান্তরবাদীরা স্নেহাদি যেসকল ধর্ম্মকে হেতু করিয়া মনুষ্য-শরীরে জলীয়ত্বাদির অনুমান করেন, ঐসকল হেতু মনুষ্য-শরীরে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আছে কি না, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উহা হেতু হইতে পারে না। ঐসকল হেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুষ্য-শরীরে নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইলেই, উহার দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অনেক ভূত মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে, উহা গন্ধশূন্য, রসশূন্য, রূপশূন্য ও স্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী ও জল মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ জন্মিতে পারে না। কারণ, জলে গন্ধ নাই। পৃথিবী ও তেজ মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে, উহাতে গন্ধ ও রস—এই উভয়ই জন্মিতে পারে না। কারণ, তেজে গন্ধ নাই ; রসও নাই। পৃথিবী ও বায়ু মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ, রস ও রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, বায়ুতে গন্ধ, রস ও রূপ নাই। পৃথিবী ও আকাশ মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে আকাশে গন্ধাদি না থাকায়, ঐ শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না। এই ভাবে অন্যান্য পক্ষেরও দোষ বুঝিতে হইবে। ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর ইহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের অভিসন্ধি বর্ণন করিয়াছেন যে, পার্থিব ও জলীয় দুইটি পরমাণু কোন এক দ্ব্যণুকের উৎপাদক হইতে পারে না। কারণ, উহার মধ্যে জলীয় পরমাণুতে গন্ধ না থাকায়, ঐ দ্ব্যণুকে গন্ধ জন্মিতে পারে না। পার্থিব পরমাণুতে গন্ধ থাকিলেও, ঐ এক অবয়বস্থ একগন্ধ ঐ দ্ব্যণুকে গন্ধ জন্মাইতে পারে না। কারণ, এক কারণগুণ কখনই কার্য্যদ্রব্যের গুণ জন্মায় না। অবশ্য দুইটি পার্থিব পরমাণু এবং একটি জলীয় পরমাণু—এই তিন পরমাণুর দ্বারা কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে পার্থিব পরমাণু-দ্বয়গত গন্ধদ্বয়রূপ দুইটি কারণগুণের দ্বারা গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তিন পরমাণু বা বহু পরমাণু কোন কার্য্যদ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না[১]। কারণ, বহু পরমাণু কোন কার্য্যদ্রব্যের উপাদান হইতে পারিলে ঘটের অন্তর্গত পরমাণুসমষ্টিকেই ঘটের উপাদানকারণ বলা যাইতে পারে। তাহা স্বীকার করিলে ঘটের নাশ হইলে তখন কপালাদির উপলব্ধি হইতে পারে না। অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টিই একই সময়ে মিলিত হইয়া ঘট উৎপন্ন করিলে মুদ্গর প্রহারের দ্বারা ঘটকে চূর্ণ করিলে, তখন কিছুই উপলব্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ ঘটের উপাদানকারণ পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং বহু পরমাণু কোন কার্য্যদ্রব্যের উপাদান হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত যুক্তির বিশদ বর্ণন করিয়াছেন।[২] পরন্তু পৃথিবী ও জল প্রভৃতি

১। ত্রয়ঃ পরমাণবো ন কার্য্যদ্রব্যমারভন্তে, পরমাণুত্বে সতি বহুত্বসংখ্যাযুক্তত্বাৎ ঘটোপগৃহীতপরমাণুপ্রচয়বৎ। —তাৎপর্য্যটীকা।

২। যদি হি ঘটোপগৃহীতাঃ পরমাণবো ঘটমারভেরন্ ন ঘটে প্রবিভজ্যমানে কপালশর্করাদ্যুপলভ্যেত, তেষামনারব্ধত্বাৎ, ঘটস্যৈব তৈরারব্ধত্বাৎ। তথা সতি মুদ্গরপ্রহারাদ্ ঘটবিনাশে ন কিঞ্চিদুপলভ্যেত, তেষামনারব্ধত্বাৎ, তদবয়বানাং পরমাণূনামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ইত্যাদি।—বেদান্তদর্শন, ২য় অ°, ২য় পা০ ১১শ সূত্রভাষ্য ভামতী দ্রষ্টব্য।

বিজাতীয় অনেক দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সেই কার্য্যদ্রব্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি নানা বিরুদ্ধজাতি স্বীকৃত হওয়ায়, সঙ্করবশতঃ পৃথিবীত্বাদি জাতি হইতে পারে না। পৃথিবী প্রভৃতি অনেকভূত মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে, ঐ শরীর গন্ধাদিশূন্য হইবে কেন? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, প্রকৃতির অনুবিধান। উপাদানকারণ বা সমবায়ি কারণকে প্রকৃতি বলে। ঐ প্রকৃতির বিশেষ গুণ কার্য্যদ্রব্যের বিশেষ গুণের অসমবায়ি-কারণ হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে যে জাতীয় বিশেষ গুণ থাকে, কার্য্যদ্রব্যেও তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বলে, প্রকৃতির অনুবিধান। কিন্তু যেমন একটি উপাদানকারণ কোন কার্য্যদ্রব্য জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ ঐ উপাদানের একমাত্র গুণও কার্য্যদ্রব্যের গুণ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী ও জলাদি মিলিত হইয়া কোন শরীর উৎপন্ন করিলে, ঐ শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না; সুতরাং পৃথিব্যাদি নানাভূত কোন শরীরের উপাদান নহে, ইহা স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি (২৮।২৯।৩০) সূত্রকে অনেকে মহর্ষি গোতমের সূত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ, মহর্ষি কোন সূত্রের দ্বারা ঐ মতত্রয়ের খণ্ডন করেন নাই। প্রচলিত "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থের দ্বারাও ঐ তিনটিকে মহর্ষির সূত্র বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্র ঐ তিনটিকে ন্যায়সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে পাঁচটি সূত্র বলিয়াছেন। "ন্যায়তত্ত্বালোকে" বাচস্পতি মিশ্রও ঐ তিনটিকে পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ তিনটিকে মতান্তর প্রতিপাদক সূত্র বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মহর্ষি গোতম ঐ মতত্রয়ের উল্লেখ করিয়াও তুচ্ছ বলিয়া উহার খণ্ডন করেন নাই, ইহাও লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বোক্ত হেতুত্রয়ের সন্দিগ্ধতাই মহর্ষি গোতমের উপেক্ষার কারণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তিনটি বাক্য মহর্ষির সূত্র হইলেও ভাষ্যকারের ঐ কথা অসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতত্রয়ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং ন্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি উহা উপেক্ষা করেন নাই। পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে,[১] প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পঞ্চাত্মক কোন দ্রব্য নাই। অর্থাৎ পঞ্চভূতই কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে। কণাদের তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ হইলে শরীরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ভূতই থাকায়, শরীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, বৃক্ষাদি প্রত্যক্ষ দ্রব্যের সহিত আকাশাদি অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগ। ঐ সংযোগ যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ—এই দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হওয়ায়, উহার প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ পঞ্চভূতে সমবেত শরীরেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বেদান্তদর্শন ২য় অ০, ২য় পাদের ১১শ

১। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে।—কণাদসূত্র। ৪।২।২।

সূত্রের ভাষ্যশেষে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও কণাদের এই সূত্রের এইরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবী প্রভৃতি ভূতত্রয়ও শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহা সমর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন, যে,[১] ঐ ভূতত্রয়ই উপাদানকারণ হইলে বিজাতীয় অনেক অবয়বের গুণজন্য কার্য্যদ্রব্যরূপ অবয়বীতে গন্ধাদি গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। পূর্ব্বে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের কথায় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।. পার্থিবাদি দ্রব্যে অন্যান্য ভূতের পরমাণুর বিলক্ষণ সংযোগ আছে, ইহা শেষে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন[২] ॥ ৩০ ॥

সূত্র। শ্রুতিপ্রামাণ্যাচ্চ ॥৩১॥২২৯॥

অনুবাদ। শ্রুতির প্রামাণ্যবশতঃও [মনুষ্য-শরীর পার্থিব]।

ভাষ্য। "সূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতা"দিত্যত্র মন্ত্রে "পৃথিবীং তে শরীর"-মিতি শ্রূয়তে। তদিদং প্রকৃতৌ বিকারস্য প্রলয়াভিধানমিতি। "সূর্য্যং তে চক্ষুঃ স্পৃণোমি" ইত্যত্র মন্ত্রান্তরে "পৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি" ইতি শ্রূয়তে। সেয়ং কারণাদ্বিকারস্য স্পৃতিরভিধীয়ত ইতি। স্থাল্যাদিষু চ তুল্যজাতীয়ানামেককার্য্যারম্ভদর্শনাদ্ভিন্নজাতীয়ানামেক-কার্য্যারম্ভানুপপত্তিঃ।

অনুবাদ। "সূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতাৎ" এই মন্ত্রে "পৃথিবীং তে শরীরং" এই বাক্য শ্রুত হয়। সেই ইহা প্রকৃতিতে বিকারের লয়-কথন। "সূর্য্যং তে চক্ষুঃ স্পৃণোমি" এই মন্ত্রান্তরে "পৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি" এই বাক্য শ্রুত হয়। সেই ইহা কারণ হইতে বিকারের "স্পৃতি" অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইতেছে। স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যেও একজাতীয় কারণের "এককার্য্যারম্ভ" অর্থাৎ এক কার্য্যের আরম্ভকত্ব বা উপাদানত্ব দেখা যায়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় পদার্থের এককার্য্যারম্ভকত্ব উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে প্রথম সূত্রে মনুষ্য-শরীরের পার্থিবত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, পরে তিন সূত্রের দ্বারা ঐ বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতান্তরবাদীরা যে সকল হেতুর দ্বারা ঐ সকল মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাকে সন্দিগ্ধ বলিলে মনুষ্যশরীরে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহাকেও সন্দিগ্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ, জলাদি ভূতত্রয় বা ভূতচতুষ্টয় মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলেও পৃথিবী তাহাতে নিমিত্তকারণরূপে সন্নিহিত বা সংযুক্ত থাকায়, সেই পৃথিবী-ভাগের গন্ধই ঐ শরীরে উপলব্ধ হয়, ইহাও তুল্যভাবে বলা যাইতে পারে। পরন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের শেষভাগে[৩]

১। গুণান্তরা প্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকং। ২। অণুসংযোগস্ত্বপ্রতিষিদ্ধঃ।—বৈশেষিক দর্শন। ৪।২।৩।৪।

৩। "সেয়ং দেবতৈক্ষত।হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ ইত্যাদি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ভূতত্রয়ের যে "ত্রিবৃৎকরণ" কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পঞ্চীকরণও প্রতিপাদিত[1] হওয়ায়, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান, ইহা বুঝা যায়। অনেক সম্প্রদায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ কথার দ্বারা পঞ্চভূতই যে ভৌতিক দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহর্ষি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শ্রুতির প্রামাণ্যবশতঃও মনুষ্যশরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধ হয়। কোন্ শ্রুতির দ্বারা মনুষ্যশরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার অগ্নিহোত্রীর দাহকালে পাঠ্য মন্ত্রের মধ্যে "পৃথিবীং তে শরীরং" এই বাক্যের দ্বারা মনুষ্যশরীরের পার্থিবত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক, এইরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকৃতিতে বকারের লয় কথিত হওয়ায়, পৃথিবীই যে, মনুষ্যশরীরের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ, বিনাশকালে উপাদানকারণেই তাহার কার্য্যের লয় হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। এইরূপ অন্য একটি মন্ত্রের মধ্যে "পৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি" এইরূপ যে বাক্য আছে, তদ্দ্বারা পৃথিবীরূপ উপাদানকারণ হইতেই মনুষ্যশরীরের উৎপত্তি বুঝা যায়[2]। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই যুক্তি-সিদ্ধ, সুতরাং উহাই বেদের প্রকৃতসিদ্ধান্ত, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও একজাতীয় অনেক দ্রব্যই এক দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহা দৃষ্ট হয়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় নানাদ্রব্য কোন এক দ্রব্যের উপাদান হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা যখন মনুষ্যশরীরের পার্থিবত্বই সিদ্ধ হইতেছে, তখন অন্য কোন অনুমানের দ্বারা ভূতত্রয় অথবা ভূতচতুষ্টয় অথবা পঞ্চভূতই মনুষ্যশরীরের উপাদান, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, উহা "ন্যায়াভাস" নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা তাহার পূর্ব্বোক্ত মতত্রয়েরও খণ্ডন হইয়াছে। পরন্তু মহর্ষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান যে, প্রমাণই নহে, ইহাও সূচনা করিয়া গিয়াছেন। এবং ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যোপনিষদে "ত্রিবৃৎকরণ" শ্রুতির দ্বারা ভূতত্রয় বা পঞ্চভূতের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অন্যশ্রুতির দ্বারা একমাত্র পৃথিবীই যে মনুষ্যশরীরের উপাদানকারণ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এবং অন্যান্য ভূত নিমিত্তকারণ হইলেও ছান্দোগ্যোপনিষদের 'ত্রিবৃৎকরণ' শ্রুতির উপপত্তি হইতে পারে। মহর্ষি কণাদও তিনটি সূত্র দ্বারা ঐ শ্রুতির ঐরূপই তাৎপর্য্য সূচনা করিয়া গিয়াছেন ॥৩১॥

শরীরপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

১। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ।—বেদান্তসার।

২। "স্পৃণোমি"। এই প্রয়োগে "স্পৃ" ধাতুর দ্বারা যে স্পৃতি অর্থ বুঝা যায়, এবং ভাষ্যকার "স্পৃতি" শব্দের দ্বারাই যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্র ঐ "স্পৃতি"র অর্থ বলিয়াছেন, কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি। "সেয়ং স্পৃতিঃ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ"।—ন্যায়বার্ত্তিক। "স্পৃতিরুৎপত্তিরিত্যর্থঃ"।—তাৎপর্য্যটীকা।

ভাষ্য। অথেদানীমিন্দ্রিয়াণি প্রমেয়ক্রমেণ বিচার্য্যন্তে, কিমাব্যক্তিকান্যাহোস্বিদ্—ভৌতিকানীতি। কুতঃ সংশয়ঃ ?

অনুবাদ। অনন্তর ইদানীং প্রমেয়ক্রমানুসারে ইন্দ্রিয়গুলি পরীক্ষিত হইতেছে, (সংশয়) ইন্দ্রিয়গুলি কি আব্যক্তিক ? অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে সম্ভূত ? অথবা ভৌতিক ? (প্রশ্ন) সংশয় কেন ? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় কেন হয় ?

সূত্র। কৃষ্ণসারে সত্যুপলম্ভাদ্ব্যতিরিচ্য চোপলম্ভাৎ সংশয়ঃ ॥৩২॥২৩০॥

অনুবাদ। (উত্তর) কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক থাকিলেই (রূপের) উপলব্ধি হয়, এবং কৃষ্ণসারকে[১] প্রাপ্ত না হইয়া (অবস্থিত বিষয়ের) অর্থাৎ কৃষ্ণসারের দূরস্থ বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, এজন্য (পূর্ব্বোক্তরূপ) সংশয় হয়।

ভাষ্য। কৃষ্ণসারং ভৌতিকং, তস্মিন্ননুপহতে রূপোপলব্ধিঃ, উপহতে চানুপলব্ধিরিতি। ব্যতিরিচ্য কৃষ্ণসারমবস্থিতস্য বিষয়স্যোপলম্ভো ন কৃষ্ণসারপ্রাপ্তস্য, ন চাপ্রাপ্যকারিত্বমিন্দ্রিয়াণাং, তদিদমভৌতিকত্বে বিভুত্বাৎ সম্ভবতি। এবমুভয়ধর্ম্মোপলব্ধেঃ সংশয়ঃ।

অনুবাদ। কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক ভৌতিক, সেই কৃষ্ণসার উপহত না হইলে রূপের উপলব্ধি হয়, উপহত হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। (এবং) কৃষ্ণসারকে ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত না হইয়া অবস্থিত বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, কৃষ্ণসার প্রাপ্ত-বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিতাও অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বিষয়ের গ্রাহকতাও নাই। সেই ইহা অর্থাৎ প্রাপ্যকারিতা বা সম্বদ্ধ বিষয়ের গ্রাহকতা (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) অভৌতিকত্ব হইলে বিভুত্ববশতঃ সম্ভব হয়। এইরূপে উভয় ধর্ম্মের উপলব্ধিবশতঃ (পূর্ব্বোক্তরূপ) সংশয় হয়।

১। সূত্রে "ব্যতিরিচ্য উপলম্ভাৎ" এই বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণসারং ব্যতিরিচ্য অপ্রাপ্য অবস্থিতস্য বিষয়স্য উপলম্ভাৎ" অর্থাৎ "কৃষ্ণসারাদ্দূরেস্থিতস্যৈব রূপাদের্ব্বিষয়স্য প্রত্যক্ষাৎ" এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের কথার দ্বারা বুঝা যায়। সূত্রোক্ত সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত "কৃষ্ণসার" শব্দেরই দ্বিতীয়া বিভক্তির যোগে অনুষঙ্গ করিয়া "কৃষ্ণসারং ব্যতিরিচ্য" এইরূপ যোজনাই মহর্ষির অভিপ্রেত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ব্যতিরিচ্য বিষয়ং প্রাপ্য"। বৃত্তিকারের ঐ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বুঝিতে পারি না।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যে ক্রমে আত্মা হইতে অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের উদ্দেশপূর্ব্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই ক্রমানুসারে আত্মা ও শরীরের পরীক্ষা করিয়া এখন ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করিতেছেন। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, এজন্য মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয় পরীক্ষার পূর্ব্বাঙ্গ সংশয়ের হেতুর উল্লেখ করিয়া তদ্বিষয়ে সংশয় সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে ঐ সংশয়ের আকার প্রদর্শন করিয়া, উহার হেতু প্রকাশ করিতে মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সাংখ্যমতে অব্যক্ত অর্থাৎ মূল-প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ, তাহার পরিণাম অহঙ্কার, ঐ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মূল কারণ হওয়ায়, ঐ তাৎপর্য্যে—ইন্দ্রিয়গুলিকে আব্যক্তিক (অব্যক্তসম্ভূত) বলা যায়। এবং ন্যায়মতে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ পৃথিব্যাদি ভূতজন্য বলিয়া উহাদিগকে ভৌতিক বলা হয়। মহর্ষি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। চক্ষুর আবরণ কোমল চর্ম্মের মধ্যভাগে যে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহাই সূত্রে "কৃষ্ণসার" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। উহার প্রসিদ্ধ নাম চক্ষুর্গোলক। যাহার ঐ চক্ষুর্গোলক আছে, উহা উপহত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই রূপ দর্শন করিতে পারে। যাহার উহা নাই, সে রূপ দর্শন করিতে পারে না। সুতরাং রূপ দর্শনের সাধন ঐ কৃষ্ণসার বা চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিন্দ্রিয়, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় ভৌতিকই হয়। কারণ, ঐ কৃষ্ণসার ভৌতিক পদার্থ, ইহা সর্ব্বসম্মত। এইরূপ এই দৃষ্টান্তে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়কেও সেই সেই স্থানস্থ ভৌতিক পদার্থবিশেষ স্বীকার করিলে, ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই ভৌতিক, ইহা বলা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে, এজন্য উহাদিগকে প্রাপ্যকারী বলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়বর্গের এই প্রাপ্যকারিত্ব পরে সমর্থিত হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণসারই চক্ষুরিন্দ্রিয়—ইহা বলা যায় না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি ঐ কৃষ্ণসারকে ব্যতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ উহার সহিত অসন্নিকৃষ্ট হইয়া দূরে অবস্থিত থাকে। সুতরাং উহা ঐ রূপাদির প্রত্যক্ষজনক ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। এইরূপ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলিরও বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ অবশ্যস্বীকার্য্য। নচেৎ তাহাদিগেরও প্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে পারে না। সাংখ্যমতানুসারে যদি ইন্দ্রিয়বর্গকে অভৌতিক বলা যায়, অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে সমুদ্ভূত বলা যায়, তাহা হইলে উহারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ না হইয়া, বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হয়। সুতরাং উহারা বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতে পারায়, উহাদিগের প্রাপ্যকারিত্বের কোন বাধা হয় না। এইরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গে অভৌতিক ও ভৌতিক পদার্থের সমান ধর্ম্মের জ্ঞান-জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয়ে মহর্ষিসূত্রানুসারে উভয় ধর্ম্মের উপলব্ধি অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয়কেই কারণ বলিয়াছেন, ইহা ভাষ্য-সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত সংশয়কে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি কি আহঙ্কারিক? অথবা ভৌতিক? এইরূপ সংশয় সাংখ্য ও নৈয়ায়িকের বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত। এবং ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক এই

পক্ষে কৃষ্ণসারই ইন্দ্রিয় ? অথবা ঐ কৃষ্ণসারে অধিষ্ঠিত কোন তৈজস পদার্থই ইন্দ্রিয় ? এইরূপ সংশয়ও ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ সংশয়কে বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িকের বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বলিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিন্দ্রিয়, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্য ও বার্ত্তিকের প্রচলিত পাঠের দ্বারা এখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির কোন কথাই বুঝা যায় না। অবশ্য পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু মহর্ষির সূত্র দ্বারা তিনি যে এখানে বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই ॥৩২॥

ভাষ্য। অভৌতিকানীত্যাহ। কস্মাৎ ?

অনুবাদ। [ইন্দ্রিয়গুলি] অভৌতিক, ইহা (সাংখ্য-সম্প্রদায়) বলেন (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। মহদণুগ্রহণাৎ ॥ ৩৩॥২৩১॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু মহৎ ও অণুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) হয়।

ভাষ্য। মহদিতি মহত্তরং মহত্তমঞ্চোপলভ্যতে, যথা ন্যগ্রোধ-পর্ব্বতাদি। অণ্বিতি অণুতরমণুতমঞ্চ গৃহ্যতে, যথা ন্যগ্রোধধানাদি। তদুভয়মুপলভ্যমানং চক্ষুষো ভৌতিকত্বং বাধতে। ভৌতিকং হি যাবত্তাবদেব ব্যাপ্নোতি, অভৌতিকন্তু বিভুত্বাৎ সর্ব্বব্যাপকমিতি।

অনুবাদ। "মহৎ" এই প্রকারে মহত্তর ও মহত্তম বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, যেমন বটবৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি। "অণু" এই প্রকারে অণুতর ও অণুতম বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, যেমন বটবৃক্ষের অঙ্কুর প্রভৃতি। সেই উভয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহৎ ও অণুদ্রব্য উপলভ্যমান হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব বাধিত করে। যেহেতু ভৌতিক বস্তু যাবৎপরিমিত, তাবৎপরিমিত বস্তুকেই ব্যাপ্ত করে, কিন্তু অভৌতিক বস্তু বিভুত্ববশতঃ সর্ব্বব্যাপক হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব ও অভৌতিকত্ব-বিষয়ে সংশয় সমর্থন করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের সম্মত অভৌতিকত্ব পক্ষের সাধন করিয়াছেন। অভৌতিকত্ব-রূপ পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, উহার খণ্ডন করাই মহর্ষির উদ্দেশ্য। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি এখানে বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়বর্গ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অভৌতিক ও সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়ও অভৌতিক ও সর্ব্বব্যাপী। মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা ঐ

সাংখ্য মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা মহৎ এবং অণুদ্রব্যের এবং মহত্তর ও মহত্তম দ্রব্যের এবং অণুতর ও অণুতম দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ হইলে উহা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হওয়ায়, কোন দ্রব্যের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা হইতে বৃহৎপরিমাণ কোন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন অণুপদার্থের ন্যায় মহৎ পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ নহে, উহা অভৌতিক পদার্থ, সুতরাং উহা অণু ও মহৎ সর্ব্ববিধ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যকেই ব্যাপ্ত করিতে পারে, অর্থাৎ বৃত্তিরূপে উহার সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। জ্ঞান যেমন অভৌতিক পদার্থ বলিয়া মহৎ ও অণু, সর্ব্ববিষয়েরই প্রকাশক হয়, তদ্রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় অভৌতিক পদার্থ হইলেই তাহার গ্রাহ্য সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে। মূলকথা, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও সাংখ্যসম্মত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং অহঙ্কারের ন্যায় অভৌতিক ও বৃত্তিরূপে উহা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হয়॥ ৩৩॥

ভাষ্য। ন মহদণুগ্রহণমাত্রাদভৌতিকত্বং বিভুত্বঞ্চেন্দ্রিয়াণাং শক্যং প্রতিপত্তুং, ইদং খলু—

অনুবাদ। (উত্তর) মহৎ ও অণুপদার্থের জ্ঞানমাত্রপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অভৌতিকত্ব ও বিভুত্ব বুঝিতে পারা যায় না। যেহেতু ইহা—

সূত্র। রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষবিশেষাত্তদ্‌গ্রহণং ॥৩৪॥২৩২॥

অনুবাদ। রশ্মি ও অর্থের অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি ও গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত মহৎ ও অণুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) হয়।

ভাষ্য। তয়োর্মহদণ্বোর্গ্রহণং চক্ষূরশ্মেরর্থস্য চ সন্নিকর্ষবিশেষাদ্‌ভবতি। যথা, প্রদীপরশ্মেরর্থস্য চেতি। রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষবিশেষশ্চাবরণলিঙ্গঃ। চাক্ষুষো হি রশ্মিঃ কুড্যাদিভিরাবৃতমর্থং ন প্রকাশয়তি, যথা প্রদীপরশ্মিরিতি।

অনুবাদ। চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, যেমন প্রদীপরশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ বশতঃ (পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ হয়) চক্ষুর রশ্মিও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ, কিন্তু আবরণলিঙ্গ, অর্থাৎ আবরণরূপ হেতুর দ্বারা অনুমেয়। যেহেতু প্রদীপরশ্মির ন্যায় চাক্ষুষ রশ্মি কুড্যাদির দ্বারা আবৃত পদার্থকে প্রকাশ করে না।

। মহর্ষি এই সূত্রদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মির সহিত দূরস্থ বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, এই মাত্র হেতুর দ্বারাই ইন্দ্রিয়বর্গের অভৌতিকত্ব এবং বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষস্থলে ঐ ইন্দ্রিয়ের রশ্মি দূরস্থ গ্রাহ্য বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, ঐ রশ্মির সহিত গ্রাহ্যবিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ হইলেই সেই বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপদার্থ, প্রদীপের ন্যায় উহারও রশ্মি আছে। কারণ, যেমন প্রদীপের রশ্মি কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তুর প্রকাশ করে না, তদ্রূপ চক্ষুর রশ্মিও কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তুর প্রকাশ করে না। সুতরাং সেই স্থলে গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষ হয় না এবং অনাবৃত নিকটস্থ পদার্থে চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষ হয়, সুতরাং চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা স্বীকার্য্য। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির তাৎপর্য্য সূচনা করিয়াই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "ইদং খলু" এই বাক্যের সহিত সূত্রের "তদগ্রহণং" এই বাক্যের যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত, বুঝা যায় ॥৩৪॥

ভাষ্য। আবরণানুমেয়ত্বে সতীদমাহ—

অনুবাদ। আবরণ দ্বারা অনুমেয়ত্ব হইলে, অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয়, ইহা অবরণ দ্বারা অনুমানসিদ্ধ, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্র (পরবর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষসূত্র) বলিতেছেন—

সূত্র। তদনুপলব্ধেরহেতুঃ ॥৩৫॥২৩৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্ষুর রশ্মির অপ্রত্যক্ষবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত হেতু) অহেতু।

ভাষ্য। রূপস্পর্শবদ্ধি তেজঃ, মহত্ত্বাদনেকদ্রব্যবত্ত্বাদ্রূপবত্ত্বাচ্চোপলব্ধি-রিতি প্রদীপবৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যেত, চাক্ষুষো রশ্মির্যদি স্যাদিতি।

অনুবাদ। যেহেতু তেজঃপদার্থ রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট, মহত্ত্বপ্রযুক্ত অনেক-দ্রব্যবত্ত্বপ্রযুক্ত ও রূপবত্ত্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, সুতরাং যদি চক্ষুর রশ্মি থাকে, তাহা হইলে (উহা) প্রত্যক্ষ দ্বারা উপলব্ধ হউক ?

টিপ্পনী। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি আছে, উহা তেজঃ পদার্থ, সুতরাং উহার সহিত সন্নিকর্ষবিশেষ বশতঃ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে, দূরস্থ বিষয়েরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে

পারে ও হইয়া থাকে। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ইহা বলিয়াছেন। চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ, আবরণ দ্বারা অনুমানসিদ্ধ, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। এখন যাঁহারা চক্ষুর রশ্মি স্বীকার করেন না, তাহাদিগের পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি স্বীকার করিলে, উহাকে তেজঃপদার্থ বলিতে হইবে, সুতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তেজঃপদার্থ মাত্রই রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট। তাহা হইলে প্রদীপের ন্যায় চক্ষুর রশ্মিরও প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। কারণ, মহত্ত্ব অনেকদ্রব্যবত্ত্ব ও রূপবত্ত্বপ্রযুক্ত দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দ্রব্যের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে মহত্ত্বাদি ঐ তিনটি কারণ[1]। দূরস্থ মহৎপদার্থের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে উহার মহত্ত্ব বা মহৎপরিমাণাদিও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ থাকায়, প্রদীপের ন্যায় চক্ষুর রশ্মির কেন প্রত্যক্ষ হয় না? প্রত্যক্ষের কারণসমূহ সত্ত্বেও যখন উহার প্রত্যক্ষ হয় না, তখন উহার অস্তিত্বই নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং উহার অনুমানে কোন হেতুই হইতে পারে না। যাহা অসিদ্ধ বা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার অনুমান অসম্ভব। তাহার অনুমানে প্রযুক্ত হেতু অহেতু ॥ ৩৫ ॥

১। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষে মহত্ত্বের সহিত অনেকদ্রব্যবত্ত্বকেও কারণ বলিয়াছেন। বার্ত্তিককারও ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষে মহত্ত্ব ও অনেকদ্রব্যবত্ত্ব—এই উভয়কেই কেন কারণ বলিতে হইবে, ইহা তাঁহারা কেহ বলেন নাই। নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মহত্ত্ব জাতি, সুতরাং মহত্ত্বকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে কারণতাবচ্ছেদকের লাঘব হয়, এজন্য প্রত্যক্ষে মহত্ত্বই কারণ, অনেক দ্রব্যবত্ত্ব কারণ নহে, উহা অন্যথাসিদ্ধ। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর" টীকায় মহাদেব ভট্টও ঐ বিষয়ে কোন মতান্তর প্রকাশ করেন নাই। তিনি অনেক দ্রব্যবত্ত্বের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অণুভিন্ন দ্রব্যত্বই অনেকদ্রব্যবত্ত্ব। সুতরাং উহা আত্মাতেও আছে। সে যাহাই হউক, প্রাচীন মতে যে মহত্ত্বের ন্যায় অনেকদ্রব্যবত্ত্বও প্রত্যক্ষে বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা পরম প্রাচীন বাৎস্যায়ন প্রভৃতির কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি কণাদের "মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ" (বৈশেষিকদর্শন ৪অ° ১আ° ষষ্ঠ সূত্র) এই সূত্রই পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সিদ্ধান্তের মূল বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, অবয়বের বহুত্বপ্রযুক্ত মহত্ত্বের আশ্রয়ত্বই অনেকদ্রব্যবত্ত্ব। কণাদের সূত্রানুসারে মহত্ত্বের ন্যায় উহাকেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ বলিতে হইবে। তুল্যভাবে ঐ উভয়েরই অন্বয়-ব্যতিরেক-জ্ঞানবশতঃ উভয়কেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উহার একের দ্বারা অপরটি অন্যথাসিদ্ধ হইবে না। দূরস্থ দ্রব্যে মহত্ত্বের উৎকর্ষে প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষ হয়, ইহা বলিলে সেখানে অনেক দ্রব্যবত্ত্বের উৎকর্ষও তাহার কারণ বলিতে পারি। পরন্তু কোনস্থলে অনেক দ্রব্যবত্ত্বের উৎকর্ষই প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষের কারণ, ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য। কারণ, মর্কটের সূত্র-জালে মর্কটের অপেক্ষায় মহত্ত্বের উৎকর্ষ থাকিলেও দূর হইতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তত্রত্য মর্কটের প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ সূক্ষ্মসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রের দূর হইতে প্রত্যক্ষ না হইলেও তদপেক্ষায় স্বল্পপরিমাণ মুদ্গরের সেখানে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মর্কট ও মুদ্গরে অনেকদ্রব্যবত্ত্বের উৎকর্ষ থাকাতেই সেখানে তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং মহত্ত্বের ন্যায় অনেকদ্রব্যবত্ত্বকেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ বলিতে হইবে। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্র ও শঙ্কর মিশ্রের কথাগুলি প্রণিধান করিয়া প্রাচীন মতের যুক্তি চিন্তা করিবেন।

সূত্র। নানুমীয়মানস্য প্রত্যক্ষতোঽনুপলব্ধিরভাব-হেতুঃ ॥৩৬॥২৩৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) অনুমীয়মান পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি অভাবের সাধক হয় না।

ভাষ্য। সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থেনাবরণেন লিঙ্গেনানুমীয়মানস্য রশ্মের্যা প্রত্যক্ষতোঽনুপলব্ধির্নাসাবভাবং প্রতিপাদয়তি, যথা চন্দ্রমসঃ পরভাগস্য পৃথিব্যাশ্চাধোভাগস্য।

অনুবাদ। সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থ অর্থাৎ সন্নিকর্ষ না হওয়া যাহার প্রয়োজন বা ফল, এমন আবরণরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমীয়মান রশ্মির প্রত্যক্ষতঃ যে অনুপলব্ধি, উহা অভাবপ্রতিপাদন করে না, যেমন চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগের (প্রত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি অভাবপ্রতিপাদন করে না)।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাহা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, এমন পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না হওয়া তাহার অভাবের প্রতিপাদক হয় না। বস্তুমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না, অনেক অতীন্দ্রিয় বস্তুও আছে, প্রমাণ দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার দৃষ্টান্তরূপে চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগ আমাদিগের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহার অপলাপ কেহই করিতে পারেন না। কারণ, উহা অনুমান বা যুক্তিসিদ্ধ। এইরূপ চক্ষুর রশ্মিও অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ হওয়ায়, উহারও আপলাপ করা যায় না। কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তু দেখা যায় না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। সুতরাং ঐ আবরণ চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের প্রতিষেধক বা প্রতিবন্ধক হয়, ইহাই সেখানে বলিতে হইবে। নচেৎ সেখানে কেন প্রত্যক্ষ হয় না? সুতরাং এইভাবে আবরণ চক্ষুর রশ্মির অনুমাপক হওয়ায়, উহা অনুমানসিদ্ধ হয়॥ ৩৬॥

সূত্র। দ্রব্য-গুণ-ধর্ম্মভেদাচ্চোপলব্ধিনিয়মঃ ॥৩৭॥২৩৫॥

অনুবাদ। পরন্তু দ্রব্য-ধর্ম্ম ও গুণ-ধর্ম্মের ভেদবশতঃ উপলব্ধির (প্রত্যক্ষের) নিয়ম হইয়াছে।

ভাষ্য। ভিন্নঃ খল্বয়ং দ্রব্যধর্ম্মো গুণধর্ম্মশ্চ, মহদনেকদ্রব্যবচ্চ বিষক্তাবয়বমাপ্যং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যতে, স্পর্শস্তু শীতো গৃহ্যতে।

তস্য দ্রব্যস্যানুবন্ধাৎ হেমন্তশিশিরৌ কল্প্যেতে। তথাবিধমেব চ তৈজসং দ্রব্যমনুদ্ভূতরূপং সহ রূপেণ নোপলভ্যতে, স্পর্শস্ত্বস্যোষ্ণ উপলভ্যতে। তস্য দ্রব্যস্যানুবন্ধাদ্‌গ্রীষ্মবসন্তৌ কল্প্যেতে।

অনুবাদ। এই দ্রব্য-ধর্ম্ম ও গুণ-ধর্ম্ম ভিন্নই, বিষক্তাবয়ব অর্থাৎ যাহার অবয়ব দ্রব্যান্তরের সহিত বিষক্ত বা মিশ্রিত হইয়াছে, এমন জলীয় দ্রব্য মহৎ ও অনেক দ্রব্য সমবেত হইয়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু (ঐ দ্রব্যের) শীত স্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রব্যের সম্বন্ধবিশেষবশতঃ হেমন্ত ও শীত ঋতু কল্পিত হয়। এবং অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট তথাবিধ (বিষক্তাবয়ব) তৈজস দ্রব্যই রূপের সহিত উপলব্ধ হয় না, কিন্তু উহার উষ্ণস্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রব্যের সম্বন্ধবিশেষবশতঃ গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতু কল্পিত হয়।

টিপ্পনী। চক্ষুর রশ্মি অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং উহার প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহা স্বীকার্য্য, এই কথা পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য তেজঃপদার্থ এবং তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ চক্ষুর রশ্মি ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, দ্রব্য ও গুণের ধর্ম্মভেদবশতঃ প্রত্যক্ষের নিয়ম হইয়াছে। ভাষ্যকার মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, জলীয় দ্রব্য মহত্ত্বাদিকারণপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হইলেও, উহা যখন বিষক্তাবয়ব হয়, অর্থাৎ পৃথিবী বা বায়ুর মধ্যে উহার অবয়বগুলি যখন বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হয়, তখন ঐ জলীয় দ্রব্যের এবং উহার রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু তখন তাহার শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্তরূপ জলীয় দ্রব্যের এবং তাহার রূপের প্রত্যক্ষ প্রয়োজক ধর্ম্মভেদ না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু উহার শীতস্পর্শরূপ গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কারণ, তাহাতে প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধর্ম্মভেদ (উদ্ভূতত্ব) আছে। ঐ শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার আধার জলীয় দ্রব্য ও তাহার রূপ অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ জলীয় দ্রব্য শিশিরের সম্বন্ধবিশেষই হেমন্ত ও শীত ঋতুর ব্যঞ্জক হওয়ায়, তদ্দ্বারা ঐ ঋতুদ্বয়ের কল্পনা হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার তৈজসদ্রব্যে উদ্ভূতরূপ না থাকায়, তাহার এবং তাহার রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু তাহার উষ্ণস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাদৃশ তৈজসদ্রব্যের (উষ্মার) সম্বন্ধবিশেষই গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুর ব্যঞ্জক হওয়ায়, তদ্দ্বারা ঐ ঋতুদ্বয়ের কল্পনা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ তৈজসদ্রব্য ও তাহার রূপ অনুমানসিদ্ধ হয়। মূলকথা, দ্রব্যমাত্র ও গুণমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। যে দ্রব্য ও যে গুণে প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধর্ম্মবিশেষ আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তুর অভাব নির্ণয় করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকার জলীয় ও তৈজস দ্রব্য এবং তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ চক্ষুর রশ্মি ও তাহার রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধর্ম্মভেদ

উহাতে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উহার অভাব নির্ণয় করা যায় না। কারণ, উহা পূর্ব্বোক্তরূপে অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য। যত্র ত্বেষা ভবতি—

অনুবাদ। যাহা বিদ্যমান থাকিলেই অর্থাৎ যাহার সত্তাপ্রযুক্ত এই উপলব্ধি হয়, (সেই ধর্ম্মভেদ পরসূত্রে বলিতেছেন)—

সূত্র। অনেকদ্রব্যসমবায়াদ্রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ ॥৩৮॥২৩৬॥ *

অনুবাদ। বহুদ্রব্যের সহিত সমবায়সম্বন্ধপ্রযুক্ত এবং রূপবিশেষ প্রযুক্ত রূপের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। যত্র রূপঞ্চ দ্রব্যঞ্চ তদাশ্রয়ঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে। রূপবিশেষস্তু যদ্ভাবাৎ ক্বচিদ্রূপোপলব্ধিঃ, যদভাবাচ্চ দ্রব্যস্য ক্বচিদনুপলব্ধিঃ,—স রূপধর্ম্মোঽয়মুদ্ভবসমাখ্যাত ইতি। অনুদ্ভূতরূপশ্চায়ং নায়নো রশ্মিঃ, তস্মাৎ প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ তেজসো ধর্ম্মভেদঃ, উদ্ভূতরূপস্পর্শং প্রত্যক্ষং তেজো যথা আদিত্যরশ্ময়ঃ। উদ্ভূতরূপমনুদ্ভূতস্পর্শঞ্চ প্রত্যক্ষং তেজো যথা প্রদীপরশ্ময়ঃ। উদ্ভূতস্পর্শমনুদ্ভূতরূপমপ্রত্যক্ষং যথাঽবাদি সংযুক্তং তেজঃ। অনুদ্ভূতরূপস্পর্শোঽপ্রত্যক্ষশ্চাক্ষুষো রশ্মিরিতি।

অনুবাদ। যাহা বিদ্যমান থাকিলে অর্থাৎ যে "রূপবিশেষে"র সত্তাপ্রযুক্ত রূপ এবং তাহার আধারদ্রব্যও প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়, (তাহাই পূর্ব্বসূত্রোক্ত ধর্ম্মভেদ)।

রূপবিশেষ কিন্তু—যাহার সত্তাপ্রযুক্ত কোন স্থলে রূপের প্রত্যক্ষ হয়, এবং যাহার অভাবপ্রযুক্ত কোন স্থলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, সেই এই রূপ-ধর্ম্ম

* বৈশেষিক দর্শনেও এইরূপ সূত্র দেখা যায়। (৪অ০ ১আ০ ৮ম সূত্র দ্রষ্টব্য) শঙ্কর মিশ্র সেই সূত্রে "রূপ-বিশেষ" শব্দের দ্বারা উদ্ভূতত্ব, অনভিভূতত্ব ও রূপত্ব—এই ধর্ম্মত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার প্রভৃতি "রূপবিশেষ" শব্দের দ্বারা কেবল উদ্ভব বা উদ্ভূতত্ব ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক সূত্রের উপস্কারে প্রথমে উদ্ভূতত্বকে জাতিবিশেষ বলিয়া পরে উহাকে ধর্ম্মবিশেষই বলিয়াছেন। চিন্তামণিকার গঙ্গেশ প্রথমকল্পে অনুদ্ভূতত্বের অভাবসমূহকেই উদ্ভূতত্ব বলিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র এই মতের খণ্ডন করিলেও, বিশ্বনাথ পঞ্চানন সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

(রূপগত ধর্ম্মবিশেষ) উদ্ভবসমাখ্যাত অর্থাৎ উদ্ভব বা উদ্ভূতত্ব নামে খ্যাত। কিন্তু এই চাক্ষুষ রশ্মি অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট, অর্থাৎ উহার রূপে পূর্ব্বোক্ত রূপবিশেষ বা উদ্ভূতত্ব নাই, অতএব (উহা) প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না।

তেজঃপদার্থের ধর্ম্মভেদ দেখাও যায়। (উদাহরণ) (১) উদ্ভূত রূপও উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন সূর্য্যের রশ্মি। (২) উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট ও অনুদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন প্রদীপের রশ্মি (৩) উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট ও অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন জলাদির সহিত সংযুক্ত তেজঃ। (৪) অনুদ্ভূতরূপ ও অনুদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজঃ চাক্ষুষ রশ্মি।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি যে "দ্রব্যগুণধর্ম্মভেদ" বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ ? এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহা সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে "এষা" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত উপলব্ধিকে গ্রহণ করিয়া, পরে সূত্রস্থ "রূপোপলব্ধি" শব্দের দ্বারা রূপ এবং রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের উপলব্ধিই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরে সূত্রস্থ "রূপবিশেষ" শব্দের দ্বারা রূপের বিশেষক ধর্ম্মই মহর্ষির বিবক্ষিত, অর্থাৎ "রূপবিশেষ" শব্দের দ্বারা এখানে রূপগত ধর্ম্মবিশেষই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন। ঐ রূপগত ধর্ম্মবিশেষের নাম উদ্ভব বা উদ্ভূতত্ব। উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত, এই দুই প্রকার রূপ আছে। তন্মধ্যে উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ যেরূপে উদ্ভূতত্ব নামক বিশেষধর্ম্ম আছে, তাহার এবং সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং রূপগত বিশেষধর্ম্ম ঐ উদ্ভূতত্ব, রূপ এবং তাহার আশ্রয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রযোজক। মহর্ষি "রূপবিশেষাৎ" এই কথার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। এবং "অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ" এই কথার দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত অনেক দ্রব্যবত্ত্ব অর্থাৎ বহুদ্রব্যবত্ত্বও যে ঐ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা সূচনা করিয়াছেন। দ্ব্যণুকে উদ্ভূতরূপ থাকিলেও তাহাতে বহুদ্রব্যসমবেতত্ব না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। মহর্ষি গোতম এই সূত্রে মহত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে মহত্ত্বও ঐ প্রত্যক্ষের কারণ—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা মহত্ত্বের সমুচ্চয়ও ভাষ্যকার বলিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার তাহা কিছু বলেন নাই। রূপের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই প্রত্যক্ষরূপ কার্য্যের দ্বারা সেই রূপে উদ্ভূতত্ব আছে, ইহা অনুমান করা যায়। চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তেজঃপদার্থ মাত্রই যে প্রত্যক্ষ হইবে, এমন নিয়ম নাই। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চতুর্ব্বিধ তেজঃপদার্থের উল্লেখ করিয়া তেজঃপদার্থের ধর্ম্মভেদ দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে চতুর্থপ্রকার তেজঃপদার্থ চাক্ষুষ রশ্মি। উহাতে উদ্ভূত রূপ নাই, উদ্ভূত স্পর্শও নাই, সুতরাং উহার প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূত স্পর্শ থাকিলেও জলাদি-সংযুক্ত তেজঃপদার্থের উদ্ভূতরূপ না থাকায়, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না॥ ৩৮ ॥

সূত্র । কর্ম্মকারিতশ্চেন্দ্রিয়াণাং ব্যূহঃ পুরুষার্থতন্ত্রঃ ॥ ॥৩৯॥২৩৭॥

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যূহ[১] অর্থাৎ বিশিষ্ট রচনা কর্ম্মকারিত (অদৃষ্টজনিত) এবং পুরুষার্থতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের উপভোগসম্পাদক ।

ভাষ্য । যথা চেতনস্যার্থো বিষয়োপলব্ধিভূতঃ সুখদুঃখোপলব্ধিভূতশ্চ কল্প্যতে, তথেন্দ্রিয়াণি ব্যূঢ়াণি, বিষয়প্রাপ্ত্যর্থশ্চ রশ্মেশ্চাক্ষুষস্য ব্যূহঃ । রূপস্পর্শানভিব্যক্তিশ্চ ব্যবহারপ্রক্লৃপ্ত্যর্থা,দ্রব্যবিশেষে চ প্রতীঘাতাদাবরণোপপত্তির্ব্ব্যবহারার্থা । সর্ব্বদ্রব্যাণাং বিশ্বরূপো ব্যূহ ইন্দ্রিয়বৎ কর্ম্মকারিতঃ পুরুষার্থতন্ত্রঃ । কর্ম্ম তু ধর্ম্মাধর্ম্মভূতং চেতনস্যোপভোগার্থমিতি ।

অনুবাদ । যে প্রকারে বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধিরূপ এবং সুখদুঃখের উপলব্ধিরূপ চেতনার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ কল্পনা করা হইয়াছে, সেই প্রকারে ব্যূঢ় অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে রচিত ইন্দ্রিয়গুলিও কল্পনা করা হইয়াছে এবং বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য চাক্ষুষ রশ্মির ব্যূহ (বিশিষ্ট রচনা) কল্পনা করা হইয়াছে । রূপ ও স্পর্শের অনভিব্যক্তি ও ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য কল্পনা করা হইয়াছে । দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতবশতঃ আবরণের উপপত্তি ও ব্যবহারার্থ কল্পনা করা হইয়াছে । সমস্ত জন্যদ্রব্যের বিচিত্র রূপ রচনা ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কর্ম্মজনিত ও পুরুষের উপভোগসম্পাদক । কর্ম্ম কিন্তু পুরুষের উপভোগার্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ।

টিপ্পনী । চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা ভৌতিক পদার্থ, উহাতে উদ্ভূতরূপ না থাকাতেই উহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । এখন উহাতে উদ্ভূতরূপ নাই কেন ? অন্যান্য তেজঃপদার্থের ন্যায় উহাতে উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শের সৃষ্টি কেন হয় নাই ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, তাই তদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বর্গের বিশিষ্ট রচনা "পুরুষার্থ-তন্ত্র", সুতরাং পুরুষের অদৃষ্ট-বিশেষ-জনিত । পুরুষের বিষয়ভোগরূপ প্রয়োজন যাহার তন্ত্র অর্থাৎ প্রযোজক, অর্থাৎ বিষয়ভোগের জন্য যাহার সৃষ্টি, তাহা পুরুষার্থতন্ত্র । অদৃষ্ট-বিশেষবশতঃ পুরুষের বিষয়ভোগ হইতেছে, সুতরাং ঐ বিষয়ভোগের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গও অদৃষ্টবিশেষজনিত । যে ইন্দ্রিয় যেরূপে রচিত বা সৃষ্ট হইলে তদ্দ্বারা তাহার ফল বিষয়ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে, জীবের ঐ বিষয়ভোগজনক অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত সেই ইন্দ্রিয় সেইরূপেই সৃষ্ট

১ । সূত্রে "ব্যূহ" শব্দের দ্বারা এখানে নির্ম্মাণ অর্থাৎ রচনা বা সৃষ্টি বুঝা যায় । "ব্যূহঃ স্যাদ্ বলবিন্যাসে নির্ম্মাণে বৃন্দতর্কয়োঃ" ।—মেদিনী ।

হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন, যে, বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি এবং সুখদুঃখের উপলব্ধি, এই দুইটিকে চেতনের অর্থ, অর্থাৎ ভোক্তা আত্মার প্রয়োজনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দুইটি পুরুষার্থ সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং ঐ দুইটি পুরুষার্থ নিষ্পত্তির জন্য উহার সাধনরূপে ইন্দ্রিয়গুলিও সেইভাবে রচিত হইয়াছে, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি বা সন্নিকর্ষ না হইলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, সুতরাং সেজন্য চাক্ষুষ রশ্মিরও সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। এবং ঐ চাক্ষুষ রশ্মির রূপ ও স্পর্শের অনভিব্যক্তি অর্থাৎ উহার অনুদ্ভূতত্বও প্রত্যক্ষ ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য স্বীকার করা হইয়াছে। বার্ত্তিককার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি চাক্ষুষ রশ্মিতে উদ্ভূত স্পর্শ থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যে চক্ষুর অনেক রশ্মির সংযোগ হইলে ঐ দ্রব্যের দাহ হইতে পারে। উদ্ভূত স্পর্শবিশিষ্ট বহ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থের সংযোগে যখন দ্রব্যবিশেষের সন্তাপ বা দাহ হয়, তখন চাক্ষুষ রশ্মির সংযোগেও কেন তাহা হইবে না ? এবং কোন দ্রব্যে চক্ষুর বহু রশ্মি সন্নিপতিত হইলে তদ্দ্বারা ঐ দ্রব্য ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত হওয়ায়, ঐ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সূর্য্যরশ্মি-সম্বদ্ধ পদার্থে সূর্য্যরশ্মির দ্বারা যেমন চাক্ষুষ রশ্মি আচ্ছাদিত হয় না, তদ্রূপ চাক্ষুষ রশ্মির দ্বারাও উহা আচ্ছাদিত হয় না, ইহা বলা যায় না। কারণ চাক্ষুষ রশ্মি ও সূর্য্যরশ্মিকে ভেদ করিয়া ঐ সূর্য্যরশ্মিসম্বদ্ধ দ্রব্যের সহিত সম্বদ্ধ হয়, ফলবলে ইহাই কল্পনা করিতে হইবে। চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত স্পর্শ স্বীকার করিয়া তাহাতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনা করা ব্যর্থ ও নিষ্প্রমাণ এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ে উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ থাকিলে, কোন দ্রব্যে প্রথমে এক ব্যক্তির চক্ষুর রশ্মি পতিত হইলে, তদ্দ্বারা ঐ দ্রব্য ব্যবহিত হওয়ায়, অপর ব্যক্তি আর তখন ঐ দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, অনেক রশ্মির সন্নিপাত হইলে, তাহা হইতে সেখানে অন্য রশ্মির উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারাই সেখানে প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে পূর্ণচক্ষু ও অপূর্ণচক্ষু—এই উভয় ব্যক্তিরই তুল্যভাবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। চক্ষুর রশ্মি হইতে যদি অন্য রশ্মির উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিরও ক্রমে পূর্ণদৃষ্টি ব্যক্তির ন্যায় চক্ষুর রশ্মি উৎপন্ন হওয়ায়, তুল্যভাবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষের অপকর্ষের কোন কারণ নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত যুক্তিতে প্রত্যক্ষ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ নাই, ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে। অদৃষ্টবিশেষবশতঃ ব্যবহারসিদ্ধি বা ভোগনিষ্পত্তির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শই উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্যবহিত দ্রব্যবিশেষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ঐ দ্রব্যে চাক্ষুষ রশ্মির প্রতীঘাত হয়, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সেখানেও ঐরূপ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ভিত্তি প্রভৃতিকে চাক্ষুষ রশ্মির আবরণ বা আচ্ছাদক-রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। জগতের ব্যবহার-বৈচিত্র্য-বশতঃ তাহার কারণও বিচিত্র বলিতে হইবে। সে বিচিত্র কারণ জীবের কর্ম্ম, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট। কেবল ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্যই যে ঐ অদৃষ্টজনিত, তাহা নহে। সমস্ত জন্যদ্রব্য বা জগতের বিচিত্র রচনাই ইন্দ্রিয়বর্গরচনার ন্যায় অদৃষ্টজনিত ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য। **অব্যভিচারাচ্চ প্রতীঘাতো ভৌতিকধর্ম্মঃ।** *

যশ্চাবরণোপলম্ভাদিন্দ্রিয়স্য দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতঃ স ভৌতিকধর্ম্মো ন ভূতানি ব্যভিচরতি, নাভৌতিকং প্রতীঘাতধর্ম্মকং দৃষ্টমিতি। অপ্রতীঘাতস্তু ব্যভিচারী, ভৌতিকাভৌতিকয়োঃ সমানত্বাদিতি।

যদপি মন্যেত প্রতীঘাতাদ্‌ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি, অপ্রতীঘাতাদভৌতিকানীতি প্রাপ্তং, দৃষ্টশ্চাপ্রতীঘাতঃ, কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ। তন্ন যুক্তং, কস্মাৎ? যস্মাদ্‌ভৌতিকমপি ন প্রতিহন্যতে, কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতপ্রকাশাৎ প্রদীপরশ্মীনাং,—স্থাল্যাদিষু চ পাচকস্য তেজসোঽপ্রতীঘাতাৎ।

অনুবাদ। পরন্তু, অব্যভিচারবশতঃ প্রতীঘাত ভৌতিকদ্রব্যের ধর্ম্ম। বিশদার্থ এই যে, আবরণের উপলব্ধিবশতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যবিশেষে যে প্রতীঘাত, সেই ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম্ম ভূতের ব্যভিচারী হয় না। (কারণ) অভৌতিক দ্রব্য-প্রতীঘাতধর্ম্মবিশিষ্ট দেখা যায় না। অপ্রতীঘাত কিন্তু (ভূতের) ব্যভিচারী, যেহেতু উহা ভৌতিক ও অভৌতিক দ্রব্যে সমান।

আর যে (কেহ) মনে করিবেন, প্রতীঘাতবশতঃ ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, (সুতরাং) অপ্রতীঘাতবশতঃ অভৌতিক, ইহা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) অপ্রতীঘাত দেখাও যায়; কারণ, কাচ ও অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মত যুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভৌতিক দ্রব্যও প্রতিহত হয় না। কারণ, প্রদীপরশ্মির কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রকাশকত্ব আছে এবং স্থালী প্রভৃতিতে পাচক তেজের (স্থালী প্রভৃতির নিম্নস্থ অগ্নির) প্রতীঘাত হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বসিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপদার্থ; কারণ, তেজ নামক ভূতই উহার উপাদানকারণ, এইজন্যই উহাকে ভৌতিক বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্য এখানে নিজে আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, প্রতীঘাত ভৌতিক দ্রব্যেরই ধর্ম্ম, উহা অভৌতিক দ্রব্যের

* মুদ্রিত ন্যায়বার্ত্তিকে "অব্যভিচারী তু প্রতীঘাতো ভৌতিকধর্ম্মঃ" এইরূপ একটি সূত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উহা বার্ত্তিককারের নিজের পাঠও হইতে পারে। "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থে ঐস্থলে "অব্যভিচারাচ্চ" এইরূপ সূত্রপাঠ দেখা যায়। কিন্তু "ন্যায়তত্ত্বালোক" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" এখানে ঐরূপ কোন সূত্র গৃহীত হয় নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপ সূত্র বলেন নাই। সুতরাং ইহা ভাষ্য বলিয়াই গৃহীত হইল।

ধর্ম্ম নহে। কারণ, অভৌতিক দ্রব্য কথনই কোন দ্রব্যের দ্বারা প্রতিহত হয়, ইহা দেখা যায় না। কিন্তু ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রতিহত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা যে ভৌতিক দ্রব্য, ইহা বুঝা যায়। যে যে দ্রব্যে প্রতীঘাত আছে, তাহা সমস্তই ভৌতিক, সুতরাং প্রতীঘাতরূপ ধর্ম্ম ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী। তাহা হইলে যাহা যাহা প্রতীঘাতধর্ম্মক, সে সমস্তই ভৌতিক, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ ঐ প্রতীঘাতরূপ ধর্ম্মের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়[1], এবং ঐরূপে ঐ দৃষ্টান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও ভৌতিকত্ব অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। কিন্তু অপ্রতীঘাত যেমন ভৌতিক দ্রব্যে আছে, তদ্রূপ অভৌতিক দ্রব্যেও আছে, সুতরাং উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব বা অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে কেহ বলিতে পারেন যে, যদি প্রতীঘাতবশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক, ইহা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অপ্রতীঘাতবশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ অভৌতিক, ইহাও সিদ্ধ হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেমন প্রতীঘাত আছে, তদ্রূপ অপ্রতীঘাতও আছে। কারণ, কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত বস্তুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং সেখানে কাচাদির দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রতীঘাত হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কাচাদির দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রতীঘাত হয় না, সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অপ্রতীঘাত ধর্ম্মই থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বসম্মত ভৌতিকদ্রব্য প্রদীপের রশ্মিও কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রকাশ করে। সুতরাং সেখানে ঐ প্রদীপরশ্মিরূপ ভৌতিক দ্রব্যও কাচাদি দ্বারা প্রতিহত হয় না, উহাতেও তখন অপ্রতীঘাত ধর্ম্ম থাকে, ইহাও স্বীকার্য্য। এইরূপ স্থালী প্রভৃতির নিম্নস্থ অগ্নি, স্থালী প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তণ্ডুলাদির পাক সম্পাদন করে। সুতরাং সেখানেও সর্ব্বসম্মত ভৌতিক পদার্থ ঐ পাচক তেজের স্থালী প্রভৃতির দ্বারা প্রতীঘাত হয় না। সুতরাং অপ্রতীঘাত যখন অভৌতিক পদার্থের ন্যায় ভৌতিক পদার্থেও আছে, তখন উহা অভৌতিকত্বের ব্যভিচারী, উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রতীঘাত কেবল ভৌতিক পদার্থেরই ধর্ম্ম, সুতরাং উহা ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী হওয়ায়, উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে॥ ৩৯॥

ভাষ্য। উপপদ্যতে চানুপলব্ধিঃ কারণভেদাৎ—

অনুবাদ। কারণবিশেষপ্রযুক্ত (চাক্ষুষ রশ্মির) অনুপলব্ধি উপপন্নও হয়।

সূত্র। মধ্যন্দিনোল্কাপ্রকাশানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ ॥৪০॥২৩৮॥

অনুবাদ। মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোকের অনুপলব্ধির ন্যায় তাহার (চাক্ষুষ রশ্মির) অনুপলব্ধি হয়।

১। ভৌতিকং চক্ষুঃ কুড্যাদিভিঃ প্রতীঘাতদর্শনাৎ ঘটাদিবৎ।—ন্যায়বার্ত্তিক।

ভাষ্য। যথাঽনেকদ্রব্যেণ সমবায়াদ্রূপবিশেষাচ্চোপলব্ধিরিতি সত্যুপলব্ধিকারণে মধ্যন্দিনোল্কাপ্রকাশো নোপলভ্যতে আদিত্যপ্রকাশেনাভিভূতঃ, এবং মহদনেকদ্রব্যবত্ত্বাদ্রূপবিশেষাচ্চোপলব্ধিরিতি সত্যুপলব্ধিকারণে চাক্ষুষো রশ্মির্নোপলভ্যতে নিমিত্তান্তরতঃ। তচ্চ ব্যাখ্যাতমনুদ্ভূতরূপস্পর্শস্য দ্রব্যস্য প্রত্যক্ষতোঽনুপলব্ধিরিতি।

অনুবাদ। যেরূপ বহুদ্রব্যের সহিত সমবায়-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত ও রূপবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষের কারণ থাকিলেও, সূর্য্যালোকের দ্বারা অভিভূত মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোক প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ মহত্ত্ব ও অনেকদ্রব্যবত্ত্বপ্রযুক্ত এবং রূপবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও নিমিত্তান্তরবশতঃ চাক্ষুষ রশ্মি প্রত্যক্ষ হয় না। অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় না, এই কথার দ্বারা সেই নিমিত্তান্তরও (পূর্ব্বে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টিপ্পনী। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা তৈজস, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৈজস পদার্থ হইলেও, উহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না—ইহাও মহর্ষি বলিয়াছেন। এখন একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অপ্রত্যক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোক যেমন তৈজস হইয়াও প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ চাক্ষুষ রশ্মিরও অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অন্যান্য সমস্ত কারণ সত্ত্বেও যেমন সূর্য্যালোকের দ্বারা অভিভববশতঃ মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোকের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষের অন্যান্য কারণ সত্ত্বেও কোন নিমিত্তান্তরবশতঃ চাক্ষুষ রশ্মিরও প্রত্যক্ষ হয় না। চাক্ষুষ রশ্মির রূপের অনুদ্ভূতত্বই সেই নিমিত্তান্তর। যে দ্রব্যে উদ্ভূত রূপ নাই এবং উদ্ভূত স্পর্শ নাই, তাহার বাহ্যপ্রত্যক্ষ জন্মে না, এই কথার দ্বারা ঐ নিমিত্তান্তর পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলকথা, তৈজস পদার্থ হইলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ হইবে, এমন নিয়ম নাই। তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালেও উল্কার প্রত্যক্ষ হইত। যে দ্রব্যের রূপ ও স্পর্শ উদ্ভূত নহে, অথবা উদ্ভূত হইলেও কোন দ্রব্যের দ্বারা অভিভূত থাকে, সেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুর রশ্মির রূপ উদ্ভূত নহে, এজন্যই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না॥ ৪০॥

ভাষ্য। অত্যন্তানুপলব্ধিশ্চাভাবকারণং। যো হি ব্রবীতি লোষ্টপ্রকাশো মধ্যন্দিনে আদিত্যপ্রকাশাভিভবান্নোপলভ্যত ইতি তস্যৈতৎ স্যাৎ ?

অনুবাদ। অত্যন্ত অনুপলব্ধিই অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারা অনুপলব্ধিই অভাবের কারণ (সাধক) হয়। (পূর্ব্বপক্ষ) যিনি বলিবেন, মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যালোক দ্বারা

অভিভববশতঃই লোষ্টের আলোক প্রত্যক্ষ হয় না, তাঁহার এই মত হউক ? অর্থাৎ উহাও বলা যায়—

সূত্র। ন রাত্রাবপ্যনুপলব্ধেঃ ॥ ৪১॥২৩৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ উল্কার ন্যায় লোষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বদ্রব্যেরই আলোক বা রশ্মি আছে, ইহা বলা যায় না, যেহেতু রাত্রিতে (তাহার) প্রত্যক্ষ হয় না, এবং অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও (তাহার) উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। অপ্যনুমানতোঽনুপলব্ধেরিতি। এবমত্যন্তানুপলব্ধের্লোষ্টপ্রকাশো নাস্তি, নত্বেবং চাক্ষুষো রশ্মিরিতি।

অনুবাদ। যেহেতু অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও (লোষ্টরশ্মির) উপলব্ধি হয় না। এইরূপ হইলে, অত্যন্তানুপলব্ধিবশতঃ লোষ্টরশ্মি নাই। কিন্তু চাক্ষুষরশ্মি এইরূপ নহে। [অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অত্যন্তানুপলব্ধি নাই, সুতরাং উহার অভাব সিদ্ধ হয় না।]

টিপ্পনী। মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোক সূর্য্যালোক দ্বারা অভিভূত হওয়ায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা দৃষ্টান্তরূপে পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে। এখন ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যমাত্রেরই রশ্মি আছে, ইহা বলা যায়। কারণ, সূর্য্যালোক দ্বারা অভিভবপ্রযুক্তই ঐ সমস্ত রশ্মির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলিতে পারা যায়। মহর্ষি এতদুত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা বলা যায় না। কারণ, মধ্যাহ্নকালে উল্কালোকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, রাত্রিতে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু লোষ্ট প্রভৃতির কোন প্রকার রশ্মি রাত্রিতেও প্রত্যক্ষ হয় না। উহা থাকিলে রাত্রিকালে সূর্য্যালোক দ্বারা অভিভব না থাকায়, উল্কার ন্যায় অবশ্যই উহার প্রত্যক্ষ হইত। উহার সর্ব্বদা অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনা নিষ্প্রমাণ ও গৌরব-দোষযুক্ত। পরন্তু যেমন কোন কালেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা লোষ্ট প্রভৃতির রশ্মির উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উহার উপলব্ধি হয় না। ঐ বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণও নাই। সুতরাং অত্যন্তানুপলব্ধিবশতঃ উহার অস্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু চক্ষুর রশ্মি অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, উহার অত্যন্তানুপলব্ধি নাই, সুতরাং উহার অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। সূত্রে "অপি" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণের সমুচ্চয় বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অপ্যনুমানতোঽনুপলব্ধে"রিতি ॥৪১॥

ভাষ্য। উপপন্নরূপা চেয়ং—

সূত্র। বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহাদ্বিষয়োপলব্ধেরনভি-ব্যক্তিতোঽনুপলব্ধিঃ ॥৪২॥২৪০॥

অনুবাদ। বাহ্য আলোকের সাহায্যবশতঃ বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায়, অনভি-ব্যক্তিবশতঃ অর্থাৎ রূপের অনুদ্ভূতত্ববশতঃ এই অনুপলব্ধি উত্তমরূপে উপপন্নই হয়।

ভাষ্য। বাহ্যেন প্রকাশেনানুগৃহীতং চক্ষুর্ব্বিষয়গ্রাহকং, তদভাবে-ঽনুপলব্ধিঃ। সতি চ প্রকাশানুগ্রহে শীতস্পর্শোপলব্ধৌ চ সত্যাং তদাশ্রয়স্য দ্রব্যস্য চক্ষুষাঽগ্রহণং রূপস্যানুদ্ভূতত্বাৎ সেয়ং রূপানভিব্যক্তিতো রূপা-শ্রয়স্য দ্রব্যস্যানুপলব্ধির্দৃষ্টা। তত্র যদুক্তং "তদনুপলব্ধেরহেতু"-রিত্যেতদযুক্তং।

অনুবাদ। বাহ্য আলোকের দ্বারা উপকৃত চক্ষু বিষয়ের গ্রাহক হয়, তাহার অভাবে (চক্ষুর দ্বারা) উপলব্ধি হয় না। (যথা) বাহ্য আলোকের সাহায্য থাকিলেও এবং (শিশিরাদি জলীয় দ্রব্যের) শীতস্পর্শের উপলব্ধি হইলেও, রূপের অনুদ্ভূতত্ববশতঃ তাহার আধার দ্রব্যের (শিশিরাদির) চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। সেই এই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষ রূপের অনভিব্যক্তিবশতঃ (অনুদ্ভূতত্ববশতঃ) দেখা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহা হইলে "তদনুপলব্ধেরহেতুঃ" এই যে পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র (পূর্ব্বোক্ত ৩৫শ সূত্র) বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। চক্ষুর রশ্মি থাকিলেও, রূপের অনুদ্ভূতত্ববশতঃ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়া এই সূত্রদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। সূত্রে "অনভিব্যক্তি" শব্দের দ্বারা অনুদ্ভূতত্বই বিবক্ষিত। রূপের অনুদ্ভূতত্ববশতঃ সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। ইহাতে হেতু বলিয়াছেন, বাহ্য আলোকের সাহায্য-বশতঃ বিষয়ের উপলব্ধি। মহর্ষির বিবক্ষা এই যে, যে বস্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সূর্য্য বা প্রদীপাদি কোন বাহ্য আলোককে অপেক্ষা করে, তাহার অনুপলব্ধি তাহার রূপের অনুদ্ভূতত্বপ্রযুক্তই হয়। যেমন হেমন্তকালে শিশিররূপ জলীয় দ্রব্য। মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা ঐরূপ দৃষ্টান্ত সূচিত হইয়াছে। জলীয় দ্রব্য তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বাহ্য আলোককে অপেক্ষা করে। কিন্তু হেমন্তকালে শিশিররূপ জলীয় দ্রব্যে বাহ্য আলোকের সংযোগ থাকিলেও এবং তাহার শীতস্পর্শের ত্বগিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার রূপের অনুদ্ভূতত্ববশতঃ তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ চাক্ষুষ রশ্মিও ঘটাদি প্রত্যক্ষ জন্মাইতে বাহ্য আলোককে অপেক্ষা করে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়াও তাহার রূপের অনুদ্ভূতত্বপ্রযুক্তই বলিতে হইবে। তাহা হইলে

"তদনুপলব্ধেরহেতুঃ" এই সূত্রদ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহার অযুক্ততা প্রতিপন্ন হইল। ঐ পূর্ব্বপক্ষনিরাসে এইটি চরম সূত্র। ভাষ্যকার ইহার অবতারণা করিতে প্রথমে 'উপপন্নরূপ চেয়ঞ্চ' এই বাক্যের দ্বারা চাক্ষুষ রশ্মির অনুপলব্ধি উক্তপ্রকারে উপপন্নই হয়, ইহা বলিয়াছেন। প্রশংসার্থে রূপ প্রত্যয়যোগে "উপপন্নরূপা" এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ বাক্যের সহিত সূত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে[1] ॥৪২॥

ভাষ্য। কস্মাৎ পুনরভিভবোঽনুপলব্ধিকারণং চাক্ষুষস্য রশ্মে-র্নোচ্যত ইতি—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) অভিভবকেই চাক্ষুষ রশ্মির অপ্রত্যক্ষের কারণ (প্রযোজক) কেন বলা হইতেছে না?

সূত্র। অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥৪৩॥২৪১॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অভিব্যক্তি (উদ্ভূতত্ব) থাকিলে, অর্থাৎ কোনকালে প্রত্যক্ষ হইলে এবং বাহ্য আলোকের সাহায্যে নিরপেক্ষতা থাকিলে অভিভব হয়।

ভাষ্য। বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহনিরপেক্ষতায়াঞ্চেতি "চা"র্থঃ। যদ্রূপমভিব্যক্তমুদ্ভূতং, বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহঞ্চ নাপেক্ষতে, তদ্বিষয়োঽভিভবো বিপর্য্যয়েঽভিভবাভাবাৎ। অনুদ্ভূতরূপত্বাচ্চানুপলভ্যমানং বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহাচ্চোপলভ্যমানং নাভিভূয়ত ইতি। এবমুপপন্নমস্তি চাক্ষুষো রশ্মিরিতি।

অনুবাদ। বাহ্য আলোকের সাহায্য-নিরপেক্ষতা থাকিলে, ইহা (সূত্রস্থ) "চ" শব্দের অর্থ। যে রূপ, অভিব্যক্ত কি না উদ্ভূত, এবং বাহ্য আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে না তদ্বিষয়ক অভিভব হয়, অর্থাৎ তাদৃশ রূপই অভিভবের বিষয় (আধার) হয়, কারণ বিপর্য্যয় অর্থাৎ উদ্ভূতত্ব এবং বাহ্য আলোকের সাহায্যনিরপেক্ষতা না থাকিলে অভিভব হয় না। এবং অনুদ্ভূতরূপবত্ত্বপ্রযুক্ত অনুপলভ্যমান দ্রব্য (শিশিরাদি) এবং বাহ্য আলোকের সাহায্যবশতঃ উপলভ্যমান দ্রব্য (ঘটাদি) অভিভূত হয় না। এইরূপ হইলে চাক্ষুষ রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়।

১। উপপন্নরূপা চেয়মনভিব্যক্তিতোঽনুপলব্ধিরিতি যোজনা। অনভিব্যক্তিতোঽনুদ্ভূতেরিত্যর্থঃ। অত্র হেতুর্বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহাদ্বিষয়োপলব্ধেরিতি। বিষয়স্য স্বরূপস্যাভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

টিপ্পনী। যেমন রূপের অনুদ্ভূতত্বপ্রযুক্ত সেই রূপ ও তাহার আধার দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ অভিভবপ্রযুক্তও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোক ইহার দৃষ্টান্তরূপে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চাক্ষুষ রশ্মিতে উদ্ভূত রূপই স্বীকার করিয়া মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোকের ন্যায় অভিভবপ্রযুক্তই তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলিয়াও মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন। মহর্ষি কেন তাহা বলেন নাই? এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, রূপমাত্রের এবং দ্রব্যমাত্রেরই অভিভব হয় না। যে রূপে অভিব্যক্তি আছে এবং যে রূপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপাদি কোন বাহ্য আলোককে অপেক্ষা করে না, তাহারই অভিভব হয়। মধ্যাহ্নকালীন উল্কালোকের রূপ ইহার দৃষ্টান্ত। এবং অনুদ্ভূত রূপবত্তাপ্রযুক্ত যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং বাহ্য আলোকের সাহায্যেই যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, ঐ দ্রব্য অভিভূত হয় না। শিশিরাদি এবং ঘটাদি ইহার দৃষ্টান্ত আছে। চাক্ষুষ রশ্মি অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য, সুতরাং উহাও অভিভূত হইতে পারে না। উহাতে উদ্ভূত রূপ থাকিলে কোনকালে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু কোন কালেই উহার প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উহাতে উদ্ভূত রূপ নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। উহাতে উদ্ভূত রূপ স্বীকার করিয়া সর্ব্বদা ঐ রূপের অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। সূত্রে "অভিব্যক্তি" শব্দের দ্বারা উদ্ভূতত্বই বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার "অভিব্যক্তং" বলিয়া উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "উদ্ভূতং"। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে চাক্ষুষ রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন হয়। ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য ইহাও বুঝা যাইতে পারে যে, চক্ষুর রশ্মি আছে, চক্ষু তৈজস, ইহাই মহর্ষির সাধ্য এবং চক্ষুর রশ্মির রূপ উদ্ভূত নহে, ইহাই মহর্ষির সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রতিবাদী চক্ষুর রশ্মি বা তাহার রূপকে সর্ব্বদা অভিভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, চক্ষুর রশ্মি স্বীকার না করিলে, তাহার অভিভব বলা যায় না। যাহা অভিভাব্য, তাহা অলীক হইলে তাহার অভিভব কিরূপে বলা যাইবে? সুতরাং উভয় পক্ষেই চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন বা সিদ্ধ হয়। অথবা ভাষ্যকার পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেই "এবমুপপন্নং" ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা এইরূপে অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়, ইহা বলিয়া ভাষ্যকার পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, ঐ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা ঐ বিষয়ে প্রমাণান্তরও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। ৪৩ ॥

সূত্র। নক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্মিদর্শনাচ্চ ॥৪৪॥২৪২॥

অনুবাদ। এবং "নক্তঞ্চর"-বিশেষের (বিড়ালাদির) চক্ষুর রশ্মির দর্শন হওয়ায়, (ঐ দৃষ্টান্তে মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি অনুমানসিদ্ধ হয়)।

ভাষ্য। দৃশ্যন্তে হি নক্তং নয়নরশ্ময়ো নক্তঞ্চরাণাং বৃষদংশপ্রভৃতীনাং তেন শেষস্যানুমানমিতি। জাতিভেদবদিন্দ্রিয়ভেদ ইতি চেৎ? ধর্ম্মভেদমাত্রঞ্চানুপপন্নং,[১] আবরণস্য প্রাপ্তিপ্রতিষেধার্থস্য দর্শনাদিতি।

অনুবাদ। যেহেতু রাত্রিকালে বিড়াল প্রভৃতি নক্তঞ্চরগণের চক্ষুর রশ্মি দেখা যায়, তদ্দ্বারা শেষের অনুমান হয়, অর্থাৎ তদ্দৃষ্টান্তে মনুষ্যাদির চক্ষুরও রশ্মি অনুমান সিদ্ধ হয়। (পূর্ব্বপক্ষ) জাতিভেদের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের ভেদ আছে, ইহা যদি বল? (উত্তর) ধর্ম্মভেদমাত্র অনুপপন্নই হয়, অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষুতে রশ্মিমত্ত্ব ধর্ম্ম আছে, মনুষ্যাদির চক্ষুতে তাহার অভাব আছে, এইরূপ ধর্ম্মভেদ উপপন্ন হইতেই পারে না, কারণ, (বিড়ালাদির চক্ষুরও) "প্রাপ্তিপ্রতিষেধার্থ" অর্থাৎ বিষয়সন্নিকর্ষের নিবর্ত্তক আবরণের দর্শন হয়।

টিপ্পনী। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস, উহার রশ্মি আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শেষে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা চরম প্রমাণ বলিয়াছেন যে, রাত্রিকালে বিড়াল ও ব্যাঘ্রবিশেষ প্রভৃতি নক্তঞ্চর জীববিশেষের চক্ষুর রশ্মি দেখা যায়। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে শেষের অর্থাৎ অবশিষ্ট মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি অনুমানসিদ্ধ হয়[২]। বিড়ালের অপর নাম বৃষদংশ[৩]। মহর্ষির এই সূত্রোক্ত কথায় প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, যেমন বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির বিড়ালত্ব প্রভৃতি জাতির ভেদ আছে তদ্রূপ উহাদিগের ইন্দ্রিয়েরও ভেদ আছে। অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষু রশ্মিবিশিষ্ট, মনুষ্যাদির চক্ষু রশ্মিশূন্য। ভাষ্যকার এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, বিড়ালাদির চক্ষুতে রশ্মিমত্ত্ব ধর্ম্ম আছে, মনুষ্যাদির চক্ষুতে ঐ ধর্ম্ম নাই, এইরূপ ধর্ম্মভেদ উপপন্ন হইতেই পারে না। কারণ, বিড়ালাদির চক্ষু যেমন ভিত্তি প্রভৃতি আবরণের দ্বারা আবৃত হয়, তদ্দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না, মনুষ্যাদির চক্ষুও ঐরূপ ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হয়, তদ্দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সন্নিকর্ষের নিবর্ত্তক আবরণও বিভিন্ন জাতীয় জীবের পক্ষে সমানই দেখা যায়। বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির ন্যায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত বস্তু দেখিতে পায় না। সুতরাং জাতিভেদ উপপন্ন হইলেও বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মভেদ কিছুতেই উপপন্ন হয় না। কারণ, মনুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি না থাকিলে, উহার সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ অসম্ভব হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতি আবরণ, ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের

১। শঙ্কা ভাষ্যং—জাতিভেদবদিন্দ্রিয়ভেদ ইতি চেৎ? নিরাকরোতি ধর্ম্মভেদমাত্রঞ্চানুপপন্নং। বৃষদংশনয়নস্য রশ্মিমত্ত্বং, মানুষনয়নস্য তু ন তদ্বদিতি যোহয়ং ধর্ম্মভেদঃ স এবমাত্রং তচ্চানুপপন্নং। চোহবধারণে ভিন্নক্রমঃ। অনুপপন্ন মেবেতি যোজনা—তাৎপর্য্যটীকা।

২। মানুষং চক্ষুঃ রশ্মিমৎ, অপ্রাপ্তিস্বভাবত্বে সতি রূপাদ্যুপলব্ধিনিমিত্তত্বাৎ নক্তঞ্চরচক্ষুর্ব্বদিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

৩। ওতুর্ব্বিড়ালো মার্জ্জারো বৃষদংশক আখুভুক্।—অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ। ১০।

সন্নিকর্ষের নিবর্ত্তক, ইহা আর বলা যায় না। সুতরাং বিড়ালাদির ন্যায় মনুষ্যাদির চক্ষুরও রশ্মি স্বীকার্য্য।

জৈন দার্শনিকগণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বও নাই, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়কে প্রাপ্ত না হইয়াই, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে। "প্রমেয়-কমলমার্ত্তণ্ড" নামক জৈনগ্রন্থের শেষভাগে এই জৈনমত বিশেষ বিচার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এবং "প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার"নামক জৈন গ্রন্থের রত্নপ্রভাচার্য্য-বিরচিত "রত্নাকরাবতারিকা" টীকায় (কাশী সংস্করণ, ৫১শ পৃষ্ঠা হইতে) পূর্ব্বোক্ত জৈন সিদ্ধান্তের বিশেষ আলোচনা ও সমর্থন দেখা যায়। জৈন দার্শনিকগণের এই বিষয়ে বিচারের দ্বারা একটি বিশেষ কথা বুঝা যায় যে, নৈয়ায়িকগণ "চক্ষুস্তৈজসং" এইরূপে যে অনুমান প্রদর্শন করেন, উহাতে অন্ধকারের অপ্রকাশকত্ব উপাধি থাকায়, ঐ অনুমান প্রমাণ নহে। অর্থাৎ "চক্ষুর্ন তৈজসং অন্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা প্রদীপঃ" এইরূপে অনুমানের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস নহে, ইহাই সিদ্ধ হওয়ায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে তৈজসত্ব বাধিত, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারাই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, অর্থাৎ অন্ধকারের প্রত্যক্ষে প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ বা আলোক কারণ নহে, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, চক্ষুরিন্দ্রিয় অন্ধকারেরও প্রকাশক, ইহাও সর্ব্বসম্মত। সুতরাং যাহা অন্ধকারের প্রকাশক, তাহা তৈজস নহে, অথবা যাহা তৈজস, তাহা অন্ধকারের প্রকাশক নহে, এইরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। "চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি প্রদীপাদির ন্যায় তৈজস পদার্থ হইত, তাহা হইলে প্রদীপাদির ন্যায় অন্ধকারের অপ্রকাশক হইত," এইরূপ তর্কের সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান চক্ষুরিন্দ্রিয়ে তৈজসত্বের অভাব সাধন করে।

পূর্ব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ ঘটাদির ন্যায় অন্ধকারের প্রকাশক কেন হয় না, এবং অন্ধকার কাহাকে বলে, ইহা বুঝা আবশ্যক। নৈয়ায়িকগণ মীমাংসক প্রভৃতির ন্যায় অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বিশেষ বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যেরূপ উদ্ভূত ও অনভিভূত, তাদৃশ রূপবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থের সামান্যাভাবই অন্ধকার। সুতরাং যেখানে তাদৃশ তেজঃপদার্থ (প্রদীপাদি) থাকে, সেখানে অন্ধকারের প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহার প্রত্যক্ষ অন্ধকারের প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা অন্ধকারপ্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না; তাহার কারণত্বের কোন প্রমাণও নাই। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপদার্থ হইলেও প্রদীপাদির ন্যায় উদ্ভূত ও অনভিভূত রূপবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থ নহে। সুতরাং উহা অন্ধকারনামক অভাবপদার্থের প্রতিযোগী না হওয়ায়, অন্ধকারপ্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে। রাত্রিকালে বিড়ালাদির যে চক্ষুর রশ্মির দর্শন হয়, ইহা মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, সেই চক্ষুও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থ নহে, এই জন্যই বিড়ালাদিও রাত্রিকালে তাহাদিগের ঐ চক্ষুর দ্বারা দূরস্থ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করে। কারণ, প্রদীপাদির ন্যায় প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থই অন্ধকারের প্রতিযোগী, সুতরাং সেইরূপ তেজঃ-

পদার্থই অন্ধকারপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয়। বিড়ালাদির চক্ষু প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থ হইলে দিবসেও উহার সম্যক্ প্রত্যক্ষ হইত এবং রাত্রিকালে উহার সম্মুখে প্রদীপের ন্যায় আলোক প্রকাশ হইত। মূলকথা, তেজঃপদার্থমাত্রই যে, অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, ইহা বলিবার কোন যুক্তি নাই। কিন্তু যে তেজঃপদার্থ অন্ধকারের প্রতিযোগী, সেই প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থই অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয় পূর্ব্বোক্তরূপ তেজঃপদার্থ না হওয়ায়, উহা অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে। তাহা হইলে "চক্ষুরিন্দ্রিয়" যদি তৈজস পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে না" এইরূপ যথার্থ তর্ক সম্ভব না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত অনুমান অপ্রযোজক। অর্থাৎ তৈজস পদার্থমাত্রই অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায়, তন্মূলক পূর্ব্বোক্ত (চক্ষুর্ন তৈজসং অন্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ) অনুমানের প্রামাণ্য নাই। সুতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের "চক্ষুস্তৈজসং" ইত্যাদি প্রকার অনুমানে অন্ধকারের অপ্রকাশকত্ব উপাধি হয় না। কারণ, তৈজস পদার্থ মাত্রই যে অন্ধকারের অপ্রকাশক, এবিষয়ে প্রমাণ নাই। পরন্তু বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়মাত্রই তৈজস নহে, এইরূপ অনুমান করা যাইবে না, এবং ঐ বিড়ালাদিরও দূরে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ স্বীকার্য্য হইলে, তেজঃপদার্থমাত্রই অন্ধকারের অপ্রকাশক, ইহাও বলা যাইবে না। সুতরাং "চক্ষুর্ন তৈজসং" ইত্যাকার পূর্ব্বোক্ত অনুমানের প্রামাণ্য নাই এবং "চক্ষুস্তৈজসং" ইত্যাদি প্রকার অনুমানে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন উপাধি নাই, ইহাও মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। মহর্ষি ইহার পরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে প্রাপ্যকারিত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব বা রশ্মিমত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষস্য জ্ঞানকারণত্বানুপপত্তিঃ। কস্মাৎ ?

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষকারণত্ব উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ॥ ॥৪৫॥২৪৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রাপ্ত না হইয়া গ্রহণ করে, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়-প্রাপ্ত বা বিষয়সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই, ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায়, কারণ, (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা) কাচ অভ্রপটল[১] ও স্ফটিকের দ্বারা ব্যবহিত বস্তুরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। তৃণাদিসর্পদ্দ্রব্যং কাচেঽভ্রপটলে বা প্রতিহতং দৃষ্টং, অব্যবহিতেন সন্নিকৃষ্যতে, ব্যাহন্যতে বৈ প্রাপ্তির্ব্যবধানেনেতি। যদি চ

১। সূত্রে "অভ্র" শব্দের দ্বারা মেঘ অথবা অভ্র নামক পার্ব্বত্য ধাতুবিশেষই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। "অভ্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চনে" ইতি বিশ্বঃ।

রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষো গ্রহণহেতুঃ স্যাৎ, ন ব্যবহিতস্য সন্নিকর্ষ ইত্যগ্রহণং স্যাৎ। অস্তি চেয়ং কাচাভ্রপটল-স্ফটিকান্তরিতোপলব্ধিঃ,সা জ্ঞাপয়ত্যপ্রাপ্যকারীণীন্দ্রিয়াণি, অতএবাভৌতিকানি, প্রাপ্যকারিত্বং হি ভৌতিকধর্ম্ম ইতি।

অনুবাদ। তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য, কাচ এবং অভ্রপটলে প্রতিহত দেখা যায়, অব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, ব্যবধানপ্রযুক্ত (উহাদিগের) প্রাপ্তি (সংযোগ) ব্যাহতই হয়। কিন্তু যদি চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে ব্যবহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয় না, এজন্য (উহার) অপ্রত্যক্ষ হউক ? কিন্তু কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের এই উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) আছে, অর্থাৎ উহা সর্ব্বসম্মত, সেই উপলব্ধি ইন্দ্রিয়বর্গকে অপ্রাপ্যকারী বলিয়া জ্ঞাপন করে, অতএব (ইন্দ্রিয়বর্গ) অভৌতিক। যেহেতু প্রাপ্যকারিত্ব ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম্ম।

টিপ্পনী। মহর্ষি ইন্দ্রিয়বর্গের ভৌতিকত্ব সমর্থন করিয়া এখন উহাতে প্রকারান্তরে বিরুদ্ধবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তখন বলিতে হইবে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়প্রাপ্ত বা বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে। কারণ, যে সকল বস্তু কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকে, তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে যে প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে কাচাদি ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য কাচ ও অভ্রপটলে প্রতিহত দেখা যায়। অব্যবহিত বস্তুর সহিতই উহাদিগের সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। কোন ব্যবধান থাকিলে তদ্দ্বারা ব্যবহিত দ্রব্যের সহিত উহাদিগের সংযোগ ব্যাহত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে চক্ষুরিন্দ্রিয়ও কাচাদি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতে পারে না, কাচাদি দ্রব্যে উহাও প্রতিহত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয়কে ভৌতিক পদার্থ বলিলে, উহাকে তৈজস পদার্থ বলিতে হইবে। তাহা হইলে উহাও তৃণাদির ন্যায় গতিবিশিষ্ট দ্রব্য হওয়ায়, কাচাদি দ্রব্যে উহাও অবশ্য প্রতিহত হইবে। কিন্তু কাচাদি দ্রব্যবিশেষের দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা বিবাদ নাই। সুতরাং উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গ যে অপ্রাপ্যকারী, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক নহে, উহারা অভৌতিক পদার্থ, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক পদার্থ হইলে প্রাপ্যকারীই হইবে, অপ্রাপ্যকারী হইতে পারে না। কারণ, প্রাপ্যকারিত্বই ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় যদি তাহার গ্রাহ্য বিষয়কে প্রাপ্ত

অর্থাৎ তাহার সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ জন্মায়, তাহা হইলে উহাকে বলা যায়—প্রাপ্যকারী, ইহার বিপরীত হইলে, তাহাকে বলা যায়—অপ্রাপ্যকারী। "প্রাপ্য" বিষয়ং প্রাপ্য-করোতি প্রত্যক্ষং জনয়তি"—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "প্রাপ্যকারী" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। ৪৫ ॥

সূত্র। কুড্যান্তরিতানুপলব্ধেরপ্রতিষেধঃ ॥৪৬॥২৪৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, প্রতিষেধ হয় না [অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যখন ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তু দেখা যায় না, তখন তাহার প্রাপ্যকারিত্বের অথবা তাহার সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্বের প্রতিষেধ (অভাব) বলা যায় না]।

ভাষ্য। অপ্রাপ্যকারিত্বে সতীন্দ্রিয়াণাং কুড্যান্তরিতস্যানুপলব্ধির্ন স্যাৎ।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিত্ব হইলে ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তুর অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বর্গকে অপ্রাপ্যকারী বলিলে ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না"। যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়সন্নিকৃষ্ট না হইয়াই প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে, মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত ভিত্তির দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কেন হয় না? তাহা যখন হয় না, তখন বলিতে হইবে, উহা অপ্রাপ্যকারী নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উহার অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও প্রাপ্যকারিত্ব ও ভৌতিকত্ব সিদ্ধ হয়। ৪৬।

ভাষ্য। প্রাপ্যকারিত্বেঽপি তু কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ধির্ন স্যাৎ—

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রাপ্যকারিত্ব হইলেও কিন্তু কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—

সূত্র। অপ্রতীঘাতাৎ সন্নিকর্ষোপপত্তিঃ ॥৪৭॥২৪৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রতীঘাত না হওয়ায়, সন্নিকর্ষের উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। ন চ কাচোঽভ্রপটলং বা নয়নরশ্মিং বিষ্টভ্নাতি, সোঽপ্রতি-হন্যমানঃ সন্নিকৃষ্যত ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু কাচ ও অভ্রপটল নয়নরশ্মিকে প্রতিহত করে না (সুতরাং) অপ্রতিহন্যমান সেই নয়নরশ্মি (কাচাদি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত) সন্নিকৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী হইলেও সে পক্ষে দোষ হয়। কারণ, তাহা হইলে কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ভাষ্যকার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তাহার উত্তরসূত্ররূপে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্য তাহার ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুর রশ্মির প্রতিরোধক হয় না। ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচাদি দ্রব্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মির প্রতিঘাত হয় না, সুতরাং সেখানে চক্ষুর রশ্মি কাচাদির দ্বারা অপ্রতিহত হওয়ায়, ঐ কাচাদিকে ভেদ করিয়া তদ্ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। সুতরাং সেখানে ঐ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার কোন বাধা নাই। সেখানেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই আছে॥ ৪৭॥

ভাষ্য। যশ্চ মন্যতে ন ভৌতিকস্যাপ্রতীঘাত ইতি। তন্ন,

অনুবাদ। আর যিনি মনে করেন, ভৌতিক পদার্থের অপ্রতীঘাত নাই, তাহা নহে—

সূত্র। আদিত্যরশ্মেঃ স্ফটিকান্তরেঽপি দাহ্যেঽ-বিঘাতাৎ ॥৪৮॥২৪৬॥

অনুবাদ। যেহেতু (১) সূর্য্যরশ্মির বিঘাত নাই, (২) স্ফটিক-ব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহ্য বস্তুতেও বিঘাত নাই।

ভাষ্য। আদিত্যরশ্মেরবিঘাতাৎ, স্ফটিকান্তরিতেপ্যবিঘাতাৎ, দাহ্যেঽ-বিঘাতাৎ। "অবিঘাতা"দিতি পদাভিসম্বন্ধভেদাদ্বাক্যভেদ ইতি। প্রতিবাক্যঞ্চার্থভেদ ইতি। আদিত্যরশ্মিঃ কুম্ভাদিষু ন প্রতিহন্যতে, অবিঘাতাৎ কুম্ভস্থমুদকং তপতি, প্রাপ্তৌ হি দ্রব্যান্তরগুণস্য উষ্ণস্য স্পর্শস্য গ্রহণং, তেন চ শীতস্পর্শাভিভব ইতি। স্ফটিকান্তরিতেঽপি প্রকাশনীয়ে প্রদীপরশ্মীনামপ্রতীঘাতঃ, অপ্রতীঘাতাৎ প্রাপ্তস্য গ্রহণমিতি। ভর্জনকপালাদিস্থঞ্চ দ্রব্যমাগ্নেয়েন তেজসা দহ্যতে, তত্রাবিঘাতাৎ প্রাপ্তিঃ প্রাপ্তৌ তু দাহো নাপ্রাপ্যকারি তেজ ইতি।

অবিঘাতাদিতি চ কেবলং পদমুপাদীয়তে, কোঽয়মবিঘাতো নাম? অব্যূহ্যমানাবয়বেন ব্যবধায়কেন দ্রব্যেণ সর্ব্বতো দ্রব্যস্যাবিষ্টম্ভঃ ক্রিয়া-

হেতোরপ্রতিবন্ধঃ প্রাপ্তেরপ্রতিষেধ ইতি। দৃষ্টং হি কলশনিষক্তানামপাং বহিঃ শীতস্পর্শগ্রহণং। ন চেন্দ্রিয়েণাসন্নিকৃষ্টস্য দ্রব্যস্য স্পর্শোপলব্ধিঃ। দৃষ্টৌ চ প্রস্পন্দপরিস্রবৌ। তত্র কাচাভ্রপটলাদিভির্নায়নরশ্মের-প্রতীঘাতাদ্‌বিভিদ্যার্থেন সহ সন্নিকর্ষাদুপপন্নং গ্রহণমিতি।

অনুবাদ।—যেহেতু (১) সূর্য্যরশ্মির বিঘাত (প্রতীঘাত) নাই, (২) স্ফটিক-ব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহ্য বস্তুতেও বিঘাত নাই। "অবিঘাতাৎ" এই (সূত্রস্থ) পদের সহিত সম্বন্ধভেদপ্রযুক্ত বাক্যভেদ (পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যত্রয়) হইয়াছে। এবং প্রতি বাক্যে অর্থাৎ বাক্যভেদবশতঃই অর্থের ভেদ হইয়াছে। (উদাহরণ) (১) সূর্য্যরশ্মি কুম্ভাদিতে প্রতিহত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ কুম্ভস্থ জল তপ্ত করে, প্রাপ্তি অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির সহিত ঐ জলের সংযোগ হইলে (তাহাতে) দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ জলভিন্ন দ্রব্য তেজের গুণ উষ্ণস্পর্শের জ্ঞান হয়। সেই উষ্ণস্পর্শের দ্বারাই (ঐ জলের) শীতস্পর্শের অভিভব হয়। (২) স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত হইলেও গ্রাহ্য বিষয়ে প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ প্রাপ্তের অর্থাৎ সেই প্রদীপরশ্মিসম্বন্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। (৩) এবং ভর্জ্জন-কপালাদির মধ্যগত দ্রব্য, আগ্নেয় তেজের দ্বারা দগ্ধ হয়, অপ্রতীঘাতবশতঃ সেই দ্রব্যে (ঐ তেজের) প্রাপ্তি (সংযোগ) হয়, সংযোগ হইলেই দাহ হয়, (কারণ) তেজঃপদার্থ অপ্রাপ্যকারী নহে।

(প্রশ্ন) "অবিঘাতাৎ" এইটি কিন্তু কেবল পদ গৃহীত হইয়াছে, এই অবিঘাত কি? (উত্তর) অব্যূহ্যমানাবয়ব ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা, অর্থাৎ যাহার অবয়বে দ্রব্যান্তর-জনক সংযোগ উৎপন্ন হয় না, এইরূপ ভর্জ্জনকপালাদি দ্রব্যের দ্বারা সর্ব্বাংশে দ্রব্যের অবিষ্টম্ভ, ক্রিয়া হেতুর অপ্রতিবন্ধ, সংযোগের অপ্রতিষেধ। অর্থাৎ ইহাকেই "অবিঘাত" বলে। যেহেতু কলসস্থ জলের বহির্ভাগে শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্টদ্রব্যের স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। এবং প্রস্পন্দ ও পরিস্রব অর্থাৎ কুম্ভের নিম্নদেশ হইতে কুম্ভস্থ জলের স্যন্দন ও রেচন দেখা যায়। তাহা হইলে কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়ায়, (ঐ কাচাদিকে) ভেদ করিয়া (ঐ কাচাদি-ব্যবহিত) বিষয়ের সহিত (ইন্দ্রিয়ের) সন্নিকর্ষ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। চক্ষুরিন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ হইলেও, কাচাদি দ্বারা তাহার প্রতীঘাত হয় না, ইহা মহর্ষি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ইহাতে যদি কেহ বলেন যে, ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই প্রতিহত হয়, সমস্ত

ভৌতিক পদার্থই প্রতীঘাতধর্ম্মক, কুত্রাপি উহাদিগের অপ্রতীঘাত নাই। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার সূচনা করিয়া ঐ মতের খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিয়াছেন। সূত্রোক্ত "অবিঘাতাৎ" এই পদটির তিনবার আবৃত্তি করিয়া তিনটি বাক্য বুঝিতে হইবে এবং সেই তিনটি বাক্যের দ্বারা তিনটি অর্থ মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণানুসারে এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, (১) যেহেতু জলপূর্ণ কুম্ভাদিতে সূর্য্যরশ্মির প্রতীঘাত নাই, এবং (২) গ্রাহ্য বিষয় স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত হইলেও তাহাতে প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত নাই, এবং (৩) ভর্জ্জনকপালাদিস্থ দাহ্য তণ্ডুলাদিতে আগ্নেয় তেজের প্রতীঘাত নাই, অতএব ভৌতিক পদার্থ হইলেই, তাহা সর্ব্বত্র প্রতিহত হইবে, ভৌতিক পদার্থে অপ্রতীঘাত নাই, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। কুম্ভস্থ জলমধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট না হইলে উহা উত্তপ্ত হইতে পারে না, উহাতে তেজঃপদার্থের গুণ উষ্ণস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তদ্দ্বারা ঐ জলের শীতস্পর্শ অভিভূত হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই সমস্তই হইতেছে, তখন সূর্য্যরশ্মি ঐ জলকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ঐ জলের সর্ব্বাংশে সূর্য্যরশ্মির সংযোগ হয়, উহা সেখানে প্রতিহত হয় না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ স্ফটিক বা কাচাদি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও প্রদীপরশ্মি ঐ বিষয়কে প্রকাশ করে, ইহাও দেখা যায়। সুতরাং ঐ ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সেখানে প্রদীপরশ্মির সংযোগ হয়, স্ফটিকাদির দ্বারা উহার প্রতীঘাত হয় না, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ ভর্জ্জনকপালাদিতে যে তণ্ডুলাদি দ্রব্যের ভর্জ্জন করা হয়, তাহাতেও নিম্নস্থ অগ্নির সংযোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত যে সকল পাত্রবিশেষে তণ্ডুলাদির ভর্জ্জন করা হয়, তাহাকে ভর্জ্জনকপাল বলে। প্রচলিত কথায় উহাকে "ভাজাখোলা" বলে। উহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র অবশ্যই আছে। নচেৎ উহার মধ্যগত তণ্ডুলাদি দাহ্য বস্তুর সহিত নিম্নস্থ অগ্নির সংযোগ হইতে পারে না। কিন্তু যখন ঐ অগ্নির দ্বারা তণ্ডুলাদির ভর্জ্জন হইয়া থাকে, তখন সেখানে ঐ ভর্জ্জনকপালের মধ্যে অগ্নিপ্রবিষ্ট হয়, সেখানে তদ্দ্বারা ঐ অগ্নির প্রতীঘাত হয় না, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। সূর্য্যরশ্মি প্রদীপরশ্মি ও পাকজনক অগ্নি—এই তিনটি ভৌতিক পদার্থের পূর্ব্বোক্তস্থলে অপ্রতীঘাত অবশ্য স্বীকার করিতে হইলে, ভৌতিক পদার্থের অপ্রতীঘাত নাই, ইহা আর বলা যায় না।

সূত্রে "অবিঘাতাৎ" এইটি কেবল পদ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উহার সহিত শব্দান্তর যোগ না থাকায়, ঐ পদের দ্বারা কিসের অবিঘাত, কিসের দ্বারা অবিঘাত, এবং অবিঘাত কাহাকে বলে, এসমস্ত বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ব্যবধায়ক কোন দ্রব্যের দ্বারা অন্য দ্রব্যের যে সর্ব্বাংশে অবিষ্টম্ভ, তাহাকে বলে অবিঘাত। ঐ অবিষ্টম্ভ কি? তাহা বুঝাইতে উহারই বিবরণ করিয়াছেন যে, ক্রিয়া হেতুর অপ্রতি-বন্ধ সংযোগের অপ্রতিষেধ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতির যে ক্রিয়া জন্য জলাদির সহিত তাহার সংযোগ হয়, ঐ ক্রিয়ার কারণ সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতির জলাদিতে অপ্রতি-বন্ধ অর্থাৎ ঐ জলাদিতে সর্ব্বাংশে তাহার প্রাপ্তি বা সংযোগের বাধা না হওয়াই, ঐ স্থলে

অবিঘাত। জল ও ভর্জ্জনকপালাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র বলিয়া উহাদিগের অবিনাশে উহাতে সূর্য্য-রশ্মি ও অগ্নি প্রভৃতির যে প্রবেশ, তাহাই অবিঘাত, ইহাই সার কথা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহাই বুঝাইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্যকে "অব্যূহ্যমানাবয়ব" বলিয়াছেন। যে দ্রব্যের অবয়বের ব্যূহন হয় না, তাহাকে অব্যূহ্যমানাবয়ব" বলা যায়। পূর্ব্বোৎপন্ন দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগ নষ্ট হইলে, তাহার অবয়বে দ্রব্যান্তরজনক সংযোগের উৎপাদনকে "ব্যূহন" বলে[১]। ভর্জ্জনকপালাদি দ্রব্যের পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিনাশ হয় না,—সুতরাং সেখানে তাহার অবয়বের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যূহন হয় না। ফলকথা, কুম্ভ ও ভর্জ্জনকপালাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র বলিয়া, তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ অবিঘাত সম্ভব হয়। ভাষ্যকার শেষে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, কলসস্থ জলের বহির্ভাগে শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ কলস সচ্ছিদ্র, উহার ছিদ্র দ্বারা বহির্ভাগে জলের সমাগম হয়, ঐ কলস তাহার মধ্যগত জলের অত্যন্ত প্রতিরোধক হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপ কাচাদি স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়ায়, কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেখানে কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্যকে ভেদ করিয়া চক্ষুর রশ্মি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। ভাষ্যে "প্রস্যন্দপরিস্রবৌ" এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়। উদ্দ্যোতকর সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন যে, "পরিস্পন্দ" বলিতে বক্রগমন, "পরিস্রব" বলিতে পতন। তাঁহার মতে "পরিস্পন্দপরিস্রবৌ" এইরূপই ভাষ্যপাঠ, ইহাও বুঝা যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥

সূত্র। নেতরেতরধর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪৯॥২৪৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ কাচাদির দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রতীঘাত হয় না, ইহা বলা যায় না, যেহেতু (তাহা বলিলে) ইতরে ইতরের ধর্ম্মের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। কাচাভ্রপটলাদিবদ্বা কুড্যাদিভিরপ্রতীঘাতঃ, কুড্যাদিবদ্বা কাচাভ্রপটলাদিভিঃ প্রতীঘাত ইতি প্রসজ্যতে, নিয়মে কারণং বাচ্যমিতি।

অনুবাদ। কাচ ও অভ্রপটলাদির ন্যায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা অপ্রতীঘাত হয়, অথবা ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা প্রতীঘাত হয়, ইহা প্রসক্ত হয়, নিয়মে কারণ বলিতে হইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদি কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত বলা যায়, তাহা হইলে তাহার ন্যায় কুড্যাদির দ্বারাও উহার অপ্রতীঘাত কেন হয় না? এইরূপও আপত্তি করা যায়। এবং যদি কুড্যাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত বলা যায়, তাহা হইলে, তাহার ন্যায় কাচাদির দ্বারাও উহার প্রতীঘাত কেন হয়

১। যস্ত দ্রব্যস্যাবয়বা ন ব্যূহ্যন্তে ইত্যাদি—ন্যায়বার্ত্তিক।

যস্য দ্রব্যস্য ভর্জ্জনকপালাদেরবয়বা ন ব্যূহ্যন্তে পূর্ব্বোৎপন্নদ্রব্যারম্ভকসংযোগনাশেন দ্রব্যান্তরসংযোগোৎপাদনং ব্যূহনং তন্ন ক্রিয়ন্তে" ইত্যাদি।—তাৎপর্য্যটীকা।

না? এইরূপও আপত্তি করা যায়। কুড্যাদির দ্বারা প্রতীঘাতই হইবে, আর কাচাদি দ্বারা অপ্রতীঘাতই হইবে, এইরূপ নিয়মে কোন কারণ নাই। কারণ থাকিলে তাহা বলা আবশ্যক। ফলকথা, অপ্রতীঘাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীঘাতরূপ ধর্ম্মের আপত্তি হয়, এবং প্রতীঘাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীঘাতরূপ ধর্ম্মের আপত্তি হয়, এজন্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে॥ ৪৯॥

সূত্র। আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদস্বাভাব্যাদ্রূপোপলব্ধিবৎ তদুপলব্ধিঃ॥ ৫০॥২৪৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) দর্পণ ও জলের স্বচ্ছতাস্বভাববশতঃ রূপের প্রত্যক্ষের ন্যায় তাহার, অর্থাৎ কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়।

ভাষ্য। আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদো রূপবিশেষঃ স্বো ধর্ম্মো নিয়মদর্শনাৎ, প্রসাদস্য বা স্বো ধর্ম্মো রূপোপলম্ভনং। যথাদর্শপ্রতিহতস্য পরাবৃত্তস্য নয়নরশ্মেঃ স্বেন মুখেন সন্নিকর্ষে সতি স্বমুখোপলম্ভনং প্রতিবিম্বগ্রহণাখ্যমাদর্শরূপানুগ্রহাৎ তন্নিমিত্তং ভবতি, আদর্শরূপোপঘাতে তদভাবাৎ, কুড্যাদিষু চ প্রতিবিম্বগ্রহণং ন ভবতি, এবং কাচাভ্রপটলাদিভিরবিঘাতশ্চক্ষূরশ্মেঃ কুড্যাদিভিশ্চ প্রতীঘাতো দ্রব্যস্বভাবনিয়মাদিতি।

অনুবাদ। দর্পণ ও জলের প্রসাদ রূপবিশেষ স্বকীয় ধর্ম্ম, যেহেতু নিয়ম দেখা যায়, [অর্থাৎ ঐ প্রসাদ নামক রূপবিশেষ দর্পণ ও জলেই যখন দেখা যায়, তখন উহা দর্পণ ও জলেরই স্বকীয় ধর্ম্ম, ইহা বুঝা যায়] অথবা প্রসাদের স্বকীয় ধর্ম্ম রূপের উপলব্ধিজনন।

যেমন দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়া পরাবৃত্ত (প্রত্যাগত) নয়নরশ্মির স্বকীয় মুখের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, দর্পণের রূপের সাহায্যবশতঃ তন্নিমিত্তক স্বকীয় মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ নামক প্রত্যক্ষ হয়; কারণ, দর্পণের রূপের বিনাশ হইলে, সেই প্রত্যক্ষ হয় না, এবং ভিত্তি প্রভৃতিতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ হয় না—এইরূপ দ্রব্য স্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হয়, এবং ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা (উহার) প্রতীঘাত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের স্বভাব-নিয়ম-প্রযুক্তই কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা উহার প্রতীঘাত হয়। সুতরাং কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইতে পারায়,

তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দর্পণ ও জলের প্রসাদস্বভাবতাপ্রযুক্ত রূপোপলব্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া মহর্ষি তাঁহার বিবক্ষিত দ্রব্যস্বভাবের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "প্রসাদ"শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—রূপবিশেষ। বার্ত্তিককার ঐ রূপবিশেষকে বলিয়াছেন, দ্রব্যান্তরের দ্বারা অসংযুক্ত দ্রব্যের সমবায়। ভাষ্যকার ঐ প্রসাদ বা রূপবিশেষকেই প্রথমে স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা দর্পণ ও জলেরই ধর্ম্ম, এইরূপ নিয়মবশতঃ উহাকে তাহার স্বভাব বলা যায়। ভাষ্যকার পরে প্রসাদের স্বভাব এইরূপ অর্থে তৎপুরুষ সমাস আশ্রয় করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দর্পণ ও জলের প্রসাদনামক রূপবিশেষের স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়াছেন, রূপোপলম্ভন। ঐ প্রসাদের দ্বারা রূপোপলব্ধি হয়, এজন্য রূপের উপলব্ধিসম্পাদনকে উহার স্বভাব বা স্বধর্ম্ম বলা যায়। দর্পণাদির দ্বারা কিরূপে রূপোপলব্ধি হয়, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, চক্ষুর রশ্মি দর্পণে পতিত হইলে, উহা ঐ দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়া দ্রষ্টাব্যক্তির নিজমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তখন দর্পণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত ঐ নয়নরশ্মির দ্রষ্টাব্যক্তির নিজ মুখের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, তদ্দ্বারা নিজ মুখের প্রতিবিম্বগ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। ঐ প্রত্যক্ষ, দর্পণের রূপের সাহায্যপ্রযুক্ত হওয়ায়, উহাকে তন্নিমিত্তক বলা যায়। কারণ, দর্পণের পূর্ব্বোক্ত প্রসাদনামক রূপবিশেষ নষ্ট হইলে, ঐ প্রতিবিম্বগ্রহণ নামক মুখপ্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত ভিত্তিপ্রভৃতিতেও প্রতিবিম্বগ্রহণ না হওয়ায়, প্রতিবিম্বগ্রহণের পূর্ব্বোক্ত কারণ তাহাতে নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দ্রব্যস্বভাবের নিয়মবশতঃ সকল দ্রব্যেই সমস্ত স্বভাব থাকে না। ফলের দ্বারাই ঐ স্বভাবের নির্ণয় হইয়া থাকে। এইরূপ দ্রব্যস্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বারা প্রতীঘাত হয়। স্বভাবের উপরে কোন বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। পরসূত্রে মহর্ষি নিজেই ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

সূত্র। দৃষ্টানুমিতানাং হি নিয়োগপ্রতিষেধানুপপত্তিঃ ॥৫১॥২৪৯॥

অনুবাদ। দৃষ্ট ও অনুমিত (প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ) পদার্থসমূহের নিয়োগ ও প্রতিষেধের অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে বিধি ও নিষেধের উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ। ন খলু ভোঃ পরীক্ষমাণেন দৃষ্টানুমিতা অর্থাঃ শক্যা নিযোক্তুমেবং ভবতেতি, নাপি প্রতিষেদ্ধুমেবং ন ভবতেতি। ন হীদমুপপদ্যতে রূপবদ্ গন্ধোঽপি চাক্ষুষো ভবত্বিতি, গন্ধবদ্বা রূপং চাক্ষুষং মাভূদিতি, অগ্নিপ্রতিপত্তিবদ্ ধূমেনোদকপ্রতিপত্তি-

রপি ভবত্বিতি, উদকাপ্রতিপত্তিবদ্বা ধূমেনাগ্নিপ্রতিপত্তিরপি মাভূদিতি। কিং কারণং ? যথা খল্বর্থা ভবন্তি য এষাং স্বো ভাবঃ স্বো ধর্ম্ম ইতি তথাভূতাঃ প্রমাণেন প্রতিপদ্যন্ত ইতি, তথাভূতবিষয়কং হি প্রমাণমিতি। ইমৌ খলু নিয়োগপ্রতিষেধৌ ভবতা দেশিতৌ, কাচাভ্রপটলাদিবদ্বা কুড্যাদিভিরপ্রতীঘাতো ভবতু, কুড্যাদিবদ্বা কাচাভ্রপটলাদিভিরপ্রতীঘাতো মাভূদিতি। ন, দৃষ্টানুমিতাঃ খল্বিমে দ্রব্যধর্ম্মাঃ, প্রতীঘাতাপ্রতীঘাতয়োর্হ্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধী ব্যবস্থাপিকে। ব্যবহিতানুপলব্ধ্যাঽনুমীয়তে কুড্যাদিভিঃ প্রতীঘাতঃ, ব্যবহিতোপলব্ধ্যাঽনুমীয়তে কাচাভ্রপটলাদিভিরপ্রতীঘাত ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু প্রমাণের তত্ত্ববিষয়ত্ব আছে, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা বস্তুর তত্ত্বই হইয়া থাকে (অতএব তাহার সম্বন্ধে নিয়োগ বা প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না)।

পরীক্ষমাণ অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বস্তুতত্ত্ববিচারক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও অনুমানসিদ্ধ পদার্থসমূহ "তোমরা এইরূপ হও"---এইরূপে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত অথবা "তোমরা এইরূপ হইও না" এইরূপে প্রতিষেধ করিবার নিমিত্ত যোগ্য নহে। যেহেতু "রূপের ন্যায় গন্ধও চাক্ষুষ হউক ?" অথবা "গন্ধের ন্যায় রূপ চাক্ষুষ না হউক ?" "ধূমের দ্বারা অগ্নির অনুমানের ন্যায় জলের অনুমানও হউক ?" অথবা "যেমন ধূমের দ্বারা জলের অনুমান হয় না, তদ্রূপ অগ্নির অনুমানও না হউক ?" ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়োগ ও প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কি জন্য ? অর্থাৎ ঐরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধ না হওয়ার কারণ কি ? (উত্তর) যেহেতু পদার্থসমূহ যে প্রকার হয়, যাহা ইহাদিগের স্বকীয় ভাব, কি না স্বকীয় ধর্ম্ম, প্রমাণ দ্বারা (ঐ সকল পদার্থ) সেই প্রকারই প্রতিপন্ন হয় ; কারণ, প্রমাণ, তথাভূত-পদার্থ-বিষয়ক।

(বিশদার্থ) এই (১) নিয়োগ ও (২) প্রতিষেধ, আপনি (পূর্ব্বপক্ষবাদী) আপত্তি করিয়াছেন। (যথা) কাচ ও অভ্রপটলাদির ন্যায় ভিত্তিপ্রভৃতি দ্বারা (চক্ষুর রশ্মির) অপ্রতীঘাত হউক ? অথবা ভিত্তিপ্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত না হউক ? না, অর্থাৎ ঐরূপ আপত্তি

অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষই প্রতীঘাত ও অপ্রতীঘাতের নিয়ামক। ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষপ্রযুক্ত ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা প্রতীঘাত অনুমিত হয়, এবং ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা অপ্রতীঘাত অনুমিত হয়।

টিপ্পনী। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, কাচাদি দ্রব্যের দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হয় না, কিন্তু ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রতীঘাত হয়, ইহার কারণ কি? কাচাদির ন্যায় ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বারা প্রতীঘাত না হউক? অথবা ভিত্তিপ্রভৃতির ন্যায় কাচাদির দ্বারাও প্রতীঘাত হউক? মহর্ষি এতদুত্তরে এই সূত্রের দ্বারা শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা যেরূপে পরীক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে "এই প্রকার হউক?" অথবা "এই প্রকার না হউক?"—এইরূপ বিধান বা নিষেধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার "প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ" এই কথা বলিয়া মহর্ষির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে ইন্দ্রিয়পরীক্ষায় মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার শেষভাগে "প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়াৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধা"দি গ্রন্থে উদ্ধৃত এই সূত্রপাঠে কোন হেতু-বাক্য নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রমাণ যখন প্রকৃত তত্ত্বকেই বিষয় করে, তখন প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেই পদার্থ সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, গন্ধেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হউক, এইরূপ নিয়োগ করা যায় না। এইরূপ গন্ধের ন্যায় রূপেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হউক, এইরূপ নিষেধ করাও যায় না। এবং ধূমের দ্বারা বহ্নির ন্যায় জলেরও অনুমান হউক, অথবা ধূমের দ্বারা জলের অনুমান না হওয়ার ন্যায় বহ্নির অনুমানও না হউক, এইরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধও হইতে পারে না। কারণ, ঐসকল পদার্থ ঐরূপে দৃষ্ট বা অনুমিত হয় নাই। যেরূপে উহারা প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই উহাদিগের স্বভাব বা স্বধর্ম্ম। বস্তুস্বভাবের উপরে কোনরূপ বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেখানে অপ্রতিঘাত হউক, এইরূপ নিয়োগ করা যায় না। এইরূপ কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেখানে অপ্রতীঘাত না হউক, এইরূপ নিষেধ করাও যায় না। ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা কাচাদির ন্যায় চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হইলে, কাচাদির দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের ন্যায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত এবং কাচাদির দ্বারাও চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হইলে, কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত না। কিন্তু ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ এবং কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত এবং কাচাদির দ্বারা উহার অপ্রতীঘাত অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। সুতরাং উহার সম্বন্ধে আর পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়োগ বা প্রতিষেধ করা যায় না।

মহর্ষি এই প্রকরণের শেষে চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত ও অপ্রতীঘাত সমর্থন করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করায়, ইহার দ্বারাও তাঁহার সম্মত ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। কারণ, ইন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ না হইলে, কুত্রাপি তাহার প্রতীঘাত সম্ভব না হওয়ায়, সর্ব্বত্র ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ" যে নানাপ্রকার এবং উহা প্রত্যক্ষের কারণরূপে অবশ্যস্বীকার্য্য, ইহাও সূচিত হইয়াছে। কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষই "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ"। ঐ সন্নিকর্ষ ব্যতীত ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব সম্ভবই হয় না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়ের কোন এক প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে। এজন্য উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে গোতমোক্ত "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ"কে ছয় প্রকার বলিয়াছেন। উহা পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকদিগেরই কল্পিত নহে। মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে "সন্নিকর্ষ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই, উহা সূচনা করিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ মহর্ষির অভিমত হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ "সংযোগ" শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে অপ্রসিদ্ধ "সন্নিকর্ষ" শব্দের কেন প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ ঘটাদি দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হইতে পারিলেও, ঐ ঘটাদি দ্রব্যের রূপাদি গুণের সহিত এবং ঐ রূপাদিগত রূপত্বাদি জাতির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যের ন্যায় রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং রূপাদি গুণপদার্থ এবং রূপত্বাদি জাতিও অভাব প্রভৃতি অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষের কারণরূপে বিভিন্নপ্রকার সন্নিকর্ষই মহর্ষি গোতমের অভিমত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এখন কেহ কেহ প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ব-বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সংযোগ-সম্বন্ধই জন্মে, সংযোগ সকল পদার্থেই জন্মিতে পারে, এইরূপ বলিয়া নানা সন্নিকর্ষবাদী নব্যনৈয়ায়িকদিগকে উপহাস করিতেছেন। নিরর্থক ষড়্‌বিধ "সন্নিকর্ষে"র কল্পনা নাকি নব্যনৈয়ায়িকদিগেরই অজ্ঞতামূলক। কণাদ ও গোতম যখন ঐ কথা বলেন নাই, তখন নব্যনৈয়ায়িকদিগের ঐসমস্ত বৃথা কল্পনায় কর্ণপাত করার কোন কারণ নাই, ইহাই তাঁহাদিগের কথা। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, গুণাদি পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ-সম্বন্ধ হয় না, সংযোগ যে, কেবল দ্রব্যপদার্থেই জন্মে, ইহা নব্যনৈয়ায়িকগণ নিজ বুদ্ধির দ্বারা কল্পনা করেন নাই। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদই "গুণ" পদার্থের লক্ষণ বলিতে "গুণ" পদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[১]। কণাদের মতে সংযোগ গুণপদার্থ। সুতরাং দ্রব্যপদার্থ ভিন্ন আর কোন পদার্থে সংযোগ জন্মে না, ইহা কণাদের ঐ সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। গুণপদার্থে গুণপদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, নীল রূপে অন্য নীল রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, মধুর রসে অন্য মধুর রসের উৎপত্তি হইতে পারে। এইরূপে অনন্ত রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তির আপত্তি হয়। সুতরাং জন্যগুণের

১। দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণং। ১।১।১৬।

উৎপত্তিতে দ্রব্য-পদার্থই সমবায়িকারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে দ্রব্য-পদার্থই গুণের আশ্রয়, গুণাদি সমস্ত পদার্থই নির্গুণ, ইহাই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়। তাই মহর্ষি কণাদ গুণ-পদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও নির্গুণ বলিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির উদ্ভাবন করিয়া কণাদ-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তের কল্পনা করেন নাই। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও কণাদের ঐ সিদ্ধান্তানুসারেই গোতমোক্ত প্রত্যক্ষকারণ "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ"কে ছয় প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন; ন্যায়দর্শনের সমানতন্ত্র বৈশেষিক-দর্শনোক্ত ঐ সিদ্ধান্তই ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমও প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষসূত্রে "সংযোগ" শব্দ ত্যাগ করিয়া, "সন্নিকর্ষ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। সূত্রে সূচনাই থাকে।

এইরূপ "সামান্যলক্ষণা", "জ্ঞানলক্ষণা" ও "যোগজ" নামে যে তিন প্রকার "সন্নিকর্ষ" নব্যনৈয়ায়িকগণ ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে বর্ণন করিয়াছেন, উহাও মহর্ষি গোতমের প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রোক্ত "সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরন্তু মহর্ষি গোতমের প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে "অব্যভিচারি" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার মতে ব্যভিচারি-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ভ্রম-প্রত্যক্ষও যে আছে, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণরূপে কোন সন্নিকর্ষও তিনি স্বীকার করিতেন, ইহাও বুঝা যায়। নব্য-নৈয়ায়িকগণ ঐ "সন্নিকর্ষে"রই নাম বলিয়াছেন, "জ্ঞানলক্ষণা"। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিকায় রজতভ্রম প্রভৃতি ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থলে সর্পাদি বিষয় না থাকায়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি-সন্নিকর্ষ অসম্ভব। সুতরাং সেখানে ঐ ভ্রম প্রত্যক্ষের কারণরূপে সর্পত্বাদির জ্ঞানবিশেষস্বরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। উহা জ্ঞানস্বরূপ, তাই উহার নাম "জ্ঞানলক্ষণা" প্রত্যাসত্তি। "লক্ষণ" শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ, এবং "প্রত্যাসত্তি" শব্দের অর্থ "সন্নিকর্ষ"। বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক-সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত ভ্রম-প্রত্যক্ষ-স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা-বশতঃ ঐরূপ স্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি মিথ্যা বিষয়ের মিথ্যা সৃষ্টিই কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন সম্প্রদায়ই উহা স্বীকার করেন নাই। ফলকথা, মহর্ষি গোতমের মতে ভ্রম-প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব থাকায়, উহার কারণরূপে তিনি যে, কোন সন্নিকর্ষ-বিশেষ স্বীকার করিতেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। উহা অলৌকিক সন্নিকর্ষ। নব্যনৈয়ায়িকগণ উহার সমর্থন করিয়াছেন। উহা কেবল তাঁহাদিগের বুদ্ধিমাত্র কল্পিত নহে। এইরূপ মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে মুমুক্ষুর যোগাদির আবশ্যকতা প্রকাশ করায়, "যোগজ" সন্নিকর্ষবিশেষও একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে তাঁহার সম্মত, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে "সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারা উহাও সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ কোন স্থানে একবার "গো" দেখিলে, গোত্বরূপে সমস্ত গো-ব্যক্তির যে এক প্রকার প্রত্যক্ষ হয় এবং একবার ধূম দেখিলে ধূমত্বরূপে সকল ধূমের যে এক প্রকার প্রত্যক্ষ হয়, উহার কারণরূপেও কোন "সন্নিকর্ষ"-বিশেষ স্বীকার্য্য। কারণ, যেখানে সমস্ত গো এবং সমস্ত ধূমে চক্ষুঃ সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ নাই, উহা অসম্ভব, সেখানে গোত্বাদি সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞানজন্যই

সমস্ত গবাদি বিষয়ে এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। একবার কোন গো দেখিলে যে গোত্ব নামক সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, ঐ সামান্য ধর্ম্ম সমস্ত গো-ব্যক্তিতেই থাকে। ঐ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞানই সেখানে সমস্ত গো-বিষয়ক অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ "সন্নিকর্ষ"। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ ঐ সন্নিকর্ষের নাম বলিয়াছেন—"সামান্যলক্ষণা"। ঐরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে, ঐরূপ সকল গবাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। ঐরূপ প্রত্যক্ষ না জন্মিলে "ধূম বহ্নিব্যাপ্য কি না"—এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে না। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি কোন স্থানে ধূম ও বহ্নি উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইলে, সেই পরিদৃষ্ট ধূম যে সেই বহ্নির ব্যাপ্য, ইহা নিশ্চিতই হয়। সুতরাং সেই ধূমে সেই বহ্নির ব্যাপ্যতা-বিষয়ে সংশয় হইতেই পারে না। সেখানে অন্য ধূমের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে, সামান্যতঃ ধূম বহ্নিব্যাপ্য কি না?—এইরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? সুতরাং যখন অনেকস্থলে ঐরূপ সংশয় জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ; তখন কোন স্থানে একবার ধূম দেখিলে ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য সকল ধূম-বিষয়ক যে এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষের বিষয় অন্য ধূমকে বিষয় করিয়া সামান্যতঃ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য কি না—এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বোক্তরূপ নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা "সামান্যলক্ষণা" নামে অলৌকিক সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িক, রঘুনাথ শিরোমণি ঐ "সামান্যলক্ষণা" খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া, তাঁহার অভিনব অদ্ভুত প্রতিভার দ্বারা "সামান্যলক্ষণা" খণ্ডন করিয়া, তাঁহার গুরু বিশ্ববিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন। গঙ্গেশের "তত্ত্বচিন্তামণি"র "দীধিতি"তে তিনি গঙ্গেশের মতের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, যদি পূর্ব্বোক্ত "সামান্যলক্ষণা" নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য্যই হয়, তাহা হইলে, মহর্ষি গোতমের প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে "সন্নিকর্ষ" শব্দের দ্বারা উহাও সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুধীগণ এ বিষয়ে বিচার করিয়া গোতম-মত নির্ণয় করিবেন ॥ ৫১ ॥

ইন্দ্রিয়ভৌতিকত্ব-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

———০———

ভাষ্য। অথাপি খল্বেকমিদমিন্দ্রিয়ং, বহূনীন্দ্রিয়াণি বা। কুতঃ সংশয়ঃ?

অনুবাদ। পরন্তু, এই ইন্দ্রিয় এক? অথবা ইন্দ্রিয় বহু? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের একত্ব ও বহুত্ব-বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি?

সূত্র। স্থানান্যত্বে নানাত্বাদবয়বি-নানাস্থানত্বাচ্চ সংশয়ঃ ॥৫২॥২৫০॥

অনুবাদ। স্থানভেদে নানাত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আধারের ভেদে আধেয়ের ভেদ-প্রযুক্ত এবং অবয়বীর নানাস্থানত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বী শাখা প্রভৃতি নানাস্থানে থাকিলেও ঐ অবয়বীর অভেদপ্রযুক্ত (ইন্দ্রিয় বহু ? অথবা এক ?— এইরূপ) সংশয় হয়।

ভাষ্য। বহূনি দ্রব্যাণি নানাস্থানানি দৃশ্যন্তে, নানাস্থানশ্চ সন্নেকোঽবয়বী চেতি, তেনেন্দ্রিয়েষু ভিন্নস্থানেষু সংশয় ইতি।

অনুবাদ। নানাস্থানস্থ দ্রব্যকে বহু দেখা যায়, এবং অবয়বী (বৃক্ষাদি দ্রব্য) নানাস্থানস্থ হইয়াও, এক দেখা যায়, তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে (ইন্দ্রিয় বহু ? অথবা এক ? এইরূপ) সংশয় হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার কথিত তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষায় পূর্ব্বপ্রকরণে ইন্দ্রিয়বর্গের ভৌতিকত্ব পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা সেই পরীক্ষাঙ্গ সংশয় সমর্থন করিয়াছেন। সংশয়ের কারণ এই যে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায়, স্থান অর্থাৎ আধারের ভেদপ্রযুক্ত উহাদিগের ভেদ বুঝা যায়। কারণ, ঘট-পটাদি যে সকল দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা আধারে থাকে, তাহাদিগের ভেদ বা বহুত্বই দেখা যায়। কিন্তু একই ঘট-পটাদি ও বৃক্ষাদি অবয়বী, নানা অবয়বে থাকে, ইহাও দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন নানা আধারে অবস্থিত দ্রব্যের নানাত্ব দেখা যায়, তদ্রূপ নানা আধারে অবস্থিত অবয়বী দ্রব্যের একত্বও দেখা যায়। সুতরাং নানাস্থানে অবস্থান বস্তুর নানাত্বের সাধক হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়বর্গ নানা স্থানে অবস্থিত হইলেও, উহা বহু, অথবা এক ? এইরূপ সংশয় হয়। নানা স্থানে অবস্থান, দ্রব্যের নানাত্ব ও একত্ব—এই উভয়-সাধারণ ধর্ম্ম হওয়ায়, উহার জ্ঞানবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে। উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়বিষয়ে সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া, ইন্দ্রিয়ের স্থান-বিষয়ে সংশয়ের যুক্ততা সমর্থন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়ে শরীরভিন্নত্ব ও সত্তা থাকায়, তৎপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয় কি এক, অথবা অনেক ?—এইরূপ সংশয় জন্মে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। অর্থাৎ শরীরভিন্ন বস্তু এক এবং অনেক দেখা যায়। যেমন—আকাশ এক, ঘটাদি অনেক। এইরূপ সৎপদার্থও এক এবং অনেক দেখা যায়। সুতরাং শরীরভিন্নত্ব ও সত্তারূপ সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্য ইন্দ্রিয়বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে॥ ৫২ ॥

ভাষ্য। একমিন্দ্রিয়ং—

সূত্র। ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥৫৩॥২৫১॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, যেহেতু অব্যতিরেক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্থানে ত্বকের সত্তা আছে।

ভাষ্য। ত্বগেকমিন্দ্রিয়মিত্যাহ, কস্মাৎ? অব্যতিরেকাৎ। ন ত্বচা কিঞ্চিদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং ন প্রাপ্তং, ন চাসত্যাং ত্বচি কিঞ্চিদ্বিষয়গ্রহণং ভবতি। যয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়স্থানানি ব্যাপ্তানি যস্যাঞ্চ সত্যাং বিষয়গ্রহণং ভবতি সা ত্বগেকমিন্দ্রিয়মিতি।

অনুবাদ। ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা (কেহ) বলেন। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অব্যতিরেক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্থানে ত্বকের সত্তা আছে। বিশদার্থ এই যে, কোন ইন্দ্রিয়-স্থান ত্বগিন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত নহে, ইহা নহে এবং ত্বগিন্দ্রিয় না থাকিলে, কোন বিষয়-জ্ঞান হয় না। যাহার দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়-স্থান ব্যাপ্ত, অথবা যাহা থাকিলে বিষয়জ্ঞান হয়, সেই ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয় বহু? অথবা এক?—এইরূপ সংশয় সমর্থন করিয়া এই সূত্রের দ্বারা ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার "একমিন্দ্রিয়ং এই বাক্যের পূরণ করিয়া এই পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত সূত্রের "ত্বক্" এই পদের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভাষ্যকারও ঐরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া "ইত্যাহ" এই কথার দ্বারা উহা যে কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ত্বক্‌ই একমাত্র বহিরিন্দ্রিয়, ইহা প্রাচীন সাংখ্যমতবিশেষ। "শারীরক-ভাষ্যা"দি গ্রন্থে ইহা পাওয়া যায়[১]। মহর্ষি গোতম ঐ সাংখ্যমতবিশেষকে খণ্ডন করিতেই এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ-রূপে ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি ঐ মত সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন, "অব্যতিরেকাৎ"। সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানে ত্বকের সম্বন্ধ বা সত্তাই এখানে "অব্যতিরেক" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,কোন ইন্দ্রিয়স্থান ত্বগিন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত নহে, ইহা নহে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানেই ত্বগিন্দ্রিয় আছে, এবং ত্বগিন্দ্রিয় না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মে না। ফলকথা, সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানেই যখন ত্বগিন্দ্রিয় আছে, এবং ত্বগিন্দ্রিয় থাকাতেই যখন সমস্ত বিষয়-জ্ঞান হইতেছে, মনের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞানই জন্মে না, তখন ত্বক্‌ই একমাত্র বহিরিন্দ্রিয়—উহাই গন্ধাদি সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায়। সুতরাং ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রির স্বীকার অনাবশ্যক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং জন্যজ্ঞানমাত্রেই ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ কারণ, এই ন্যায়সিদ্ধান্ত প্রকটিত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক॥ ৫৩॥

১। পরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাংখ্যানামভ্যুপগমঃ। ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যনুক্রামন্তি" ইত্যাদি—(বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ২য় পা০ ১০ম সূত্রভাষ্য)।

ত্বঙ্‌মাত্রমেবহি বুদ্ধীন্দ্রিয়মনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থমেকং, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, সপ্তমঞ্চ মন ইতি সপ্তেন্দ্রিয়াণি।

—ভামতী।

ভাষ্য। **নেন্দ্রিয়ান্তরার্থানুপলব্ধেঃ।** স্পর্শোপলব্ধিলক্ষণায়াং সত্যাং ত্বচি গৃহ্যমাণে ত্বগিন্দ্রিয়েণ স্পর্শে ইন্দ্রিয়ান্তরার্থা রূপাদয়ো ন গৃহ্যন্তে অন্ধাদিভিঃ। ন স্পর্শগ্রাহকাদিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ান্তরমস্তীতি স্পর্শবদন্ধাদিভির্ন-গৃহ্যেরন্ রূপাদয়ঃ, ন চ গৃহ্যন্তে তস্মান্নৈকমিন্দ্রিয়ং ত্বগিতি।

ত্বগবয়ববিশেষেণ ধূমোপলব্ধিবৎ তদুপলব্ধিঃ। যথা ত্বচোঽবয়ববিশেষঃ কশ্চিৎ চক্ষুষি সন্নিকৃষ্টো ধূমস্পর্শং গৃহ্লাতি নান্যঃ, এবং ত্বচোঽবয়ববিশেষা রূপাদিগ্রাহকাস্তেষামুপঘাতাদন্ধাদিভি-র্ন গৃহ্যন্তে রূপাদয় ইতি।

ব্যাহতত্বাদহেতুঃ। ত্বগব্যতিরেকাদেকমিন্দ্রিয়মিত্যুক্ত্বা ত্বগবয়ব-বিশেষেণ ধূমোপলব্ধিবদ্রূপাদ্যুপলব্ধিরিত্যুচ্যতে। এবঞ্চ সতি নানাভূতানি বিষয়গ্রাহকানি বিষয়ব্যবস্থানাৎ, তদ্ভাবে বিষয়গ্রহণস্য ভাবাৎ তদুপঘাতে চাভাবাৎ, তথা চ পূর্ব্বো বাদ উত্তরেণ বাদেন ব্যাহন্যত ইতি।

সন্দিগ্ধশ্চাব্যতিরেকঃ। পৃথিব্যাদিভিরপি ভূতৈরিন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠানানি ব্যাপ্তানি, ন চ তেষ্বসৎসু বিষয়গ্রহণং ভবতীতি। তস্মান্ন ত্বগন্যদ্বা সর্ব্ববিষয়মেকমিন্দ্রিয়মিতি।

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা বলা যায় না, যেহেতু ইন্দ্রিয়ান্তরার্থের (রূপাদির) উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে, স্পর্শের উপলব্ধি যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ. এমন ত্বগিন্দ্রিয় থাকিলে, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ গৃহ্যমাণ হইলে, তখন অন্ধ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়ান্তরার্থ রূপাদি গৃহীত হয় না। স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয় হইতে, অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয় নাই, এজন্য অন্ধপ্রভৃতি কর্ত্তৃক স্পর্শের ন্যায় রূপাদিও গৃহীত হউক? কিন্তু গৃহীত হয় না, অতএব ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বারা ধূমের উপলব্ধির ন্যায় সেই রূপাদির উপলব্ধি হয়। বিশদার্থ এই যে, যেমন চক্ষুতে সন্নিকৃষ্ট ত্বকের কোন অংশবিশেষ ধূমের স্পর্শের গ্রাহক হয়, অন্য অর্থাৎ ত্বকের অন্য কোন অংশ ধূমস্পর্শের গ্রাহক হয় না, এইরূপ ত্বকের অবয়ববিশেষ রূপাদির গ্রাহক হয়, তাহাদিগের বিনাশপ্রযুক্ত অন্ধাদিকর্ত্তৃক রূপাদি গৃহীত হয় না।

(উত্তর) ব্যাঘাতবশতঃ অহেতু, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধবশতঃ পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, অব্যতিরেকবশতঃ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা বলিয়া ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বারা ধূমের উপলব্ধির ন্যায় রূপাদির উপলব্ধি হয়, ইহা বলা হইতেছে। এইরূপ হইলে বিষয়ের নিয়মবশতঃ বিষয়ের গ্রাহক নানাপ্রকারই হয়। কারণ, তাহার ভাবে অর্থাৎ সেই বিষয়গ্রাহক থাকিলে বিষয়জ্ঞান হয় এবং তাহার বিনাশে বিষয়জ্ঞান হয় না। সেইরূপ হইলে, অর্থাৎ বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব স্বীকার করিলে, পূর্ব্ববাক্য উত্তরবাক্য কর্ত্তৃক ব্যাহত হয়। অর্থাৎ প্রথমে বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের একত্ব বলিয়া পরে আবার বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব বলিলে, পূর্ব্বাপর বাক্য বিরুদ্ধ হয়।

পরন্তু, অব্যতিরেক সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ যে অব্যতিরেককে হেতু করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়কেই একমাত্র ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, তাহাও সন্দিগ্ধ বলিয়া হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, পৃথিব্যাদি ভূত কর্ত্তৃকও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগুলি ব্যাপ্ত, সেই পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ না থাকিলেও, বিষয়জ্ঞান হয় না। অতএব ত্বক্ অথবা অন্য সর্ব্ববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নহে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষি কথিত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে স্বতন্ত্রভাবে ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, স্পর্শোপলব্ধি ত্বগিন্দ্রিয়ের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ। অর্থাৎ স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত্বক্ যে ইন্দ্রিয়, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তু যদি ঐ ত্বক্ই গন্ধাদি সর্ব্ববিষয়ের গ্রাহক একমাত্র ইন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে যাহাদিগের ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অর্থাৎ যাহাদিগের ত্বগিন্দ্রিয় আছে, ইহা স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা অবশ্য স্বীকার্য্য, এইরূপ অন্ধ, বধির এবং ঘ্রাণশূন্য ও রসনাশূন্য ব্যক্তিরাও যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ ও রস প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কারণ, ঐ রূপাদি বিষয়ের গ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয় তাহাদিগেরও আছে। পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মতে ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন রূপাদি-বিষয়-গ্রাহক আর কোন ইন্দ্রিয় না থাকায়, অন্ধ প্রভৃতির রূপাদি প্রত্যক্ষের কারণের অভাব নাই। এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতেন যে, ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইলেও, তাহার অবয়ব-বিশেষ বা অংশ-বিশেষই রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক হয়। যেমন চক্ষুতে যে ত্বক্-বিশেষ আছে, তাহার সহিত ধূমের সংযোগ হইলেই, তখন ধূমস্পর্শ প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কোন অবয়বস্থ ত্বকের সহিত ধূমের সংযোগ হইলে, ধূমস্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয়ের অংশবিশেষ যে, বিষয়-বিশেষের গ্রাহক হয়, সর্ব্বাংশই সর্ব্ববিষয়ের গ্রাহক হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। তদ্রূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন অংশ রূপের গ্রাহক, কোন অংশ রসের গ্রাহক, এইরূপে উহার অবয়ব-বিশেষকে রূপাদি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক বলা যায়। অন্ধ প্রভৃতির ত্বগিন্দ্রিয় থাকিলেও, তাহার রূপাদি গ্রাহক অবয়ব-বিশেষ না থাকায়, অথবা তাহার উপঘাত বা বিনাশ হওয়ায়, তাহারা রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন

যে, ত্বকের অবয়ব-বিশেষকে রূপাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক বলিলে, বস্তুতঃ রূপাদি-বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে নানাই বলা হয়। কারণ, রূপাদি বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম সর্ব্বসম্মত। যাহা রূপের গ্রাহক, তাহা রসের গ্রাহক নহে; তাহা কেবল রূপেরই গ্রাহক, ইত্যাদি প্রকার বিষয়-ব্যবস্থা থাকাতেই, সেই রূপের গ্রাহক থাকিলেই রূপের জ্ঞান হয়, তাহার উপঘাত হইলে, রূপের জ্ঞান হয় না। এখন যদি এইরূপ বিষয়-ব্যবস্থাবশতঃ ত্বগিন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বকে রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক বলা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ের একত্ব সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। বার্ত্তিককার ইহা স্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের যে সকল অবয়ব-বিশেষকে রূপাদির গ্রাহক বলা হইতেছে, তাহারা কি ইন্দ্রিয়াত্মক, অথবা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ? উহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে, রূপাদি বিষয়গুলি যে ইন্দ্রিয়ার্থ, বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই সিদ্ধান্ত থাকে না। উহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে, উহাদিগকে ইন্দ্রিয়ার্থও বলা যায় না। ত্বগিন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্ত অবয়ববিশেষগুলিকে ইন্দ্রিয়াত্মক বলিলে, উহাদিগের নানাত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হয়। অবয়বী দ্রব্য হইতে তাহার অবয়বগুলি ভিন্ন পদার্থ, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব-বিশেষকে রূপাদি-বিষয়ের গ্রাহক বলিলে, উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ত্বক্ই সর্ব্ববিষয়গ্রাহক একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত শেষোক্ত বাক্যের বিরোধ হয়। সুতরাং শেষোক্ত হেতু যাহা ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব-বিশেষের ইন্দ্রিয়ত্বসাধক, তাহা ইন্দ্রিয়ের একত্ব সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হওয়ায়, উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস, সুতরাং অহেতু। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা অবয়বী হইতে অবয়বের একান্ত ভেদ স্বীকার করেন না, সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয়ের অবয়ব-বিশেষকে ইন্দ্রিয় বলিলে, তাহাদিগের মতে তাহাও বস্তুতঃ ত্বগিন্দ্রিয়ই হয়। এইজন্য শেষে ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের হেতুতে দোষান্তর প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানে ত্বকের সত্তারূপ যে অব্যতিরেককে হেতু বলা হইয়াছে, তাহাও সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ ঐরূপ "অব্যতিরেক"বশতঃ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইবে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না, ঐ হেতু ঐ সাধ্যের ব্যাপ্য কি না, এইরূপ সন্দেহবশতঃ ঐ হেতু সন্দিগ্ধ ব্যভিচারী। কারণ, যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানে ত্বকের সত্তা আছে, তদ্রূপ পৃথিব্যাদি ভূতেরও সত্তা আছে। পৃথিব্যাদি ভূত কর্ত্তৃকও সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানগুলি ব্যাপ্ত। পঞ্চ-ভৌতিক দেহের সর্ব্বত্রই পঞ্চ-ভূত আছে এবং তাহা না থাকিলেও কোন বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং ত্বকের ন্যায় পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতেরও সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানে সত্তারূপ "অব্যতিরেক"থাকায়, তাহাদিগকেও ইন্দ্রিয় বলা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ "অব্যতিরেক" বশতঃ ত্বক্ অথবা অন্য কোন একমাত্র সর্ব্ববিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয় সিদ্ধ হয় না। ৫৩ ॥

সূত্র। ন যুগপদর্থানুপলব্ধেঃ ॥ ৫৪॥২৫২॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, যেহেতু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে অর্থসমূহের (রূপাদি বিষয়সমূহের) প্রত্যক্ষ হয় না।

ভাষ্য। আত্মা মনসা সম্বধ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বার্থৈঃ সন্নিকৃষ্টমিতি আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষেভ্যো যুগপদ্‌গ্রহণানি স্যুঃ, ন চ যুগপদ্রূপাদয়ো গৃহ্যন্তে, তস্মান্নৈকমিন্দ্রিয়ং সর্ব্ববিষয়মস্তীতি। অসাহচর্য্যাচ্চ বিষয়গ্রহণানাং নৈকমিন্দ্রিয়ং সর্ব্ববিষয়কং, সাহচর্য্যে হি বিষয়গ্রহণানামন্ধাদ্যনুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। আত্মা মনের সহিত সম্বন্ধ হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, ইন্দ্রিয় সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট, এইজন্য আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের (রূপাদির) সন্নিকর্ষবশতঃ একই সময়ে সমস্ত জ্ঞান হউক, কিন্তু একই সময়ে রূপাদি গৃহীত হয় না, অতএব সর্ববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই। এবং বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য্যের অভাবপ্রযুক্ত সর্ববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই। যেহেতু বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য্য থাকিলে অন্ধাদির উপপত্তি হয় না।

। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, এই সূত্র হইতে কয়েকটি সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, একই সময়ে কাহারও রূপাদি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইলে, ঐ ইন্দ্রিয় যখন রূপাদি সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণ থাকায়, আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও রূপাদি অর্থের সন্নিকর্ষবশতঃ একই সময়ে রূপাদি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু একই সময়ে যখন কাহারই রূপাদি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না, তখন সর্ব্ববিষয়ক অর্থাৎ রূপাদি সমস্ত অর্থই যাহার বিষয় বা গ্রাহ্য, এমন কোন একমাত্র ইন্দ্রিয় নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, শেষে এখানে মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, রূপাদি বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য্য নাই। যাহার একটি বিষয়-জ্ঞান হয়, তখন তাহার দ্বিতীয় বিষয়-জ্ঞানও হইলে, ইহাকে বার্ত্তিককার এখানে বিষয়-জ্ঞানের সাহচর্য্য বলিয়াছেন। ঐরূপ সাহচর্য্য থাকিলে অন্ধ-বধিরাদি থাকিতে পারে না। কারণ, অন্ধের ত্বগিন্দ্রিয় জন্য স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইলে, যদি আবার তখন রূপের প্রত্যক্ষও (সাহচর্য্য) হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে অন্ধ বলা যায় না। সুতরাং অন্ধ-বধিরাদির উপপত্তির জন্য বিষয়-প্রত্যক্ষসমূহের সাহচর্য্য নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে, রূপাদি সর্ব্ববিষয়গ্রাহক কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয় নাই, ইহাও স্বীকার্য্য। বার্ত্তিককার এখানে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধান্তেও ঘটাদি দ্রব্যের একই সময়ে চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের আপত্তি সমর্থন করিয়া শেষে মহর্ষি-সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অন্যরূপে নিরাস করিয়াছেন। সে সকল কথা পরবর্ত্তি-সূত্র-ভাষ্যে পাওয়া যাইবে। ৫৪।

সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা ॥৫৫॥২৫৩॥

অনুবাদ। এবং বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ একমাত্র ত্বক্ ইন্দ্রিয় নহে।

ভাষ্য। ন খলু ত্বগেকমিন্দ্রিয়ং ব্যাঘাতাৎ। ত্বচা রূপাণ্যপ্রাপ্তানি গৃহ্যন্ত ইত্যপ্রাপ্যকারিত্বে স্পর্শাদিষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ। স্পর্শাদীনাঞ্চ প্রাপ্তানাং গ্রহণাদ্রূপাদীনামপ্রাপ্তানামগ্রহণমিতি প্রাপ্তং। প্রাপ্যাপ্রাপ্যকারিত্বমিতি চেৎ ?[১] আবরণানুপপত্তের্বিষয়মাত্রস্য গ্রহণং। অথাপি মন্যেত প্রাপ্তাঃ স্পর্শাদয়স্ত্বচা গৃহ্যন্তে, রূপাণি ত্বপ্রাপ্তানীতি, এবং সতি নাস্ত্যাবরণং আবরণানুপপত্তেশ্চ রূপমাত্রস্য গ্রহণং ব্যবহিতস্য চাব্যবহিতস্য চেতি। দূরান্তিকানুবিধানঞ্চ রূপোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোর্ন স্যাৎ। অপ্রাপ্তং ত্বচা গৃহ্যতে রূপমিতি দূরে রূপস্যাগ্রহণমন্তিকে চ গ্রহণমিত্যেতন্ন স্যাদিতি।

অনুবাদ। ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে। কারণ, ব্যাঘাত হয়। (ব্যাঘাত কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন)। অপ্রাপ্ত রূপসমূহ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য অপ্রাপ্যকারিত্বপ্রযুক্ত স্পর্শাদি বিষয়েও এইরূপ আপত্তি হয়। [অর্থাৎ যদি রূপাদি বিষয়ের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও, তদ্দ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে স্পর্শাদির সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও, তদ্দ্বারা স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে,] কিন্তু (ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) প্রাপ্ত স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অপ্রাপ্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্পর্শাদি দৃষ্টান্তে রূপাদি বিষয়ের ও ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি বা সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা সিদ্ধ হয়।

(পূর্ব্বপক্ষ) প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব (এই উভয়ই আছে) ইহা যদি বল ? (উত্তর) আবরণের অসম্ভাবশতঃ বিষয় মাত্রের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বিশদার্থ এই যে, যদি স্বীকার কর, প্রাপ্ত স্পর্শাদি ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু রূপসমূহ অপ্রাপ্ত হইয়াই (ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) প্রত্যক্ষ হয়। (উত্তর) এইরূপ হইলে, আবরণ

১। কোন পুস্তকে "সান্নিকারিত্বমিতি চেৎ ?" এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। উদ্দ্যোতকরও পূর্ব্বসূত্রবার্ত্তিকে "অথ সান্নিকারীন্দ্রিয়ং" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষের বর্ণন করিয়াছেন। উহার ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন, "সান্নার্দ্ধং"। একমপীন্দ্রিয়মর্দ্ধং প্রাপ্য গৃহ্নাতি, অপ্রাপ্তকার্দ্ধমেকদেশ ইতি যাবৎ। "সান্ন" শব্দের দ্বারা অর্দ্ধ বা একাংশ বুঝা যায়। একই ত্বগিন্দ্রিয়ের এক অর্দ্ধ প্রাপ্যকারী, অপর অর্দ্ধ অপ্রাপ্যকারী হইলে, তাহাকে "সান্নিকারী" বলা যায়। "সান্নিকারিত্বমিতি চেৎ ?" এইরূপ ভাষ্যপাঠ হইলে, তদ্দ্বারা ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

নাই, আবরণের অসত্ত্বাবশতঃ ব্যবহিত ও অব্যবহিত রূপমাত্রের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পরন্তু, রূপের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দূরান্তিকানুবিধান থাকে না। বিশদার্থ এই যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাপ্ত রূপ গৃহীত হয়, এজন্য "দূরে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, নিকটেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়" ইহা অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম থাকে না।

টিপ্পনী। ত্বকই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন, "বিপ্রতিষেধ"। "বিপ্রতিষেধ" বলিতে এখানে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকারের অভিমত ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ত্বগিন্দ্রিয়ই রূপাদি সকল বিষয়ের গ্রাহক হইলে, অপ্রাপ্ত অর্থাৎ ঐ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট রূপই ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, দূরস্থ রূপের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভবই নহে। সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে স্পর্শ প্রভৃতিও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট হইয়াও, প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অসন্নিকৃষ্ট স্পর্শাদিরও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। সুতরাং সর্ব্বত্রই ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষজনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু, সন্নিকৃষ্ট স্পর্শাদিরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তদ্দৃষ্টান্তে সন্নিকৃষ্ট রূপাদিরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা সিদ্ধ হয়। মূলকথা, স্পর্শাদি প্রত্যক্ষে ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব এবং রূপাদির প্রত্যক্ষে উহার অপ্রাপ্যকারিত্ব বিরুদ্ধ, বিরোধবশতঃ উহা স্বীকার করা যায় না, সুতরাং ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের কোন অংশ প্রাপ্যকারী এবং কোন অংশ অপ্রাপ্যকারী। প্রাপ্যকারী অংশের দ্বারা সন্নিকৃষ্ট স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ জন্মে। অন্য অংশের দ্বারা অসন্নিকৃষ্ট রূপাদির প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং একই ত্বগিন্দ্রিয়ে প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে পারে, উহা বিরুদ্ধ নহে। ভাষ্যকার এই কথারও উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে আবরণ না থাকায়, ব্যবহিত ও অব্যবহিত সর্ব্ববিধ উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। কারণ, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ব্যাঘাতক দ্রব্যবিশেষকেই ইন্দ্রিয়ের আবরণ বলে। কিন্তু রূপের প্রত্যক্ষে ঐ রূপের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ যখন অনাবশ্যক, তখন সেখানে আবরণপদার্থ থাকিতেই পারে না। সুতরাং ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত রূপের প্রত্যক্ষ কেন জন্মিবে না, উহা অনিবার্য্য। পরন্তু ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত রূপের সন্নিকর্ষ ব্যতীতও তদ্দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, অব্যবহিত অতি দূরস্থ রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু অতিদূরস্থ অব্যবহিত রূপেরও প্রত্যক্ষ জন্মে না, নিকটস্থ অব্যবহিত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা সর্ব্বসম্মত। ইহাকেই বলে রূপের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দূরান্তিকানুবিধান। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, তিনি রূপের প্রত্যক্ষে ত্বগিন্দ্রিয়কে অপ্রাপ্যকারী বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রূপের সহিত

ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীতও রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং অতিদূরস্থ অব্যবহিত রূপেরও প্রত্যক্ষের আপত্তি অনিবার্য্য ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্য। একত্বপ্রতিষেধাচ্চ নানাত্বসিদ্ধৌ স্থাপনা হেতুরপ্যুপাদীয়তে।

অনুবাদ। একত্বপ্রতিষেধ বশতঃই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের একত্বখণ্ডনপ্রযুক্তই নানাত্ব সিদ্ধি হইলে, স্থাপনার হেতুও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপক হেতুও গ্রহণ করিতেছেন।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥২৫৪ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন পাঁচপ্রকার বলিয়া, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার।

ভাষ্য। অর্থঃ প্রয়োজনং, তৎ পঞ্চবিধমিন্দ্রিয়াণাং। স্পর্শনে-নেন্দ্রিয়েণ স্পর্শগ্রহণে সতি ন তেনৈব রূপং গৃহ্যত ইতি রূপগ্রহণপ্রয়োজনং চক্ষুরনুমীয়তে। স্পর্শরূপগ্রহণে চ তাভ্যামেব ন গন্ধো গৃহ্যত ইতি গন্ধগ্রহণপ্রয়োজনং ঘ্রাণমনুমীয়তে। ত্রয়াণাং গ্রহণে ন তৈরেব রসো গৃহ্যত ইতি রসগ্রহণপ্রয়োজনং রসনমনুমীয়তে। চতুর্ণাং গ্রহণে ন তৈরেব শব্দঃ শ্রূয়ত ইতি শব্দগ্রহণপ্রয়োজনং শ্রোত্রমনুমীয়তে। এবমিন্দ্রিয়প্রয়োজনস্যানিতরেতরসাধনসাধ্যত্বাৎ পঞ্চৈবেন্দ্রিয়াণি।

অনুবাদ। অর্থ বলিতে প্রয়োজন; ইন্দ্রিয়বর্গের সেই প্রয়োজন পাঁচ প্রকার। স্পর্শ প্রত্যক্ষের সাধন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলে, তাহার দ্বারাই রূপ গৃহীত হয় না, এজন্য রূপগ্রহণার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় অনুমিত হয়। এবং স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই দুইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অর্থাৎ ত্বক্ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গন্ধ গৃহীত হয় না, এজন্য গন্ধ-গ্রহণার্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনুমিত হয়। তিনটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই তিনটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই (ত্বক্, চক্ষু ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই) রস গৃহীত হয় না, এজন্য রস-গ্রহণার্থ রসনেন্দ্রিয় অনুমিত হয়। চারিটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই চারিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই (ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই) শব্দ শ্রুত হয় না, এজন্য শব্দগ্রহণার্থ শ্রবণেন্দ্রিয় অনুমিত হয়। এইরূপ হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষের ইতরেতর সাধনসাধ্যত্ব না থাকায়, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকারই।

টিপ্পনী। ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, এই মতের খণ্ডন করিয়া মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের একত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ একত্বাভাব সিদ্ধ করায়, তদ্দ্বারা অর্থতঃ ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি এখন এই সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপনার হেতুও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়া, মহর্ষিসূত্রের অবতারণা করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় সূত্রস্থ "অর্থ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, প্রয়োজন। "ইন্দ্রিয়ার্থ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন বা ফল পাঁচ প্রকার, সুতরাং ইন্দ্রিয়ও পাঁচ প্রকার। ইহাই ভাষ্যকারের মতে সূত্রার্থ। বার্ত্তিককার সূত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় নানাকরণবিশিষ্ট কর্ত্তাই স্বীকার্য্য। কর্ত্তা যে করণের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ করেন, তদ্দ্বারাই রসাদির প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। কারণ, কোন একমাত্র করণের দ্বারা কোন কর্ত্তা নানা বিষয়ে ক্রিয়া করিতে পারেন না। যাঁহার অনেক বিষয়ে ক্রিয়া করিতে হয়, তিনি এক বিষয় সিদ্ধি হইলে, বিষয়ান্তরসিদ্ধির জন্য করণান্তর অপেক্ষা করেন, ইহা দেখা যায়। অনেক শিল্পকার্য্যদক্ষ ব্যক্তি এক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, অন্য ক্রিয়া করিতে করণান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ হইলে, রূপ-রসাদি পঞ্চবিধ বিষয়ের প্রত্যক্ষক্রিয়ার করণ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা স্বীকার্য্য। বার্ত্তিককারের মতে সূত্রস্থ "অর্থ" শব্দের অর্থ, বিষয়—ইহা বুঝা যাইতে পারে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যব্যাখ্যাকারগণও এই সূত্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ" বলিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ই বুঝিয়াছেন। মহর্ষির পরবর্ত্তি-পূর্ব্বপক্ষসূত্র ও তাহার উত্তর-সূত্রের দ্বারাও এখানে ঐরূপ অর্থই সরলভাবে বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের দ্বারাই তাহার করণরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়। ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও, তদ্দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং রূপের প্রত্যক্ষ যাহার প্রয়োজন, অর্থাৎ ফল—এমন কোন ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। সেই ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুঃ। এইরূপ স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বারা রসের প্রত্যক্ষ হয় না। স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং স্পর্শাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ, যাহা ইন্দ্রিয়বর্গের প্রয়োজন বা ফল, তাহা ইতরেতর সাধনসাধ্য না হওয়ায়, অর্থাৎ ঐ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের কোনটিই তাহার অপরটির করণের দ্বারা উৎপন্ন না হওয়ায়, উহাদিগের করণরূপে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ই সিদ্ধ হয়। মূলকথা, রূপাদি প্রত্যক্ষরূপ যে প্রয়োজন-সম্পাদনের জন্য ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে—যে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সাধক, সেই প্রয়োজন পঞ্চবিধ বলিয়া, ইন্দ্রিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েই এখানে সূত্রোক্ত "ইন্দ্রিয়ার্থ" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ॥ ৫৬ ॥

সূত্র। ন তদর্থবহুত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পঞ্চবিধ, ইহা বলা যায় না, যেহেতু সেই অর্থের (ইন্দ্রিয়ার্থের) বহুত্ব আছে।

ভাষ্য। ন খল্বিন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণীতি সিধ্যতি। কস্মাৎ? তেষামর্থানাং বহুত্বাৎ। বহবঃ খল্বিমে ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, স্পর্শাস্তাবৎ শীতোষ্ণানুষ্ণাশীতা ইতি। রূপাণি শুক্লহরিতাদীনি। গন্ধা ইষ্টানিষ্টোপেক্ষণীয়াঃ। রসাঃ কটুকাদয়ঃ। শব্দা বর্ণাত্মানো ধ্বনিমাত্রাশ্চ ভিন্নাঃ। তদ্যস্যেন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি, তস্যেন্দ্রিয়ার্থবহুত্বাদ্বহূনীন্দ্রিয়াণি প্রসজ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা সিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু সেই অর্থের (গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের) বহুত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ বহুই; স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত। রূপ—শুক্ল, হরিত প্রভৃতি। গন্ধ—ইষ্ট, অনিষ্ট ও উপেক্ষণীয়। রস—কটু প্রভৃতি। শব্দ—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক বিভিন্ন। সুতরাং যাঁহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় বহু প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বহুত্বের আপত্তি হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, পূর্ব্বসূত্রে যদি গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই পঞ্চত্বহেতু অভিমত হয়, তাহা হইলে, ঐ ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্ববশতঃ তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বহুত্বও সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ব ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বসাধক হইতে পারে, তাঁহার মতে ঐ ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্বও ইন্দ্রিয়ের বহুত্বসাধক হইতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি গ্রহণ করিলে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের সমসংখ্যক ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া বুঝাইতে স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ ভিন্ন আরও এক প্রকার গন্ধ স্বীকার করিয়া তাহাকে বলিয়াছেন, উপেক্ষণীয় গন্ধ। মূলকথা, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ কেবল পঞ্চবিধ নহে উহারা প্রত্যেকেই বহুবিধ। ধ্বনি ও বর্ণভেদে শব্দ দ্বিবিধ হইলেও, তীব্র-মন্দাদিভেদে আবার ঐ শব্দও বহুবিধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ব গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধন করা যায় না। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ার্থের পূর্ব্বোক্ত বহুত্ব গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব সাধনও করা যাইতে পারে। ৫৭।

সূত্র। গন্ধত্বাদ্যব্যতিরেকাদ্‌গন্ধাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥ ॥৫৮॥২৫৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) গন্ধাদিতে গন্ধত্বাদির অব্যতিরেক (সত্তা) বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। গন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থানাং গন্ধাদীনাং যানি গন্ধাদিগ্রহণানি তান্যসমানসাধনসাধ্যত্বাদ্‌গ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোজয়ন্তি। অর্থসমূহোঽনুমানমুক্তো নার্থৈকদেশঃ। অর্থৈকদেশঞ্চাশ্রিত্য বিষয়-পঞ্চত্বমাত্রং ভবান্ প্রতিষেধতি, তস্মাদযুক্তোঽয়ং প্রতিষেধ ইতি। কথং পুনর্গন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা গন্ধাদয় ইতি। স্পর্শঃ খল্বয়ং ত্রিবিধঃ, শীত উষ্ণোঽনুষ্ণাশীতশ্চ স্পর্শত্বেন স্বসামান্যেন সংগৃহীতঃ। গৃহ্যমাণে চ শীতস্পর্শে নোষ্ণস্যানুষ্ণাশীতস্য বা স্পর্শস্য গ্রহণং গ্রাহকান্তরং প্রযোজয়তি, স্পর্শভেদানামেকসাধনসাধ্যত্বাৎ যেনৈব শীতস্পর্শো গৃহ্যতে, তেনৈবেতরাবপীতি। এবং গন্ধত্বেন গন্ধানাং, রূপত্বেন রূপাণাং, রসত্বেন রসানাং, শব্দত্বেন শব্দানামিতি। গন্ধাদিগ্রহণানি পুনরসমান-সাধনসাধ্যত্বাৎ গ্রাহকান্তরাণাং প্রযোজকানি। তস্মাদুপপন্নমিন্দ্রিয়ার্থ-পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণীতি।

অনুবাদ। গন্ধাদি-বিষয়ক যে সমস্ত জ্ঞান, সেই সমস্ত জ্ঞান অসাধারণ সাধন-জন্যত্ববশতঃ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ গন্ধাদি-বিষয়ের নানা গ্রাহকান্তরকে অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদির গ্রাহক অসংখ্য ইন্দ্রিয়কে সাধন করে না। (কারণ) অর্থসমূহই অনুমান (ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক)-রূপে কথিত হইয়াছে, অর্থের একদেশ অনুমানরূপে কথিত হয় নাই। [অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি অর্থের একদেশ বা কোন এক প্রকার গন্ধাদি বিশেষকে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক বলা হয় নাই, গন্ধত্বাদি পাঁচটি সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা পঞ্চ প্রকারে সংগৃহীত গন্ধাদি সমূহকেই ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক বলা হইয়াছে], কিন্তু আপনি (পূর্ব্বপক্ষবাদী) অর্থের একদেশকে অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদি-বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের পঞ্চত্বমাত্রকে প্রতিষেধ করিতেছেন, অতএব এই প্রতিষেধ অযুক্ত।

(প্রশ্ন) গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি কৃতব্যবস্থ কিরূপে? (উত্তর) যেহেতু শীত, উষ্ণ, এবং অনুষ্ণাশীত, এই ত্রিবিধ স্পর্শ স্পর্শত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। শীতস্পর্শ জ্ঞায়মান হইলে, অর্থাৎ শীতস্পর্শের গ্রাহকরূপে ত্বগিন্দ্রিয় স্বীকৃত হইলে, উষ্ণ অথবা অনুষ্ণাশীত-স্পর্শের প্রত্যক্ষ অন্য গ্রাহককে (ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে) সাধন করে না। (কারণ) স্পর্শভেদ (পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ স্পর্শ)-সমূহের "একসাধনসাধ্যত্ব" বশতঃ

অর্থাৎ একই করণের দ্বারা জ্ঞেয়ত্ববশতঃ যাহার দ্বারাই শীতস্পর্শ গৃহীত হয়, তাহার দ্বারাই ইতর দুইটি (উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত) স্পর্শও গৃহীত হয়। এইরূপ গন্ধত্বের দ্বারা গন্ধসমূহের, রূপত্বের দ্বারা রূপসমূহের, রসত্বের দ্বারা রসসমূহের, শব্দত্বের দ্বারা শব্দসমূহের (ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে)। গন্ধাদি জ্ঞানসমূহ কিন্তু একসাধনসাধ্য না হওয়ায়, অর্থাৎ গন্ধজ্ঞানাদি সমস্ত প্রত্যক্ষ কোন একটিমাত্র করণজন্য হইতে না পারায়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহককে সাধন করে। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থের (পূর্ব্বোক্ত গন্ধাদি বিষয়ের) পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বসূত্রোক্ত কথার উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি প্রত্যেকে বহুবিধ ও বহু হইলেও, তাহাতে গন্ধত্বাদি পাঁচটি সামান্য ধর্ম্ম থাকায়, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না। কারণ, সর্ব্বপ্রকার গন্ধেই গন্ধত্বরূপ একটি সামান্য ধর্ম্ম থাকায়, তদ্দ্বারা গন্ধমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে এবং ঐ সর্ব্বপ্রকার গন্ধই একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায়, উহার প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় স্বীকার অনাবশ্যক। এইরূপ রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই চারিটি ইন্দ্রিয়ার্থও প্রত্যেকে বহুবিধ ও বহু হইলে, যথাক্রমে রসত্ব, রূপত্ব, স্পর্শত্ব ও শব্দত্ব—এই চারিটি সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্ববিধ রসই রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং সর্ব্ববিধ রূপই চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং সর্ব্ববিধ স্পর্শই ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং সর্ব্ববিধ শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায়, উহাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় স্বীকার অনাবশ্যক। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থবর্গ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত পাঁচটি সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা কৃত-ব্যবস্থ, অর্থাৎ উহারা ঐ গন্ধত্বাদিরূপে নিয়মপূর্ব্বক পঞ্চ প্রকারেই সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গন্ধাদির পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উহাদিগের গ্রাহকের অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের করণবিশেষের প্রযোজক বা সাধক হয়। কিন্তু ঐ গন্ধাদি-প্রত্যক্ষ অসাধারণ করণজন্য হওয়ায়, অর্থাৎ সমস্ত গন্ধ-প্রত্যক্ষ এক ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ করণজন্য হওয়ায়, এবং সমস্ত রস-প্রত্যক্ষ এক রসনেন্দ্রিয়রূপ করণজন্য হওয়ায় এবং সমস্ত রূপ-প্রত্যক্ষ এক চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ করণজন্য হওয়ায়, এবং সমস্ত স্পর্শ-প্রত্যক্ষ এক ত্বগিন্দ্রিয়রূপ করণজন্য হওয়ায়, এবং সমস্ত শব্দ-প্রত্যক্ষ এক শ্রবণেন্দ্রিয়-রূপ করণজন্য হওয়ায়, উহারা এতদ্ভিন্ন আর কোন গ্রাহকের সাধক হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। গন্ধত্বাদিরূপে গন্ধাদি অর্থসমূহই তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের অনুমান অর্থাৎ অনুমিতি প্রযোজকরূপে কথিত হইয়াছে। গন্ধাদি অর্থের একদেশ অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদি অর্থকে ইন্দ্রিয়ের অনুমিতি প্রযোজক বলা হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী কিন্তু প্রত্যেক গন্ধাদি অর্থকে গ্রহণ করিয়াই, তাহার বহুত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ব প্রতিষেধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ গন্ধত্বাদিরূপে পঞ্চবিধ, এবং তাহাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধকরূপে কথিত হইয়াছে। গন্ধাদি পাঁচটি

ইন্দ্রিয়ার্থ গন্ধত্বাদি স্বগত-সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে কেন ? ইহা ভাষ্যকার নিজে প্রশ্ন-পূর্ব্বক বুঝাইয়া শেষে আবার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি জ্ঞানগুলি একসাধনসাধ্য না হওয়ায়, গ্রাহকান্তরের প্রযোজক হয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি সর্ব্ববিধ বিষয়জ্ঞানসমূহ কোন একটি ইন্দ্রিয়জন্য হইতে না পারায়, উহারা ঘ্রাণাদি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাধক হয়। অর্থাৎ ঐ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের করণরূপে পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই স্বীকার্য্য। কিন্তু সমস্ত গন্ধজ্ঞান ও সমস্ত রসজ্ঞান ও সমস্ত রূপজ্ঞান ও সমস্ত স্পর্শজ্ঞান ও সমস্ত শব্দজ্ঞান যথাক্রমে ঘ্রাণাদি এক একটি অসাধারণ ইন্দ্রিয়জন্য হওয়ায়, উহারা ঐ পাচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কোন গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের সাধক হয় না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই প্রথমে "গ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোজয়ন্তি"—এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন। "বার্ত্তিক"গ্রন্থের দ্বারাও প্রথমে ভাষ্যকারের উহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায় ॥৫৮॥

ভাষ্য। যদি সামান্যং সংগ্রাহকং, প্রাপ্তমিন্দ্রিয়াণাং—

সূত্র। বিষয়ত্বাব্যতিরেকাদেকত্বং ॥৫৯॥২৫৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যদি সামান্য ধর্ম্ম সংগ্রাহক হয়, তাহা হইলে, বিষয়ত্বের অব্যতিরেক বশতঃ অর্থাৎ গন্ধাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থেই বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের সত্তা-বশতঃ ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য। বিষয়ত্বেন হি সামান্যেন গন্ধাদয়ঃ সংগৃহীতা ইতি।

অনুবাদ। বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি (সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ) সংগৃহীত হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি আবার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, গন্ধত্বাদি সামান্য ধর্ম্ম যদি গন্ধাদির সংগ্রাহক হয়, অর্থাৎ যদি গন্ধত্বাদি স্বগত পাঁচটি সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা গন্ধাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের দ্বারাও উহারা সংগৃহীত হইতে পারে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থেই বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম আছে। তাহা হইলে, ঐ বিষয়ত্বরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ঐ বিষয়গ্রাহক একটি ইন্দ্রিয়ই বলা যায়। ঐরূপে ইন্দ্রিয়ের একত্বই প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত সূত্রের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ॥৫৯॥

সূত্র। ন বুদ্ধিলক্ষণাধিষ্ঠান-গত্যাকৃতি-জাতি-পঞ্চত্বেভ্যঃ ॥ ৬০॥২৫৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের একত্ব হইতে পারে না। যেহেতু বুদ্ধি-রূপ লক্ষণের অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষরূপ লিঙ্গ বা সাধকের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত, এবং

অধিষ্ঠানের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থানের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত এবং গতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত এবং আকৃতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত এবং জাতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত (ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়)।

ভাষ্য। ন খলু বিষয়ত্বেন সামান্যেন কৃতব্যবস্থা বিষয়া গ্রাহকান্তর-নিরপেক্ষা একসাধনগ্রাহ্যা অনুমীয়ন্তে। অনুমীয়ন্তে চ পঞ্চগন্ধাদয়ো গন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা ইন্দ্রিয়ান্তরগ্রাহ্যাঃ, তস্মাদসম্বদ্ধ-মেতৎ। অয়মেব চার্থোঽনূদ্যতে বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্বাদিতি।

বুদ্ধয় এব লক্ষণানি, বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্বাদিন্দ্রিয়াণাং। তদেত-দিন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাদিত্যেতস্মিন্ সূত্রে কৃতভাষ্যমিতি। তস্মাৎ বুদ্ধিলক্ষণ-পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।

অধিষ্ঠানান্যপি খলু পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং, সর্ব্বশরীরাধিষ্ঠানং স্পর্শনং স্পর্শগ্রহণলিঙ্গং। কৃষ্ণসারাধিষ্ঠানং চক্ষুর্ব্বহির্নিঃসৃতং রূপগ্রহণলিঙ্গং। নাসাধিষ্ঠানং ঘ্রাণং, জিহ্বাধিষ্ঠানং রসনং, কর্ণচ্ছিদ্রাধিষ্ঠানং শ্রোত্রং, গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দগ্রহণলিঙ্গত্বাদিতি।

গতিভেদাদপীন্দ্রিয়ভেদঃ, কৃষ্ণসারোপনিবদ্ধং চক্ষুর্বহির্নিঃসৃত্য রূপাধিকরণানি দ্রব্যাণি প্রাপ্নোতি। স্পর্শনাদীনি ত্বিন্দ্রিয়াণি বিষয়া এবাশ্রয়োপসর্পণাৎ প্রত্যাসীদন্তি। সন্তানবৃত্ত্যা শব্দস্য শ্রোত্রপ্রত্যাসত্তিরিতি।

আকৃতিঃ খলু পরিমাণমিয়ত্তা, সা পঞ্চধা। স্বস্থানমাত্রাণি ঘ্রাণ-রসন-স্পর্শনানি বিষয়গ্রহণেনানুমেয়ানি। চক্ষুঃ কৃষ্ণসারাশ্রয়ং বহির্নিঃসৃতং বিষয়ব্যাপি। শ্রোত্রং নান্যদাকাশাৎ, তচ্চ বিভু, শব্দমাত্রানুভবানু-মেয়ং, পুরুষসংস্কারোপগ্রহাচ্চাধিষ্ঠাননিয়মেন শব্দস্য ব্যঞ্জকমিতি।

জাতিরিতি যোনিং প্রচক্ষতে। পঞ্চ খল্বিন্দ্রিয়যোনয়ঃ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি। তস্মাৎ প্রকৃতিপঞ্চত্বাদপি পঞ্চেন্দ্রিয়াণীতি সিদ্ধং।

অনুবাদ। বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ সমস্ত বিষয়, গ্রাহকান্তর-নিরপেক্ষ এক সাধনগ্রাহ্য বলিয়া অনুমিত হয় না, কিন্তু গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়, ইন্দ্রিয়ান্তরগ্রাহ্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ব অযুক্ত। (এই সূত্রে) "বুদ্ধি"রূপ লক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত" এই

কথার দ্বারা এই অর্থই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধক "পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ পঞ্চত্ব"-রূপ হেতুই অনূদিত হইয়াছে।

বুদ্ধিসমূহই লক্ষণ। কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব আছে, অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষই ইন্দ্রিয়বর্গের লিঙ্গ বা অনুমাপক হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষরূপ পঞ্চবিধ বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়বর্গের লক্ষণ অর্থাৎ সাধক হয়। সেই ইহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব "ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ"—এই সূত্রে কৃতভাষ্য হইয়াছে। অতএব বিষয়বুদ্ধিরূপ লক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি।

ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থানও পাঁচটিই। (যথা) স্পর্শের প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ (সাধক) সেই (১) ত্বগিন্দ্রিয়, সর্ব্বশরীরাধিষ্ঠান। রূপের প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ এবং যাহা বহির্দ্দেশে নির্গত হয়, সেই (২) চক্ষুঃ কৃষ্ণসারাধিষ্ঠান, অর্থাৎ চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্থান। (৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসাধিষ্ঠান। (৪) রসনেন্দ্রিয় জিহ্বাধিষ্ঠান। (৫) শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণচ্ছিদ্রাধিষ্ঠান। যেহেতু গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ (ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের) লিঙ্গ।

গতির ভেদপ্রযুক্তও ইন্দ্রিয়ের ভেদ (সিদ্ধ হয়)। কৃষ্ণসারসংযুক্ত চক্ষু বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া রূপবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রশ্মির দ্বারা বহিঃস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু (স্পর্শাদি) বিষয়সমূহই আশ্রয়-দ্রব্যের উপসর্পণ অর্থাৎ সমীপগমনপ্রযুক্ত ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রাপ্ত হয়। সন্তানবৃত্তিবশতঃ, অর্থাৎ প্রথম শব্দ হইতে দ্বিতীয় শব্দ, সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ, এইরূপে শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত প্রত্যাসত্তি (সন্নিকর্ষ) হয়।

আকৃতি বলিতে পরিমাণ, ইয়ত্তা, (ইন্দ্রিয়ের) সেই আকৃতি পাঁচ প্রকার। স্বস্থান-পরিমিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়, বিষয়ের (গন্ধ, রস ও স্পর্শের) প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমেয়। কৃষ্ণসারাশ্রিত ও বহির্দ্দেশে নির্গত চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপক। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, শব্দমাত্রের প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমেয় বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সেই আকাশই জীবের অদৃষ্টবিশেষের সহকারিতাবশতঃই অধিষ্ঠানের (কর্ণচ্ছিদ্রের) নিয়মপ্রযুক্ত শব্দের ব্যঞ্জক হয়।

"জাতি" এই শব্দের দ্বারা (পণ্ডিতগণ) যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি বলেন। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই ইন্দ্রিয়বর্গের যোনি। অতএব প্রকৃতির পঞ্চত্বপ্রযুক্তও ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্য মহর্ষি এই সূত্রে পাঁচটি হেতু দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-সিদ্ধান্তের সাধন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততা বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি বিষয়সমূহে বিষয়ত্বরূপ একটি সামান্য ধর্ম্ম থাকিলেও, তদ্দ্বারা কৃতব্যবস্থ অর্থাৎ ঐ বিষয়ত্বরূপে এক বলিয়া সংগৃহীত ঐ বিষয়সমূহ একমাত্র ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপ নানা গ্রাহক অপেক্ষা করে না, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ববাদে প্রমাণাভাব। কিন্তু গন্ধাদি পঞ্চবিধ বিষয় গন্ধত্ব প্রভৃতি পাঁচটি স্বগত-সামান্য ধর্ম্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ, অর্থাৎ পঞ্চত্বরূপেই সংগৃহীত হইয়া ইন্দ্রিয়ান্তরের গ্রাহ্য অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রমাণাভাবে অযুক্ত। এবং পূর্ব্বেই "ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ"—এই সূত্র দ্বারাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্রিয়ের একত্ব নিরস্ত হওয়ায়, পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বপক্ষের কথনও অযুক্ত। পূর্ব্বে "ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ"—এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বসাধনে যে হেতু বলিয়াছেন, এই সূত্রে প্রথমে "বুদ্ধিরূপলক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত" এই কথার দ্বারা ঐ হেতুরই অনুবাদ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বপক্ষ-কথনের অযুক্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু, পূর্ব্বোক্ত ঐ সূত্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধিই মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা প্রকাশ করিতেও মহর্ষি এই সূত্রে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতুর অনুবাদ করিয়া স্পষ্টরূপে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার "ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ" এই সূত্রে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও, ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রে "বুদ্ধি-লক্ষণপঞ্চত্ব"—এই হেতু দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্ব'রূপ হেতুর উক্ত রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বার্ত্তিককারের মতে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পঞ্চত্ব ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বের সাধক না হইলে, এই সূত্রে মহর্ষির প্রথমোক্ত "বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্ব" কিরূপে ইন্দ্রিয়পঞ্চত্বের সাধক হইবে, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের লিঙ্গ, ইহা পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রিয়ার্থ-পঞ্চত্বাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যেই ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। সুতরাং গন্ধাদি-বিষয়ক পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষরূপ যে বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধিরূপ লক্ষণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাধকের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের মতে ইহাই মহর্ষি এই সূত্রে প্রথম হেতুর দ্বারা বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সাধনে মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু "অধিষ্ঠানপঞ্চত্ব"। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান পাঁচটি। স্পর্শের প্রত্যক্ষ ত্বগিন্দ্রিয়ের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। সমস্ত শরীরই ঐ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান। ত্বগিন্দ্রিয় শরীরব্যাপক। চক্ষুরিন্দ্রিয় কৃষ্ণসারে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই বহির্দ্দেশে নির্গত ও বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়া রূপাদির প্রত্যক্ষ জন্মায়। রূপাদির প্রত্যক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। কৃষ্ণসার উহার অধিষ্ঠান। এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান নাসিকা নামক স্থান। রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান জিহ্বা নামক স্থান। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান কর্ণচ্ছিদ্র। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যক্ষ যথাক্রমে ঘ্রাণাদি

ইন্দ্রিয়ের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক, এজন্য ঐ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পূর্ব্বোক্তরূপ অধিষ্ঠানভেদ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠানভেদ স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ শরীরমাত্রই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান হইলে, অন্ধ ও বধির প্রভৃতি হইতে পারে না। অধিষ্ঠানভেদ স্বীকার করিলে কোন একটি অধিষ্ঠানের বিনাশ হইলেও, অন্য অধিষ্ঠানে অন্য ইন্দ্রিয়ের অবস্থান বলা যাইতে পারে। সুতরাং অন্ধ বধির প্রভৃতির অনুপপত্তি নাই। অন্ধ হইলেই অথবা বধিরাদি হইলেই একেবারে ইন্দ্রিয়শূন্য হইবার কারণ নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আধারের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তৎপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়।

মহর্ষির তৃতীয় হেতু "গতি-পঞ্চত্ব"। ইন্দ্রিয়ের বিষয়প্রাপ্তিই এখানে "গতি" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। ঐ গতিও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এক প্রকার নহে। ভাষ্যকার ঐ গতিভেদ-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়, এই কথা বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মহর্ষিসম্মত গতিভেদ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যে প্রাপ্যকারী, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রাপ্যকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জৈন-সম্প্রদায় কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসক প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম ইতঃপূর্ব্বে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করিয়া, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়মাত্রেরই প্রাপ্যকারিত্বের যুক্তি সূচনা করিয়াছেন। বার্ত্তিককার এখানে ভাষ্যকারোক্ত "গতিভেদাৎ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ভিন্নগতিত্বাৎ"। তাঁহার বিবক্ষিত যুক্তি এই যে, ইন্দ্রিয়ের গতিভেদ না থাকিলে, অন্ধ-বধিরাদির অভাব হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি বহির্দ্দেশে নির্গত না হইয়াও রূপের প্রকাশক হইতে পারে, তাহা হইলে অন্ধবিশেষও দূরস্থ রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আবৃতনেত্র ব্যক্তিও রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এইরূপ গন্ধাদি প্রত্যক্ষেরও পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি হয়। কারণ, গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীতও যদি গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে অন্যান্য কারণ সত্ত্বে দূরস্থ গন্ধাদি বিষয়েরও প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-বর্গের পূর্ব্বোক্তরূপ গতিভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ গতিভেদপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয়প্রাপ্তিরূপ গতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্বই সিদ্ধ হয়।

মহর্ষির চতুর্থ হেতু "আকৃতি-পঞ্চত্ব"। "আকৃতি" শব্দের দ্বারা এখানে ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ইয়ত্তাই মহর্ষির বিবক্ষিত। ইন্দ্রিয়ের ঐ আকৃতি পাঁচ প্রকার। কারণ, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বগিন্দ্রিয় স্বস্থানসমপরিমাণ। অর্থাৎ উহাদিগের অধিষ্ঠানপ্রদেশ হইতে উহাদের পরিমাণ অধিক নহে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহার অধিষ্ঠান কৃষ্ণসার (গোলক) হইতে বহির্গত হইয়া রশ্মির দ্বারা বহিঃস্থিত গ্রাহ্য বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং বিষয়ভেদে উহার পরিমাণভেদ স্বীকার্য্য। শ্রবণেন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। কারণ, উহা আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সর্ব্বদেশেই শব্দের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, শব্দের সমবায়ী কারণ আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হইলেও, জীবের সংস্কারবিশেষের অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের সহকারিতাবশতঃই কর্ণচ্ছিদ্রই শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিয়ত অধিষ্ঠান হওয়ায়, ঐ

স্থানেই আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায়, এজন্য ঐ অধিষ্ঠানস্থ আকাশকেই শ্রবণেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা আকাশই। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম মহৎ পরিমাণই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ পরিমাণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। কারণ, একই ইন্দ্রিয় হইলে তাহার ঐরূপ পরিমাণভেদ হইতে পারে না। পরিমাণভেদে দ্রব্যের ভেদ সর্ব্বসিদ্ধ।

মহর্ষির পঞ্চম হেতু "জাতি-পঞ্চত্ব"। "জাতি" শব্দের অন্যরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও, এখানে ভাষ্যকারের মতে যাহা হইতে জন্ম হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ "জাতি" শব্দের দ্বারা "যোনি" অর্থাৎ প্রকৃতি বা উপাদানই মহর্ষির বিবক্ষিত। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতই যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, নানা বিরুদ্ধ প্রকৃতি (উপাদান) হইতে এক ইন্দ্রিয় জন্মিতে পারে না। এখানে গুরুতর প্রশ্ন এই যে, আকাশ নিত্য পদার্থ, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। (দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা বস্তুতঃ আকাশই, ইহা ভাষ্যকারও এই সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিত্যত্ববশতঃ আকাশকে উহার প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান-কারণ বলা যায় না। কিন্তু এই সূত্রে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বলিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ সূত্রেও (১ম আ৽, ১২শ সূত্রে) মহর্ষির "ভূতেভ্যঃ" এই বাক্যের দ্বারা আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিত্যত্ববশতঃ উহা কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্তরূপ অনুপপত্তি নিরাসের জন্য এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোনি" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, "তাদাত্ম্য,"। "তাদাত্ম্য" বলিতে অভেদ। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সহিত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অভেদ আছে, সুতরাং ঐ পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রে "তাদাত্ম্য" শব্দ দেখিয়া এখানে ভাষ্যকারোক্ত "যোনি" শব্দের "তাদাত্ম্য" অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু "যোনি" শব্দের "তাদাত্ম্য" অর্থে কোন প্রমাণ আছে কি না, ইহা দেখা আবশ্যক, এবং ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত "জাতি" শব্দের অর্থ যোনি, ইহা বলিয়া পরে "প্রকৃতিপঞ্চত্বাৎ" এই কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "যোনি" শব্দের প্রকৃতি অর্থই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। আমাদিগের মনে হয় যে, গন্ধাদি যে পঞ্চবিধ গুণের গ্রাহকরূপে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয়, ঐ গন্ধাদি গুণের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানরূপে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সত্তাপ্রযুক্ত ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সত্তা সিদ্ধ হওয়ায়, মহর্ষি এবং ভাষ্যকার ঐরূপ তাৎপর্য্যেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বলিয়াছেন। আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপাদানকারণরূপ প্রকৃতি না হইলেও যে শব্দের প্রত্যক্ষ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাধক, সেই শব্দের উপাদান-কারণরূপে আকাশের সত্তাপ্রযুক্তই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা ও কার্য্যকারিতা, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, প্রত্যক্ষ শব্দবিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, আকাশমাত্রই শ্রবণেন্দ্রিয় নহে। সুতরাং ঐ শব্দের উপাদান-

কারণরূপে আকাশের সত্তা ব্যতীত কর্ণবিবরে শব্দ জন্মিতেই পারে না, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। সুতরাং আকাশের সত্তাপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা সিদ্ধ হওয়ায়, ঐরূপ অর্থে আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়-বিভাগ-সূত্রে মহর্ষির "ভূতেভ্যঃ" এই বাক্যের দ্বারা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভূতজন্যত্ব না বুঝিয়া-পূর্ব্বোক্তরূপে ভূতপ্রযুক্তত্বও বুঝা যাইতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে আকাশজন্যত্ব না থাকিলেও, পূর্ব্বোক্তরূপে আকাশপ্রযোজ্যত্ব অবশ্যই আছে। সুধীগণ বিচার দ্বারা এখানে মহর্ষি ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন।

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি গোতমের মতে মন ইন্দ্রিয় হইলেও, তিনি প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই কেন? তাহা প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। মহর্ষি ঘ্রাণাদি পাঁচটিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করায়, ইন্দ্রিয়নানাত্ব-পরীক্ষা-প্রকরণে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর্য্যটীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করায়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থের ইন্দ্রিয়ত্ব নাই, ইহাও সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমের এই মত সমর্থন করিতে তাৎপর্য্যটীকা-কার বলিয়াছেন যে, বাক্ পাণি প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধন না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়পদবাচ্য হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বাক্, পাণি প্রভৃতিতে নাই। অসাধারণ কার্য্য-বিশেষের সাধন বলিয়া উহা-দিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিলে, কণ্ঠ, হৃদয়, আমাশয়, পক্বাশয় প্রভৃতিকেও অসাধারণ কার্য্য-বিশেষের সাধন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশেষ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা কেহই বলেন নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণ না হইলে, তাহাকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষের কর্তৃরূপে আত্মার অনুমান হয়, এজন্য ঐ ঘ্রাণাদি "ইন্দ্র" অর্থাৎ আত্মার অনুমাপক হওয়ায়, ইন্দ্রিয়পদবাচ্য হইয়াছে। শ্রুতিতে আত্মা অর্থে "ইন্দ্র" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, "ইন্দ্র" বলিতে আত্মা বুঝা যায়। "ইন্দ্রে"র লিঙ্গ বা অনুমাপক, এই অর্থে "ইন্দ্র" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে "ইন্দ্রিয়" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বাক্, পাণি প্রভৃতি জ্ঞানের করণ না হওয়ায়, জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মার অনুমাপক হয় না, এইজন্য মহর্ষি কণাদ ও গোতম উহাদিগকে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মনু প্রভৃতি অন্যান্য মহর্ষিগণ বাক্, পাণি প্রভৃতি পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও সাংখ্যমত সমর্থন করিতে, "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে বাক্, পাণি প্রভৃতিকেও আত্মার লিঙ্গ বলিয়াও ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

মহর্ষি গোতম এই প্রকরণে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, তাঁহার মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় একটি, বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইটি নহে। কারণ, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা উপপন্ন হয় না, মহর্ষির এই প্রকরণের সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হয়, ইহা উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বে মহর্ষির "চক্ষুরদ্বৈত-প্রকরণে"র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইটি। একজাতীয় প্রত্যক্ষের সাধন বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াই

মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের পক্ষে বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা করিতে উদ্দ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার একজাতীয় দুইটি চক্ষুরিন্দ্রিয়কে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াই যে, এখানে মহর্ষি-কথিত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যার উপপাদন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত "চক্ষুরদ্বৈত-প্রকরণে"র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বিত্ব-পক্ষই সুব্যক্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

ভাষ্য। কথং পুনর্জ্ঞায়তে ভূতপ্রকৃতীনীন্দ্রিয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ ভূতপ্রকৃতিক, অব্যক্ত-প্রকৃতিক নহে, ইহা কিরূপে অর্থাৎ কোন্ হেতুর দ্বারা বুঝা যায় ?

সূত্র। ভূতগুণবিশেষোপলব্ধেস্তাদাত্ম্যং ॥৬১॥২৫৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) ভূতের গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায়, অর্থাৎ ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গন্ধাদি গুণবিশেষের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, (ঐ পঞ্চ ভূতের সহিত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের) তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। দৃষ্টো হি বায়্বাদীনাং ভূতানাং গুণবিশেষাভিব্যক্তিনিয়মঃ। বায়ুঃ স্পর্শব্যঞ্জকঃ, আপো রসব্যঞ্জিকাঃ, তেজো রূপব্যঞ্জকং, পার্থিবং কিঞ্চিদ্দ্রব্যং কস্যচিদ্দ্রব্যস্য গন্ধব্যঞ্জকং। অস্তি চায়মিন্দ্রিয়াণাং ভূতগুণ-বিশেষোপলব্ধিনিয়মঃ,—তেন ভূতগুণবিশেষোপলব্ধের্মন্যামহে, ভূতপ্রকৃতী-নীন্দ্রিয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি।

অনুবাদ। যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতের গুণবিশেষের (স্পর্শাদির) উপলব্ধির নিয়ম দেখা যায়। যথা—বায়ু স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হয়, জল রসেরই ব্যঞ্জক হয়, তেজঃ রূপেরই ব্যঞ্জক হয়। পার্থিব কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যবিশেষের গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। ইন্দ্রিয়-বর্গেরও এই (পূর্ব্বোক্ত প্রকার) গুণবিশেষের উপলব্ধির নিয়ম আছে, সুতরাং ভূতের গুণবিশেষের উপলব্ধিপ্রযুক্ত, ইন্দ্রিয়বর্গ ভূতপ্রকৃতিক, অব্যক্তপ্রকৃতিক নহে, ইহা আমরা (নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়) স্বীকার করি।

টিপ্পনী। মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত সাধন করিতে পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতির পঞ্চত্বকে চরম হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত (প্রকৃতি) ইন্দ্রিয়ের মূলপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত অহংকারই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপাদান-কারণ হইলে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়, এজন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা শেষে পঞ্চভূতই যে, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু, ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও, শেষে ঐ বিষয়ে মূল-

যুক্তি প্রকাশ করিতেও এই সূত্রটি বলিয়াছেন। মহর্ষির মূলযুক্তি এই যে, যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত গন্ধাদি গুণবিশেষেরই ব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও যথাক্রমে ঐ গন্ধাদি গুণ-বিশেষের ব্যঞ্জক হয়, সুতরাং ঐ পঞ্চভূতের সহিত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের তাদাত্ম্যই সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী প্রকরণে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, ঘৃতাদি পার্থিব দ্রব্যের ন্যায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, পার্থিব দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রসনেন্দ্রিয়, রূপাদির মধ্যে কেবল রসেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, জলীয় দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদীপাদির ন্যায় গন্ধাদির মধ্যে কেবল রূপেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, তৈজস দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ত্বগিন্দ্রিয় ব্যজন-বায়ুর ন্যায় রূপাদির মধ্যে কেবল স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, বায়বীয় দ্রব্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের বিশেষ গুণ শব্দমাত্রের ব্যঞ্জক হওয়ায়, উহা আকাশাত্মক বলিয়াই সিদ্ধ হয়। "তাৎপর্য্যটীকা", "ন্যায়মঞ্জরী" এবং "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ব্বোক্তরূপ ন্যায়মতের সাধক অনুমান-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব জলীয়ত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে, ভৌতিকত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সাংখ্যসম্মত অহংকার হইতে উৎপন্ন নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হয়॥ ৬১ ॥

ইন্দ্রিয়-নানাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ভাষ্য। গন্ধাদয়ঃ পৃথিব্যাদিগুণা ইত্যুদ্দিষ্টং, উদ্দেশশ্চ পৃথিব্যাদীনা-মেকগুণত্বে চানেকগুণত্বে সমান ইত্যত আহ—

অনুবাদ। গন্ধাদি পৃথিব্যাদির গুণ, ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ উদ্দেশ পৃথিব্যাদির একগুণত্ব ও অনেকগুণত্বে সমান, এজন্য (মহর্ষি দুইটি সূত্র) বলিয়াছেন।

সূত্র। গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬২॥২৬০॥

সূত্র। অপ্‌তেজোবায়ূনাং পূর্ব্বং পূর্ব্বমপোহ্যাকাশ-স্যোত্তরঃ ॥৬৩॥২৬১॥

অনুবাদ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে স্পর্শ পর্য্যন্ত পৃথিবীর গুণ। স্পর্শ পর্য্যন্তের মধ্যে অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া জল, তেজ ও বায়ুর গুণ জানিবে। উত্তর অর্থাৎ স্পর্শের পরবর্ত্তী শব্দ, আকাশের গুণ।

ভাষ্য। স্পর্শপর্য্যন্তানামিতি বিভক্তিবিপরিণামঃ। আকাশস্যোত্তরঃ শব্দঃ স্পর্শপর্য্যন্তেভ্য ইতি। কথং তর্হি তরব্‌নির্দ্দেশঃ? স্বতন্ত্রবিনিয়োগসামর্থ্যাৎ। তেনোত্তরশব্দস্য পরার্থাভিধানং বিজ্ঞায়তে। উদ্দেশসূত্রে হি স্পর্শপর্য্যন্তেভ্যঃ পরঃ শব্দ ইতি। তন্ত্রং বা, স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। স্পর্শপর্য্যন্তেষু নিযুক্তেষু যোঽন্ত্যস্তদুত্তরঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। "স্পর্শপর্য্যন্তানাং" এইরূপে বিভক্তির পরিবর্ত্তন (বুঝিতে হইবে) স্পর্শ পর্য্যন্ত হইতে উত্তর অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের অনন্তর শব্দ,—আকাশের (গুণ)। (প্রশ্ন) তাহা হইলে "তরপ্‌" প্রত্যয়ের নির্দ্দেশ কিরূপে হয়? অর্থাৎ এখানে বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধ হওয়ায়, "উত্তম" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে, সূত্রে "উত্তর" এইরূপ—'তরপ্‌'প্রত্যয়নিষ্পন্ন প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয়? (উত্তর) যেহেতু স্বতন্ত্র প্রয়োগে সামর্থ্য আছে, তন্নিমিত্ত 'উত্তর' শব্দের পরার্থে অভিধান অর্থাৎ অনন্তরার্থের বাচকত্ব বুঝা যায়। উদ্দেশসূত্রেও (১ম অঃ, ১ম আঃ, ১৪শ সূত্রে) স্পর্শ পর্য্যন্ত হইতে পর অর্থাৎ স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের অনন্তর শব্দ (উদ্দিষ্ট হইয়াছে) অথবা স্পর্শের বিবক্ষাবশতঃ "তন্ত্র" অর্থাৎ সূত্রস্থ একই "স্পর্শ" শব্দের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝা যায়। নিযুক্ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত স্পর্শ পর্য্যন্ত গুণের মধ্যে যাহা অন্ত্য অর্থাৎ শেষোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তর শব্দ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার পরে যথাক্রমে "অর্থে"র পরীক্ষা করিতে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অর্থ"-বিষয়ে সংশয় সূচনা করিয়া মহর্ষির দুইটি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি যে গন্ধাদি গুণের ব্যবস্থার জন্য এখানে দুইটি সূত্রই বলিয়াছেন, ইহা উদ্দ্যোতকরও "নিয়মার্থে সূত্রে" এই কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে "অর্থে"র উদ্দেশসূত্রে (১ম আঃ, ১৪শ সূত্রে) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এই পাঁচটি পৃথিব্যাদির গুণ বলিয়া "অর্থ" নামে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ গন্ধাদি গুণের মধ্যে কোন্‌টি কাহার গুণ, তাহা সেখানে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। মহর্ষির ঐ উদ্দেশের দ্বারা যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি পৃথিব্যাদি এক একটির গুণ, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। এবং গন্ধাদি সমস্তই পৃথিব্যাদি সর্ব্বভূতেরই গুণ, অথবা উহার মধ্যে কাহারও গুণ একটি, কাহারও দুইটি, কাহারও তিনটি বা চারিটি, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। তাই মহর্ষি এখানে সংশয়নিবৃত্তির জন্য প্রথম সূত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি গুণের মধ্যে স্পর্শ পর্য্যন্ত (গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ) চারিটিই পৃথিবীর গুণ। স্পষ্টার্থ বলিয়া ভাষ্যকার এখানে প্রথম সূত্রের

কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রথম সূত্রোক্ত "স্পর্শপর্য্যন্তাঃ" এই বাক্যের প্রথমা বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির যোগে "স্পর্শ-পর্য্যন্তানাং" এইরূপ বাক্যের অনুবৃত্তি মহর্ষির এই সূত্রে অভিপ্রেত। নচেৎ এই সূত্রে 'পূর্ব্বং পূর্ব্বং' এই কথার দ্বারা কাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব, তাহা বুঝা যায় না। পূর্ব্বোক্ত "স্পর্শপর্য্যন্তানাং" এইরূপ বাক্যের অনুবৃত্তি বুঝিলে, দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়, স্পর্শপর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া জল, তেজ ও বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ গন্ধাদি চারিটির মধ্যে সকলের পূর্ব্ব গন্ধকে ত্যাগ করিয়া, উহার শেষোক্ত রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ বুঝিতে হইবে। এবং ঐ রসাদির মধ্যে পূর্ব্ব অর্থাৎ রসকে ত্যাগ করিয়া শেষোক্ত রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ বুঝিতে হইবে। এবং ঐ রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্ব্ব রূপকে ত্যাগ করিয়া উহার শেষোক্ত স্পর্শ বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে। ঐ স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের "উত্তর" অর্থাৎ সর্ব্বশেষোক্ত শব্দ আকাশের গুণ বুঝিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "উৎ" শব্দের পরে "তরপ্' প্রত্যয়যোগে "উত্তর" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু দুইটি পদার্থের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধন স্থলেই 'তরপ্' প্রত্যয়ের বিধান আছে। এখানে স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি পদার্থ হইতে শব্দের উৎকর্ষ বোধ হওয়ায়, শব্দকে "উত্তম' বলাই সমুচিত। অর্থাৎ এখানে "উৎ" শব্দের পরে "তমপ্"প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'উত্তম' শব্দের প্রয়োগ করাই মহর্ষির কর্ত্তব্য। তিনি এখানে "উত্তর" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবোধনস্থলে "তরপ্" প্রত্যয়-নিষ্পন্ন "উত্তর" শব্দের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ "উত্তর" শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগও অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়নিরপেক্ষ অব্যুৎপন্ন "উত্তর" শব্দের প্রয়োগও আছে। সুতরাং ঐ রূঢ় "উত্তর" শব্দ যে, অনন্তর অর্থের বাচক, ইহা বুঝা যায়[১]। তাহা হইলে এখানে স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের "উত্তর" অর্থাৎ অনন্তর যে শব্দ, তাহা আকাশের গুণ, এইরূপ অর্থবোধ হওয়ায়, "উত্তর" শব্দের প্রয়োগ এবং তাহার অর্থের কোন অনুপপত্তি নাই। ভাষ্যকার শেষে "উত্তর" শব্দে "তরপ্" প্রত্যয় স্বীকার করিয়াই, উহার উপপাদন করিতে কল্পান্তরে বলিয়াছেন, "তন্ত্রং বা"। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য মনে হয় যে, সূত্রে "স্পর্শ" শব্দ একবার উচ্চরিত হইলেও, উভয়ত্র উহার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সূত্রস্থ "উত্তর" শব্দের সহিতও উহার সম্বন্ধ বুঝিয়া স্পর্শের উত্তর শব্দ, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়কল্পে ভাষ্যকার শেষে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্যবস্থিত যে স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণ, তাহার মধ্যে যাহা অন্ত্য অর্থাৎ শেষোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তর শব্দ। স্পর্শ ও শব্দ—এই উভয়ের মধ্যে শব্দ "উত্তর", এইরূপ বিবক্ষা হইলে, "তরপ্" প্রত্যয়ের অনুপপত্তি নাই, ইহাই ভাষ্যকারের দ্বিতীয় কল্পের মূল তাৎপর্য্য। তাই ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন, "স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ"। অর্থাৎ মহর্ষি স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের

১। অব্যুৎপন্নোঽয়মুত্তরশব্দোঽনন্তরবচনঃ, তেন বহূনাং নির্দ্ধারণেঽপ্যুপপন্নার্থ ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

মধ্যে স্পর্শকেই গ্রহণ করিয়া শব্দকে ঐ স্পর্শেরই "উত্তর" বলিয়াছেন। সূত্রস্থ একই "স্পর্শ" শব্দের শেষোক্ত "উত্তর" শব্দের সহিতও সম্বন্ধ মহর্ষির অভিপ্রেত। একবার উচ্চরিত একই শব্দের উভয়ত্র সম্বন্ধকে "তন্ত্র-সম্বন্ধ" বলে। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদে বাজপেয়াধিকরণে এই "তন্ত্র-সম্বন্ধে"র বিচার আছে। "শাস্ত্রদীপিকা" এবং "ন্যায়প্রকাশ" প্রভৃতি মীমাংসাগ্রন্থেও এই "তন্ত্র-সম্বন্ধে"র কথা পাওয়া যায়। শব্দশাস্ত্রেও দ্বিবিধ "তন্ত্র" এবং তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়[১]। অভিধানে "তন্ত্র" শব্দের 'প্রধান' প্রভৃতি অনেক অর্থ দেখা যায়। "তন্ত্র" শব্দের দ্বারা এখানে প্রধান অর্থ বুঝিয়া সূত্রে "উত্তর" শব্দটি "তরপ্"প্রত্যয়নিষ্পন্ন যৌগিক, সুতরাং প্রধান, ইহাও কেহ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। রূঢ় ও যৌগিকের মধ্যে যৌগিকের প্রাধান্য স্বীকার করিলে, দ্বিতীয় কল্পে সূত্রস্থ "উত্তর" শব্দের প্রাধান্য হইতে পারে। কিন্তু কেবল "তন্ত্রং বা" এইরূপ পাঠের দ্বারা ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না।

এখানে প্রাচীন ভাষ্যপুস্তকেও এবং মুদ্রিত ন্যায়বার্ত্তিকেও "তন্ত্রং বা" এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা করিতে এখানে শেষে লিখিয়াছেন যে, কোন পুস্তকে "তন্ত্রং বা" ইত্যাদি পাঠ আছে, উহা ভাষ্যানুসারে স্পষ্টার্থই। "তন্ত্রং বা" ইত্যাদি পাঠ যে কিরূপে স্পষ্টার্থ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদি ভাষ্য ও বার্ত্তিকে "তন্ত্রং বা" এই স্থলে "তরব্ বা" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে উহা স্পষ্টার্থই বলা যায়, এবং "তরব্ বা" এইরূপ পাঠ হইলে, বার্ত্তিককারের "ভবতু বা তরব্ নির্দ্দেশঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যাও সুসঙ্গত হয়। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে "উত্তর" শব্দে "তরপ্" প্রত্যয় অস্বীকার করিয়া, দ্বিতীয় কল্পে উহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় কল্পে 'তরব্ বা" এইরূপ বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করাই সমীচীন। সুতরাং "তরব্ বা" এইরূপ প্রকৃত পাঠ "তন্ত্রং বা" এইরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে কিনা, এইরূপ সন্দেহ জন্মে। সুধীগণ এখানে দ্বিতীয় কল্পে ভাষ্যকারের বক্তব্য এবং বার্ত্তিককারের "ভবতু বা তরব্ নির্দ্দেশঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা[২] এবং "স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের উত্থাপন এবং তাৎপর্য্যটীকাকারের "স্ফুটার্থ এব" এই কথায় মনোযোগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাঠকল্পনার সমালোচনা করিবেন। এখানে প্রচলিত ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে শেষে "যোঽন্যঃ" এইরূপ পাঠই সমস্ত পুস্তকে পরিদৃষ্ট হইলেও, "যোঽস্যাঃ," এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায়, ঐ পাঠই গৃহীত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

১। "তন্ত্রং দ্বেধা শব্দতন্ত্রমর্থতন্ত্রঞ্চ" ইত্যাদি—নাগেশ ভট্টকৃত "লঘুশব্দেন্দুশেখর" দ্রষ্টব্য।

২। তন্ত্রং বা স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—ভবতু বা তরব্ নির্দ্দেশঃ। নন্‌বুক্তমুত্তম ইতি প্রাপ্নোতি? ন, স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। শব্দাদিভ্যঃ পরঃ স্পর্শঃ, স্পর্শাদয়ং পর ইতি যাবদুক্তং ভবতি তাবদুক্তং ভবত্যুত্তর ইতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

ক্বচিৎ পাঠস্তন্ত্রং বেতি যথা ভাষ্যং স্ফুটার্থ এব।—তাৎপর্য্যটীকা।

সূত্র। ন সর্ব্বগুণানুপলব্ধেঃ ॥৬৪॥২৬২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণ-নিয়ম সাধু নহে। কারণ, (ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) সর্ব্বগুণের প্রত্যক্ষ হয় না।

ভাষ্য। নায়ং গুণনিয়োগঃ সাধুঃ, কস্মাৎ? যস্য ভূতস্য যে গুণা ন তে তদাত্মকেনেন্দ্রিয়েণ সর্ব্ব উপলভ্যন্তে,—পার্থিবেন হি ঘ্রাণেন স্পর্শ-পর্য্যন্তা ন গৃহ্যন্তে, গন্ধ এবৈকো গৃহ্যতে, এবং শেষেষ্বপীতি।

অনুবাদ। এই গুণনিয়োগ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত গুণব্যবস্থা সাধু নহে, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যে ভূতের যেগুলি গুণ, সেই সমস্ত গুণই "তদাত্মক" অর্থাৎ সেই ভূতাত্মক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধাদি চারিটি গুণই প্রত্যক্ষ হয় না; এক গন্ধই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ শেষগুলিতেও অর্থাৎ জলাদি ভূতের গুণ রসাদিতেও বুঝিবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া, এখন ঐ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ গুণব্যবস্থা যথার্থ নহে। কারণ, পৃথিবীতে গন্ধাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত যে চারিটি গুণ বলা হইয়াছে, তাহা পার্থিব ইন্দ্রিয় ঘ্রাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, উহার মধ্যে ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীতে কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়। যদি গন্ধাদি চারিটি গুণই পৃথিবীর নিজের গুণ হইত, তাহা হইলে পার্থিব ইন্দ্রিয় ঘ্রাণের দ্বারা ঐ চারিটি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত। এইরূপ রস, রূপ ও স্পর্শ—এই তিনটি গুণই যদি জলের নিজের গুণ হইত, তাহা হইলে জলীয় ইন্দ্রিয় রসনার দ্বারা ঐ তিনটি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু রসনার দ্বারা কেবল রসেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং রূপের ন্যায় স্পর্শও তেজের নিজের গুণ হইলে, তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষুর দ্বারা স্পর্শেরও প্রত্যক্ষ হইত। ফলকথা, যে ভূতের যে সমস্ত গুণ বলা হইয়াছে, ঐ ভূতাত্মক ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ সমস্ত গুণেরই প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত গুণব্যবস্থা যথার্থ হয় নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

ভাষ্য। কথং তর্হীমে গুণা বিনিয়োক্তব্যাঃ? ইতি—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে এই সমস্ত গুণ (গন্ধাদি) কিরূপে বিনিয়োগ করিতে হইবে?—অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের গুণব্যবস্থা কিরূপ হইবে?

সূত্র। একৈকশ্যেনোত্তরোত্তরগুণসদ্ভাবাদুত্তরোত্তরাণাং তদনুপলব্ধিঃ ॥৬৫॥২৬৩॥*

অনুবাদ। (উত্তর) উত্তরোত্তরের অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের উত্তরোত্তর গুণের (যথাক্রমে গন্ধাদি পঞ্চগুণের) সত্তা বশতঃ সেই সেই গুণ-বিশেষের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। গন্ধাদীনামেকৈকো যথাক্রমং পৃথিব্যাদীনামেকৈকস্য গুণঃ, অতস্তদনুপলব্ধিঃ—তেষাং তয়োস্তস্য চানুপলব্ধিঃ—ঘ্রাণেন রস-রূপ-স্পর্শানাং, রসনেন রূপস্পর্শয়োঃ, চক্ষুষা স্পর্শস্যেতি।

কথং তর্হ্যনেকগুণানি ভূতানি গৃহ্যন্ত ইতি?

সংসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণং[১] অবাদিসংসর্গাচ্চ পৃথিব্যাং রসাদয়ো গৃহ্যন্তে, এবং শেষেষ্বপীতি।

অনুবাদ। গন্ধাদিগুণের মধ্যে এক একটি যথাক্রমে পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্যে এক একটির গুণ;—অতএব "তদনুপলব্ধি" অর্থাৎ সেই গুণত্রয়েরও, সেই গুণদ্বয়ের এবং

---

* কোন পুস্তকে এই সূত্রের প্রথমে "একৈকস্যৈব" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও অনেক পুস্তকের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" "একৈকশ্যেন" এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। উহাই প্রকৃত পাঠ। "একৈকশঃ" এইরূপ অর্থে "একৈকশ্যেন" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সূত্রগ্রন্থেও অনেক স্থানে বেদবৎ প্রয়োগ হইয়াছে। তাই এখানে বার্ত্তিকারও লিখিয়াছেন—"একৈকশ্যেনেতি সৌত্রো নির্দ্দেশঃ"। ঋষিবাক্যে পূর্ব্বোক্ত অর্থে অন্যত্রও ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা "তেন মায়া সহস্রং তৎ শম্বরস্যাশুগামিনা। বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন সূদিতং" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "রামানুজদর্শনে" উদ্ধৃত শ্লোক)। কোন মুদ্রিত শ্রীভাষ্যে উক্ত শ্লোকে—"একৈকাংশেন" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত পাঠই প্রকৃতার্থবোধক, সুতরাং প্রকৃত।

১। অনেক মুদ্রিত পুস্তকে এবং "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থে "সংসর্গাচ্চ" ইত্যাদি বাক্যটি ন্যায়সূত্ররূপেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং "ন্যায়সূত্র-বিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ঐরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই। "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও ঐরূপ সূত্র গ্রহণ করেন নাই। তদনুসারে "সংসর্গাচ্চ" ইত্যাদি বাক্য ভাষ্য বলিয়াই গৃহীত হইল। কোন পুস্তকে কোন টিপ্পনী-কার লিখিয়াছেন যে, "ন পার্থিবাপ্যয়োঃ" ইত্যাদি পরবর্ত্তি-সূত্রের ভাষ্যারম্ভে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "নেতি ত্রিসূত্রীং প্রত্যাচষ্টে"। সুতরাং ভাষ্যকারের ঐ কথা দ্বারাই তাঁহার মতে "সংসর্গাচ্চ" ইত্যাদি বাক্যটি মহর্ষি গোতমের সূত্র নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, ঐ বাক্যটি সূত্র হইলে, পূর্ব্বোক্ত "ন সর্ব্বগুণোপলব্ধেঃ" এই সূত্র হইতে গণনা করিয়া চারিটি সূত্র হয়, "ত্রিসূত্রী" হয় না। কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন নহে। কারণ, ভাষ্যকারের কথা দ্বারাই "সংসর্গাচ্চ" ইত্যাদি বাক্য যে, তাঁহার মতে সূত্র ইহাও বুঝা যায়। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

সেই এক গুণের উপলব্ধি হয় না (বিশদার্থ)—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস, রূপও স্পর্শের, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ ও স্পর্শের, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের উপলব্ধি হয় না।

(প্রশ্ন) তাহা হইলে অনেকগুণবিশিষ্ট ভূতসমূহ গৃহীত হয় কেন? অর্থাৎ পৃথিব্যাদি চারি ভূতে গন্ধ প্রভৃতি অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন? (উত্তর) সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়। বিশদার্থ এই যে, জলাদির সংসর্গবশতঃই পৃথিবীতে রসাদি প্রত্যক্ষ হয়। শেষগুলিতেও অর্থাৎ জল, তেজঃ ও বায়ুতেও এইরূপ জানিবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত পরিস্ফুট করিবার জন্য, ঐ মতে গুণ-ব্যবস্থা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি গুণের মধ্যে এক একটি গুণ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যথাক্রমে এক একটির গুণ। অর্থাৎ গন্ধই কেবল পৃথিবীর গুণ। রসই কেবল জলের গুণ। রূপই কেবল তেজের গুণ। স্পর্শই কেবল বায়ুর গুণ। সুতরাং পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ গুণত্রয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল গন্ধমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ জলে রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ গুণদ্বয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। এবং তেজে স্পর্শ না থাকায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। সূত্রে "তদনুপলব্ধিঃ"—এই বাক্যে "তৎ"শব্দের দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়, গুণদ্বয় এবং স্পর্শরূপ একটি গুণই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ। তাই ভাষ্যকারও "তেষাং, তয়োঃ, তস্য চ অনুপলব্ধিঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রে তে চ, তৌ চ, স চ, এইরূপ অর্থে একশেষবশতঃ "তৎ"শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থ বুঝা যায়।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিব্যাদিতে অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন? অর্থাৎ পৃথিবীতে বস্তুতঃ রসাদি না থাকিলে, তাহাতে রসাদির প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলাদিতে রূপাদি না থাকিলে, তাহাতে রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বস্তুতঃ রসাদি না থাকিলেও, জলাদি ভূতের সংসর্গবশতঃ সেই জলাদিগত রসাদিরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পুষ্পাদি পার্থিব দ্রব্যে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় অংশও সংযুক্ত থাকায়, তাহাতে সেই জলাদিদ্রব্যগত রস, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপ জলাদি দ্রব্যেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জলে রূপ ও স্পর্শ না থাকিলেও, তাহাতে তেজ ও বায়ু সংযুক্ত থাকায়, তাহারই রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং তেজে স্পর্শ না থাকিলেও, তাহাতে বায়ু সংযুক্ত থাকায়, তাহারই স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের নিজ সিদ্ধান্তেও অনেকস্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার মতেও গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে পৃথিব্যাদি ভূতে অনেক গুণের প্রত্যক্ষ অসম্ভব বলা যাইবে না॥ ৬৫॥

ভাষ্য। নিয়মস্তর্হি ন প্রাপ্নোতি সংসর্গস্যানিয়মাচ্চতুর্গুণা পৃথিবী ত্রিগুণা আপো দ্বিগুণং তেজ একগুণো বায়ুরিতি। নিয়মশ্চোপপদ্যতে, কথং?

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে সংসর্গের নিয়ম না থাকায়, পৃথিবী চতুর্গুণ-বিশিষ্ট, জল ত্রিগুণবিশিষ্ট, তেজ গুণদ্বয়বিশিষ্ট, বায়ু একগুণবিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম উপপন্ন হয় না? (উত্তর) নিয়মও উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) কিরূপে?

সূত্র। বিষ্টং হ্যপরং পরেণ ॥৬৬॥২৬৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অপর ভূত (পৃথিব্যাদি) পরভূত (জলাদি) কর্ত্তৃক "বিষ্ট" অর্থাৎ ব্যাপ্ত।

ভাষ্য। পৃথিব্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরেণ বিষ্টমতঃ সংসর্গ-নিয়ম ইতি। তচ্চৈতদ্ভূতসৃষ্টৌ বেদিতব্যং, নৈতর্হীতি।

অনুবাদ। পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত উত্তরোত্তর ভূত কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, অতএব সংসর্গের নিয়ম আছে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতে পর পর ভুতের প্রবেশ বা সংসর্গবিশেষ ভূতসৃষ্টিতে জানিবে, ইদানীং নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত মতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্যে একের সহিত অপরের সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে ঐ সংসর্গের নিয়ম না থাকায়, পৃথিবীতে গন্ধাদি চারিটি গুণের এবং জলে রসাদি গুণত্রয়ের এবং তেজে রূপ এবং স্পর্শের এবং বায়ুতে কেবল স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ নিয়ম উপপন্ন হইতে পারে না। তাই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতে পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মের উপপাদনের জন্য এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব ভূত জলাদি উত্তরোত্তর ভূত কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সুতরাং ভূতসংসর্গের নিয়ম উপপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী জল, তেজ ও বায়ু কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, অর্থাৎ জল, তেজ ও বায়ুশূন্য কোন পৃথিবী নাই। সুতরাং পৃথিবীতে যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুর গুণ—রস, রূপ ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু জলাদিতে পৃথিবীর ঐরূপ সংসর্গ না থাকায়, পৃথিবীর গুণ গন্ধের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ জলে তেজ ও বায়ুর ঐরূপ সংসর্গবিশেষ থাকায়, জলে তেজ এবং বায়ুর গুণ—রূপ ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু তেজ ও বায়ুতে জলের ঐরূপ সংসর্গবিশেষ না থাকায়, তাহাতে জলের গুণ রসের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ তেজে বায়ুর ঐরূপ সংসর্গবিশেষ থাকায়, তাহাতে বায়ুর গুণ স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু বায়ুতে তেজের ঐরূপ সংসর্গ না থাকায়, তাহাতে তেজের

গুণ রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে না। ফলকথা, ভূতসৃষ্টিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতে পর পর ভূতেরই অনুপ্রবেশ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্তরূপ সংসর্গনিয়ম ও তজ্জন্য ঐরূপ গুণপ্রত্যক্ষের নিয়ম উপপন্ন হয়। জলাদি পরভূত কর্তৃকই পৃথিব্যাদি পূর্ব্বভূত "বিষ্ট", কিন্তু পূর্ব্বভূত কর্তৃক জলাদি পরভূত "বিষ্ট" নহে। প্রবেশার্থ "বিশ্" ধাতু হইতে "বিষ্ট" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন,—"বিষ্টত্বং সংযোগবিশেষঃ"। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "সংযোগবিশেষে"র অর্থ বলিয়াছেন,—ব্যাপ্তি। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ সংসর্গ উভয়গত হইলেও, উভয়েই উহা তুল্য নহে। যেমন, অগ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ ঐ উভয়েই একপ্রকার নহে। অগ্নি ব্যাপক, ধূম তাহার ব্যাপ্য। ধূম থাকিলে সেখানে অগ্নির ভাবই থাকে; অভাব থাকে না, এবং অগ্নিশূন্যস্থানে ধূম থাকে না, কিন্তু ধূমশূন্য-স্থানেও অগ্নি থাকে। এইরূপ জলাদি ব্যতীত পৃথিবী না থাকায়, পৃথিবীই জলাদির ব্যাপ্য, জলাদি পৃথিবীর ব্যাপক।

ভাষ্যকার এই মতের ব্যাখ্যা করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, "ইহা ভূতসৃষ্টিতে জানিবে, ইদানীং নহে"। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ভূতসৃষ্টিকালেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতে পর পর ভূতের অনুপ্রবেশ হইয়াছে, ইদানীং উহা অনুভব করা যায় না, এইরূপ তাৎপর্য্যই সরলভাবে বুঝা যায়। পরবর্ত্তি-সূত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার এই কথার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও এই তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে ভাষ্যকারের "ভূতসৃষ্টি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভূতসৃষ্টি প্রতি-পাদক পুরাণশাস্ত্র। অর্থাৎ ভূতসৃষ্টিপ্রতিপাদক পুরাণশাস্ত্রে ইহা জানিবে, পুরাণশাস্ত্রে ইহা বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তি-সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় ঐ পুরাণের কোনরূপে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাও তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পুরাণে কোথায় পূর্ব্বোক্তমত বর্ণিত হইয়াছে, এবং ন্যায়মতানুসারে সেই পুরাণ-বচনের কিরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার—তাঁহার "ভামতী" গ্রন্থে শারীরক-ভাষ্যোক্ত গুণব্যবস্থা সমর্থনের জন্য কতিপয় পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন[1]। কিন্তু সেই সমস্ত বচনের দ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতের যথাক্রমে শব্দপ্রভৃতি এক একটিই গুণ, এই মত বুঝা যায় না। তদ্দ্বারা অন্যরূপ মতই বুঝা যায়। সেখানে তাঁহার উদ্ধৃত বচনের শেষ বচনের দ্বারা ভূতবর্গের পরস্পরানুপ্রবেশও স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য মহর্ষি মনু "আকাশং জায়তে তস্মাৎ"—ইত্যাদি "অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ" ইত্যন্ত-(মনুসংহিতা ১ম অঃ, ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮) বচনগুলির দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে আকাশাদি পঞ্চভূতের যথাক্রমে শব্দাদি এক একটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি গোতম এখানে মতান্তররূপে যে গুণব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা পুরাণের মত বলিয়া তাৎপর্য্যটীকাকার প্রকাশ করিয়াছেন, উহা মনুর মত নহে। কারণ, প্রথমে পঞ্চভূতে এক একটি গুণের উৎপত্তি হইলেও, পরে বায়ু প্রভৃতি ভূতে যে, গুণান্তরেরও উৎপত্তি হয়, ইহা মনু প্রথমেই বলিয়াছেন[2]। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত মতকে

১। পুরাণেহপি স্মর্য্যতে—"আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ" ইত্যাদি। পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ ধারয়ন্তি পরস্পরং"।—বেদান্তদর্শন ২।২।১৬শ সূত্রের ভাষ্য 'ভামতী' দ্রষ্টব্য।

২। আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্ গুণঃ স্মৃতঃ॥ ১।২০।

আয়ুর্ব্বেদের মত বলিয়া প্রকাশ করেন এবং ঐ মত যে গোতমেরও সম্মত, ইহা গোতমের এই সূত্র পাঠ করিয়া সমর্থন করেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম যে, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজের মত নহে, ইহা দেখা আবশ্যক। আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতকে আয়ুর্ব্বেদের মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না। কারণ, চরক-সংহিতায়[১] বায়ু প্রভৃতি পরপর ভূতে অন্যান্য ভূতের সংমিশ্রণজন্য গুণবৃদ্ধিই কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতায়[২] "একোত্তর পরিবৃদ্ধাঃ" এবং "পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তই সুব্যক্ত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদমতে জন্যদ্রব্যমাত্রই পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চভূতই সকলের উপাদান। কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চীকরণ ব্যতীত ঐ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। ভূতবর্গের পরস্পরানুপ্রবেশ সম্ভব হয় না। কিন্তু এখানে "বিষ্টং হ্যপরং পরেণ" এই সূত্রের দ্বারা পঞ্চীকরণ কথিত হয় নাই এবং পঞ্চীকরণানুসারে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত গুণব্যবস্থাও ঐ সূত্রের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। যাহা হউক, তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে অনেক পুরাণে অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত মতান্তরের বর্ণন পাই নাই। পুরাণে অনেক স্থলে এ বিষয়ে সাংখ্যাদি মতেরই বর্ণন পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে একস্থানে উক্ত মতান্তরের বর্ণন বুঝিতে পারা যায়। সেখানে আকাশাদি পঞ্চভূতে অন্যান্য পদার্থবিশেষও গুণ বলিয়া কথিত হইলেও, শব্দাদি পঞ্চগুণের মধ্যে যথাক্রমে এক একটি গুণই আকাশাদি পঞ্চভূতে কথিত হইয়াছে। সেখানে বায়ু প্রভৃতি ভূতে ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধির কোন কথা নাই। সেখানে বায়ু প্রভৃতিতে গুণবৃদ্ধি বুঝিলে, সংখ্যা-নির্দ্দেশও উপপন্ন হয় না। সুধীগণ ইহা প্রণিধান করিয়া মহাভারতের ঐ সমস্ত শ্লোকের[৩] তাৎপর্য্য বিচার করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত মতান্তরের মূল অনুসন্ধান করিবেন ॥ ৬৬ ॥

১। তেষামেকগুণঃ পূর্ব্বো গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বগুণশ্চৈব ক্রমশো গুণিষু স্মৃতঃ ॥
—চরকসংহিতা, শারীর স্থান, ১ম অঃ, ৭ম শ্লোক।

২। আকাশপবনদহনতোয়ভূমিষু যথাসংখ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, তস্মাদাপ্যো রসঃ পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্তি ইত্যাদি।
—সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান। ২

৩। শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশসম্ভবং।
প্রাণশ্চেষ্টা তথা স্পর্শ এতে বায়ুগুণাস্ত্রয়ঃ ॥
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ ত্রিধা জ্যোতির্বিধীয়তে।
রসোহথ রসনং স্নেহো গুণাস্ত্বেতে ত্রয়োঽম্ভসঃ ॥
ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ ভূমেরেতে গুণাস্ত্রয়ঃ।
এতাবানিন্দ্রিয়গ্রামো ব্যাখ্যাতঃ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥
বায়োঃ স্পর্শো রসোঽদ্ভ্যশ্চ জ্যোতিষো রূপমুচ্যতে।
আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ ॥
—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৪৬ অঃ, ৯। ১০। ১১। ১২

সূত্র। ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ ॥৬৭॥২৬৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, যেহেতু পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। নেতি ত্রিসূত্রীং প্রত্যাচষ্টে, কস্মাৎ? পার্থিবস্য দ্রব্যস্য আপ্যস্য চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। মহত্ত্বানেকদ্রব্যবত্ত্বাদ্রূপাচ্চোপলব্ধিরিতি তৈজসমেব দ্রব্যং প্রত্যক্ষং স্যাৎ, ন পার্থিবমাপ্যং বা, রূপাভাবাৎ। তৈজসবত্তু পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বান্ন সংসর্গাদনেকগুণগ্রহণং ভূতানামিতি। ভূতান্তরকৃতঞ্চ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বং ব্রুবতঃ প্রত্যক্ষো বায়ুঃ প্রসজ্যতে, নিয়মে বা কারণমুচ্যতামিতি। রসয়োর্ব্বা পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। পার্থিবো রসঃ ষড়্‌বিধ আপ্যো মধুর এব, ন চৈতৎ সংসর্গাদ্‌ভবিতুমর্হতি। রূপয়োর্ব্বা পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৈজসরূপানুগৃহীতয়োঃ, সংসর্গে হি ব্যঞ্জকমেব রূপং ন ব্যঙ্গ্যমস্তীতি। একানেকবিধত্বে চ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাদ্রূপয়োঃ, পার্থিবং হরিত-লোহিত-পীতাদ্যনেকবিধং রূপং, আপ্যন্তু শুক্লমপ্রকাশকং, ন চৈতদেকগুণানাং সংসর্গে সত্যুপপদ্যত ইতি।

উদাহরণমাত্রঞ্চৈতৎ। অতঃপরং প্রপঞ্চঃ। স্পর্শয়োর্ব্বা পার্থিবতৈজসয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পার্থিবোঽনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শঃ উষ্ণস্তৈজসঃ প্রত্যক্ষঃ, ন চৈতদেকগুণানামনুষ্ণাশীতস্পর্শেন বায়ুনা সংসর্গেণোপপদ্যত ইতি। অথবা পার্থিবাপ্যয়োর্দ্রব্যয়োর্ব্যবস্থিতগুণয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। চতুর্গুণং পার্থিবং দ্রব্যং ত্রিগুণমাপ্যং প্রত্যক্ষং, তেন তৎকারণমনুমীয়তে তথাভূতমিতি। তস্য কার্য্যং লিঙ্গং কারণভাবাদ্ধি কার্য্যভাব ইতি। এবং তৈজসবায়ব্যয়োর্দ্রব্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাদ্‌গুণব্যবস্থায়াস্তৎকারণে দ্রব্যে ব্যবস্থানুমানমিতি। দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পার্থিবং দ্রব্যমবাদিভির্ব্বিযুক্তং প্রত্যক্ষতো গৃহ্যতে, আপ্যঞ্চ পরাভ্যাং, তৈজসঞ্চ বায়ুনা, ন চৈকৈকগুণং গৃহ্যত ইতি। নিরনুমানঞ্চ "বিষ্টং হ্যপরং পরেণে"ত্যেতদিতি। নাত্র লিঙ্গমনুমাপকং গৃহ্যত ইতি, যেনৈতদেবং প্রতিপদ্যেমহি। যচ্চোক্তং বিষ্টং হ্যপরং পরেণেতি ভূতসৃষ্টৌ বেদিতব্যং

ন সাম্প্রতমিতি নিয়মকারণাভাবাদযুক্তং। দৃষ্টঞ্চ সাম্প্রতমপরং পরেণ বিষ্টমিতি বায়ুনা চ বিষ্টং তেজ ইতি। বিষ্টত্বং সংযোগঃ, স চ দ্বয়োঃ সমানঃ, বায়ুনা চ বিষ্টত্বাৎ স্পর্শবত্তেজো ন তু তেজসা বিষ্টত্বাদ্ রূপবান্ বায়ুরিতি নিয়মকারণং নাস্তীতি। দৃষ্টঞ্চ তৈজসেন স্পর্শেন বায়ব্যস্য স্পর্শস্যাভিভবাদগ্রহণমিতি, ন চ তেনৈব তস্যাভিভব ইতি।

অনুবাদ। "ন" এই শব্দের দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত) তিন সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা সমর্থিত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, ইহাই মহর্ষি এই সূত্রে প্রথমে "নঞ্" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (১) পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহত্ত্ব, অনেকদ্রব্যবত্ত্ব ও রূপ-প্রযুক্ত (চাক্ষুষ) উপলব্ধি হয়, এজন্য (পূর্ব্বোক্ত মতে) তৈজস-দ্রব্যই প্রত্যক্ষ হইতে পারে, রূপ না থাকায় পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু তৈজস-দ্রব্যের ন্যায় পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশতঃ সংসর্গপ্রযুক্তই ভূতের অনেকগুণ প্রত্যক্ষ হয় না [অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যক্ষ হয়, রূপ পৃথিবী ও জলের নিজগুণ নহে, ইহা বলা যায় না,] পরন্তু পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের "ভূতান্তরকৃত" অর্থাৎ অন্য ভূতের (তেজের) সংসংর্গপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষতা-বাদীর (মতে) বায়ু প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়, [অর্থাৎ বায়ুতেও তেজের সংসর্গ থাকায়, তৎপ্রযুক্ত বায়ুরও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়] অথবা তিনি নিয়মে অর্থাৎ তেজেই বায়ুর সংসর্গ আছে, বায়ুতে তেজের ঐরূপ সংসর্গবিশেষ নাই, এইরূপ নিয়মে কারণ (প্রমাণ) বলুন।

(২) অথবা পার্থিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে)। পার্থিব রস, ষট্‌প্রকার, জলীয় রস কেবল মধুর, ইহাও সংসর্গবশতঃ হইতে পারে না [অর্থাৎ জলে তিক্তাদি পঞ্চরস না থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পৃথিবীতে তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব]। (৩) অথবা তৈজস রূপের দ্বারা অনুগৃহীত পার্থিব ও জলীয় রূপের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে) যেহেতু সংসর্গ স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, রূপ ব্যঞ্জকই হয়, ব্যঙ্গ্য হয় না। এবং পার্থিব ও জলীয় রূপের অনেকবিধত্ব ও একবিধত্ববিষয়ে প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে)। পার্থিব রূপ, হরিত, লোহিত, পীত প্রভৃতি অনেক প্রকার ; কিন্তু জলীয় রূপ অপ্রকা-

শক শুক্ল, কিন্তু ইহা একগুণবিশিষ্ট পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে (তেজের) সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না।

ইহা অর্থাৎ সূত্রে "পার্থিবাপ্যয়োঃ" এই পদটি উদাহরণ মাত্রই। ইহার পরে প্রপঞ্চ অর্থাৎ এই সূত্রের ব্যাখ্যা-বিস্তর বলিতেছি—(১) অথবা পার্থিব ও তৈজস স্পর্শের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে)। পার্থিব অনুষ্ণাশীত স্পর্শ ও তৈজস উষ্ণস্পর্শ প্রত্যক্ষ, ইহাও একগুণবিশিষ্ট পৃথিবী ও তেজের সম্বন্ধে অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুর সহিত সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না। (২) অথবা ব্যবস্থিত গুণবিশিষ্ট পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে) চতুর্গুণবিশিষ্ট পার্থিব দ্রব্য ও ত্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, তদ্দ্বারা তাহার কারণ তথাভূত অনুমিত হয়। কার্য্য তাহার (তথাভূত কারণের) লিঙ্গ, যেহেতু কারণের সত্তাপ্রযুক্ত কার্য্যের সত্তা। (৩) এইরূপ তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যে গুণনিয়মের প্রত্যক্ষতাবশতঃ তাহার কারণদ্রব্যে ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণ-নিয়মের অনুমান হয়। (৪) অথবা পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশতঃ বিবেক অর্থাৎ অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গ দৃষ্ট হয়। জলাদি কর্ত্তৃক বিযুক্ত (অসংসৃষ্ট) পার্থিব দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং তেজ ও বায়ু কর্ত্তৃক বিযুক্ত জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং বায়ু কর্ত্তৃক বিযুক্ত তৈজস-দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়। কিন্তু (ঐ দ্রব্যত্রয়) এক একটি গুণবিশিষ্ট হইয়া গৃহীত হয় না। এবং "যেহেতু অপরভূত পরভূত কর্ত্তৃক বিষ্ট" ইহা নিরনুমান, এই বিষয়ে অনুমাপক লিঙ্গ গৃহীত হয় না, যদ্দ্বারা ইহা এইরূপ স্বীকার করিতে পারি। আর যে বলা হইয়াছে, "যেহেতু অপরভূত পরভূত কর্ত্তৃক বিষ্ট" ইহা ভূতসৃষ্টিতে জানিবে—ইদানীং নহে, ইহাও অযুক্ত। কারণ, নিয়মে অর্থাৎ কেবল গন্ধই পৃথিবীর বিশেষ গুণ, ইত্যাদি প্রকার নিয়মে কারণ (প্রমাণ) নাই। সম্প্রতিও অপরভূত পরভূত কর্ত্তৃক বিষ্ট দেখা যায়। তেজঃ বায়ু কর্ত্তৃক বিষ্ট হয়। বিষ্টত্ব সংযোগ, সেই সংযোগ কিন্তু উভয়ে এক। বায়ু কর্ত্তৃক বিষ্টত্ববশতঃ তেজঃ স্পর্শবিশিষ্ট, কিন্তু তেজঃ কর্ত্তৃক বিষ্টত্ববশতঃ বায়ু রূপবিশিষ্ট নহে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ নাই। এবং তৈজস স্পর্শ কর্ত্তৃক বায়বীয় স্পর্শের অভিভবপ্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ দেখা যায়। কারণ, তৎকর্ত্তৃকই তাহার অভিভব হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভবকর্ত্তা হইতে পারে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষ খণ্ডন করিতে এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে,

পার্থিব, জলীয় ও তৈজস—এই তিন প্রকার দ্রব্যেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কেবল তৈজস দ্রব্যেরই রূপ থাকায়, তাহারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, মহত্ত্বাদির ন্যায় রূপবিশেষও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের কারণ। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য একেবারে রূপশূন্য হইলে, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হয়। রূপবিশিষ্ট তৈজস দ্রব্যের সংসর্গবশতঃই পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিলে বায়ুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, রূপবিশিষ্ট তেজের সহিত বায়ুরও সংসর্গ আছে। বায়ুতে তেজের ঐ সংসর্গ নাই, কিন্তু তেজেই বায়ুর ঐ সংসর্গ আছে, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত মতে তেজের সহিত সংসর্গবশতঃ আকাশেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আপত্তি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রস্থ "পার্থিবাপ্যয়োঃ" এই বাক্যের দ্বারা পার্থিব ও জলীয় রসাদিকেও গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পার্থিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবীতে রস নাই ; কেবল জলেই রস আছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। জলের সহিত সংসর্গবশতঃই পৃথিবীতে রসের-প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, জলে তিক্তাদি রস না থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পৃথিবীতে তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং পৃথিবীতে ষড়্‌বিধ রসেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ষড়্‌বিধ রসই তাহাতে স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তৈজস রূপের দ্বারা অনুগৃহীত অর্থাৎ তৈজস রূপ যাহার প্রত্যক্ষে সহায়, সেই পার্থিব ও জলীয় রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবী ও জলে রূপ নাই, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। তেজের সংসর্গবশতঃই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলিলে বস্তুতঃ সেই তেজের রূপ সেখানে পৃথিবী ও জলের ব্যঞ্জকই হয়, সুতরাং সেখানে ব্যঙ্গ্য রূপ থাকে না। কিন্তু পৃথিবী ও জলের ন্যায় তাহার রূপেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাতে স্বগত ব্যঙ্গ্য রূপ অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু পৃথিবীতে হরিত, লোহিত, পীত প্রভৃতি নানাবিধ রূপের এবং জলে কেবল একবিধ শুক্ল-রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ গন্ধ প্রভৃতি এক একটি গুণবিশিষ্ট হইলে তেজে হরিত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ রূপ না থাকায়, এবং জলে পরিদৃশ্যমান অপ্রকাশক শুক্লরূপ না থাকায়, তেজের সংসর্গপ্রযুক্ত পৃথিবী ও জলে ঐ সমস্ত রূপের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। তেজের রূপ ভাস্বর শুক্ল, সুতরাং উহা অন্য বস্তুর প্রকাশক হয় অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহায় হয়। তাই ভাষ্যকার পার্থিব ও জলীয় রূপকে "তৈজসরূপানুগৃহীত" বলিয়াছেন। জলের রূপ অভাস্বর শুক্ল, সুতরাং উহা পরপ্রকাশক হইতে পারে না। ভাষ্যকারের এই তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় সূত্রে "পার্থিব" ও "আপ্য" শব্দের দ্বারা পার্থিব ও জলীয় রূপ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার শেষে সূত্রকারের "পার্থিবাপ্যয়োঃ" এই বাক্যকে উদাহরণমাত্র বলিয়া এই সূত্রের আরও চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যায় সূত্রে "পার্থিব" ও "আপ্য" শব্দের দ্বারা পার্থিব ও তৈজস স্পর্শ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পার্থিব ও তৈজস-স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবী ও তেজে স্পর্শ নাই, এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। বায়ুর সংসর্গবশতঃই পৃথিবী ও তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, পৃথিবীতে পাকজন্য

অনুষ্ণাশীত স্পর্শ এবং তেজে উষ্ণস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বায়ুতে ঐরূপ স্পর্শ নাই; কারণ, বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত। সুতরাং বায়ুর সংসর্গবশতঃ পৃথিবী ও তেজে পূর্ব্বোক্তরূপ বিজাতীয় স্পর্শের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি চারিটি গুণবিশিষ্ট পার্থিব দ্রব্যের এবং রসাদিগুণত্রয়বিশিষ্ট জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ঐ দ্রব্যদ্বয়ের কারণেও ঐরূপ গুণচতুষ্টয় ও গুণত্রয় আছে, ইহা অনুমিত হয়। কারণ, কারণের সত্তাপ্রযুক্তই কার্য্যের সত্তা। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে যে গুণচতুষ্টয় ও গুণত্রয় প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার মূল কারণ পরমাণুতেও ঐরূপ ব্যবস্থিত গুণচতুষ্টয় ও গুণত্রয় আছে, ইহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। তৃতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যে গুণব্যবস্থার অর্থাৎ ব্যবস্থিত বা নিয়তগুণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার কারণদ্রব্যে ঐ গুণব্যবস্থার অনুমান হয়। তেজে রূপ ও স্পর্শ,—এই দুইটি গুণেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায় এবং বায়ুতে কেবল স্পর্শেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তদ্দ্বারা তাহার কারণ পরমাণুতেও ঐরূপ গুণব্যবস্থা অবশ্য সিদ্ধহইবে। সুতরাং তেজে রূপ ও স্পর্শ—এই গুণদ্বয়ই আছে, এবং বায়ুতে কেবল স্পর্শই আছে, এইরূপে গুণব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। এই ব্যাখ্যায় সূত্রে "প্রত্যক্ষত্ব" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ গুণব্যবস্থার প্রত্যক্ষতা বুঝিতে হইবে। এবং "পার্থিবাপ্যয়োঃ" এই বাক্যটি উদাহরণমাত্র॥ উহার দ্বারা "তৈজসবায়ব্যয়োঃ"[১] এইরূপ সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত বাক্য এই পক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যকার শেষে "দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা কল্পান্তরে এই সূত্রের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দৃষ্টশ্চ" এই স্থলে "চ"শব্দের অর্থ বিকল্প। অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গই বিবেক। জলাদি ভূতের সহিত অসংসৃষ্ট পার্থিব দ্রব্যের এবং পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংসৃষ্ট জলীয়

১। ভাষ্যকারের "তৈজসবায়ব্যয়োর্দ্রব্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ" এই সন্দর্ভের দ্বারা তিনি বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতা বলেন নাই। ঐরূপ দ্রব্যে গুণব্যবস্থার প্রত্যক্ষতাই বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য। ভাষ্যে "তৈজসবায়ব্যয়োঃ" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে বায়ুর প্রতক্ষতাবিষয়ে কোন কথা নাই। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ বায়ুর অনুমানই প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে প্রাচীন বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ বায়ুর অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৪০শ সূত্রের ভাষ্যে রূপশূন্য দ্রব্যের বাহ্য প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাও ভাষ্যকারের কথায় দ্বারা বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ে (১ম আঃ, ১৪শ সূত্রের বার্ত্তিকে) উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারাও বায়ু যে বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজ বায়ুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতেন, ইহা "তার্কিকরক্ষা"র টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথ "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ"গ্রন্থে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ জন্মে, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারেই "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে বিশ্বনাথ নব্যমতে বায়ুর প্রত্যক্ষ এবং ঐ মতের যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার রঘুনাথের মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"য় "বিংশ-কারিকা"র ব্যাখ্যায় বায়ুত্ব-জাতিকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, বায়ুর অপ্রত্যক্ষতাই যে তাঁহার সম্মত, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে বিশ্বনাথের কথানুসারে নব্যনৈয়ায়িকমাত্রই যে বায়ুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝিতে হইবে না।

দ্রব্যের এবং বায়ুর সহিত অসংসৃষ্ট তৈজস দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, ইহাই এই কল্পে সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। যে পার্থিব দ্রব্যে জলাদির সংসর্গ নাই, তাহাতে রস প্রত্যক্ষ হইলে, তাহা ঐ পার্থিব দ্রব্যেরই রস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এবং তাহাতে তেজের সংসর্গ না থাকায়, তাহাতে যে রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও ঐ পার্থিব দ্রব্যের নিজের রূপ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংসৃষ্ট জলীয় দ্রব্যে এবং বায়ুর সহিত অসংসৃষ্ট তৈজস দ্রব্যে রূপ ও স্পর্শ অবশ্য স্বীকার্য্য, উহাতে সংসর্গপ্রযুক্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ বলা যাইবে না। পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্য হইতে অন্য ভূতের পরমাণুসমূহ নিষ্কাশন করিয়া দিলে সেই অন্য ভূতের সহিত পৃথিব্যাদির বিবেক বা অসংসর্গ হইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় পরমপ্রাচীন বাৎস্যায়নও এতদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, ইহা এখানে তাঁহার কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথার অনুবাদ করিয়া, তাহারও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অপর ভূত পরভূত কর্ত্তৃক বিষ্ট, ইহাও নিরনুমান, এ বিষয়ে অনুমাপক কোন লিঙ্গ নাই, যদ্দ্বারা উহা স্বীকার করিতে পারি এবং ভূতসৃষ্টিকালেই অপর ভূত পরভূত কর্ত্তৃক বিষ্ট হয়, এতৎকালে তাহা হয় না, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম-বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায়, অযুক্ত। পরন্তু এতৎকালেও অপরভূত পরভূত কর্ত্তৃক বিষ্ট হয়, ইহা দেখা যায়। এখনও বায়ুকর্ত্তৃক তেজ বিষ্ট হয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। পরন্তু অন্য ভূতে যে অন্য ভূতের গুণের প্রত্যক্ষ হয় বলা হইয়াছে, তাহা ঐ ভূতদ্বয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবপ্রযুক্তই বলা যায় না। কারণ, ব্যাপ্যব্যাপক ভাব না থাকিলেও, অগ্নিসংযুক্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং ব্যাপ্যব্যাপকভাব সত্ত্বেও আকাশস্থ ধূমে ভূমিস্থিত অগ্নির গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তমতবাদীরা যে "বিষ্টত্ব" বলিয়াছেন, তাহা সংযোগমাত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। অপরভূতে পরভূতের সংযোগই ঐ বিষ্টত্ব, উহা উভয় ভূতেই এক, বায়ুর সহিত তেজের যে সংযোগ আছে, তেজের সহিতও বায়ুর ঐ সংযোগই আছে। সুতরাং তেজঃসংযুক্ত বায়ুতেও রূপের প্রত্যক্ষ এবং তজ্জন্য বায়ুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বায়ুকর্ত্তৃক সংযুক্ত বলিয়া তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তেজঃকর্ত্তৃক সংযুক্ত হইলেও, বায়ুতে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে সর্ব্বশেষে আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, বায়ুর মধ্যে তেজঃপদার্থ প্রবিষ্ট হইলে, তখন তাহাতে তেজের উষ্ণ স্পর্শই অনুভূত হয়, যদ্দ্বারা বায়ুর অনুষ্ণাশীত স্পর্শ অভিভূত হওয়ায়, তাহার অনুভব হয় না। কিন্তু তেজে স্পর্শ না থাকিলে, সেখানে বায়ুর স্পর্শ কিসের দ্বারা অভিভূত হইবে? বায়ুর স্পর্শ নিজেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভবজনক হয় না। সুতরাং তেজের স্বকীয় উষ্ণস্পর্শ অবশ্য স্বীকার্য্য॥ ৬৭॥

ভাষ্য। তদেবং ন্যায়বিরুদ্ধং প্রবাদং প্রতিষিধ্য "ন সর্ব্বগুণা-নুপলব্ধে"রিতি চোদিতং সমাধীয়তে[১]—

১। এখানে ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে "ন সর্ব্বগুণানুপলব্ধেঃ" এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের

অনুবাদ। সেই এইরূপে ন্যায়বিরুদ্ধ প্রবাদ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিয়া, "ন সর্ব্বগুণানুপলব্ধেঃ" এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমাধান করিতেছেন।

সূত্র। পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুণোৎকর্ষাৎ তত্তৎপ্রধানং॥ ॥৬৮॥২৬৬॥*

অনুবাদ। (উত্তর) পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গুণের (যথাক্রমে গন্ধাদি গুণের) উৎকর্ষপ্রযুক্ত "তত্তৎপ্রধান" অর্থাৎ গন্ধাদিপ্রধান, (গন্ধাদি বিষয়-বিশেষের গ্রাহক)।

ভাষ্য। তস্মান্ন সর্ব্বগুণোপলব্ধির্ঘ্রাণাদীনাং, পূর্ব্বং পূর্ব্বং গন্ধাদের্গুণস্যোৎকর্ষাৎ তত্তৎ প্রধানং। কা প্রধানতা? বিষয়গ্রাহকত্বং। কো গুণোৎকর্ষঃ? অভিব্যক্তৌ সমর্থত্বং। যথা, বাহ্যানাং পার্থিবাপ্যতৈজসানাং দ্রব্যাণাং চতুর্গুণ-ত্রিগুণ-দ্বিগুণানাং ন সর্ব্বগুণব্যঞ্জকত্বং, গন্ধ-রস-রূপোৎকর্ষাত্তু যথাক্রমং গন্ধ-রস-রূপ-ব্যঞ্জকত্বং, এবং ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুষাং চতুর্গুণ-ত্রিগুণ-দ্বিগুণানাং ন সর্ব্বগুণগ্রাহকত্বং, গন্ধরসরূপোৎকর্ষাত্তু যথাক্রমং গন্ধরসরূপগ্রাহকত্বং, তস্মাদ্‌ঘ্রাণাদিভির্ন সর্ব্বেষাং গুণানামুপলব্ধিরিতি। যস্তু প্রতিজানীতে গন্ধগুণত্বাদ্‌ঘ্রাণং গন্ধস্য গ্রাহকমেবং রসনাদিষ্বপীতি, তস্য যথাগুণযোগং ঘ্রাণাদিভির্গুণগ্রহণং প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। অতএব ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক সর্ব্বগুণের উপলব্ধি হয় না। (কারণ) পূর্ব্ব পূর্ব্ব, অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি-গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত তত্তৎপ্রধান। (প্রশ্ন) প্রধানত্ব কি? (উত্তর) বিষয়বিশেষের গ্রাহকত্ব। (প্রশ্ন) গুণের উৎকর্ষ

খণ্ডন করেন নাই, পূর্ব্বোক্ত মতেরই অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। এবং ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রভাষ্যারম্ভে "নেতি ত্রিসূত্রীং প্রত্যাচষ্টে" এই কথা বলিয়াছেন। নচেৎ সেখানে ঐ কথা বলার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে "ত্রিসূত্রী" শব্দের দ্বারা "ন সর্ব্বগুণানুপলব্ধেঃ" এই সূত্রকে ত্যাগ করিয়া উহার পরবর্ত্তী তিন সূত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "সংসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণং" এই বাক্যটি ভাষ্যকারের মতে গোতমের সূত্রই বলিতে হয়। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" ঐরূপ সূত্র নাই, পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে।

* অনেক পুস্তকে এই সূত্রে "পূর্ব্বপূর্ব্ব" এইরূপ পাঠ থাকিলেও, "ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে" বর্দ্ধমান উপাধ্যায় "পূর্ব্বং পূর্ব্বং" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করায়, এবং ঐরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হওয়ায়, ঐরূপ পাঠই গৃহীত হইল।

কি ? অভিব্যক্তি বিষয়ে সামর্থ্য। (তাৎপর্য্য) যেমন চতুর্গুণবিশিষ্ট, ত্রিগুণবিশিষ্ট ও দ্বিগুণবিশিষ্ট পার্থিব, জলীয় ও তৈজস বাহ্যদ্রব্যের সর্ব্বগুণ ব্যঞ্জকত্ব নাই, কিন্তু গন্ধ, রস ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের ব্যঞ্জকত্ব আছে, এইরূপ চতুর্গুণবিশিষ্ট, ত্রিগুণবিশিষ্ট ও দ্বিগুণবিশিষ্ট ঘ্রাণ, রসনা ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সর্ব্বগুণগ্রাহকত্ব নাই, কিন্তু গন্ধ, রস, ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের গ্রাহকত্ব আছে, অতএব ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক সর্ব্বগুণের উপলব্ধি হয় না।

যিনি কিন্তু গন্ধগুণত্বহেতুক অর্থাৎ গন্ধবত্ত্ব হেতুর দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, এই প্রতিজ্ঞা করেন, এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়েও (রসবত্ত্বাদি হেতুর দ্বারা রসগ্রাহক ইত্যাদি) প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার (মতে) গুণযোগানুসারে ঘ্রাণাদির দ্বারা গুণগ্রহণ অর্থাৎ রসাদি গুণের প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, এখন তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে "ন সর্ব্বগুণানুপলব্ধেঃ" এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান বলিয়াছেন। মহর্ষির উত্তর এই যে, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধাদি সর্ব্বগুণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণের উৎকর্ষ আছে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব দ্রব্য বলিয়া তাহাতে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ—এই চারিটি গুণ থাকিলেও, তন্মধ্যে তাহাতে গন্ধগুণের উৎকর্ষ থাকায়, উহা গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। যথাক্রমে গন্ধাদি গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, প্রধান। গন্ধাদি-বিষয়বিশেষের গ্রাহকত্বই প্রধানত্ব। এবং ঐ বিষয়-বিশেষের অভিব্যক্তি-বিষয়ে সামর্থ্যই গুণোৎকর্ষ। ভাষ্যকার এইরূপ বলিলেও, বার্ত্তিককার ঘ্রাণ, রসনা ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যথাক্রমে চতুর্গুণত্ব, ত্রিগুণত্ব ও দ্বিগুণত্বই সূত্রোক্ত প্রধানত্ব বলিয়াছেন। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত গুণচতুষ্টয়, গুণত্রয় ও গুণদ্বয় থাকিলেও, তন্মধ্যে যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্তই উহারা যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপেরই ব্যঞ্জক হয়। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন পার্থিব বাহ্য দ্রব্য গন্ধাদি চতুর্গুণবিশিষ্ট হইলেও, উহা পৃথিবীর ঐ চারিটি গুণেরই ব্যঞ্জক হয় না, কিন্তু গন্ধগুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধাদিচতুর্গুণ বিশিষ্ট হইলেও, তাহাতে গন্ধের উৎকর্ষপ্রযুক্ত তাহা গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। এইরূপ রসাদি ত্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় বাহ্য দ্রব্যের ন্যায় রসনেন্দ্রিয়ে রসাদিগুণত্রয় থাকিলেও, রসের উৎকর্ষপ্রযুক্ত উহা রসেরই ব্যঞ্জক হয়, রসাদি গুণত্রয়েরই ব্যঞ্জক হয় না। এইরূপ রূপাদি-গুণদ্বয়বিশিষ্ট তৈজস বাহ্য দ্রব্যের ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ে ঐ গুণদ্বয় থাকিলেও, রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত উহা রূপেরই ব্যঞ্জক হয়। মূলকথা, যে দ্রব্যে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই দ্রব্যাত্মক ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত গুণেরই ব্যঞ্জক হইবে, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ত্রয়ের পার্থিবত্বাদি সাধনে যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহারাও সর্ব্বগুণের ব্যঞ্জক নহে। তদ্দৃষ্টান্তে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ত্রয়ও যথাক্রমে

গন্ধাদি এক একটি গুণেরই ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গন্ধই আছে, অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধেরই গ্রাহক এবং রসনেন্দ্রিয়ে রসই আছে, অতএব উহা রসেরই গ্রাহক, ইত্যাদিরূপে অনুমান দ্বারা প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষ খণ্ডন করিয়া মহর্ষি পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের যেরূপ গুণনিয়ম সমর্থন করিয়াছেন, তদনুসারে পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গন্ধের ন্যায় রস, রূপ ও স্পর্শও আছে। সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঐ রসাদি গুণেরও গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা যায় না। ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের গন্ধাদি-গ্রাহকত্ব সাধন করিলে, উহারা স্বগত সর্ব্বগুণেরই গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গুণোৎকর্ষ-বশতঃই ঘ্রাণাদি-ইন্দ্রিয় গন্ধাদি-বিষয়বিশেষের গ্রাহক হয়, ইহাই বলিতে হইবে ॥৬৮॥

ভাষ্য। কিং কৃতং পুনর্ব্যবস্থানং কিঞ্চিৎ পার্থিবমিন্দ্রিয়ং, ন সর্ব্বাণি, কানিচিদাপ্যতৈজসবায়ব্যানি ইন্দ্রিয়াণি ন সর্ব্বাণি ?

অনুবাদ। (প্রশ্ন) কোন ইন্দ্রিয়ই পার্থিব, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, কোন ইন্দ্রিয়-বর্গই (যথাক্রমে) জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রযুক্ত ? অর্থাৎ ঐরূপ নিয়মের মূল কি ?—

সূত্র। তদ্ব্যবস্থানন্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৬৯॥২৬৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যবস্থা (পার্থিবত্বাদি নিয়ম) কিন্তু ভূয়স্ত্ব (পার্থিবাদি-ভাগের প্রকর্ষ)-বশতঃ বুঝিবে।

ভাষ্য। অর্থনির্ব্বৃত্তিসমর্থস্য প্রবিভক্তস্য দ্রব্যস্য সংসর্গঃ পুরুষ-সংস্কারকারিতো ভূয়স্ত্বং। দৃষ্টো হি প্রকর্ষে ভূয়স্ত্বশব্দঃ, প্রকৃষ্টো যথা বিষয়ো ভূয়ানিত্যুচ্যতে। যথা পৃথগর্থক্রিয়াসমর্থানি পুরুষসংস্কারবশা-দ্বিষৌষধিমণিপ্রভৃতীনি দ্রব্যাণি নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে, ন সর্ব্বং সর্ব্বার্থং, এবং পৃথগ্-বিষয়গ্রহণসমর্থানি ঘ্রাণাদীনি নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে, ন সর্ব্ববিষয়গ্রহণসমর্থানীতি।

অনুবাদ। পুরুষার্থ-সম্পাদনসমর্থ প্রবিভক্ত (অপর দ্রব্য হইতে বিশিষ্ট) দ্রব্যের পুরুষসংস্কারজনিত অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবিশেষজনিত সংসর্গ "ভূয়স্ত্ব"। যেহেতু প্রকর্ষ অর্থে "ভূয়স্ত্ব" শব্দ দৃষ্ট হয়; যেমন প্রকৃষ্ট বিষয় ভূয়ান্ এইরূপ কথিত হয়। (তাৎপর্য্য) যেমন জীবের অদৃষ্টবশতঃ বিষ, ওষধি ও মণি প্রভৃতি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয়, সমস্ত দ্রব্য সর্ব্ব-প্রয়োজন-সাধক হয় না, তদ্রূপ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ বিষয়গ্রহণে সমর্থ হইয়াই উৎপন্ন হয়, সমস্ত বিষয়গ্রহণে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিব, রসনেন্দ্রিয়ই জলীয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই তৈজস, এবং ত্বগিন্দ্রিয়ই বায়বীয়—এইরূপ ব্যবস্থার বোধক কি ? এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ভূয়স্ত্ববশতঃ সেই ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। পুরুষার্থসম্পাদনসমর্থ এবং দ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষের অদৃষ্টবিশেষজনিত যে সংসর্গ, তাহাকেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন—"ভূয়স্ত্ব," এবং উহাকেই বলিয়াছেন—প্রকর্ষ। প্রকৃষ্ট বিষয়কে "ভূয়ান্" এইরূপ বলা হয়, সুতরাং "ভূয়স্ত্ব" শব্দের দ্বারা প্রকর্ষ অর্থ বুঝা যায়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গন্ধের প্রত্যক্ষরূপ পুরুষার্থসম্পাদনসমর্থ এবং দ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে পার্থিব দ্রব্যের সংসর্গ আছে, ঐ সংসর্গ জীবের গন্ধগ্রহণজনক অদৃষ্টবিশেষজনিত, উহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পার্থিব দ্রব্যের ভূয়স্ত্ব বা প্রকর্ষ, তৎপ্রযুক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, ইহা সিদ্ধ হয়। এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়ে যথাক্রমে রসাদির প্রত্যক্ষরূপ পুরুষার্থসম্পাদনসমর্থ এবং দ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে জলাদি দ্রব্যের সংসর্গ আছে, উহা জীবের রসাদি-প্রত্যক্ষজনক অদৃষ্টবিশেষজনিত, উহাই রসনাদি ইন্দ্রিয়ে জলাদি দ্রব্যের ভূয়স্ত্ব বা প্রকর্ষ, তৎপ্রযুক্তই ঐ রসনাদি ইন্দ্রিয়ত্রয় যথাক্রমে জলীয়, তৈজস, ও বায়বীয়—ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "ভূয়স্ত্ব" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমস্ত দ্রব্যই সমস্ত প্রয়োজনের সাধক হয় না। জীবের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনসম্পাদনে সমর্থ হয়। বিষ, মণি ও ওষধি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন জীবের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ও গন্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গ্রহণে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়-গ্রহণে উহাদিগের সামর্থ্য নাই। অদৃষ্টবিশেষই ইহার মূল। ঐ অদৃষ্টবিশেষজনিত পূর্ব্বোক্ত ভূয়স্ত্ববশতঃ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের পার্থিবত্বাদি নিয়ম বুঝা যায়, উহা অমূলক নহে ॥৬৯॥

ভাষ্য। স্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্দ্রিয়াণি কস্মাদিতি চেৎ ?

অনুবাদ। (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ স্বগত গুণকে উপলব্ধি করে না কেন, ইহা যদি বল ?

সূত্র। সগুণানামিন্দ্রিয়ভাবাৎ ॥৭০॥২৬৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু স্বগুণ অর্থাৎ গন্ধাদিগুণ-সহিত ঘ্রাণাদিরই ইন্দ্রিয়ত্ব।

ভাষ্য। স্বান্ গন্ধাদীন্নোপলভন্তে ঘ্রাণাদীনি। কেন কারণেনেতি চেৎ ? স্বগুণৈঃ সহ ঘ্রাণাদীনামিন্দ্রিয়ভাবাৎ। ঘ্রাণং স্বেন গন্ধেন সমানার্থকারিণা সহ বাহ্যং গন্ধং গৃহ্লাতি, তস্য স্বগন্ধগ্রহণং সহকারিবৈকল্যান্ন ভবতি, এবং শেষাণামপি।

অনুবাদ। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় গন্ধাদিকে উপলব্ধি করে না। (প্রশ্ন) কি কারণপ্রযুক্ত, ইহা যদি বল? (উত্তর) যেহেতু ঘ্রাণাদির স্বকীয় গুণের (গন্ধাদির) সহিত ইন্দ্রিয়ত্ব আছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমানার্থকারী (একপ্রয়োজন-সাধক) স্বকীয় গন্ধের সহিত বাহ্য গন্ধ গ্রহণ করে, অর্থাৎ গন্ধ-সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপর বাহ্য গন্ধের গ্রাহক হয়, সহকারি-কারণের অভাববশতঃ সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক স্বকীয় গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শেষ অর্থাৎ রসনাদি ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃকও (স্বকীয় রসাদির প্রত্যক্ষ জন্মে না)।

টিপ্পনী। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় অন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ জন্মায়, কিন্তু স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, স্বকীয় গন্ধাদি-গুণ-সহিত ঘ্রাণাদিই ইন্দ্রিয়। কেবল ঘ্রাণাদি দ্রব্যের ইন্দ্রিয়ত্ব নাই। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে গন্ধাদি গুণ না থাকিলে, ঐ ঘ্রাণাদি অন্য দ্রব্যের গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষে ঐ ঘ্রাণাদি-গত গন্ধাদি সমানার্থকারী, অর্থাৎ সহকারী কারণ। কিন্তু ঘ্রাণাদিগত গন্ধাদি নিজের প্রত্যক্ষে সহকারী কারণ হইতে পারে না। পরসূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে। সুতরাং সহকারী কারণ না থাকায়, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের করণ হইলেও, ভাষ্যকার এখানে ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া "গন্ধং গৃহ্লাতি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। করণে কর্ত্তৃত্বের উপচারবশতঃ ভাষ্যকার অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। নব্যগ্রন্থকারও ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা "গৃহ্লাতি চক্ষুঃ সম্বন্ধাদালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ"—ভাষাপরিচ্ছেদ ॥ ৭০ ॥

ভাষ্য। যদি পুনর্গন্ধঃ সহকারী চ স্যাদ্‌ঘ্রাণস্য, গ্রাহ্যশ্চৈত্যত আহ—

অনুবাদ। গন্ধ যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহকারীই হয়, তাহা হইলে গ্রাহ্যও হউক? এই জন্য অর্থাৎ এই আপত্তি নিরাসের জন্য (পরবর্ত্তি-সূত্র) বলিতেছেন।

সূত্র। তেনৈব তস্যাগ্রহণাচ্চ ॥৭১॥২৬৯॥

অনুবাদ। এবং যেহেতু তদ্দ্বারাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না।

ভাষ্য। ন স্বগুণোপলব্ধিরিন্দ্রিয়াণাং। যো ব্রূতে যথা বাহ্যং দ্রব্যং চক্ষুষা গৃহ্যতে তথা তেনৈব চক্ষুষা তদেব চক্ষুর্গৃহ্যতামিতি তাদৃগিদং, তুল্যো হ্যুভয়ত্র প্রতিপত্তি-হেত্বভাব ইতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ঘ্রাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। যিনি বলেন—"যেমন বাহ্য দ্রব্য চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয়, তদ্রূপ সেই

চক্ষুর দ্বারাই সেই চক্ষুই গৃহীত হউক ?” ইহা তদ্রূপ, অর্থাৎ এই আপত্তির ন্যায় পূর্ব্বোক্ত আপত্তিও হইতে পারে না, যেহেতু উভয় স্থলেই জ্ঞানের কারণের অভাব তুল্য।

টিপ্পনী। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ ঘ্রাণাদিগত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? ঐ গন্ধাদি ঘ্রাণাদির সহকারী হইলে, তাহার গ্রাহ্য কেন হইবে না ? এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার বলিয়াছেন যে, তদ্দ্বারাই তাহার জ্ঞান হয় না, এজন্য ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ভাষ্যকার সূত্র-তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে গন্ধাদি গুণসহিত ঘ্রাণাদি-কেই ইন্দ্রিয় বলিয়া ঘ্রাণাদিগত গন্ধাদিও যে ঐ ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় নিজের স্বরূপের গ্রাহক হইতে না পারায়, তদ্‌গত গন্ধাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি করা যায় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রাহক হয় না। তাহা হইলে যে চক্ষুর দ্বারা বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই চক্ষুর দ্বারা সেই চক্ষুরই প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? এইরূপ আপত্তি না হওয়ার কারণ কি ? যদি বল, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ কখনও দেখা যায় না, সুতরাং তাহার কারণ নাই, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বগত গন্ধাদি-গুণের প্রত্যক্ষও কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং তাহারও কারণ নাই, ইহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের আপত্তির ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়গত গন্ধাদিগুণের প্রত্যক্ষের আপত্তিও কারণাভাবে নিরস্ত হয়। প্রত্যক্ষের কারণের অভাব উভয় স্থলেই তুল্য। বস্তুতঃ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে উদ্ভূত গন্ধাদি না থাকায়, ঐ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ উদ্ভূত গন্ধাদিই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে ॥৭১॥

সূত্র। ন শব্দগুণোপলব্ধেঃ ॥৭২॥২৭০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বগতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলা যায় না, যেহেতু শব্দরূপ গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। স্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্দ্রিয়াণীতি এতন্ন ভবতি। উপলভ্যতে হি স্বগুণঃ শব্দঃ শ্রোত্রেণেতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় গুণকে প্রত্যক্ষ করে না, ইহা হয় না, অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক স্বকীয় গুণ শব্দ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ হয় না, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বলা যায় না। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক, শব্দ আকাশের গুণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বগত শব্দেরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ স্বগত-গুণের প্রত্যক্ষের করণ হয় না, ইহা বলা যাইতে পারে না॥ ৭২॥

সূত্র। তদুপলব্ধিরিতরেতরদ্রব্যগুণবৈধর্ম্ম্যাৎ॥

॥৭৩॥২৭১॥

অনুবাদ। (উত্তর) ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের বৈধর্ম্ম্যবশতঃ তাহার (শব্দরূপ গুণের) প্রত্যক্ষ হয়।

ভাষ্য। ন শব্দেন গুণেন সগুণমাকাশমিন্দ্রিয়ং ভবতি। ন শব্দঃ শব্দস্য ব্যঞ্জকঃ, ন চ ঘ্রাণাদীনাং স্বগুণগ্রহণং প্রত্যক্ষং, নাপ্যনুমীয়তে, অনুমীয়তে তু শ্রোত্রেণাকাশেন শব্দস্য গ্রহণং শব্দগুণত্বঞ্চাকাশস্যেতি। পরিশেষশ্চানুমানং বেদিতব্যং। আত্মা তাবৎ শ্রোতা, ন করণং, মনসঃ শ্রোত্রত্বে বধিরত্বাভাবঃ, পৃথিব্যাদীনাং ঘ্রাণাদিভাবে সামর্থ্যং, শ্রোত্রভাবে চাসামর্থ্যং। অস্তি চেদং শ্রোত্রং, আকাশঞ্চ শিষ্যতে, পরিশেষাদাকাশং শ্রোত্রমিতি।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্যাদ্যমাহ্নিকং॥

অনুবাদ। শব্দগুণ হইতে অভিন্নগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দরূপ গুণযুক্ত আকাশ ইন্দ্রিয় নহে। শব্দ শব্দের ব্যঞ্জক নহে। এবং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের স্বকীয় গুণের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ নহে, অনুমিতও হয় না, কিন্তু আকাশরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ ও আকাশের শব্দরূপ গুণবত্ত্ব অনুমিত হয়। "পরিশেষ" অনুমানই জানিবে। (যথা)—আত্মা শ্রবণের কর্ত্তা, করণ নহে, মনের শ্রোত্রত্ব হইলে বধিরত্বের অভাব হয়। পৃথিব্যাদির ঘ্রাণাদিভাবে সামর্থ্য আছে, শ্রোত্রভাবে সামর্থ্যই নাই। কিন্তু এই শ্রোত্র আছে, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। আকাশই অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ আকাশের শ্রবণেন্দ্রিয়ত্বের বাধক কোন প্রমাণ নাই, (সুতরাং) পরিশেষ অনুমানবশতঃ আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, ইহা সিদ্ধ হয়।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত॥

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বগত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বগত শব্দের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে পারে। কারণ, সমস্ত দ্রব্য ও সমস্ত গুণই এক প্রকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য আছে। ঘ্রাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্য হইতে এবং উহাদিগের স্বকীয় গুণ গন্ধাদি হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ দ্রব্য এবং তাহার স্বকীয় গুণ শব্দের বৈধর্ম্ম্য থাকায়, শ্রবণেন্দ্রিয় স্বকীয় শব্দের গ্রাহক হইতে পারে। ভাষ্যকার এই বৈধর্ম্ম্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আকাশ স্বকীয় গুণযুক্ত হইয়াই, অর্থাৎ শব্দাত্মক গুণের সহিতই, ইন্দ্রিয় নহে। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্বগত শব্দ, শব্দের প্রত্যক্ষে কারণ হয় না। আকাশ-রূপ শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্য, সুতরাং শব্দোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই উহা বিদ্যমান আছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দ উৎপন্ন হইলে সেই শব্দেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ শব্দ ঐ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে না পারায়, ঐ শব্দ-সহিত আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয় নহে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন শব্দ ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্বরূপ না হওয়ায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বকীয় গুণ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়স্থ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে ঘ্রাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ হওয়ায়, ঘ্রাণাদির দ্বারা স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয় স্বকীয় গুণের গ্রাহক হয় না, এই যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, তাহা ঘ্রাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার মহর্ষির কথা সমর্থন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদিগত গন্ধাদিগুণের প্রত্যক্ষবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধও নহে, অনুমানসিদ্ধও নহে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে স্বগত-শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এবং শব্দ যে আকাশেরই গুণ, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে। ভাষ্যকার ঐ বিষয়ে "পরিশেষ" অনুমান অর্থাৎ মহর্ষি গোতমোক্ত "শেষবৎ" অনুমান প্রদর্শন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, আত্মা শব্দশ্রবণের কর্ত্তা, সুতরাং তাহা শব্দশ্রবণের করণ নহে। মন নিত্য পদার্থ, সুতরাং মনকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলিলে, জীবমাত্রেরই শ্রবণেন্দ্রিয় সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায়, বধির কেহই থাকে না। পৃথিব্যাদি-ভূতচতুষ্টয় ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়েরই প্রকৃতিরূপে সিদ্ধ, সুতরাং উহাদিগের শ্রোত্রভাবে সামর্থ্যই নাই। সুতরাং অবশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, ইহা সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন ঐ শব্দ-প্রত্যক্ষের অবশ্য কোন করণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য, উহার নামই শ্রোত্র। কিন্তু আত্মা, মন এবং পৃথিব্যাদি আর কোন পদার্থকেই শব্দ-প্রত্যক্ষের করণ বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। অন্য কোন পদার্থই শব্দ-প্রত্যক্ষের করণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে, অবশিষ্ট আকাশই শ্রোত্র, ইহা "পরিশেষ" অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়॥ ৭৩॥

অর্থপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত॥

———o———

দ্বিতীয় আহ্নিক

ভাষ্য। পরীক্ষিতানীন্দ্রিয়াণ্যর্থাশ্চ, বুদ্ধেরিদানীং পরীক্ষাক্রমঃ। সা কিমনিত্যা নিত্যা বেতি। কুতঃ সংশয়ঃ ?

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়সমূহ ও অর্থসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির পরীক্ষার স্থান। (সংশয়) সেই বুদ্ধি কি অনিত্য অথবা নিত্য ? (প্রশ্ন) সংশয় কেন, অর্থাৎ ঐ সংশয়ের হেতু কি ?

সূত্র। কর্ম্মাকাশসাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়ঃ ॥১॥২৭২॥

অনুবাদ। (উত্তর) কর্ম্ম ও আকাশের সমানধর্ম্মপ্রযুক্ত সংশয় হয়, [অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ কর্ম্ম ও নিত্যপদার্থ আকাশের সমান ধর্ম্ম স্পর্শশূন্যতা প্রভৃতি বুদ্ধিতে আছে, তৎপ্রযুক্ত "বুদ্ধি কি অনিত্য, অথবা নিত্য ?" এইরূপ সংশয় জন্মে]।

ভাষ্য। অস্পর্শবত্ত্বং তাভ্যাং সমানো ধর্ম্ম উপলভ্যতে বুদ্ধৌ, বিশেষশ্চোপজনাপায়ধর্ম্মবত্ত্বং বিপর্য্যয়শ্চ যথাস্বমনিত্যনিত্যয়োস্তস্যাং বুদ্ধৌ নোপলভ্যতে, তেন সংশয় ইতি।

অনুবাদ। সেই উভয়ের অর্থাৎ সূত্রোক্ত কর্ম্ম ও আকাশের সমান ধর্ম্ম স্পর্শ-শূন্যতা, বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, এবং উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মবত্ত্বরূপ বিশেষ এবং অনিত্য ও নিত্য পদার্থের যথাযথ বিপর্য্যয়, অর্থাৎ নিত্যত্ব, অথবা অনিত্যত্ব, বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয় না, সুতরাং (পূর্ব্বোক্তরূপ) সংশয় হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে যথাক্রমে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ—এই চতুর্ব্বিধ প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়া, দ্বিতীয় আহ্নিকে যথাক্রমে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা করিয়াছেন। বুদ্ধি-পরীক্ষায় ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা ও অর্থ-পরীক্ষা আবশ্যক, ইন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্য অর্থের তত্ত্ব না জানিলে, বুদ্ধির তত্ত্ব বুঝা যায় না, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অর্থের পরীক্ষার পরেই মহর্ষির বুদ্ধির পরীক্ষা সঙ্গত। ভাষ্যকার এই সঙ্গতি সূচনার জন্যই এখানে প্রথমে "ইন্দ্রিয় ও অর্থ পরীক্ষিত হইয়াছে", ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যে "পরীক্ষাক্রমঃ" এই স্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার "ক্রম" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, স্থান।

সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন আবশ্যক, এজন্য ভাষ্যকার ঐ বুদ্ধি কি অনিত্য ? অথবা নিত্য ?—এইরূপ

১। যথাস্বস্তু যথাযথং।—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ ॥৪৩॥

সংশয় প্রদর্শন করিয়া, ঐ সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিতে মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় সংশয়ের এক প্রকার কারণ, ইহা প্রথম অধ্যায়ে সংশয়লক্ষণসূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন। অনিত্য পদার্থ কর্ম্ম এবং নিত্য পদার্থ আকাশ, এই উভয়েই স্পর্শ না থাকায়, স্পর্শশূন্যতা ঐ উভয়ের সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্ম। বুদ্ধিতেও স্পর্শ না থাকায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অনিত্য ও নিত্য পদার্থের সমান ধর্ম্ম স্পর্শশূন্যতার নিশ্চয়জন্য বুদ্ধি কি অনিত্য? অথবা নিত্য? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলেও, যদি বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় অথবা সংশয়বিষয়ীভূত ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কোন একটির বিপর্য্যয় অর্থাৎ অভাবের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয় হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিতে উৎপত্তি বা বিনাশধর্ম্মরূপ বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় নাই, এবং অনিত্য ও নিত্য পদার্থের স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয়ও নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের বাধক না থাকায়, পূর্ব্বোক্ত সমান ধর্ম্মের নিশ্চয়জন্য বুদ্ধি অনিত্য কি নিত্য?—এইরূপ সংশয় হয়। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত কারণজন্য বুদ্ধিবিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্য। অনুপপন্নরূপঃ খল্বয়ং সংশয়ঃ, সর্ব্বশরীরিণাং হি প্রত্যাত্মবেদনীয়া অনিত্যা বুদ্ধিঃ সুখাদিবৎ। ভবতি চ সংবিত্তির্জ্ঞাস্যামি, জানামি অজ্ঞাসিষমিতি, ন চোপজনাপায়াবন্তরেণ ত্রৈকাল্যব্যক্তিঃ, ততশ্চ ত্রৈকাল্যব্যক্তেরনিত্যা বুদ্ধিরিত্যেতৎ সিদ্ধং। প্রমাণসিদ্ধঞ্চেদং শাস্ত্রেঽপ্যুক্ত-"মিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং" "যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গ"মিত্যেবমাদি। তস্মাৎ সংশয়প্রক্রিয়ানুপপত্তিরিতি।

দৃষ্টিপ্রবাদোপালম্ভার্থন্তু প্রকরণং, এবং হি পশ্যন্তঃ প্রবদন্তি সাংখ্যাঃ পুরুষস্যান্তঃকরণভূতা নিত্যা বুদ্ধিরিতি। সাধনঞ্চ প্রচক্ষতে—

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এই সংশয় অনুপপন্নরূপই, (অর্থাৎ বুদ্ধি অনিত্য কি নিত্য? এই সংশয়ের স্বরূপই উপপন্ন হয় না—উহা জন্মিতেই পারে না,) যেহেতু বুদ্ধি সুখাদির ন্যায় অনিত্য বলিয়া সর্ব্বজীবের প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ জীবমাত্র প্রত্যেকেই বুদ্ধি বা জ্ঞানকে সুখদুঃখাদির ন্যায় অনিত্য বলিয়াই অনুভব করে। এবং "জানিব", "জানিতেছি", "জানিয়াছিলাম"—এইরূপ সংবিত্তি (মানস অনুভব) জন্মে। কিন্তু (বুদ্ধির) উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত (ঐ বুদ্ধিতে) ত্রৈকাল্যের (অতীতাদিকালত্রয়ের) ব্যক্তি (বোধ) হয় না, সেই ত্রৈকাল্যের বোধবশতঃও বুদ্ধি অনিত্য, ইহা সিদ্ধ আছে। এবং প্রমাণসিদ্ধ, ইহা (বুদ্ধির অনিত্যত্ব) শাস্ত্রেও (এই ন্যায়দর্শনেও) উক্ত হইয়াছে, (যথা) "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন", "যুগপৎ

জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ” ইত্যাদি (১ম অঃ, ১ম আঃ ।৪।১৬।) অতএব সংশয়প্রক্রিয়ার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়ের উপপত্তি হয় না। (উত্তর) কিন্তু “দৃষ্টিপ্রবাদের” অর্থাৎ সাংখ্যদৃষ্টি বা সাংখ্যদর্শনের মতবিশেষের খণ্ডনের জন্য প্রকরণ [অর্থাৎ মহর্ষি বুদ্ধিবিষয়ে সাংখ্য-মত খণ্ডনের জন্যই এই প্রকরণটি বলিয়াছেন]। যেহেতু সাংখ্য-সম্প্রদায় এইরূপ দর্শন করতঃ (বিচার দ্বারা নির্ণয় করতঃ) পুরুষের অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য, ইহা বলেন, (তদ্বিষয়ে) সাধনও অর্থাৎ হেতু বা অনুমানপ্রমাণও বলেন।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া, পরে নিজে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি-বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। কারণ, বুদ্ধি বলিতে এখানে জ্ঞান। বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ, ইহা মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১ম আঃ, ১৫শ সূত্রে) বলিয়াছেন। ক্রমানুসারে ঐ বুদ্ধি বা জ্ঞানই এখানে মহর্ষির পরীক্ষণীয়। ঐ বুদ্ধি বা জ্ঞান সুখ-দুঃখাদির ন্যায় অনিত্য, ইহা সর্ব্বজীবের অনুভবসিদ্ধ। এবং “আমি জানিব”, “আমি জানিতেছি”, “আমি জানিয়াছিলাম” এইরূপে ঐ বুদ্ধিতে ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালত্রয়ের বোধও হইয়া থাকে। বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকিলে, তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপে কালত্রয়ের বোধ হইতে পারে না। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাকে ভবিষ্যৎ বলিয়া এবং যাহার ধ্বংস নাই, তাহাকে অতীত বলিয়া ঐরূপ যথার্থ বোধ হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিতে পূর্ব্বোক্তরূপে কালত্রয়ের বোধ হওয়ায়, বুদ্ধি যে অনিত্য, ইহা সিদ্ধই আছে। এবং মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন বলিয়া, ঐ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা অনিত্য, ইহা বলিয়াছেন। এবং “যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ”—এই কথা বলিয়া জ্ঞানের যে বিভিন্ন কালে উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা অনিত্য, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ এই তত্ত্ব মহর্ষি নিজে এই শাস্ত্রেও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুভব ও শাস্ত্র দ্বারা যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব নিশ্চিত, তাহাতে অনিত্যত্বের সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সমানধর্ম্মনিশ্চয়াদি কোন কারণেই আর সেখানে সংশয় জন্মে না। সুতরাং মহর্ষি এই সূত্রে যে সংশয়ের সূচনা করিয়াছেন, তাহা উপপন্ন হয় না।

তবে মহর্ষি ঐ সংশয় নিরাস করিতে এখানে এই প্রকরণটি কিরূপে বলিয়াছেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার তাঁহার নিজের মত বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সম্প্রদায় পুরুষের অন্তঃকরণকেই বুদ্ধি বলিয়া তাহাকে যে নিত্য বলিয়াছেন এবং তাহার নিত্যত্ব-বিষয়ে যে সাধনও বলিয়াছেন, তাহার খণ্ডনের জন্যই মহর্ষি এখানে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন। যদিও সাংখ্য-মতেও বুদ্ধির আবির্ভাব ও তিরো-ভাব থাকায়, বুদ্ধি অনিত্য। “প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যং”—এই (৫।৭২) সাংখ্যসূত্রের দ্বারা এবং ‘হেতুমদনিত্যমব্যাপি”-ইত্যাদি (১০ম) সাংখ্যকারিকার দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে। তথাপি সাংখ্য-মতে অন্তঃকরণের নামই বুদ্ধি। প্রলয়কালেও মূলপ্রকৃতিতে উহার

অস্তিত্ব থাকে। উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া, উহার অনিত্যত্ব কথিত হইলেও, সাংখ্যমতে অসতের উৎপত্তি ও সতের অত্যন্ত বিনাশ না থাকায়, ঐ অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধিরও যে কোনরূপে সর্ব্বদা সত্তারূপ নিত্যত্বই এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার এখানে সাংখ্যসম্মত বুদ্ধির পূর্ব্বোক্তরূপ নিত্যত্বই এই প্রকরণের দ্বারা মহর্ষির খণ্ডনীয় বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এখানে সূত্রকারোক্ত সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থন করিলেও, মহর্ষি যে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের পরীক্ষার জন্যই এই সূত্রের দ্বারা সেই বুদ্ধিবিষয়েই কোন সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না। বিচার মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক। তাই মহর্ষি বুদ্ধিবিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় সূচনা করিয়াছেন। সংশয়ের বাধক থাকিলেও, বিচারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সংশয় (আহার্য্য সংশয়) করিতে হয়, ইহাও মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিতে পারেন। তাই মনে হয়, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়াই এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা এখানে উক্তরূপ সংশয়ের কোন বাধকের উল্লেখ করেন নাই।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা ও সমাধানের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, যে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে মনের দ্বারাই বুঝা যায়, যাহাকে সাংখ্য-সম্প্রদায় বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়াছেন, তাহার অনিত্যত্ব সাংখ্য-সম্প্রদায়েরও সম্মত। সুতরাং তাহার অনিত্যত্ব সংশয় কাহারই হইতে পারে না। পরন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায় যে বুদ্ধিকে মহৎ ও অন্তঃকরণ বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব-বিষয়েই বিবাদ থাকায়, তাহাতেও নিত্যত্বাদি সংশয় বা নিত্যত্বাদি বিচার হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্মী অসিদ্ধ হইলে, তাহার ধর্ম্মবিষয়ে কোন সংশয় বা বিচার হইতেই পারে না। সুতরাং এই প্রকরণের দ্বারা বুদ্ধির নিত্যত্বাদি বিচারই মহর্ষির মূল উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ঐ বিচারের দ্বারা জ্ঞান হইতে বুদ্ধি যে পৃথক্ পদার্থ, অর্থাৎ বুদ্ধি বলিতে অন্তঃকরণ; জ্ঞান তাহারই বৃত্তি, অর্থাৎ পরিণাম-বিশেষ, এই সাংখ্য-মত নিরস্ত করাই মহর্ষির মূল উদ্দেশ্য। বুদ্ধির নিত্যত্ব-সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিলে, জ্ঞানকেই বুদ্ধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধির কোনই ভেদ সিদ্ধ না হইলে, মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইবে। তাই মহর্ষি এখানে উক্ত গূঢ় উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিতেই সামান্যতঃ বুদ্ধির নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার করিয়া অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "দৃষ্টিপ্রবাদোপালম্ভার্থস্তু প্রকরণং।"

এখানে সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই কেবল "দৃষ্টি" শব্দই আছে, "সাংখ্য-দৃষ্টি" এইরূপ স্পষ্টার্থ-বোধক শব্দ প্রয়োগ নাই, কিন্তু ভাষ্যকার যে ঐরূপই প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহাও মনে আসে। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের শেষোক্ত "এবং হি পশ্যন্তঃ প্রবদন্তি সাংখ্যাঃ" এই ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারাও সাংখ্য-দৃষ্টি বা সাংখ্যদর্শনই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এবং সাংখ্য-সম্প্রদায় যে দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শনরূপ জ্ঞানবিশেষপ্রযুক্ত "বুদ্ধি নিত্য" এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ "প্রবাদ" অর্থাৎ বাক্যের "উপালম্ভ" অর্থাৎ খণ্ডনের জন্যই মহর্ষির এই প্রকরণ, এইরূপ অর্থও

উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায়ের বাক্যখণ্ডন না বলিয়া, মতখণ্ডন বলাই সমুচিত। সুতরাং ভাষ্যে "প্রবাদ" শব্দের দ্বারা এখানে মতবিশেষ বা সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়। ভাষ্যকার ইহার পূর্ব্বেও (এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৬৮ম সূত্রের পূর্ব্বভাষ্যে) মতবিশেষ অর্থেই "প্রবাদ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "প্রবাদ" শব্দ যে মতবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইত, ইহা আমরা "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে মহামনীষী ভর্ত্তৃহরির প্রয়োগের দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি[১]। তাহা হইলে "দৃষ্টি" অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্য-শাস্ত্রের যে "প্রবাদ" অর্থাৎ মতবিশেষ, তাহার খণ্ডনের জন্যই মহর্ষির এই প্রকরণ, ইহাই ভাষ্যকারের উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। অবশ্য এখানে সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের জ্ঞানবিশেষকেও সাংখ্যদৃষ্টি বলিয়া বুঝা যাইতে পারে, জ্ঞানবিশেষ অর্থেও "দৃষ্টি" ও "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও ঐরূপ অর্থে "দৃষ্টি" বুঝাইতে "দিট্‌ঠি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পরন্তু পরবর্ত্তী ৩৪শ সূত্রের ভাষ্যারম্ভে ভাষ্যকারের "কস্যচিদ্দর্শনং" এবং এই সূত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরের "পরস্য দর্শনং" এবং চতুর্থ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষে ভাষ্যকারের "অন্যোন্য-প্রত্যনীকানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি" ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন কালে যে মত বা সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থেও "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারাও মতবিশেষ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে যখন পৃথক্ করিয়া "প্রবাদ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারা তিনি এখানে সাংখ্য-শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হয়। নচেৎ "প্রবাদ' শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কোন প্রয়োজন বুঝা যায় না। সুপ্রাচীন কালেও বাক্যবিশেষ বা শাস্ত্রবিশেষ বুঝাইতেও "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে "অস্ত্যাত্মা ইত্যেকং দর্শনং" এই প্রয়োগে বাক্যবিশেষ অর্থেই 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (১ম খণ্ড, ২১৩—১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বাক্যবিশেষ বা শাস্ত্রবিশেষ অর্থে "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন[২]। সেখানে 'কিরণাবলী'কার উদয়নাচার্য্য এবং "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্টও "দর্শন" শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শারীরক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও (২য় অঃ, ১ম ও ২য় পাদে) "ঔপনিষদং দর্শনং", "বৈদিকস্য দর্শনস্য", "অসমঞ্জসমিদং দর্শনং", ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্রবিশেষকেই 'দর্শন" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র সর্ব্বশেষে উদয়নাচার্য্য "ন্যায়দর্শনোপসংহারঃ" এই বাক্যে ন্যায়-শাস্ত্রকেই "ন্যায়দর্শন" বলিয়াছেন। ফলকথা, যদি ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও প্রশস্তপাদ

১। "তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ" ।—বাক্যপদীয়। ৮।

২। ত্রয়ীদর্শনবিপরীতেষু শাক্যাদি-দর্শনেম্বিদং শ্রেয় ইতি মিথ্যা-প্রত্যয়ঃ। (প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, কন্দলী-সহিত কাশী-সংস্করণ, ১৭৭পৃঃ)। দৃশ্যতে স্বর্গাপবর্গসাধনভূতোঽর্থোঽনয়া ইতি দর্শনং, ত্রয্যেব দর্শনং ত্রয়ী দর্শনং, তদ্বিপরীতেষু শাক্যাদি-দর্শনেষু শাক্যভিক্ষুক-নিগ্রন্থক-সংসারমোচকাদি-শাস্ত্রেষু। কন্দলী, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

প্রভৃতি প্রাচীনগণের প্রয়োগের দ্বারা বাক্য বা শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীনকালে "দর্শন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থে "দৃষ্টি" শব্দেরও প্রয়োগ স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারা আমরা তাৎপর্য্যানুসারে সাংখ্যশাস্ত্রও বুঝিতে পারি। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত "দৃষ্টি" শব্দের প্রকৃতার্থ বিচার করিবেন।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ন্যায়-মতে আকাশ নিত্য পদার্থ, ইহাই সম্প্রদায়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। কারণ, কর্ম্মের ন্যায় আকাশও অনিত্য পদার্থ হইলে, কর্ম্ম ও আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত বুদ্ধি কি নিত্য? অথবা অনিত্য? এইরূপ সংশয় হইতে পারে না। মহর্ষি তাহা বলিতে পারেন না। কিন্তু মহর্ষি যখন এই সূত্রে কর্ম্ম ও আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত বুদ্ধির নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়, তখন তাঁহার মতে আকাশ কর্ম্মের ন্যায় অনিত্য পদার্থ নহে, কিন্তু নিত্য, ইহা বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে (২৮শ সূত্র ভাষ্যে) ন্যায়মতানুসারে আকাশের নিত্যত্বসিদ্ধান্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং এখন কেহ কেহ যে ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের দ্বারাও বেদান্ত-মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা সার্থক হইতে পারে না ॥১॥

সূত্র। বিষয়-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥২॥২৭৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যেহেতু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা হয় (অতএব ঐ জ্ঞানের আশ্রয় অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য)।

ভাষ্য। কিং পুনরিদং প্রত্যভিজ্ঞানং? যং পূর্ব্বমজ্ঞাসিষমর্থং তমিমং জানামীতি জ্ঞানয়োঃ সমানেঽর্থে প্রতিসন্ধিজ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানং, এতচ্চাবস্থিতায়া বুদ্ধেরুপপন্নং। নানাত্বে তু বুদ্ধিভেদেষূৎপন্নাপবর্গিষু প্রত্যভিজ্ঞানানুপপত্তিঃ, নান্যজ্ঞাতমন্যঃ প্রত্যভিজানাতীতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই প্রত্যভিজ্ঞান কি? (উত্তর) "যে পদার্থকে পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম, সেই এই পদার্থকে জানিতেছি" এইরূপে জ্ঞানদ্বয়ের এক পদার্থের প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, ইহা কিন্তু অবস্থিত বুদ্ধির সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী একপদার্থ হইলেই, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষ জন্মিতে পারে। কিন্তু নানাত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির ভেদ হইলে, উৎপন্নাপবর্গী অর্থাৎ যাহারা উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এমন

বুদ্ধিভেদগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না, (কারণ) অন্যের জ্ঞাত বস্তু অন্য ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করে না।

টিপ্পনী। সাংখ্য-মতে অন্তঃকরণের নামান্তর বুদ্ধি। উহা সাংখ্য-সম্মত মূলপ্রকৃতির প্রথম পরিণাম। ঐ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ প্রত্যেক পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন শরীরের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি আছে; উহাই কর্ত্তা, উহা জড়পদার্থ হইলেও, কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞান-সুখাদি উহারই বৃত্তি বা পরিণামরূপ ধর্ম্ম। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই চেতন পদার্থ। উহা কূটস্থ নিত্য, অর্থাৎ উহার কোন প্রকার পরিণাম নাই, এজন্য কর্ত্তৃত্বাদি উহার ধর্ম্ম হইতে পারে না; ঐ পুরুষ অকর্ত্তা, উহার শরীরমধ্যগত অন্তঃকরণই কর্ত্তা এবং তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে। কালবিশেষে ঐ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির মূলপ্রকৃতিতে লয় হয়, কিন্তু উহার আত্যন্তিক বিনাশ নাই। মুক্ত পুরুষের বুদ্ধিতত্ত্ব মূলপ্রকৃতিতে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইলেও উহা প্রকৃতিরূপে তখনও থাকে। সাংখ্য-সম্প্রদায় এই ভাবে ঐ বুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতম এই সূত্রে সেই সাংখ্যোক্ত বুদ্ধির নিত্যত্বের সাধন বলিয়াছেন, "বিষয়প্রত্যভিজ্ঞান"। কোন একটি পদার্থকে একবার দেখিয়া পরে আবার দেখিলে, "যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আবার দেখিতেছি" ইত্যাদি প্রকারে পূর্ব্বজাত ও পরজাত সেই জ্ঞানদ্বয়ের সেই একই পদার্থে যে প্রতিসন্ধানরূপ তৃতীয় জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাকে বলে "প্রত্যভিজ্ঞান"। ইহা "প্রত্যভিজ্ঞা" নামেই বহু স্থানে কথিত হইয়াছে। বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেই ঐ প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষ জন্মে। আত্মার কোন পরিণাম অসম্ভব বলিয়া, তাহাতে জ্ঞানাদি জন্মিতে পারে না। কারণ, ঐ জ্ঞানাদি পরিণামবিশেষ। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ ঐ জ্ঞানের আশ্রয় বুদ্ধিকে অবস্থিত অর্থাৎ পূর্ব্বাপর-কালস্থায়ী বলিতেই হইবে। কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ঐ বুদ্ধি পরজাত জ্ঞানের কাল পর্য্যন্ত না থাকিলে, "যাহা আমি পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম, তাহাকে আবার জানিতেছি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। পুরুষের বুদ্ধি নানা হইলে এবং "উৎপন্নাপবর্গী" হইলে অর্থাৎ ন্যায় মতানুসারে উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় ক্ষণে অপবর্গী (বিনাশী) হইলে, তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান জন্মে, সেই বুদ্ধিই পরজাত জ্ঞানের কাল পর্য্যন্ত থাকে না, উহা তাহার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। একের জ্ঞাত বস্তু অন্য ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয় বুদ্ধির চিরস্থিরত্বই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বুদ্ধির বৃত্তি জ্ঞান হইতে ঐ বুদ্ধির পার্থক্যই সিদ্ধ হইবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের নিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে ॥২॥

সূত্র। সাধ্যসমত্বাদহেতুঃ ॥৩॥২৭৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) সাধ্যসমত্বপ্রযুক্ত অহেতু, [অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয়-প্রত্যভিজ্ঞানরূপ হেতু বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে অসিদ্ধ, সুতরাং উহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, উহা বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতুই হয় না।]

ভাষ্য। যথা খলু নিত্যত্বং বুদ্ধেঃ সাধ্যমেবং প্রত্যভিজ্ঞানমপীতি। কিংকারণং ? চেতনধর্ম্মস্য করণেঽনুপপত্তিঃ। পুরুষধর্ম্মঃ খল্বয়ং জ্ঞানং দর্শনমুপলব্ধির্ব্বোধঃ প্রত্যয়োঽধ্যবসায় ইতি। চেতনো হি পূর্ব্বজ্ঞাতমর্থং প্রত্যভিজানাতি, তস্যৈতস্মাদ্ধেতোর্নিত্যত্বং যুক্তমিতি। করণচৈতন্যাভ্যুপগমে তু চেতনস্বরূপং বচনীয়ং, নানির্দ্দিষ্টস্বরূপমাত্মান্তরং শক্যমস্তীতি প্রতিপত্তুং। জ্ঞানঞ্চেদন্তঃকরণস্যাভ্যুপগম্যতে, চেতনস্যেদানীং কিং স্বরূপং, কো ধর্ম্মঃ, কিং তত্ত্বং ? জ্ঞানেন চ বুদ্ধৌ বর্ত্তমানেনায়ং চেতনঃ কিং করোতীতি। **চেতয়ত ইতি চেৎ ? ন, জ্ঞানাদর্থান্তরবচনং।** পুরুষশ্চেতয়তে বুদ্ধির্জানাতীতি নেদং জ্ঞানাদর্থান্তরমুচ্যতে। চেতয়তে, জানীতে, পশ্যতি, উপলভতে—ইত্যেকোঽয়মর্থ ইতি। বুদ্ধির্জ্ঞাপয়তীতি চেৎ অদ্ধা, (১) জানীতে পুরুষো বুদ্ধির্জ্ঞাপয়তীতি। সত্যমেতৎ। এবঞ্চাভ্যুপগমে জ্ঞানং পুরুষস্যেতি সিদ্ধং ভবতি, ন বুদ্ধেরন্তঃকরণস্যেতি।

প্রতিপুরুষঞ্চ শব্দান্তরব্যবস্থা-প্রতিজ্ঞানে প্রতিষেধহেতু-বচনং। যশ্চ প্রতিজানীতে কশ্চিৎ পুরুষশ্চেতয়তে কশ্চিদ্‌বুধ্যতে কশ্চিদুপলভতে কশ্চিৎ পশ্যতীতি, পুরুষান্তরাণি খল্বিমানি চেতনো বোদ্ধা উপলব্ধা দ্রষ্টেতি, নৈকস্যৈতে ধর্ম্মা ইতি, অত্র কঃ প্রতিষেধহেতুরিতি। **অর্থস্যাভেদ ইতি চেৎ, সমানং।** অভিন্নার্থা এতে শব্দা ইতি তত্র ব্যবস্থানুপপত্তিরিত্যেবঞ্চেন্মন্যসে, সমানং ভবতি, পুরুষশ্চেতয়তে বুদ্ধির্জানীতে ইত্যত্রাপ্যর্থো ন ভিদ্যতে, তত্রোভয়োশ্চেতনত্বাদন্যতরলোপ ইতি। যদি পুনর্ব্বুধ্যতেঽনয়েতি বোধনং বুদ্ধির্মন এবোচ্যতে তচ্চ নিত্যং, অস্ত্বেতদেবং, নতু মনসো বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানান্নিত্যত্বং। দৃষ্টং হি করণভেদে জ্ঞাতুরেকত্বাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং—সব্যদৃষ্টস্যেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি চক্ষুর্ব্বৎ, প্রদীপবচ্চ, প্রদীপান্তরদৃষ্টস্য প্রদীপান্তরেণ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি। তস্মাজ্‌জ্ঞাতুরয়ং নিত্যত্বে হেতুরিতি।

অনুবাদ। যেমন বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধ্য, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও সাধ্য, অর্থাৎ বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে প্রত্যভিজ্ঞাকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিতে নিত্যত্বের

১। "অদ্ধা" শব্দের অর্থ তত্ত্ব বা সত্য—তত্ত্বে ত্বদ্ধাঽঞ্জসাদ্বয়ং। অমরকোষ। অব্যয়বর্গ। ৬৭।

ন্যায় সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাও সাধ্য, সুতরাং তাহা হেতু হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কারণ কি? অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রত্যভিজ্ঞা সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? (উত্তর) করণে চেতন-ধর্ম্মের অনুপপত্তি। কারণ, জ্ঞান, দর্শন, উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যয়, অধ্যবসায়, ইহা পুরুষের (চেতন আত্মার) ধর্ম্ম, চেতনই অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মাই পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থকে প্রত্যভিজ্ঞা করে, এই হেতুপ্রযুক্ত সেই চেতনের (আত্মার) নিত্যত্ব যুক্ত।

করণের চৈতন্য স্বীকার করিলে কিন্তু চেতনের স্বরূপ বলিতে হইবে; অনির্দ্দিষ্ট-স্বরূপ অর্থাৎ যাহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় না, এমন আত্মান্তর আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। বিশদার্থ এই যে—যদি জ্ঞান অন্তঃকরণের (ধর্ম্ম) স্বীকৃত হয়, (তাহা হইলে) এখন চেতনের স্বরূপ কি, ধর্ম্ম কি, তত্ত্ব কি, বুদ্ধিতে বর্ত্তমান জ্ঞানের দ্বারাই বা এই চেতন কি করে? (ইহা বলা আবশ্যক)। চেতনাবিশিষ্ট হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ বলা হয় নাই। বিশদার্থ এই যে, পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, ইহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ বলা হইতেছে না, (কারণ) (১) চেতনাবিশিষ্ট হয়, (২) জানে, (৩) দর্শন করে, (৪) উপলব্ধি করে, ইহা একই পদার্থ। বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, ইহা যদি বল? (উত্তর) সত্য। পুরুষ জানে, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, ইহা সত্য, কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে জ্ঞান পুরুষের (ধর্ম্ম), ইহাই সিদ্ধ হয়, জ্ঞান অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধির (ধর্ম্ম), ইহা সিদ্ধ হয় না।

প্রত্যেক পুরুষে শব্দান্তরব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিষেধের হেতু বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে—যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোন পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, কোন পুরুষ বোধ করে, কোন পুরুষ উপলব্ধি করে, কোন পুরুষ দর্শন করে, চেতন, বোদ্ধা, উপলব্ধা ও দ্রষ্টা, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষই, এই সমস্ত অর্থাৎ চেতনত্ব প্রভৃতি একের ধর্ম্ম নহে, এই পক্ষে অর্থাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে প্রতিষেধের হেতু কি?

অর্থের অভেদ, ইহা যদি বল? সমান। বিশদার্থ এই যে, এই সমস্ত শব্দ ("চেতন" প্রভৃতি শব্দ) অভিন্নার্থ, এ জন্য তাহাতে ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দান্তর-ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না, ইহা যদি মনে কর,—(তাহা হইলে) সমান হয়, (কারণ) পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে,—এই উভয় স্থলেও অর্থ ভিন্ন হয় না, তাহা হইলে উভয়ের চেতনত্বপ্রযুক্ত একতরের অভাব সিদ্ধ হয়।

(প্রশ্ন) যদি "ইহার দ্বারা বুঝা যায়" এই অর্থে বোধন মনকেই "বুদ্ধি" বলা যায়, তাহা ত নিত্য? (উত্তর) ইহা (মনের নিত্যত্ব) এইরূপ হউক, অর্থাৎ তাহা

আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ মনের নিত্যত্ব নহে। যেহেতু করণের অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানসাধনের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ব-প্রযুক্ত প্রত্যভিজ্ঞা দেখা যায়, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞান হওয়ায় যেমন চক্ষু, এবং যেমন প্রদীপ, প্রদীপান্তরের দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর অন্য প্রদীপের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞা—যাহা সাংখ্যসম্প্রদায় বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতু বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মারই নিত্যত্বে হেতু হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস হওয়ায় হেতুই হয় না। বুদ্ধির নিত্যত্ব যেমন সাধ্য, তদ্রূপ ঐ বুদ্ধিতে বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞানও সাধ্য; কারণ, বুদ্ধিই বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা করে, ইহা কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ নহে, সুতরাং উহা বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধন করিতে পারে না। যাহা সাধ্যের ন্যায় পক্ষে অসিদ্ধ, তাহা "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস। তাহার দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় না। বুদ্ধিতে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যাহা চেতন আত্মারই ধর্ম্ম, তাহা করণে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন অচেতন পদার্থে থাকিতে পারে না। জ্ঞান, দর্শন, উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যয়, অধ্যবসায়, চেতন আত্মারই ধর্ম্ম, চেতন আত্মাই দর্শনাদি করে, চেতন আত্মাই পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থকে প্রত্যভিজ্ঞা করে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞা চেতন আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া, ঐ হেতুবশতঃ চেতন আত্মারই নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, উহা বুদ্ধির নিত্যত্বের সাধক হইতেই পারে না।

ভাষ্যকার সূত্রতাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, পরে ন্যায়মত সমর্থনের জন্য নিজে বিচারপূর্ব্বক সাংখ্য-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণের চৈতন্য স্বীকার করিলে, চেতনের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য, চৈতন্য ও জ্ঞান যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। এখন যদি ঐ জ্ঞানকে অন্তঃকরণের ধর্ম্মই বলা হয়, তাহা হইলে ঐ অন্তঃকরণকেই চৈতন্যবিশিষ্ট বা চেতন বলিয়া স্বীকার করা হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, ঐ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন যে চেতন পুরুষ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইবে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণেই কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞান স্বীকার করিলে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জন্য সুখ-দুঃখাদিও অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম হইলে, ঐ সকল গুণের দ্বারা আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যাহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় না, এমন কোন আত্মা আছে, অর্থাৎ নির্গুণ আত্মা আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। পরন্তু এই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা ঐ চেতন পুরুষ কি করে, অর্থাৎ পরকীয় ঐ জ্ঞানের দ্বারা পুরুষের কি উপকার হয়, ইহাও বলা আবশ্যক। যদি বল, পুরুষ অন্তঃকরণস্থ ঐ জ্ঞানের দ্বারা চেতনাবিশিষ্ট হয়? কিন্তু তাহা বলিলেও স্বমত রক্ষা

হইবে না। কারণ, চেতনা বা চৈতন্য ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নহে। পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, এইরূপ বলিলে জ্ঞান হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ বলা হয় না। চেতনাবিশিষ্ট হয়, জানে, দর্শন করে, উপলব্ধি করে, ইহা একই পদার্থ। সাংখ্যাচার্য্যগণ চৈতন্য হইতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞানকে যে পৃথক্ পদার্থ বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যদি বল, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে বলিব, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, পুরুষ জানে, বুদ্ধি তাহাকে জানায়, ইহা সত্য, উহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে আমাদিগের মতানুসারে জ্ঞানকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ইহা সিদ্ধ হইবে না। কারণ, অন্তঃকরণ জ্ঞাপন করে, ইহা বলিলে, আত্মাকেই জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ আত্মাতেই জ্ঞান উৎপন্ন করে, ইহাই বলিতে হইবে। সাংখ্যসম্প্রদায় চৈতন্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াই পুরুষ বা আত্মা চেতন। তাহার অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি। জ্ঞান ঐ বুদ্ধির পরিণামবিশেষ, সুতরাং বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, চৈতন্য হইতে জ্ঞান বা বোধ ভিন্ন পদার্থ হইলে পুরুষেরও ভেদ কেন স্বীকার করিবে না ? আমি চৈতন্যবিশিষ্ট, আমি বুঝিতেছি, আমি উপলব্ধি করিতেছি, আমি দর্শন করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার অনুভবের দ্বারা পুরুষ বা আত্মাই যে ঐ বোধের কর্ত্তা বা আশ্রয়, ইহা সিদ্ধ হয়। সার্ব্বজনীন ঐ অনুভবকে বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত ভ্রম বলা যায় না। তাহা হইলে যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন পুরুষ চেতন, কোন পুরুষ বোদ্ধা, কোন পুরুষ উপলব্ধা, কোন পুরুষ দ্রষ্টা—ঐ চেতনত্ব বোদ্ধৃত্ব উপলব্ধৃত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব এক পুরুষের ধর্ম্ম নহে, পূর্ব্বোক্ত চেতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারিটি পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষে পূর্ব্বোক্ত "চেতন" প্রভৃতি চারিটি শব্দান্তর অর্থাৎ নামান্তরের ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে। যে পুরুষ চেতন, তিনি বোদ্ধা নহেন, যে পুরুষ বোদ্ধা, তিনি চেতন নহেন, ইত্যাদি প্রকার নিয়ম স্বীকার করিয়া, তাহার সাধনের জন্য কেহ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার প্রতিষেধের হেতু কি বলিবে ? যদি বল, পূর্ব্বোক্ত চেতন প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থের কোন ভেদ নাই, উহারা একার্থবোধক শব্দ, সুতরাং পুরুষে পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। এইরূপ বলিলে উহা আমার কথার সমান হইবে, অর্থাৎ পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, এই উভয় স্থলেও চেতনা ও জ্ঞানরূপ পদার্থের কোন ভেদ নাই, ইহা আমিও পূর্ব্বে বলিয়াছি। বুদ্ধিতে জ্ঞান স্বীকার করিলে, তাহাকেও চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মা ও অন্তঃকরণ, এই উভয়কেই চেতন বলিয়া স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন এবং এক দেহে দুইটি চেতন পদার্থ স্বীকার করিলে উভয়েরই কর্তৃত্ব নির্ব্বাধ হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বসম্মত চেতন আত্মাই স্বীকার্য্য, পূর্ব্বোক্তরূপ সাংখ্যসম্মত "বুদ্ধি" প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

যদি কেহ বলেন যে, "যদ্দ্বারা বুঝা যায়" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে "বুদ্ধি" শব্দের অর্থ বোধন অর্থাৎ বোধের সাধন মন,—ঐ মন এবং তাহার নিত্যত্ব ন্যায়াচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। তবে মহর্ষি গোতম এখানে বুদ্ধির নিত্যত্ব খণ্ডন করেন কিরূপে ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,

মনের নিত্যত্ব আমরাও স্বীকার করি বটে, কিন্তু সাংখ্যোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ হেতুর দ্বারা মনের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, মন জ্ঞানের করণ, মন জ্ঞাতা নহে, মনে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। মন যদি অনিত্যও হইত, কালভেদে ভিন্ন ভিন্নও হইত, তাহা হইলেও জ্ঞাতা আত্মা এক বলিয়া তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিত। কারণ, করণের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ববশতঃ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা হয় এবং যেমন এক প্রদীপের দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর অন্য প্রদীপের দ্বারাও প্রত্যভিজ্ঞা হয়। সুতরাং বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা, জ্ঞাতা আত্মার নিত্যত্বেরই সাধক হয়, উহা বুদ্ধি বা মনের নিত্যত্বের সাধক হয় না ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। যচ্চ মন্যতে বুদ্ধেরবস্থিতায়া যথাবিষয়ং বৃত্তয়ো জ্ঞানানি নিশ্চরন্তি, বৃত্তিশ্চ বৃত্তিমতো নান্যেতি, তচ্চ—

অনুবাদ। আর যে, অবস্থিত বুদ্ধি হইতে বিষয়ানুসারে জ্ঞানরূপ বৃত্তিসমূহ আবির্ভূত হয়, বৃত্তি কিন্তু বৃত্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা মনে করেন অর্থাৎ সাংখ্যসম্প্রদায় স্বীকার করেন, তাহাও—

সূত্র। ন যুগপদগ্রহণাৎ ॥৪॥২৭৫॥

অনুবাদ। না, যেহেতু একই সময়ে (সমস্ত বিষয়ের) জ্ঞান হয় না।

ভাষ্য। বৃত্তিবৃত্তিমতোরনন্যত্বে বৃত্তিমতোঽবস্থানাদ্‌বৃত্তীনামবস্থানমিতি, যানীমানি বিষয়গ্রহণানি তান্যবতিষ্ঠন্ত ইতি যুগপদ্‌বিষয়াণাং গ্রহণং প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে বৃত্তিমানের অবস্থানপ্রযুক্ত বৃত্তিসমূহের অবস্থান হয় (অর্থাৎ) এই যে সমস্ত বিষয়-জ্ঞান, সেগুলি অবস্থিতই থাকে; সুতরাং একই সময়ে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। সাংখ্যসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ অবস্থিতই থাকে, উহা হইতে জ্ঞানরূপ নানাবিধ বৃত্তি আবির্ভূত হয়; ঐ বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণেরই পরিণামবিশেষ; সুতরাং উহা বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহাও নহে। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "তচ্চ" এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তিসমূহের যদি ভেদ না থাকে, উহারা যদি বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে বৃত্তিমান্ সর্ব্বদা অবস্থিত থাকায় তাহার বৃত্তিরূপ জ্ঞানসমূহও সর্ব্বদা অবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ঐ বৃত্তিগুলি অবস্থিত বৃত্তিমান্ হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদি সমস্ত বিষয়জ্ঞানরূপ বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া সর্ব্বদাই অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান বর্ত্তমানই আছে, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানের প্রসক্তি বা আপত্তি হয়। অর্থাৎ যদি বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানসমূহ ঐ বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে একই সময়ে বা প্রতিক্ষণেই ঐ সমস্ত জ্ঞানই বর্ত্তমান থাকুক ? এইরূপ আপত্তি হয়। কিন্তু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত জ্ঞান কাহারই থাকে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য ॥ ৪ ॥

সূত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞানে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ ॥৫॥২৭৬॥

অনুবাদ। প্রত্যভিজ্ঞার অভাব হইলে কিন্তু (বুদ্ধির) বিনাশের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। অতীতে চ প্রত্যভিজ্ঞানে বৃত্তিমানপ্যতীত ইত্যন্তঃকরণস্য বিনাশঃ প্রসজ্যতে, বিপর্য্যয়ে চ নানাত্বমিতি।

অনুবাদ। প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ বৃত্তি অতীত হইলে বৃত্তিমান্‌ও অতীত হয়। এ জন্য অন্তঃকরণের বিনাশ প্রসক্ত হয়, বিপর্য্যয় হইলে কিন্তু অর্থাৎ বৃত্তি অতীত হয়, বৃত্তিমান্ অবস্থিতই থাকে, এইরূপ হইলে (বৃত্তি ও বৃত্তিমানের) নানাত্ব (ভেদ) প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। সাংখ্যসম্প্রদায়ের কথা এই যে, প্রত্যভিজ্ঞা অন্তঃকরণেরই বৃত্তি। ঐ প্রত্যভিজ্ঞা ও অন্যান্য বৃত্তিসমূহ বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ হইতেই আবির্ভূত হইয়া ঐ অন্তঃকরণেই তিরোভূত হয়। বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ অবস্থিত থাকিলেও তাহার বৃত্তিসমূহ অবস্থিত থাকে না। মহর্ষি এই পক্ষেও দোষ প্রদর্শন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে অন্তঃকরণেরও বিনাশ-প্রসঙ্গ হয়। সূত্রে "অপ্রত্যভিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা ও অন্যান্য বৃত্তিসমূহের অভাব অর্থাৎ ধ্বংসই মহর্ষির বিবক্ষিত। সাংখ্যমতে জ্ঞানাদি বৃত্তির যে তিরোভাব বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ বৃত্তিসমূহের যেরূপ অভাব হয়, বৃত্তিমানেরও সেইরূপ অভাব হইবে। বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তিসমূহ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হইলে বৃত্তির তিরোভাবে বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণের তিরোভাব কেন হইবে না ? বৃত্তি বিনষ্ট হইবে, কিন্তু বৃত্তিমান্ অবস্থিতই থাকিবে, ইহা বলিলে সে পক্ষে বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পদার্থের ভেদ থাকিলেই একের বিনাশে অপরের বিনাশের আপত্তি হইতে পারে না। বৃত্তি ও বৃত্তিমান্ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, এই সিদ্ধান্তে বৃত্তির বিনাশ বা তিরোভাবে বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণের বিনাশ বা তিরোভাব অনিবার্য্য ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। অবিভু চৈকং মনঃ পর্য্যায়েণেন্দ্রিয়ৈঃ সংযুজ্যত ইতি—

অনুবাদ। কিন্তু অবিভু অর্থাৎ অণু একটি মনঃ ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সংযুক্ত হয়, এজন্য—

সূত্র। ক্রমবৃত্তিত্বাদযুগপদ্‌গ্রহণং ॥৩॥২৭৭॥

অনুবাদ। ক্রমবৃত্তিত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হওয়ায় (ইন্দ্রিয়ার্থবর্গের) যুগপৎ জ্ঞান হয় না।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ার্থানাং। বৃত্তিবৃত্তিমতোর্নানাত্বাদিতি। একত্বে চ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবয়োরভাব ইতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থবর্গের। (অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের যুগপৎ জ্ঞান হয় না)। যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে। একত্ব অর্থাৎ অভেদ থাকিলে কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাবের অভাব হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ সূত্রে যে যুগপদ্‌গ্রহণের অভাব বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজমতে কিরূপে উপপন্ন হয়? তাঁহার মতেও একই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষের আপত্তি কেন হয় না? এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মনের ক্রমবৃত্তিত্ববশতঃ যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। সূত্রে "অযুগপদ্‌গ্রহণং" এই বাক্যের পূর্ব্বে "ইন্দ্রিয়ার্থানাং" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার সূত্রের অবতারণা করিয়া প্রথমেই সূত্রকারের হৃদয়স্থ "ইন্দ্রিয়ার্থানাং" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত ক্রমশঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সংযোগই মনের "ক্রমবৃত্তিত্ব"। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত এই ক্রমবৃত্তিত্বের হেতু বলিবার জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, মন প্রতিশরীরে একটি এবং মন অবিভু, অর্থাৎ বিভু বা সর্ব্বব্যাপী পদার্থ নহে, মন পরমাণুর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম। তাদৃশ একটি মনের একই সময়ে নানাস্থানস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে না, ক্রমশঃ অর্থাৎ কালবিলম্বেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইয়া থাকে। সুতরাং মনের ক্রমবৃত্তিত্বই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ অসম্ভব বলিয়া, কারণের অভাবে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মিবে, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ সেই প্রত্যক্ষে আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত মূলকথা বলিয়াছেন যে, যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের নানাত্ব (ভেদ) আছে। উহাদিগের অভেদ বলিলে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন হইলে, অন্তঃকরণ হইতে তাহার নিজেরই আবির্ভাব ও অন্তঃকরণে তাহার নিজেরই তিরোভাব বলিতে হয়, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে সর্ব্বদাই অন্তঃকরণের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিবে? আর তাহা থাকিলে উহার আবির্ভাব তিরোভাবই বা কোন্ সময়ে কিরূপে হইবে? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। নিষ্প্রমাণ কল্পনা স্বীকার করা যায় না।

সুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অবস্থিত আছে বলিয়া তাহার বৃত্তি বা তজ্জন্য সর্ব্ববিষয়ের সমস্ত জ্ঞানও সর্ব্বদা থাকুক ? যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ হউক ? এইরূপ আপত্তি কোন মতেই হইবে না। সাংখ্যমতে যে আপত্তি হইয়াছে, ন্যায়মতে তাহা হইতেই পারে না ॥ ৬ ॥

সূত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞানঞ্চ বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গাৎ ॥৭॥২৭৮॥

অনুবাদ। এবং বিষয়ান্তরে ব্যাসঙ্গবশতঃ (বিষয়বিশেষের) অনুপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। অপ্রত্যভিজ্ঞানমনুপলব্ধিঃ। অনুপলব্ধিশ্চ কস্যচিদর্থস্য বিষয়ান্তরব্যাসক্তে মনস্যুপপদ্যতে, বৃত্তিবৃত্তিমতোর্নানাত্বাৎ, একত্বে হি অনর্থকো ব্যাসঙ্গ ইতি

অনুবাদ। "অপ্রত্যভিজ্ঞান" বলিতে (এখানে) অনুপলব্ধি। কোন পদার্থের অনুপলব্ধি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কিন্তু মনঃ বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত হইলে উপপন্ন হয়। কারণ, বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে, যেহেতু একত্ব অর্থাৎ অভেদ থাকিলে ব্যাসঙ্গ নিরর্থক হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি সাংখ্যসম্মত বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদবাদ খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা শেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, মন কোন একটী ভিন্ন বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিলে তখন সেই ব্যাসঙ্গ-বশতঃ সম্মুখীন বিষয়ে চক্ষুঃসংযোগাদি হইলেও তাহার উপলব্ধি হয় না। সুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তি-মানের ভেদ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি যদি বস্তুতঃ অভিন্নই হয়, তাহা হইলে বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ নিরর্থক। যে বিষয়ে মন ব্যাসক্ত থাকে, তদ্‌ভিন্ন বিষয়েও অন্তঃ-করণের বৃত্তি থাকিলে বিষয়ান্তর-ব্যাসঙ্গ সেখানে আর কি করিবে ? উহা কিসের প্রতিবন্ধক হইবে ? অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তি অভিন্ন হইলে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অবস্থিত আছে বলিয়া, তাহা হইতে অভিন্ন সর্ব্ববিষয়ক বৃত্তিও সর্ব্বদাই আছে, ইহা স্বীকার্য্য ॥ ৭ ॥

ভাষ্য। বিভুত্বে চান্তঃকরণস্য পর্য্যায়েণেন্দ্রিয়েণ সংযোগঃ—

সূত্র। ন গত্যভাবাৎ ॥৮॥২৭৯॥

অনুবাদ। অন্তঃকরণের বিভুত্ব থাকিলে কিন্তু গতির অভাববশতঃ ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না।

ভাষ্য। প্রাপ্তানীন্দ্রিয়াণ্যন্তঃকরণেনেতি প্রাপ্ত্যর্থস্য গমনস্যাভাবঃ। তত্র ক্রমবৃত্তিত্বাভাবাদযুগপদ্‌গ্রহণানুপপত্তিরিতি। গত্যভাবাচ্চ প্রতিষিদ্ধং বিভুনোঽন্তঃকরণস্যাযুগপদ্‌গ্রহণং ন লিঙ্গান্তরেণানুমীয়ত ইতি। যথা চক্ষুষো

গতিঃ প্রতিষিদ্ধা সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টয়োস্তুল্যকালগ্রহণাৎ পাণিচন্দ্রমসো ব্যবধান[১]-প্রতীঘাতেনানুমীয়ত ইতি। সোঽয়ং নান্তঃকরণে বিবাদো ন তস্য নিত্যত্বে, সিদ্ধং হি মনোঽন্তঃকরণং নিত্যঞ্চেতি। ক্ব তর্হি বিবাদঃ? তস্য বিভুত্বে, তচ্চ প্রমাণতোঽনুপলব্ধেঃ প্রতিষিদ্ধমিতি। একঞ্চান্তঃকরণং, নানা চৈতা জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তয়ঃ, চক্ষুর্ব্বিজ্ঞানং, ঘ্রাণবিজ্ঞানং, রূপবিজ্ঞানং, গন্ধবিজ্ঞানং। এতচ্চ বৃত্তিবৃত্তিমতোরেকত্বেঽনুপপন্নমিতি। পুরুষো জানীতে নান্তঃকরণমিতি। এতেন বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ। বিষয়ান্তর-গ্রহণলক্ষণো বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গঃ পুরুষস্য, নান্তঃকরণস্যেতি। কেনচি-দিন্দ্রিয়েণ সন্নিধিঃ কেনচিদসন্নিধিরিত্যয়ন্তু ব্যাসঙ্গোঽনুজ্ঞায়তে মনস ইতি।

অনুবাদ। অন্তঃকরণ কর্ত্তৃক সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত, অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিভু (সর্ব্বব্যাপী পদার্থ) হইলে সর্ব্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার প্রাপ্তি (সংযোগ) থাকে, সুতরাং (অন্তঃকরণে) প্রাপ্ত্যর্থ অর্থাৎ প্রাপ্তি বা সংযোগের জনক গমন-(ক্রিয়া) নাই। তাহা হইলে (অন্তঃকরণের) ক্রমবৃত্তিত্ব না থাকায় অযুগপদ্-গ্রহণের অর্থাৎ একই সময়ে নানাবিধ প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তির উপপত্তি হয় না। এবং বিভু অন্তঃকরণের গতি না থাকায় প্রতিষিদ্ধ অযুগপদ্‌গ্রহণ অন্য কোন হেতুর দ্বারাও অনুমিত হয় না। যেমন সন্নিকৃষ্ট (নিকটস্থ) হস্ত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) চন্দ্রের একই সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি "ব্যবধানপ্রতী-ঘাত" দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুর ব্যবধায়ক ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্যজন্য প্রতীঘাত দ্বারা অনুমিত হয়। সেই এই বিবাদ অন্তঃকরণে নহে, তাহার নিত্যত্ব বিষয়েও নহে। যেহেতু মন, অন্তঃকরণ (অন্তরিন্দ্রিয়) এবং নিত্য, ইহা সিদ্ধ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে কোন্ বিষয়ে বিবাদ? (উত্তর) সেই অন্তঃকরণের অর্থাৎ মনের বিভুত্ব বিষয়ে। তাহাও অর্থাৎ মনের বিভুত্বও প্রমাণের দ্বারা অনুপলব্ধিবশতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু অন্তঃকরণ এক, কিন্তু এই জ্ঞানাত্মক বৃত্তিসমূহ নানা, (যথা) চাক্ষুষ জ্ঞান, ঘ্রাণজ জ্ঞান, রূপজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান (ইত্যাদি)। ইহা কিন্তু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে উপপন্ন হয় না। সুতরাং পুরুষ জানে, অন্তঃকরণ জানে না অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই ধর্ম্ম, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা (অন্তঃকরণের) বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ নিরস্ত হইল। বিষয়ান্তরের জ্ঞানরূপ বিষয়ান্তর-

১। এখানে কলিকাতায়মুদ্রিত পুস্তকের পাঠই গৃহীত হইয়াছে। "ব্যবধান" শব্দের অর্থ এখানে ব্যবধায়ক দ্রব্য, তজ্জন্য প্রতীঘাতই "ব্যবধান-প্রতীঘাত"।

ব্যাসঙ্গ পুরুষের, অন্তঃকরণের নহে। কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগ, এই ব্যাসঙ্গ কিন্তু মনের (ধর্ম্ম) স্বীকৃত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সূত্রে যে "অযুগপদ্গ্রহণ" বলিয়াছেন, তাহা মন বিভু হইলে উপপন্ন হয় না। কারণ, "বিভু" বলিতে সর্ব্বব্যাপী। দিক্, কাল, আকাশ ও আত্মা, ইহারা বিভু পদার্থ। বিভু পদার্থের গতি নাই, উহা নিষ্ক্রিয়। মন বিভু হইলে তাহার সহিত সর্ব্বদাই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকিবে, ঐ সংযোগের জনক গতি বা ক্রিয়া মনে না থাকায় তজ্জন্য ক্রমশঃ ঐ সংযোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যাইবে না, সুতরাং মনের ক্রমবৃত্তিত্ব সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অযুগপদ্গ্রহণের উপপত্তি হইতে পারে না। একই সময়ে নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়াই "অযুগপদ্গ্রহণ।" উহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মন অতিসূক্ষ্ম হইলেই একই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না। দ্রুত গতিশীল অতি সূক্ষ্ম ঐ মনের গতি বা ক্রিয়াজন্য কালবিলম্বেই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় কালবিলম্বেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহর্ষি তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তানুসারে সাংখ্যমত খণ্ডন প্রসঙ্গে এই সূত্রের দ্বারা সাংখ্যসম্মত মনের বিভুত্ববাদ খণ্ডন করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির হৃদয়স্থ প্রতিষেধ্য প্রকাশ করিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "সংযোগঃ" এই বাক্যের সহিত সূত্রের আদিস্থ "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

মনের বিভুত্ববাদী পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, অযুগপদ্গ্রহণ আমরা স্বীকার না করিলেও, উহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত না হইলেও যদি উহা সিদ্ধান্ত বলিয়াই মানিতে হয়, যদি উহাই বাস্তব তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে উহার সাধক হেতু যাহা হইবে, তদ্দ্বারাই উহা সিদ্ধ হইবে, উহার অনুপপত্তি হইবে কেন ? ভাষ্যকার এই জন্য আবার বলিয়াছেন যে, মন বিভু হইলে তাহার গতি না থাকায় যে অযুগপদ্গ্রহণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যাহার অনুপপত্তি বলিয়াছি, তাহা আর কোন হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এমন কোন হেতু নাই, যদ্দ্বারা মনের বিভুত্বপক্ষেও অযুগপদ্গ্রহণ সিদ্ধ করা যায়। অবশ্য সাধক হেতু থাকিলে তদ্দ্বারা প্রতিষিদ্ধ পদার্থেরও সিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই সময়ে নিকটস্থ হস্ত ও দূরস্থ চন্দ্রের প্রত্যক্ষ হওয়ায় যাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গতি নাই, ইহা বলিয়াছেন, একই সময়ে নিকটস্থ ও দূরস্থ দ্রব্যে কোন পদার্থের গতিজন্য সংযোগ হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া যাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গতির প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি, সাধক হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন ব্যবধায়ক দ্রব্যজন্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে প্রতীঘাত হয়, তদ্দ্বারা ঐ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গতি আছে, ইহা অনুমিত হয়। অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় সেই দ্রব্যের সহিত সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গতি আছে, উহা তেজঃ-পদার্থ। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি নিকটস্থ হস্তের ন্যায় দূরস্থ চন্দ্রেও গমন করে, ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা

ঐ রশ্মির প্রতীঘাত অর্থাৎ গতিরোধ হয়, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গতি না থাকিলে তাহার সহিত দূরস্থ দ্রব্যের সংযোগ না হইতে পারায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এবং ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা তাহার প্রতীঘাতও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গতির প্রতিষেধ করিলেও পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা উহা অনুমানসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু মনকে বিভু বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা নিষ্ক্রিয়ই হইবে, ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াজন্য ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাহার সংযোগ জন্মে, ইহা বলাই যাইবে না, সুতরাং "অযুগপদ্গ্রহণ"রূপ সিদ্ধান্ত রক্ষা করা যাইবে না। মন বিভু হইলে আর কোন হেতুই পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি অনুমিত হয়, তদ্রূপ মনের বিভুত্ব পক্ষে প্রতিষিদ্ধ "অযুগপদ্গ্রহণ" কোন হেতুর দ্বারা অনুমিত হয় না। এইরূপে ভাষ্যকার এখানে "ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত" প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে ফলকথা বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণ ও তাহার নিত্যত্ব মহর্ষি গোতমেরও সম্মত। কারণ, "করণ" শব্দের ইন্দ্রিয় অর্থ বুঝিলে "অন্তঃকরণ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় অন্তরিন্দ্রিয়। গোতমমতে মনই অন্তরিন্দ্রিয় এবং উহা নিত্য। সুতরাং যাহাকে মন বলা হইয়াছে, তাহারই নাম অন্তঃকরণ। উহার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বে বিবাদ নাই, কিন্তু উহার বিভুত্বেই বিবাদ। মনের বিভুত্ব কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় মহর্ষি গোতম উহা স্বীকার করেন নাই। উহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ অন্তঃকরণ বৃত্তিমান্, জ্ঞান উহারই বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ, ঐ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের কোন ভেদ নাই, এই সাংখ্যসিদ্ধান্তও মহর্ষি গোতম স্বীকার করেন নাই। অন্তঃকরণ প্রতি শরীরে একটী মাত্র। চক্ষুর দ্বারা রূপজ্ঞান ও ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান ঐ অন্তঃকরণের নানা বৃত্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে ইহাও উপপন্ন হয় না। যাহা নানা, যাহা অসংখ্য, তাহা এক অন্তঃকরণ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। এক ও বহু, ভিন্ন পদার্থই হইয়া থাকে। পরন্তু সকল সময়েই রূপজ্ঞান গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান থাকে না। সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই জ্ঞাতা, অন্তঃকরণ জ্ঞাতা নহে, অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে, এই সিদ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি নাই। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা বিষয়ান্তর-ব্যাসঙ্গও নিরস্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, অন্তঃকরণ বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত হইলে চক্ষুরাদি-সম্বদ্ধ পদার্থ-বিশেষেরও যখন জ্ঞান হয় না, তখন বুঝা যায়, সেই সময়ে অন্তঃকরণের সেই বিষয়াকার বৃত্তি হয় নাই, অন্তঃকরণের বৃত্তিই জ্ঞান, সাংখ্যসম্প্রদায়ের এই কথাও নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, বিষয়ান্তরের জ্ঞানরূপ বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ অন্তঃকরণে থাকেই না, উহা আত্মার ধর্ম্ম। যে জ্ঞাতা, তাহাকেই বিষয়ান্তরব্যাসক্ত বলা যায়। অন্তঃকরণ যখন জ্ঞাতাই নহে, তখন তাহাতে ঐ বিষয়ান্তর-ব্যাসঙ্গ থাকিতেই পারে না। তবে "অন্তঃকরণ বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত হইয়াছে" এইরূপ কথা কেন বলা হয়? এজন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ এবং কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের অসংযোগ, ইহাকেই মনের "বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ" বলা হয়। ঐরূপ বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ মনের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত আছে। কিন্তু উহা জ্ঞান পদার্থ না হওয়ায় উহার দ্বারা

জ্ঞান অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে সাংখ্যমতে অন্তঃকরণের বিভুত্ব বলিয়া জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ" (৩।১৪।) এই সাংখ্যসূত্রে বৃত্তিকার অনিরুদ্ধের ব্যাখ্যানুসারে মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। মনের বিভুত্ব পাতঞ্জলসিদ্ধান্ত। যোগদর্শন-ভাষ্যে[1] ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সেখানে "যোগবার্ত্তিকে" বিজ্ঞান ভিক্ষু, ভাষ্য-কারের প্রথমোক্ত মতের ব্যাখ্যা করিতে সাংখ্যমতে মন শরীরপরিমাণ, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং শেষোক্ত মতের ব্যাখ্যায় আচার্য্য অর্থাৎ পতঞ্জলির মতে মন বিভু, ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। পতঞ্জলির মতে মন বিভু, মনের সংকোচ ও বিকাশ নাই, কিন্তু ঐ মনের বৃত্তিরই সংকোচ ও বিকাস হয়। ভাষ্যকার এখানে প্রাচীন কোন সাংখ্যমতে অথবা সেশ্বর সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে মনের বিভুত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। নৈয়ায়িকগণ মনের বিভুত্ববাদ বিশেষ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন, পরে তাহা পাওয়া যাইবে। পরবর্ত্তী ৫৯ম সূত্রের ভাষ্যটিপ্পনী দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

ভাষ্য। একমন্তঃকরণং নানা বৃত্তয় ইতি। সত্যভেদে বৃত্তেরিদ-মুচ্যতে—

অনুবাদ। অন্তঃকরণ এক, বৃত্তি নানা, ইহা (উক্ত হইয়াছে)। বৃত্তির অভেদ থাকিলে অর্থাৎ বৃত্তির অভেদ পক্ষে (মহর্ষি) এই সূত্র বলিতেছেন—

সূত্র। স্ফটিকান্যত্বাভিমানবত্তদন্যত্বাভিমানঃ ॥ ॥৯॥২৮০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) স্ফটিক মণিতে ভেদের অভিমানের ন্যায় সেই বৃত্তিতে ভেদের অভিমান (ভ্রম) হয়।

ভাষ্য। তস্যাং বৃত্তৌ নানাত্বাভিমানঃ, যথা দ্রব্যান্তরোপহিতে স্ফটিকেঽন্যত্বাভিমানো নীলো লোহিত ইতি, এবং বিষয়ান্তরোপধানা-দিতি।

অনুবাদ। সেই বৃত্তিতে নানাত্বের অভিমান (ভ্রম) হয়, যেমন—দ্রব্যান্তরের দ্বারা উপহিত অর্থাৎ নীল ও রক্ত প্রভৃতি দ্রব্যের সান্নিধ্যবশতঃ যাহাতে ঐ দ্রব্যের নীলাদি রূপের আরোপ হয়, এমন স্ফটিক-মণিতে নীল, রক্ত, এইরূপে

১। "বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সংকোচবিকাসিনীত্যাচার্য্যঃ" ।—যোগদর্শন, কৈবল্যপাদ, ১০ম সূত্র ভাষ্য।

ভেদের অভিমান হয়,—তদ্রূপ বিষয়ান্তরের উপধানপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষপ্রযুক্ত (বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে ভেদের অভিমান হয়)।

টিপ্পনী। সাংখ্যসম্মত বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ মত নিরস্ত হইয়াছে। বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ এক, তাহার বৃত্তিজ্ঞানগুলি নানা, সুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তিমান্ অভিন্ন হইতে পারে না, ইহাও পূর্ব্ব-সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যসম্প্রদায় অন্তঃকরণের বৃত্তিকেও বস্তুতঃ এক বলিয়া ঘটপটাদি নানাবিষয়ক জ্ঞানের পরস্পর বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে, তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের মতে বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ সিদ্ধির কোন বাধা হইতে পারে না। এজন্য মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদি নানাবিষয়ক জ্ঞানের বাস্তব ভেদ নাই, উহাকে নানা অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম। বস্তু এক হইলেও উপাধির ভেদবশতঃ ঐ বস্তুকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, উহাতে নানাত্বের (ভেদের) অভিমান (ভ্রম) হয়। যেমন একটি স্ফটিকের নিকটে কোন নীল দ্রব্য থাকিলে, তখন ঐ নীল দ্রব্যগত নীল রূপ ঐ শুভ্র স্ফটিকে আরোপিত হয় এবং উহার নিকটে কোন রক্ত দ্রব্য থাকিলে তখন ঐ রক্ত দ্রব্যগত রক্ত রূপ ঐ স্ফটিকে আরোপিত হয়, এজন্য ঐ স্ফটিক বস্তুতঃ এক হইলেও ঐ নীল ও রক্ত দ্রব্যরূপ উপাধি-বশতঃ তাহাতে কালভেদে "ইহা নীল স্ফটিক," "ইহা রক্ত স্ফটিক," এইরূপে ভেদের ভ্রম হয়, তাহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তদ্রূপ যে সকল বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তি জন্মে, সেই সকল বিষয়রূপ উপাধিবশতঃ ঐ বৃত্তিতে ঐ সকল বিষয়ের ভেদ আরোপিত হওয়ায় ঐ বৃত্তি ও জ্ঞান বস্তুতঃ এক হইলেও উহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তাহাতে নানাত্বের অভিমান হয়। বস্তুতঃ ঐ বৃত্তিও বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণের ন্যায় এক ॥৯॥

ভাষ্য। **ন হেত্বভাবাৎ**। স্ফটিকান্যত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বাভিমানো গৌণো ন পুনর্গন্ধাদ্যন্যত্বাভিমানবদিতি হেতুর্নাস্তি,—হেত্বভাবাদনুপপন্ন ইতি। সমানো হেত্বভাব ইতি চেৎ? ন, জ্ঞানানাং ক্রমেণোপজনাপায়দর্শনাৎ। ক্রমেণ হীন্দ্রিয়ার্থেষু জ্ঞানান্যুপজায়ন্তে চাপযন্তি চেতি দৃশ্যতে। তস্মাদ্‌গন্ধাদ্যন্যত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বাভিমান ইতি।

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত অভিমান সিদ্ধ হয় না, কারণ, হেতু নাই। বিশদার্থ এই যে, জ্ঞানবিষয়ে এই নানাত্ব জ্ঞান স্ফটিক-মণিতে ভেদ ভ্রমের ন্যায় গৌণ, কিন্তু গন্ধাদির ভেদজ্ঞানের ন্যায় (মুখ্য) নহে, এ বিষয়ে হেতু নাই, হেতু না থাকায় (ঐ ভ্রম) উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) হেতুর অভাব সমান, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না। কারণ, জ্ঞানসমূহের ক্রমশঃ

উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায়। যেহেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ ক্রমশঃ উপজাত (উৎপন্ন) হয়, এবং অপযাত (বিনষ্ট) হয়, ইহা দেখা যায়। অতএব জ্ঞানবিষয়ে এই নানাত্বজ্ঞান গন্ধাদির ভেদজ্ঞানের ন্যায় (মুখ্য)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া পরে নিজে উহা খণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ঐ নানাত্ব-ভ্রম উপপন্ন হয় না। কারণ, উহার সাধক কোন হেতু নাই। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না। যেমন, স্ফটিক মণিতে নানাত্বের অভিমান হয়, তদ্রূপ গন্ধ, রস, রূপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও নানাত্বের অভিমান হয়। স্ফটিক-মণিতে পূর্ব্বোক্ত কারণে নানাত্বের অভিমান গৌণ; কারণ, উহা ভ্রম। গন্ধাদি নানা বিষয়ে নানাত্বের অভিমান ভ্রম নহে; উহা যথার্থ ভেদজ্ঞান। অভিমান মাত্রই ভ্রম নহে। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী স্ফটিক-মণিতে নানাত্ব ভ্রমকে দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তি জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের জ্ঞানকে গন্ধাদি বিষয়ে মুখ্য নানাত্ব জ্ঞানের ন্যায় যথার্থও বলিতে পারি। জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের জ্ঞান গন্ধাদি বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ নহে, কিন্তু স্ফটিক-মণিতে নানাত্বজ্ঞানের ন্যায় ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার ঐ সাধ্যসাধক কোন হেতু বলেন নাই, সুতরাং উহা উপপন্ন হয় না। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ সাধ্যসিদ্ধি করিলে গন্ধাদি বিষয়ে নানাত্ব-জ্ঞানরূপ প্রতিদৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াও সিদ্ধ করিতে পারি। যদি বল, সে পক্ষেও ত হেতু নাই, কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, সেগুলির ক্রমশঃ উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায়। অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়-জ্ঞানের ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ে যথার্থ ভেদজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞান বিষয়ে ভেদজ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারি। জ্ঞানগুলি যখন ক্রমশঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, তখন উহাদিগের যে পরস্পর বাস্তব ভেদই আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর এখানে আরও বলিয়াছেন যে,—যদি উপাধির ভেদপ্রযুক্ত ভেদের অভিমান বল, তাহা হইলে ঐ উপাধিগুলি যে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বুঝিবে? উপাধিবিষয়ক জ্ঞানের ভেদপ্রযুক্তই ঐ উপাধির ভেদ জ্ঞান হয়, ইহা বলিলে জ্ঞানের ভেদ স্বীকৃতই হইবে, জ্ঞানের অভেদ পক্ষ রক্ষিত হইবে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে,—নানাত্বের অভিমানই বৃত্তির একত্বসাধক হেতু। যাহা নানাত্বের অভিমানের বিষয় হয়, তাহা এক, যেমন স্ফটিক। বৃত্তি বা জ্ঞানও নানাত্বের অভিমানের বিষয় হওয়ায় তাহাও স্ফটিকের ন্যায় এক, ইহা সিদ্ধ হয়। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ঐ নানাত্বের অভিমান যেমন স্ফটিকাদি এক বিষয়ে দেখা যায়, তদ্রূপ গন্ধাদি অনেক বিষয়েও দেখা যায়। সুতরাং নানাত্বের অভিমান হইলেই তদ্দ্বারা কোন পদার্থের একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে "ইহা এক," "ইহা অনেক"

এইরূপ জ্ঞান অযুক্ত হয়। পরন্তু এক স্ফটিকেও যে নানাত্ব জ্ঞান, তাহাও জ্ঞানের ভেদ ব্যতীত হইতে পারে না। কারণ, সেখানেও ইহা নীল স্ফটিক, ইহা রক্ত স্ফটিক, এইরূপে বিভিন্ন জ্ঞানই হইয়া থাকে। জ্ঞানের অভেদবাদীর মতে ঐ নীলাদি জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না। পরন্তু জ্ঞানের ভেদ না থাকিলে সাংখ্যসম্প্রদায়ের প্রমাণত্রয় স্বীকারও উপপন্ন হয় না। জ্ঞানের ভেদ না থাকিলে প্রমাণের ভেদ কখনই সম্ভবপর হয় না। প্রমাণের ভেদ ব্যতীত জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদও বুঝা যায় না। বিষয়ই জ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য বা অভেদবশতঃ সেইরূপে ব্যবস্থিত থাকিয়া সেইরূপেই প্রতিভাত হয়,—জ্ঞান ও বিষয়েও কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলে প্রমাণ ব্যর্থ হয়। বিষয়রূপে জ্ঞান ব্যবস্থিত থাকিলে আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? উদ্দ্যোতকর এইরূপে বিচারপূর্ব্বক এখানে পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ "ন হেত্বভাবাৎ" এই বাক্যটিকে মহর্ষির সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত নবম সূত্রের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন, নিজেই তাহার উত্তর না বলিলে মহর্ষির শাস্ত্রের ন্যূনতা হয়। সুতরাং "ন হেত্বভাবাৎ" এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষিই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদয়নের "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"র টীকা "ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে" বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়া "ন হেত্বভাবাৎ" এই বাক্যকে মহর্ষির সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার প্রাচীন উদ্দ্যোতকর ঐ বাক্যকে সূত্ররূপে উল্লেখ করেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় ঐ বাক্যকে ভাষ্য বলিয়াই স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 'ন্যায়সূচীনিবন্ধে'ও ঐ বাক্যকে সূত্রমধ্যে গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তদনুসারে এখানে "ন হেত্বভাবাৎ" এই বাক্যটি ভাষ্যরূপেই গৃহীত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকে ৪৩শ সূত্রের দ্বারা মহর্ষি, কোন প্রকার হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না, এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তদ্দ্বারা এখানেও পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সেই পূর্ব্বোক্ত উত্তরই বুঝিতে পারিবে, ইহা মনে করিয়াই মহর্ষি এখানে অতিরিক্ত সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বোক্ত উত্তরের পুনরুক্তি করেন নাই। ভাষ্যকার "ন হেত্বভাবাৎ" এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষির দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত সেই উত্তরই স্মরণ করাইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের পক্ষে ইহাই বুঝিতে হইবে। ৯।

বুদ্ধ্যনিত্যতাপ্রকরণ সমাপ্ত। ১ ॥

—o—

ভাষ্য। "স্ফটিকান্যত্বাভিমানব"দিত্যেতদমৃষ্যমাণঃ ক্ষণিকবাদ্যাহ—

অনুবাদ। "স্ফটিকে নানাত্বাভিমানের ন্যায়" এই কথা অস্বীকার করতঃ ক্ষণিকবাদী বলিতেছেন—

সূত্র। স্ফটিকেঽপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ ক্ষণিকত্বাদ্‌ব্যক্তীনামহেতুঃ ॥১০॥২৮১ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ব্যক্তিসমূহের (সমস্ত পদার্থের) ক্ষণিকত্বপ্রযুক্ত স্ফটিকেও অপরাপরের (ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের) উৎপত্তি হওয়ায় অহেতু, অর্থাৎ স্ফটিকে নানাত্বের অভিমান, এই পক্ষ হেতুশূন্য।

ভাষ্য। স্ফটিকস্যাভেদেনাবস্থিতস্যোপধানভেদান্নানাত্বাভিমান ইত্যয়মবিদ্যমানহেতুকঃ পক্ষঃ। কস্মাৎ? স্ফটিকেঽপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ। স্ফটিকেঽপ্যন্যা ব্যক্তয় উৎপদ্যন্তেঽন্যা নিরুধ্যন্ত ইতি। কথং? ক্ষণিকত্বাদ্‌ব্যক্তীনাং। ক্ষণশ্চাল্পীয়ান্ কালঃ, ক্ষণস্থিতিকাঃ ক্ষণিকাঃ। কথং পুনর্গম্যতে ক্ষণিকা ব্যক্তয় ইতি? উপচয়াপচয়প্রবন্ধদর্শনাচ্ছরীরাদিষু। পক্তিনির্ব্বৃত্তস্যাহাররসস্য শরীরে রুধিরাদিভাবেনোপচয়োঽপচয়শ্চ প্রবন্ধেন প্রবর্ত্ততে, উপচয়াদ্‌ব্যক্তীনামুৎপাদঃ, অপচয়াদ্‌ব্যক্তিনিরোধঃ। এবঞ্চ সত্যবয়বপরিণামভেদেন বৃদ্ধিঃ শরীরস্য কালান্তরে গৃহ্যত ইতি। সোঽয়ং ব্যক্তিবিশেষধর্ম্মো ব্যক্তিমাত্রে বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। অভেদবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত স্ফটিকের অর্থাৎ একই স্ফটিকের উপাধির ভেদপ্রযুক্ত নানাত্বের অভিমান হয়, এই পক্ষ অবিদ্যমানহেতুক, অর্থাৎ ঐ পক্ষে হেতু নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু স্ফটিকেও অপরাপরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ) স্ফটিকেও অন্য ব্যক্তিসমূহ (স্ফটিকসমূহ) উৎপন্ন হয়, অন্য ব্যক্তিসমূহ বিনষ্ট হয়। (প্রশ্ন) কেন? যেহেতু ব্যক্তিসমূহের (পদার্থমাত্রের) ক্ষণিকত্ব আছে। "ক্ষণ" বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কাল, ক্ষণমাত্রস্থায়ী পদার্থসমূহ ক্ষণিক। (প্রশ্ন) পদার্থসমূহ ক্ষণিক, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? (উত্তর) যেহেতু শরীরাদিতে উপচয় ও অপচয়ের প্রবন্ধ অর্থাৎ ধারাবাহিক বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়। "পক্তি"র দ্বারা অর্থাৎ জঠরাগ্নিজন্য পাকের দ্বারা নির্ব্বৃত্ত (উৎপন্ন) আহাররসের (ভুক্ত দ্রব্যের রসের অথবা রসযুক্ত ভুক্ত দ্রব্যের) রুধিরাদিভাববশতঃ শরীরে প্রবাহরূপে (ধারাবাহিক) উপচয় ও অপচয় (বৃদ্ধি ও হ্রাস) প্রবৃত্ত হইতেছে (উৎপন্ন হইতেছে)। উপচয়বশতঃ পদার্থসমূহের উৎপত্তি, অপচয়বশতঃ পদার্থসমূহের "নিরোধ" অর্থাৎ বিনাশ (বুঝা যায়)।

এইরূপ হইলেই অবয়বের পরিণামবিশেষ-প্রযুক্ত কালান্তরে শরীরের বৃদ্ধি বুঝা যায়। সেই এই পদার্থবিশেষের (শরীরের) ধর্ম্ম (ক্ষণিকত্ব) পদার্থমাত্রে বুঝিবে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তে ক্ষণিকবাদী যে দোষ বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডন করিয়া স্থিরত্ববাদ সমর্থনের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, একই স্ফটিকে উপাধিভেদে নানাত্বের ভ্রম যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে হেতু নাই। কারণ, পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং স্ফটিকেও প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের উৎপত্তি হইতেছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে শরীরাদি অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় স্ফটিকও নানা হওয়ায় তাহাতে নানাত্বের ভ্রম বলা যায় না। যাহা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, তাহা এক বস্তু হইতে পারে না, তাহা অসংখ্য; সুতরাং তাহাকে নানা বলিয়া বুঝিলে সে বোধ যথার্থই হইবে। যাহা বস্তুতঃ নানা, তাহাতে নানাত্বের ভ্রম হয়, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না, ঐ ভ্রমের হেতু বা কারণ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কালের নাম ক্ষণ, ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী পদার্থকে ক্ষণিক বলা যায়। বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়, সুতরাং শরীরাদি ক্ষণিক, ইহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। জঠরাগ্নির দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইলে তজ্জন্য ঐ দ্রব্যের রস শরীরে রুধিরাদিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং শরীরে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ জন্মে। অর্থাৎ শরীরের স্থূলতা ও ক্ষীণতা দর্শনে প্রতিক্ষণে শরীরের সূক্ষ্ম পরিণামবিশেষ অনুমিত হয়। ঐ পরিণামবিশেষ প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। শরীরের বৃদ্ধি হইলে উহার উৎপত্তি বুঝা যায়, হ্রাস হইলে উহার বিনাশ বুঝা যায়। প্রতিক্ষণে শরীরের বৃদ্ধি না হইলে শরীরের অবয়বের পরিণামবিশেষপ্রযুক্ত কালান্তরে শরীরের বৃদ্ধি বুঝা যাইতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই শরীরের বৃদ্ধি ব্যতীত বাল্যকালীন শরীর হইতে যৌবনকালীন শরীরের যে বৃদ্ধি বোধ হয়, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিক্ষণেই শরীরের কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রতিক্ষণেই শরীরের নাশ এবং তজ্জাতীয় অন্য শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বৃদ্ধি ও হ্রাস বলা যায় না। প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও নাশ স্বীকার্য্য হইলে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন শরীরই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে শরীরমাত্রই ক্ষণিক, এই সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয়। শরীরমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইলে তদ্দৃষ্টান্তে স্ফটিকাদি বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং শরীরের ন্যায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকেরও ভেদ সিদ্ধ হওয়ায় স্ফটিকে নানাত্ব জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানই হইবে, উহা ভ্রম জ্ঞান বলা যাইবে না। ভাষ্যকার ইহা প্রতিপন্ন করিতেই শেষে বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ শরীরের ধর্ম্ম ক্ষণিকত্ব, ব্যক্তিমাত্রে (স্ফটিকাদি বস্তুমাত্রে) বুঝিবে। ভাষ্যকার এখানে বৌদ্ধ-সম্মত ক্ষণিকত্বের অনুমানে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি এবং শরীরাদি দৃষ্টান্তই অবলম্বন

করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়[১]। ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি-বিচারাদি পরে লিখিত হইবে ॥ ১০ ॥

সূত্র। নিয়মহেত্বভাবাদ্‌যথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা ॥১১॥২৮২॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিয়মে হেতু না থাকায় অর্থাৎ শরীরের ন্যায় সর্ব্ববস্তুতেই বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ হইতেছে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ না থাকায় "যথাদর্শন" অর্থাৎ যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তদনুসারেই (পদার্থের) স্বীকার (করিতে হইবে)।

ভাষ্য। সর্ব্বাসু ব্যক্তিষু উপচয়াপচয়প্রবন্ধঃ শরীরবদিতি নায়ং নিয়মঃ। কস্মাৎ? হেত্বভাবাৎ, নাত্র প্রত্যক্ষমনুমানং বা প্রতিপাদকমস্তীতি। তস্মাদ্‌"যথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা," যত্র যত্রোপচয়াপচয়প্রবন্ধো দৃশ্যতে, তত্র তত্র ব্যক্তীনামপরাপরোৎপত্তিরুপচয়াপচয়প্রবন্ধদর্শনেনাভ্যনুজ্ঞায়তে, যথা শরীরাদিষু। যত্র যত্র ন দৃশ্যতে তত্র তত্র প্রত্যাখ্যায়তে যথা গ্রাবপ্রভৃতিষু। স্ফটিকেঽপ্যুপচয়াপচয়প্রবন্ধো ন দৃশ্যতে, তস্মাদযুক্তং "স্ফটিকেঽপ্যপরাপরোৎপত্তে"রিতি। যথা চার্কস্য কটুকিম্না সর্ব্বদ্রব্যাণাং কটুকিমানমাপাদয়েৎ তাদৃগেতদিতি।

অনুবাদ। সমস্ত বস্তুতে শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, ইহা নিয়ম নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) কারণ, হেতু নাই, (অর্থাৎ) এই নিয়ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান, প্রতিপাদক (প্রমাণ) নাই। অতএব "যথাদর্শন" অর্থাৎ প্রমাণানুসারেই (পদার্থের) স্বীকার (করিতে হইবে)। (অর্থাৎ) যে যে বস্তুতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দৃষ্ট (প্রমাণসিদ্ধ) হয়, সেই সেই বস্তুতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ-দর্শনের দ্বারা বস্তুসমূহের অপরাপরোৎপত্তি অর্থাৎ একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়, যেমন শরীরাদিতে। যে যে বস্তুতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, সেই সেই বস্তুতে অপরাপরোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হয়, অর্থাৎ স্বীকৃত হয় না, যেমন প্রস্তরাদিতে। স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে স্ফটিকের বিনাশ ও পরক্ষণেই অপর স্ফটিকের উৎপত্তি দৃষ্ট (প্রমাণসিদ্ধ) হয় না, অতএব "স্ফটিকেও অপরাপরের উৎপত্তি হওয়ায়" এই কথা অযুক্ত। যেমন অর্কফলের কটুত্বের দ্বারা অর্থাৎ কটু অর্কফলের দৃষ্টান্তে সর্ব্বদ্রব্যের কটুত্ব আপাদন করিবে, ইহা তদ্রূপ।

১। যৎ সৎ তৎ সর্ব্বং ক্ষণিকং, যথা শরীরং, তথাচ স্ফটিক ইতি জল্পন্তো বৌদ্ধাঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সমস্ত বস্তুতেই প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে, এইরূপ নিয়মে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণ নাই। ঐরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায় উহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং যেখানে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রমাণ আছে, সেখানেই তদনুসারে সেই বস্তুতে তজ্জাতীয় অন্য বস্তুর উৎপত্তি ও পূর্ব্বজাত বস্তুর বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দেখা যায় অর্থাৎ উহা প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শরীরাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায়। কিন্তু প্রস্তরাদিতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, উহা বহুকাল পর্য্যন্ত একরূপই দেখা যায়, সুতরাং তাহাতে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। এইরূপ স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দেখা যায় না, বহুকাল পর্য্যন্ত স্ফটিক একরূপই থাকে, সুতরাং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তদ্‌বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। শরীরাদি কতিপয় পদার্থের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখিয়া সমস্ত পদার্থেই উহা সিদ্ধ করা যায় না। তাহা হইলে অর্কফলের কটুত্বের উপলব্ধি করিয়া তদ্দৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রব্যেরই কটুত্ব সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তি অর্কফলের কটুত্ব উপলব্ধি করিয়া, তদ্দৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রব্যের কটুত্বের সাধন করিলে যেমন হয়, ক্ষণিকবাদীর শরীরাদি দৃষ্টান্তে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধনও তদ্রূপ হয়। অর্থাৎ তাদৃশ অনুমান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বাধিত হওয়ায় তাহা প্রমাণই হইতে পারে না। ভাষ্যকার শরীরাদির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়াই এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সিদ্ধান্ত (সর্ব্ববস্তুর ক্ষণিকত্ব) অসিদ্ধ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত সিদ্ধান্তে শরীরাদিও ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী) নহে। শরীরের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উহা হইতেছে, প্রতিক্ষণেই এক শরীরের নাশ ও তজ্জাতীয় অপর শরীরের উৎপত্তি হইতেছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। যে সময়ে কোন শরীরের বৃদ্ধি হয়, তখন পূর্ব্বশরীর হইতে তাহার পরিমাণের ভেদ হওয়ায়, সেখানে পূর্ব্বশরীরের নাশ ও অপর শরীরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, এবং কোন কারণে শরীরের হ্রাস হইলেও সেখানে শরীরান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পরিমাণের ভেদ হইলে দ্রব্যের ভেদ হইয়া থাকে। একই দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিক্ষণেই শরীরের হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিমাণ-ভেদ প্রত্যক্ষ করা যায় না, তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণও নাই; সুতরাং প্রতিক্ষণে শরীরের ভেদ স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে তাঁহার সম্মত "অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত" অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের ঐ দৃষ্টান্ত মানিয়া লইয়াই তাঁহাদিগের মূল মত খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। যশ্চাশেষনিরোধেনাপূর্ব্বোৎপাদং নিরন্বয়ং দ্রব্যসন্তানে ক্ষণিকতাং মন্যতে তস্যৈতৎ—

সূত্র। নোৎপত্তি-বিনাশকারণোপলব্ধেঃ ॥১২॥২৮৩॥

অনুবাদ। পরন্তু যিনি অশেষবিনাশবিশিষ্ট নিরন্বয় অপূর্ব্বোৎপত্তিকে অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বিনাশ ও সেই ক্ষণেই পূর্ব্বজাতকারণ-দ্রব্যের অন্বয়শূন্য (সম্বন্ধশূন্য) আর একটি অপূর্ব্বদ্রব্যের উৎপত্তিকে দ্রব্যসন্তানে (প্রতিক্ষণে জায়মান বিভিন্ন দ্রব্যসমূহে) ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার এই মত অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের ঐরূপ ক্ষণিকত্ব নাই, যেহেতু, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। উৎপত্তিকারণং তাবদুপলভ্যতেঽবয়বোপচয়ো বল্মীকাদীনাং, বিনাশকারণঞ্চোপলভ্যতে ঘটাদীনামবয়ববিভাগঃ। যস্য ত্বনপচিতাবয়বং নিরুধ্যতেঽনুপচিতাবয়বঞ্চোৎপদ্যতে, তস্যাশেষনিরোধে নিরন্বয়ে বাঽ-পূর্ব্বোৎপাদে ন কারণমুভয়ত্রাপ্যুপলভ্যত ইতি।

অনুবাদ। অবয়বের বৃদ্ধি বল্মীক প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, এবং অবয়বের বিভাগ ঘটাদির বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়। কিন্তু, যাঁহার মতে "অনপচিতাবয়ব" অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ অপচয় বা হ্রাস হয় না, এমন দ্রব্য বিনষ্ট হয়, এবং "অনুপচিতাবয়ব" অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ বৃদ্ধি হয় না, এমন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাঁহার (সম্মত) সম্পূর্ণ বিনাশে অথবা নিরন্বয় অপূর্ব্বদ্রব্যের উৎপত্তিতে, উভয়ত্রই কারণ উপলব্ধ হয় না।

টিপ্পনী। ক্ষণিকবাদীর সম্মত ক্ষণিকত্বের সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহাই পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ক্ষণিকত্বের অভাবসাধক কোন সাধন বলা হয় নাই, উহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই সাধন বলিয়াছেন। ক্ষণিকবাদীর মতে উৎপন্ন দ্রব্য পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, এবং সেই বিনাশক্ষণেই তজ্জাতীয় আর একটি অপূর্ব্ব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপে প্রতিক্ষণে জায়মান দ্রব্যসমষ্টির নাম দ্রব্যসন্তান। পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যই পরক্ষণে জায়মান দ্রব্যের উপাদানকারণ। কিন্তু ঐ কারণ দ্রব্য পরক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান না থাকায়, পরক্ষণেই উহার অশেষ নিরোধ (সম্পূর্ণ বিনাশ) হওয়ায়, পরক্ষণে জায়মান কার্য্যদ্রব্যে উহার কোনরূপ অন্বয় (সম্বন্ধ) থাকিতে পারে না। তজ্জন্য ঐ অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে যাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না)—কার্য্য-দ্রব্যের উৎপত্তিকে নিরন্বয় অপূর্ব্বোৎপত্তি বলা হয়, এবং পূর্ব্বজাত দ্রব্যের সম্পূর্ণ বিনাশক্ষণেই ঐ অপূর্ব্বোৎপত্তি হয় বলিয়া, উহাকে অশেষবিনাশবিনাশবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার এই মতের প্রকাশ করিয়া, ইহার খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "এতৎ" শব্দের সহিত সূত্রের আদিস্থ "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির সূত্রব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝা যায়। মহর্ষির কথা এই যে, বস্তুমাত্র বা দ্রব্যমাত্রের ক্ষণিকত্ব নাই। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের

কারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সূত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বল্মীক প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়বের বৃদ্ধি ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, এবং ঘটাদি দ্রব্যের অবয়বের বিভাগ ঐ সমস্ত দ্রব্যের বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনষ্ট দ্রব্যের বিনাশে সর্ব্বত্রই কারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু, ক্ষণিকবাদী স্ফটিকাদি দ্রব্যের যে প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ বলেন, তাহার কোন কারণই উপলব্ধ হয় না, তাঁহার মতে উহার কোন কারণ থাকিতেও পারে না। কারণ, উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধি এবং বিনাশের কারণ, অবয়বের বিভাগ বা হ্রাস তাঁহার মতে সম্ভবই নহে। যে বস্তু কোনরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহারই বৃদ্ধি ও হ্রাস বলা যায়। যাহা দ্বিতীয় ক্ষণেই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়,—যাহার তখন কিছুই শেষ থাকে না, তাহার তখন হ্রাস বলা যায় না এবং যাহা পরক্ষণেই উৎপন্ন হইয়া সেই একক্ষণ মাত্র বিদ্যমান থাকে, তাহারও ঐ সময়ে বৃদ্ধি বলা যায় না। সুতরাং উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধি এবং বিনাশের কারণ অবয়বের বিভাগ বা হ্রাস ক্ষণিকত্ব পক্ষে সম্ভবই নহে। তাহা হইলে ক্ষণিকবাদীর মতে অবয়বের হ্রাস ব্যতীতও যে বিনাশ হয়, এবং অবয়বের বৃদ্ধি ব্যতীতও যে উৎপত্তি হয়, সেই বিনাশ ও উৎপত্তিতে কোন কারণের উপলব্ধি না হওয়ায় কারণ নাই। সুতরাং কারণের অভাবে প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে না পারায় উহা ক্ষণিক হইতে পারে না। স্ফটিকাদি দ্রব্যের যদি প্রতিক্ষণেই একের উৎপত্তি ও অপরের বিনাশ হইত, তাহা হইলে তাহার কারণের উপলব্ধি হইত। কারণ, সর্ব্বত্রই উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ ব্যতীত কুত্রাপি কাহারও উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায় না, তাহা হইতেই পারে না। সূত্রে নঞর্থ "ন"শব্দের সহিত সমাস হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের অনুপলব্ধিই এখানে মহর্ষির কথিত হেতু বুঝা যায়। তাহা হইলে স্ফটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি না হওয়ায় কারণাভাবে তাহা হইতে পারে না, সুতরাং স্ফটিকাদি দ্রব্যমাত্র ক্ষণিক নহে, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ বলিলে মহর্ষির তাৎপর্য্যও সরলভাবে প্রকটিত হয়। পরবর্ত্তী দুই সূত্রেও "অনুপলব্ধি" শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু মহর্ষি অন্যান্য সূত্রের ন্যায় এই সূত্রে "অনুপলব্ধি" শব্দের প্রয়োগ না করায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধিই মহর্ষির কথিত হেতু বুঝিয়াছেন এবং সেইরূপই সূত্রার্থ বলিয়াছেন। এই অর্থে সূত্রকারের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর কল্পান্তরে এই সূত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন যে, কারণ বলিতে আধার, কার্য্য বলিতে আধেয়। সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী) হইলে আধারাধেয়ভাব সম্ভব হয় না, কেহ কাহারও আধার হইতে পারে না। আধারাধেয়ভাব ব্যতীত কার্য্যকারণ ভাব হইতে পারে না। কার্য্যকারণভাবের উপলব্ধি হওয়ায় বস্তু মাত্র ক্ষণিক নহে। ক্ষণিকবাদী যদি বলেন যে, আমরা কারণ ও কার্য্যের আধারাধেয়ভাব মানি না, কোন কার্য্যই আমাদিগের মতে সাধার নহে। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সমস্ত কার্য্যই আধারশূন্য, ইহা হইতেই পারে না। পরন্তু তাহা বলিলে ক্ষণিকবাদীর নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত

হয়। কারণ, তিনিও রূপের আধার স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদী যদি বলেন যে, কারণের বিনাশক্ষণেই কার্য্যের উৎপত্তি হওয়ায় ক্ষণিক পদার্থেরও কার্য্যকারণভাব সম্ভব হয়। যেমন একই সময়ে তুলাদণ্ডের এক দিকের উন্নতি ও অপরদিকের অধোগতি হয়, তদ্রূপ একই ক্ষণে কারণ-দ্রব্যের বিনাশ ও কার্য্য দ্রব্যের উৎপত্তি অবশ্য হইতে পারে। পূর্ব্বক্ষণে কারণ থাকাতেই সেখানে পরক্ষণে কার্য্য জন্মিতে পারে। এতদুত্তরে শেষে আবার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকত্বপক্ষে কার্য্যকারণভাব হয় না, ইহা বলা হয় নাই। আধারাধেয়ভাব হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে, উহাই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত হেতু। কারণ ও কার্য্য ভিন্নকালীন পদার্থ হইলে কারণ কার্য্যের আধার হইতে পারে না। কার্য্য নিরাধার, ইহা কুত্রাপি দেখা যায় না, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং আধারাধেয়ভাবের অনুপপত্তিবশতঃ বস্তু মাত্র ক্ষণিক নহে॥ ১২ ॥

সূত্র। ক্ষীরবিনাশে কারণানুপলব্ধিবদ্দধ্যুৎপত্তিবচ্চ তদুপপত্তিঃ ॥১৩॥২৮৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) দুগ্ধের বিনাশে কারণের অনুপলব্ধির ন্যায় এবং দধির উৎপত্তিতে কারণের অনুপলব্ধির ন্যায় তাহার (প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধির) উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। যথাঽনুপলভ্যমানং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎপত্তিকারণঞ্চাভ্যনুজ্ঞায়তে, তথা স্ফটিকেঽপরাপরাসু ব্যক্তিষু বিনাশকারণমুৎপত্তিকারণঞ্চাভ্যনুজ্ঞেয়মিতি।

অনুবাদ। যেমন অনুপলভ্যমান দুগ্ধধ্বংসের কারণ এবং দধির উৎপত্তির কারণ স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ স্ফটিকে ও অপরাপর ব্যক্তিসমূহে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জায়মান ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকসমূহে বিনাশের কারণ ও উৎপত্তির কারণ স্বীকার্য্য।

টিপ্পনী। মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে ক্ষণিকবাদী বলিতে পারেন যে, কারণের উপলব্ধি না হইলেই যে কারণ নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, দধির উৎপত্তির স্থলে দুগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির কোন কারণই উপলব্ধি করা যায় না। যে ক্ষণে দুগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তি হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে উহার কোন কারণ বুঝা যায় না। কিন্তু ঐ দুগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির যে কারণ আছে, কারণ ব্যতীত উহা হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তদ্রূপ প্রতিক্ষণে স্ফটিকের নাশ ও অন্যান্য স্ফটিকের উৎপত্তি যাহা বলিয়াছি, তাহারও অবশ্য কারণ আছে। ঐ কারণের উপলব্ধি না হইলেও উহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ক্ষণিকবাদীর বক্তব্য এই কথাই বলিয়াছেন॥ ১৩ ॥

সূত্র। লিঙ্গতো গ্রহণান্নানুপলব্ধিঃ ॥১৪॥২৮৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা (দুগ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের) জ্ঞান হওয়ায় অনুপলব্ধি নাই।

ভাষ্য। ক্ষীরবিনাশলিঙ্গং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎপত্তিলিঙ্গং দধ্যুৎপত্তিকারণঞ্চ গৃহ্যতেঽতো নানুপলব্ধিঃ। বিপর্য্যয়স্তু স্ফটিকাদিষু দ্রব্যেষু, অপরাপরোৎপত্তৌ ব্যক্তীনাং ন লিঙ্গমস্তীত্যনুৎপত্তিরেবেতি।

অনুবাদ। দুগ্ধের বিনাশ যাহার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, সেই দুগ্ধ বিনাশের কারণ, এবং দধির উৎপত্তি যাহার লিঙ্গ, সেই দধির উৎপত্তির কারণ গৃহীত হয়, অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি হয়, অতএব (ঐ কারণের) অনুপলব্ধি নাই। কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্যসমূহে বিপর্য্যয়, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের অনুমান প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় না। (কারণ) ব্যক্তিসমূহের অপরাপরোৎপত্তিতে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদি দ্রব্যের উৎপত্তিতে লিঙ্গ (অনুমাপক হেতু) নাই, এজন্য অনুৎপত্তিই (স্বীকার্য্য)।

টিপ্পনী। ক্ষণিকবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তিরূপ কার্য্য তাহার কারণের লিঙ্গ, অর্থাৎ কারণের অনুমাপক, তদ্দ্বারা তাহার কারণের অনুমানরূপ উপলব্ধি হওয়ায় সেখানে কারণের অনুপলব্ধি নাই। সেখানে ঐ কারণের প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি না হইলেও যখন কার্য্য দ্বারা উহার অনুমানরূপ উপলব্ধি হয়, তখন আর অনুপলব্ধি বলা যায় না। কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে যে উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন লিঙ্গ নাই, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় অনুমানপ্রমাণও নাই, আর কোন প্রমাণও নাই। সুতরাং তাহা অসিদ্ধ হওয়ায় তদ্দ্বারা তাহার কারণের অনুমান অসম্ভব। প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি না হইলেই অনুপলব্ধি বলা যায় না। দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার কারণের অনুমান হইতে পারে। যে কার্য্য প্রমাণসিদ্ধ, যাহা উভয়বাদিসম্মত, তাহা তাহার কারণের অনুমাপক হয়। কিন্তু ক্ষণিকবাদীর সম্মত স্ফটিকাদি দ্রব্যে ইহার বিপর্য্যয়। কারণ, প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদির উৎপত্তিতে কোন লিঙ্গ নাই। উহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় অনুমানপ্রমাণও না থাকায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদির অনুৎপত্তিই স্বীকার্য্য। ফল কথা, ক্ষণিকবাদী স্বমত সমর্থনে যে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, তাহা অলীক। কারণ, দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধি নাই, অনুমানপ্রমাণ-জন্য উপলব্ধিই আছে॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। অত্র কশ্চিৎ পরীহারমাহ—

অনুবাদ। এই বিষয়ে কেহ (সাংখ্য) পরীহার বলিতেছেন—

সূত্র। ন পয়সঃ পরিণাম-গুণান্তরপ্রাদুর্ভাবাৎ ॥

॥১৫॥২৮৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ দুগ্ধের যে বিনাশ বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, যেহেতু দুগ্ধের পরিণাম অথবা গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হয়।

ভাষ্য। পয়সঃ পরিণামো ন বিনাশ ইত্যেক আহ। পরিণামশ্চাবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিরিতি। গুণান্তরপ্রাদুর্ভাব ইত্যপর আহ। সতো দ্রব্যস্য পূর্ব্বগুণনিবৃত্তৌ গুণান্তরমুৎপদ্যত ইতি। স খল্বেক-পক্ষীভাব ইব।

অনুবাদ। দুগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না, ইহা এক আচার্য্য বলেন। পরিণাম কিন্তু অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি। গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হয়, ইহা অন্য আচার্য্য বলেন। বিদ্যমান দ্রব্যের পূর্ব্বগুণের নিবৃত্তি হইলে অন্য গুণ উৎপন্ন হয়। তাহা একপক্ষীভাবের তুল্য, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুইটি পক্ষ এক পক্ষ না হইলেও এক পক্ষের তুল্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রে ক্ষণিকবাদীর যে সমাধান কথিত হইয়াছে, মহর্ষি পূর্ব্ব-সূত্রের দ্বারা তাহার পরীহার করিয়াছেন। এখন সাংখ্যাদি সম্প্রদায় ঐ সমাধানের যে পরীহার (খণ্ডন) করিয়াছেন, তাহাই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়া, পরসূত্রের দ্বারা ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। সাংখ্যাদি সম্প্রদায় দুগ্ধের বিনাশ এবং অবিদ্যমান দধির উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না। দুগ্ধ হইতে দধি হইলে দুগ্ধের ধ্বংস হয় না, দুগ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। উহাই সেখানে দুগ্ধের "পরিণাম"। কেহ বলিয়াছেন যে, দুগ্ধের পরিণাম হয় না, কিন্তু তাহাতে অন্য গুণের প্রাদুর্ভাব হয়। দুগ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বগুণের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য গুণের উৎপত্তি হয়। ইহারই নাম "গুণান্তরপ্রাদুর্ভাব"। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "পরিণাম" ও "গুণান্তরপ্রাদুর্ভাব"কে দুইটি পক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা দুইটি পক্ষ থাকিলেও বিচার করিলে বুঝা যায়, ইহা এক পক্ষের তুল্য। তাৎপর্য্য এই যে, "পরিণাম" ও "গুণান্তরপ্রাদুর্ভাব" এই উভয় পক্ষেই দ্রব্য অবস্থিতই থাকে, দ্রব্যের বিনাশ হয় না। প্রথম পক্ষে দ্রব্যের পূর্ব্বধর্ম্মের তিরোভাব ও অন্য ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। দ্বিতীয় পক্ষে পূর্ব্ব-গুণের বিনাশ ও অন্য গুণের প্রাদুর্ভাব হয়। উভয় পক্ষেই সেই দ্রব্যের ধ্বংস না হওয়ায় উহা একই পক্ষের তুল্যই বলা যায়। সুতরাং একই যুক্তির দ্বারা উহা নিরস্ত হইবে। মূলকথা, এই উভয়

পক্ষেই দুগ্ধের বিনাশ ও অবিদ্যমান দধির উৎপত্তি না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রে দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধিকে যে দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে, তাহা বলাই যায় না। সুতরাং ক্ষণিকবাদীর ঐ সমাধান একেবারেই অসম্ভব ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। অত্র তু প্রতিষেধঃ —

অনুবাদ। এই উভয় পক্ষেই প্রতিষেধ (উত্তর) [বলিতেছেন]

সূত্র। ব্যূহান্তরাদ্‌দ্রব্যান্তরোৎপত্তিদর্শনং পূর্ব্বদ্রব্য-নিবৃত্তেরনুমানং ॥১৬॥২৮৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) "ব্যূহান্তর" প্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বের অন্যরূপ রচনা-প্রযুক্ত দ্রব্যান্তরের উৎপত্তিদর্শন পূর্ব্বদ্রব্যের বিনাশের অনুমান (অনুমাপক)।

ভাষ্য। সংমূর্চ্ছনলক্ষণাদবয়বব্যূহাদ্‌দ্রব্যান্তরে দধ্ন্যুৎপন্নে গৃহ্যমাণে পূর্ব্বং পয়োদ্রব্যমবয়ববিভাগেভ্যো নিবৃত্তমিত্যনুমীয়তে, যথা মৃদবয়বানাং ব্যূহান্তরাদ্‌দ্রব্যান্তরে স্থাল্যামুৎপন্নায়াং পূর্ব্বং মৃৎপিণ্ডদ্রব্যং মৃদবয়ববিভা-গেভ্যো নিবর্ত্তত ইতি। মৃদ্বচ্চাবয়বান্বয়ঃ পয়োদধ্নোর্নাঽশেষনিরোধে নিরন্বয়ো দ্রব্যান্তরোৎপাদো ঘটত ইতি।

অনুবাদ। সংমূর্চ্ছনরূপ অবয়বব্যূহজন্য অর্থাৎ দুগ্ধের অবয়বসমূহের বিভাগের পরে পুনর্ব্বার তাহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্য উৎপন্ন দধিরূপ দ্রব্যান্তর গৃহ্যমাণ (প্রত্যক্ষ) হইলে অবয়বসমূহের বিভাগ প্রযুক্ত দুগ্ধরূপ পূর্ব্বদ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয়। যেমন মৃত্তিকার অবয়বসমূহের অন্যরূপ ব্যূহ-জন্য অর্থাৎ ঐ অবয়বসমূহের বিভাগের পরে পুনর্ব্বার উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্য দ্রব্যান্তর স্থালী উৎপন্ন হইলে মৃত্তিকার অবয়বসমূহের বিভাগপ্রযুক্ত পিণ্ডাকার মৃত্তিকারূপ পূর্ব্বদ্রব্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু দুগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার ন্যায় অবয়বের অন্বয় অর্থাৎ মূল পরমাণুর সম্বন্ধ থাকে। (কারণ) অশেষনিরোধ হইলে অর্থাৎ দ্রব্যের পরমাণু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে নিরন্বয় দ্রব্যান্তরোৎপত্তি সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের অবয়বের অন্যরূপ ব্যূহ-জন্য দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, উহা দেখিয়া সেখানে পূর্ব্বদ্রব্যের বিনাশের অনুমান করা যায়। ঐ দ্রব্যান্তরোৎপত্তিদর্শন সেখানে পূর্ব্বদ্রব্য বিনাশের অনুমাপক। ভাষ্যকার প্রকৃতস্থলে মহর্ষির কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দধিরূপ দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইলে

সেখানে দুগ্ধের অবয়বসমূহের বিভাগজন্য সেই পূর্ব্বদ্রব্য দুগ্ধ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমান দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন যে, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা লইয়া স্থালী নির্ম্মাণ করিলে, সেখানে ঐ পিণ্ডাকার মৃত্তিকার অবয়বগুলির বিভাগ হয়, তাহার পরে ঐ সকল অবয়বের পুনর্ব্বার অন্যরূপ ব্যূহ (সংযোগবিশেষ) হইলে তজ্জন্য স্থালীনামক দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়। সেখানে ঐ পিণ্ডাকার মৃত্তিকা থাকে না, উহার অবয়বসমূহের বিভাগজন্য উহার বিনাশ হয়। এইরূপ দধির উৎপত্তিস্থলেও পূর্ব্বদ্রব্য দুগ্ধ বিনষ্ট হয়। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা দধির উৎপত্তি-স্থলে দুগ্ধের বিনাশ সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, দুগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার ন্যায় অবয়বের অন্বয় থাকে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, দধির উৎপত্তিস্থলে দুগ্ধ বিনষ্ট হইলেও যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত স্থালীতে ঐ মৃত্তিকার মূল পরমাণুরূপ অবয়বের অন্বয় থাকে, স্থালী ও মৃত্তিকার মূল পরমাণুর ভেদ না থাকায় স্থালীতে উহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে, তদ্রূপ দুগ্ধ ও দধির মূল পরমাণুর ভেদ না থাকায় দুগ্ধ ও দধিতে সেই মূল পরমাণুর অন্বয় বা বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। ভাষ্যকারের গূঢ় অভিসন্ধি এই যে, আমরা দধির উৎপত্তিস্থলে দুগ্ধের ধ্বংস স্বীকার করিলেও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় "অশেষনিরোধ" অর্থাৎ মূল পরমাণু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করি না, একেবারে কারণের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধশূন্য (নিরন্বয়) দ্রব্যান্তরোৎপত্তি আমরা স্বীকার করি না। ভাষ্যকার ইহার হেতুরূপে শেষে বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের "অশেষনিরোধ" অর্থাৎ পরমাণু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে নিরন্বয় দ্রব্যান্তরোৎপত্তি ঘটে না, অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না, আধার না থাকিলে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুমাত্র ক্ষণিক হইলে কোন বস্তুরই আধার থাকে না। সুতরাং ঐ মতে কোন বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। মূলকথা, দধির উৎপত্তি-স্থলে পূর্ব্বদ্রব্য দুগ্ধের পরিণাম বা গুণান্তর-প্রাদুর্ভাব হয় না, দুগ্ধের বিনাশই হইয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার কারণের অনুপলব্ধি বলা যাইতে পারে না। কারণ, অম্ল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধের বিলক্ষণ-সংযোগ হইলে ক্রমে ঐ দুগ্ধের অবয়বগুলির বিভাগ হয়, উহা সেখানে দুগ্ধ ধ্বংসের কারণ। দুগ্ধরূপ অবয়বীর বিনাশ হইলে পাকজন্য ঐ দুগ্ধের মূল পরমাণুসমূহে বিলক্ষণ রসাদি জন্মে, পরে সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারাই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সেখানে দধিনামক দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়। ঐ দ্ব্যণুকাদিজনক ঐ সমস্ত অবয়বের পুনর্ব্বার যে বিলক্ষণ সংযোগ, উহাই সেখানে দধির অসমবায়ি-কারণ। উহাই সেখানে দুগ্ধের অবয়বের "ব্যূহান্তর"। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "সংমূর্চ্ছন"[১]। "ব্যূহ" শব্দের দ্বারা নির্ম্মাণ বা রচনা বুঝা যায়[২]। অবয়বসমূহের বিলক্ষণ সংযোগরূপ আকৃতিই উহার ফলিতার্থ[৩]। উহাই জন্যদ্রব্যের অসমবায়ি-কারণ। উহার ভেদ হইলে তজ্জন্য দ্রব্যের ভেদ হইবেই। অতএব

১। দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৬৭ সূত্রভাষ্যে "মূর্চ্ছিতাবয়ব" শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন—"মূর্চ্ছিতাঃ পরস্পরং সংযুক্তা অবয়বা যস্য"।

২। ব্যূহঃ স্যাদ্ বলবিন্যাসে নির্ম্মাণে বৃন্দতর্কয়োঃ।—মেদিনী।

৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে আকৃতিলক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার আকৃতিকে অবয়বের "ব্যূহ" বলিয়াছেন।

দধির উৎপত্তিস্থলে ঐ ব্যূহ বা আকৃতির ভেদ হওয়ায় দধিনামক দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার্য্য। সুতরাং সেখানে পূর্ব্বদ্রব্য দুগ্ধের বিনাশও স্বীকার্য্য। দুগ্ধের বিনাশ না হইলে সেখানে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, দুগ্ধ বিদ্যমান থাকিলে উহা সেখানে দধির উৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয়। কিন্তু দধির উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহার দ্বারা সেখানে পূর্ব্বদ্রব্য দুগ্ধের বিনাশ অনুমানসিদ্ধও হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও যাঁহারা তাহা মানিবেন না, তাঁহাদিগের জন্যই মহর্ষি এখানে উহার অনুমান বা যুক্তি বলিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। অভ্যনুজ্ঞায় চ নিষ্কারণং ক্ষীরবিনাশং দধ্যুৎপাদঞ্চ প্রতিষেধ উচ্যতে—

অনুবাদ। দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তিকে নিষ্কারণ স্বীকার করিয়াও (মহর্ষি) প্রতিষেধ বলিতেছেন—

সূত্র। ক্বচিদ্বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ ক্বচিচ্চোপলব্ধেরনেকান্তঃ ॥১৭॥২৮৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) কোন স্থলে বিনাশের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ এবং কোন স্থলে বিনাশের কারণের উপলব্ধিবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত) একান্ত (নিয়ত) নহে।

ভাষ্য। ক্ষীরদধিবন্নিষ্কারণৌ বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকাদিব্যক্তীনামিতি নায়মেকান্ত ইতি। কস্মাৎ? হেত্বভাবাৎ, নাত্র হেতুরস্তি। অকারণৌ বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং ক্ষীরদধিবৎ, ন পুনর্যথা বিনাশকারণভাবাৎ কুম্ভস্য বিনাশ উৎপত্তিকারণভাবাচ্চ উৎপত্তিরেবং স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং বিনাশোৎপত্তিকারণভাবাদ্বিনাশোৎপত্তিভাব ইতি। **নিরধিষ্ঠানঞ্চ দৃষ্টান্তবচনং।** গৃহ্যমাণয়োর্ব্বিনাশোৎপাদয়োঃ স্ফটিকাদিষু স্যাদয়মাশ্রয়বান্ দৃষ্টান্তঃ ক্ষীরবিনাশকারণানুপলব্ধিবৎ দধ্যুৎপত্তিকারণানুপলব্ধিবচ্চেতি, তৌ তু ন গৃহ্যেতে, তস্মান্নিরধিষ্ঠানোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইতি। **অভ্যনুজ্ঞায় চ স্ফটিকস্যোৎপাদবিনাশৌ যোঽত্র সাধকস্তস্যাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ।** কুম্ভবন্ন নিষ্কারণৌ বিনাশোৎপাদৌ স্ফটিকাদীনামিত্যভ্যনুজ্ঞেয়োঽয়ং দৃষ্টান্তঃ, প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ। ক্ষীরদধি-

বস্তু নিষ্কারণৌ বিনাশোৎপাদাবিতি শক্যোঽয়ং প্রতিষেদ্ধুং ; কারণতো বিনাশোৎপত্তিদর্শনাৎ। ক্ষীরদধ্নোর্ব্বিনাশোৎপত্তী পশ্যতা তৎকারণমনুমেয়ং। কার্য্যলিঙ্গং হি কারণমিতি। উপপন্নমনিত্যা বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, ইহা একান্ত নহে অর্থাৎ ঐরূপ দৃষ্টান্ত নিয়ত নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) হেতুর অভাবপ্রযুক্ত ;—এই বিষয়ে হেতু নাই। (কোন্ বিষয়ে হেতু নাই, তাহা বলিতেছেন) স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, কিন্তু যেমন বিনাশের কারণ থাকায় কুম্ভের বিনাশ হয়, এবং উৎপত্তির কারণ থাকায় কুম্ভের উৎপত্তি হয়, এইরূপ স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের সত্তাপ্রযুক্ত বিনাশ ও উৎপত্তি হয়, ইহা নহে।

পরন্তু দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরাশ্রয়। বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যে বিনাশ ও উৎপত্তি গৃহ্যমাণ (প্রত্যক্ষ) হইলে "দুগ্ধের বিনাশের কারণের অনুপলব্ধির ন্যায়" এবং "দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধির ন্যায়" এই দৃষ্টান্ত আশ্রয়বিশিষ্ট হয়, কিন্তু (স্ফটিকাদি দ্রব্যে) সেই বিনাশ ও উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব এই দৃষ্টান্ত নিরাশ্রয় অর্থাৎ উহার আশ্রয়-ধর্ম্মীই নাই। সুতরাং উহা দৃষ্টান্তই হইতে পারে না।

পরন্তু স্ফটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া, এই বিষয়ে যাহা সাধক অর্থাৎ দৃষ্টান্ত, তাহার স্বীকারপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, কুম্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ নহে, অর্থাৎ তাহারও কারণ আছে, এই দৃষ্টান্তই স্বীকার্য্য। কারণ, (উহা) প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, এই দৃষ্টান্ত প্রতিষেধ করিতে পারা যায়, যেহেতু কারণজন্যই বিনাশ ও উৎপত্তি দেখা যায়। দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তি দর্শন করতঃ তাহার কারণ অনুমেয়, যেহেতু কারণ কার্য্য-লিঙ্গ, অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা অনুমেয়। বুদ্ধি অনিত্য, ইহা উপপন্ন হইল।

টিপ্পনী। মহর্ষি, দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধি নাই, অনুমান দ্বারা উহার উপলব্ধি হয়, সুতরাং উহার কারণ আছে, এই সিদ্ধান্ত বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রোক্ত ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া, তাহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এখন ঐ দুগ্ধের বিনাশ ও

দধির উৎপত্তির কোন কারণ নাই—উহা নিষ্কারণ, ইহা স্বীকার করিয়াও ক্ষণিকবাদীর মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকবাদীর ঐ দৃষ্টান্তও একান্ত নহে। অর্থাৎ স্ফটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ আছে কি না, ইহা বুঝিতে যে, তাঁহার কথিত ঐ দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার নিয়ম নাই। কারণ, যেখানে বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয়, এমন দৃষ্টান্তও আছে। কুম্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই কারণ জন্যই কুম্ভের বিনাশ ও উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। সুতরাং প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করিলে কুম্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় তাহারও কারণ আবশ্যক; কারণ ব্যতীত তাহা হইতে পারে না, ইহাও বলিতে পারি। কারণ, প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, কিন্তু কুম্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় সকারণ নহে, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র উভয় পক্ষেই আছে।

ভাষ্যকার সূত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিবার জন্য নিজে আরও বলিয়াছেন যে, ঐ দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরাশ্রয়। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে প্রতিক্ষণে স্ফটিকের বিনাশ ও উৎপত্তিই ক্ষণিকবাদীর অভিমত ধর্ম্মী, তাহার সমান-ধর্ম্মতাবশতঃ দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ ধর্ম্মী প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অন্য কোন প্রমাণসিদ্ধও নহে, সুতরাং আশ্রয় অসিদ্ধ হওয়ায় ক্ষণিকবাদীর কথিত ঐ দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, স্ফটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে তাহার সাধক কোন দৃষ্টান্ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর ক্ষণিকবাদী স্ফটিকাদির ঐ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের প্রতিষেধ করিতে পারিবেন না। তাৎপর্য্য এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি কুম্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় সকারণ, এইরূপ দৃষ্টান্তই অবশ্য স্বীকার্য্য; কারণ, উহা প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না। সর্ব্বত্র কারণজন্যই বস্তুর বিনাশ ও উৎপত্তি দেখা যায়। সুতরাং স্ফটিকাদির বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, এইরূপ দৃষ্টান্ত স্বীকার করা যায় না। দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন ঐ প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণের অনুমান করিতে হইবে। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই জন্মিতে পারে না, সুতরাং কারণ কার্য্যলিঙ্গ, অর্থাৎ কার্য্য দ্বারা অপ্রত্যক্ষ কারণ অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ সূত্র ও তাহার ভাষ্যেও এইরূপ যুক্তির দ্বারা ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। ফলকথা, প্রতিক্ষণেই যে স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি হইবে, তাহার কারণ নাই। কারণের অভাবে তাহা হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে ঐরূপ বিনাশ ও উৎপত্তির প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণও নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার কারণের অনুমানও সম্ভব নহে। দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার কারণের অনুমান হয়,—

উহা নিষ্কারণ নহে। মূল কথা, বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, ইহা কোনরূপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা পূর্ব্বোক্ত একাদশ সূত্রে বলা হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ সূত্রে বস্তুমাত্র যে ক্ষণিক হইতেই পারে না, এ বিষয়ে প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বিশেষরূপ অভ্যুদয় হওয়ায় তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ সূত্রের বার্ত্তিকে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব পক্ষে নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক কথার উল্লেখপূর্ব্বক বিস্তৃত বিচার দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য সূক্ষ্ম যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, বস্তু ক্ষণিক না হইলে তাহা কোন কার্য্যজনক হইতে পারে না। সুতরাং যাহা সৎ, তাহা সমস্তই ক্ষণিক। কারণ, "সৎ" বলিতে অর্থক্রিয়াকারী। যাহা অর্থক্রিয়া অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ যাহা কোন কার্য্যের জনক, তাহাকে বলে অর্থক্রিয়াকারী। অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কোন কার্য্যজনকত্বই বস্তুর সত্ত্ব। যাহা কোন কার্য্যের জনক হয় না, তাহা "সৎ" নহে, যেমন নরশৃঙ্গাদি। ঐ অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রম অথবা যৌগপদ্যের ব্যাপ্য। অর্থাৎ যাহা কোন কার্য্যকারী হইবে, তাহা ক্রমকারী অথবা যুগপৎকারী হইবে। যেমন বীজ অঙ্কুরের জনক, বীজে অঙ্কুর নামক কার্য্যকারিত্ব থাকায় উহা "সৎ"। সুতরাং বীজ ক্রমে—কালবিলম্বে অঙ্কুর জন্মাইবে, অথবা যুগপৎ সমস্ত অঙ্কুর জন্মাইবে। অর্থাৎ বীজে ক্রমকারিত্ব অথবা যুগপৎকারিত্ব থাকিবে। নচেৎ বীজে অঙ্কুরজনকত্ব থাকিতে পারে না। ঐ ক্রমকারিত্ব এবং যুগপৎকারিত্ব ভিন্ন তৃতীয় আর কোন প্রকার নাই—যেরূপে বীজাদি সৎপদার্থ অঙ্কুরাদির কারণ হইতে পারে। এখন যদি বীজকে ক্ষণমাত্র-স্থায়ী স্বীকার করা না যায়, বীজ যদি স্থির পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা অঙ্কুর-জনক হইতে পারে না। কারণ, বীজ স্থির পদার্থ হইলে গৃহস্থিত বীজ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের কোন ভেদ না থাকায় গৃহস্থিত বীজ হইতেও অঙ্কুর জন্মিতে পারে। অঙ্কুরের প্রতি বীজত্বরূপে বীজ কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীজত্ব থাকায় তাহাও অঙ্কুর জন্মায় না কেন? যদি বল যে, মৃত্তিকা ও জলাদি সমস্ত সহকারী কারণ উপস্থিত হইলেই বীজ অঙ্কুর জন্মায়, সুতরাং বীজে ক্রমকারিত্বই আছে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ স্থির বীজ কি অঙ্কুর জননে সমর্থ? অথবা অসমর্থ? যদি উহা স্বভাবতঃই অঙ্কুরজননে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই অঙ্কুর জন্মাইবে। যে বস্তু সর্ব্বদাই যে কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ, সে বস্তু ক্রমশঃ কালবিলম্বে ঐ কার্য্য জন্মাইবে কেন? পরন্তু স্থির বীজ অঙ্কুরজননে সমর্থ হইলে ক্ষেত্রস্থ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায়, তদ্রূপ ঐ বীজই গৃহে থাকা কালে কেন অঙ্কুর জন্মায় না? আর যদি স্থির বীজ অঙ্কুর জননে অসমর্থই হয়, তবে তাহা ক্রমে কালবিলম্বেও অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। যাহা অসমর্থ, যে কার্য্যজননে যাহার সামর্থ্যই নাই, তাহা সহকারী লাভ করিলেও সে কার্য্য জন্মাইতে পারে না। যেমন শিলাখণ্ড কোন কালেই অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। মৃত্তিকা ও জলাদি ক্রমিক সহকারী কারণগুলি লাভ করিলেই বীজ অঙ্কুরজননে সমর্থ হয়, ইহা বলিলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ সহকারী কারণগুলি কি বীজে

কোন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে? অথবা শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে না? যদি বল, শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে ঐ শক্তিবিশেষই অঙ্কুরের কারণ হইবে। বীজের অঙ্কুরকারণত্ব থাকিবে না। কারণ, সহকারী কারণজন্য ঐ শক্তিবিশেষ জন্মিলেই অঙ্কুর জন্মে। উহার অভাবে অঙ্কুর জন্মে না, এইরূপ "অন্বয়" ও "ব্যতিরেকে"র নিশ্চয়বশতঃ ঐ শক্তিবিশেষেরই অঙ্কুরজনকত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বল, সহকারী কারণগুলি বীজে কোন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে না। তাহা হইলে অঙ্কুরকার্য্যে উহারা অপেক্ষণীয় নহে। কারণ, যাহারা অঙ্কুরজননে কিছুই করে না, তাহারা অঙ্কুরের নিমিত্ত হইতে পারে না। পরন্তু সহকারী কারণগুলি বীজে কোন শক্তিবিশেষই উৎপন্ন করে, এই পক্ষে ঐ শক্তিবিশেষ আবার অন্য কোন শক্তিবিশেষকে উৎপন্ন করে কি না, ইহা বক্তব্য। যদি বল, অন্য শক্তিবিশেষকে উৎপন্ন করে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ অনিবার্য্য। কারণ, তাহা হইলে সেই অপর শক্তিবিশেষই অঙ্কুরকার্য্যে কারণ হওয়ায় বীজ অঙ্কুরের কারণ হইবে না। পরন্তু ঐ শক্তিবিশেষ-জন্য অপর শক্তিবিশেষ, তজ্জন্য আবার অপর শক্তিবিশেষ, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি স্বীকারে অপ্রামাণিক অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য হইবে। যদি বল যে, প্রত্যেক কারণই কার্য্যজননে সমর্থ, নচেৎ তাহাদিগকে কারণই বলা যায় না। কারণত্বই কারণের সামর্থ্য বা শক্তি, উহা ভিন্ন আর কোন শক্তি-পদার্থ কারণে নাই। কিন্তু কোন একটি কারণের দ্বারা কার্য্য জন্মে না, সমস্ত কারণ মিলিত হইলেই তদ্দ্বারা কার্য্য জন্মে, ইহা কার্য্যের স্বভাব। সুতরাং মৃত্তিকা ও জলাদি সহকারী কারণ ব্যতীত কেবল বীজের দ্বারা অঙ্কুর জন্মে না। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, যাহা যে কার্য্যের কারণ হইবে, তাহা সেই কার্য্যের স্বভাবের অধীন হইতে পারে না। তাহা হইলে তাহার কারণত্বই থাকে না। কার্য্যই কারণের স্বভাবের অধীন, কারণ কার্য্যের স্বভাবের অধীন নহে। যদি বল যে, কারণেরই স্বভাব এই যে, তাহা সহসা কার্য্য জন্মায় না, কিন্তু ক্রমে কালবিলম্বে কার্য্য জন্মায়। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে কোন্ সময়ে কার্য্য জন্মিবে, ইহা নিশ্চয় করা গেল না। পরন্তু যদি কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই, কার্য্যজনকত্ব কারণের স্বভাব হয়, তাহা হইলে কোন কার্য্যজননকালেও উক্ত স্বভাবের অনুবর্ত্তন হওয়ায় তখন আরও কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, এইরূপে সেই সকল ক্ষণ অতীত হইলে আরও কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, সুতরাং কোন কালেই কার্য্য জন্মিতে পারিবে না। কারণ, উহা কোন্ সময় হইতে কত কাল অপেক্ষা করিয়া কার্য্য জন্মায়, ইহা স্থির করিয়া বলিতে না পারিলে তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ স্বভাব নির্ণয় করা যায় না। সহকারী কারণগুলি সমস্ত উপস্থিত হইলেই কারণ কার্য্য জন্মায়, উহাই কারণের স্বভাব, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কে সহকারী কারণ, আর কে মুখ্য কারণ, ইহা কিরূপে বুঝিব? যাহা অন্য কারণের সাহায্য করে, তাহাই সহকারী কারণ, ইহা বলিলে ঐ সাহায্য কি, তাহা বলা আবশ্যক। মৃত্তিকা ও জলাদি বীজের যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে, উহাই সেখানে সাহায্য, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ঐ মৃত্তিকাদি অঙ্কুরের কারণ হয় না, ঐ শক্তিবিশেষই কারণ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরন্তু বীজ সহকারী কারণগুলির সহিত

মিলিত হইয়াই অঙ্কুর জন্মায়, ইহা তাহার স্বভাব হইলে ঐ স্বভাববশতঃ কখনও সহকারী কারণগুলিকে ত্যাগ করিবে না, উহারা পলায়ন করিতে গেলেও স্বভাববশতঃ উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসিয়া অঙ্কুর জন্মাইবে। কারণ, স্বভাবের বিপর্য্যয় হইতে পারে না, বিপর্য্যয় বা ধ্বংস হইলে তাহাকে স্বভাবই বলা যায় না। মূল কথা, সংকারী কারণ বলিয়া কোন কারণ হইতেই পারে না। বীজই অঙ্কুরের কারণ, কিন্তু উহা বীজত্বরূপে অঙ্কুরের কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীজত্ব থাকায় তাহা হইতেও অঙ্কুর জন্মিতে পারে। এজন্য বীজবিশেষে জাতিবিশেষ স্বীকার করিতে হইবে। ঐ জাতিবিশেষের নাম "কুর্ব্বদ্রূপত্ব"। বীজ ঐরূপেই অঙ্কুরের কারণ, বীজত্বরূপে কারণ নহে। যে বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, তাহাতেই ঐ জাতিবিশেষ (অঙ্কুরকুর্ব্বদ্রূপত্ব) আছে, গৃহস্থিত বীজে উহা নাই, সুতরাং তাহা ঐ জাতিবিশিষ্ট না হওয়ায় অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, তাহা অঙ্কুরের কারণই নহে। বীজে ঐরূপ জাতিবিশেষ স্বীকার্য্য হইলে অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বীজেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বপূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী এবং তৎপূর্ব্বকালবর্ত্তী বীজে ঐ জাতিবিশেষ (অঙ্কুরকুর্ব্বদ্রূপত্ব) থাকিলে পূর্ব্বেও অঙ্কুরের কারণ থাকায় অঙ্কুরোৎপত্তি অনিবার্য্য হয়। যে ক্ষণে অঙ্কুর জন্মে, তাহার পূর্ব্বপূর্ব্বক্ষণ হইতে পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী একই বীজ হইলে তাহা ঐ জাতিবিশেষবিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বেও অঙ্কুর জন্মাইতে পারে। সুতরাং অঙ্কুরোৎপত্তির অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বীজেই ঐ জাতিবিশেষ স্বীকার্য্য। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বীজে ঐ জাতিবিশেষ না থাকায় তাহা অঙ্কুরের কারণই নহে; সুতরাং পূর্ব্বে অঙ্কুর জন্মে না। তাহা হইলে অঙ্কুরোৎপত্তির অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বীজ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বীজ হইতে বিজাতীয় ভিন্ন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। কারণ, দ্বিক্ষণস্থায়ী একই বীজ ঐ জাতিবিশিষ্ট হইলে ঐ দুই ক্ষণেই অঙ্কুরের কারণ থাকে। ঐ একই বীজে পূর্ব্বক্ষণে ঐ জাতিবিশেষ থাকে না, দ্বিতীয় ক্ষণেই ঐ জাতিবিশেষ থাকে, ইহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং একই বীজ দ্বিক্ষণস্থায়ী নহে; বীজমাত্রই একক্ষণমাত্রস্থায়ী ক্ষণিক, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বীজ তাহার পূর্ব্বক্ষণে ছিল না, উহা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী বীজ হইতে পরক্ষণেই জন্মিয়াছে, এবং তাহার পরক্ষণেই অঙ্কুর জন্মাইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। বীজ হইতে প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তির প্রবাহ চলিতেছে, উহার মধ্যে যে ক্ষণে সেই বিজাতীয় (পূর্ব্বোক্ত জাতিবিশেষবিশিষ্ট) বীজটি জন্মে, তাহার পরক্ষণেই তজ্জন্য একটি অঙ্কুর জন্মে। এইরূপে একই ক্ষেত্রে ক্রমশঃ ঐ বিজাতীয় নানা বীজ জন্মিলে পরক্ষণে তাহা হইতে নানা অঙ্কুর জন্মে এবং ক্রমশঃ বহু ক্ষেত্রে ঐরূপ বহু বীজ হইতে বহু অঙ্কুর জন্মে। পূর্ব্বোক্তরূপ বিজাতীয় বীজই যখন অঙ্কুরের কারণ, তখন উহা সকল সময়ে না থাকায় সকল সময়ে অঙ্কুর জন্মিতে পারে না, এবং ক্রমশঃ ঐ সমস্ত বিজাতীয় বীজের উৎপত্তি হওয়ায় ক্রমশঃই উহারা সমস্ত অঙ্কুর জন্মায়। সুতরাং বীজ ক্ষণিক বা ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী পদার্থ হইলেই তাহার ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহা কোন কার্য্যের কারণ হইবে, তাহা ক্রমকারী হইবে, অথবা যুগপৎকারী হইবে। কিন্তু বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহা ক্রমকারী

হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহা ক্রমশঃ কালবিলম্বে অঙ্কুর জন্মাইবে, ইহার কোন যুক্তি নাই। কারণ, গৃহস্থিত ও ক্ষেত্রস্থিত একই বীজ হইলে অথবা অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষণ হইতে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী একই বীজ হইলে পূর্ব্বেও তাহা অঙ্কুর জন্মাইতে পারে। সহকারী কারণ কল্পনা করিয়া ঐ বীজের ক্রমকারিত্বের উপপাদন করা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ বীজের যুগপৎকারিত্বও সম্ভব হয় না। কারণ, বীজ একই সময়ে সমস্ত অঙ্কুর জন্মায় না, অথবা তাহার অন্যান্য সমস্ত কার্য্য জন্মায় না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। বীজের একই সময়ে সমস্ত কার্য্যজনন স্বভাব থাকিলে চিরকালই ঐ স্বভাব থাকিবে, সুতরাং ঐরূপ স্বভাব স্বীকার করিলে পুনঃ পুনঃ বীজের সমস্ত কার্য্য জন্মিতে পারে, তাহার বাধক কিছুই নাই। ফল কথা, বীজের যুগপৎকারিত্বও কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না, উহা অসম্ভব। বীজকে স্থির পদার্থ বলিলে যখন তাহার ক্রমকারিত্ব ও যুগপৎকারিত্ব, এই উভয়ই অসম্ভব, তখন তাহার "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" অর্থাৎ কার্য্যজনকত্ব থাকে না। সুতরাং বীজ "সৎ" পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব, ক্রমকারিত্ব অথবা যুগপৎকারিত্ব উহার ব্যাপক পদার্থ। ব্যাপক পদার্থ না থাকিলে তাহার অভাবের দ্বারা ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অনুমানসিদ্ধ হয়। যেমন বহ্নি ব্যাপক, ধূম তাহার ব্যাপ্য ; বহ্নি না থাকিলে সেখানে ধূম থাকে না, বহ্নির অভাবের দ্বারা ধূমের অভাব অনুমান সিদ্ধ হয়। এইরূপ বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহাতে ক্রমকারিত্ব এবং যুগপৎকারিত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়েরই অভাব থাকায় তদ্দ্বারা তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ "সত্ত্বে"র অভাব অনুমান সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে বীজ "সৎ" নহে, উহা "অসৎ", এই অপসিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বীজ ক্ষণিক পদার্থ হইলে তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রমে অঙ্কুর জন্মাইতে পারায় ক্রমকারী হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্বের বাধা হয় না। অতএব বীজ ক্ষণিক, ইহাই স্বীকার্য্য। বীজের ন্যায় "সৎ" পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক। কারণ, "সৎ" পদার্থ মাত্রই কোন না কোন কার্য্যের জনক, নচেৎ তাহাকে "সৎ"ই বলা যায় না। সৎ পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক না হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে তাহা কোন কার্য্যের জনক হইতে পারে না, স্থির পদার্থে ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং "বীজাদিকং সর্ব্বং ক্ষণিকং সত্ত্বাৎ" এইরূপে অনুমানের দ্বারা বীজাদি সৎ পদার্থমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়। ক্ষণিকত্ব বিষয়ে ঐরূপ অনুমানই প্রমাণ, উহা নিষ্প্রমাণ নহে। বৌদ্ধমহাদার্শনিক জ্ঞানশ্রী "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বীজাদি সৎ পদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইলে প্রতিক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন বীজই পরক্ষণে অপর বীজ উৎপন্ন করিয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তি ও বিনাশে উহার পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন বীজকেই কারণ বলিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সমর্থিত ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বৈদিক দার্শনিকগণ নানা গ্রন্থে বহু বিচারপূর্ব্বক বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, বীজাদি সকল পদার্থ ক্ষণিক হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। যেমন কোন বীজকে

পূর্ব্বে দেখিয়া পরে আবার দেখিলে তখন "সেই এই বীজ" এইরূপে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সেখানে বীজের "প্রত্যভিজ্ঞা" নামক প্রত্যক্ষবিশেষ। উহার দ্বারা বুঝা যায়, পূর্ব্বদৃষ্ট সেই বীজই পরজাত ঐ প্রত্যক্ষে বিষয় হইয়াছে। উহা পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী একই বীজ। প্রতিক্ষণে বীজের বিনাশ হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট সেই বীজ বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হওয়ায় "সেই এই বীজ" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ-বাধিত হওয়ায় উহা অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার উপপাদন করিতেও বহু কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, প্রতিক্ষণে বীজাদি বিনষ্ট হইলেও সেই ক্ষণে তাহার সজাতীয় অপর বীজাদির উৎপত্তি হইতেছে; সুতরাং পূর্ব্বদৃষ্ট বীজাদি না থাকিলেও তাহার সজাতীয় বীজাদি বিষয়েই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে। যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট প্রদীপশিখা বিনষ্ট হইলেও প্রদীপের অন্য শিখা দেখিলে "সেই এই দীপশিখা" এইরূপ সজাতীয় শিখা বিষয়েই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ বহু স্থলেই সজাতীয় বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে স্থিরবাদী বৈদিক দার্শনিক-দিগের কথা এই যে, বহু স্থলে সজাতীয় বিষয়েও প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুমাত্র ক্ষণিক হইলে সর্ব্বত্রই সজাতীয় বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার করিতে হয়, মুখ্য প্রত্যভিজ্ঞা কোন স্থলেই হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ ব্যতীত তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না, এবং এক আত্মার দৃষ্ট বস্তুতেও অন্য আত্মা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে যখন ঐ সংস্কার ও তজ্জন্য স্মরণের কর্ত্তা আত্মাও ক্ষণিক, তখন সেই পূর্ব্বদ্রষ্টা আত্মা ও তাহার পূর্ব্বজাত সেই সংস্কার, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় কোনরূপেই ঐ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। যে আত্মা পূর্ব্বে সেই বস্তু দেখিয়া তদ্বিষয়ে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, সেই আত্মা ও তাহার সেই সংস্কার না থাকিলে আবার তদ্বিষয়ে বা তাহার সজাতীয় বিষয়ে স্মরণাদি কিরূপে হইবে? পরন্তু একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে আত্মার জন্ম, তাহার বস্তু দর্শন ও তদ্বিষয়ে সংস্কারের উৎপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, কার্য্য ও কারণ একই সময়ে জন্মিতে পারে না। সুতরাং ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কার্য্য-কারণ ভাবই হইতে পারে না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথা এই যে, বীজাদি ব্যক্তি প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের "সন্তান" থাকে। প্রতিক্ষণে জায়মান এক একটি বস্তুর নাম "সন্তানী"। এবং জায়মান ঐ বস্তুর প্রবাহের নাম "সন্তান"। এইরূপ প্রতিক্ষণে আত্মার সন্তানীর বিনাশ হইলেও বস্তুতঃ তাহার সন্তানই আত্মা, তাহা প্রত্যভিজ্ঞাকালেও আছে, তখন তাহার সংস্কার-সন্তানও আছে। কারণ, সন্তানীর বিনাশ হইলেও সন্তানের অস্তিত্ব থাকে। এতদুত্তরে বৈদিক দার্শনিকগণের প্রথম কথা এই যে, বৌদ্ধসম্মত ঐ সন্তানের স্বরূপ ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। কারণ, ঐ "সন্তান" কি উহার অন্তর্গত প্রত্যেক "সন্তানী" হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ? অথবা অভিন্ন পদার্থ? ইহা জিজ্ঞাস্য। অভিন্ন হইলে প্রত্যেক "সন্তানী"র ন্যায়

ঐ "সন্তানে"রও প্রতিক্ষণে বিনাশ হওয়ায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্মরণের অনুপপত্তি দোষ অনিবার্য্য। আর যদি ঐ "সন্তান" কোন অতিরিক্ত পদার্থই হয়, তাহা হইলে উহার স্বরূপ বলা আবশ্যক। যদি উহা পূর্ব্বাপরকাল স্থায়ী একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা ক্ষণিক হইতে পারে না। সুতরাং বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। পরন্তু স্মরণাদির উপপত্তির জন্য পূর্ব্বাপরকাল-স্থায়ী কোন "সন্তান"কে আত্মা বলিয়া উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে উহা বেদসিদ্ধ নিত্য আত্মারই নামান্তর হইবে। ফলকথা, বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই পূর্ব্বোক্তরূপ সর্ব্বসম্মত প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মরণের উপপত্তি হইতেই পারে না। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমুদায় ও সমুদায়ীর ভেদ স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত "সন্তানী" হইতে "সন্তানে"র ভেদই স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্ "সন্তান" বিশেষ স্বীকার করিয়া ও পূর্ব্বতন "সন্তানী"র সংস্কারের সংক্রম স্বীকার করিয়া স্মরণাদির উপপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, যেমন কার্পাসবীজকে লাক্ষারসসিক্ত করিয়া, ঐ বীজ বপন করিলে অঙ্কুরাদি-পরম্পরায় সেই বৃক্ষজাত কার্পাস রক্তবর্ণই হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানসন্তানরূপ আত্মাতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্তানীর সংস্কার সংক্রান্ত হইতে পারে। তাঁহারা এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" "আর্হত দর্শনে"র প্রারম্ভে তাঁহাদিগের ঐরূপ সমাধানের এবং "যস্মিন্নেবহি সন্তানে" ইত্যাদি বৌদ্ধ কারিকার[১] উল্লেখ করিয়া জৈন-মতানুসারে উহার সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন। জৈন গ্রন্থ "প্রমাণনয়-তত্ত্বালোকালঙ্কারে"র ৫৫শ সূত্রের টীকায় জৈন দার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্যও উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, বিস্তৃত বিচার-পূর্ব্বক ঐ সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ পূর্ব্বক প্রকৃত স্থলে উহার অসংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কার্পাসবীজকে লাক্ষারস দ্বারা সিক্ত করিলে উহার মূলপরমাণুতে রক্ত রূপের উৎপত্তি হওয়ায় অঙ্কুরাদিক্রমে রক্তরূপের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, সেই বৃক্ষজাত কার্পাসেও রক্তরূপের উৎপত্তি সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকার করেন নাই, এবং ঐ পরমাণু-পুঞ্জও যাঁহাদিগের মতে ক্ষণিক, তাঁহাদিগের মতে ঐরূপ স্থলে কার্পাসে রক্ত রূপের উৎপত্তি কিরূপে হইবে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু পূর্ব্বতন বিজ্ঞানগত সংস্কার পরবর্ত্তী বিজ্ঞানে কিরূপে সংক্রান্ত হইবে, এই সংক্রমই বা কি, ইহাও বিচার করা আবশ্যক। অনন্ত বিজ্ঞানের ন্যায় পর পর বিজ্ঞানে অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা অথবা ঐ অনন্ত বিজ্ঞানে অনন্ত শক্তিবিশেষ কল্পনা করিলে নিষ্প্রমাণ মহাগৌরব অনিবার্য্য। পরন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও প্রমাণ হয় না। কারণ, বীজাদি স্থির

১। যস্মিন্নেবহি সন্তানে আহিতা কর্ম্মবাসনা।
ফলং তত্রৈব বধ্নাতি কার্পাসে রক্ততা যথা॥
কুসুমে বীজপূরাদের্যল্লাক্ষাদ্যবসিচ্যতে।
শক্তিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিং ন পশ্যসি?॥

পদার্থ হইলেও "অর্থক্রিয়াকারী" হইতে পারে। সহকারী কারণের সহিত মিলিত হইয়াই বীজাদি অঙ্কুরাদি কার্য্য উৎপন্ন করে। সুতরাং বীজাদির ক্রমকারিত্বই আছে। কার্য্যমাত্রই বহু কারণসাধ্য, একমাত্র কারণ দ্বারা কোন কার্য্যই জন্মে না, ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। কার্য্যের জনকত্বই কারণের কার্য্যজননে সামর্থ্য। উহা প্রত্যেক কারণে থাকিলেও সমস্ত কারণ মিলিত না হইলে তাহার কার্য্য জন্মিতে পারে না। যেমন এক এক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে শিবিকা-বহন করিতে না পারিলেও তাহারা মিলিত হইলে শিবিকাবহন করিতে পারে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শিবিকাবাহক বলা হয়, তদ্রূপ মৃত্তিকাদি সহকারী কারণগুলির সহিত মিলিত হইয়াই বীজ অঙ্কুর উৎপন্ন করে, ঐ সহকারী কারণগুলিও অঙ্কুরের জনক। সুতরাং উহাদিগের অভাবে গৃহস্থিত বীজ অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। ঐ সহকারী কারণগুলি বীজে কোন শক্তি-বিশেষ উৎপন্ন করে না। কিন্তু উহারা থাকিলেই অঙ্কুর জন্মে, উহারা না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়বশতঃ উহারাও অঙ্কুরের কারণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ফলকথা, সহকারী কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। উহা স্বীকার না করিয়া একমাত্র কারণ স্বীকার করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কল্পিত জাতিবিশেষ (কুর্ব্বদ্রূপত্ব) অবলম্বন করিয়া তদ্রূপে মৃত্তিকাদি যে কোন একটি পদার্থকেও অঙ্কুরের কারণ বলা যাইতে পারে। ঐরূপে বীজকেই যে অঙ্কুরের কারণ বলিতে হইবে, ইহার নিয়ামক কিছুই নাই। তুল্য ন্যায়ে মৃত্তিকাদি সমস্তকেই অঙ্কুরের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে গৃহস্থিত বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হইবে না। সুতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধির আশা থাকিবে না।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর অন্য ভাবে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি "সর্ব্বং ক্ষণিকং" এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের হেতু ও উদাহরণ সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা খণ্ডন করিতে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ প্রতিজ্ঞায় "ক্ষণিক" শব্দের কোন অর্থই হইতে পারে না। যদি বল, "ক্ষণিক" বলিতে এখানে আশুতর-বিনাশী, তাহা হইলে বৌদ্ধ মতে বিলম্ববিনাশী কোন পদার্থ না থাকায় আশুতরত্ব বিশেষণ ব্যর্থ হয় এবং উহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হয়। উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, ইহাই ঐ "ক্ষণিক" শব্দের অর্থ বলিলে উৎপত্তির ন্যায় বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে কোন পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ সম্ভব হইতেই পারে না। যদি বল "ক্ষণ" শব্দের অর্থ ক্ষয়,—ক্ষণ অর্থাৎ ক্ষয় বা বিনাশ যাহার আছে, এই অর্থে (অস্ত্যর্থে) "ক্ষণ"শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে ঐ "ক্ষণিক" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে কালে ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষয়ী সেই বস্তু না থাকায় ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্নকালীন পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধে অস্ত্যর্থ-তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। যদি বল, সর্ব্বান্ত্য কালই "ক্ষণ" অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কাল, যাহার মধ্যে আর কালভেদ সম্ভবই হয় না, তাহাই "ক্ষণ" শব্দের অর্থ, ঐরূপ ক্ষণকালস্থায়ী পদার্থই "ক্ষণিক"শব্দের অর্থ। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় কালকে সংজ্ঞাভেদ মাত্র বলিয়াছেন, উহা কোন বাস্তব পদার্থ নহে। সুতরাং সর্ব্বান্ত্য কালও যখন সংজ্ঞাবিশেষমাত্র,

উহা বাস্তব কোন পদার্থ নহে, তখন উহা কোন বস্তুর বিশেষণ হইতে পারে না। বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্বও তাঁহাদিগের মতে বস্তু, সুতরাং উহার বিশেষণ সর্ব্বাস্ত্য কালরূপ ক্ষণ হইতে পারে না; কারণ, উহা অবস্তু। উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষণিকত্বসাধনে কোন দৃষ্টান্তও নাই। কারণ, সর্ব্বসম্মত কোন ক্ষণিক পদার্থ নাই, যাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করা যাইতে পারে। জৈন দার্শনিকগণও ঐ কথা বলিয়াছেন। তাঁহারাও ক্ষণিক কোন পদার্থ স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা "অর্থক্রিয়াকারিত্ব"ই সত্ত্ব, এই কথাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মিথ্যা সর্পদংশনও যখন লোকের ভয়াদির কারণ হয়, তখন উহাও অর্থক্রিয়াকারী, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং উহারও "সত্ত্ব" স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যাহা মিথ্যা বা অলীক, তাহাকে "সৎ" বলিয়া তাহাতে "সত্ত্ব" স্বীকার করা যায় না। সুতরাং বৌদ্ধসম্প্রদায় যে "অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব" ইহা বলিয়া বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করেন, উহাও নির্মূল।

এখানে ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ক্ষণিক পদার্থ একেবারে অস্বীকার করিলেও ক্ষণিকত্ব বিচারের জন্য যখন "শব্দাদিঃ ক্ষণিকো ন বা" ইত্যাদি কোন বিপ্রতিপত্তি-বাক্য আবশ্যক, "বৌদ্ধাধিকারে"র টীকাকার ভগীরথ ঠাকুর, শঙ্কর মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্কবাগীশও প্রথমে ক্ষণিকত্ব বিষয়ে ঐরূপ নানাবিধ বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন উভয়বাদিসম্মত ক্ষণিক পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণও সকলেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শব্দপ্রবাহের উৎপত্তিস্থলে যেটি "অন্ত্য শব্দ" অর্থাৎ সর্ব্বশেষ শব্দ, তাহা "ক্ষণিক," ইহাও তাঁহারা মতান্তর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে অন্ত্য শব্দ ক্ষণিক, নব্য নৈয়ায়িক মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দের ন্যায় অন্ত্য শব্দ ক্ষণদ্বয়-স্থায়ী। মথুরানাথ এখানে কোন্ সম্প্রদায়কে প্রাচীন শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অনুসন্ধেয়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ "ক্ষণিক" পদার্থই অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে অন্ত্য শব্দও ক্ষণিক নহে। এজন্যই তাঁহার পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ অন্ত্য শব্দকে ক্ষণিক বলিয়াছেন, এই কথা দ্বিতীয় খণ্ডে একস্থানে লিখিত হইয়াছে এবং ঐ মতের যুক্তিও সেখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। (২য় খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দ্যোতকরের পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের অপেক্ষায় প্রাচীন সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, ক্ষণিক পদার্থ যে একেবারেই অসিদ্ধ, সুতরাং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষণিকত্বানুমানে কোন দৃষ্টান্তই নাই, ইহা বলিলে ক্ষণিকত্ব বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্য কিরূপে হইবে, ইহা চিন্তনীয়। উদয়নাচার্য্য "কিরণাবলী" এবং "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও অতি উপাদেয় বিচারের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত ক্ষণভঙ্গবাদের সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন এবং "শারীরক-ভাষ্য", "ভামতী", "ন্যায়মঞ্জরী", "শাস্ত্রদীপিকা" প্রভৃতি নানা গ্রন্থেও বহু বিচারপূর্ব্বক ঐ মতের খণ্ডন হইয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সমস্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক কথা পাইবেন।

এখানে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ বক্তব্য এই যে, ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন দেখিয়া, ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতম গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী, অথবা পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ মত খণ্ডনের জন্য ন্যায়দর্শনে অন্য কর্তৃক কতিপয় সূত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ও তৎপরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব গৌতম বুদ্ধের মত বলিয়া সমর্থন করিলেও ঐ মত যে তাঁহার পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, উহার অস্তিত্বই ছিল না, ইহা নিশ্চয় করিবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বহু বহু সুপ্রাচীন গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অনেক মতের প্রথম আবির্ভাবকাল নিশ্চয় করা এখন অসম্ভব। পরন্তু গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও যে অনেক বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাও বিদেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায় এবং অনেক পুরাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন। আমরা সুপ্রাচীন বাল্মীকি রামায়ণেও বুদ্ধের নাম ও তাঁহার মতের নিন্দা দেখিতে পাই[১]। পূর্ব্বকালে দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া মায়ামোহ অসুরদিগের প্রতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাও বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত দেখা যায়। পরন্তু যাঁহারা ক্ষণিক বুদ্ধিকেই আত্মা বলিতেন, উহা হইতে ভিন্ন আত্মা মানিতেন না, তাঁহারা ঐ জন্য "বৌদ্ধ" আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থেও "বৌদ্ধ" শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়[২]। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী "বৌদ্ধ" গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও থাকিতে পারেন। বুদ্ধদেবের শিষ্য বা সম্প্রদায় না হইলেও পূর্ব্বোক্ত অর্থে "বৌদ্ধ" নামে পরিচিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ সুচিরকাল হইতেই তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য নানা পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন ও খণ্ডনাদি হইতেছে। উপনিষদেও বিচারের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নানা অবৈদিক মতের উল্লেখ দেখা যায়[৩]। দর্শনকার মহর্ষিগণ পূর্ব্বপক্ষরূপে ঐ সকল মতের সমর্থনপূর্ব্বক উহার খণ্ডনের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্তের নির্ণয় ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা নিত্য আত্মা স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা "নৈরাত্ম্যবাদী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কঠ প্রভৃতি উপনিষদেও এই "নৈরাত্ম্যবাদ" ও তাহার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়[৪]। বস্তুমাত্রই ক্ষণিক হইলে চিরস্থায়ী নিত্য আত্মা থাকিতেই পারে না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "নৈরাত্ম্যবাদ"ই সমর্থিত হয়। তাই নৈরাত্ম্যবাদী কোন ব্যক্তি প্রথমে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্যও নৈরাত্ম্যবাদের মূল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে প্রথমে ক্ষণভঙ্গবাদেরই

১। "যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি"—ইত্যাদি (অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯ সর্গ, ৩৪শ শ্লোক)।

২। "বুদ্ধিতত্ত্বে ব্যবস্থিতো বৌদ্ধঃ" (ত্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত গ্রন্থমালায় "প্রপঞ্চহৃদয়" নামক গ্রন্থের ৩১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩। "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা, ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যং।"—শ্বেতাশ্বতর।১।২। "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ"—শ্বেতাশ্বতর।৬।১।

৪। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।"—কঠ।১।২০।

"নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈর্মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ" ইত্যাদি।—মৈত্রায়ণী।৭.৮।

উল্লেখ করিয়াছেন[1]। নৈরাত্ম্যদর্শনই মোক্ষের কারণ, ইহা বৌদ্ধ মত বলিয়া অনেকে লিখিলেও "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি ঐ মতের যুক্তির বর্ণন করিয়া "ইতি কেচিৎ" বলিয়াছেন। তিনি উহা কেবল বৌদ্ধ মত বলিয়া জানিলে "ইতি বৌদ্ধাঃ" এইরূপ কেন বলেন নাই, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর, অথবা অলীক, "আমি" বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলে কোন বিষয়ে কামনা জন্মে না। সুতরাং কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, সুতরাং মুক্তি লাভ করে। এইরূপ "নৈরাত্ম্যদর্শন" মোক্ষের কারণ, ইহাই রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব যে কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, একেবারে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি বা আত্মার অলীকত্ব যে তাঁহার মত নহে, কর্ম্মবাদ যে তাঁহার প্রধান সিদ্ধান্ত, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। আমাদিগের মনে হয়, বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধদেব মানবের বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্যই এবং বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া মানবকে মোক্ষলাভে প্রকৃত অধিকারী করিবার জন্যই প্রথমে "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং" এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সংসার অনিত্য, বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ উপদেশ পাইয়া, ঐরূপ সংস্কার লাভ করিলে মানব যে বৈরাগ্যের শান্তিময় পথে উপস্থিত হইতে পারে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যে, আত্মারও ক্ষণিকত্ব বাস্তব সিদ্ধান্তরূপেই বলিয়াছেন, ইহা আমাদিগের মনে হয় না। সে যাহা হউক, মূলকথা, উপনিষদেও যখন "নৈরাত্ম্যবাদের" সূচনা আছে, তখন অতি প্রাচীন কালেও যে উহা নানাপ্রকারে সমর্থিত হইয়াছিল, এবং উহার সমর্থনের জন্যই কেহ কেহ বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন, গোতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ বৈদিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেই ঐ কল্পিত সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন বাধক দেখি না। কেহ বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্যের দ্বারা বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব অতি প্রাচীন কালেও আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতিতে উহার প্রতিষেধ থাকায় ঐ মত পূর্ব্বপক্ষ-রূপেও শ্রুতির দ্বারা সূচিত হইয়াছে। বস্তুমাত্র ক্ষণিক হইলে প্রত্যেক বস্তুই প্রতি ক্ষণে ভিন্ন হওয়ায় নানা স্বীকার করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ এই জগতে নানা কিছু নাই। উক্ত শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্য না হইলে "কিঞ্চন" এই বাক্য ব্যর্থ হয়, "নেহ নানাস্তি" এই পর্য্যন্ত বলিলেই বৈদান্তিকসম্মত অর্থ বুঝা যায়, ইহাই তাঁহার কথা। সুধীগণ এই নবীন ব্যাখ্যার বিচার করিবেন।

পরিশেষে এখানে ইহাও বক্তব্য যে, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বৌদ্ধবিরোধী আচার্য্যগণ, মহর্ষি গোতমের সূত্রের দ্বারাই বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ববাদের খণ্ডন করিবার জন্য সেইরূপেই মহর্ষি-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদিগের আশ্রিত আমরাও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত দশম সূত্রে "ক্ষণিকত্বাৎ" এ বাক্যে "ক্ষণিকত্ব" শব্দের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্বই যে তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝিবার

১। "তত্র বাধকং ভবদাত্মনি ক্ষণভঙ্গো বা" ইত্যাদি।—আত্মতত্ত্ববিবেক।

পক্ষে বিশেষ কোন কারণ বুঝি না। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কাল অর্থাৎ যে কালের মধ্যে আর কালভেদ সম্ভবই নহে, তাদৃশ কালবিশেষকেই "ক্ষণ" বলিয়া, ঐ ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, এইরূপ অর্থেই বৌদ্ধসম্প্রদায় বস্তুমাত্রকে ক্ষণিক বলিয়াছেন। অবশ্য নৈয়ায়িকগণও পূর্ব্বোক্তরূপ কালবিশেষকে "ক্ষণ" বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ অর্থে "ক্ষণ" শব্দটি পারিভাষিক, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, কোষকার অমরসিংহ ত্রিংশৎকলাত্মক কালকেই "ক্ষণ" বলিয়াছেন[১]। মহর্ষি মনু "ত্রিংশৎকলা মুহূর্ত্তঃ স্যাৎ" (১।৬৪) এই বাক্যের দ্বারা ত্রিংশৎকলাত্মক কালকে মুহূর্ত্ত বলিলেও এবং ঐ বচনে "ক্ষণে"র কোন উল্লেখ না করিলেও অমরসিংহের ঐরূপ উক্তির অবশ্যই মূল আছে; তিনি নিজে কল্পনা করিয়া ঐরূপ বলিতে পারেন না। পরন্তু মহামনীষী উদয়নাচার্য্য "কিরণাবলী" গ্রন্থে "ক্ষণদ্বয়ং লবঃ প্রোক্তো নিমেষস্তু লবদ্বয়ং" ইত্যাদি যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহারও অবশ্য মূল আছে। দুইটি ক্ষণকে "লব" বলে, দুই "লব" এক "নিমেষ", অষ্টাদশ "নিমেষ" এক "কাষ্ঠা", ত্রিংশৎকাষ্ঠা এক "কলা," ইহা উদয়নের উদ্ধৃত প্রমাণের দ্বারা পাওয়া যায়। কিন্তু এই মতেও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কালই যে ক্ষণ, ইহা বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, "ক্ষণ" শব্দের নানা অর্থের মধ্যে মহর্ষি গোতম যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকালরূপ "ক্ষণ"কেই গ্রহণ করিয়া "ক্ষণিকত্বাৎ" এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা শপথ করিয়া কেহ বলিতে পারিবেন না। সুতরাং মহর্ষিসূত্রে যে, বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ব মতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেখানে "ক্ষণিক" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে "ক্ষণশ্চ অল্পীয়ান্ কালঃ" এই কথার দ্বারা অল্পতর কালকেই "ক্ষণ" বলিয়া, সেই ক্ষণমাত্রস্থায়ী পদার্থকেই "ক্ষণিক" বলিয়াছেন, এবং শরীরকেই উহার দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়া স্ফটিকাদি দ্রব্যমাত্রকেই ক্ষণিক বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ঋষিগণ কিন্তু শরীরের বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ব স্বীকার না করিলেও "শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং "ক্ষণ" শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্রই যে বৌদ্ধসম্মত "ক্ষণই" বুঝা যায়, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার যে "অল্পীয়ান্ কালঃ" বলিয়া "ক্ষণের" পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও যে, সর্ব্বাপেক্ষা অল্প কাল, ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় না। পরন্তু ভাষ্যকার সেখানে স্ফটিকের ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য শরীরকে যে ভাবে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকালরূপ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্বই যে, সেখানে তাঁহার অভিমত "ক্ষণিকত্ব", ইহাও মনে হয় না। কারণ, শরীরে সর্ব্বমতে ঐরূপ "ক্ষণিকত্ব" নাই। দৃষ্টান্ত উভয়পক্ষ-সম্মত হওয়া আবশ্যক। সুধীগণ এ সকল কথারও বিচার করিবেন ॥ ১৭ ॥

ক্ষণভঙ্গপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

১। অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠাস্ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।
তাস্তু ত্রিংশৎক্ষণস্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশাঽস্ত্রিয়াং ॥—অমরকোষ, স্বর্গবর্গ, ৩য় স্তবক।

ভাষ্য। ইদন্তু চিন্ত্যতে, কস্যেয়ং বুদ্ধিরাত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং গুণ ইতি। প্রসিদ্ধোঽপি খল্বয়মর্থঃ পরীক্ষাশেষং প্রবর্ত্তয়ামীতি প্রক্রিয়তে। সোঽয়ং বুদ্ধৌ সন্নিকর্ষোৎপত্তেঃ সংশয়ঃ, বিশেষস্যাগ্রহণাদিতি। তত্রায়ং বিশেষঃ—

অনুবাদ। কিন্তু ইহা চিন্তার বিষয়, এই বুদ্ধি,—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের (গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের) মধ্যে কাহার গুণ ? এই পদার্থ প্রসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মপরীক্ষার দ্বারাই উহা সিদ্ধ হইলেও পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিব, এই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সন্নিকর্ষের উৎপত্তি হওয়ায় বুদ্ধি বিষয়ে সেই এই সংশয় হয়, কারণ, বিশেষের জ্ঞান নাই। (উত্তর) তাহাতে এই বিশেষ (পরসূত্র দ্বারা কথিত হইয়াছে)।

সূত্র। নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেঽপি জ্ঞানাবস্থানাৎ ॥১৮॥২৮৯॥

অনুবাদ। (জ্ঞান) ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের (গুণ) নহে,—যেহেতু সেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের (স্মৃতির) অবস্থান (উৎপত্তি) হয়।

ভাষ্য। নেন্দ্রিয়াণামর্থানাং বা গুণো জ্ঞানং,তেষাং বিনাশেঽপি জ্ঞানস্য ভাবাৎ। ভবতি খল্বিদমিন্দ্রিয়েঽর্থে চ বিনষ্টে জ্ঞানমদ্রাক্ষমিতি। ন চ জ্ঞাতরি বিনষ্টে জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। অন্যৎ খলু বৈ তদিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজং জ্ঞানং; যদিন্দ্রিয়ার্থবিনাশে ন ভবতি, ইদমন্যদাত্মমনঃসন্নিকর্ষজং, তস্য যুক্তো ভাব ইতি। স্মৃতিঃ খল্বিয়মদ্রাক্ষমিতি পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়া, ন চ জ্ঞাতরি নষ্টে পূর্ব্বোপলব্ধেঃ স্মরণং যুক্তং, ন চান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতি। ন চ মনসি জ্ঞাতরি অভ্যুপগম্যমানে শক্যমিন্দ্রিয়ার্থয়োর্জ্ঞাতৃত্বং প্রতিপাদয়িতুং।

অনুবাদ। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা অর্থসমূহের গুণ নহে; কারণ, সেই ইন্দ্রিয় বা অর্থসমুহের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলেও "আমি দেখিয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, কিন্তু জ্ঞাতা বিনষ্ট হইলে জ্ঞান হইতে পারে না। (পূর্ব্বপক্ষ) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজন্য সেই জ্ঞান অন্য, যাহা ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের বিনাশ হইলে জন্মে না। আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্য এই জ্ঞান

অর্থাৎ "আমি দেখিয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞান অন্য, তাহার উৎপত্তি সম্ভব। (উত্তর) "আমি দেখিয়াছিলাম" এই প্রকার জ্ঞান, ইহা পূর্ব্বদৃষ্টবস্তুবিষয়ক স্মরণই, কিন্তু জ্ঞাতা নষ্ট হইলে পূর্ব্বোপলব্ধিপ্রযুক্ত স্মরণ সম্ভব নহে, কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না। পরন্তু মন জ্ঞাতা বলিয়া স্বীক্রিয়মাণ হইলে ইন্দ্রিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না।

টিপ্পনী। বুদ্ধি অনিত্য, ইহা উপপন্ন হইয়াছে[১]। কিন্তু ঐ বুদ্ধি বা জ্ঞান কাহার গুণ, ইহা এখন চিন্তার বিষয়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে সন্দেহ হওয়ায়, পরীক্ষা আবশ্যক হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে আত্মার পরীক্ষার দ্বারাই বুদ্ধি যে আত্মারই গুণ, ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি মহর্ষি ঐ পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিতেই এই প্রকরণটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়ে অবান্তর বিশেষ পরিজ্ঞানের জন্যই পুনর্ব্বার বিবিধ বিচারপূর্ব্বক বুদ্ধি আত্মারই গুণ, ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে ঐরূপ তাৎপর্য্যই বর্ণন করিয়াছেন। ফল কথা, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান কি আত্মার গুণ ? অথবা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের গুণ ? অথবা মনের গুণ ? অথবা গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের গুণ ? এইরূপ সংশয়বশতঃ বুদ্ধি আত্মারই গুণ, ইহা পুনর্ব্বার পরীক্ষিত হইয়াছে। ঐরূপ সংশয়ের কারণ কি ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সন্নিকর্ষের উৎপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জন্যজ্ঞানমাত্রে আত্মা ও মনের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ কারণ। লৌকিক প্রত্যক্ষ মাত্রে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ কারণ। সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণরূপে যে সন্নিকর্ষ আবশ্যক, তাহা যখন আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থে উৎপন্ন হয়, তখন ঐ জ্ঞান ঐ ইন্দ্রিয়াদিতেও উৎপন্ন হইতে পারে। কারণ, যেখানে কারণ থাকে, সেখানেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। জ্ঞান—ইন্দ্রিয়, মন ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থে উৎপন্ন হয় না, জ্ঞান—ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের গুণ নহে, এইরূপে বিশেষ নিশ্চয় ব্যতীত ঐরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ সংশয়নিবর্ত্তক বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকায় ঐরূপ সংশয় জন্মে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা জ্ঞান—ইন্দ্রিয় ও অর্থের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিয়া এবং পরসূত্রের দ্বারা জ্ঞান, মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিয়া ঐ সংশয়ের নিবৃত্তি করিয়াছেন। কারণ, ঐরূপ বিশেষ নিশ্চয় হইলে আর ঐরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। তাই মহর্ষি সেই বিশেষ সিদ্ধ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই তাৎপর্য্যে "তত্রায়ং বিশেষঃ" এই কথা বলিয়া মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সূত্রার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলেও যখন "আমি দেখিয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখন জ্ঞান, ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ,

১। সমস্ত পুস্তকেই ভাষ্যকারের "উপপন্নমনিত্যা বুদ্ধিরিতি" এই সন্দর্ভ পূর্ব্বসূত্র-ভাষ্যের শেষেই দেখা যায়। কিন্তু এই সূত্রের অবতারণায় ভাষ্যারম্ভে "উপপন্নমনিত্যা বুদ্ধিরিতি। ইদন্তু চিন্ত্যতে" এইরূপ সন্দর্ভ লিখিত হইলে উহার দ্বারা এই প্রকরণের সংগতি স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। সুতরাং ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতেই প্রথমে উক্ত সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে।

জ্ঞাতা বিনষ্ট হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই কথা বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় অথবা তাহার গ্রাহ্য গন্ধাদি অর্থ বিনষ্ট হইলে ঐ উভয়ের সন্নিকর্ষ হইতে না পারায় তজ্জন্য বাহ্য প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অবশ্য জন্মিতে পারে না, কিন্তু আত্মা ও মনের নিত্যতাবশতঃ বিনাশ না হওয়ায় সেই আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্য "আমি দেখিয়াছিলাম" এইরূপ মানস জ্ঞান অবশ্য হইতে পারে, উহার কারণের অভাব নাই। সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান কেন হইবে না? ঐরূপ মানস প্রত্যক্ষ হইবার বাধা কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "আমি দেখিয়াছিলাম" এইরূপ যে জ্ঞান বলিয়াছি, উহা সেই পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ, উহা মানস প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু যদি জ্ঞান—ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের গুণ হয়, তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয় অথবা অর্থই জ্ঞাতা হইবে, সুতরাং ঐ জ্ঞানজন্য তাহাতেই সংস্কার জন্মিবে। তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয় অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত সেই সংস্কারও বিনষ্ট হইবে, উহাও থাকিতে পারে না। সুতরাং তখন আর পূর্ব্বোপলব্ধিপ্রযুক্ত পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ হইতে পারে না। জ্ঞাতা বিনষ্ট হইলে তখন আর কে স্মরণ করিবে? অন্যের দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। যে চক্ষুর দ্বারা যে রূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই চক্ষু বা সেই রূপকেই ঐ জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা বলিলে, সেই চক্ষু অথবা সেই রূপের বিনাশ হইলে জ্ঞাতার বিনাশ হওয়ায় তখন আর পূর্ব্বোক্তরূপ স্মরণ হইতে পারে না, কিন্তু তখনও ঐরূপ স্মরণ হওয়ায় জ্ঞান, ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের গুণ নহে, কিন্তু চিরস্থায়ী কোন পদার্থের গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তি নিরাসের জন্য যদি মনকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন করা যাইবে না। অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ দুইটি পক্ষ ত্যাগ করিতেই হইবে॥ ১৮॥

ভাষ্য। অস্তু তর্হি মনোগুণো জ্ঞানং?

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে জ্ঞান মনের গুণ হউক?

সূত্র। যুগপজ্‌জ্ঞেয়ানুপলব্ধেশ্চ ন মনসঃ॥১৯॥২৯০॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং (জ্ঞান) মনের (গুণ) নহে,—যেহেতু যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। যুগপজ্‌জ্ঞেয়ানুপলব্ধিরন্তঃকরণস্য লিঙ্গং, তত্র যুগপজ্‌-জ্ঞেয়ানুপলব্ধ্যা যদনুমীয়তেঽন্তঃকরণং, ন তস্য গুণো জ্ঞানং। কস্য তর্হি? জ্ঞস্য, বশিত্বাৎ। বশী জ্ঞাতা, বশ্যং করণং, জ্ঞানগুণত্বে চ করণ-ভাবনিবৃত্তিঃ। ঘ্রাণাদিসাধনস্য চ জ্ঞাতুর্গন্ধাদিজ্ঞানভাবাদনুমীয়তে

অন্তঃকরণসাধনস্য সুখাদিজ্ঞানং স্মৃতিশ্চেতি, তত্র যজ্জ্ঞানগুণং মনঃ স আত্মা, যত্তু সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমন্তঃকরণং মনস্তদিতি সংজ্ঞাভেদমাত্রং, নার্থভেদ ইতি।

যুগপজ্জ্ঞেয়োপলব্ধেশ্চ যোগিন ইতি বা "চা"র্থঃ। যোগী খলু ঋদ্ধৌ প্রাদুর্ভূতায়াং বিকরণধর্ম্মা নির্ম্মায় সেন্দ্রিয়াণি শরীরান্তরাণি তেষু যুগপজ্জ্ঞেয়ান্যুপলভতে, তচ্চৈতদ্বিভৌ জ্ঞাতর্য্যুপপদ্যতে, নাণৌ মনসীতি। বিভুত্বে বা মনসো জ্ঞানস্য নাত্মগুণত্বপ্রতিষেধঃ। বিভু চ মনস্তদন্তঃকরণভূতমিতি তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্যুগপৎসংযোগাদ্যুগপজ্জ্ঞানান্যুৎপদ্যেরন্নিতি।

অনুবাদ। যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি (অপ্রত্যক্ষ) অন্তঃকরণের (মনের) লিঙ্গ (অর্থাৎ) অনুমাপক, তাহা হইলে যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি প্রযুক্ত যে অন্তঃকরণ অনুমিত হয়, জ্ঞান তাহার গুণ নহে। (প্রশ্ন) তবে কাহার? অর্থাৎ জ্ঞান কাহার গুণ? (উত্তর) জ্ঞাতার,—যেহেতু বশিত্ব আছে, জ্ঞাতা বশী (স্বতন্ত্র), করণ বশ্য (পরতন্ত্র)। এবং (মনের) জ্ঞানগুণত্ব হইলে করণত্বের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মন, জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট বা জ্ঞাতা হইলে তাহা করণ হইতে পারে না। পরন্তু ঘ্রাণ প্রভৃতিসাধনবিশিষ্ট জ্ঞাতার গন্ধাদিবিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় (ঐ জ্ঞানের করণ) অনুমিত হয়,—অন্তঃকরণরূপসাধনবিশিষ্ট জ্ঞাতার সুখাদিবিষয়ক জ্ঞান ও স্মৃতি জন্মে, (এজন্য তাহারও করণ অনুমিত হয়) তাহা হইলে যাহা জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট মন, তাহা আত্মা, যাহা কিন্তু সুখাদির উপলব্ধির সাধন অন্তঃকরণ, তাহা মন, ইহা সংজ্ঞাভেদমাত্র, পদার্থভেদ নহে।

অথবা "যেহেতু যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়" ইহা "চ" শব্দের অর্থ, অর্থাৎ সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ আর একটি হেতুও এখানে মহর্ষি বলিয়াছেন। ঋদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইলে বিকরণধর্ম্মা[১] অর্থাৎ বিলক্ষণ করণ-

---

১। "ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ" এই যোগসূত্রে (বিভূতিপাদ।৪৮) বিদেহ যোগীর "বিকরণভাব" কথিত হইয়াছে। নকুলীশ পাশুপত-সম্প্রদায় ক্রিয়াশক্তিকে "মনোজবিত্ব", "কামরূপিত্ব" ও "বিকরণধর্ম্মিত্ব" এই নামত্রয়ে তিনপ্রকার বলিয়াছেন। "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" মাধবাচার্য্যও "নকুলীশ পাশুপত দর্শনে" উহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে সেখানে "বিক্রমণধর্ম্মিত্বং" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠ অশুদ্ধ। শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের "গণকারিকা" গ্রন্থের "রত্নটীকায়" ঐ স্থলে "বিকরণধর্ম্মিত্বং" এইরূপ বিশুদ্ধ পাঠই

বিশিষ্ট যোগী বহিরিন্দ্রিয় সহিত নানা শরীর নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় (নানা সুখ দুঃখ) উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই ইহা অর্থাৎ যোগীর সেই যুগপৎ নানা সুখ দুঃখ জ্ঞান, জ্ঞাতা বিভু হইলে উপপন্ন হয়,—অণু মনে উপপন্ন হয় না। মনের বিভুত্ব পক্ষেও অর্থাৎ মনকে জ্ঞাতা বলিয়া বিভু বলিলে জ্ঞানের আত্ম-গুণত্বের প্রতিষেধ হয় না। মন বিভু, কিন্তু তাহা অন্তঃকরণভূত—অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়, এই পক্ষে তাহার যুগপৎ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত (সকলেরই) যুগপৎ নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে।

টিপ্পনী। যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে গন্ধাদি নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। যুগপৎ গন্ধাদি নানা বিষয়ের অপ্রত্যক্ষই মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম মনের অনুমাপক, ইহা মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ সূত্রে বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সূত্রেও ঐ হেতুর দ্বারাই জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যে মন অনুমিত হয়, জ্ঞান তাহার গুণ নহে, অর্থাৎ সেই মন জ্ঞাতা বা জ্ঞানের কর্ত্তা না হওয়ায় জ্ঞান তাহার গুণ হইতে পারে না। যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা, জ্ঞান তাঁহারই গুণ। কারণ, জ্ঞাতা স্বতন্ত্র, জ্ঞানের করণ ইন্দ্রিয়াদি ঐ জ্ঞাতার বশ্য। স্বাতন্ত্র্যই কর্ত্তার লক্ষণ[১]। অচেতন পদার্থের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তাহা কর্ত্তা হইতে পারে না। কর্ত্তা ও করণাদি মিলিত হইলে তন্মধ্যে কর্ত্তাকেই চেতন বলিয়া বুঝা যায়। করণাদি অচেতন পদার্থ ঐ চেতন কর্ত্তার বশ্য। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন কোন কার্য্য জন্মাইতে পারে না। জ্ঞাতা চেতন, সুতরাং বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র। জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়াদি করণের দ্বারা জ্ঞানাদি করেন ; এজন্য ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার বশ্য। অবশ্য কোন স্থলে জ্ঞাতাও অপর জ্ঞাতার বশ্য হইয়া থাকেন, এই জন্য উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতা বশীই হইবেন, এইরূপ নিয়ম নাই। কিন্তু অচেতন সমস্তই বশ্য, তাহারা কখনও বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হয় না, এইরূপ নিয়ম আছে। জ্ঞান যাহার গুণ, এই অর্থে জ্ঞাতাকে "জ্ঞানগুণ" বলা যায়। মনকে "জ্ঞানগুণ" বলিলে মনের করণত্ব থাকে না, জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মন অচেতন, সুতরাং তাহার জ্ঞাতৃত্ব হইতেই পারে না।

আছে। কিন্তু ভাষ্যকার কায়ব্যূহকারী যে যোগীকে "বিকরণধর্ম্মা" বলিয়াছেন, তাঁহার তখন পূর্ব্বোক্ত "বিকরণভাব" বা "বিকরণধর্ম্মিত্ব" সম্ভব হয় না। কারণ, কায়ব্যূহকারী যোগী ইন্দ্রিয় সহিত নানা শরীর নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি করণের সাহায্যেই যুগপৎ নানা বিষয় জ্ঞান করেন। তাই এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— "বিশিষ্টং করণং ধর্ম্মো যস্য স "বিকরণধর্ম্মা," "অস্মদাদিকরণবিলক্ষণকরণঃ যেন ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-সূক্ষ্মাদিবেদী ভবতীত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্যটীকাকার আবার অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিবিধং করণং ধর্ম্মো যস্য স তথোক্তঃ।" পরবর্ত্তী ৩৩শ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১। "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।" পাণিনিসূত্র। ২য় খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যদি কেহ বলেন যে, মনকে চেতনই বলিব, মনকে জ্ঞানগুণ বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা চেতনই হইবে। এইজন্য ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণাদি করণবিশিষ্ট জ্ঞাতারই গন্ধাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষের করণরূপে ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়, এবং সুখাদির প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে বহিরিন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ অন্তরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়। সুখাদির প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে যে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়, তাহা মন নামে কথিত হইয়াছে। তাহা জ্ঞানের কর্ত্তা নহে, তাহা জ্ঞানের করণ, সুতরাং জ্ঞান তাহার গুণ নহে। যদি বল, জ্ঞান মনেরই গুণ, মন চেতন পদার্থ, তাহা হইলে ঐ মনকেই জ্ঞাতা বলিতে হইবে। কিন্তু একই শরীরে দুইটি চেতন পদার্থ থাকিলে জ্ঞানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং এক শরীরে একটি চেতনই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত জ্ঞানরূপ গুণবিশিষ্ট মনের নাম "আত্মা" এবং সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধনরূপে স্বীকৃত অন্তঃকরণের নাম "মন", এইরূপে সংজ্ঞাভেদই হইবে, পদার্থ-ভেদ হইবে না। জ্ঞাতা ও তাহার সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন পৃথক্ ভাবে স্বীকার করিলে নামমাত্রে কোন বিবাদ নাই। মূল কথা, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যে মনের সাধক বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না, জ্ঞান তাহার গুণ হইতে পারে না। মহর্ষি পূর্ব্বেও (এই অধ্যায়ের ১ম আঃ ১৬শ ১৭শ সূত্রে) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য সেখানেই সুব্যক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যকার শেষে কল্পান্তরে এই সূত্রোক্ত "চ" শব্দের দ্বারা অন্য হেতুরও ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা যেহেতু যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, ইহা "চ" শব্দের অর্থ। অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিতে মহর্ষি এই সূত্রে সর্ব্বমনুষ্যের যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধিকে প্রথম হেতু বলিয়া "চ" শব্দের দ্বারা কায়ব্যূহ স্থলে যোগীর নানা দেহে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের যে উপলব্ধি হয়, উহাকে দ্বিতীয় হেতু বলিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকারের অথবা কল্পের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে, "যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধিবশতঃ এবং কায়ব্যূহকারী যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিবশতঃ জ্ঞান মনের গুণ নহে"। ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় হেতু বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, অণিমাদি সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইলে যোগী তখন "বিকরণ-ধর্ম্মা" অর্থাৎ অযোগী ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়াদি করণ হইতে বিলক্ষণ করণবিশিষ্ট হইয়া ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত নানা শরীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ যোগী অবিলম্বেই নির্ব্বাণলাভে ইচ্ছুক হইয়া নিজ শক্তির দ্বারা নানা স্থানে নানা শরীর নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ তাঁহার অবশিষ্ট প্রারব্ধ কর্ম্মফল নানা সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। যোগীর ক্রমশঃ বিলম্বে সেই সমস্ত সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইলে তাঁহার নির্ব্বাণলাভে বহু বিলম্ব হয়। তাঁহার কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বোক্তরূপ নানা দেহ নির্ম্মাণই যোগীর "কায়ব্যূহ"। উহা যোগশাস্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি "নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" ।৪।৪। এই সূত্রের দ্বারা কায়ব্যূহকারী যোগী তাঁহার

সেই নিজনির্ম্মিত শরীর-সমসংখ্যক মনেরও যে সৃষ্টি করেন, ইহা বলিয়াছেন। যোগীর সেই প্রথম দেহস্থ এক মনই তখন তাঁহার নিজনির্ম্মিত সমস্ত শরীরে প্রদীপের ন্যায় প্রসৃত হয়; ইহা পতঞ্জলি বলেন নাই। "যোগবার্ত্তিকে" বিজ্ঞানভিক্ষু যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা পতঞ্জলির ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়মতে মনের নিত্যতাবশতঃ মনের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, মুক্তি হইলেও তখন আত্মার ন্যায় মনও থাকে। এই জন্যই মনে হয়, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়মতানুসারে বলিয়াছেন যে, কায়ব্যূহকারী যোগী মুক্ত পুরুষদিগের মনঃসমূহকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার নিজনির্ম্মিত শরীরসমূহে প্রবিষ্ট করেন। মনঃশূন্য শরীরে সুখদুঃখ ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং যোগীর সেই সমস্ত শরীরেও মন থাকা আবশ্যক। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন। আবশ্যক বুঝিলে কোন যোগী নিজ শক্তির দ্বারা মুক্ত পুরুষদিগের মনকেও আকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরে গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, যদি কায়ব্যূহকারী যোগী তাঁহার সেই নিজনির্ম্মিত শরীরসমূহে মুক্ত পুরুষদিগের মনকেই আকর্ষণ করিয়া প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত মনকে তখন তাঁহার সুখ দুঃখের ভোক্তা বলা যায় না। কারণ, মুক্ত পুরুষদিগের মনে অদৃষ্ট না থাকায় উহা সুখদুঃখ-ভোক্তা হইতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না, ঐ সমস্ত মন তখন সেই যোগীর সেই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। আর যদি পতঞ্জলির সিদ্ধান্তানুসারে যোগীর সেই সমস্ত শরীরে পৃথক্ পৃথক্ মনের সৃষ্টিই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা জ্ঞাতার নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। কায়ব্যূহকারী যোগী প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত নানা শরীরে যুগপৎ নানা সুখদুঃখ ভোগ করেন, সেই অদৃষ্টবিশেষ তাঁহার নিজনির্ম্মিত সেই সমস্ত মনে না থাকায় ঐ সমস্ত মন, তাঁহার সুখদুঃখের ভোক্তা হইতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না। জ্ঞান ঐ সমস্ত মনের গুণ হইতে পারে না। সুতরাং মনকে জ্ঞাতা বলিতে হইলে অর্থাৎ জ্ঞান মনেরই গুণ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কায়ব্যূহকারী যোগীর পূর্ব্বদেহস্থ সেই নিত্য মনকেই জ্ঞাতা বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ মনের অণুত্ববশতঃ সেই যোগীর সমস্ত শরীরের সহিত যুগপৎ সংযোগ না থাকায় ঐ মন যোগীর সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। সমস্ত শরীরে জ্ঞাতা না থাকিলে সমস্ত শরীরে যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যোগী যখন যুগপৎ নানা শরীরে নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তখন ঐ যোগীর সেই সমস্ত শরীরসংযুক্ত কোন জ্ঞাতা আছে, অর্থাৎ জ্ঞাতা বিভু, ইহাই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যোগীর নানাস্থানস্থ নানা শরীরে যে, যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি, তাহা বিভু জ্ঞাতা হইলেই উপপন্ন হয়, অতি সূক্ষ্ম মন জ্ঞাতা হইলে উহা উপপন্ন হয় না। কারণ, যোগীর সেই সমস্ত শরীরে ঐ মন থাকে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, মনকে জ্ঞাতা বলিয়া তাহাকে

বিভু বলিয়াই স্বীকার করিব। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে অনুপপত্তি নাই। এজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মনকে জ্ঞাতা বলিয়া বিভু বলিলে সে পক্ষে জ্ঞানের আত্মগুণত্বের খণ্ডন হইবে না। অর্থাৎ তাহা বলিলে আমাদিগের অভিমত আত্মারই নামান্তর হইবে "মন"। সুতরাং বিভু জ্ঞাতাকে "মন" বলিয়া উহার জ্ঞানের সাধন পৃথক্ অতিসূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয় অন্য নামে স্বীকার করিলে বস্তুতঃ জ্ঞান আত্মারই গুণ, ইহাই স্বীকৃত হইবে। নামমাত্রে আমাদিগের কোন বিবাদ নাই। যদি বল, যে মন অন্তঃকরণভূত অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকৃত, তাহাকেই বিভু বলিয়া তাহাকেই জ্ঞাতা বলিব, উহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞাতা স্বীকার করিব না, অন্তরিন্দ্রিয় মনই জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এতদুত্তরে ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ বিভু মনের সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ থাকায় সকলেরই যুগপৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-জন্য নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। অর্থাৎ ঐ আপত্তিবশতঃ অন্তরিন্দ্রিয় মনকে বিভু বলা যায় না। মহর্ষি কণাদ ও গোতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়া মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নানা স্থানে জ্ঞানের অযৌগপদ্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন। কায়ব্যূহ স্থলে যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও অন্য কোন স্থলে কাহারই যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, ইহাই বাৎস্যায়নের কথা। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় ইহা একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদ্যও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা মনের অণুত্বও স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ, নৈয়ায়িকের ন্যায় মনের অণুত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও "যোগবার্ত্তিকে" বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমতে মন দেহপরিমাণ, এবং পাতঞ্জলমতে মন বিভু, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করিয়া মনকে অণু না বলিলেও সেই মতেও মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না। কারণ, যে মন, জ্ঞানের করণ বলিয়া সিদ্ধ, তাহা জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে পারে না। অন্তরিন্দ্রিয় মন, জ্ঞানকর্ত্তা জ্ঞাতার বশ্য, সুতরাং উহার স্বাতন্ত্র্য না থাকায় উহাকে জ্ঞানকর্ত্তা বলা যায় না। জ্ঞানকর্ত্তা না হইলে জ্ঞান উহার গুণ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত এই যুক্তিও এখানে স্মরণ করিতে হইবে।

সমস্ত পুস্তকেই এখানে ভাষ্যে "যুগপজ্জ্ঞেয়ানুপলব্ধেশ্চ যোগিনঃ" এবং কোন পুস্তকে ঐ স্থলে "অযোগিনঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত পাঠই অশুদ্ধ, ইহা বুঝা যায়; কারণ, ভাষ্যকার প্রথম কল্পে সূত্রানুসারে অযোগী ব্যক্তিদিগের যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, পরে কল্পান্তরে সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা কায়ব্যূহকারী যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিকেই যে, অন্য হেতুরূপে মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ভাষ্যকারের "তেষু যুগপজ্জ্ঞেয়ান্যুপলভতে" এই পাঠের দ্বারাও তাঁহার শেষ কল্পে ব্যাখ্যাত ঐ হেতু স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং "যুগপজ্জ্ঞেয়োপলব্ধেশ্চ যোগিন ইতি বা 'চা'র্থঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মুদ্রিত "ন্যায়বার্ত্তিক" ও

"ন্যায়সূচীনিবন্ধে" এই সূত্রে "চ" শব্দ না থাকিলেও ভাষ্যকার শেষে "চ" শব্দের অর্থ বলিয়া অন্ত হেতুর ব্যাখ্যা করায় "চ" শব্দযুক্ত সূত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে[১] উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও এখানে সূত্র ও ভাষ্যের পরিগৃহীত পাঠই যে প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না ॥ ১৯ ॥

সূত্র। তদাত্মগুণত্বেঽপি তুল্যং ॥২০॥২৯১॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই জ্ঞানের আত্মগুণত্ব হইলেও তুল্য। অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও পূর্ব্ববৎ যুগপৎ নানা বিষয়-জ্ঞানের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। বিভুরাত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ সংযুক্ত ইতি যুগপজ্‌জ্ঞানোৎপত্তি-প্রসঙ্গ ইতি।

অনুবাদ। বিভু আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত, এ জন্য যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি হয়।

টিপ্পনী। মনকে বিভু বলিলে ঐ মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকায় যুগপৎ নানা জ্ঞানের আপত্তি হয়, এজন্য মহর্ষি গোতম মনকে বিভু বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অণু বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন এবং যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, এই সিদ্ধান্তানুসারে পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু মনকে অণু বলিয়া স্বীকার করিলেও যুগপৎ নানা জ্ঞান কেন জন্মিতে পারে না, ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও, পূর্ব্ববৎ যুগপৎ নানা জ্ঞান হইতে পারে। কারণ, আত্মা বিভু, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহার সংযোগ থাকায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্য সমস্ত জ্ঞানই একই সময়ে হইতে পারে। মনের বিভুত্ব পক্ষে যে দোষ বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত পক্ষেও ঐ দোষ তুল্য ॥ ২০ ॥

সূত্র। ইন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎ-পত্তিঃ ॥২১॥২৯২॥

অনুবাদ। (উত্তর) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ না থাকায় সেই সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

১। "যুগপজ্‌জ্ঞেয়ানুপলব্ধেশ্চ ন মনস" ইতি পূর্ব্বসূত্রস্থস্য "চ"কারস্যাগ্রে ভাষ্যকারেণ "যুগপজ্‌জ্ঞেয়োপলব্ধেশ্চ যোগিন ইতি বা "চা"র্থ ইতি বিচরিষ্যমাণত্বাৎ। —তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি।

ভাষ্য। গন্ধাদ্যুপলব্ধেরিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষবদিন্দ্রিয়মনঃসন্নিকর্ষোঽপি কারণং, তস্য চাযৌগপদ্যমণুত্বান্মনসঃ। অযৌগপদ্যাদনুৎপত্তির্যুগপজ্জ্ঞানানামাত্মগুণত্বেঽপীতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের সন্নিকর্ষও গন্ধাদি প্রত্যক্ষের কারণ, কিন্তু মনের অণুত্ববশতঃ সেই ইন্দ্রিয়মনঃসন্নিকর্ষের যৌগপদ্য হয় না। যৌগপদ্য না হওয়ায় আত্মগুণত্ব হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান বিভু আত্মার গুণ হইলেও যুগপৎ সমস্ত জ্ঞানের (গন্ধাদি প্রত্যক্ষের) উৎপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থবর্গের প্রত্যক্ষে যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ কারণ, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়মনঃসন্নিকর্ষও কারণ। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হইলে সেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু মন অতি সূক্ষ্ম বলিয়া একই সময়ে নানা স্থানস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় একই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।—জ্ঞান আত্মারই গুণ এবং ঐ আত্মাও বিভু, সুতরাং আত্মার সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সর্ব্বদাই আছে, ইহা সত্য ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ যাহা প্রত্যক্ষের একটি অসাধারণ কারণ, তাহার যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না ॥২১॥

ভাষ্য। যদি পুনরাত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষমাত্রাদ্‌গন্ধাদি-জ্ঞানমুৎপদ্যেত ?

অনুবাদ। (প্রশ্ন) যদি আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্র জন্যই গন্ধাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় ? অর্থাৎ ইহা বলিলে দোষ কি ?

সূত্র। নোৎপত্তিকারণানপদেশাৎ ॥২২॥২৯৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) না,—অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ-মাত্রজন্যই গন্ধাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না ; কারণ, উৎপত্তির কারণের (প্রমাণের) অপদেশ (কথন) হয় নাই।

ভাষ্য। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষমাত্রাদ্‌গন্ধাদিজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি, নাত্রোৎপত্তিকারণমপদিশ্যতে, যেনৈতৎ প্রতিপদ্যেমহীতি।

অনুবাদ। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্রজন্য গন্ধাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই বাক্যে উৎপত্তির কারণ (প্রমাণ) কথিত হইতেছে না, যদ্দ্বারা ইহা স্বীকার করিতে পারি।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও মনের সন্নিকর্ষ অনাবশ্যক,—আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্রজন্যই গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়। এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঐকথা বলা যায় না। কারণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্রজন্যই যে গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তি বিষয়ে কারণ অর্থাৎ প্রমাণ বলা হয় নাই। যে প্রমাণের দ্বারা উহা স্বীকার করিতে পারি, সেই প্রমাণ বলা আবশ্যক। সূত্রে "কারণ" শব্দ প্রমাণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ে তর্কের লক্ষণসূত্রেও (৪০শ সূত্রে) মহর্ষি প্রমাণ অর্থে "কারণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারাও "কারণ" শব্দের প্রমাণ অর্থই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহা বুঝা যায়[১]। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "যেনৈতৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ সন্নিকর্ষমাত্রজন্য গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, পরন্তু বাধক প্রমাণই আছে, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এই সূত্রের তাৎপর্য্য। উদ্দ্যোতকর সর্ব্বশেষে এই সূত্রের আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে সময়ে ইন্দ্রিয় ও আত্মা কোন অর্থের সহিত যুগপৎ সম্বদ্ধ হয়, তখন সেই জ্ঞানের উৎপত্তিতে কি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই কারণ ? অথবা আত্মা ও অর্থের সন্নিকর্ষই কারণ, অথবা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষই কারণ ? এইরূপে কারণ বলা যায় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কোন সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের উৎপাদক হয় না, উহারা সকলেই তখন ব্যভিচারী হওয়ায় উহাদিগের মধ্যে কোন সন্নিকর্ষেরই কারণত্ব কল্পনায় নিয়ামক হেতু না থাকায় কোন সন্নিকর্ষকেই বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষের কারণ বলা যায় না ॥২২॥

সূত্র। বিনাশকারণানুপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ॥২৩॥২৯৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এবং (জ্ঞানের) বিনাশের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ অবস্থান (স্থিতি) হইলে তাহার (জ্ঞানের) নিত্যত্বের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। "তদাত্মগুণত্বেঽপি তুল্য"মিত্যেতদনেন সমুচ্চীয়তে। দ্বিবিধো হি গুণনাশহেতুঃ, গুণানামাশ্রয়াভাবো বিরোধী চ গুণঃ। নিত্যত্বাদাত্মনোঽনুপপন্নঃ পূর্ব্বঃ, বিরোধী চ বুদ্ধের্গুণো ন গৃহ্যতে, তস্মাদাত্মগুণত্বে সতি বুদ্ধের্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ।

অনুবাদ। "তদাত্মগুণত্বেঽপি তুল্যং" এই পূর্ব্বোক্ত সূত্র, এই সূত্রের সহিত সমুচ্চিত হইতেছে। গুণের বিনাশের কারণ দ্বিবিধই, (১) গুণের আশ্রয়ের অভাব,

---

১। নোৎপত্তীতি। নাত্র প্রমাণমপদিশ্যতে, প্রত্যুত বাধকং প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

(২) এবং বিরোধী গুণ। আত্মার নিত্যত্ববশতঃ পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম কারণ আশ্রয়-নাশ উপপন্ন হয় না, বুদ্ধির বিরোধী গুণও গৃহীত হয় না, অর্থাৎ গুণনাশের দ্বিতীয় কারণও নাই। অতএব বুদ্ধির আত্মগুণত্ব হইলে নিত্যত্বের আপত্তি হয়।

টিপ্পনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে, কিন্তু আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আর একটি পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির বিনাশের কারণ উপলব্ধ না হওয়ায় কারণাভাবে বুদ্ধির বিনাশ হয় না, বুদ্ধির অবস্থানই হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বুদ্ধির নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হয়, পূর্ব্বে যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়। বুদ্ধির বিনাশের কারণ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, দুই কারণে গুণপদার্থের বিনাশ হইয়া থাকে। কোন স্থলে সেই গুণের আশ্রয় দ্রব্য নষ্ট হইলে আশ্রয়নাশজন্য সেই গুণের নাশ হয়। কোন স্থানে বিরোধী গুণ উৎপন্ন হইলে তাহাও পূর্ব্বজাত গুণের নাশ করে। কিন্তু বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলিলে আত্মাই তাহার আশ্রয় দ্রব্য হইবে। আত্মা নিত্য, তাহার বিনাশই নাই, সুতরাং আশ্রয়নাশরূপ প্রথম কারণ অসম্ভব। বুদ্ধির বিরোধী কোন গুণেরও উপলব্ধি না হওয়ায় সেই কারণও নাই। সুতরাং বুদ্ধির বিনাশের কোন কারণই না থাকায় বুদ্ধির নিত্যত্বের আপত্তি হয়। ভাব পদার্থের বিনাশের কারণ না থাকিলে তাহা নিত্যই হইয়া থাকে। এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা মহর্ষি এই সূত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত "তদাত্মগুণত্বেঽপি তুল্যং" এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের সমুচ্চয় (পরস্পর সম্বন্ধ) প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এখানে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন[১]। তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধি আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্ত পক্ষে যেমন পূর্ব্বোক্ত "তদাত্ম-গুণত্বেঽপি তুল্যং" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এই সূত্রের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্ত-পক্ষেই পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধি আত্মার গুণ হইলে যেমন আত্মার বিভুত্ববশতঃ যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি হয়, তদ্রূপ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ কখনও উহার বিনাশ হইতে না পারায় তাহার গুণ বুদ্ধিরও কখনও বিনাশ হইতে পারে না, ঐ বুদ্ধির নিত্যত্বের আপত্তি হয়। সুতরাং বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলিলেই পূর্ব্বোক্ত ঐ পূর্ব্বপক্ষের ন্যায় এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়েও মহর্ষির এইরূপ একটি সূত্র দেখা যায়। ২য় আঃ, ৩৭শ সূত্র দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

সূত্র। অনিত্যত্বগ্রহণাদ্‌বুদ্ধের্ব্বুদ্ধ্যন্তরাদ্বিনাশঃ শব্দবৎ ॥ ॥২৪॥২৯৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) বুদ্ধির অনিত্যত্বের জ্ঞান হওয়ায় বুদ্ধ্যন্তর প্রযুক্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানান্তরজন্য বুদ্ধির বিনাশ হয়, যেমন শব্দের (শব্দান্তর জন্য বিনাশ হয়)।

১। অত্র পূর্ব্বপক্ষসূত্রে চকারঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসূত্রাপেক্ষয়া ইত্যাহ তদাত্মগুণত্ব ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

ভাষ্য। অনিত্যা বুদ্ধিরিতি সর্ব্বশরীরিণাং প্রত্যাত্মবেদনীয়মেতৎ। গৃহ্যতে চ বুদ্ধিসন্তানস্তত্র বুদ্ধেবু‍র্দ্ধ্যন্তরং বিরোধী গুণ ইত্যনুমীয়তে, যথা শব্দসন্তানে শব্দঃ শব্দান্তরবিরোধীতি।

অনুবাদ। বুদ্ধি অনিত্য, ইহা সর্ব্বপ্রাণীর প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী নিজের আত্মাতেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব বুঝিতে পারে। বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানপরম্পরাও গৃহীত হইতেছে, তাহা হইলে বুদ্ধির সম্বন্ধে অপর বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানান্তর বিরোধী গুণ, ইহা অনুমিত হয়। যেমন শব্দের সন্তানে শব্দ, শব্দান্তরের বিরোধী, অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দের বিনাশক।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহার বিনাশের কারণও সিদ্ধ হয়। এই আহ্নিকের প্রথম প্রকরণেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধি যে অনিত্য, ইহা প্রত্যেক প্রাণী নিজের আত্মাতেই বুঝিতে পারে। "আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি বুঝিব" এইরূপে বুদ্ধি বা জ্ঞানের ধ্বংস ও প্রাগভাব মনের দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং বুদ্ধির উৎপত্তির কারণের ন্যায় তাহার বিনাশের কারণও অবশ্য আছে। বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক নানা জ্ঞানও জন্মে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং সেই নানা জ্ঞানের মধ্যে এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের বিরোধী গুণ, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ, উহাই প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিনাশের কারণ। যেমন বীচিতরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন শব্দসন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ, তদ্রূপ জ্ঞানের উৎপত্তিস্থলেও দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ। এইরূপ তৃতীয় জ্ঞান দ্বিতীয় জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পরক্ষণজাত শব্দ যেমন তাহার পূর্ব্বক্ষণজাত শব্দের নাশক, তদ্রূপ পরক্ষণজাত জ্ঞানও তাহার পূর্ব্বক্ষণজাত জ্ঞানের নাশক হয়। যে জ্ঞানের পরে আর জ্ঞান জন্মে নাই, সেই চরম জ্ঞান কাল বা সংস্কার দ্বারা বিনষ্ট হয়। মহর্ষি শব্দকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করায় শব্দান্তরজন্য শব্দনাশের ন্যায় জ্ঞানান্তরজন্য জ্ঞান নাশ বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানের পরক্ষণে সুখ দুঃখাদি মনোগ্রাহ্য বিশেষ গুণ জন্মিলে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বজাত জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী প্রকরণে এ সকল কথা পরিস্ফুট হইবে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য। অসংখ্যেয়েষু জ্ঞানকারিতেষু সংস্কারেষু স্মৃতিহেতু-ষ্বাত্মসমবেতেষ্বাত্মমনসোশ্চ সন্নিকর্ষে সমানে স্মৃতিহেতৌ সতি ন কারণস্য যৌগপদ্যমস্তীতি যুগপৎ স্মৃতয়ঃ প্রাদুর্ভবেয়ুর্যদি বুদ্ধিরাত্মগুণঃ স্যাদিতি। তত্র কশ্চিৎ সন্নিকর্ষস্যাযৌগপদ্যমুপপাদয়িষ্যন্নাহ।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আত্মাতে সমবেত জ্ঞানজনিত অসংখ্য সংস্কাররূপ স্মৃতির কারণ থাকায় এবং আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষরূপ সমান স্মৃতির কারণ থাকায় কারণের অযৌগপদ্য নাই, সুতরাং যদি বুদ্ধি আত্মার গুণ হয়, তাহা হইলে যুগপৎ সমস্ত স্মৃতি প্রাদুর্ভূত হউক? তন্নিমিত্ত অর্থাৎ এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানের জন্য সন্নিকর্ষের (আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের) অযৌগপদ্য উপপাদন করিতে কেহ বলেন—

সূত্র। জ্ঞানসমবেতাত্ম-প্রদেশসন্নিকর্ষান্মনসঃ স্মৃত্যুৎ-পত্তের্ন যুগপদুৎপত্তিঃ ॥২৫॥২৯৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) "জ্ঞানসমবেত" অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশ-বিশেষের সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ (স্মৃতির) উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। জ্ঞানসাধনঃ সংস্কারো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে। জ্ঞানসংস্কৃতৈ-রাত্মপ্রদেশৈঃ পর্য্যায়েণ মনঃ সন্নিকৃষ্যতে। আত্মমনঃসন্নিকর্ষাৎ স্মৃতয়োঽপি পর্য্যায়েণ ভবন্তীতি।

অনুবাদ। জ্ঞান যাহার সাধন, অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, "জ্ঞান" এই শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশ-গুলির সহিত ক্রমশঃ মন সন্নিকৃষ্ট হয়। আত্মা ও মনের (ক্রমিক) সন্নিকর্ষজন্য সমস্ত স্মৃতিও ক্রমশঃ জন্মে।

টিপ্পনী। মনের অণুত্ববশতঃ যুগপৎ নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইতে না পারায় ঐ কারণের অভাবে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং জ্ঞান আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কিত দোষও নিরাকৃত হইয়াছে। এখন ভাষ্যকার ঐ সিদ্ধান্তে আর একটি পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ হইলে স্মৃতিরূপ জ্ঞান যুগপৎ কেন জন্মে না? স্মৃতিকার্য্যে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ নহে। পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারই স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ। আত্মার ও মনের সন্নিকর্ষ, জন্য জ্ঞানমাত্রের সমান কারণ, সুতরাং উহা স্মৃতিরও সমান কারণ। অর্থাৎ একরূপ আত্মমনঃসন্নিকর্ষই সমস্ত স্মৃতির কারণ। জীবের আত্মাতে অসংখ্যবিষয়ক অসংখ্য জ্ঞানজন্য অসংখ্য সংস্কার বর্ত্তমান আছে, এবং আত্মা ও মনের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ, যাহা সমস্ত স্মৃতির সমান কারণ, তাহাও আছে, সুতরাং স্মৃতিরূপ জ্ঞানের যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগের যৌগপদ্যই আছে। তাহা হইলে কোন

একটি সংস্কারজন্য কোন বিষয়ের স্মরণকালে অন্যান্য নানা সংস্কারজন্য অন্যান্য নানা বিষয়েরও স্মরণ হউক ? স্মৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য হইলে স্মৃতিরূপ কার্য্যের যৌগপদ্য কেন হইবে না ? এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসের জন্য কেহ বলিয়াছিলেন যে, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ সমস্ত স্মৃতির কারণ হইলেও বিভিন্নরূপ আত্মমনঃসন্নিকর্ষই বিভিন্ন স্মৃতির কারণ, সেই বিভিন্নরূপ আত্মমনঃসন্নিকর্ষের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য নানা স্মৃতির যৌগপদ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ একই সময়ে নানা স্মৃতির কারণ নানাবিধ আত্মমনঃসন্নিকর্ষ হইতে না পারায় নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পরোক্ত এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্ব্বক এই সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যেই এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যাহার দ্বারা স্মরণরূপ জ্ঞান জন্মে, এই অর্থে সূত্রে সংস্কার অর্থে "জ্ঞান" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "জ্ঞান" অর্থাৎ সংস্কার যাহাতে সমবেত, (সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান), এইরূপ যে আত্মপ্রদেশ, অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন স্থান, তাহার সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হয়, সুতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা বলা হইয়াছে। প্রদেশ শব্দের মুখ্য অর্থ কারণদ্রব্য, জন্য দ্রব্যের অবয়ব বা অংশই তাহার কারণ দ্রব্য, তাহাকেই ঐ দ্রব্যের প্রদেশ বলে। সুতরাং নিত্য দ্রব্য আত্মার প্রদেশ নাই। 'আত্মার প্রদেশ' এইরূপ প্রয়োগ সমীচীন নহে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২য় আঃ, ১৭শ সূত্রে) এ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে অন্যের মত বলিতে তদনুসারে গৌণ অর্থে আত্মার প্রদেশ বলিয়াছেন। স্মৃতির যৌগপদ্য নিরাস করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অপরের কথা বলিয়াছেন যে, স্মৃতির কারণ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার আত্মার একই স্থানে উৎপন্ন হয় না। আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার উৎপন্ন হয়। এবং যে সংস্কার আত্মার যে প্রদেশে জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশের সহিত মনের সন্নিকর্ষ হইলে সেই সংস্কারজন্য স্মৃতি জন্মে। একই সময়ে আত্মার সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত অতি সূক্ষ্ম মনের সংযোগ হইতে পারে না। ক্রমশঃই সেই সমস্ত সংস্কারবিশিষ্ট আত্মপ্রদেশের সহিত মনের সংযোগ হওয়ায় ক্রমশঃই তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন নানা স্মৃতি জন্মে। স্মৃতির কারণ নানা সংস্কারের যৌগপদ্য থাকিলেও পূর্ব্বোক্তরূপ বিভিন্ন আত্মমনঃসংযোগের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় স্মৃতির যৌগপদ্যের আপত্তি করা যায় না ॥ ২৫ ॥

সূত্র। নান্তঃশরীরবৃত্তিত্বান্মনসঃ ॥২৬॥২৯৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উত্তর বলা যায় না, যেহেতু মনের শরীরমধ্যেই বর্ত্তমানত্ব আছে।

ভাষ্য। সদেহস্যাত্মনো মনসা সংযোগো বিপচ্যমানকর্ম্মাশয়সহিতো জীবনমিষ্যতে, তত্রাস্য প্রাক্‌প্রায়ণাদন্তঃশরীরে বর্ত্তমানস্য মনসঃ শরীরাদ্বহির্জ্ঞানসংস্কৃতৈরাত্মপ্রদেশৈঃ সংযোগো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। "বিপচ্যমান" অর্থাৎ যাহার বিপাক বা ফলভোগ হইতেছে, এমন "কর্ম্মাশয়" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত দেহবিশিষ্ট আত্মার মনের সহিত সংযোগ, জীবন স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মমনঃসংযোগবিশেষকেই জীবন বলে। তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ জীবন থাকিতে শরীরের মধ্যেই বর্ত্তমান এই মনের শরীরের বাহিরে জ্ঞান-সংস্কৃত নানা আত্মপ্রদেশের সহিত সংযোগ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মন "অন্তঃশরীরবৃত্তি" অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর পূর্ব্বে মন শরীরের বাহিরে যায় না, সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমাধান হইতে পারে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবনকালে মন শরীরের মধ্যেই থাকে, নচেৎ জীবনই থাকে না, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার এখানে জীবনের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগই জীবন, দেহের বাহিরে আত্মার সহিত মনের সংযোগ জীবন নহে। কারণ, তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকায় জীবন থাকিতে পারে। সুতরাং দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মার সহিত মনের সংযোগকেই "জীবন" বলিতে হইবে। কিন্তু শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত যে ক্ষণে মনের প্রথম সংযোগ জন্মে, সেই ক্ষণেই জীবন ব্যবহার হয় না, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগারম্ভ হইলেই জীবন-ব্যবহার হয়। এজন্য ভাষ্যকার "বিপচ্যমানকর্ম্মাশয়সহিতঃ" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ মনঃসংযোগকে বিশিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নাম "কর্ম্মাশয়"[১]। যে কর্ম্মাশয়ের বিপাক অর্থাৎ ফলভোগ হইতেছে, তাহাই বিপচ্যমান কর্ম্মাশয়। তাদৃশ কর্ম্মাশয় সহিত যে দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনঃসংযোগ, তাহাই জীবন। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মমনঃসংযোগ জীবন নহে। জীবনের পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ নির্ণীত হইলে জীবের "প্রায়ণের" (মৃত্যুর) পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবনকালে মন শরীরের মধ্যেই থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন আত্মপ্রদেশের সহিত মনের সংযোগ উপপন্ন হইতে পারে না। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কল্পনা করিলেও যে প্রদেশে একটি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই অন্য সংস্কারের উৎপত্তি বলা যাইবে না। তাহা বলিলে আত্মার একই প্রদেশে নানা সংস্কার বর্ত্তমান থাকায় সেই প্রদেশের সহিত মনের সংযোগ হইলে—সেখানে একই সময়ে সেই নানাসংস্কারজন্য নানা স্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং যে আপত্তির নিরাসের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, সেই আপত্তির নিরাস হয় না। সুতরাং আত্মার এক একটি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি সংস্কারই জন্মে, ইহাই বলিতে হইবে।

১। ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।—যোগসূত্র, সাধনপাদ, ১২।
পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ।—ব্যাসভাষ্য।
আশেরতে সাংসারিকাঃ পুরুষা অস্মিন্ ইত্যাশয়ঃ। কর্ম্মণামাশয়ো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ।—বাচস্পতি মিশ্র টীকা।

কিন্তু শরীরের মধ্যে আত্মার প্রদেশগুলিতে অসংখ্য সংস্কার স্থান পাইবে না। সুতরাং শরীরের মধ্যে আত্মার যতগুলি প্রদেশ গ্রহণ করা যাইবে, সেই সমস্ত প্রদেশ সংস্কারপূর্ণ হইলে তখন শরীরের বাহিরে সর্ব্বব্যাপী আত্মার অসংখ্য প্রদেশে ক্রমশঃ অসংখ্য সংস্কার জন্মে এবং শরীরের বাহিরে আত্মার সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হইলে সেই সমস্ত সংস্কারজন্য ক্রমশঃ নানা স্মৃতি জন্মে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু জীবনকাল পর্য্যন্ত মন "অন্তঃশরীরবৃত্তি" ; সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে মন শরীরের বাহিরে না যাওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধান উপপন্ন হয় না। মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব কি ? এই বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, শরীরের বাহিরে মনের কার্য্যকারিতার অভাবই মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব। যে শরীরের দ্বারা আত্মা কর্ম্ম করিতেছেন, সেই শরীরের সহিত সংযুক্ত মনই আত্মার জ্ঞানাদি কার্য্যের সাধন হইয়া থাকে। ২৬॥

সূত্র। সাধ্যত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥২৯৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সাধ্য, সিদ্ধ নহে, এ জন্য অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই হয় না।

ভাষ্য। বিপচ্যমানকর্ম্মাশয়মাত্রং জীবনং, এবঞ্চ সতি সাধ্যমন্তঃশরীরবৃত্তিত্বং মনস ইতি।

অনুবাদ। বিপচ্যমান কর্ম্মাশয়মাত্রই জীবন। এইরূপ হইলে মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব সাধ্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে যে মনের "অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব" হেতু বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত উত্তরবাদী স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে স্মরণের জন্য মন শরীরের বাহিরেও আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়। বিপচ্যমান কর্ম্মাশয়মাত্রই জীবন, শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগ জীবন নহে। সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গেলেও তখন জীবনের সত্তার হানি হয় না। তখনও জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ বর্ত্তমান থাকায় বিপচ্যমান কর্ম্মাশয়রূপ জীবন থাকে। মৃত্যুর পরে পূর্ব্বদেহে আত্মার পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীবন না থাকিলেও দেহান্তরে জীবন থাকে। মৃত্যুর পরে তখনই দেহান্তর-পরিগ্রহ শাস্ত্রসিদ্ধ। প্রলয়কালে এবং মুক্তিলাভ হইলেই পূর্ব্বোক্তরূপ জীবন থাকে না। ফলকথা, জীবনের স্বরূপ বলিতে শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সংযোগ, এই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গেলে জীবন থাকে না, ইহার কোন হেতু না থাকায় মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্ব অন্য যুক্তির দ্বারা সাধন করিতে হইবে, উহা সিদ্ধ নহে, কিন্তু সাধ্য, সুতরাং উহা হেতু হইতে পারে না। উহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমাধানের খণ্ডন করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীর এই কথাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ২৭॥

সূত্র। স্মরতঃ শরীরধারণোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ ॥ ॥২৮॥২৯৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) স্মরণকারী ব্যক্তির শরীর ধারণের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ নাই।

ভাষ্য। সুস্মূর্ষয়া খল্বয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কঞ্চিদর্থং স্মরতি, স্মরতশ্চ শরীরধারণং দৃশ্যতে, আত্মমনঃসন্নিকর্ষজশ্চ প্রযত্নো দ্বিবিধো ধারকঃ প্রেরকশ্চ, নিঃসৃতে চ শরীরাদ্বহির্মনসি ধারকস্য প্রযত্নস্যাভাবাৎ গুরুত্বাৎ পতনং স্যাৎ শরীরস্য স্মরত ইতি।

অনুবাদ। এই স্মর্ত্তা স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করে, স্মরণকারী জীবের শরীর ধারণও দেখা যায়। আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্য প্রযত্নও দ্বিবিধ,—ধারক ও প্রেরক; কিন্তু মন শরীরের বাহিরে নির্গত হইলে ধারক প্রযত্ন না থাকায় গুরুত্ববশতঃ স্মরণকারী ব্যক্তির শরীরের পতন হউক ?

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষের নিরাসের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মনের অন্তঃশরীরবৃত্তিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না অর্থাৎ জীবনকালে মন যে শরীরের মধ্যেই থাকে, শরীরের বাহিরে যায় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, স্মরণকারী ব্যক্তির স্মরণকালেও শরীর ধারণ দেখা যায়। কোন বিষয়ের স্মরণের ইচ্ছা হইলে তৎপ্রযুক্ত তখন প্রণিহিতমনা হইয়া বিলম্বেও সেই বিষয়ের স্মরণ করে। কিন্তু তখন মন শরীরের বাহিরে গেলে শরীর ধারণ হইতে পারে না। শরীরের গুরুত্ববশতঃ তখন ভূমিতে শরীরের পতন অনিবার্য্য হয়। কারণ, শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্য আত্মাতে শরীরের প্রেরক ও ধারক, এই দ্বিবিধ প্রযত্ন জন্মে। তন্মধ্যে ধারক প্রযত্নই শরীরের পতনের প্রতিবন্ধক। মন শরীরের বাহিরে গেলে তখন ঐ ধারক প্রযত্নের কারণ না থাকায় উহার অভাব হয়, সুতরাং তখন শরীরের ধারণ হইতে পারে না। গুরুত্ববিশিষ্ট দ্রব্যের পতনের অভাবই তাহার ধৃতি বা ধারণ। কিন্তু ঐ পতনের প্রতিবন্ধক ধারক প্রযত্ন না থাকিলে সেখানে পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত মনের দ্বারা কোন বিষয়ের স্মরণ হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ স্মরণ ও শরীর-ধারণ যুগপৎ জন্মে, ইহা দৃষ্ট হয়;—যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য ॥ ২৮ ॥

সূত্র। ন তদাশুগতিত্বান্মনসঃ ॥২৯॥৩০০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হয় না, অর্থাৎ মন শরীরের বাহিরে গেলেও শরীরের পতন হয় না। কারণ, মনের আশুগতিত্ব আছে।

ভাষ্য। আশুগতি মনস্তস্য বহিঃশরীরাদাত্মপ্রদেশেন জ্ঞানসংস্কৃতেন সন্নিকর্ষঃ, প্রত্যাগতস্য চ প্রযত্নোৎপাদনমুভয়ং যুজ্যত ইতি, উৎপাদ্য বা ধারকং প্রযত্নং শরীরান্নিঃসরণং মনসোঽতস্তত্রোপপন্নং ধারণমিতি।

অনুবাদ। মন আশুগতি, (সুতরাং) শরীরের বাহিরে জ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ, এবং প্রত্যাগত হইয়া প্রযত্নের উৎপাদন, উভয়ই সম্ভব হয়। অথবা ধারক প্রযত্ন উৎপন্ন করিয়া মনের শরীর হইতে নির্গমন হয়, অতএব সেই স্থলে ধারণ উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষের নিরাস করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলেও শরীর ধারণের অনুপপত্তি নাই। কারণ, মন অতি দ্রুতগতি, শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মিলেই তখনই আবার শরীরে প্রত্যাগত হইয়া, ঐ মন শরীরধারক প্রযত্ন উৎপন্ন করে। সুতরাং শরীরের পতন হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, সেই সময়ে শরীরধারণ কিরূপে হইবে? এজন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনের জন্য শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা মন শরীরধারক প্রযত্ন উৎপন্ন করিয়াই শরীরের বাহিরে নির্গত হয়, ঐ প্রযত্নই তৎকালে শরীর পতনের প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান থাকায় তখন শরীর ধারণ উপপন্ন হয়। সূত্রে "তৎ"শব্দের দ্বারা শরীরের পতনই বিবক্ষিত। পরবর্ত্তী রাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য "ন্যায়সূত্রবিবরণে" ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ন তৎ শরীরাধারণং" ॥ ২৯ ॥

সূত্র। ন স্মরণকালানিয়মাৎ ॥৩০॥৩০১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ মনের আশুগতিত্ববশতঃ শরীর ধারণ উপপন্ন হয় না। কারণ, স্মরণের কালের নিয়ম নাই।

ভাষ্য। কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রং স্মর্য্যতে, কিঞ্চিচ্চিরেণ; যদা চিরেণ, তদা সুস্মূর্ষয়া মনসি ধার্য্যমাণে চিন্তাপ্রবন্ধে সতি কস্যচিদেবার্থস্য লিঙ্গভূতস্য

চিন্তনমারাধিতং স্মৃতিহেতুর্ভবতি। তত্রৈতচ্চিরনিশ্চরিতে মনসি নোপপদ্যত ইতি।

শরীরসংযোগানপেক্ষশ্চাত্মমনঃসংযোগো ন স্মৃতিহেতুঃ, শরীরস্যোপভোগায়তনত্বাৎ।

উপভোগায়তনং পুরুষস্য জ্ঞাতুঃ শরীরং, ন ততো নিশ্চরিতস্য মনস আত্মসংযোগমাত্রং জ্ঞানসুখাদীনামুৎপত্ত্যৈ[১] কল্পতে, ক্লৃপ্তৌ চ শরীরবৈয়র্থ্যমিতি।

অনুবাদ। কোন বস্তু শীঘ্র স্মৃত হয়, কোন বস্তু বিলম্বে স্মৃত হয়, যে সময়ে বিলম্বে স্মৃত হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ মন ধার্য্যমাণ হইলে অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে মনকে প্রণিহিত করিলে তখন চিন্তার প্রবন্ধ (স্মৃতির প্রবাহ) হইলে[২] লিঙ্গভূত অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্নভূত কোন পদার্থের চিন্তন (স্মরণ) আরাধিত (সিদ্ধ) হইয়া স্মরণের হেতু হয় (অর্থাৎ সেই চিহ্ন বা অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে সেই চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের স্মরণ জন্মায়) সেই স্থলে অর্থাৎ ঐরূপ বিলম্বে স্মরণস্থলে মন (শরীর হইতে) চিরনির্গত হইলে ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত শরীর ধারণ উপপন্ন হয় না।

এবং শরীরের উপভোগায়তনত্ববশতঃ শরীরসংযোগনিরপেক্ষ আত্মমনঃসংযোগ, স্মরণের হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে—শরীর জ্ঞাতা পুরুষের উপভোগের আয়তন অর্থাৎ অধিষ্ঠান,—সেই শরীর হইতে নির্গত মনের আত্মার সহিত সংযোগমাত্র, জ্ঞান ও সুখাদির উৎপত্তির নিমিত্ত সমর্থ হয় না, অর্থাৎ শরীরের বাহিরে কেবল আত্মার সহিত যে মনঃসংযোগ, তাহার জ্ঞান ও সুখাদির উৎপাদনে সামর্থ্যই নাই, সামর্থ্য থাকিলে কিন্তু শরীরের বৈয়র্থ্য হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, স্মরণের কালনিয়ম না থাকায় মন আশুগতি হইলেও শরীর ধারণের উপপত্তি হয় না। যেখানে

১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই "উৎপত্তৌ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু এখানে সামর্থ্যবোধক কৃপ ধাতুর প্রয়োগ হওয়ায় তাহার যোগে চতুর্থী বিভক্তিই প্রযোজ্য, ভাষ্যকার এইরূপ স্থলে অন্যত্রও চতুর্থী বিভক্তিরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাই এখানেও ভাষ্যকার "উৎপত্ত্যৈ" এইরূপ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন মনে হওয়ায় ঐরূপ পাঠই গৃহীত হইল। (১ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

২। ভাষ্যে "চিন্তাপ্রবন্ধঃ" স্মৃতিপ্রবন্ধঃ। "কস্যচিদেবার্থস্য "লিঙ্গভূতস্য", চিহ্নভূতস্য অসাধারণস্যেতি যাবৎ। "চিন্তনং" স্মরণং, "আরাধিতং" সিদ্ধং, চিহ্নবতঃ স্মৃতিহেতুর্ভবতীতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনেক চিন্তার পরে বিলম্বে স্মরণ হয়, সেখানে মন শরীর হইতে নির্গত হইয়া স্মরণকাল পর্য্যন্ত শরীরের বাহিরে থাকিলে তৎকালে শরীর-ধারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বিলম্বে কোন পদার্থের স্মরণ হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে মনকে প্রণিহিত করিলে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ নানা স্মৃতি জন্মে। এইরূপে যখন সেই স্মরণীয় পদার্থের কোন অসাধারণ চিহ্নের স্মরণ হয়, তখন সেই স্মরণ, সেই চিহ্নবিশিষ্ট স্মরণীয় পদার্থের স্মৃতি জন্মায়। তাহা হইলে সেই চরম স্মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং তৎকাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ হইতে পারে না। মন ধারক প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া শরীরের বাহিরে গেলেও ঐ প্রযত্ন তৎকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। কারণ, তৃতীয় ক্ষণেই প্রযত্নের বিনাশ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শেষে নিজে আরও একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলে মনের সহিত শরীরের সংযোগ থাকে না, কেবল আত্মার সহিতই মনের সংযোগ থাকে। সুতরাং ঐ সংযোগ, জ্ঞান ও সুখাদির উৎপাদনে সমর্থই হয় না। কারণ, শরীর আত্মার উপভোগের আয়তন, শরীরের বাহিরে আত্মার কোনরূপ উপভোগ হইতে পারে না। শরীরের বাহিরে কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগ-জন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইলে শরীরের উপভোগায়তনত্ব থাকে না, তাহা হইলে শরীরের উৎপত্তি ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ যে উপভোগ সম্পাদনের জন্য শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যদি শরীরের বাহিরে শরীর ব্যতিরেকেও হইতে পারে, তাহা হইলে শরীর-সৃষ্টি ব্যর্থ হয়। সুতরাং শরীরসংযোগনিরপেক্ষ আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে কারণই হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। অতএব মন শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইলে তখনই বিষয়বিশেষের স্মৃতি জন্মে, ঐরূপ মনঃসংযোগের যৌগপদ্য না হওয়ায় স্মৃতিরও যৌগপদ্য হইতে পারে না, এইরূপ সমাধান কোনরূপেই সম্ভব নহে ॥৩০॥

সূত্র। আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ ন সংযোগ-বিশেষঃ ॥৩১॥৩০২॥

অনুবাদ। আত্মা কর্তৃক প্রেরণ, অথবা যদৃচ্ছা অর্থাৎ অকস্মাৎ, অথবা জ্ঞানবত্তাপ্রযুক্ত (শরীরের বাহিরে মনের) সংযোগবিশেষ হয় না।

ভাষ্য। আত্মপ্রেরণেন বা মনসো বহিঃ শরীরাৎ সংযোগবিশেষঃ স্যাৎ ? যদৃচ্ছয়া বা আকস্মিকতয়া, জ্ঞতয়া বা মনসঃ ? সর্ব্বথা চানুপপত্তিঃ। কথং ? স্মর্ত্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণাজ্‌জ্ঞানাসম্ভবাচ্চ। যদি তাবদাত্মা অমুষ্যার্থস্য স্মৃতিহেতুঃ সংস্কারোঽমুষ্মিন্নাত্মপ্রদেশে সমবেতস্তেন মনঃ সংযুজ্যতামিতি মনঃ প্রেরয়তি, তদা স্মৃত এবাসাবর্থো ভবতি ন স্মর্ত্তব্যঃ। ন

চাত্মপ্রত্যক্ষ আত্মপ্রদেশঃ সংস্কারো বা, তত্রানুপপন্নাত্মপ্রত্যক্ষেণ সংবিত্তিরিতি। সুস্মূর্ষয়া চায়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কঞ্চিদর্থং স্মরতি নাকস্মাৎ। জ্ঞত্বঞ্চ মনসো নাস্তি, জ্ঞানপ্রতিষেধাদিতি।

অনুবাদ। শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ কি (১) আত্মা কর্ত্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ হয়? অথবা (২) যদৃচ্ছাবশতঃ (অর্থাৎ) আকস্মিক ভাবে হয়? (৩) অথবা মনের জ্ঞানবত্তাবশতঃ হয়? সর্ব্বপ্রকারেই উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারেই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না কেন? (উত্তর) (১) স্মরণীয়ত্বপ্রযুক্ত, (২) ইচ্ছাপূর্ব্বক স্মরণপ্রযুক্ত, (৩) এবং মনে জ্ঞানের অসম্ভব প্রযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, যদি (১) আত্মা "এই পদার্থের স্মৃতির কারণ সংস্কার এই আত্মপ্রদেশে সমবেত আছে, তাহার সহিত মনঃ সংযুক্ত হউক," এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই পদার্থ অর্থাৎ মনঃ-প্রেরণের জন্য পূর্ব্বচিন্তিত সেই পদার্থ স্মৃতই হয়, স্মরণীয় হয় না। এবং আত্মার প্রদেশ অথবা সংস্কার, আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্বিষয়ে আত্মার প্রত্যক্ষের দ্বারা সংবিত্তি (জ্ঞান) উপপন্ন হয় না। এবং (২) স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ এই স্মর্ত্তা মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করে; অকস্মাৎ স্মরণ করে না। এবং (৩) মনের জ্ঞানবত্তা নাই। কারণ, জ্ঞানের প্রতিষেধ হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞান যে মনের গুণ নহে, মনে জ্ঞান জন্মে না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

টিপ্পনী। বিষয়বিশেষের স্মরণের জন্য মন শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। এখন ঐ মত-খণ্ডনে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অপরের কথা বলিয়াছেন যে, আত্মাই মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য শরীরের বাহিরে আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা বলা যায় না। মন অকস্মাৎ শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাও বলা যায় না। এবং মন নিজের জ্ঞানবত্তাবশতঃ নিজেই কর্ত্তব্য বুঝিয়া শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাও বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারেই যখন শরীরের বাহিরে মনের ঐরূপ সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না, তখন আর কোন প্রকার না থাকায় সর্ব্বপ্রকারেই উহা উপপন্ন হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। আত্মাই শরীরের বাহিরে মনকে প্রেরণ করায়, মনের পূর্ব্বোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই প্রথম পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার "স্মর্ত্তব্যত্বাৎ" এই কথা বলিয়া, পরে তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, আত্মা যে পদার্থকে স্মরণ করিবার জন্য

মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিবেন, সেই পদার্থ তাঁহার স্মর্ত্তব্য, অর্থাৎ মনঃ-প্রেরণের পূর্ব্বে তাহা স্মৃত হয় নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু আত্মা ঐ পদার্থকে স্মরণ করিবার জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিলে "এই পদার্থের স্মৃতির জনক সংস্কার এই আত্মপ্রদেশে সমবেত আছে, সেই আত্মপ্রদেশের সহিত মনঃ সংযুক্ত হউক" এইরূপ চিন্তা করিয়াই মনকে প্রেরণ করেন, ইহা বলিতে হইবে। নচেৎ আত্মার প্রেরণজন্য যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্মিলে সেই স্মর্ত্তব্য বিষয়ের স্মরণ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া মনকে প্রেরণ করিলে তাহার সেই স্মর্ত্তব্য বিষয়টি মনঃ প্রেরণের পূর্ব্বেই চিন্তার বিষয় হইয়া স্মৃতই হয়, তাহাতে তখন আর স্মর্ত্তব্যত্ব থাকে না। সুতরাং আত্মাই তাঁহার স্মর্ত্তব্য বিষয়বিশেষের স্মরণের জন্য মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের সংযোগ জন্মে, এই পক্ষ উপপন্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবাদী যদি বলেন যে, আত্মা তাঁহার স্মৃতির জনক সংস্কার ও সেই সংস্কারবিশিষ্ট আত্মপ্রদেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াই সেই প্রদেশে মনকে প্রেরণ করেন, মনঃ প্রেরণের জন্য পূর্ব্বে তাঁহার সেই স্মর্ত্তব্য বিষয়ের স্মরণ অনাবশ্যক, এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—আত্মার সেই প্রদেশ এবং সেই সংস্কার আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, ঐ সংস্কার অতীন্দ্রিয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। মন অকস্মাৎ শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার পূর্ব্বে (২) "ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ" এই কথা বলিয়া, পরে তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্মর্ত্তা স্মরণের ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করেন, অকস্মাৎ স্মরণ করেন না। তাৎপর্য্য এই যে, স্মর্ত্তা যে স্থলে স্মরণের ইচ্ছা করিয়া মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বে কোন পদার্থকে স্মরণ করে, সেই স্থানে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবাদীর মতে শরীরের বাহিরে আত্মার প্রদেশ-বিশেষের সহিত মনের সংযোগ অকস্মাৎ হয় না, স্মরণের ইচ্ছা হইলে তৎপ্রযুক্তই মনের ঐ সংযোগবিশেষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু অকস্মাৎ মনের ঐ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই কথার দ্বারা বিনা কারণেই ঐ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই অর্থও বুঝিতে পারি না। কারণ, বিনা কারণে কোন কার্য্য জন্মিতে পারে না। অকস্মাৎ মনের ঐরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, অর্থাৎ উহার কোন প্রতিবন্ধক নাই, ইহা বলিলে স্মরণের বিষয়-নিয়ম থাকিতে পারে না। ঘটের স্মরণের কারণ উপস্থিত হইলে তখন পটবিষয়ক সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষে অকস্মাৎ মনের সংযোগ-জন্য পটের স্মরণ হইতে পারে। মন নিজের জ্ঞানবত্তা প্রযুক্তই শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার পূর্ব্বে (৩) "জ্ঞানাসম্ভবাচ্চ" এই কথা বলিয়া, পরে উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মনের জ্ঞানবত্তাই নাই, পূর্ব্বেই মনের জ্ঞানবত্তা খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং মন নিজের জ্ঞানবত্তাপ্রযুক্তই শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষও বলা যায় না। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই "স্মর্ত্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণজ্ঞানাসম্ভবাচ্চ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু সূত্রোক্ত দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার "ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ" এইরূপ বাক্য

এবং তৃতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে "জ্ঞানাসম্ভবাচ্চ" এইরূপ বাক্যই বলিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। কোন জ্ঞানই মনের গুণ নহে, মনে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রেরই অসম্ভব, ইহাই "জ্ঞানাসম্ভবাৎ" এই বাক্য দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারের "জ্ঞত্বঞ্চ মনসো নাস্তি" ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা এবং দ্বিতীয় পক্ষে "সুস্মূর্ষয়া চায়ং.........স্মরতি" ইত্যাদি ব্যাখ্যা দ্বারাও "ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং প্রচলিত পাঠ গৃহীত হয় নাই ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য। এতচ্চ

সূত্র। ব্যাসক্তমনসঃ পাদব্যথনেন সংযোগবিশেষেণ সমানং ॥৩২॥৩০৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) ইহা কিন্তু ব্যাসক্তমনাঃ ব্যক্তির চরণ-ব্যথাজনক সংযোগ-বিশেষের সহিত সমান।

ভাষ্য। যদা খল্বয়ং ব্যাসক্তমনাঃ ক্বচিদ্দেশে শর্করয়া[1] কণ্টকেন বা পাদব্যথনমাপ্নোতি, তদাত্মমনঃসংযোগবিশেষ এষিতব্যঃ। দৃষ্টং হি দুঃখং দুঃখসংবেদনঞ্চেতি, তত্রায়ং সমানঃ প্রতিষেধঃ। যদৃচ্ছয়া তু ন বিশেষো নাকস্মিকী ক্রিয়া নাকস্মিকঃ সংযোগ ইতি।

কর্ম্মাদৃষ্টমুপভোগার্থং ক্রিয়াহেতুরিতি চেৎ? সমানং। কর্ম্মাদৃষ্টং পুরুষস্থং পুরুষোপভোগার্থং মনসি ক্রিয়াহেতুরেবং দুঃখং দুঃখ-সংবেদনঞ্চ সিধ্যতীত্যেবঞ্চেন্মন্যসে? সমানং, স্মৃতিহেতাবপি সংযোগ-বিশেষো ভবিতুমর্হতি। তত্র যদুক্তং **"আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ ন সংযোগবিশেষ"** ইত্যয়মপ্রতিষেধ ইতি। **পূর্ব্বস্তু প্রতিষেধো নান্তঃশরীরবৃত্তিত্বান্মনস"** ইতি।

অনুবাদ। যে সময়ে ব্যাসক্তচিত্ত এই আত্মা কোন স্থানে শর্করার দ্বারা অথবা কণ্টকের দ্বারা চরণব্যথা প্রাপ্ত হন, তৎকালে আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ স্বীকার্য্য। যেহেতু (তৎকালে) দুঃখ এবং দুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সেই আত্মমনঃসংযোগে এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ তুল্য।

১। "স্ত্রী শর্করা শর্করিনঃ" ইত্যাদি। অমরকোষ, ভূমিবর্গ।

যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্তু বিশেষ হয় না। (কারণ) ক্রিয়া আকস্মিক হয় না, সংযোগ আকস্মিক হয় না।

(পূর্ব্বপক্ষ) উপভোগার্থ কর্ম্মাদৃষ্ট ক্রিয়ার হেতু, ইহা যদি বল ? (উত্তর) সমান। বিশদার্থ এই যে, পুরুষের (আত্মার) উপভোগার্থ (উপভোগ-সম্পাদক) পুরুষস্থ কর্ম্মাদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অদৃষ্টবিশেষ, মনে ক্রিয়ার কারণ, (অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষই ঐ স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেষ জন্মায়)। এইরূপ হইলে (পূর্ব্বোক্ত) দুঃখ এবং দুঃখের বোধ সিদ্ধ হয়, এইরূপ যদি স্বীকার কর ? (উত্তর) তুল্য। (কারণ) স্মৃতির হেতু (অদৃষ্টবিশেষ) থাকাতেও সংযোগবিশেষ হইতে পারে। তাহা হইলে "আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরণ, অথবা যদৃচ্ছা অথবা জ্ঞানবত্তাপ্রযুক্ত সংযোগ-বিশেষ হয় না" এই যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহা প্রতিষেধ নহে। "মনের অন্তঃশরীর-বৃত্তিত্ববশতঃ (শরীরের বাহিরে সংযোগবিশেষ) হয় না" এই পূর্ব্বই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তরই প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত অপরের প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে সময়ে কোন ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হইয়া কোন দৃশ্য দর্শন অথবা শব্দ শ্রবণাদি করিতেছেন, তৎকালে কোন স্থানে তাঁহার চরণে শর্করা (কঙ্কর) অথবা কণ্টক বিদ্ধ হইলে তখন সেই চরণপ্রদেশে তাহার আত্মাতে তজ্জন্য দুঃখ এবং ঐ দুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার অপলাপ করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির মন অন্য বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণপ্রদেশে উপস্থিত হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তখন সেই চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ না হইলে সেই চরণপ্রদেশে দুঃখ ও দুঃখের বোধ জন্মিতেই পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে তৎক্ষণাৎ চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাতেও পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রকারে তুল্য প্রতিষেধ (খণ্ডন) হয়। অর্থাৎ ঐ আত্মমনঃসংযোগও তখন আত্মা কর্ত্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ হয় না, যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ হয় না, এবং মনের জ্ঞানবত্তাপ্রযুক্ত হয় না, ইহা বলা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ কোনরূপে উপপন্ন হইলে শরীরের বাহিরেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ উপপন্ন হইতে পারে। ঐ উভয় স্থলে বিশেষ কিছুই নাই। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ, উহা উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত, সুতরাং ঐ সংযোগ যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ জন্মে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শরীরের বাহিরে আত্মার সহিত মনঃসংযোগ কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং অকস্মাৎ তাহার উৎপত্তি হয়, এইরূপ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য ভাষ্যকার

শেষে বলিয়াছেন যে, যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত ঐ সংযোগের বিশেষ হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে যদৃচ্ছা-বশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, এই কথা বলিয়া ঐ সংযোগের বিশেষ প্রদর্শন করা যায় না। কারণ, ক্রিয়া ও সংযোগ আকস্মিক হইতে পারে না। অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণেই মনে ক্রিয়া জন্মে, অথবা সংযোগ জন্মে, ইহা বলা যায় না। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে দুরদৃষ্টবিশেষ চরণপ্রদেশে আত্মাতে দুঃখ এবং ঐ দুঃখবোধের জনক, তাহাই ঐ স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ক্রিয়াজন্য চরণপ্রদেশে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, উহা আকস্মিক বা নিষ্কারণ নহে। ভাষ্যকার শেষে এই সমাধানেরও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ইহা সমান। কারণ, স্মৃতির জনক অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তও শরীরের বাহিরে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেষ জন্মিতে পারে। অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষজন্যই পূর্ব্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা বলিলে যিনি স্মৃতির যৌগপদ্য বারণের জন্য শরীরের বাহিরে আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত ক্রমিক মনঃসংযোগ স্বীকার করেন, তিনিও ঐ মনঃসংযোগকে অদৃষ্টবিশেষজন্য বলিতে পারেন। তাঁহার ঐরূপ বলিবার বাধক কিছুই নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "আত্মপ্রেরণ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করা যায় না। ঐ সূত্রোক্ত প্রতিষেধ পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিষেধ হয় না। উহার পূর্ব্বকথিত "নান্তঃশরীরবৃত্তিত্বান্মনসঃ" এই সূত্রোক্ত প্রতিষেধই প্রকৃত প্রতিষেধ। ঐ সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারাই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ প্রতিষিদ্ধ হয়॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। কঃ খল্বিদানীং কারণ-যৌগপদ্যসদ্ভাবে যুগপদস্মরণস্য হেতুরিতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) কারণের যৌগপদ্য থাকিলে এখন যুগপৎ অস্মরণের অর্থাৎ একই সময়ে নানা স্মৃতি না হওয়ার হেতু কি?

সূত্র। প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানামযুগপদ্ভাবাদ-যুগপদস্মরণং ॥৩৩॥৩০৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রণিধান ও লিঙ্গাদি-জ্ঞানের যৌগপদ্য না হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না।

ভাষ্য। যথা খল্বাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষঃ সংস্কারশ্চ স্মৃতিহেতুরেবং প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানি, তানি চ ন যুগপদ্ভবন্তি, তৎকৃতা স্মৃতীনাং যুগপদনুৎপত্তিরিতি।

অনুবাদ। যেমন আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ এবং সংস্কার স্মৃতির কারণ, এইরূপ প্রণিধান এবং লিঙ্গাদিজ্ঞান স্মৃতির কারণ, সেই প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ হয় না, তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই প্রণিধানাদি কারণের অযৌগপদ্যপ্রযুক্ত স্মৃতিসমূহের যুগপৎ অনুৎপত্তি হয়।

টিপ্পনী। নানা স্মৃতির কারণ নানা সংস্কার এবং আত্মমনঃসংযোগ, যুগপৎ আত্মাতে থাকায় যুগপৎ নানা স্মৃতি উৎপন্ন হউক ? স্মৃতির কারণের যৌগপদ্য থাকিলেও স্মৃতির যৌগপদ্য কেন হইবে না ? কারণ সত্ত্বেও যুগপৎ নানা স্মৃতি না হওয়ার হেতু কি ? এই পূর্ব্বপক্ষে মহর্ষি প্রথমে অপরের সমাধানের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত সমাধান বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, স্মৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় স্মৃতির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। কারণ, সংস্কার ও আত্মমনঃসংযোগের ন্যায় প্রণিধান এবং লিঙ্গাদি-জ্ঞান প্রভৃতিও স্মৃতির কারণ। সেই প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে না পারায় স্মৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য হইতেই পারে না, সুতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে না। এই প্রণিধানাদির বিবরণ পরবর্ত্তী ৪১শ সূত্রে পাওয়া যাইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রস্থ "আদি" শব্দের "জ্ঞান" শব্দের পরে যোগ করিয়া "লিঙ্গজ্ঞানাদি" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং লিঙ্গজ্ঞানকে উদ্‌বোধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির পরবর্ত্তী ৪১শ সূত্রে লিঙ্গজ্ঞানের ন্যায় লক্ষণ ও সাদৃশ্যাদির জ্ঞানও স্মৃতির কারণরূপে কথিত হওয়ায় এই সূত্রে "আদি" শব্দের দ্বারা ঐ লক্ষণাদিই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। এবং যে সকল উদ্‌বোধক জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও স্মৃতির হেতু হয়, সেইগুলিই এই সূত্রে বহুবচনের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও শেষে ইহাই বলিয়াছেন।

ভাষ্য। **প্রাতিভবত্তু প্রণিধানাদ্যনপেক্ষে স্মার্ত্তে যৌগপদ্যপ্রসঙ্গঃ।** যৎ খল্বিদং প্রাতিভমিব জ্ঞানং প্রণিধানাদ্যনপেক্ষং স্মার্ত্তমুৎপদ্যতে, কদাচিত্তস্য যুগপদুৎপত্তিপ্রসঙ্গো হেত্বভাবাৎ। **সতঃ স্মৃতিহেতোরসংবেদনাৎ প্রাতিভেন সমানাভিমানঃ।** বহ্বর্থবিষয়ে বৈ চিন্তাপ্রবন্ধে কশ্চিদেবার্থঃ কস্যচিৎ স্মৃতিহেতুঃ, তস্যানুচিন্তনাৎ তস্য স্মৃতির্ভবতি, ন চায়ং স্মর্ত্তা সর্ব্বং স্মৃতিহেতুং সংবেদয়তে এবং মে স্মৃতিরুৎপন্নেতি,—অসংবেদনাৎ প্রাতিভমিব জ্ঞানমিদং স্মার্ত্তমিত্যভিমন্যতে, ন ত্বস্তি প্রণিধানাদ্যনপেক্ষং স্মার্ত্তমিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) কিন্তু প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়[১] প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ স্মৃতিতে যৌগপদ্যের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ এই যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ তাহার যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয়; কারণ, হেতু নাই, অর্থাৎ সেখানে ঐ স্মৃতির বিশেষ কোন কারণ নাই। (উত্তর) বিদ্যমান স্মৃতি-হেতুর জ্ঞান না হওয়ায় প্রাতিভ জ্ঞানের সমান বলিয়া অভিমান (ভ্রম) হয়। বিশদার্থ এই যে, বহু পদার্থবিষয়ক চিন্তার প্রবন্ধ (স্মৃতি-প্রবাহ) হইলে কোন পদার্থই কোন পদার্থের স্মৃতির প্রযোজক হয়, তাহার অর্থাৎ সেই চিহ্নভূত অসাধারণ পদার্থটির অনুচিন্তন (স্মরণ)-জন্য তাহার অর্থাৎ সেই চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের স্মৃতি জন্মে। কিন্তু এই স্মর্ত্তা "এইরূপে অর্থাৎ এই সমস্ত কারণজন্য আমার স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে" এই প্রকারে সমস্ত স্মৃতির কারণ বুঝে না, সংবেদন না হওয়ায় অর্থাৎ ঐ স্মৃতির কারণ থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হওয়ায় "এই স্মৃতি প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়" এইরূপ অভিমান করে। কিন্তু প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ স্মৃতি নাই।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, ঐ সমাধানের সমর্থনের জন্য এখানে নিজে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল স্মৃতি প্রণিধানাদি কারণকে অপেক্ষা করে, তাহাদিগের যৌগপদ্যের আপত্তি মহর্ষি এই সূত্রদ্বারা নিরস্ত করিলেও যে সকল স্মৃতি যোগীদিগের "প্রাতিভ" নামক জ্ঞানের ন্যায় প্রণিধানাদি কারণকে অপেক্ষা না করিয়া সহসা উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্মৃতির কদাচিৎ যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে। কারণ, ঐ স্থলে যুগপৎ বর্ত্তমান নানা সংস্কার ও আত্মমনঃসংযোগাদি ব্যতীত স্মৃতির আর কোন বিশেষ হেতু (প্রণিধানাদি) নাই। সুতরাং ঐরূপ নানা স্মৃতির যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি অনিবার্য্য। ভাষ্যকার "হেত্বভাবাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ

১। যোগীদিগের লৌকিক কোন কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মনের দ্বারা অতি শীঘ্র এক প্রকার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, উহার নাম "প্রাতিভ"। যোগশাস্ত্রে উহা "তারক" নামেও কথিত হইয়াছে। ঐ "প্রাতিভ" জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই যোগী সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। প্রশস্তপাদ "প্রাতিভ" জ্ঞানকে "আর্ষ" জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উহা কদাচিৎ লৌকিক ব্যক্তিদিগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়াছেন। "ন্যায়কন্দলী"তে শ্রীধর ভট্ট প্রশস্তপাদের কথিত "প্রাতিভ" জ্ঞানকে "প্রতিভা" বলিয়া, ঐ "প্রতিভা"রূপ জ্ঞানই "প্রাতিভ" নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। ("ন্যায়কন্দলী," কাশীসংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা, এবং এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যোগভাষ্যের টীকা ও যোগবার্ত্তিকাদি গ্রন্থের দ্বারা যোগীদের "প্রতিভা" অর্থাৎ উহজন্য জ্ঞানবিশেষই "প্রাতিভ" ইহা বুঝা যায়। "প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বং"।—যোগসূত্র। বিভূতিপাদ। ৩৩। "প্রাতিভং নাম তারকং" ইত্যাদি। ব্যাসভাষ্য। "প্রতিভা উহঃ, তদ্ভবং প্রাতিভং"। টীকা। "প্রাতিভং স্বপ্রতিভোত্থং অনৌপদেশিকং জ্ঞানং" ইত্যাদি। যোগবার্ত্তিক। "প্রতিভয়া উহমাত্রেণ জাতং প্রাতিভং জ্ঞানং ভবতি"।—মণিপ্রভা।

স্মৃতির পূর্ব্বোক্ত প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ নাই, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা (স্বপদবর্ণন) করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলেও স্মৃতির হেতু অর্থাৎ প্রণিধানাদি কোন বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু তাহার জ্ঞান না হওয়ায় ঐ স্মৃতিকে "প্রাতিভ" জ্ঞানের তুল্য অর্থাৎ প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। ভাষ্যকার এই উত্তরের ব্যাখ্যা (স্বপদবর্ণন) করিতে বলিয়াছেন যে, বহু পদার্থ বিষয়ে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ ধারাবাহিক নানা স্মৃতি জন্মিলে কোন একটী অসাধারণ পদার্থবিশেষ তদ্‌বিশিষ্ট কোন পদার্থের স্মৃতির প্রযোজক হয়। কারণ, সেই অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে স্মর্ত্তার অভিমত বিষয়ের স্মরণ জন্মায়। সুতরাং যেখানে প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ ব্যতীত সহসা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইতেছে, বস্তুতঃ সেখানেও তাহা হয় না। সেখানেও নানা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে স্মর্ত্তা কোন অসাধারণ পদার্থের স্মরণ করিয়াই তজ্জন্য কোন বিষয়ের স্মরণ করে। (পূর্ব্বোক্ত ৩০শ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সেই অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে ঐরূপ স্মৃতির বিশেষ কারণ। উহার যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় ঐরূপ স্মৃতিরও যৌগপদ্য হইতে পারে না। মহর্ষি "প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানাং" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অসাধারণ পদার্থবিশেষের স্মরণকেও স্মৃতিবিশেষের বিশেষ কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল কথা, প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ-নিরপেক্ষ কোন স্মৃতি নাই। কিন্তু স্মর্ত্তা পূর্ব্বোক্তরূপ স্মৃতি স্থলে ঐ স্মৃতির সমস্ত কারণ লক্ষ্য করিতে পারে না। অর্থাৎ "এই সমস্ত কারণ-জন্য আমার এই স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপে ঐ স্মৃতির সমস্ত কারণ বুঝিতে পারে না, এই জন্যই তাহার ঐ স্মৃতিকে "প্রাতিভ" নামক জ্ঞানের তুল্য বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ তাহার ঐ স্মৃতিও "প্রাতিভ" নামক জ্ঞানের তুল্য নহে। "প্রাতিভ" জ্ঞানের ন্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ কোন স্মৃতি নাই। ভাষ্যে "স্মৃতি" শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন "স্মার্ত্ত" শব্দের দ্বারা স্মৃতিই বুঝা যায়। "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থে "প্রাতিভবত্তু ...... যৌগপদ্যপ্রসঙ্গঃ" এই সন্দর্ভ সূত্ররূপেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু "তাৎপর্য্যটীকা" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" ঐ সন্দর্ভ সূত্ররূপে গৃহীত হয় নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। বার্ত্তিককারও ঐ সন্দর্ভকে সূত্র বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

ভাষ্য। প্রাতিভে কথমিতি চেৎ? পুরুষকর্ম্মবিশেষাদুপভোগবন্নিয়মঃ। প্রাতিভমিদানীং জ্ঞানং যুগপৎ কস্মান্নোৎপদ্যতে? যথোপভোগার্থং কর্ম্ম যুগপদুপভোগং ন করোতি, এবং পুরুষকর্ম্মবিশেষঃ প্রাতিভহেতুর্ন যুগপদনেকং প্রাতিভং জ্ঞানমুৎপাদয়তি।

হেত্বভাবাদযুক্তমিতি চেৎ? ন, করণস্য প্রত্যয়পর্য্যায়ে সামর্থ্যাৎ। উপভোগবন্নিয়ম ইত্যস্তি দৃষ্টান্তো হেতুর্নাস্তীতি

চেম্মন্যসে ? ন, করণস্য প্রত্যয়পর্য্যায়ে সামর্থ্যাৎ। নৈকস্মিন্ জ্ঞেয়ে যুগপদনেকং জ্ঞানমুৎপদ্যতে ন চানেকস্মিন্। তদিদং দৃষ্টেন প্রত্যয়-পর্য্যায়েণানুমেয়ং করণস্য[1] সামর্থ্যমিত্থম্ভূতমিতি ন জ্ঞাতুর্ব্বিকরণধর্ম্মণো দেহনানাত্বে প্রত্যয়যৌগপদ্যাদিতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) "প্রাতিভ" জ্ঞানে (অযৌগপদ্য) কেন, ইহা যদি বল ? (উত্তর) পুরুষের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। বিশদার্থ এই যে, (প্রশ্ন) ইদানীং অর্থাৎ "প্রাতিভ" জ্ঞান প্রণিধানাদি কারণ অপেক্ষা করে না, ইহা স্বীকৃত হইলে প্রাতিভ জ্ঞান যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না ? (উত্তর) যেমন উপভোগের জনক অদৃষ্ট, যুগপৎ (অনেক) উপভোগ জন্মায় না, এইরূপ "প্রাতিভ" জ্ঞানের কারণ পুরুষের অদৃষ্টবিশেষ, যুগপৎ অনেক "প্রাতিভ" জ্ঞান জন্মায় না।

(পূর্ব্বপক্ষ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, যেহেতু করণের (জ্ঞানের সাধনের) প্রত্যয়ের পর্য্যায়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রমে সামর্থ্য আছে, [অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ক্রমিক জ্ঞান জন্মাইতেই সমর্থ, যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ নহে।] বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) উপভোগের ন্যায় নিয়ম, ইহা দৃষ্টান্ত আছে, হেতু নাই, ইহা যদি মনে কর ? (উত্তর) না, যেহেতু করণের জ্ঞানের ক্রমে অর্থাৎ ক্রমিক জ্ঞান জননেই সামর্থ্য আছে। একটি জ্ঞেয় বিষয়ে যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অনেক জ্ঞেয় বিষয়েও যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ইন্দ্রিয়াদির সেই এই ইত্থম্ভূত (পূর্ব্বোক্ত প্রকার) সামর্থ্য দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রমের দ্বারা অনুমেয়,—জ্ঞাতার অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মার (পূর্ব্বোক্ত প্রকার সামর্থ্য) নহে, যেহেতু "বিকরণধর্ম্মার" অর্থাৎ বিবিধ করণবিশিষ্ট (কায়ব্যূহকারী) যোগীর দেহের নানাত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানের যৌগপদ্য হয়।

টিপ্পনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্মৃতিমাত্রই প্রণিধানাদি কারণবিশেষকে অপেক্ষা করায় কোন স্মৃতিরই যৌগপদ্য সম্ভব না হইলেও পূর্ব্বোক্ত "প্রাতিভ" জ্ঞানের যৌগপদ্য কেন হয় না ?

১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকে "করণসামর্থ্যং" এইরূপ পাঠ থাকিলেও এখানে 'করণস্য সামর্থ্যং' এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝিয়াছি। তাহা হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত 'ন জ্ঞাতুঃ' এই বাক্যের পরে পূর্ব্বোক্ত 'সামর্থ্যং' এই বাক্যের অনুষঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অধ্যাহারের অপেক্ষায় অনুষঙ্গই শ্রেষ্ঠ।

"প্রাতিভ" জ্ঞানে প্রণিধানাদি কারণবিশেষের অপেক্ষা না থাকায় যুগপৎ অনেক "প্রাতিভ" জ্ঞান কেন জন্মে না ? ভাষ্যকার নিজেই এই প্রশ্নের উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। ভাষ্যকার এই উত্তরের ব্যাখ্যা (স্বপদ-বর্ণন) করিয়াছেন যে, যেমন জীবের নানা সুখ দুঃখ ভোগের জনক অদৃষ্ট যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিলেও উহা যুগপৎ নানা সুখ দুঃখের উপভোগ জন্মায় না, তদ্রূপ "প্রাতিভ" জ্ঞানের কারণ যে অদৃষ্টবিশেষ, তাহাও যুগপৎ নানা "প্রাতিভ" জ্ঞান জন্মায় না। অর্থাৎ সুখ দুঃখের উপভোগের ন্যায় "প্রাতিভ" জ্ঞান প্রভৃতিও ক্রমশঃ জন্মে, যুগপৎ জন্মে না, এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম সমর্থনের জন্য পরে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সাধক হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতু ব্যতীত কোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় না। "উপভোগের ন্যায় নিয়ম" এইরূপে দৃষ্টান্তমাত্রই বলা হইয়াছে, হেতু বলা হয় নাই। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা ক্রমশঃই জ্ঞানরূপ কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ হয়, যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয় না। একটি জ্ঞেয় বিষয়ে যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপাদন ব্যর্থ। অনেকজ্ঞেয়-বিষয়ক নানা জ্ঞান জন্মাইতে জ্ঞানের করণের সামর্থ্যই নাই। জ্ঞানের করণের ক্রমিক জ্ঞান জননেই যে সামর্থ্য আছে, ইহার প্রমাণ কি ? এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রম দৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞান যে যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমশঃই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঐ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের ক্রমের দ্বারাই জ্ঞানের করণের পূর্ব্বোক্তরূপ সামর্থ্য অনুমানসিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতারই পূর্ব্বোক্তরূপ সামর্থ্য বলা যায় না। কারণ, যোগী কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীরের সাহায্যে যুগপৎ নানা সুখ দুঃখ ভোগ করেন, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ আছে। (পূর্ব্বোক্ত ১৯শ সূত্রভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য)। সেই স্থলে জ্ঞাতা এক হইলেও জ্ঞানের করণের (দেহাদির) ভেদ প্রযুক্ত তাহার যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সামান্যতঃ জ্ঞানের যৌগপদ্যই নাই, কোন স্থলেই কাহারই যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। সুতরাং জ্ঞাতারই ক্রমিক জ্ঞান জননে সামর্থ্য কল্পনা করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানের কোন একটি করণের দ্বারা যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, ক্রমশঃই নানা জ্ঞান জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় ঐ করণেরই পূর্ব্বোক্তরূপ সামর্থ্য সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে সুখ দুঃখের উপভোগের ন্যায় যে নিয়ম অর্থাৎ "প্রাতিভ" জ্ঞানেরও অযৌগপদ্য নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহাতে হেতুর অভাব নাই। যোগীর একটি মনের দ্বারা যে "প্রাতিভ" জ্ঞান জন্মে, তাহারও অযৌগপদ্য ঐ করণজন্যত্ব হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হয়। কায়ব্যূহ স্থলে করণের ভেদ প্রযুক্ত যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্য সময়ে তাঁহারও নানা "প্রাতিভ" জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ক একটি সমূহালম্বন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্ববিষয়ক একটি সমূহালম্বন জ্ঞানই যোগীর সর্ব্বজ্ঞতা। এইরূপ কোন স্থলে নানা পদার্থবিষয়ক স্মৃতির কারণসমূহ উপস্থিত হইলে সেখানে সেই সমস্ত পদার্থবিষয়ক "সমূহালম্বন" একটি স্মৃতিই জন্মে।

স্মৃতির করণ মনের ক্রমিক স্মৃতি জননেই সামর্থ্য থাকায় যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার এখানে "প্রাতিভ" জ্ঞানের অযৌগপদ্য সমর্থন করিয়া স্মৃতির অযৌগপদ্য সমর্থনে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ঐ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই "প্রাতিভ" জ্ঞানের অযৌগপদ্য কেন ? এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ প্রভৃতি কেহ কেহ "প্রাতিভ" জ্ঞানকে "আর্ষ" বলিয়া একটি পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট ঐ মত খণ্ডনপূর্ব্বক উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারাই ঐ জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষই হইবে, উহা প্রমাণান্তর নহে। ন্যায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতিরও ইহাই সিদ্ধান্ত। "শ্লোকবার্ত্তিকে" ভট্ট কুমারিল "প্রাতিভ" জ্ঞানের অস্তিত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব্বজ্ঞতা কাহারই হইতে পারে না, সর্ব্বজ্ঞ কেহই নাই। জয়ন্ত ভট্ট এই মতেরও খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতের সমর্থন করিয়াছেন। (ন্যায়মঞ্জরী, কাশী সংস্করণ, ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রতিষেধঃ[1] **অবস্থিতশরীরস্য চানেকজ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপদনেকার্থস্মরণং স্যাৎ।** ক্বচিদ্দেশেঽবস্থিতশরীরস্য জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়ার্থপ্রবন্ধেন জ্ঞানমনেকমেকস্মিন্নাত্মপ্রদেশে সমবৈতি। তেন যদা মনঃ সংযুজ্যতে তদা জ্ঞাতপূর্ব্বস্যানেকস্য যুগপৎ স্মরণং প্রসজ্যেত ? প্রদেশসংযোগপর্য্যায়াভাবাদিতি। আত্মপ্রদেশানামদ্রব্যান্তরত্বাদেকার্থসমবায়স্যাবিশেষে সতি স্মৃতিযৌগপদ্যস্য প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। শব্দসন্তানে তু[2] শ্রোত্রাধিষ্ঠানপ্রত্যাসত্ত্যা শব্দশ্রবণবৎ সংস্কারপ্রত্যাসত্ত্যা মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তের্ন যুগপদুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ব এব তু প্রতিষেধো নানেকজ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপৎস্মৃতিপ্রসঙ্গ ইতি।

অনুবাদ। পরন্তু ইহা দ্বিতীয় প্রতিষেধ [অর্থাৎ স্মৃতির যৌগপদ্য নিরাসের জন্য কেহ যে, আত্মার সংস্কারবিশিষ্ট প্রদেশভেদ বলিয়াছেন, উহার দ্বিতীয় প্রতিষেধও বলিতেছি] "অবস্থিতশরীর" অর্থাৎ যে আত্মার কোন প্রদেশবিশেষে তাহার শরীর অবস্থিত আছে, সেই আত্মারই একই প্রদেশে অনেক জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধপ্রযুক্ত যুগপৎ অনেক পদার্থের স্মরণ হউক ? বিশদার্থ এই যে, (আত্মার) কোন প্রদেশবিশেষে "অবস্থিতশরীর" আত্মার, ইন্দ্রিয় ও অর্থের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধাদি বিষয়ের) প্রবন্ধ (পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধ) বশতঃ এক আত্মপ্রদেশেই অনেক

১। "অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রতিষেধঃ" জ্ঞানসংস্কৃতাত্মপ্রদেশভেদস্যাযুগপজ্জ্ঞানোপপাদকস্য।—তাৎপর্য্যটীকা।

২। "শব্দসন্তানে ত্বি"তি শঙ্কানিরাকরণভাষ্যং। "তু" শব্দঃ শঙ্কাং নিরাকরোতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

জ্ঞান সমবেত হয়। যে সময়ে সেই আত্মপ্রদেশের সহিত মন সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে পূর্ব্বানুভূত অনেক পদার্থের যুগপৎ স্মরণ প্রসক্ত হউক ? কারণ, প্রদেশ-সংযোগের অর্থাৎ তখন আত্মার সেই এক প্রদেশের সহিত মনঃসংযোগের পর্য্যায় (ক্রম) নাই। [অর্থাৎ আত্মার যে প্রদেশে নানা ইন্দ্রিয়জন্য নানা জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই ঐ সমস্ত জ্ঞানজন্য নানা সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই প্রদেশে শরীরও অবস্থিত থাকায় শরীরস্থ মনঃসংযোগও আছে ; সুতরাং তখন আত্মার ঐ প্রদেশে পূর্ব্বানুভূত সেই সমস্ত বিষয়েরই যুগপৎ স্মরণের সমস্ত কারণ থাকায় উহার আপত্তি হয়।]

(পূর্ব্বপক্ষ) আত্মার প্রদেশসমূহের দ্রব্যান্তরত্ব না থাকায় অর্থাৎ আত্মার কোন প্রদেশই আত্মা হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে, এ জন্য একই অর্থে (আত্মাতে) সমবায় সম্বন্ধের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নানা জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধের বিশেষ না থাকায় স্মৃতির যৌগপদ্যের প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। (উত্তর) কিন্তু শব্দসন্তান-স্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানে (কর্ণবিবরে) প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ শ্রাব্য শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যেমন শব্দ শ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনের "সংস্কার-প্রত্যাসত্তি"প্রযুক্ত অর্থাৎ মনে সংস্কারের সহকারী কারণের সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্ত স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয় না। এক প্রদেশে অনেক জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যুগপৎ স্মৃতির আপত্তি হয় না, এই প্রতিষেধ কিন্তু পূর্ব্বই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তই জানিবে।

টিপ্পনী ;—যুগপৎ নানা স্মৃতির কারণ থাকিলেও যুগপৎ নানা স্মৃতি কেন জন্মে না ? এতদুত্তরে কেহ বলিয়াছিলেন যে, আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার জন্মে, সুতরাং সেই ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রদেশে যুগপৎ মনঃসংযোগ সম্ভব না হওয়ায় ঐ কারণের অভাবে যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মে না। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ২৫শ সূত্রের দ্বারা এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, ২৬শ সূত্রের দ্বারা উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে মন শরীরের বাহিরে যায় না। অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিলে শরীরের বাহিরেও আত্মার নানা প্রদেশে নানা সংস্কার জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে শরীরের বাহিরে আত্মার ঐ সমস্ত প্রদেশের সহিত মনঃসংযোগ সম্ভব না হওয়ায় ঐ সমস্ত প্রদেশস্থ সংস্কারজন্য স্মৃতির উৎপত্তি সম্ভবই হয় না। সুতরাং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার জন্মে, এইরূপ কল্পনা করা যায় না। মহর্ষি ইহা সমর্থন করিতে পরে কতিপয় সূত্রের দ্বারা মন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীরের বাহিরে যায় না, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমাধানবাদী বলিতে পারেন যে, আমি শরীরের মধ্যেই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার

করি। আমার মতেও শরীরের বাহিরে আত্মার কোন প্রদেশে সংস্কার জন্মে না। এই জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বে মহর্ষির সূত্রোক্ত প্রতিষেধের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া, এখানে স্বতন্ত্রভাবে নিজে ঐ মতান্তরের দ্বিতীয় প্রতিষেধ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য মনে হয় যে, যদি শরীরের মধ্যেই আত্মার নানা প্রদেশে নানা সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও নানা সংস্কার স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার অসংখ্য সংস্কারের স্থান হইবে না। সুতরাং শরীরের মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও বহু সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার যে কোন এক প্রদেশে নানা জ্ঞানজন্য যে, নানা সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেও আত্মার শরীর অবস্থিত থাকায় সেই প্রদেশে শরীরস্থ মনের সংযোগ জন্মিলে তখন সেখানে ঐ সমস্ত সংস্কারজন্য যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তি হয়। অর্থাৎ যিনি আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ কল্পনা করিয়া, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিযৌগপদ্যের আপত্তি নিরাস করিতে জীবনকালে মনের শরীরমধ্যবর্ত্তিত্বই স্বীকার করিবেন, তাঁহার মতেও শরীরের মধ্যেই আত্মার যে কোন প্রদেশে যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তির নিরাস হইবে না। কারণ, আত্মার ঐ প্রদেশে একই সময়ে মনের যে সংযোগ জন্মিবে, ঐ মনঃসংযোগের ক্রম নাই। অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অণু মনের সংযোগ হইলে সেই সমস্ত সংযোগই ক্রমশঃ কালবিলম্বে জন্মে, একই প্রদেশে যে মনঃসংযোগ, তাহার কালবিলম্ব না থাকায় সেখানে ঐ সময়ে যুগপৎ নানা স্মৃতির অন্যতম কারণ আত্মমনঃসংযোগের অভাব নাই। সুতরাং সেখানে যুগপৎ নানা স্মৃতির সমস্ত কারণ সম্ভব হওয়ায় উহার আপত্তি অনিবার্য্য হয়। ভাষ্যকার "অবস্থিতশরীরস্য" এই বিশেষণবোধক বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আত্মার সেই প্রদেশবিশেষে যে শরীরস্থ মনের সংযোগই আছে, ইহা উপপাদন করিয়াছেন। এবং "অনেকজ্ঞানসমবায়াৎ" এই বাক্যের দ্বারা আত্মার সেই প্রদেশে যে অনেকজ্ঞানজন্য অনেক সংস্কার বর্ত্তমান আছে, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবাদে তৃতীয় ব্যক্তির আশঙ্কা হইতে পারে যে, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব গ্রহণ করিয়া, তাহাতে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বলা হইতেছে, ঐ সমস্ত প্রদেশ ত আত্মা হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে। সুতরাং আত্মার যে প্রদেশেই জ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হউক, উহা সেই এক আত্মাতেই সমবায় সম্বন্ধে জন্মে। সেই একই আত্মাতে নানা জ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কারের সমবায়সম্বন্ধের কোন বিশেষ নাই। আত্মার প্রদেশভেদ কল্পনা করিলেও তাহাতে সেই নানা জ্ঞান ও তজ্জন্য নানা সংস্কারের সমবায়সম্বন্ধের কোন বিশেষ বা ভেদ হয় না। সুতরাং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার থাকিলেও তজ্জন্য ঐ আত্মাতে যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তি অনিবার্য্য। আত্মার যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্মিলেই উহাকে আত্মমনঃসংযোগ বলা যায়। কারণ, আত্মার প্রদেশ আত্মা হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে। সুতরাং ঐরূপ স্থলে আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণেরও অভাব না থাকায় মহর্ষির নিজের মতেও স্মৃতির যৌগপদ্যের আপত্তি হয়, স্মৃতির যৌগপদ্যের

প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার এখানে শেষে এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া, উক্ত বিষয়ে মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সমাধান দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রথম শব্দ হইতে পরক্ষণেই দ্বিতীয় শব্দ জন্মে, এবং ঐ দ্বিতীয় শব্দ হইতে পরক্ষণেই তৃতীয় শব্দ জন্মে, এইরূপে ক্রমশঃ যে শব্দসন্তানের (ধারাবাহিক শব্দ-পরম্পরার) উৎপত্তি হয়, ঐ সমস্ত শব্দ একই আকাশে উৎপন্ন হইলেও যেমন ঐ সমস্ত শব্দেরই শ্রবণ হয় না, কিন্তু উহার মধ্যে যে শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ হয়, তাহারই শ্রবণ হয়—কারণ, শব্দ-শ্রবণে ঐ শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্যক, তদ্রূপ একই আত্মাতে নানা জ্ঞানজন্য নানা সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও একই সময়ে ঐ সমস্ত সংস্কারজন্য অথবা বহু সংস্কারজন্য বহু স্মৃতি জন্মে না। কারণ, একই আত্মাতে নানা সংস্কার থাকিলেও একই সময়ে নানা সংস্কার স্মৃতির কারণ হয় না। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে,—সংস্কারমাত্রই স্মৃতির কারণ নহে। উদ্বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। "প্রণিধান" প্রভৃতি সংস্কারের উদ্বোধক। সুতরাং স্মৃতি কার্য্যে ঐ "প্রণিধান" প্রভৃতিকে সংস্কারের সহকারী কারণ বলা যায়। (পরবর্ত্তী ৪১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ "প্রণিধান" প্রভৃতি যে কোন কারণজন্য যখন যে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তখন সেই সংস্কারজন্যই তাহার ফল স্মৃতি জন্মে। ভাষ্যকার "সংস্কারপ্রত্যাসত্ত্যা মনসঃ" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত স্থলে মনের যে "সংস্কারপ্রত্যাসত্তি" বলিয়াছেন, উহার অর্থ সংস্কারের সহকারী কারণের সমবধান। উদ্দ্যোতকর ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। অর্থাৎ ভাষ্যকারের কথা এই যে, সংস্কারের সহকারী কারণ যে প্রণিধানাদি, উহা উপস্থিত হইলে তৎপ্রযুক্ত স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। কারণ, ঐ প্রণিধানাদির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। যুগপৎ নানা সংস্কারের নানাবিধ উদ্বোধক উপস্থিত হইতে না পারিলে যুগপৎ নানা স্মৃতি কিরূপে জন্মিবে? যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মে না, কিন্তু সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে সেখানে একই সময়ে বহু পদার্থবিষয়ক একটি সমূহালম্বন স্মৃতিই জন্মে, ইহাই যখন অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, তখন নানা সংস্কারের উদ্বোধক "প্রণিধান" প্রভৃতির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না, ইহাই অনুমানসিদ্ধ। মহর্ষি নিজেই পূর্ব্বোক্ত ৩৩শ সূত্রে উক্তরূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া স্মৃতির যৌগপদ্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে "পূর্ব্ব এব তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা এই কথাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। পরন্তু ঐ সন্দর্ভের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, আত্মার একই প্রদেশে অনেক জ্ঞানজন্য অনেক সংস্কার বিদ্যমান থাকায় এবং একই সময়ে সেই প্রদেশে মনঃসংযোগ সম্ভব হওয়ায় একই সময়ে যে, নানা স্মৃতির আপত্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐ আপত্তি হয় না, এই প্রতিষেধ কিন্তু পূর্ব্বোক্তই জানিবে। অর্থাৎ মহর্ষি (৩৩শ সূত্রের দ্বারা) ইহা পূর্ব্বেই

১। সংস্কারস্য সহকারিকারণসমবধানং প্রত্যাসত্তিঃ, শব্দবৎ। যথা শব্দাঃ সন্তানবর্ত্তিনঃ সর্ব্ব এবাকাশে সমবয়ন্তি, সমানদেশত্বেঽপি যস্যোপলব্ধেঃ কারণানি সন্তি, স উপলভ্যতে, নেতরে, তথা সংস্কারেষ্বপীতি।—ন্যায়বার্ত্তিক। নিষ্প্রদেশত্বেঽপি আত্মনঃ সংস্কারস্য অব্যাপ্যবৃত্তিত্বমুপপাদিতং, তেন শব্দবৎ সহকারিকারণস্য সন্নিধানাসন্নিধানে জ্ঞানোৎপত্তে এবেত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যটীকা।

বলিয়াছেন। পরন্তু মহর্ষি যে প্রতিষেধ বলিয়াছেন, উহাই প্রকৃত প্রতিষেধ। উহা ভিন্ন অন্য কোনরূপে ঐ আপত্তির প্রতিষেধ হইতে পারে না। মহর্ষির ঐ সমাধান বুঝিলে আর ঐরূপ আপত্তি হইতেও পারে না, ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পরন্তু ভাষ্যকার "অবস্থিত-শরীরস্য" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে "দ্বিতীয় প্রতিষেধ" বলিয়াছেন, উহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত কথার দ্বারা উহারও নিরাস বুঝা যায়। কিন্তু নানা কারণে ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের অন্যরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছি। সুধীগণ এখানে বিশেষ চিন্তা করিয়া ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য বিচার করিবেন ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য। পুরুষধর্ম্মো জ্ঞানং, অন্তঃকরণস্যেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখানি ধর্ম্মা ইতি কস্যচিদ্দর্শনং, তৎ প্রতিষিধ্যতে—

অনুবাদ। জ্ঞান পুরুষের (আত্মার) ধর্ম্ম ; ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ ও দুঃখ, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ইহা কাহারও দর্শন, অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত,[১] তাহা প্রতিষেধ (খণ্ডন) করিতেছেন।

সূত্র। জ্ঞস্যেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তত্বাদারম্ভনিবৃত্ত্যোঃ ॥ ॥৩৪॥৩০৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু আরম্ভ ও নিবৃত্তি জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক (অতএব ইচ্ছা ও দ্বেষাদি জ্ঞাতার ধর্ম্ম)।

ভাষ্য। অয়ং খলু জানীতে তাবদিদং মে সুখসাধনমিদং মে দুঃখ-সাধনমিতি, জ্ঞাত্বা স্বস্য সুখসাধনমাপ্তুমিচ্ছতি, দুঃখসাধনং হাতুমিচ্ছতি।

১। তাৎপর্য্যটীকাকার এই মতকে সাংখ্যমত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানকে পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়াছেন। সাংখ্যমতে পুরুষ নিগুর্ণ নির্দ্ধর্ম্মক। সাংখ্যমতে যে পৌরুষেয় বোধকে প্রমাণের ফল বলা হইয়াছে, উহাও বস্তুতঃ পুরুষস্বরূপ হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম নহে। পরন্তু এখানে যে জ্ঞান পদার্থ-বিষয়ে বিচার হইয়াছে, ঐ জ্ঞান সাংখ্যমতে অন্তঃকরণের বৃত্তি, উহা অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। ভাষ্যকার এই আহ্নিকের প্রথম সূত্রভাষ্যে "সাংখ্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই সাংখ্যমতের প্রকাশপূর্ব্বক তৃতীয় সূত্রভাষ্যে ঐ সাংখ্যমতের খণ্ডন করিতে জ্ঞান পুরুষেরই ধর্ম্ম, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে, চেতনের ধর্ম্ম অচেতন অন্তঃকরণে থাকিতেই পারে না, ইত্যাদি কথার দ্বারা সাংখ্যমতে যে জ্ঞান পুরুষের ধর্ম্ম নহে, ন্যায়মতেই জ্ঞান পুরুষের ধর্ম্ম, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ভাষ্যকার সাংখ্যমতে জ্ঞান পুরুষের ধর্ম্ম, এই কথা কিরূপে বলিবেন, এবং সাংখ্যমত প্রকাশ করিতে পূর্ব্বের ন্যায় "সাংখ্য"শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "কস্যচিদ্দর্শনং" এইরূপ কথাই বা কেন বলিবেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এবং অনুসন্ধান করিয়াও এখানে ভাষ্যকারোক্ত মতের অন্য কোন মূলও পাই নাই। ভাষ্যকার অতি প্রাচীন কোন মতেরই এখানে উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রভাষ্য দেখিয়া এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার বিচার করিবেন।

প্রাপ্তীচ্ছাপ্রযুক্তস্যাস্য সুখসাধনাবাপ্তয়ে সমীহাবিশেষ আরম্ভঃ, জিহাসা-প্রযুক্তস্য দুঃখসাধনপরিবর্জ্জনং নিবৃত্তিঃ। এবং জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্ন-দ্বেষ-সুখ-দুঃখানামেকেনাভিসম্বন্ধ এককর্ত্তৃকত্বং জ্ঞানেচ্ছাপ্রবৃত্তীনাং সমানা-শ্রয়ত্বঞ্চ, তস্মাজ্‌জ্ঞস্যেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখানি ধর্ম্মা নাচেতনস্যেতি। আরম্ভনিবৃত্ত্যোশ্চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টত্বাৎ পরত্রানুমানং বেদিতব্যমিতি।

অনুবাদ। এই আত্মাই "ইহা আমার সুখসাধন, ইহা আমার দুঃখসাধন" এইরূপ জানে, জানিয়া নিজের সুখসাধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, দুঃখসাধন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ "প্রযুক্ত"[১] অর্থাৎ কৃতযত্ন এই আত্মার সুখসাধন লাভের নিমিত্ত সমীহাবিশেষ অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টাবিশেষ "আরম্ভ"। ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ "প্রযুক্ত" অর্থাৎ কৃতযত্ন এই আত্মার দুঃখসাধনের পরিবর্জ্জন "নিবৃত্তি"। এইরূপ হইলে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখের একের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির (প্রযত্নের) এককর্ত্তৃকত্ব এবং একাশ্রয়ত্ব (সিদ্ধ হয়)। অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ জ্ঞাতার (আত্মার) ধর্ম্ম, অচেতনের (অন্তঃকরণের) ধর্ম্ম নহে। পরন্তু আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্মাতে দৃষ্টত্ববশতঃ অর্থাৎ নিজ আত্মাতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির কর্ত্তৃত্বের মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় অন্যত্র (অন্যান্য সমস্ত আত্মাতে) অনুমান জানিবে। অর্থাৎ স্বকীয় আত্মাকে দৃষ্টান্ত করিয়া অন্যান্য সমস্ত আত্মাতেও কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও নিবৃত্তির অনুমান হওয়ায় তাহার কারণরূপে সেই সমস্ত আত্মাতেও ইচ্ছা ও দ্বেষ সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই গুণ, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে মহর্ষি অনেক কথা বলিয়া, ঐ সিদ্ধান্তে স্মৃতির যৌগপদ্যের আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক এখন নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এই সূত্রের দ্বারা ঐ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিয়াছেন। কোন দর্শনকারের মতে জ্ঞান আত্মারই ধর্ম্ম, কিন্তু ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে, ঐ ইচ্ছাদি অচেতন অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। মহর্ষি এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা ঐ ইচ্ছাদিও যে জ্ঞাতা আত্মারই ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, আত্মাই "ইহা আমার সুখের সাধন" এইরূপ বুঝিয়া, তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ তদ্বিষয়ে প্রযত্নবান্ হইয়া, তাহার প্রাপ্তির জন্য আরম্ভ (চেষ্টা) করে এবং আত্মাই "ইহা আমার দুঃখের সাধন" এইরূপ বুঝিয়া, তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ তদ্বিষয়ে প্রযত্নবান্ হইয়া দ্বেষবশতঃ তাহার পরিবর্জ্জন করে।

১। ইচ্ছার পরে ঐ ইচ্ছাজন্য আত্মাতে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জন্য শরীরে চেষ্টারূপ প্রবৃত্তি জন্মে। ১ম অঃ, ১ম আঃ, ৭ম সূত্রভাষ্যে "চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্তঃ" এই স্থানে তাৎপর্য্যটীকাকার "প্রযুক্ত" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "প্রযুক্ত" উৎপাদিতপ্রযত্নঃ।

পূর্ব্বোক্তরূপ "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ হইলেও উহা আত্মারই ইচ্ছা ও দ্বেষজন্য। কারণ, উহার মূল সুখসাধনত্ব-জ্ঞান ও দুঃখসাধনত্ব-জ্ঞান আত্মারই ধর্ম্ম। ঐরূপ জ্ঞান না হইলে তাহার ঐরূপ ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না। একের ঐরূপ জ্ঞান হইলেও তজ্জন্য অপরের ঐরূপ ইচ্ছাদি জন্মে না। সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, দ্বেষ ও সুখ দুঃখের এক আত্মার সহিতই সম্বন্ধ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নের এককর্তৃকত্ব ও একাশ্রয়ত্বই সিদ্ধ হয়। আত্মাই ঐ ইচ্ছাদির আশ্রয় হইলে ঐ ইচ্ছাদি যে, আত্মারই ধর্ম্ম, ইহা স্বীকার্য্য। অচেতন অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না পারায় তাহাতে জ্ঞানজন্য ইচ্ছাদি গুণ জন্মিতেই পারে না। সুতরাং ইচ্ছাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইতেই পারে না। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ইচ্ছাদি মনের গুণ হইলে আত্মা তাহার প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কারণ, অন্যের ইচ্ছাদি অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। পরন্তু ইচ্ছাদি মনের গুণ হইলে উহার প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কারণ, মনের সমস্ত গুণই অতীন্দ্রিয়। ইচ্ছাদি মনের গুণ হইলে মনের অণুত্ববশতঃ তদ্গত ইচ্ছাদি গুণও অতীন্দ্রিয় হইবে। জ্ঞানের ন্যায় ইচ্ছাদি গুণও যে, সমস্ত আত্মারই ধর্ম্ম, উহা কোন আত্মারই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্মাতে দৃষ্টত্ব-বশতঃ অন্যান্য সমস্ত আত্মাতে ঐ উভয়ের অনুমান বুঝিবে। অর্থাৎ অন্য সমস্ত আত্মাই যে নিজের ইচ্ছাবশতঃ আরম্ভ করে এবং দ্বেষবশতঃ নিবৃত্তি করে, ইহা নিজের আত্মাকে দৃষ্টান্ত করিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং অন্যান্য সমস্ত আত্মাও পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাদি গুণবিশিষ্ট, ইহাও অনুমান-সিদ্ধ। এখানে কঠিন প্রশ্ন এই যে, সূত্রোক্ত "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" প্রযত্নবিশেষই হইলে উহা নিজের আত্মাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা বলা যাইতে পারে। উদয়নাচার্য্যের "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির" টীকা "ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে" বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকেই এখানে সূত্রোক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে প্রযত্নবিশেষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রোক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারার্থ ক্রিয়াবিশেষই বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৩৭শ সূত্রভাষ্যে ইহা সুব্যক্ত আছে। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে এখানে ক্রিয়াবিশেষরূপ "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" নিষ্ক্রিয় আত্মাতে না থাকায় উহা স্বকীয় আত্মাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এই কথা কিরূপে সংগত হইবে? বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের একটি সূত্র আছে—"প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গং"।৩।১।১৯। শঙ্কর মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "প্রত্যগাত্মা" অর্থাৎ স্বকীয় আত্মাতে যে "প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি" নামক প্রযত্নবিশেষ অনুভূত হয়, উহা অপর আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, পরশরীরে ক্রিয়াবিশেষরূপ চেষ্টা দর্শন করিয়া, ঐ চেষ্টা প্রযত্নজন্য, এইরূপ অনুমান হওয়ায় ঐ প্রযত্নের কারণ বা আশ্রয়রূপে পরশরীরেও যে আত্মা আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। এখানে ভাষ্যকারের "আরম্ভনিবৃত্ত্যোশ্চ" ইত্যাদি পাঠের দ্বারা মহর্ষি কণাদের ঐ সূত্রটি স্মরণ হইলেও ভাষ্য-

কারের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। ভাষ্যকার এখানে পরশরীরে আত্মার অনুমান বলেন নাই, তাহা বলাও এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের মনে হয় যে, "আমি ভোজন করিতেছি" এইরূপে স্বকীয় আত্মাতে ভোজনকর্তৃত্বের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে যেমন ঐ ভোজনও ঐ মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ "আমি আরম্ভ করিতেছি", "আমি নিবৃত্তি করিতেছি" এই-রূপে স্বকীয় আত্মাতে ক্রিয়াবিশেষরূপ আরম্ভ ও নিবৃত্তির কর্তৃত্বের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে ঐ আরম্ভ ও নিবৃত্তিও ঐ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় ভাষ্যকার ঐরূপ তাৎপর্য্যে এখানে তাঁহার ব্যাখ্যাত ক্রিয়াবিশেষরূপ আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে স্বকীয় আত্মাতে "দৃষ্ট" অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াছেন। স্বকীয় আত্মাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ঐ আরম্ভ ও নিবৃত্তি মানস প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলে তদ্দৃষ্টান্তে অন্য আত্মাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধেই ঐ আরম্ভ ও নিবৃত্তির অনুমান হয়। অর্থাৎ আমি যেমন কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও নিবৃত্তিবিশিষ্ট, তদ্রূপ অপর সমস্ত আত্মাও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও নিবৃত্তিবিশিষ্ট, এইরূপ অনুমান হইলে অপর সমস্ত আত্মাও আমার ন্যায় ইচ্ছাদি গুণ-বিশিষ্ট, ইহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য। সুধীগণ পরবর্ত্তী ৩৭শ সূত্রের ভাষ্য দেখিয়া এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন ॥৩৪॥

ভাষ্য। অত্র ভূতচৈতনিক আহ—

অনুবাদ। এই স্থলে ভূতচৈতন্যবাদী (দেহাত্মবাদী নাস্তিক) বলিতেছেন।

সূত্র। তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেষ্ব-প্রতিষেধঃ ॥৩৫॥৩০৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ইচ্ছা ও দ্বেষের "তল্লিঙ্গত্ব"বশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তি ইচ্ছা ও দ্বেষের লিঙ্গ (অনুমাপক), এ জন্য পার্থিবাদি শরীরসমূহে (চৈতন্যের) প্রতিষেধ নাই।

ভাষ্য। আরম্ভনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাদ্বেষাবিতি যস্যারম্ভনিবৃত্তী, তস্যেচ্ছা-দ্বেষৌ, তস্য জ্ঞানমিতি প্রাপ্তং। পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণা-মারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষজ্ঞানৈর্যোগ ইতি চৈতন্যং।

অনুবাদ। ইচ্ছা ও দ্বেষ আরম্ভলিঙ্গ ও নিবৃত্তিলিঙ্গ, অর্থাৎ আরম্ভের দ্বারা ইচ্ছার এবং নিবৃত্তির দ্বারা দ্বেষের অনুমান হয়, সুতরাং যাহার আরম্ভ ও নিবৃত্তি, তাহার ইচ্ছা ও দ্বেষ, তাহার জ্ঞান, ইহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বুঝা যায়। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহের আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ (সিদ্ধ হয়)। এ জন্য (ঐ শরীরসমূহেরই) চৈতন্য (স্বীকার্য্য)।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে যে যুক্তির দ্বারা স্বমত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে দেহাত্মবাদী নাস্তিকের কথা এই যে, ঐ যুক্তির দ্বারা আমার মত অর্থাৎ দেহের চৈতন্যই সিদ্ধ হয়। কারণ, যে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দ্বারা ইচ্ছা ও দ্বেষের অনুমান হয়, ঐ আরম্ভ ও নিবৃত্তি শরীরেরই ধর্ম্ম, শরীরেই উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং উহার কারণ ইচ্ছা ও দ্বেষ এবং তাহার কারণ জ্ঞান, শরীরেই সিদ্ধ হয়। কার্য্য ও কারণ একই আধারে অবস্থিত থাকে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং যাহার আরম্ভ ও নিবৃত্তি, তাহারই ইচ্ছা ও দ্বেষ, এবং তাহারই জ্ঞান, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ শরীরই চেতন, ঐ শরীর হইতে ভিন্ন কোন চেতন বা আত্মা নাই, ইহা সিদ্ধ হয়। তাই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ।" (বার্হস্পত্য সূত্র)। চতুর্ব্বিধ ভূত (পৃথিবী. জল, তেজঃ, বায়ু) দেহাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞাননামক গুণবিশেষ জন্মে। সুতরাং দেহের চৈতন্য স্বীকার করিলেও ভূতচৈতন্যই স্বীকৃত হয়। দেহের মূল পরমাণুতে চৈতন্য স্বীকার করিয়াও চার্ব্বাক নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এই নাস্তিক মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন ॥৩৫॥

সূত্র। পরশ্বাদিষ্বারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাৎ ॥৩৬॥৩০৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) কুঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ (শরীরে চৈতন্য নাই)।

ভাষ্য। শরীরে চৈতন্যনিবৃত্তিঃ। আরম্ভনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষ-জ্ঞানৈর্যোগ ইতি প্রাপ্তং পরশ্বাদেঃ করণস্যারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাচ্চৈতন্যমিতি। অথ শরীরস্যেচ্ছাদিভির্যোগঃ, পরশ্বাদেস্তু করণস্যারম্ভনিবৃত্তৌ ব্যভিচরতঃ, ন তর্হ্যয়ং হেতুঃ "পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণামারম্ভনিবৃত্তি-দর্শনাদিচ্ছাদ্বেষজ্ঞানৈর্যোগ" ইতি।

অয়ং তর্হ্যন্যোঽর্থঃ[১] "তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেষ্ব-প্রতিষেধঃ"—পৃথিব্যাদীনাং ভূতানামারম্ভস্তাবৎ ত্রস[২]স্থাবরশরীরেষু

১। ভূতচৈতনিকস্তল্লিঙ্গত্বাদিতি হেতুং স্বপক্ষসিদ্ধ্যর্থমন্যথা ব্যাচষ্টে, "অয়ং তর্হী"তি। শরীরেষবয়বব্যূহ-দর্শনাদদর্শনাচ্চ লোষ্টাদিষু, শরীরারম্ভকানামণূনাং প্রবৃত্তিভেদোঽনুমীয়তে, ততশ্চেচ্ছাদ্বেষৌ, তাভ্যাং চৈতন্যমিতি। তাৎপর্য্যটীকা।

২। "ত্রস" শব্দের অর্থ স্থাবরের বিপরীত জঙ্গম। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ত্রসং জঙ্গমং বিশরারু অস্থিরং কৃমিকীটপ্রভৃতীনাং শরীরং। স্থাবরং স্থিরং শরীরং দেবমনুষ্যাদীনাং, তদ্ধি চিরতরং বা ধ্রিয়তে"। জৈন শাস্ত্রেও অনেক স্থানে "ত্রসস্থাবর" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। মহাভারতেও ঐরূপ অর্থে "ত্রস" শব্দের

তদবয়বব্যূহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষঃ, লোষ্টাদিষু লিঙ্গাভাবাৎ প্রবৃত্তিবিশেষাভাবো নিবৃত্তিঃ। আরম্ভনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাদ্বেষাবিতি। পার্থিবাদ্যেষ্বণুষু তদ্দর্শনাদিচ্ছাদ্বেষযোগস্তদ্‌যোগাজ্‌জ্ঞানযোগ ইতি সিদ্ধং ভূতচৈতন্যমিতি।

অনুবাদ। শরীরে চৈতন্য নাই। আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, ইহা বলিলে কুঠারাদি করণের আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কুঠারাদি করণেরও আরম্ভ ও নিবৃত্তি থাকায় তাহারও চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। যদি বল, ইচ্ছাদির সহিত শরীরের সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, কিন্তু আরম্ভ ও নিবৃত্তি কুঠারাদি করণের সম্বন্ধে ব্যভিচারী, অর্থাৎ উহা কুঠারাদির ইচ্ছাদির সাধক হয় না। (উত্তর) তাহা হইলে "পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহের আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়" ইহা হেতু হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্য দেহ-চৈতন্যের সাধক হয় না।

(পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে এই অন্য অর্থ বলিব, (পূর্ব্বোক্ত "তল্লিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রটির উদ্ধারপূর্ব্বক উহার অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন) "ইচ্ছা ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ পার্থিবাদি পরমাণুসমূহে (চৈতন্যের) প্রতিষেধ নাই"—(ব্যাখ্যা) জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমূহে সেই শরীরের অবয়বব্যূহ-লিঙ্গ অর্থাৎ সেই সমস্ত শরীরের অবয়বের ব্যূহ বা বিলক্ষণ সংযোগ যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক, এমন প্রবৃত্তিবিশেষ, পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের অর্থাৎ শরীরারম্ভক পার্থিবাদি পরমাণুসমূহের "আরম্ভ", লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যে (শরীরাবয়বব্যূহরূপ) লিঙ্গ না থাকায় প্রবৃত্তিবিশেষের অভাব "নিবৃত্তি"। ইচ্ছা ও দ্বেষ আরম্ভ-লিঙ্গ ও নিবৃত্তি-লিঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ আরম্ভ ইচ্ছার অনুমাপক, এবং নিবৃত্তি দ্বেষের অনুমাপক। পার্থিবাদি

প্রয়োগ আছে, যথা—"ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতে।"—বনপর্ব্ব। ১৮৭।৩০। কোষকার অমরসিংহও বলিয়াছেন, "চরিষ্ণুর্জঙ্গমচর-ত্রসমিঙ্গং চরাচরং।" অমরকোষ, বিশেষ্যনিঘ্ন বর্গ। ৪৫। সুতরাং "ত্রস" শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগের অভাব নাই। উহা কেবল জৈন শাস্ত্রেই প্রযুক্ত নহে। "ত্রসরেণু" এই শব্দের প্রথমে যে "ত্রস" শব্দের প্রয়োগ হয়, উহার অর্থও জঙ্গম। জঙ্গম রেণুবিশেষই "ত্রসরেণু" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে মনে হয়। সুধীগণ ইহা চিন্তা করিবেন।

পরমাণুসমূহে সেই আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শন (জ্ঞান) হওয়ায় অর্থাৎ শরীরারম্ভক পার্থিবাদি পরমাণুসমূহে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হওয়ায় ইচ্ছা ও দ্বেষের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তৎসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞানসম্বন্ধ বা জ্ঞানবত্তা সিদ্ধ হয়, অতএব ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। ভূতচৈতন্যবাদীর অভিমত শরীরের চৈতন্যসাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে এই সূত্রদ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে, কুঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় শরীরে চৈতন্য নাই। ভাষ্যকার প্রথমে "শরীরে চৈতন্যনিবৃত্তিঃ" এই বাক্যের পূরণ করিয়া, এই সূত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত সাধ্যের প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, ভূতচৈতন্যবাদী "আরম্ভ" শব্দের দ্বারা ক্রিয়ামাত্র অর্থ বুঝিয়া এবং "নিবৃত্তি" শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার অভাব মাত্র অর্থ বুঝিয়া তদ্দ্বারা শরীরে চৈতন্যের অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" ছেদনাদির করণ কুঠারাদিতেও আছে, তাহাতে চৈতন্য না থাকায় উহা চৈতন্যের সাধক হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্তরূপ আরম্ভ ও নিবৃত্তি দেখিয়া ইচ্ছা ও দ্বেষের সাধন করিয়া, তদ্দ্বারা চৈতন্য সিদ্ধ করিলে কুঠারাদিরও চৈতন্য সিদ্ধ হয়। ইচ্ছাদি গুণ শরীরেরই ধর্ম্ম, কুঠারাদি করণে আরম্ভ ও নিবৃত্তি থাকিলেও উহা সেখানে ইচ্ছাদি গুণের ব্যভিচারী হওয়ায় ইচ্ছাদি গুণের সাধক হয় না, ইহা স্বীকার করিলে ভূতচৈতন্যবাদীর কথিত ঐ হেতু শরীরের ও ইচ্ছাদি-গুণের সাধক হয় না. উহা ব্যভিচারী হওয়ায় হেতুই হয় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে ভূতচৈতন্যবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "তল্লিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষসূত্রের অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে "আরম্ভ" ইচ্ছার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক, তাহা ক্রিয়ামাত্র নহে। এবং যে "নিবৃত্তি" দ্বেষের লিঙ্গ, তাহা ঐ ক্রিয়ার অভাব মাত্র নহে। প্রবৃত্তিবিশেষই পৃথিব্যাদি ভূতের অর্থাৎ পার্থিবাদি পরমাণুসমূহের "আরম্ভ"। "ত্রস" অর্থাৎ অস্থির বা অল্পকালস্থায়ী কৃমি কীট প্রভৃতির শরীর এবং "স্থাবর" অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী দেবতা ও মনুষ্যাদির শরীরের অবয়বের ব্যূহ অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষের অনুমান হয়। শরীরের আরম্ভক পরমাণুসমূহে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষ না জন্মিলে সেই পরমাণুসমূহ পূর্ব্বোক্তরূপ শরীরের উৎপাদন করিতে পারে না। শরীরের অবয়বের যে ব্যূহ দেখা যায়, তাহা লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যে দেখা যায় না, সুতরাং শরীরের আরম্ভক পার্থিবাদি পরমাণুসমূহেই প্রবৃত্তিবিশেষ অনুমিত হয়। ঐ পরমাণুসমূহ যে সময়ে শরীরের উৎপাদন করে না, তখন তাহাতেও নিবৃত্তি অনুমিত হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিবিশেষের অভাবই "নিবৃত্তি"। শরীরারম্ভক পরমাণুসমূহে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা তাহাতে ঐ প্রবৃত্তির কারণ ইচ্ছা এবং নিবৃত্তির কারণ দ্বেষ সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ পরমাণুসমূহে চৈতন্যও সিদ্ধ হয়। কারণ, চৈতন্য ব্যতীত ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না। শরীরারম্ভক পার্থিবাদি পরমাণুসমূহে চৈতন্য সিদ্ধ হইলে ভূতচৈতন্যই সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। **কুম্ভাদিষ্বনুপলব্ধেরহেতুঃ**[১]। কুম্ভাদিমৃদবয়বানাং ব্যূহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষ আরম্ভঃ, সিকতাদিষু প্রবৃত্তিবিশেষাভাবো নিবৃত্তিঃ। ন চ মৃৎসিকতানামারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নজ্ঞানৈর্যোগঃ, তস্মাৎ "তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়ো"রিত্যহেতুঃ।

অনুবাদ। (উত্তর) কুম্ভাদি দ্রব্যে (ইচ্ছাদির) উপলব্ধি না হওয়ায় (ভূতচৈতন্যবাদীর ব্যাখ্যাত হেতু) অহেতু। বিশদার্থ এই যে, কুম্ভাদির মৃত্তিকারূপ অবয়বসমূহের "ব্যূহলিঙ্গ" অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা অনুমেয় প্রবৃত্তিবিশেষ "আরম্ভ" আছে, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যে প্রবৃত্তিবিশেষের অভাবরূপ "নিবৃত্তি" আছে। কিন্তু মৃত্তিকা ও বালুকাদি দ্রব্যের আরম্ভ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষ ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, অতএব "ইচ্ছা ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ" ইহা অর্থাৎ "তল্লিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত হেতু, অহেতু।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার ভূতচৈতন্যবাদীর মতানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার কথিত হেতুর ব্যাখ্যান্তর করিয়া, এখন ঐ হেতুতেও ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে, কুম্ভাদি দ্রব্যে ইচ্ছাদির উপলব্ধি না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ হেতুও ইচ্ছাদির ব্যভিচারী, সুতরাং উহাও হেতু হয় না। অবয়বের ব্যূহ বা বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইলে কুম্ভাদি দ্রব্যের আরম্ভক মৃত্তিকারূপ অবয়বের ব্যূহদ্বারা তাহাতেও প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইবে, কুম্ভাদির উপাদান মৃত্তিকাতেও প্রবৃত্তিবিশেষরূপ আরম্ভ স্বীকার করিতে হইবে। এবং বালুকাদি দ্রব্যে পূর্ব্বোক্তরূপ অবয়বব্যূহ না থাকায় তাহাতে ঐ প্রবৃত্তিবিশেষ সিদ্ধ হয় না। চূর্ণ বালুকাদিদ্রব্য পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের অভাববশতঃ কোন দ্রব্যান্তরের আরম্ভক না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষরূপ আরম্ভ সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে ঐ প্রবৃত্তিবিশেষের অভাব নিবৃত্তিই স্বীকার্য্য। সুতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর কথিত যুক্তির দ্বারা কুম্ভাদি দ্রব্যের আরম্ভক মৃত্তিকাতেও প্রবৃত্তি এবং বালুকাদিতেও নিবৃত্তি সিদ্ধ হওয়ায় ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছাদির ব্যভিচারী, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ঐ মৃত্তিকা ও বালুকাদিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি থাকিলেও তাহাতে ইচ্ছা ও দ্বেষ নাই, প্রযত্ন ও জ্ঞানও নাই। ভূতচৈতন্যবাদীও ঐ মৃত্তিকাদিতে ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করেন না। তিনি শরীরারম্ভক পরমাণু ও তজ্জনিত পার্থিবাদি শরীরসমূহে চৈতন্য স্বীকার করিলেও মৃত্তিকাদি অন্যান্য সমস্ত বস্তু তাঁহার মতেও চেতন নহে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত "তল্লিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ভূতচৈতন্যবাদ সমর্থন করিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা ব্যভিচার প্রযুক্ত হেতুই হয় না, উহা হেত্বাভাস, সুতরাং উহার দ্বারা ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয় না॥৩৬॥

১। "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থে এই সন্দর্ভ সূত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই উহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"ও উহা সূত্রমধ্যে গৃহীত হয় নাই।

সূত্র। নিয়মানিয়মৌ তু তদ্বিশেষকৌ ॥৩৭॥৩০৮॥

অনুবাদ। কিন্তু নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক অর্থাৎ ভেদক।

ভাষ্য। তয়োরিচ্ছাদ্বেষয়োর্নিয়মানিয়মৌ বিশেষকৌ ভেদকৌ, জ্ঞস্যেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী ন স্বাশ্রয়ে। কিং তর্হি? প্রয়োজ্যাশ্রয়ে। তত্র প্রযুজ্যমানেষু ভূতেষু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্তঃ, ন সর্ব্বেম্বিত্যনিয়মোপপত্তিঃ। যস্য তু জ্ঞত্বাদ্‌ভূতানামিচ্ছা-দ্বেষ-নিমিত্তে আরম্ভনিবৃত্তী স্বাশ্রয়ে তস্য নিয়মঃ স্যাৎ। যথা ভূতানাং গুণান্তরনিমিত্তা প্রবৃত্তির্গুণপ্রতিবন্ধাচ্চ নিবৃত্তির্ভূতমাত্রে ভবতি নিয়মেনৈবং ভূতমাত্রে জ্ঞানেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তে প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্বাশ্রয়ে স্যাতাং, নতু ভবতঃ, তস্মাৎ প্রযোজকাশ্রিতা জ্ঞানেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাঃ, প্রযোজ্যাশ্রয়ে তু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী, ইতি সিদ্ধং।

একশরীরে জ্ঞাতৃবহুত্বং নিরনুমানং। ভূতচৈতনিকস্যৈকশরীরে বহূনি ভূতানি জ্ঞানেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নগুণানীতি জ্ঞাতৃবহুত্বং প্রাপ্তং। ওমিতি ব্রুবতঃ প্রমাণং নাস্তি। যথা নানাশরীরেষু নানাজ্ঞাতারো বুদ্ধ্যাদিগুণব্যবস্থানাৎ, এবমেকশরীরেঽপি বুদ্ধ্যাদিগুণব্যবস্থাঽনুমানং স্যাজ্‌জ্ঞাতৃবহুত্বস্যেতি।

অনুবাদ। নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছা দ্বেষের বিশেষক কি না ভেদক। জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ ও তাহার অভাব "স্বাশ্রয়ে" অর্থাৎ ঐ ইচ্ছা ও দ্বেষের আশ্রয় দ্রব্যে থাকে না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) প্রযোজ্যরূপ আশ্রয়ে অর্থাৎ কুঠারাদি দ্রব্যে থাকে। তাহা হইলে প্রযুজ্যমান ভূতসমূহে অর্থাৎ কুঠারাদি যে সমস্ত দ্রব্য জ্ঞাতার প্রযোজ্য, সেই সমস্ত দ্রব্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি থাকে, সমস্ত ভূতে থাকে না, এ জন্য অনিয়মের উপপত্তি হয়। কিন্তু যাহার মতে (ভূতচৈতন্যবাদীর মতে) ভূতসমূহের জ্ঞানবত্তাপ্রযুক্ত ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক আরম্ভ ও নিবৃত্তি স্বাশ্রয়ে অর্থাৎ শরীরাদিতে থাকে, তাহার মতে নিয়ম হউক? (বিশদার্থ) যেমন ভূতসমূহের (পৃথিব্যাদির) গুণান্তরনিমিত্তক (গুরুত্বাদিজন্য) প্রবৃত্তি (পতনাদি ক্রিয়া) এবং গুণপ্রতিবন্ধবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণান্তর গুরুত্বাদির প্রতিবন্ধবশতঃ নিবৃত্তি (পতনাদি ক্রিয়ার

অভাব) নিয়মতঃ ভূতমাত্রে অর্থাৎ স্বাশ্রয় সমস্ত ভূতেই হয়,—এইরূপ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্বেষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি স্বাশ্রয় ভূতমাত্রে অর্থাৎ ঐ জ্ঞানাদির আশ্রয় সর্ব্বভূতে হউক ? কিন্তু হয় না, অতএব জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন প্রযোজকাশ্রিত, কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্যাশ্রিত, ইহাই সিদ্ধ হয়।

পরন্তু একশরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব নিরনুমান অর্থাৎ নিষ্প্রমাণ। বিশদার্থ এই যে, ভূতচৈতন্যবাদীর (মতে) একশরীরে বহু ভূত (বহু পরমাণু) জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নরূপ গুণবিশিষ্ট, এ জন্য জ্ঞাতার বহুত্ব প্রাপ্ত হয়। "ওম্" এই শব্দবাদীর প্রমাণ নাই অর্থাৎ "ওম্"[১] এই শব্দ বলিয়া জ্ঞাতার বহুত্ব স্বীকার করিলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। (কারণ) যেমন বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থাবশতঃ নানা শরীরে নানা জ্ঞাতা অর্থাৎ প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয়, এইরূপ একশরীরেও বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থা, জ্ঞাতার বহুত্বের অনুমান (সাধক) হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থাই জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক, কিন্তু এক শরীরে উহা সম্ভব না হওয়ায় একশরীরে জ্ঞাতার বহুত্বে প্রমাণ নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি ভূতচৈতন্যবাদীর সাধন খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে ক্রিয়াবিশেষরূপ প্রবৃত্তিকেই "আরম্ভ" বলা হইয়াছে। এবং ঐ ক্রিয়াবিশেষের অভাবকেই "নিবৃত্তি" বলা হইয়াছে। প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছা ও দ্বেষের আধার আত্মাতে জন্মিলেও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছা ও দ্বেষের অনাধার দ্রব্যেই জন্মে। অর্থাৎ জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষবশতঃ অচেতন শরীর ও কুঠারাদি দ্রব্যেই ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে। জ্ঞাতা প্রযোজক, শরীর ও কুঠারাদি তাহার প্রযোজ্য। ইচ্ছা ও দ্বেষ জ্ঞাতার ধর্ম্ম, পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঐ জ্ঞাতার প্রযোজ্য শরীরাদির ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছা ও দ্বেষের এই যে ভিন্নাশ্রয়ত্বরূপ বিশেষ, তাহার বোধক "নিয়ম" ও "অনিয়ম"। তাই মহর্ষি নিয়ম ও অনিয়মকে ঐ স্থলে ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক বলিয়াছেন। "নিয়ম" বলিতে এখানে সার্ব্বত্রিকত্ব, এবং "অনিয়ম" বলিতে অসার্ব্বত্রিকত্বই ভাষ্যকারের মতে এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার প্রথমে ঐ অনিয়মের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষজন্য যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাহা ঐ জ্ঞাতার প্রযোজ্য কুঠারাদি দ্রব্যেই দেখা যায়, সর্ব্বত্র দেখা যায় না। সুতরাং উহা সার্ব্বত্রিক নহে, এ জন্য ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অসার্ব্বত্রিকত্বরূপ অনিয়ম উপপন্ন হয়। যে দ্রব্য ইচ্ছাদিজনিত ক্রিয়ার আধার, তাহা ইচ্ছাদির আধার নহে, কুঠারাদি দ্রব্য ইহার দৃষ্টান্ত। ঐ দৃষ্টান্তে শরীরও ইচ্ছাদির আধার নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যাখ্যা করিতে

১। "ওম্" শব্দ স্বীকারবোধক অব্যয়। ওমেবং পরমং মতে। অমরকোষ, অব্যয় বর্গ, ৩৮ শ্লোক।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ভূতচৈতন্যবাদীর মতে ভূতসমূহের নিজেরই জ্ঞানবত্তা বা চৈতন্য-প্রযুক্ত ইচ্ছা ও দ্বেষজন্য স্বাশ্রয় অর্থাৎ ঐ ইচ্ছা ও দ্বেষের আধার শরীরাদিতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে। সুতরাং তাঁহার মতে ঐ জ্ঞান ও ইচ্ছাদি সর্ব্বভূতেই জন্মিবে, ইচ্ছা ও দ্বেষজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিও সর্ব্বভূতে জন্মিলে উহার সার্ব্বত্রিকত্বরূপ নিয়মের আপত্তি হইবে। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন গুরুত্বাদি গুণান্তরজন্য পতনাদি ক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তি এবং কোন কারণে ঐ গুণান্তরের প্রতিবন্ধ হইলে ঐ ক্রিয়ার অভাবরূপ নিবৃত্তি, নিয়মতঃ ঐ গুরুত্বাদি গুণান্তরের আশ্রয় ভূতমাত্রেই জন্মে, তদ্রূপ জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্বেষজন্য যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাহাও ঐ জ্ঞানাদির আশ্রয় সর্ব্বভূতেই উৎপন্ন হউক? কিন্তু ভূতচৈতন্যবাদীর মতেও সর্ব্বভূতে ঐ জ্ঞানাদি জন্মে না, সুতরাং জ্ঞানাদি, প্রযোজক জ্ঞাতারই ধর্ম্ম, পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্য কুঠারাদিরই ধর্ম্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতের যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহা সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূতেই থাকে, যেমন গুরুত্বাদি। পৃথিবী ও জলে যে গুরুত্ব আছে, তাহা সমস্ত পৃথিবী ও সমস্ত জলেই আছে। জ্ঞান ও ইচ্ছাদি যদি পৃথিব্যাদি ভূতেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সর্ব্বভূতেরই ধর্ম্ম হইবে, উহাদিগের সার্ব্বত্রিকত্বরূপ নিয়মই হইবে। কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদি নাই, ভূতচৈতন্য-বাদীও ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদি স্বীকার করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানাদি, ভূতধর্ম্ম হইতে পারে না। জ্ঞানাদি ভূতধর্ম্ম হইলে গুরুত্বাদিগুণের ন্যায় ঐ জ্ঞানাদিরও সার্ব্বত্রিকত্বরূপ নিয়মের আপত্তি হয়। কিন্তু অপ্রামাণিক ঐ নিয়ম ভূতচৈতন্যবাদীও স্বীকার করেন না। সুতরাং জ্ঞাতার জ্ঞানজন্য ইচ্ছা বা দ্বেষ উৎপন্ন হইলে তখন ঐ জ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষেই তজ্জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মে, ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জ্ঞাতা অর্থাৎ প্রযোজক আত্মাতে জন্মে না, সর্ব্বভূতেও জন্মে না, এ জন্য উহারও অসার্ব্বত্রিকত্বরূপ অনিয়মই প্রমাণসিদ্ধ হয়। ভূতচৈতন্যবাদীর মতে এই অনিয়মের উপপত্তি হয় না, পরন্তু অপ্রামাণিক নিয়মের আপত্তি হয়। অপ্রামাণিক এই নিয়ম এবং প্রামাণিক অনিয়ম বুঝিলে তদ্দ্বারা মহর্ষির ৩৪শ সূত্রোক্ত "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছা ও দ্বেষের ভিন্নাশ্রয়ত্বরূপ বিশেষ বুঝা যায়, তাই মহর্ষি ঐ "নিয়ম" ও "অনিয়ম"কে ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক বলিয়াছেন।

ভূতচৈতন্যবাদী বলিয়াছেন যে, জ্ঞানাদি ভূতধর্ম্ম হইলে তাহা সর্ব্বভূতেরই ধর্ম্ম হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যেমন গুড় তণ্ডুলাদি দ্রব্যবিশেষ বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ দ্রব্যান্তরে পরিণত হইলে তাহাতেই মদশক্তি বা মাদকতা জন্মে, তদ্রূপ পার্থিবাদি পরমাণুবিশেষ বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ শরীরাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে। শরীরারম্ভক পরমাণুবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগবিশেষই জ্ঞানাদির উৎপাদক। সুতরাং ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষেই জ্ঞানাদির উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানাদি ঐ ভূতবিশেষেরই ধর্ম্ম, ভূতমাত্রের ধর্ম্ম নহে। ভাষ্যকার ভূতচৈতন্যবাদীর এই সমা-ধানের চিন্তা করিয়া ঐ মতে দোষান্তর বলিয়াছেন যে, এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব নিষ্প্রমাণ।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষে চৈতন্ত স্বীকার করিলে ঐ ভূতবিশেষের অর্থাৎ শরীরের আরম্ভক হস্তাদি অবয়ব অথবা সমস্ত পরমাণুতেই চৈতন্ত স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, শরীরের মূল কারণে চৈতন্য না থাকিলে শরীরেও চৈতন্ত জন্মিতে পারে না। গুড় তণ্ডুলাদি যে সকল দ্রব্যের দ্বারা মদ্য জন্মে, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যেই মদশক্তি বা মাদকতা আছে, ইহা স্বীকার্য্য। শরীরের আরম্ভক প্রত্যেক অবয়ব বা প্রত্যেক পরমাণুতেই চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে প্রতি শরীরে বহু অবয়ব বা অসংখ্য পরমাণুকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এক শরীরেও জ্ঞাতার বহুত্বের আপত্তি অনিবার্য্য। এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণ না থাকায় ভূতচৈতন্যবাদী তাহা স্বীকারও করিতে পারেন না। এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থাই জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক। এক জ্ঞাতার বুদ্ধি বা সুখ দুঃখাদি গুণ জন্মিলে সমস্ত শরীরে সমস্ত জ্ঞাতার ঐ বুদ্ধ্যাদি গুণ জন্মে না। যে জ্ঞাতার বুদ্ধ্যাদি গুণ জন্মে, ঐ বুদ্ধ্যাদি গুণ ঐ জ্ঞাতারই ধর্ম্ম, অন্য জ্ঞাতার ধর্ম্ম নহে, ইহাই বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থা। বুদ্ধ্যাদিগুণের এই ব্যবস্থা বা পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মবশতঃ নানা শরীরে নানা জ্ঞাতা অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয়। এইরূপ এক শরীরে নানা জ্ঞাতা বা জ্ঞাতার বহুত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ বুদ্ধ্যাদিগুণব্যবস্থাই তাহাতে অনুমান বা সাধক হইবে, উহা ব্যতীত জ্ঞাতার বহুত্বের আর কোন সাধক নাই। কিন্তু এক শরীরে একই জ্ঞাতা স্বীকার করিলেও তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবস্থার কোন অনুপপত্তি নাই। সুতরাং ঐ বুদ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবস্থা এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক হইতে পারে না। এক শরীরেও জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে বুদ্ধ্যাদিগুণ-ব্যবস্থাই সাধক হইবে, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে আর কোন সাধক নাই, জ্ঞাতার বহুত্বের যাহা সাধক, সেই বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থা এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক হয় না, সুতরাং উহা নিষ্প্রমাণ, এই তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন, বুঝা যায়। নচেৎ ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বকথিত প্রমাণাভাব সমর্থিত হয় না। ভাষ্যকার এখানে এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব মাত্রই বলিয়াছেন। কিন্তু এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের বাধকও আছে। তাৎপর্য্যটীকাকার তাহা বলিয়াছেন যে, এক শরীরে বহু জ্ঞাতা থাকিলে সমস্ত জ্ঞাতাই বিরুদ্ধ অভিপ্রায়বিশিষ্ট হওয়ায় সকলেরই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ কোন কার্য্যই জন্মিতে পারে না। কর্ত্তা বহু হইলেও কার্য্যকালে তাহাদিগের সকলের একরূপ অভিপ্রায়ই হইবে, কোন মতভেদ হইবে না, এইরূপ নিয়ম দেখা যায় না। কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ ঐকমত্য হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যে সমস্ত জ্ঞাতারই ঐকমত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং এক শরীরে বহু জ্ঞাতা স্বীকার করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিতে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, শরীরই চেতন হইলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর কালান্তরে স্মরণ হইতে পারে না। বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর বৃদ্ধকালেও স্মরণ

হইয়া থাকে। কিন্তু বাল্যকালের সেই শরীর বৃদ্ধকালে না থাকায় এবং সেই শরীরস্থ সংস্কারও বিনষ্ট হওয়ায় তখন কোনরূপেই সেই বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, একের দৃষ্ট বস্তু অন্য কেহই স্মরণ করিতে পারে না। অর্থাৎ শরীরের হ্রাস ও বৃদ্ধিবশতঃ পূর্ব্ব-শরীরের বিনাশ ও শরীরান্তরের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বালক শরীর হইতে যুবক শরীরের এবং যুবক শরীর হইতে বৃদ্ধ শরীরের ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের পরিমাণের ভেদ হওয়ায় সেই সমস্ত শরীরকেই এক শরীর বলা যাইবে না। কারণ, পরিমাণের ভেদে দ্রব্যের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু প্রতিদিনই শরীরের হ্রাস বা বৃদ্ধিবশতঃ শরীরের ভেদ সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বদিনে অনুভূত বস্তুর পরদিনেও স্মরণ হইতে পারে না। শরীরের প্রত্যেক অবয়বে চৈতন্য স্বীকার করিলেও হস্তাদি কোন অবয়বের বিনাশ হইলে সেই হস্তাদি অবয়বের অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। অনুভবিতার বিনাশ হইলে তদ্‌গত সংস্কারেরও বিনাশ হওয়ায় সেই সংস্কারজন্য স্মরণ অসম্ভব। ঐ সংস্কারের বিনাশ হয় না, কিন্তু পরজাত অন্য শরীরে উহার সংক্রম হওয়ায় তদ্দ্বারা সেই পরজাত অন্য শরীরও পূর্ব্বশরীরের অনুভূত বস্তুর স্মরণ করিতে পারে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, সংস্কারের ঐরূপ সংক্রম হইতেই পারে না। সংস্কারের ঐরূপ সংক্রম হইতে পারিলে মাতার সংস্কারও গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে। তাহা হইলে মাতার অনুভূত বিষয়ও গর্ভস্থ সন্তান স্মরণ করিতে পারে। উপাদান কারণস্থ সংস্কারই তাহার কার্য্যে সংক্রান্ত হয়, মাতা সন্তানের উপাদান কারণ না হওয়ায় তাহার সংস্কার সন্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহা বলিলেও পূর্ব্বোক্ত স্মরণের উপপত্তি হয় না। কারণ, শরীরের কোন অবয়বের ধ্বংস হইলে অবশিষ্ট অবয়বগুলির দ্বারা সেখানে শরীরান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে অবয়ব বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা ঐ শরীরান্তরের উপাদান কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সেই বিনষ্ট অবয়বস্থ সংস্কার ঐ শরীরান্তরে সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই বিনষ্ট অবয়ব পূর্ব্বে যে বস্তুর অনুভব করিয়াছিল, তখন তাহার আর স্মরণ হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে হস্ত কোন বস্তুর অনুভব করিয়াছিল, তখন ঐ হস্তেই সেই অনুভবজন্য সংস্কার জন্মিয়াছিল। ঐ হস্ত বিনষ্ট হইলেও তাহার পূর্ব্বানুভূত সেই বস্তুর স্মরণ হয়, ইহা ভূতচৈতন্যবাদীরও স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহার মতে তখন ঐ পূর্ব্বানুভবের কর্ত্তা সেই হস্ত ও তদ্‌গত সংস্কার না থাকায় তজ্জন্য সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ কোনরূপেই সম্ভব নহে। শরীরের আরম্ভক পরমাণুতেই চৈতন্য স্বীকার করিব, পরমাণুর স্থিরত্ববশতঃ তদ্‌গত সংস্কারও চিরস্থায়ী হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত স্মরণের অনুপপত্তি নাই—ভূতচৈতন্যবাদীর এই সমাধানের উত্তরে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকায় উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ। এই জন্যই পরমাণুগত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না। ঐ পরমাণুতেই জ্ঞানাদি স্বীকার করিলে ঐ জ্ঞানাদিরও মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ "আমি জানিতেছি," "আমি সুখী," "আমি দুঃখী" ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ জ্ঞানাদি গুণ পরমাণুবৃত্তি হইলে পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকায়

ঐ জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তিবশতঃও উহারা পরমাণুবৃত্তি নহে, ইহা স্বীকার্য্য। টীকাকার হরিদাস তর্কাচার্য্য শেষে এই পক্ষে চরম দোষ বলিয়াছেন যে, পরমাণুকে চেতন বলিলেও পূর্ব্বোক্ত স্মরণের উপপত্তি হয় না। কারণ, যে পরমাণু পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল, তাহা বিশ্লিষ্ট হইলে তদ্‌গত সংস্কারও আর সেই ব্যক্তির পক্ষে কোন কার্য্যকারী হয় না। সুতরাং সেই স্থানে তখন পূর্ব্বানুভূত সেই বস্তুর স্মরণ হওয়া অসম্ভব। হস্তারম্ভক কোন পরমাণুবিশেষ যে বস্তুর অনুভব করিয়াছিল, ঐ পরমাণুটি বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্যত্র গেলে আর তাহার অনুভূত বস্তুর স্মরণ কিরূপে হইবে ? (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ১ম স্তবক, ১৫শ কারিকা দ্রষ্টব্য)।

শরীরারম্ভক সমস্ত অবয়ব অথবা পরমাণুসমূহে চৈতন্য স্বীকার করিলে এক শরীরেও জ্ঞাতা বা আত্মার বহুত্বের আপত্তি হয়। অর্থাৎ সেই এক শরীরের আরম্ভক হস্ত পদাদি সমস্ত অবয়ব অথবা পরমাণুসমূহকেই সেই শরীরে জ্ঞাতা বা আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা স্বীকার করা যায় না। ভাষ্যকার ভূতচৈতন্যবাদীর মতে এই দোষ বলিতে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা এবং তাহার সাধকের উল্লেখ করায় প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা জীবাত্মার নানাত্বই যে তাঁহার মত এবং ন্যায়দর্শনেরও উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবাত্মা নানা হইলে তাহার সহিত এক ব্রহ্মের অভেদ সম্ভব না হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদও যে তাঁহার সম্মত নহে, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদে দৃঢ়নিষ্ঠাবশতঃ এখন কেহ কেহ ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকেও যে অদ্বৈতবাদী বলিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগের ঐ আকাঙ্ক্ষা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্য। **দৃষ্টশ্চান্যগুণনিমিত্তঃ প্রবৃত্তিবিশেষো ভূতানাং সোঽনুমানমন্যত্রাপি**। দৃষ্টঃ করণলক্ষণেষু ভূতেষু পরশ্বাদিষু উপাদানলক্ষণেষু চ মৃৎপ্রভৃতিস্বন্যগুণনিমিত্তঃ প্রবৃত্তিবিশেষঃ, সোঽনুমানমন্যত্রাপি ত্রসস্থাবরশরীরেষু। তদবয়বব্যূহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষো ভূতানামন্যগুণনিমিত্ত ইতি। স চ গুণঃ প্রযত্নসমানাশ্রয়ঃ সংস্কারো ধর্ম্মাধর্ম্মসমাখ্যাতঃ সর্ব্বার্থঃ পুরুষার্থারাধনায় প্রয়োজকো ভূতানাং প্রযত্নবদিতি।

আত্মাস্তিত্বহেতুভিরাত্মনিত্যত্বহেতুভিশ্চ ভূতচৈতন্যপ্রতিষেধঃ কৃতো বেদিতব্যঃ। "নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেঽপি জ্ঞানাবস্থানা"দিতি চ সমানঃ প্রতিষেধ ইতি। ক্রিয়ামাত্রং ক্রিয়োপরমমাত্রঞ্চারম্ভনিবৃত্তী, ইত্যভিপ্রেত্যোক্তং "তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেষ্বপ্রতিষেধ" ইতি। অন্যথা হিমে আরম্ভনিবৃত্তী আখ্যাতে, নচ তথাবিধে পৃথিব্যাদিষু দৃশ্যেতে, তস্মাদযুক্তং "তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেষ্বপ্রতিষেধ" ইতি।

অনুবাদ। ভূতসমূহের অন্যগুণনিমিত্তক প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্টও হয়, সেই প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যত্রও অনুমান (সাধক) হয়। বিশদার্থ এই যে, করণরূপ কুঠারাদি ভূতসমূহে এবং উপাদানরূপ মৃত্তিকাদি ভূতসমূহে অন্যের গুণজন্য প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্ট হয়,—সেই প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যত্রও (অর্থাৎ) জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমূহে অনুমান (সাধক) হয়। (এবং) সেই শরীরসমূহের অবয়বের ব্যূহ যাহার লিঙ্গ (অনুমাপক) অর্থাৎ ঐ অবয়বব্যূহের দ্বারা অনুমেয় ভূতসমূহের প্রবৃত্তিবিশেষও অন্যের গুণজন্য। সেই গুণ কিন্তু প্রযত্নের সমানাশ্রয়, সর্ব্বার্থ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রয়োজনসম্পাদক, পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্য প্রযত্নের ন্যায় ভূতসমূহের প্রযোজক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক সংস্কার।

আত্মার অস্তিত্বের হেতুসমূহের দ্বারা এবং আত্মার নিত্যত্বের হেতুসমূহের দ্বারা ভূতচৈতন্যের প্রতিষেধ করা হইয়াছে জানিবে। (জ্ঞান) "ইন্দ্রিয় ও অর্থের (গুণ) নহে; কারণ, সেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের (স্মরণের) উৎপত্তি হয়" এই সূত্রদ্বারাও তুল্য প্রতিষেধ করা হইয়াছে, জানিবে। ক্রিয়ামাত্র এবং ক্রিয়ার অভাবমাত্র (যথাক্রমে) "আরম্ভ ও নিবৃত্তি" ইহা অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ ইহা বুঝিয়াই (ভূতচৈতন্যবাদী) "ইচ্ছা ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ পার্থিবাদি শরীরসমূহে চৈতন্যের প্রতিষেধ নাই" ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরম্ভ ও নিবৃত্তি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার আরম্ভ ও নিবৃত্তি কিন্তু পৃথিব্যাদিতে অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই দৃষ্ট হয় না, অতএব "ইচ্ছা ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ পার্থিবাদি শরীরসমূহে (চৈতন্যের) প্রতিষেধ নাই" ইহা অর্থাৎ ভূতচৈতন্যবাদীর এই পূর্ব্বোক্ত কথা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই (৩৭শ) সূত্রদ্বারা যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুমান সূচনার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, কুঠারাদি এবং মৃত্তিকাদি ভূতসমূহের যে প্রবৃত্তিবিশেষ, তাহা অন্যের গুণজন্য, ইহা দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠ-ছেদনাদি কার্য্যের জন্য কুঠারাদি করণের যে প্রবৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, এবং ঘটাদি কার্য্যের জন্য মৃত্তিকাদি উপাদান কারণের যে প্রবৃত্তিবিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, তাহা অপর কাহারও প্রযত্নরূপ গুণজন্য, কাহারও প্রযত্ন ব্যতীত কুঠারাদি ও মৃত্তিকাদিতে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ জন্মে না, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং ঐ প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যত্রও (শরীরেও) অনুমান অর্থাৎ সাধক হয়। অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর সর্ব্ববিধ শরীরেও যে প্রবৃত্তিবিশেষ জন্মে, তাহাও অপর কাহারও গুণজন্য, নিজের গুণজন্য নহে, ইহা ঐ কুঠারাদিগত প্রবৃত্তিবিশেষের দৃষ্টান্তে অনুমানদ্বারা[1] বুঝা যায়। পরন্তু কেবল শরীরের ঐ

১। সোঽয়ং প্রয়োগঃ, ত্রসস্থাবরশরীরেষু প্রবৃত্তিঃ স্বাশ্রয়ব্যতিরিক্তাশ্রয়গুণনিমিত্তা প্রবৃত্তিবিশেষত্বাৎ পরশ্বাদিগতপ্রবৃত্তিবিশেষবদিতি। ন কেবলং শরীরস্য প্রবৃত্তিবিশেষোঽন্যগুণনিমিত্তঃ, ভূতানামপি তদারম্ভকাণাং প্রবৃত্তিবিশেষোঽন্যগুণনিবন্ধন এবেত্যাহ "তদবয়বব্যূহলিঙ্গ" ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

প্রবৃত্তিবিশেষই যে অন্যের গুণজন্য, তাহা নহে। ঐ শরীরের আরম্ভক ভূতসমূহের অর্থাৎ হস্তাদি অবয়বের যে প্রবৃত্তিবিশেষ, তাহাও অন্যের গুণজন্য। শরীরের অবয়বব্যূহ অর্থাৎ শরীরের অবয়বগুলির বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা ঐ অবয়বসমূহের ক্রিয়াবিশেষরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ অনুমিত হয়। যে সময়ে শরীরের উৎপত্তি হয়, তৎপূর্ব্বে শরীরের অবয়বগুলির বিলক্ষণ সংযোগ-জনক উহাদিগের ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, এবং শরীর উৎপন্ন হইলে হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য ঐ শরীরে এবং তাহার অবয়ব হস্তাদিতে যে ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, তাহাই এখানে প্রবৃত্তি-বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত কুঠারাদিগত প্রবৃত্তিবিশেষের দৃষ্টান্তে এই প্রবৃত্তিবিশেষও অন্যের গুণজন্য, ইহা সিদ্ধ হইলে ঐ গুণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার শেষে ঐ প্রবৃত্তিবিশেষের কারণরূপে প্রযত্নের ন্যায় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক সংস্কার অর্থাৎ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রযত্ন নামক গুণের ন্যায় ঐ প্রযত্নের সহিত একাধারস্থ অদৃষ্টও ঐ প্রবৃত্তিবিশেষের কারণ। কারণ, প্রযত্নের ন্যায় ঐ অদৃষ্টও সর্ব্বার্থ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রয়োজনসম্পাদক এবং পুরুষার্থসম্পাদনের জন্য ভূতসমূহের প্রবর্ত্তক। শরীরাদির পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ অন্যের গুণজন্য এবং সেই গুণ প্রযত্ন ও অদৃষ্ট, ইহা সিদ্ধ হইলে ঐ প্রযত্ন যে শরীর ও হস্তপদাদির গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ প্রযত্নের কারণ, অদৃষ্ট এবং জ্ঞানাদিও ঐ শরীরাদির গুণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, শরীরাদিতে প্রযত্ন না থাকিলে অদৃষ্টও তাহার গুণ হইতে পারে না। অতএব ঐ শরীরাদিভিন্ন অর্থাৎ ভূতভিন্ন কোন জ্ঞাতারই জ্ঞানজন্য ইচ্ছাবশতঃ শরীরাদিতে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। কারণ, কুঠারাদি ও মৃত্তিকাদিতে প্রবৃত্তিবিশেষ যখন অপরের গুণজন্য দেখা যায়, তখন তদ্দৃষ্টান্তে শরীরাদির প্রবৃত্তিবিশেষও তদ্ভিন্ন জ্ঞাতা বা আত্মারই গুণজন্য, ইহা অনুমানসিদ্ধ।

ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির সূত্রানুসারে ভূতচৈতন্যবাদের নিরাস করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বসাধক হেতুসমূহের দ্বারা অর্থাৎ এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বের সাধক যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভূতচৈতন্যের খণ্ডন করা হইয়াছে জানিবে। এবং এই আহ্নিকের "নেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ" ইত্যাদি (১৮শ) সূত্রদ্বারাও তুল্যভাবে ভূতচৈতন্যের খণ্ডন করা হইয়াছে জানিবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থ বিনষ্ট হইলেও স্মরণের উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয় ও অর্থের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ যুক্তির দ্বারা জ্ঞান শরীরের গুণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, বাল্য যৌবনাদি অবস্থাভেদে পূর্ব্বশরীরের অথবা ঐ শরীরের অবয়ববিশেষের বিনাশ হইলেও পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ঐ এক যুক্তির দ্বারাই জ্ঞান, শরীর বা শরীরের অবয়বের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার "সমানঃ প্রতিষেধঃ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়া-ছেন। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে ভূতচৈতন্যবাদীর পূর্ব্বপক্ষের বীজ প্রকাশ করিয়া ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে "আরম্ভ" শব্দের দ্বারা ক্রিয়ামাত্র এবং "নিবৃত্তি"শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার অভাব মাত্র বুঝিয়াই ভূতচৈতন্যবাদী "তল্লিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি ৩৫শ সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে যে "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" কথিত হইয়াছে, তাহা অন্য

প্রকার। পৃথিবী প্রভৃতি ভূতমাত্রেই উহা নাই,—সুতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর ঐ পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। উদ্দ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে,হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য যে ক্রিয়াবিশেষ, তাহাই পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রে 'আরম্ভ" ও নিবৃত্তি" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। ভূতচৈতন্যবাদী উহা না বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করায় এখানে তাঁহার "অপ্রতিপত্তি" নামক নিগ্রহস্থান স্বীকার্য্য। হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য ক্রিয়াবিশেষরূপ আরম্ভ ও নিবৃত্তি সর্ব্বভূতে জন্মে না, জ্ঞাতার প্রযোজ্য কুঠারাদি এবং শরীরাদি ভূতবিশেষেই জন্মে, সুতরাং ঐ "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" জ্ঞাতারই ইচ্ছা ও দ্বেষ-জন্য, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ আরম্ভ ও নিবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাতারই ইচ্ছা ও দ্বেষ সিদ্ধ হয়, জ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষে ইচ্ছা ও দ্বেষ সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর পূর্ব্ব-পক্ষ অযুক্ত। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রের ভাষ্যে ঐ সূত্রোক্ত "আরম্ভ" ও "নিবৃত্তির" স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এই ৩৭শ সূত্রভাষ্যে "প্রবৃত্তি" ও "নিবৃত্তি" প্রযোজ্যাশ্রিত, উহা প্রযোজক আত্মাতে থাকে না, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করায় তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত ৩৪শ সূত্রোক্ত আরম্ভ" ও "নিবৃত্তি" যে প্রযত্নবিশেষ নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর এবং তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে পূর্ব্বোক্ত আরম্ভ ও নিবৃত্তিকে ক্রিয়াবিশেষই বলিয়াছেন।

ভূতচৈতন্যবাদ বা দেহাত্মবাদ অতি প্রাচীন মত। দেবগুরু বৃহস্পতি এই মতের প্রবর্ত্তক[১]। উপনিষদেও পূর্ব্বপক্ষরূপে এই মতের সূচনা আছে[২]। মহর্ষি গোতম চতুর্থ অধ্যায়েও অনেক নাস্তিক মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা লিখিত হইবে ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য। ভূতেন্দ্রিয়মনসাং সমানঃ প্রতিষেধো মনস্তূদাহরণমাত্রং।

অনুবাদ। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধে (চৈতন্যের) প্রতিষেধ সমান,—মন কিন্তু উদাহরণমাত্র।

সূত্র। যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতন্ত্র্যাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ ন মনসঃ ॥৩৮॥৩০৯॥

অনুবাদ। যথোক্তহেতুত্ববশতঃ, পরতন্ত্রতাবশতঃ এবং অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ (চৈতন্য) মনের অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের (গুণ) নহে।

১। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি, তৎসমুদায়ে শরীরবিষয়েন্দ্রিয়সংজ্ঞাঃ, তেভ্যশ্চৈতন্যং। বার্হস্পত্যসূত্র।

২। বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাহস্তি। বৃহদারণ্যক।২।৪।১২। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক দর্শন দ্রষ্টব্য।

ভাষ্য। "ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গ"মিত্যতঃ প্রভৃতি যথোক্তং সংগৃহ্যতে, তেন ভূতেন্দ্রিয়মনসাং চৈতন্য-প্রতিষেধঃ। পারতন্ত্র্যাৎ,—পরতন্ত্রাণি ভূতেন্দ্রিয়মনাংসি ধারণ-প্রেরণ-ব্যূহনক্রিয়াসু প্রযত্নবশাৎ প্রবর্ত্তন্তে, চৈতন্যে পুনঃ স্বতন্ত্রাণি স্যুরিতি। অকৃতাভ্যাগমাচ্চ,—"প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ" ইতি, চৈতন্যে ভূতেন্দ্রিয়মনসাং পরকৃতং কর্ম্ম পুরুষেণোপভুজ্যত ইতি স্যাৎ, অচৈতন্যে তু তৎসাধনস্য স্বকৃতকর্ম্ম-ফলোপভোগঃ পুরুষস্যেত্যুপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। "ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ" ইহা হইতে অর্থাৎ ঐ সূত্রোক্ত আত্মার লক্ষণ হইতে লক্ষণের পরীক্ষা পর্য্যন্ত (১)"যথোক্ত" বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ হইয়াছে। (এবং) (২) পরতন্ত্রতাবশতঃ,—(তাৎপর্য্য এই যে) পরতন্ত্র ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন, ধারণ, প্রেরণ ও ব্যূহন ক্রিয়াতে (আত্মার) প্রযত্নবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চৈতন্য থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন চেতন পদার্থ হইলে (উহারা) স্বতন্ত্র হউক ? এবং (৩) অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ—(তাৎপর্য্য এই যে) বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির (মনের) দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ পুণ্য ও পাপকর্ম্ম "প্রবৃত্তি"। ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের চৈতন্য থাকিলে পরকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ ঐ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কৃত কর্ম্ম পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, ইহা হউক ? [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় অথবা মনই চেতন হইলে তাহাতেই পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, সুতরাং পুরুষ বা আত্মার পরকৃত কর্ম্মেরই ফলভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়] চৈতন্য না থাকিলে কিন্তু অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন অচেতন পদার্থ হইলে সেই ভূতাদি সাধন-বিশিষ্ট পুরুষের স্বকৃত কর্ম্মফলের উপভোগ, ইহা উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্র দ্বারা মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ করিতে আবার তিনটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই এই সূত্র পাঠে বুঝা যায়। কিন্তু এই সূত্রোক্ত হেতুত্রয়ের দ্বারা মনের চৈতন্যের ন্যায় ভূত এবং ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যও প্রতিষিদ্ধ হয়। সুতরাং মহর্ষি "ন মনসঃ" এই কথা বলিয়া কেবল মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ বলিয়াছেন কেন ? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্য হইতে পারে। তাই তদুত্তরে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রোক্ত চৈতন্যের প্রতিষেধ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধে সমান। সুতরাং এই সূত্রে মন উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত হেতুত্রয়ের দ্বারা যখন তুল্যভাবে ভূত এবং ইন্দ্রিয়ের ও চৈতন্যের প্রতিষেধ হয়, তখন এই সূত্রে "মনস্‌" শব্দের দ্বারা ভূত এবং

ইন্দ্রিয়ও মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে সূত্রার্থ বর্ণন করিতেও সূত্রোক্ত "মনস্" শব্দের দ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, এই তিনটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সূত্রে মহর্ষির প্রথম হেতু (১) "যথোক্ত-হেতুত্ব"। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "ইচ্ছাদ্বেষ-প্রযত্ন" ইত্যাদি সূত্রে (১ম আ, ১০ম সূত্রে) আত্মার অনুমাপক যে কএকটি হেতু বলিয়াছেন, উহাই মহর্ষির উদ্দিষ্ট আত্মার লক্ষণ। এই সূত্রে "যথোক্তহেতু" বলিয়া মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ আত্মার লক্ষণগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আত্মলক্ষণের যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রথম অধ্যায়োক্ত ঐ সমস্ত হেতুর হেতুত্ব পরীক্ষা। সুতরাং "যথোক্তহেতুত্ব" শব্দের দ্বারা তৃতীয়াধ্যায়োক্ত আত্মলক্ষণপরীক্ষাই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। ভাষ্যকারও "প্রভৃতি" শব্দের দ্বারা ঐ পরীক্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। ফলকথা, সূত্রোক্ত "যথোক্তহেতুত্ব" বলিতে আত্মার লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা। আত্মার লক্ষণ হইতে তাহার পরীক্ষা পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনঃ আত্মা নহে, চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু (২) "পারতন্ত্র্য"। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন পরতন্ত্র পদার্থ, উহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই, সুতরাং চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে। ভাষ্যকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন পরতন্ত্র. উহারা কোন বস্তুর ধারণ, প্রেরণ এবং ব্যূহন অর্থাৎ নির্ম্মাণ ক্রিয়াতে অপরের প্রযত্নবশতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, উহাদিগের নিজের প্রযত্নবশতঃ প্রবৃত্তি বা স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা প্রমাণসিদ্ধ[১]। কিন্তু উহাদিগের চৈতন্য স্বীকার করিলে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উহাদিগের প্রমাণসিদ্ধ পরতন্ত্রতার বাধা হয়। সুতরাং উহাদিগের স্বাতন্ত্র্য কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। মহর্ষির তৃতীয় হেতু (৩) "অকৃতাভ্যাগম"। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও শরীরাদি পদার্থের চৈতন্য স্বীকার করিয়া, অচেতন আত্মার ফলভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ মতে শরীরাদির অচেতনত্ব বিষয়ে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন "অকৃতাভ্যাগম"। ভাষ্যকার মহর্ষির এই তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়া, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রবৃত্তির লক্ষণসূত্রটি (১ম আঃ, ১৭শ সূত্র) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভূত, ইন্দ্রিয় অথবা মনের চৈতন্য থাকিলে আত্মাতে পরকৃতকর্ম্মফলভোক্তৃত্বের আপত্তি হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ভূত অথবা ইন্দ্রিয়াদিকে চেতন পদার্থ বলিলে উহাদিগকেই পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তি"রূপ কর্ম্মের কর্ত্তা বলিতে হইবে। কারণ, যাহা চেতন, তাহাই স্বতন্ত্র এবং স্বাতন্ত্র্যই কর্তৃত্ব। কিন্তু ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি, শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা হইলেও উহাদিগের অচিরস্থায়িত্ববশতঃ পারলৌকিক ফলভোক্তৃত্ব অসম্ভব, এজন্য চিরস্থির আত্মারই ফলভোক্তৃত্ব

১। ধারণ-প্রেরণ-ব্যূহনক্রিয়াসু যথাযোগং শরীরেন্দ্রিয়াণি, পরতন্ত্রাণি ভৌতিকত্বাৎ ঘটাদিবদিতি। মনশ্চ পরতন্ত্রং করণত্বাদ্বাস্যাদিবদিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আত্মাতে নিজের অকৃতের অভ্যাগম (ফলভোক্তৃত্ব) স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় অথবা মনঃ কর্ম্ম করে, আত্মা ঐ পরকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। আত্মা স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোক্তা, ইহাই স্বীকার্য্য—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। আত্মাই চেতন পদার্থ হইলে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আত্মাই শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা, এবং অচেতন ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ শরীরাদি আত্মার সাধন, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় শরীরাদি সাধনবিশিষ্ট আত্মাই অনাদি কাল হইতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া স্বকৃত ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন, ইহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে কোন অনুপপত্তি নাই ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য। অথেদং সিদ্ধোপসংগ্রহঃ—

অনুবাদ। অনন্তর ইহা সিদ্ধের উপসংগ্রহ অর্থাৎ উপসংহার—

সূত্র। পারিশেষ্যাদ্যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ ॥ ॥৩৭॥৩১০॥

অনুবাদ। "পরিশেষ"বশতঃ এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তিবশতঃ অথবা যথোক্ত হেতুবশতঃ এবং "উপপত্তি"বশতঃ (জ্ঞান আত্মার গুণ)।

ভাষ্য। আত্মগুণো জ্ঞানমিতি প্রকৃতং। "পরিশেষো" নাম প্রসক্ত-প্রতিষেধেহন্যত্রাপ্রসঙ্গাচ্ছিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়মনসাং প্রতিষেধে দ্রব্যান্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তস্য গুণো জ্ঞানমিতি জ্ঞায়তে।

"যথোক্তহেতূপপত্তে"শ্চেতি, "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা"দিত্যেবমাদীনামাত্মপ্রতিপত্তিহেতূনামপ্রতিষেধাদিতি। পরিশেষজ্ঞাপনার্থং প্রকৃত-স্থাপনাদিজ্ঞানার্থঞ্চ "যথোক্তহেতূপপত্তি"বচনমিতি।

অথবা "উপপত্তে"শ্চেতি হেত্বন্তরমেবেদং, নিত্যঃ খল্বয়মাত্মা, যস্মাদেকস্মিন্ শরীরে ধর্ম্মং চরিত্বা কায়স্য ভেদাৎ[1] স্বর্গে দেবেষূপপদ্যতে, অধর্ম্মং চরিত্বা দেহভেদান্নরকেষূপপদ্যত ইতি। উপপত্তিঃ শরীরান্তরপ্রাপ্তিলক্ষণা, সা সতি সত্ত্বে নিত্যে চাশ্রয়বতী। বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে তু নিরাত্মকে নিরাশ্রয়া

১। ভাষং কায়স্য ভেদাদ্বিনাশাদিতি। তাৎপর্য্যটীকা। এখানে কায়স্য ভেদং প্রাপ্য, এই অর্থে "ল্যপ্"লোপে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগও বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন, "দেহভেদাদিতি ল্যপ্লোপে পঞ্চমী"।

নোপপদ্যত ইতি। একসত্ত্বাধিষ্ঠানশ্চানেকশরীরযোগঃ সংসার উপপদ্যতে, শরীরপ্রবন্ধোচ্ছেদশ্চাপবর্গো মুক্তিরিত্যুপপদ্যতে। বুদ্ধিসন্ততিমাত্রে ত্বেকসত্ত্বানুপপত্তের্ন কশ্চিদ্দীর্ঘমধ্বানং সংধাবতি, ন কশ্চিৎ শরীরপ্রবন্ধাদ্বিমুচ্যত ইতি সংসারাপবর্গানুপপত্তিরিতি। বুদ্ধিসন্ততিমাত্রে চ সত্ত্বভেদাৎ সর্ব্বমিদং প্রাণিব্যবহারজাতমপ্রতিসংহিতমব্যাবৃত্তমপরিনিষ্ঠঞ্চ স্যাৎ, ততঃ স্মরণাভাবান্নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি। স্মরণঞ্চ খলু পূর্ব্বজ্ঞাতস্য সমানেন জ্ঞাত্রা গ্রহণমজ্ঞাসিষমমুমর্থং জ্ঞেয়মিতি। সোঽয়মেকো জ্ঞাতা পূর্ব্বজ্ঞাতমর্থং গৃহ্লাতি, তচ্চাস্য গ্রহণং স্মরণমিতি তদ্‌বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে নিরাত্মকে নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। "পরিশেষ" বলিতে প্রসক্তের প্রতিষেধ হইলে অন্যত্র অপ্রসঙ্গবশতঃ শিষ্যমাণ পদার্থে [প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থ বিষয়ে] সম্প্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্ প্রতীতির (যথার্থ অনুমিতির) সাধন। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতিষেধ হইলে দ্রব্যান্তর প্রসক্ত হয় না, আত্মা অবশিষ্ট থাকে, অতএব জ্ঞান তাহার (আত্মার) গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তিবশতঃ (বিশদার্থ) যেহেতু "দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ" ইত্যাদি সূত্রোক্ত আত্মপ্রতিপত্তির হেতুসমূহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আত্মার সাধক হেতুসমূহের প্রতিষেধ নাই, অতএব (জ্ঞান ঐ আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়)। "পরিশেষ" জ্ঞাপনের জন্য এবং প্রকৃত স্থাপনাদি জ্ঞানের জন্য "যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তি" বলা হইয়াছে।

অথবা "এবং উপপত্তিবশতঃ" এইরূপে ইহা হেত্বন্তরই (কথিত হইয়াছে)। বিশদার্থ এই যে, এই আত্মা নিত্যই, যেহেতু এক শরীরে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া দেহ বিনাশের অনন্তর স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে "উপপত্তি" লাভ করে, অধর্ম্ম আচরণ করিয়া দেহ বিনাশের অনন্তর নরকে "উপপত্তি" লাভ করে। "উপপত্তি" শরীরান্তরপ্রাপ্তিরূপ ; "সত্ত্ব" অর্থাৎ আত্মা থাকিলে এবং নিত্য হইলে সেই "উপপত্তি" আশ্রয়বিশিষ্ট হয়। কিন্তু নিরাত্মক বুদ্ধিপ্রবাহমাত্রে (ঐ উপপত্তি) নিরাশ্রয় হইয়া উপপন্ন হয় না। এবং একসত্ত্বাশ্রিত অনেক শরীরসম্বন্ধরূপ সংসার উপপন্ন হয়, এবং শরীরপ্রবন্ধের উচ্ছেদরূপ অপবর্গ মুক্তি, ইহা উপপন্ন হয়। কিন্তু (আত্মা) বুদ্ধিসন্তানমাত্র হইলে এক আত্মার অনুপপত্তিবশতঃ কোন আত্মাই দীর্ঘ পথ

ধাবন করে না, কোন আত্মাই শরীরপ্রবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয় না। সুতরাং সংসার ও অপবর্গের অনুপপত্তি হয়। এবং (আত্মা) বুদ্ধিসন্তানমাত্র হইলে আত্মার ভেদ-বশতঃ এই সমস্ত প্রাণিব্যবহারসমূহ অপ্রত্যভিজ্ঞাত, অব্যাবৃত্ত, (অবিশিষ্ট) এবং অপরিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। কারণ, তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আত্মার ভেদপ্রযুক্ত স্মরণ হয় না, অন্যের দৃষ্ট বস্তু অন্য স্মরণ করে না। স্মরণ কিন্তু পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর এক জ্ঞাতা কর্ত্তৃক "আমি এই জ্ঞেয় পদার্থকে জানিয়াছিলাম" এইরূপে গ্রহণ অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান-বিশেষ। অর্থাৎ সেই এই এক জ্ঞাতা পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থকে গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই ইহার (আত্মার) স্মরণ। সেই স্মরণ নিরাত্মক বুদ্ধিসন্তানমাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহমাত্রে উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। নানা হেতুদ্বারা এ পর্য্যন্ত যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতে অর্থাৎ সর্ব্বশেষে সংক্ষেপে তাহাই প্রকাশ করিতে মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। জ্ঞান নিত্য আত্মারই গুণ, ইহাই নানা প্রকারে নানা হেতুর দ্বারা মহর্ষির সাধনীয়। সুতরাং ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর সাধ্য প্রকাশ করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা প্রকৃত। এই সূত্রে মহর্ষির প্রথম হেতু "পরিশেষ"। এই "পরিশেষ" শব্দটি "শেষবৎ" অনুমানের নামান্তর। প্রথম অধ্যায়ে অনুমানলক্ষণসূত্র-ভাষ্যে এই "পরিশেষ" বা "শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। "প্রসক্তপ্রতিষেধে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার সেখানেও মহর্ষির এই সূত্রোক্ত "পরিশেষে"র ব্যাখ্যা করিয়া উহাকেই "শেষবৎ" অনুমান বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যাদি সেখানেই বর্ণিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ১৪৪।৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কোন মতে জ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ, কোন মতে ইন্দ্রিয়ের গুণ, কোন মতে মনের গুণ। সুতরাং জ্ঞান—ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ, ইহা প্রসক্ত। দিক্, কাল ও আকাশে জ্ঞানরূপ গুণের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রসঙ্গ বা প্রসক্তি নাই। পূর্ব্বোক্ত নানা হেতুর দ্বারা জ্ঞান ভূতের গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে, এবং মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় প্রসক্তের প্রতিষেধ হইয়াছে। সুতরাং যে দ্রব্য অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই জ্ঞানরূপ গুণ সিদ্ধ হয়। সেই দ্রব্যই চেতন, সেই দ্রব্যের নাম আত্মা। পূর্ব্বোক্তরূপে "পরিশেষ" অনুমানের দ্বারা, জ্ঞান ঐ আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু "যথোক্তহেতূপপত্তি"। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্র ("দর্শন-স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ") হইতে আত্মার প্রতিপত্তির জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ভিন্ন নিত্য আত্মার সাধনের জন্য মহর্ষি যে সমস্ত হেতু বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত হেতুই এই সূত্রে "যথোক্তহেতু" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ "যথোক্ত হেতুসমূহের" "উপপত্তি" বলিতে ঐ সমস্ত হেতুর অপ্রতিষেধ। ভাষ্যকার "অপ্রতিষেধাৎ" এই কথার দ্বারা সূত্রোক্ত "উপপত্তি" শব্দেরই অর্থ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত হেতুর উপপত্তি আছে অর্থাৎ প্রতিবাদিগণ ঐ সমস্ত হেতুর প্রতিষেধ করিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদির গুণ নহে, জ্ঞান নিত্য আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সূত্রে "পরিশেষাৎ" এই মাত্রই মহর্ষির বক্তব্য, তদ্দ্বারাই তাঁহার সাধ্যসাধক যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তিবশতঃ সাধ্য সিদ্ধি বুঝা যায়; মহর্ষি আবার ঐ দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এই জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,—"পরিশেষ" জ্ঞাপন এবং প্রকৃত স্থাপনাদির জ্ঞানের জন্য মহর্ষি যথোক্তহেতুসমূহের উপপত্তিরূপ দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যথোক্তহেতুসমূহের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে প্রসক্তের প্রতিষেধ হইলেই পরিশেষ অনুমানের দ্বারা জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত-রূপে প্রসক্তের প্রতিষেধ না হইলে "পরিশেষ" বুঝাই যায় না, এবং যথোক্ত হেতুসমূহের দ্বারাই প্রকৃত সাধ্যের সংস্থাপনাদি বুঝা যায়, হেতুর জ্ঞান ব্যতীত সাধ্যের সংস্থাপনাদি কোনরূপেই বুঝা যাইতে পারে না, এই জন্যই মহর্ষি আবার বলিয়াছেন,—""যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় "উপপত্তি" শব্দের বৈয়র্থ্য মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অথবা "উপপত্তি" হেত্বন্তর। অর্থাৎ যথোক্তহেতুবশতঃ এবং উপপত্তিবশতঃ আত্মা নিত্য, এইরূপ তাৎপর্য্যেই এই সূত্রে মহর্ষি "যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ" এই কথা বলিয়াছেন। "যথোক্তহেতুভিঃ সহিতা উপপত্তিঃ" এইরূপ বিগ্রহে "যথোক্তহেতূপপত্তি" এই বাক্যটি মধ্যপদলোপী তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসই এই পক্ষে বুঝিতে হইবে। এবং আত্মা নিত্য, ইহাই এই পক্ষে প্রতিজ্ঞাবাক্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যথোক্ত হেতুবশতঃ আত্মা নিত্য, এবং "উপপত্তি"বশতঃ আত্মা নিত্য। স্বর্গ ও নরকে শরীরান্তর প্রাপ্তিই প্রথমে ভাষ্যকার এই "উপপত্তি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ উপপত্তিবশতঃ আত্মা নিত্য। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন এক শরীরে ধর্ম্মাচরণ করিয়া, ঐ শরীরের বিনাশ হইলে সেই আত্মারই স্বর্গলোকে দেবকুলে পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম-জন্য শরীরান্তর প্রাপ্তিরূপ "উপপত্তি" হয়। এবং কোন এক শরীরে অধর্ম্মাচরণ করিয়া ঐ শরীরের বিনাশ হইলে সেই আত্মারই পূর্ব্বসঞ্চিত অধর্ম্মজন্য নরকে শরীরান্তর প্রাপ্তিরূপ "উপপত্তি" হয়। আত্মার এই শাস্ত্রসিদ্ধ "উপপত্তি" আত্মা নিত্য হইলেই সম্ভব হইতে পারে। যাঁহাদিগের মতে আত্মাই নাই, অথবা আত্মা অনিত্য, তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্তরূপ "উপপত্তি"র কোন আশ্রয় না থাকায় উহা সম্ভব হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞা-নাত্মবাদকে অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রকেই আত্মা বলিলে বস্তুতঃ উহার সহিত প্রকৃত আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকায় ঐ বুদ্ধিসন্তানরূপ কল্পিত আত্মাকে নিরাত্মকই বলা যায়। সুতরাং উহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ "উপপত্তি" নিরাশ্রয় হওয়ায় উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় "অহং" "অহং" ইত্যাকার বুদ্ধি বা আলয়বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা সন্তানমাত্রকে যে আত্মা বলিয়াছেন, ঐ আত্মা পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষণমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানস্বরূপ, এবং প্রতিক্ষণে বিভিন্ন; সুতরাং উহাতে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ নরকে শরীরান্তর প্রাপ্তিরূপ "উপপত্তি" সম্ভবই হয় না। যে আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া স্বর্গ নরক ভোগ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় অর্থাৎ কোন

কালেই যাহার নাশ হয় না, সেই আত্মারই পূর্ব্বোক্তরূপ "উপপত্তি" সম্ভব হয়। স্বর্গ নরক স্বীকার না করিলে এবং "উপপত্তি" শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ অপ্রসিদ্ধ বলিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হয় না। এই জন্যই মনে হয়, ভাষ্যকার পরে সংসার ও মোক্ষের উপপত্তিকেই সূত্রোক্ত "উপপত্তি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেই একই আত্মার অনাদিকাল হইতে অনেক-শরীর-সম্বন্ধরূপ সংসার এবং সেই আত্মার নানা শরীর-সম্বন্ধের আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ মোক্ষের উপপত্তি হয়। ক্ষণমাত্রস্থায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানই আত্মা হইলে কোন আত্মাই দীর্ঘ পথ ধাবন করে না, অর্থাৎ কোন আত্মাই একক্ষণের অধিককাল স্থায়ী হয় না, সুতরাং ঐ মতে আত্মার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হয় না। সংসার হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যাহার স্থায়িত্বই নাই, তাহার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি কোনরূপেই হইতে পারে না। ফলকথা, আত্মা নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হইতে পারে, নচেৎ উহা অসম্ভব। অতএব ঐ "উপপত্তি"বশতঃ আত্মা নিত্য।

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিসন্তান বা আলয়বিজ্ঞানসমূহ আত্মা হইলে প্রতি ক্ষণেই আত্মার ভেদ হওয়ায় জীবগণের ব্যবহারসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মকলাপ অপ্রতিসংহিত হয় অর্থাৎ জীবগণ নিজের ব্যবহার বা কর্ম্মকলাপের প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—স্মরণাভাব,[১] এবং শেষে স্মরণ জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতে উহার অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বদিনে অর্দ্ধকৃত কার্য্যের পরদিনে পরিসমাপন দেখা যায়। আমার আরব্ধ কার্য্য আমিই সমাপ্ত করিব, এইরূপ প্রতিসন্ধান (জ্ঞানবিশেষ) না হইলে ঐরূপ পরিসমাপন হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান জ্ঞান স্মরণসাপেক্ষ। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণবিশেষ ব্যতীত ঐরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিক্ষণে আত্মার বিনাশ হইলে কোন আত্মারই স্মরণ জ্ঞান সম্ভব নহে। যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, সেই আত্মা না থাকায় অন্য আত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মার অনুভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণ না হওয়ায় পূর্ব্বদিনে অর্দ্ধ-কৃত কর্ম্মের পরদিনে প্রতিসন্ধান হইতে পারে না, এইরূপ সর্ব্বত্রই জীবের সমস্ত কর্ম্মের প্রতিসন্ধান অসম্ভব হওয়ায় উহা "অপ্রতিসংহিত" হয়। তাহা হইলে কোন আত্মাই কোন কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া সমাপন করে না, ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না। ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতে প্রতিক্ষণে আত্মার ভেদবশতঃ জীবের কর্ম্মকলাপ "অব্যাবৃত্ত" এবং "অপরিনিষ্ঠ" হয়। "অব্যাবৃত্ত" বলিতে অবিশিষ্ট। নিজের আরব্ধ কার্য্য হইতে পরের আরব্ধ কার্য্য বিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতে একশরীরবর্ত্তী আত্মাও প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও যখন তাহার কৃত কার্য্য অবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তখন সর্ব্বশরীরবর্ত্তী সমস্ত আত্মার কৃত সমস্ত কার্য্যই অবিশিষ্ট হউক?

১। অপ্রতিসংহিতত্বে হেতুমাহ "স্মরণাভাবা"দিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

আমি প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও যখন আমার কৃত কার্য্য অবিশিষ্ট হয়, তখন অন্যান্য সমস্ত আত্মার কৃত সমস্ত কার্য্যও আমার কার্য্য হইতে অবিশিষ্ট কেন হইবে না? ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এবং পূর্ব্বোক্ত মতে জীবের কর্ম্মকলাপ "অপারনিষ্ঠ" হয়। "পরিনিষ্ঠা" শব্দের সমাপ্তি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত মতে কোন আত্মাই একক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী না হওয়ায় কোন আত্মাই নিজের আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারে না,—অপর আত্মাও সেই কর্ম্মের প্রতিসন্ধান করিতে না পারায় তাহা সমাপ্ত করিতে পারে না। সুতরাং কর্ম্ম মাত্রই অপরিসমাপ্ত হয়, ইহাই ভাষ্যকারের শেষোক্ত "অপরিনিষ্ঠ" শব্দের দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। এইরূপ অর্থ বুঝিলে ভাষ্যকারের "স্মরণাভাবাৎ" এই হেতুবাক্যও সুসংগত হয়। অর্থাৎ স্মরণের অভাববশতঃ জীবের কর্ম্মকলাপ প্রতিসংহিত হইতে না পারায় অসমাপ্ত হয়, ইহাই ভাষ্যকারের কথার দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াও পরে "অপরিনিষ্ঠ" শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বৈশ্যস্তোমে বৈশ্যই অধিকারী, এবং রাজসূয় যজ্ঞে রাজাই অধিকারী, এবং সোমসাধ্য যাগে ব্রাহ্মণই অধিকারী, ইত্যাদি প্রকার যে নিয়ম আছে, তাহাকে "পরিনিষ্ঠা" বলে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানসন্তানই আত্মা হইলে ঐ "পরিনিষ্ঠা" উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার কিন্তু এখানে জীবের কার্য্যমাত্রকেই "অপরিনিষ্ঠ" বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতে লোকব্যবহারেরও উচ্ছেদ হয়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য বুঝা যায়॥ ৩৯ ॥

সূত্র। স্মরণন্ত্বাত্মনো জ্ঞস্বাভাব্যাৎ ॥৪০॥৩১১॥

অনুবাদ। জ্ঞস্বভাবতাপ্রযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তিপ্রযুক্ত আত্মারই স্মরণ (উপপন্ন হয়)।

ভাষ্য। উপপদ্যত ইতি। আত্মন এব স্মরণং, ন বুদ্ধিসন্ততি-মাত্রস্যেতি। 'তু'শব্দোঽবধারণে। কথং? জ্ঞস্বভাবত্বাৎ, জ্ঞ ইত্যস্য স্বভাবঃ স্বো ধর্ম্মঃ, অয়ং খলু জ্ঞাস্যতি, জানাতি, অজ্ঞাসীদিতি, ত্রিকাল-বিষয়েণানেকেন জ্ঞানেন সম্বধ্যতে, তচ্চাস্য ত্রিকালবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যাত্মবেদনীয়ং জ্ঞাস্যামি, জানামি, অজ্ঞাসিষমিতি বর্ত্ততে, তদ্‌যস্যায়ং স্বো ধর্ম্মস্তস্য স্মরণং, ন বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস্য নিরাত্মকস্যেতি।

অনুবাদ। উপপন্ন হয়। আত্মারই স্মরণ, বুদ্ধিসন্তানমাত্রের স্মরণ নহে। "তু" শব্দ অবধারণ অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে)। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন? (উত্তর) জ্ঞস্বভাবতাপ্রযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, "জ্ঞ" ইহা এই আত্মার স্বভাব কি না স্বকীয় ধর্ম্ম, এই জ্ঞাতাই জানিবে,

জানিতেছে, জানিয়াছিল, এই জন্য ত্রিকালবিষয়ক অনেক জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হয়। এই জ্ঞাতার সেই "জানিবে," "জানিতেছে", "জানিয়াছিল" এইরূপ ত্রিকাল-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই নিজের আত্মাতে অনুভব-সিদ্ধ আছে, সুতরাং যাহার এই (পূর্ব্বোক্ত) স্বকীয় ধর্ম্ম, তাহারই স্মরণ, নিরাত্মক বুদ্ধিসন্তানমাত্রের নহে।

টিপ্পনী। আত্মা নিত্য, এবং জ্ঞান ঐ আত্মারই গুণ, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা স্মরণও আত্মারই গুণ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সূত্রে "স্মরণং" এই বাক্যের পরে "উপপদ্যতে" এই বাক্যের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "উপপদ্যতে" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রে "তু" শব্দের দ্বারা আত্মারই অবধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ "আত্মনস্ত আত্মন এব স্মরণং উপপদ্যতে" এইরূপে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার প্রথমে ঐ "তু" শব্দার্থ অবধারণ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্মত বুদ্ধিসন্তানমাত্রের স্মরণ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা কোন অস্থায়ী অনিত্য পদার্থের স্মরণ উপপন্ন হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন ? এতদুত্তরে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন, "জ্ঞস্বাভাব্যাৎ"। ভাষ্যকার ঐ হেতুর ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, "জ্ঞ" ইহাই আত্মার স্বভাব কি না স্বকীয় ধর্ম্ম। অর্থাৎ জানিবে, জানিতেছে ও জানিয়াছিল, এই ত্রিবিধ অর্থেই "জ্ঞ" এই পদটি সিদ্ধ হয়। সুতরাং "জ্ঞ" শব্দের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন জ্ঞানের আধার, এই অর্থ বুঝা যায়। আত্মাই জানিয়াছিল, আত্মাই জানিবে এবং আত্মাই জানিতেছে, ইহা সমস্ত আত্মাই বুঝিয়া থাকে। আত্মার ঐ কালত্রয়বিষয়ক জ্ঞানসমূহ সমস্ত জীবই নিজের আত্মাতে অনুভব করে। সুতরাং ঐ ত্রিকালীন জ্ঞানের সহিত আত্মারই সম্বন্ধ, ইহা স্বীকার্য্য। উহাই আত্মার স্বভাব, উহাকেই বলে ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তি। উহাই এই সূত্রোক্ত "জ্ঞস্বাভাব্য"। সুতরাং স্মরণরূপ জ্ঞানও আত্মারই গুণ, ইহা স্বীকার্য্য।

বৌদ্ধসম্মত ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানসন্তান পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী না হওয়ায় পূর্ব্বানু-ভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং স্মরণ তাহার গুণ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে আত্মা বলা যায় না, ইহাই এখানে ভাষ্যকার মহর্ষি-সূত্রের দ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানসন্তানও উহার অন্তর্গত প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার "বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস্ত" এই বাক্যে "মাত্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানসন্তান যে আত্মা হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার আরও অনেক স্থলে অনেক বার মহর্ষির সূত্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই সমর্থন করিয়াছেন। ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ৭৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ॥৪০॥

ভাষ্য। স্মৃতিহেতূনামযৌগপদ্যাদ্যুগপদস্মরণমিত্যুক্তং। অথ কেভ্যঃ স্মৃতিরুৎপদ্যত ইতি? স্মৃতিঃ খলু—

অনুবাদ। স্মৃতির হেতুসমূহের যৌগপদ্য না হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে। (প্রশ্ন) কোন্ হেতুসমূহ প্রযুক্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয়? (উত্তর) স্মৃতি—

সূত্র। প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাস-লিঙ্গ-লক্ষণ-সাদৃশ্য-পরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিত-সম্বন্ধানন্তর্য্য-বিয়োগৈককার্য্য-বিরোধাতিশয়-প্রাপ্তি-ব্যবধান-সুখ-দুঃখেচ্ছাদ্বেষ-ভয়ার্থিত্ব-ক্রিয়ারাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ ॥৪১॥৩১২॥

অনুবাদ। প্রণিধান, নিবন্ধ, অভ্যাস, লিঙ্গ, লক্ষণ, সাদৃশ্য, পরিগ্রহ, আশ্রয়, আশ্রিত, সম্বন্ধ, আনন্তর্য্য, বিয়োগ, এককার্য্য, বিরোধ, অতিশয়, প্রাপ্তি, ব্যবধান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, অর্থিত্ব, ক্রিয়া, রাগ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এই সমস্ত হেতু-বশতঃ উৎপন্ন হয়।

ভাষ্য। সুস্মূর্ষয়া মনসো ধারণং প্রণিধানং, সুস্মূর্ষিতলিঙ্গানুচিন্তনং বাঽর্থস্মৃতিকারণং। নিবন্ধঃ খল্বেকগ্রন্থোপযমোঽর্থানাং, একগ্রন্থোপযতাঃ খল্বর্থা অন্যোন্যস্মৃতিহেতব আনুপূর্ব্ব্যেণেতরথা বা ভবন্তীতি। ধারণাশাস্ত্র-কৃতো বা প্রজ্ঞাতেষু বস্তুষু স্মর্ত্তব্যানামুপনিঃক্ষেপো নিবন্ধ ইতি। অভ্যাসস্তু সমানে বিষয়ে জ্ঞানানামভ্যাবৃত্তিঃ, অভ্যাসজনিতঃ সংস্কার আত্ম-গুণোঽভ্যাসশব্দেনোচ্যতে, স চ স্মৃতিহেতুঃ সমান ইতি। লিঙ্গং—পুনঃ সংযোগি সমবায়ি একার্থসমবায়ি বিরোধি চেতি। যথা—ধূমোঽগ্নেঃ, গোর্ব্বিষাণং, পাণিঃ পাদস্য, রূপং স্পর্শস্য, অভূতং ভূতস্যেতি। লক্ষণং—পশ্বয়বস্থং গোত্রস্য স্মৃতিহেতুঃ, বিদানামিদং, গর্গাণামিদমিতি। সাদৃশ্যং—চিত্রগতং প্রতিরূপকং দেবদত্তস্যেত্যেবমাদি। পরিগ্রহাৎ—স্বেন বা স্বামী স্বামিনা বা স্বং স্মর্য্যতে। আশ্রয়াৎ গ্রামণ্যা তদধীনং স্মরতি। আশ্রিতাৎ তদধীনেন গ্রামণ্যমিতি। সম্বন্ধাৎ অন্তেবাসিনা যুক্তং গুরুং স্মরতি, ঋত্বিজা যাজ্যমিতি। আনন্তর্য্যাদিতিকরণীয়েষ্বর্থেষু। বিয়োগাৎ—যেন বিযুজ্যতে তদ্বিয়োগপ্রতিসংবেদী ভৃশং স্মরতি। এককার্য্যাৎ কর্ত্রন্তরদর্শনাৎ কর্ত্রন্তরে

স্মৃতিঃ। বিরোধাৎ—বিজিগীষমাণয়োরন্যতরদর্শনাদন্যতরঃ স্মর্য্যতে। অতিশয়াৎ—যেনাতিশয় উৎপাদিতঃ। প্রাপ্তেঃ—যতো যেন কিঞ্চিৎ প্রাপ্তমাপ্তব্যং বা ভবতি তমভীক্ষ্ণং স্মরতি। ব্যবধানাৎ—কোশাদিভিরসিপ্রভৃতীনি স্মর্য্যন্তে। সুখদুঃখাভ্যাং—তদ্ধেতুঃ স্মর্য্যতে। ইচ্ছাদ্বেষাভ্যাং—যমিচ্ছতি যঞ্চ দ্বেষ্টি তং স্মরতি। ভয়াৎ—যতো বিভেতি। অর্থিত্বাৎ—যেনার্থী ভোজনেনাচ্ছাদনেন বা। ক্রিয়ায়াঃ—রথেন রথকারং স্মরতি। রাগাৎ—যস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ভবতি তামভীক্ষ্ণং স্মরতি। ধর্ম্মাৎ—জাত্যন্তরস্মরণমিহ চাধীতশ্রুতাবধারণমিতি। অধর্ম্মাৎ—প্রাগনুভূতদুঃখসাধনং স্মরতি। ন চৈতেষু নিমিত্তেষু যুগপৎ সংবেদনানি ভবন্তীতি যুগপদস্মরণমিতি। নিদর্শনঞ্চেদং স্মৃতিহেতূনাং ন পরিসংখ্যানমিতি।

অনুবাদ। স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ (স্মরণীয় বিষয়ে) মনের ধারণ[১] অথবা স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নবিশেষের অনুচিন্তনরূপ (১) "প্রণিধান," পদার্থস্মৃতির কারণ। (২) "নিবন্ধ" বলিতে পদার্থসমূহের একগ্রন্থে উল্লেখ, —একগ্রন্থে "উপযত" (উল্লিখিত বা উপনিবদ্ধ) পদার্থসমূহ আনুপূর্ব্বীরূপে অর্থাৎ ক্রমানুসারে অথবা অন্য প্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। অথবা "ধারণাশাস্ত্র"-জনিত প্রজ্ঞাত বস্তুসমূহে (নাড়ী প্রভৃতিতে) স্মরণীয় পদার্থসমূহের (দেবতাবিশেষের) উপনিঃক্ষেপ (সমারোপ) "নিবন্ধ"। (৩) "অভ্যাস" কিন্তু এক বিষয়ে বহু জ্ঞানের "অভ্যাবৃত্তি" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, অভ্যাসজনিত আত্মার গুণবিশেষ সংস্কারই "অভ্যাস" শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহাও তুল্য স্মৃতিহেতু। (৪) "লিঙ্গ" কিন্তু (১) সংযোগি, (২) সমবায়ি, (৩) একার্থসমবায়ি, এবং (৪) বিরোধি,—অর্থাৎ কণাদোক্ত এই চতুর্ব্বিধ লিঙ্গ পদার্থবিশেষের স্মৃতির কারণ হয়। যেমন (১) ধূম অগ্নির, (২) শৃঙ্গ গোর, (৩) হস্ত চরণের, রূপ স্পর্শের, (৪) অভূত পদার্থ, ভূত পদার্থের (স্মৃতির কারণ হয়)। পশুর অবয়বস্থ (৫) "লক্ষণ"—"বিদ"বংশীয়গণের ইহা, "গর্গ"বংশীয়গণের ইহা, ইত্যাদি প্রকারে গোত্রের স্মৃতির কারণ হয়। (৬) "সাদৃশ্য" চিত্রগত, "দেবদত্তের প্রতিরূপক" ইত্যাদি প্রকারে (স্মৃতির কারণ হয়)। (৭) "পরিগ্রহ"বশতঃ—"স্ব" অর্থাৎ

১। তেষু তেষু বিষয়েষু প্রসক্তস্য মনসস্ততো নিবারণমিত্যর্থঃ। "সুস্মূর্ষিতলিঙ্গানুচিন্তনং বা", সাক্ষাদ্বা তত্র ধারণং তল্লিঙ্গে বা প্রযত্ন ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

ধনের দ্বারা স্বামী, অথবা স্বামীর দ্বারা ধন স্মৃত হয়। (৮) "আশ্রয়"বশতঃ—গ্রামণীর দ্বারা (নায়কের দ্বারা) তাহার অধীন ব্যক্তিকে স্মরণ করে। (৯) "আশ্রিত"-বশতঃ—সেই নায়কের অধীন ব্যক্তির দ্বারা গ্রামণীকে (নায়ককে) স্মরণ করে। (১০) "সম্বন্ধ"বশতঃ—অন্তেবাসীর দ্বারা যুক্ত গুরুকে স্মরণ করে, পুরোহিতের দ্বারা যজমানকে স্মরণ করে। (১১) "আনন্তর্য্য"বশতঃ—ইতিকর্ত্তব্য বিষয়সমূহে (স্মরণ জন্মে)। (১২) "বিয়োগ"বশতঃ যৎকর্ত্তৃক বিযুক্ত হয়, বিয়োগ-বোদ্ধা ব্যক্তি তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে। (১৩) "এককার্য্য"বশতঃ—অন্য কর্ত্তার দর্শন প্রযুক্ত অপর কর্ত্তৃবিষয়ে স্মৃতি জন্মে। (১৪) "বিরোধ"বশতঃ——বিজিগীষু ব্যক্তিদ্বয়ের একতরের দর্শনপ্রযুক্ত একতর স্মৃত হয়। (১৫) "অতিশয়"বশতঃ—যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিশয় (উৎকর্ষ) উৎপাদিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি স্মৃত হয়। (১৬) "প্রাপ্তি"-বশতঃ—যাহা হইতে যৎকর্ত্তৃক কিছু প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য হয়, তাহাকে সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (১৭) "ব্যবধান"বশতঃ—কোশ প্রভৃতির দ্বারা খড়্গ প্রভৃতি স্মৃত হয়। (১৮) সুখ ও (১৯) দুঃখের দ্বারা তাহার হেতু স্মৃত হয়। (২০) ইচ্ছা ও (২১) দ্বেষের দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা করে এবং যাহাকে দ্বেষ করে, তাহাকে স্মরণ করে। (২২) "ভয়"বশতঃ—যাহা হইতে ভীত হয়, তাহাকে স্মরণ করে। (২৩) "অর্থিত্ব-" বশতঃ— ভোজন অথবা আচ্ছাদনরূপ যে প্রয়োজন-বিশিষ্ট হয়, ঐ প্রয়োজনকে স্মরণ করে। (২৪) "ক্রিয়া"বশতঃ—রথের দ্বারা রথকারকে স্মরণ করে। (২৫) "রাগ"বশতঃ—যে স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (২৬) "ধর্ম্ম"-বশতঃ—পূর্ব্বজাতির স্মরণ এবং ইহ জন্মে অধীত ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে। (২৭) "অধর্ম্ম"বশতঃ—পূর্ব্বানুভূত দুঃখসাধনকে স্মরণ করে। এই সমস্ত নিমিত্ত বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, এ জন্য অর্থাৎ এই সমস্ত স্মৃতিকারণের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না। ইহা কিন্তু স্মৃতির কারণসমূহের নিদর্শনমাত্র, পরিগণনা নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৩৩শ সূত্রে প্রণিধানাদি স্মৃতি-কারণের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ স্মৃতি জন্মে না, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রণিধান প্রভৃতি স্মৃতির কারণগুলি বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি এই প্রকরণের শেষে এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত কথার উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির তাৎপর্য্য প্রকাশ করতঃ এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "স্মৃতিঃ খলু" এই বাক্যের সহিত সূত্রের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

"প্রণিধান" পদার্থের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্মরণের ইচ্ছা হইলে,

তৎপ্রযুক্ত স্মরণীয় বিষয়ে মনের ধারণই "প্রণিধান"। অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ে আসক্ত মনকে সেই সেই বিষয় হইতে নিবারণপূর্ব্বক স্মরণীয় বিষয়ে একাগ্র করাই "প্রণিধান"। কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের স্মরণের জন্য সেই পদার্থের কোন লিঙ্গ বা অসাধারণ চিহ্নের চিন্তাই "প্রণিধান"। অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে সাক্ষাৎ মনের ধারণ, অথবা তাহার লিঙ্গ-বিশেষে প্রযত্নই (১) "প্রণিধান"। পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ "প্রণিধান"ই পদার্থ স্মৃতির কারণ হয়। (২) "নিবন্ধ" বলিতে একগ্রন্থে নানা পদার্থের উল্লেখ। এক গ্রন্থে বর্ণিত পদার্থগুলি পরস্পর ক্রমানুসারে অথবা অন্যপ্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। যেমন এই ন্যায়দর্শনে "প্রমাণ" পদার্থের স্মরণ করিয়া ক্রমানুসারে "প্রমেয়" পদার্থ স্মরণ করে। এবং অন্যপ্রকারে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমেও শেষোক্ত "নিগ্রহস্থান"কে স্মরণ করিয়া প্রথমোক্ত "প্রমাণ" পদার্থ স্মরণ করে। এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রেও বর্ণিত পদার্থগুলি ক্রমানুসারে এবং ব্যুৎক্রমে পরস্পর পরস্পরের স্মারক হয়। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "নিবন্ধে"র অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা "ধারণাশাস্ত্র"জনিত প্রজ্ঞাত বস্তুসমূহে স্মরণীয় পদার্থসমূহের উপনিঃক্ষেপ "নিবন্ধ"। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জৈগীষব্য প্রভৃতি মুনিপ্রোক্ত যে ধারণাশাস্ত্র, তাহার সাহায্যে নাড়ী, মুখ, হৃদয়পুণ্ডরীক, কণ্ঠকূপ, নাসাগ্র, তালু, ললাট ও ব্রহ্মরন্ধ্রাদি পরিজ্ঞাত পদার্থসমূহে স্মরণীয় দেবতাবিশেষের যে উপনিঃক্ষেপ অর্থাৎ আরোপ, তাহাকে "নিবন্ধ" বলে। পূর্ব্বোক্ত নাড়ী প্রভৃতি পদার্থসমূহে দেবতাবিশেষ আরোপিত হইলে সেই সেই অবয়বের জ্ঞানপ্রযুক্ত তাঁহারা স্মৃত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত আরোপ ধারণাশাস্ত্রানুসারেই করিতে হয়, সুতরাং উহা ধারণাশাস্ত্র-জনিত। ঐ আরোপবিশেষরূপ "নিবন্ধ" দেবতাবিশেষের স্মৃতির কারণ হয়। এক বিষয়ে বহু জ্ঞানের উৎপাদন "অভ্যাস" পদার্থ হইলেও এই সূত্রে "অভ্যাস" শব্দের দ্বারা ঐ অভ্যাসজনিত আত্মগুণ সংস্কারই মহর্ষির বিবক্ষিত। ঐ (৩) সংস্কারই স্মৃতির কারণ হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "অভ্যাস" শব্দের দ্বারা সংস্কার কথিত হওয়ায় উহার দ্বারা আদর ও জ্ঞানও সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, বিষয়বিশেষে আদর ও জ্ঞানও অভ্যাসের ন্যায় সংস্কার সম্পাদনদ্বারা স্মৃতির কারণ হয়। সূত্রোক্ত (৪) "লিঙ্গ" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার কণাদোক্ত চতুর্ব্বিধ[১] লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া উহার জ্ঞানজন্য স্মৃতির উদাহরণ বলিয়াছেন। কণাদ-সূত্রানুসারে ধূম বহ্নির (১) "সংযোগি" লিঙ্গ। যেমন ধূমের জ্ঞানবিশেষ প্রযুক্ত বহ্নির অনুমান হয়, এইরূপ ধূমের জ্ঞান হইলে বহ্নির স্মরণও জন্মে। শৃঙ্গ গোর (২) "সমবায়ি" লিঙ্গ। শৃঙ্গের জ্ঞান হইলে গোর স্মরণও জন্মে। একই পদার্থের সমবায় সম্বন্ধ যাহাতে আছে এবং একই পদার্থে সমবায়সম্বন্ধ যাহার আছে, এই দ্বিবিধ অর্থেই (৩) "একার্থসমবায়ি" লিঙ্গ বলা যায়। এই "একার্থসমবায়ি" লিঙ্গের জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। ভাষ্যকার প্রথম অর্থে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন—"পাণিঃ পাদস্য।" দ্বিতীয় অর্থে উদাহরণ বলিয়াছেন—"রূপং স্পর্শস্য।" একই শরীরে হস্ত ও চরণের সমবায় সম্বন্ধ আছে, সুতরাং হস্ত, চরণের "একার্থসমবায়ি" লিঙ্গ হওয়ায় হস্তের জ্ঞান চরণের

১। সংযোগি সমবায্যেকার্থসমবায়ি বিরোধি চ॥ কণাদসূত্র, ৩য় অঃ, ১ম আঃ, ৯ সূত্র।

স্মৃতি জন্মায়। এইরূপ ঘটাদি এক পদার্থে রূপ ও স্পর্শের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় রূপ, স্পর্শের "একার্থসমবায়ি" লিঙ্গ হয়। ঐ রূপের জ্ঞানও স্পর্শের স্মৃতি জন্মায়। (৪) অবিদ্যমান বিরোধিপদার্থ বিদ্যমান পদার্থের লিঙ্গ হয়, উহাকে "বিরোধি"লিঙ্গ বলা হইয়াছে১। এই বিরোধি-লিঙ্গের জ্ঞানও বিদ্যমান পদার্থবিশেষের স্মৃতি জন্মায়। যেমন মণিবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলে বহ্নিজন্য দাহ জন্মে না, সুতরাং ঐ মণিসম্বন্ধ "ভূত" অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে দাহ "অভূত" অর্থাৎ অবিদ্যমান হয়। ঐরূপ স্থলে অভূত দাহের জ্ঞান ভূত মণিসম্বন্ধের স্মৃতি জন্মায়। এইরূপ ভূত পদার্থও অভূত পদার্থের বিরোধিলিঙ্গ এবং ভূত পদার্থও ভূত পদার্থের বিরোধি লিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ বিরোধি লিঙ্গের জ্ঞানও স্মৃতিবিশেষের কারণ বলিয়া এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থই "লিঙ্গ," সাংকেতিক চিহ্নবিশেষই "লক্ষণ," সুতরাং "লিঙ্গ" ও "লক্ষণের" বিশেষ আছে। ঐ (৫) "লক্ষণে"র জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। যেমন "বিদ" ও "গর্গ" প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ মুনিবিশেষের পশুর অবয়বস্থ লক্ষণবিশেষ জানিলে তদ্দ্বারা ইহা বিদগোত্রীয়, ইহা গর্গ-গোত্রীয়, ইত্যাদি প্রকারে গোত্রের স্মরণ হয়। (৬) সাদৃশ্যের জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। যেমন চিত্রগত দেবদত্তাদির সাদৃশ্য দেখিলে ইহা দেবদত্তের প্রতিরূপক, ইত্যাদি প্রকারে দেবদত্তাদি ব্যক্তির স্মরণ জন্মে। ধনস্বামী ধন পরিগ্রহ করেন। সেখানে ঐ (৭) পরিগ্রহ-বশতঃ ধনের জ্ঞান হইলে ধনস্বামীর স্মরণ হয়, এবং সেই ধনস্বামীর জ্ঞান হইলে সেই ধনের স্মরণ হয়। নায়ক ব্যক্তি আশ্রয়, তাঁহার অধীন ব্যক্তিগণ তাঁহার আশ্রিত। ঐ (৮) আশ্রয়ের জ্ঞান হইলে আশ্রিতের স্মরণ হয়, এবং সেই (৯) আশ্রিতের জ্ঞান হইলে তাহার আশ্রয়ের স্মরণ হয়। (১০) সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞানপ্রযুক্তও স্মৃতি জন্মে। যেমন শিষ্য দেখিলে গুরুর স্মরণ হয়,—পুরোহিত দেখিলে যজমানের স্মরণ হয়। (১১) আনন্তর্য্যবশতঃ অর্থাৎ আনন্তর্য্যের জ্ঞানজন্য ইতিকর্ত্তব্যবিষয়ে স্মৃতি জন্মে। যথাক্রমে বিহিত কর্ম্মসমূহকে ইতিকর্ত্তব্য বলা যায়। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরণ, তাহার পরে উত্থান, তাহার পরে মূত্রত্যাগ, তাহার পরে শৌচ, তাহার পরে মুখপ্রক্ষালন দন্তধাবনাদি বিহিত আছে। ঐ সকল কর্ম্মের মধ্যে যাহার অনন্তর যাহা বিহিত, সেই কর্ম্মে তৎপূর্ব্বকর্ম্মের আনন্তর্য্য জ্ঞান হইলেই তৎপ্রযুক্ত সেখানে পরকর্ম্মের স্মৃতি জন্মে। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে বিহিত কর্ম্মকলাপকেই ইতিকর্ত্তব্য বলিয়া, ঐ অর্থে "ইতিকরণীয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ঐরূপ কর্ম্মকলাপ বুঝাইতে "করণীয়" শব্দেরও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে "আনন্তর্য্যাদিতি" এই বাক্যে "ইতি" শব্দের কোন সার্থক্য থাকে না। ভাষ্যকার এখানে অন্যত্রও ঐরূপ পঞ্চম্যন্ত বাক্যের পরে "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, সুধীগণ ইহাও লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন। (১২) কাহারও সহিত "বিয়োগ" হইলে সেই বিয়োগের জ্ঞাতা ব্যক্তি তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিয়োগ শব্দের দ্বারা

১। বিরোধ্যভূতং ভূতস্য॥ ভূতমভূতস্য॥ ভূতো ভূতস্য॥ কণাদসূত্র, ৩য় অঃ, ১ম আঃ, ১১।১২।১৩ সূত্র।

এখানে বিয়োগজন্য শোক বিবক্ষিত। শোক হইলে তৎপ্রযুক্ত শোকের বিষয়কে স্মরণ করে। (১৩) বহু কর্ত্তার এক কার্য্য হইলে সেই এককার্য্যপ্রযুক্ত তাহার এক কর্ত্তার দর্শনে অপর কর্ত্তার স্মরণ হয়। (১৪) বিরোধ প্রযুক্ত বিরোধী ব্যক্তিদ্বয়ের একের দর্শনে অপরের স্মরণ হয়। (১৫) অতিশয়প্রযুক্ত যিনি সেই অতিশয়ের উৎপাদক, তাঁহার স্মরণ হয়। যেমন ব্রহ্মচারী তাহার উপনয়নাদিজন্য "অতিশয়" বা উৎকর্ষের উৎপাদক আচার্য্যকে স্মরণ করে। (১৬) প্রাপ্তিবশতঃ যে ব্যক্তি হইতে কেহ কিছু পাইয়াছে, অথবা পাইবে, ঐ ব্যক্তিকে সেই প্রার্থী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (১৭) খড়্গাদির ব্যবধায়ক (আবরক) কোশ প্রভৃতি দেখিলে সেই ব্যবধান (ব্যবধায়ক) কোশ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার জ্ঞানজন্য খড়্গাদির স্মরণ হয়। (১৮) "সুখ" ও (১৯) "দুঃখ"বশতঃ সুখের হেতু ও দুঃখের হেতুকে স্মরণ করে। (২০) "ইচ্ছা" অর্থাৎ স্নেহবশতঃ স্নেহভাজন ব্যক্তিকে স্মরণ করে। (২১) "দ্বেষ"বশতঃ দ্বেষ্য ব্যক্তিকে স্মরণ করে। (২২) "ভয়"বশতঃ যাহা হইতে ভীত হয়, তাহাকে স্মরণ করে। (২৩) "অর্থিত্ব"বশতঃ অর্থী ব্যক্তি তাহার ভোজন বা আচ্ছাদনরূপ অর্থকে (প্রয়োজনকে) স্মরণ করে। (২৪) "ক্রিয়া" শব্দের অর্থ এখানে কার্য্য। রথকারের কার্য্য রথ, সুতরাং রথের দ্বারা রথকারকে স্মরণ করে। (২৫) "রাগ" শব্দের অর্থ এখানে স্ত্রী বিষয়ে অনুরাগ। ঐ "রাগ"বশতঃ যে স্ত্রীতে যে ব্যক্তি অনুরক্ত, তাহাকে ঐ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (২৬) "ধর্ম্ম"বশতঃ অর্থাৎ বেদাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষ-বশতঃ পূর্ব্বজাতির স্মরণ হয় এবং ইহ জন্মেও অধীত ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে। (২৭) "অধর্ম্ম"বশতঃ পূর্ব্বানুভূত দুঃখের সাধনকে স্মরণ করে। জীব দুঃখজনক অধর্ম্ম-জন্য পূর্ব্বানুভূত দুঃখসাধনকে স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি এই সূত্রে "প্রণিধান" হইতে "অধর্ম্ম" পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি স্মৃতি-নিমিত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উন্মাদ প্রভৃতি আরও অনেক স্মৃতিনিমিত্ত আছে। স্মৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক অনন্ত, উহার পরিসংখ্যা করা যায় না। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা মহর্ষির স্মৃতির কতক-গুলি হেতুর নিদর্শন মাত্র, ইহা স্মৃতির সমস্ত হেতুর পরিগণনা নহে। সূত্রকারোক্ত স্মৃতি-নিমিত্তগুলির মধ্যে 'নিবন্ধ' প্রভৃতি যেগুলির জ্ঞানই স্মৃতিবিশেষের কারণ, সেইগুলিকে গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত নিমিত্ত বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, অর্থাৎ কোন স্থলে একই সময়ে পূর্ব্বোক্ত 'নিবন্ধা'দির জ্ঞানরূপ নানা স্মৃতির কারণ সম্ভব হয় না, সুতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। যে সকল স্মৃতিনিমিত্তের জ্ঞান স্মৃতির কারণ নহে অর্থাৎ উহারা নিজেই স্মৃতির কারণ, সেগুলিরও কোন স্থলে যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্যও যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না, ইহাও মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥৪১॥

বুদ্ধ্যাত্মগুণত্বপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। অনিত্যায়াঞ্চ বুদ্ধৌ উৎপন্নাপবর্গিত্বাৎ কালান্তরাবস্থানা-চ্চানিত্যানাং সংশয়ঃ, কিমুৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিঃ শব্দবৎ? আহো স্বিৎ কালান্তরাবস্থায়িনী কুম্ভবদিতি। উৎপন্নাপবর্গিণীতি পক্ষঃ পরিগৃহ্যতে, কস্মাৎ?

অনুবাদ। অনিত্য পদার্থের উৎপন্নাপবর্গিত্ব এবং কালান্তরস্থায়িত্ব প্রযুক্ত অনিত্য বুদ্ধি বিষয়ে সংশয় হয়—বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় উৎপন্নাপবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী? অথবা কুম্ভের ন্যায় কালান্তরস্থায়িনী? উৎপন্নাপবর্গিণী, এই পক্ষ পরিগৃহীত হইতেছে। (প্রশ্ন) কেন?

সূত্র। কর্ম্মানবস্থায়িগ্রহণাৎ ॥৪২॥৩১৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অস্থায়ী কর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়।

ভাষ্য। কর্ম্মণোঽনবস্থায়িনো গ্রহণাদিতি। ক্ষিপ্তস্যেষোরাপতনাৎ ক্রিয়াসন্তানো গৃহ্যতে, প্রত্যর্থনিয়মাচ্চ বুদ্ধীনাং ক্রিয়াসন্তানবদ্‌বুদ্ধি-সন্তানোপপত্তিরিতি। অবস্থিতগ্রহণে চ ব্যবধীয়মানস্য প্রত্যক্ষনিবৃত্তেঃ। অবস্থিতে চ কুম্ভে গৃহ্যমাণে সন্তানেনৈব বুদ্ধির্ব্বর্ত্ততে প্রাগ্‌ব্যবধানাৎ, তেন ব্যবহিতে প্রত্যক্ষং জ্ঞানং নিবর্ত্ততে। কালান্তরাবস্থানে তু বুদ্ধের্দৃশ্যব্যবধানেঽপি প্রত্যক্ষমবতিষ্ঠেতেতি।

স্মৃতিশ্চালিঙ্গং বুদ্ধ্যবস্থানে, সংস্কারস্য বুদ্ধিজস্য স্মৃতিহেতুত্বাৎ। যশ্চ মন্যেতাবতিষ্ঠতে বুদ্ধিঃ, দৃষ্টা হি বুদ্ধিবিষয়ে স্মৃতিঃ, সা চ বুদ্ধা-বনিত্যায়াং কারণাভাবান্ন স্যাদিতি, তদিদমলিঙ্গং, কস্মাৎ? বুদ্ধিজো হি সংস্কারো গুণান্তরং স্মৃতিহেতুর্ন বুদ্ধিরিতি।

হেত্বভাবাদযুক্তমিতি চেৎ? বুদ্ধ্যবস্থানাৎ প্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্যভাবঃ। যাবদবতিষ্ঠতে বুদ্ধিস্তাবদসৌ বোদ্ধব্যার্থঃ প্রত্যক্ষঃ, প্রত্যক্ষত্বে চ স্মৃতি-রনুপপন্নেতি।

অনুবাদ। (সূত্রার্থ) যেহেতু অস্থায়ী কর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় (তাৎপর্য্য) নিঃক্ষিপ্ত বাণের পতন পর্য্যন্ত ক্রিয়াসন্তান অর্থাৎ ঐ বাণে ধারাবাহিক নানা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধিসমূহের প্রতি বিষয়ে নিয়মবশতঃই ক্রিয়াসন্তানের ন্যায় বুদ্ধি-সন্তানের অর্থাৎ সেই ধারাবাহিক নানা ক্রিয়া বিষয়ে ধারাবাহিক নানা জ্ঞানের

উপপত্তি হয়। পরন্তু যেহেতু অবস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষ স্থলেও ব্যবধীয়মান বস্তুর প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, অবস্থিত কুম্ভ প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও ব্যবধানের পূর্ব্বে অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা ঐ কুম্ভের আবরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সন্তান-রূপেই অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপেই বুদ্ধি (ঐ প্রত্যক্ষ) বর্ত্তমান হয় অর্থাৎ জন্মে, সুতরাং ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ ঐ কুম্ভ আবৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধির কালান্তরে অবস্থান অর্থাৎ চিরস্থায়িত্ব হইলে দৃশ্যের ব্যবধান হইলেও প্রত্যক্ষ (পূর্ব্বোৎপন্ন কুম্ভপ্রত্যক্ষ) অবস্থিত হউক ?

স্মৃতি কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত্বে লিঙ্গ (সাধক) নহে ; কারণ, বুদ্ধিজন্য সংস্কারের স্মৃতিহেতুত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) যিনি মনে করেন, বুদ্ধি অবস্থিত অর্থাৎ স্থায়ী পদার্থ, যেহেতু বুদ্ধির বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ে স্মৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি অনিত্য হইলে কারণের অভাববশতঃ সেই স্মৃতি হইতে পারে না। (উত্তর) সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতু (বুদ্ধির স্থায়িত্বে) লিঙ্গ হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু বুদ্ধিজন্য সংস্কাররূপ গুণান্তর স্মৃতির কারণ, বুদ্ধি (স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ) নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা যদি বল ? (উত্তর) বুদ্ধির স্থায়িত্ববশতঃ প্রত্যক্ষত্ব থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না। বিশদার্থ এই যে, যে কাল পর্য্যন্ত বুদ্ধি অবস্থিত থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত এই বোদ্ধব্য পদার্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষ-বুদ্ধিরই বিষয় হয়, প্রত্যক্ষতা থাকিলে কিন্তু স্মৃতি উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই গুণ এবং উহা অনিত্য পদার্থ, ইহা মহর্ষি নানা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বুদ্ধি অনিত্য, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশ সূত্রে ঐ বুদ্ধি যে অন্য বুদ্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয়, ইহাও মহর্ষি বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধি যে, শব্দের ন্যায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, আরও অধিককাল স্থায়ী হয় না, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি কথিত হয় নাই। সুতরাং সংশয় হইতে পারে যে, বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয় ? অথবা কুম্ভের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী হয় ? মহর্ষি এই সংশয় নিরাস করিতে এই প্রকরণের আরম্ভে এই সূত্রের দ্বারা বুদ্ধি যে, কুম্ভের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু শব্দের ন্যায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে পরীক্ষাঙ্গ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধি কি শব্দের ন্যায় উৎপন্নাপবর্গিণী ? অথবা কুম্ভের ন্যায় কালান্তরস্থায়িনী ? "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা নিবৃত্তি বা বিনাশ বুঝিলে "অপবর্গী" বলিলে বিনাশী বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং যাহা উৎপন্ন হইয়াই বিনাশী,

তাহাকে "উৎপন্নাপবর্গী" বলা যাইতে পারে। কিন্তু গৌতম সিদ্ধান্তে বুদ্ধি অনিত্য হইলেও উহা উৎপন্ন হইয়াই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অন্যান্য বিনাশী পদার্থ হইতেও যাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ইহাই "উৎপন্নাপবর্গী" এই কথার অর্থ। যাহা উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, ইহা ঐ কথার অর্থ নহে। উদ্দ্যোতকর এই কথা বলিয়া পরে বুদ্ধির আশুতর বিনাশিত্ব বিষয়ে দুইটি অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম অনুমানে শব্দ এবং দ্বিতীয় অনুমানে সুখকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া, উদ্দ্যোতকর বুদ্ধিকে তৃতীয়ক্ষণবিনাশী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু নৈয়ায়িকগণ শব্দ ও সুখাদি আত্মগুণকে তৃতীয়ক্ষণবিনাশী, এই অর্থেই ক্ষণিক বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও এই বিচারের উপসংহারে (পরবর্তী ৪৫শ সূত্র-বার্ত্তিকের শেষে) "ব্যবস্থিতং ক্ষণিকা বুদ্ধিরিতি" এই কথা বলিয়া, বুদ্ধি যে তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই যে ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যায়, যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণমাত্রে অবস্থান করিয়া, তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, সেই পদার্থকেই ঐরূপ অর্থে "উৎপন্নাপবর্গী" বলা হইয়াছে। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান ঐরূপ পদার্থ। "অপেক্ষাবুদ্ধি" নামক বুদ্ধিবিশেষ চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হয়, ইহা নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন[১]। সুতরাং চতুর্থক্ষণবিনাশী, এই অর্থে ঐ বুদ্ধিবিশেষকে "উৎপন্নাপবর্গী" বলিতে হইবে। কিন্তু কোন বুদ্ধি তৃতীয় ক্ষণের পরে থাকে না, এবং অপেক্ষা-বুদ্ধি ভিন্ন সমস্ত জন্য জ্ঞানই শব্দ ও সুখদুঃখাদির ন্যায় তৃতীয়ক্ষণবিনাশী, ইহা ন্যায়াচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

বুদ্ধির পূর্ব্বোক্তরূপ "উৎপন্নাপবর্গিত্ব" সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই সূত্রে মহর্ষি যে যুক্তির সূচনা করিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যাপূর্ব্বক তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যে কাল পর্য্যন্ত ঐ বাণটি কোন স্থানে পতিত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ বাণে যে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয়, উহা একটি ক্রিয়া নহে। ঐ ক্রিয়া বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ উৎপন্ন করে, সুতরাং উহাকে বিভিন্ন কালে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন নানা ক্রিয়াই বলিতে হইবে। ঐরূপ নানা ক্রিয়াকেই "ক্রিয়াসন্তান" বলে। ঐ ক্রিয়াসন্তানের অন্তর্গত কোন ক্রিয়াই অধিকক্ষণস্থায়ী নহে, এবং এক ক্রিয়ার বিনাশ হইলেই অপর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসন্তানের নানাত্ব ও অস্থায়িত্ব স্বীকার্য্য হইলে ঐ ক্রিয়াসন্তানের যে প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি জন্মে, ঐ বুদ্ধিও নানা ও অস্থায়ী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, জন্য বুদ্ধিমাত্রই "প্রত্যর্থনিয়ত" অর্থাৎ যে পদার্থ যে বুদ্ধির নিয়ত বিষয় হয়, তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ ঐ বুদ্ধির বিষয় হয় না। নিঃক্ষিপ্ত বাণের ক্রিয়াগুলি যখন ক্রমশঃ নানা কালে বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হয়, এবং উহার প্রত্যেক ক্রিয়াই

১। দ্রব্যের গণনা করিতে "ইহা এক" "ইহা এক" ইত্যাদি প্রকারে যে বুদ্ধিবিশেষ জন্মে, তাহার নাম "অপেক্ষাবুদ্ধি।" ঐ অপেক্ষাবুদ্ধি দ্রব্যে দ্বিত্বাদি সংখ্যা উৎপন্ন করে এবং উহার নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যার নাশ হয়। সুতরাং ঐ বুদ্ধি তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইলে পরক্ষণে দ্বিত্বাদি সংখ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় দ্বিত্বাদি সংখ্যার প্রত্যক্ষ কোন দিনই সম্ভব হয় না, এ জন্য তৃতীয় ক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা বুদ্ধির সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে।

অস্থায়ী, তখন ঐ সমস্ত ক্রিয়াই একটী স্থায়ী প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। সুতরাং বাণের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ক্রিয়াসমূহ একটি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। পরন্তু ঐ ক্রিয়া বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মিলে তখন যে সমস্ত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া ঐ প্রত্যক্ষ-বুদ্ধির বিষয় হয় নাই, পরেও তাহা ঐ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। কারণ, জন্য বুদ্ধি মাত্রই "প্রত্যর্থনিয়ত"। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে নিঃক্ষিপ্ত বাণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াসন্তান বিষয়ে যে, প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি জন্মে,উহা ঐ সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়াবিষয়ক বিভিন্ন বুদ্ধি, বহুকালস্থায়ী একটি বুদ্ধি নহে। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমশঃ উৎপন্ন ঐ বুদ্ধির সমষ্টিকে বুদ্ধিসন্তান বলা যায়। উহার অন্তর্গত কোন বুদ্ধিই বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, অনবস্থায়ী (অস্থায়ী) কর্ম্মের (ক্রিয়ার) প্রত্যক্ষরূপ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিও ঐ কর্ম্মের ন্যায় অস্থায়ী ও বিভিন্নই হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঐ ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির শীঘ্রতর বিনাশিত্বই সিদ্ধ হওয়ায় ঐ বুদ্ধির নাশক বলিতে হইবে। বুদ্ধির সমবায়িকারণ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ অসম্ভব, সুতরাং আত্মার নাশকে বুদ্ধির নাশক বলা যাইবে না, বুদ্ধির বিরোধী গুণকেই উহার নাশক বলিতে হইবে। মহর্ষি গোতমও পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশ সূত্রে এই সিদ্ধান্তের সূচনা করিতে অপর বুদ্ধিকেই বুদ্ধির বিনাশের কারণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন বুদ্ধির পরক্ষণে সুখাদি গুণবিশেষ উৎপন্ন হইলে উহাও পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন সেই বুদ্ধিকে তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট করে। তুল্যন্যায়ে এবং মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তানুসারে ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। ফলকথা, বুদ্ধির দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন অন্য বুদ্ধি অথবা ঐরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য কোন আত্ম-বিশেষগুণ (সুখাদি) ঐ পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন বুদ্ধির নাশক, ইহাই বলিতে হইবে। অপেক্ষাবুদ্ধি ভিন্ন জন্য জ্ঞানমাত্রের বিনাশের কারণ কল্পনা করিতে হইলে আর কোনরূপ কল্পনাই সমীচীন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন বিনাশকারণ কল্পনা পক্ষে নিষ্প্রমাণ মহাগৌরব গ্রাহ্য নহে। পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্ব (অপেক্ষাবুদ্ধির চতুর্থক্ষণবিনাশিত্ব) সিদ্ধ হইলে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ উৎপন্নাপবর্গিত্বই সিদ্ধ হয়, সুতরাং বুদ্ধিবিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়।

আপত্তি হইতে পারে যে, অস্থায়ী নানা ক্রিয়াবিষয়ে যে প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি জন্মে, তাহার অস্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও স্থায়ী পদার্থ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ বুদ্ধি জন্মে, তাহার স্থায়িত্বই স্বীকার্য্য। অবস্থিত কোন একটি কুম্ভকে অবিচ্ছেদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিলে ঐ প্রত্যক্ষ অনেকক্ষণস্থায়ী একই প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকার করা উচিত। কারণ, ঐরূপ প্রত্যক্ষের নানাত্ব ও অস্থায়িত্ব স্বীকারের পক্ষে কোন হেতু নাই। এতদুত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, অবস্থিত কুম্ভের ঐরূপ প্রত্যক্ষস্থলেও ঐ কুম্ভের ব্যবধানের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিসন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক নানা প্রত্যক্ষই জন্মে, অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষও সেই স্থলে একটি প্রত্যক্ষ নহে, উহাও পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া-প্রত্যক্ষের ন্যায় নানা, সুতরাং অস্থায়ী। কারণ, ঐ কুম্ভ কোন দ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত বা আবৃত হইলে তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে না,—ব্যবহিত হইলে উহার প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যদি অবস্থিত অর্থাৎ বহুক্ষণস্থায়ী কুম্ভাদি পদার্থের প্রত্যক্ষকে ঐ কুম্ভাদির ন্যায় স্থায়ী একটি

প্রত্যক্ষই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ কুম্ভাদি পদার্থের স্থিতিকাল পর্য্যন্তই সেই প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ঐ কুম্ভাদি পদার্থ ব্যবহিত হইলেও তখনও সেই প্রত্যক্ষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে তখনও "আমি কুম্ভের প্রত্যক্ষ করিতেছি" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু তাহা কাহারই হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে কুম্ভাদি স্থায়ী পদার্থের ঐরূপ প্রত্যক্ষও স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষ বলা যায় না, উহাও ধারাবাহিক নানা প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের যুক্তির খণ্ডন করিতে বলা যাইতে পারে যে, অবস্থিত কুম্ভাদি দ্রব্য ব্যবহিত হইলে তখন ব্যবধানজন্য তাহাতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ বিনষ্ট হওয়ায় কারণের অভাবে আর তখন ঐ কুম্ভাদির প্রত্যক্ষ জন্মে না। পরন্তু ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষরূপ নিমিত্তকারণের বিনাশে ঐ স্থলে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের বিনাশ হয়। স্থলবিশেষে (অপেক্ষাবুদ্ধির নাশজন্য দ্বিত্ব নাশের ন্যায়) নিমিত্ত কারণের বিনাশেও কার্য্যের নাশ হইয়া থাকে। ফলকথা, অবস্থিত কুম্ভাদি পদার্থ বিষয়ে ব্যবধানের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষই স্বীকার্য্য, ঐ প্রত্যক্ষের নানাত্ব স্বীকারের কোন কারণ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে এই কথার উল্লেখ-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, জন্য বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব অন্য হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হওয়ায় ভাষ্যকার শেষে গৌণভাবেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ক্ষণবিনাশি ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সমর্থনের দ্বারাই স্থায়ি-কুম্ভাদিপদার্থবিষয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সমর্থনও সূচিত হইয়াছে[১]। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির দৃষ্টান্তে স্থায়ি-পদার্থবিষয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্বও অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কুম্ভাদি স্থায়ি-পদার্থবিষয়ক বুদ্ধির স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে ঐ বুদ্ধি কোন্ সময়ে কোন্ কারণদ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং কত কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, ইহা নিয়তরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না,—ঐ বুদ্ধির বিনাশে কোন নিয়ত কারণ বলা যায় না। দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য গুণবিশেষকে ঐ বুদ্ধির বিনাশের কারণ বলিলেই উহার নিয়ত কারণ বলা যায়। সুতরাং অপেক্ষা-বুদ্ধি ভিন্ন জন্য বুদ্ধিমাত্রের বিনাশে দ্বিতীয় ক্ষণোৎপন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন গুণবিশেষকেই কারণ বলা উচিত। তাহা হইলে ঐ বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হয়।

বুদ্ধির স্থায়িত্ববাদীর কথা এই যে, বুদ্ধি ক্ষণিক পদার্থ হইলে ঐ বুদ্ধির বিষয় পদার্থের কালান্তরে স্মরণ জন্মিতে পারে না। কারণ, স্মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধি না থাকিলে তাহা ঐ স্মরণের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং কারণের অভাবে স্মরণ জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে এই কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, স্মৃতি বুদ্ধির স্থায়িত্বের লিঙ্গ অর্থাৎ সাধক নহে। কারণ, বুদ্ধিজন্য সংস্কার ক্ষণিক পদার্থ নহে, উহা স্মরণকাল পর্য্যন্ত থাকে, উহাই স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ। প্রণিধানাদি কারণসাপেক্ষ সংস্কারজন্যই স্মৃতি জন্মে। বুদ্ধি ঐ সংস্কার জন্মায়, কিন্তু উহা স্মৃতির কর্ত্রীও নহে, অন্য কোন জ্ঞানের কর্ত্রীও নহে। আত্মাই সর্ব্ববিধ জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা। আত্মার চিরস্থায়িত্ববশতঃ স্মরণ-জ্ঞানের কর্ত্তার অভাব কখনই হয় না। ফলকথা, বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে স্মৃতির অনুপপত্তি

১। তথাহি ক্ষণবিধ্বংসিবস্তুবিষয়বুদ্ধিক্ষণিকত্বসমর্থনেনৈব স্থায়িবস্তুবিষয়বুদ্ধিক্ষণিকত্ব-সমর্থনমপি সূচিতং। স্থিরগোচরা বুদ্ধয়ঃ ক্ষণিকাঃ বুদ্ধিত্বাৎ কর্ম্মাদিবুদ্ধিবদিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

নাই। সুতরাং স্মৃতি, বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধনে লিঙ্গ হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, সংস্কারজন্যই স্মৃতি জন্মে, স্থায়ি-বুদ্ধিজন্যই স্মৃতি জন্মে না, এই সিদ্ধান্তে হেতু কি? উহার নিশ্চায়ক হেতু না থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অযুক্ত। ভাষ্যকার শেষে এই পূর্ব্বপক্ষেরও উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি স্থায়ী পদার্থ হইলে যে কাল পর্য্যন্ত বুদ্ধি থাকে, প্রত্যক্ষস্থলে তৎকাল পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধির বিষয় পদার্থ প্রত্যক্ষই থাকে, সুতরাং সেই পদার্থের স্মৃতি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই তখন তাহার বিষয়ের স্মৃতি হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই প্রত্যক্ষ তাহার বিষয়ের স্মৃতির বিরোধী থাকায় ঐ স্মৃতি কিছুতেই হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানকালে কোন ব্যক্তিরই সেই বিষয়ের স্মরণ হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য। সুতরাং প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান স্মৃতির বিরোধী, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান স্মৃতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না, উহা স্মৃতির পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য সংস্কারই স্মৃতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া স্মৃতি জন্মায়, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য॥ ৪২॥

সূত্র। অব্যক্তগ্রহণমনবস্থায়িত্বাদ্বিদ্যুৎসম্পাতে রূপাব্যক্তগ্রহণবৎ ॥ ৪৩ ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অনবস্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ববশতঃ বিদ্যুৎ-প্রকাশে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ন্যায় (সর্ব্ববিষয়েরই) অব্যক্ত জ্ঞান হউক?

ভাষ্য। যদ্যুৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিঃ, প্রাপ্তমব্যক্তং বোদ্ধব্যস্য গ্রহণং, যথা বিদ্যুৎসম্পাতে বৈদ্যুতস্য প্রকাশস্যানবস্থানাদব্যক্তং রূপগ্রহণমিতি ব্যক্তন্তু দ্রব্যাণাং গ্রহণং, তস্মাদযুক্তমেতদিতি।

অনুবাদ। বুদ্ধি যদি উৎপন্নাপবর্গিণী (তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী) হয়, তাহা হইলে বোদ্ধব্য বিষয়ের অব্যক্ত গ্রহণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অস্পষ্ট জ্ঞানের আপত্তি হয়। যেমন বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে বৈদ্যুত আলোকের অনবস্থানবশতঃ অব্যক্ত রূপ-জ্ঞান হয়। কিন্তু দ্রব্যের ব্যক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে বুদ্ধির স্থায়িত্ববাদীর আপত্তি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি যদি তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণ পর্য্যন্তই অবস্থান করে, তাহা হইলে বোদ্ধব্য বিষয়ের ব্যক্ত জ্ঞান হইতে পারে না। যেমন বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে বৈদ্যুত আলোকের অস্থায়িত্ববশতঃ তখন ঐ অস্থায়ী আলোকের সাহায্যে রূপের অব্যক্ত জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়েরই অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হয়, কুত্রাপি কোন বিষয়ের ব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু দ্রব্যের স্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের স্থায়িত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত অযুক্ত॥ ৪৩॥

সূত্র। হেতূপাদানাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাভ্যনুজ্ঞা ॥৪৪॥৩১৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) হেতুর গ্রহণবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধন করিতে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তরূপ সাধকের গ্রহণবশতঃই প্রতিষেধ্য বিষয়ের (বুদ্ধির ক্ষণিকত্বের) স্বীকার হইতেছে।

ভাষ্য উৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিরিতি প্রতিষেদ্ধব্যং, তদেবাভ্যনুজ্ঞায়তে, বিদ্যুৎসম্পাতে রূপাব্যক্তগ্রহণবদিতি

অনুবাদ। বুদ্ধি উৎপন্নাপবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণেই বুদ্ধির বিনাশ হয়, ইহা প্রতিষেধ্য, "বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ন্যায়" এই কথার দ্বারা তাহাই স্বীকৃত হইতেছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব খণ্ডন করিতে যদি উহা স্বীকারই করিতে হয়, তাহা হইলে আর সেই হেতুর দ্বারা বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব খণ্ডন করা যায় না। প্রকৃত স্থলে বুদ্ধির স্থায়িত্ববাদী বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব পক্ষে সর্ব্বত্র বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্পষ্ট জ্ঞানের আপত্তি করিতে বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে রূপের অস্পষ্ট জ্ঞানকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বিদ্যুতের আবির্ভাবস্থলে রূপের যে অস্পষ্ট জ্ঞান, তাহার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করাই হইতেছে। কারণ, ঐ স্থলে রূপজ্ঞান অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে উহা অস্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং ঐ জ্ঞান যে ক্ষণিক, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বুদ্ধির স্থায়িত্ববাদীর যাহা প্রতিষেধ্য অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব, তাহা তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্তে (বিদ্যুতের আবির্ভাবকালে রূপের অস্পষ্ট জ্ঞানে) স্বীকৃতই হওয়ায় তিনি উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। বুদ্ধিমাত্রের স্থায়িত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদ্যুতের আবির্ভাবকালীন বুদ্ধিবিশেষের অস্থায়িত্ব বা ক্ষণিকত্বের স্বীকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয়॥ ৪৪ ॥

ভাষ্য। যত্রাব্যক্তগ্রহণং তত্রোৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিরিতি। গ্রহণহেতু-বিকল্পাদ্‌গ্রহণবিকল্পো ন বুদ্ধিবিকল্পাৎ। যদিদং ক্বচিদব্যক্তং ক্বচিদ্‌ব্যক্তং গ্রহণময়ং বিকল্পো গ্রহণহেতুবিকল্পাৎ, যত্রানবস্থিতো গ্রহণহেতু-স্তত্রাব্যক্তং গ্রহণং, যত্রাবস্থিতস্তত্র ব্যক্তং, নতু বুদ্ধেরবস্থানানবস্থানাভ্যা-মিতি। কস্মাৎ? অর্থগ্রহণং হি বুদ্ধিঃ যত্তদর্থগ্রহণমব্যক্তং ব্যক্তং বা বুদ্ধিঃ সেতি। বিশেষাগ্রহণে চ সামান্যগ্রহণমাত্রমব্যক্তগ্রহণং, তত্র বিষয়ান্তরে বুদ্ধ্যন্তরানুৎপত্তির্নিমিত্তাভাবাৎ। যত্র সমানধর্ম্মযুক্তশ্চ ধর্ম্মী গৃহ্যতে বিশেষ-

ধর্ম্মযুক্তশ্চ, তদ্ব্যক্তং গ্রহণং। যত্র তু বিশেষেঽগৃহ্যমাণে সামান্যগ্রহণমাত্রং, তদব্যক্তং গ্রহণং। সমানধর্ম্মযোগাচ্চ বিশিষ্টধর্ম্মযোগো বিষয়ান্তরং, তত্র যদ্গ্রহণং ন ভবতি তদ্গ্রহণনিমিত্তাভাবান্ন বুদ্ধেরনবস্থানাদিতি। **যথাবিষয়ঞ্চ গ্রহণং ব্যক্তমেব প্রত্যর্থনিয়তত্বাচ্চ বুদ্ধীনাং।** সামান্যবিষয়ঞ্চ গ্রহণং স্ববিষয়ং প্রতি ব্যক্তং, বিশেষবিষয়ঞ্চ গ্রহণং স্ববিষয়ং প্রতি ব্যক্তং, প্রত্যর্থনিয়তা হি বুদ্ধয়ঃ। তদিদমব্যক্তগ্রহণং দেশিতং ক বিষয়ে বুদ্ধ্যনবস্থানকারিতং স্যাদিতি। **ধর্ম্মিণস্তু ধর্ম্মভেদে বুদ্ধিনানাত্বস্য ভাবাভাবাভ্যাং তদুপপত্তিঃ।** ধর্ম্মিণঃ খল্বর্থস্য সমানাশ্চ ধর্ম্মা বিশিষ্টাশ্চ, তেষু প্রত্যর্থনিয়তা নানাবুদ্ধয়ঃ, তা উভয্যো যদি ধর্ম্মিণি বর্ত্তন্তে, তদা ব্যক্তং গ্রহণং ধর্ম্মিণমভিপ্রেত্য। যদা তু সামান্যগ্রহণমাত্রং তদাঽব্যক্তং গ্রহণমিতি। এবং ধর্ম্মিণমভিপ্রেত্য ব্যক্তাব্যক্তয়োর্গ্রহণয়োরুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যে স্থলে অব্যক্ত জ্ঞান হয়, সেই স্থলে বুদ্ধি উৎপন্নাপবর্গিণী, অর্থাৎ সেই স্থলেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার্য্য। (উত্তর) গ্রহণের হেতুর বিকল্প(ভেদ)বশতঃ গ্রহণের বিকল্প হয়,—বুদ্ধির বিকল্পবশতঃ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও ক্ষণিকত্বপ্রযুক্তই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে গ্রহণের বিকল্প হয় না। (বিশদার্থ) এই যে, কোন স্থলে অব্যক্ত ও কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই বিকল্প গ্রহণের হেতুর বিকল্পবশতঃ যে স্থলে গ্রহণের হেতু অস্থায়ী, সেই স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, যে স্থলে গ্রহণের হেতু স্থায়ী, সেই স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অর্থের গ্রহণই বুদ্ধি, সেই যে অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত অর্থ গ্রহণ, তাহা বুদ্ধি। কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞান থাকিলে সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞানমাত্র অব্যক্ত গ্রহণ, সেই স্থলে নিমিত্তের অভাববশতঃ বিষয়ান্তরে জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয় না। যে স্থলে সমানধর্ম্মযুক্ত এবং বিশিষ্টধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মী গৃহীত হয়, তাহা অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান ব্যক্ত গ্রহণ। কিন্তু যে স্থলে বিশেষ ধর্ম্ম অগৃহ্যমাণ থাকিলে সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান মাত্র হয়, তাহা অব্যক্ত গ্রহণ। সমানধর্ম্মবত্তা হইতে বিশিষ্টধর্ম্মবত্তা বিষয়ান্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয়, সেই বিষয়ে অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপ বিষয়ান্তরে যে জ্ঞান হয় না, তাহা জ্ঞানের নিমিত্তের অভাবপ্রযুক্ত, বুদ্ধির অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত নহে।

পরন্তু বুদ্ধিসমূহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ জ্ঞান যথাবিষয় ব্যক্তই হয়, বিশদার্থ এই যে,—সামান্য ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান নিজের বিষয়-বিষয়ে ব্যক্ত, বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানও নিজের বিষয়বিষয়ে ব্যক্ত,—যেহেতু বুদ্ধিসমূহ প্রত্যর্থনিয়ত (অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান মাত্রেরই বিষয় নিয়ম আছে, যে বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানে অতিরিক্ত আর কোন পদার্থ বিষয় হয় না)। সুতরাং বুদ্ধির অস্থায়িত্ব-প্রযুক্ত "দেশিত" অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয়ীভূত এই অব্যক্ত গ্রহণ কোন্ বিষয়ে হইবে ? [অর্থাৎ সর্ব্বত্র নিজবিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধি ক্ষণিক হইলেও কোন বিষয়ে অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হইতে পারে না]।

কিন্তু ধর্ম্মীর ধর্ম্মভেদ বিষয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধির নানাত্বের (নানা বুদ্ধির) সত্তা ও অসত্তাবশতঃ সেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, ধর্ম্মী পদার্থেরই অর্থাৎ এক ধর্ম্মীরই বহু সমান ধর্ম্ম ও বহু বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যর্থ-নিয়ত নানা বুদ্ধি জন্মে, সেই উভয় বুদ্ধি অর্থাৎ সমানধর্ম্মবিষয়ক ও বিশিষ্টধর্ম্মবিষয়ক নানা জ্ঞান যদি ধর্ম্মিবিষয়ে থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মীকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যক্ত জ্ঞান হয়। কিন্তু যে সময়ে সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞানমাত্র হয়, সেই সময়ে অব্যক্ত জ্ঞান হয়। এইরূপে ধর্ম্মীকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়।

টিপ্পনী। বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুর অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি সমর্থন করিতে যে দৃষ্টান্তকে সাধকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব—যাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ্য, তাহা স্বীকৃতই হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যে স্থলে অব্যক্তগ্রহণ উভয়বাদিসম্মত, সেই স্থলেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিব। বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে তখন রূপের যে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তদ্দ্বারা ঐ রূপ স্থলেই ঐ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হয় না, পরন্তু ব্যক্ত গ্রহণই অনুভবসিদ্ধ, সেই স্থলে বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকারের কোন যুক্তি নাই। পরন্তু বুদ্ধিমাত্রই ক্ষণিক হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্ব বিষয়েরই অব্যক্ত গ্রহণ হয়। বিদ্যুতের আবির্ভাবস্থলে রূপের অব্যক্ত গ্রহণ হইতে মধ্যাহ্নকালে ঘটাদি স্থায়ী পদার্থের চাক্ষুষ গ্রহণের কোন বিশেষ থাকিতে পারে না। ভাষ্যকার সূত্রকারের কথার ব্যাখ্যা করিয়া শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথার উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ এবং কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয় ; এই যে গ্রহণ-বিকল্প, ইহা গ্রহণের হেতুর বিকল্পবশতঃই হইয়া থাকে। অর্থাৎ গ্রহণের হেতু অস্থায়ী হইলে সেখানে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এবং গ্রহণের হেতু স্থায়ী হইলে সেখানে ব্যক্ত গ্রহণ হয়। বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে তখন ঐ বিদ্যুতের আলোক, যাহা

রূপ গ্রহণের হেতু অর্থাৎ সহকারী কারণ, তাহা স্থায়ী না হওয়ায় তাহার অভাবে পরে আর রূপের গ্রহণ হইতে পারে না। ঐ আলোক অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হওয়ায় অল্পক্ষণেই রূপের গ্রহণ হয়, এ জন্য উহার ব্যক্ত গ্রহণ হইতে পারে না, অব্যক্ত গ্রহণই হইয়া থাকে। ঐ স্থলে বুদ্ধি বা জ্ঞানের ক্ষণিকত্ববশতঃই যে রূপের অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে। এইরূপ মধ্যাহ্নকালে স্থায়ী ঘটাদি পদার্থের যে চাক্ষুষ গ্রহণ হয়, তাহা ঐ গ্রহণের কারণের স্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ সেখানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আলোকাদি কারণের সত্তাবশতঃ ব্যক্ত গ্রহণই হইয়া থাকে। সেখানে বুদ্ধির স্থায়িত্ববশতঃই যে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিবার জন্য পরে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত অর্থ-গ্রহণই বুদ্ধি পদার্থ। যে স্থানে বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না, কেবল সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞানকেই অব্যক্ত গ্রহণ বলে। সামান্য ধর্ম্ম হইতে বিশেষ ধর্ম্ম বিষয়ান্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয় ; সুতরাং উহার বোধের কারণও ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিশেষ ধর্ম্ম জ্ঞানের কারণের অভাবেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু যে স্থলে সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানের কারণ থাকে, সেখানে সেই সামান্য ধর্ম্মযুক্ত ও বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মীর জ্ঞান হওয়ায় সেই জ্ঞানকে ব্যক্ত গ্রহণ বলে। ফলকথা, বুদ্ধির অস্থায়িত্ববশতঃই যে বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান জন্মে না, তাহা নহে। বস্তুর বিশেষধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের কারণ না থাকাতেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং সেখানে ব্যক্তজ্ঞান জন্মিতে পারে না। মূলকথা, ব্যক্তজ্ঞান ও অব্যক্তজ্ঞানের পূর্ব্বোক্তরূপে উপপত্তি হওয়ায় উহার দ্বারা স্থলবিশেষে বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও স্থলবিশেষে বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমে এইরূপে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার খণ্ডন করিয়া পরে বাস্তব তত্ত্ব বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই সর্ব্ববস্তুর গ্রহণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যক্তই হয়, অব্যক্ত গ্রহণ কুত্রাপি হয় না। কারণ, বুদ্ধি বা জ্ঞানসমূহ প্রত্যর্থ-নিয়ত। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেরই বিষয়-নিয়ম আছে। যে বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয় ভিন্ন আর কোন বস্তু সেই জ্ঞানের বিষয় হয় না। সামান্য ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান হইলে সামান্য ধর্ম্মই তাহার বিষয় হয়, বিশেষ ধর্ম্ম উহার বিষয়ই নহে। সুতরাং ঐ জ্ঞান ঐ সামান্য ধর্ম্মরূপ নিজ বিষয়ে ব্যক্তই হয়, তদ্বিষয়ে উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বলা যায় না। বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে তখন যে সামান্যতঃ রূপের জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানও নিজবিষয়ে ব্যক্তই হয়। ঐ স্থলে রূপের বিশেষ ধর্ম্ম ঐ জ্ঞানের বিষয়ই নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে ঐ জ্ঞান না জন্মিলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বলা যায় না। এইরূপ বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানও নিজ বিষয়ে ব্যক্তই হয়। ঐ জ্ঞানে সেই ধর্ম্মীর অন্যান্য ধর্ম্ম বিষয় না হইলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বলা যায় না। ফলকথা, সর্ব্বত্র সমস্ত জ্ঞানই স্ব স্ব বিষয়ে ব্যক্তই হয়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে সর্ব্বত্র যে অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি করিয়াছেন, তাহা কোন্ বিষয়ে হইবে ? তাৎপর্য্য এই যে, যখন সমস্ত জ্ঞান তাহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হয়, তখন জ্ঞান ক্ষণিক পদার্থ হইলেও কোন বিষয়েই অব্যক্ত জ্ঞান বলা যায় না। অব্যক্ত জ্ঞান অলীক, সুতরাং উহার আপত্তিই হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞান লোক-

প্রসিদ্ধ আছে। জ্ঞানমাত্রই ব্যক্ত জ্ঞান হইলে অব্যক্ত জ্ঞান বলিয়া যে লোকব্যবহার আছে, তাহার উপপত্তি হয় না। এতদুত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মী পদার্থের সামান্য ও বিশেষ বহু ধর্ম্ম আছে। ঐ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নানা বুদ্ধির সত্তা ও অসত্তাবশতঃই ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়। অর্থাৎ একই ধর্ম্মীর যে বহু সামান্য ধর্ম্ম ও বহু বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তদ্বিষয়ে নানা বুদ্ধি জন্মে। যেখানে কোন এক ধর্ম্মীর সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ক উভয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঐ উভয় ধর্ম্মবিষয়ক নানা বুদ্ধি জন্মে, সেখানে ঐ ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া তদ্বিষয়ে উৎপন্ন ঐ জ্ঞানকে ব্যক্ত জ্ঞান বলে। কিন্তু যেখানে কেবল ঐ ধর্ম্মীর সামান্য ধর্ম্মমাত্রের জ্ঞান হয়, সেখানে ঐ জ্ঞানকে অব্যক্ত জ্ঞান বলে। সেখানে ঐ জ্ঞান তাহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞান হইলেও সেই ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া উহার নানা সামান্যধর্ম্মবিষয়ক ও নানা বিশেষধর্ম্মবিষয়ক নানা জ্ঞান ঐ স্থলে উৎপন্ন না হওয়ায় ঐ জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তগ্রহণ হইতে বিপরীত। এ জন্যই ঐ জ্ঞানকে অব্যক্ত গ্রহণ বলে। এইরূপেই ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্তগ্রহণের ব্যবহার হয়॥ ৪৪॥

ভাষ্য। ন চেদমব্যক্তং গ্রহণং বুদ্ধের্ব্বোদ্ধব্যস্য বাঽনবস্থায়িত্বাদুপপদ্যত ইতি। ইদং হি—

সূত্র। ন প্রদীপার্চ্চিঃসন্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবত্তদ্‌গ্রহণং॥ ৪৫॥ ৩১৬॥*

অনুবাদ। পরন্তু বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্থায়িত্বশতঃ এই অব্যক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। যে হেতু এই অব্যক্ত গ্রহণ নাই, প্রদীপের শিখার সন্ততির অর্থাৎ ধারাবাহিক ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপশিখার অভিব্যক্ত গ্রহণের ন্যায় সেই বোদ্ধব্য বিষয়সমূহের গ্রহণ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে।

ভাষ্য। অনবস্থায়িত্বেঽপি বুদ্ধেস্তেষাং দ্রব্যাণাং গ্রহণং ব্যক্তং প্রতিপত্তব্যং। কথং? "প্রদীপার্চ্চিঃসন্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবৎ", প্রদীপার্চ্চিষাং

* "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" "ন প্রদীপার্চ্চিষঃ" ইত্যাদি সূত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ এই সূত্রের প্রথমে নঞ্ শব্দ গ্রহণ না করিলেও 'নঞ্' শব্দযুক্ত সূত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয় অব্যক্ত গ্রহণের প্রতিষেধ করিতেই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৪৩শ সূত্র হইতে "অব্যক্তগ্রহণং" এই বাক্যের অনুবৃত্তি এই সূত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত। নব্য ব্যাখ্যাকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও এখানে "নঞ্" শব্দযুক্ত সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়া "নাব্যক্তগ্রহণং" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে "ইদম্" শব্দের দ্বারা তাহার পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত গ্রহণকেই গ্রহণ করিয়া "নঞ্" শব্দযুক্ত সূত্রেরই অবতারণা করিয়াছেন বুঝা যায়। ভাষ্যকারের ঐ "ইদম্" শব্দের সহিত সূত্রের প্রথমস্থ "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "প্রদীপার্চ্চিষঃ" এইরূপ পাঠ ভাষ্যসম্মত বুঝা যায় না।

সন্তত্যা বর্ত্তমানানাং গ্রহণানবস্থানং গ্রাহ্যানবস্থানঞ্চ, প্রত্যর্থনিয়তত্বাদ্‌-বুদ্ধীনাং, যাবন্তি প্রদীপার্চ্চীংষি তাবত্যো বুদ্ধয় ইতি। দৃশ্যতে চাত্র ব্যক্তং প্রদীপার্চ্চিষাং গ্রহণমিতি।

অনুবাদ। বুদ্ধির অস্থায়িত্ব হইলেও সেই দ্রব্যসমূহের গ্রহণ ব্যক্তই স্বীকার্য্য। (প্রশ্ন) কিরূপ? (উত্তর) প্রদীপের শিখাসন্ততির অভিব্যক্ত (ব্যক্ত) গ্রহণের ন্যায়। বিশদার্থ এই যে, বুদ্ধিসমূহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ সন্ততিরূপে বর্ত্তমান প্রদীপশিখাসমূহের গ্রহণের অস্থায়িত্ব ও গ্রাহ্যের (প্রদীপশিখার) অস্থায়িত্ব স্বীকার্য্য। যতগুলি প্রদীপশিখা, ততগুলি বুদ্ধি। কিন্তু এই স্থলে প্রদীপশিখাসমূহের ব্যক্ত গ্রহণ দৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। জন্য জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুর অব্যক্ত জ্ঞান হয়, এই আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্ষি শেষে এই সূত্রদ্বারা প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির স্থায়িত্ব না থাকিলেও তৎপ্রযুক্ত বিষয়ের অব্যক্ত জ্ঞান হয় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রভাষ্যেই স্বতন্ত্রভাবে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে মহর্ষির সূত্রদ্বারা তাঁহার পূর্ব্বকথার সমর্থন করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য পদার্থের অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত অব্যক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী হইলেই যে সেখানে অব্যক্ত গ্রহণ হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় বুদ্ধির অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে না। বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী হইলেও ব্যক্ত গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি প্রদীপের শিখাসন্ততির ব্যক্ত গ্রহণকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিক্ষণে প্রদীপের যে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উদ্‌ভব হয়, তাহাকে বলে প্রদীপশিখার সন্ততি। প্রদীপের ঐ সমস্ত শিখার ভেদ থাকিলেও অবিচ্ছেদে উহাদের উৎপত্তি হওয়ায় একই শিখা বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ অবিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উৎপত্তিই ঐ স্থলে স্বীকার্য্য। ঐ শিখার মধ্যে কোন শিখা হইতে কোন শিখা দীর্ঘ, কোন শিখা খর্ব্ব, কোন শিখা স্থূল, ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। একই শিখার ঐরূপ দীর্ঘত্বাদি সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রদীপের শিখা এক নহে, সন্ততিরূপে অর্থাৎ প্রবাহরূপে উৎপন্ন নানা শিখাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রদীপের ঐ সমস্ত শিখার যে প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি জন্মে, ঐ বুদ্ধিও নানা, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, বুদ্ধিমাত্রই প্রত্যর্থনিয়ত। প্রথম শিখামাত্রবিষয়ক যে বুদ্ধি, দ্বিতীয় শিখা ঐ বুদ্ধির বিষয়ই নহে। সুতরাং দ্বিতীয় শিখা বিষয়ে দ্বিতীয় বুদ্ধিই জন্মে। এইরূপে প্রদীপের যতগুলি শিখা, ততগুলি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিই তদ্বিষয়ে জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ স্থলে প্রদীপের শিখাসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তাহার স্থায়িত্ব নাই, উহার কোন বুদ্ধিই বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, ঐ স্থলে প্রদীপের শিখারূপ যে গ্রাহ্য অর্থাৎ বোদ্ধব্য পদার্থ, তাহা অস্থায়ী, উহার কোন শিখাই বহুক্ষণস্থায়ী নহে। কিন্তু ঐ স্থলে প্রদীপের শিখাসমূহের

পূর্ব্বোক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী জ্ঞান ও ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে। প্রদীপের শিখাসমূহের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষকে কেহই অব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ অস্পষ্ট জ্ঞান বলেন না। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই ব্যক্ত গ্রহণই স্বীকার্য্য। বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে তখন যে অতি অল্পক্ষণের জন্য কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জন্মে, ঐ প্রত্যক্ষও তাহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্টই হয়। মূলকথা, প্রদীপের ভিন্ন ভিন্ন শিখাসন্ততির ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী প্রত্যক্ষগুলিও যখন ব্যক্ত গ্রহণ বলিয়া সকলেরই স্বীকার্য্য, তখন বুদ্ধি বা বোদ্ধব্য পদার্থের অস্থায়িত্ববশতঃ অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকারও প্রথমে মহর্ষির এই তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

বুদ্ধ্যুৎপন্নাপবর্গিত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

---o---

ভাষ্য। চেতনা শরীরগুণঃ, সতি শরীরে ভাবাদসতি চাভাবাদিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) চৈতন্য শরীরের গুণ, যেহেতু শরীর থাকিলেই চৈতন্যের সত্তা, এবং শরীর না থাকিলেই চৈতন্যের অসত্তা।

সূত্র। দ্রব্যে স্বগুণ-পরগুণোপলব্ধেঃ সংশয়ঃ ॥ ॥ ৪৬ ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ। দ্রব্য পদার্থে স্বকীয় গুণ ও পরকীয় গুণের উপলব্ধি হয়, সুতরাং সংশয় জন্মে।

ভাষ্য। সাংশয়িকঃ সতি ভাবঃ, স্বগুণোঽপ্সু দ্রবত্বমুপলভ্যতে, পরগুণশ্চোষ্ণতা। তেনায়ং সংশয়ঃ, কিং শরীরগুণশ্চেতনা শরীরে গৃহ্যতে? অথ দ্রব্যান্তরগুণ ইতি।

অনুবাদ। সত্ত্বে সত্তা অর্থাৎ থাকিলে থাকা সন্দিগ্ধ, (কারণ) জলে স্বকীয় গুণ দ্রবত্ব উপলব্ধ হয়, পরের গুণ অর্থাৎ জলের অন্তর্গত অগ্নির গুণ উষ্ণতাও (উষ্ণ স্পর্শও) উপলব্ধ হয়। অতএব কি শরীরের গুণ চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? অথবা দ্রব্যান্তরের গুণ চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? এই সংশয় জন্মে।

টিপ্পনী। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বার বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্য মহর্ষি বুদ্ধি পরীক্ষার শেষ ভাগে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এই প্রকরণের অবতারণা করিতে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই যখন চৈতন্য থাকে, শরীর না থাকিলে চৈতন্য থাকে না, অতএব চৈতন্য শরীরেরই

গুণ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যাহা থাকিলে যাহা থাকে বা জন্মে, তাহা তাহারই ধর্ম্ম, ইহা বুঝা যায়। যেমন ঘটাদি দ্রব্য থাকিলেই রূপাদি গুণ থাকে, এজন্য রূপাদি ঘটাদির ধর্ম্ম বলিয়াই বুঝা যায়। মহর্ষি এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, চৈতন্য শরীরেরই গুণ, অথবা দ্রব্যান্তরের গুণ, এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, যাহা থাকিলেই যাহা থাকে, অথবা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা তাহারই ধর্ম্ম, এইরূপ নিশ্চয় করা যায় না ; উহা সন্দিগ্ধ। কারণ, জলে যেমন তাহার নিজগুণ দ্রবত্ব উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ ঐ জল উষ্ণ করিলে তখন তাহাতে উষ্ণ স্পর্শও উপলব্ধ হয়। কিন্তু ঐ উষ্ণ স্পর্শ জলের নিজের গুণ নহে, উহা ঐ জলের মধ্যগত অগ্নির গুণ। এইরূপে শরীরে যে চৈতন্যের উপলব্ধি হইতেছে, তাহাও ঐ শরীরের মধ্যগত কোন দ্রব্যান্তরেরও গুণ হইতে পারে। যাহা থাকিলে যাহা থাকে বা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা তাহার ধর্ম্ম হইবে, এইরূপ নিয়ম যখন নাই, তখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা চৈতন্য শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু শরীরের নিজের গুণ চৈতন্যই কি শরীরে উপলব্ধ হয়, অথবা কোন দ্রব্যান্তরের গুণ চৈতন্যই শরীরে উপলব্ধ হয় ? এইরূপ সংশয়ই জন্মে। উদ্দ্যোতকর এখানে মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই চৈতন্য থাকে, শরীর না থাকিলে চৈতন্য থাকে না, এই যুক্তির দ্বারা চৈতন্য শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, ক্রিয়াজন্য সংযোগ, বিভাগ ও বেগ জন্মে, ক্রিয়া ব্যতীত ঐ সংযোগাদি জন্মে না ; কিন্তু ঐ সংযোগ ও বিভাগাদি ক্রিয়ার গুণ নহে। সুতরাং যাহা থাকিলেই যাহা থাকে, যাহার অভাবে যাহা থাকে না, তাহা তাহারই গুণ, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। অবশ্য যাহাতে বর্ত্তমানরূপে যে গুণের উপলব্ধি হয়, উহা তাহারই গুণ, এইরূপ নিয়ম বলা যায়। কিন্তু শরীরে বর্ত্তমানরূপে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, চৈতন্যমাত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা চৈতন্য যে শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, শরীরে চৈতন্যের উপলব্ধি স্বীকার করিলেও ঐ চৈতন্য কি শরীরেরই গুণ ? অথবা দ্রব্যান্তরের গুণ ? এইরূপ সংশয় জন্মে। সুতরাং ঐ সংশয়ের নিবৃত্তি ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্য। ন শরীরগুণশ্চেতনা। কস্মাৎ ?

অনুবাদ। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদ্রূপাদীনাং ॥৪৭॥৩১৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু রূপাদির যাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব আছে, [অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যন্ত দ্রব্য থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার গুণ রূপাদি থাকে। কিন্তু শরীর থাকিলেও সর্ব্বদা তাহাতে চৈতন্য না থাকায় চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে পারে না]।

ভাষ্য। ন রূপাদিহীনং শরীরং গৃহ্যতে, চেতনাহীনস্তু গৃহ্যতে, যথোষ্ণতাহীনা আপঃ, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি।

সংস্কারবদিতি চেৎ? ন, কারণানুচ্ছেদাৎ। যথাবিধে দ্রব্যে সংস্কারস্তথাবিধ এবোপরমো ন, তত্র কারণোচ্ছেদাদত্যন্তং সংস্কারানুপপত্তির্ভবতি, যথাবিধে শরীরে চেতনা গৃহ্যতে তথাবিধ এবাত্যন্তোপরমশ্চেতনায়া গৃহ্যতে, তস্মাৎ সংস্কারবদিত্যসমঃ সমাধিঃ। অথাপি শরীরস্থং চেতনোৎপত্তিকারণং স্যাদ্দ্রব্যান্তরস্থং বা উভয়স্থং বা তন্ন, নিয়মহেত্বভাবাৎ। শরীরস্থেন কদাচিচ্চেতনোৎপদ্যতে কদাচিন্নেতি নিয়মে হেতুর্নাস্তীতি। দ্রব্যান্তরস্থেন চ শরীর এব চেতনোৎপদ্যতে ন লোষ্টাদিষ্বিত্যত্র ন নিয়মে হেতুরস্তীতি। উভয়স্থস্য নিমিত্তত্বে শরীর-সমানজাতীয়দ্রব্যে চেতনা নোৎপদ্যতে শরীর এব চোৎপদ্যত ইতি নিয়মে হেতুর্নাস্তীতি।

অনুবাদ। রূপাদিশূন্য শরীর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু চেতনাশূন্য শরীর প্রত্যক্ষ হয়, যেমন উষ্ণতাশূন্য জল প্রত্যক্ষ হয়,—অতএব চেতনা শরীরের গুণ নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) সংস্কারের ন্যায়, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ চৈতন্য সংস্কারের তুল্য গুণ নহে, যেহেতু (চৈতন্যের) কারণের উচ্ছেদ হয় না। বিশদার্থ এই যে, যাদৃশ দ্রব্যে সংস্কার উপলব্ধ হয়, তাদৃশ দ্রব্যেই সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না, সেই দ্রব্যে কারণের উচ্ছেদবশতঃ সংস্কারের অত্যন্ত অনুপপত্তি (নিবৃত্তি) হয়। (কিন্তু) যাদৃশ শরীরে চৈতন্য উপলব্ধ হয়, তাদৃশ শরীরেই চৈতন্যের অত্যন্ত নিবৃত্তি উপলব্ধ হয়, অতএব "সংস্কারের ন্যায়" ইহা বিষম সমাধান [অর্থাৎ সংস্কার ও চৈতন্য তুল্য পদার্থ না হওয়ায় সংস্কারকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যে সমাধান বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই]। আর যদি বল, শরীরস্থ কোন বস্তু চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়, অথবা দ্রব্যান্তরস্থ অথবা শরীর ও দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বস্তু চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়? (উত্তর) তাহা নহে, অর্থাৎ ঐরূপ কোন বস্তুই চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না; কারণ, নিয়মে হেতু নাই। বিশদার্থ এই যে, শরীরস্থ কোন বস্তুর দ্বারা কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। এবং দ্রব্যান্তরস্থ কোন বস্তুর দ্বারা শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, লোষ্ট প্রভৃতিতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু

নাই। উভয়স্থ কোন বস্তুর কারণত্ব হইলে অর্থাৎ শরীর এবং দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বস্তু চৈতন্যের কারণ হইলে শরীরের সমানজাতীয় দ্রব্যে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এই নিয়মে হেতু নাই।

টিপ্পনী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীররূপ দ্রব্যের যে রূপাদি গুণ আছে, তাহা ঐ শরীররূপ দ্রব্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। রূপাদিশূন্য শরীর কখনও উপলব্ধ হয় না। কিন্তু যেমন উষ্ণ জল শীতল হইলে তখন তাহাতে উষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ সময়বিশেষে শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, চৈতন্যহীন শরীরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে উহাও রূপাদির ন্যায় ঐ শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ঐ শরীরে বিদ্যমান থাকিত।

পূর্ব্বপক্ষবাদী চার্ব্বাক বলিতে পারেন যে, শরীরের গুণ হইলেই যে, তাহা শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, এইরূপ নিয়ম নাই। শরীরে যে বেগ নামক সংস্কারবিশেষ জন্মে, উহা শরীরের গুণ হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতেও উহার বিনাশ হইয়া থাকে। এইরূপ শরীর বিদ্যমান থাকিতে কোন সময়ে চৈতন্যের বিনাশ হইলেও সংস্কারের ন্যায় চৈতন্যও শরীরের গুণ হইতে পারে। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কারণের উচ্ছেদ না হওয়ায় কোন সময়েই শরীরে চৈতন্যের অভাব হইতে পারে না। কিন্তু কারণের উচ্ছেদ হওয়ায় শরীরে বেগের অভাব হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরের বেগের প্রতি শরীরমাত্রই কারণ নহে। ক্রিয়া প্রভৃতি কারণান্তর উপস্থিত হইলে শরীরে বেগ নামক সংস্কার জন্মে। ক্রিয়া প্রভৃতি কারণবিশিষ্ট যাদৃশ শরীরে ঐ বেগ নামক সংস্কার জন্মে, তাদৃশ শরীরে ঐ সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না। ঐ ক্রিয়া প্রভৃতি কারণের বিনাশ হইলে তখন ঐ শরীরে ঐ সংস্কারের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যাদৃশ শরীরে চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, তাদৃশ শরীরেই সময়বিশেষে চৈতন্যের নিবৃত্তি উপলব্ধ হয়। শরীরে চৈতন্য স্বীকার করিলে কখনও তাহাতে চৈতন্যের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, শরীরের চৈতন্যবাদী চার্ব্বাকের মতে যে ভূতসংযোগ শরীরের চৈতন্যোৎপত্তির কারণ, তাহা মৃত শরীরেও থাকে। সুতরাং তাঁহার মতে শরীর বিদ্যমান থাকিতে তাহাতে চৈতন্যের কারণের উচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্তই তাহাতে চৈতন্য বিদ্যমান থাকিবে। চৈতন্য সংস্কারের ন্যায় গুণ না হওয়ায় ঐ সংস্কারকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাধান বলা যাইবে না। সংস্কার চৈতন্যের সমান গুণ না হওয়ায় উহা বিষম সমাধান বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী চার্ব্বাক যদি বলেন যে, শরীরে যে চৈতন্য জন্মে, তাহাতে অন্য কারণও আছে, কেবল শরীর বা ভূত-সংযোগবিশেষই উহার কারণ নহে। শরীরস্থ অথবা অন্য দ্রব্যস্থ অথবা শরীর ও অন্য দ্রব্য, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বস্তুও শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তিতে কারণ। ঐ কারণান্তরের

অভাব হইলে পূর্ব্বোক্ত সংস্কারের ন্যায় সময়বিশেষে শরীরে চৈতন্যেরও নিবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং চৈতন্যও শরীরস্থ বেগ নামক সংস্কারের ন্যায় শরীরের গুণ হইতে পারে। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নিয়মে হেতু না থাকায় পূর্ব্বোক্ত কোন বস্তুকে শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তিতে কারণ বলা যায় না। কারণ, প্রথম পক্ষে যদি শরীরস্থ কোন পদার্থবিশেষ শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ পদার্থ কোন সময়ে শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন করে, কোন সময়ে চৈতন্য উৎপন্ন করে না, এইরূপ নিয়মে কোন হেতু নাই। সর্ব্বদাই শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে। কালবিশেষে শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তির কোন নিয়ামক নাই। আর যদি (২) শরীর ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যস্থ কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে উহা শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন করে, লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যান্তরে চৈতন্য উৎপন্ন করে না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। দ্রব্যান্তরস্থ বস্তুবিশেষ চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হইলে, তাহা সেই দ্রব্যান্তরেও চৈতন্য উৎপন্ন করে না কেন? আর যদি (৩) শরীর ও দ্রব্যান্তর, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন পদার্থ চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে শরীরের সজাতীয় দ্রব্যান্তরে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। উদ্দ্যোতকর আরও বলিয়াছেন যে, শরীরস্থ কোন বস্তু শরীরের চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হইলে ঐ বস্তু কি শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে অথবা উহা নৈমিত্তিক, নিমিত্তের অভাব হইলে উহারও অভাব হয়? ইহা বক্তব্য। ঐ বস্তু শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্তই বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে সর্ব্বদা কারণের সত্তাবশতঃ শরীরে কখনও চৈতন্যের নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর ঐ শরীরস্থ বস্তুকে নৈমিত্তিক বলিলে যে নিমিত্তজন্য উহা জন্মিবে, সেই নিমিত্ত সর্ব্বদাই উহা কেন জন্মায় না? ইহা বলা আবশ্যক। সেই নিমিত্তও অর্থাৎ সেই কারণও নৈমিত্তিক, ইহা বলিলে যে নিমিত্তান্তরজন্য সেই নিমিত্ত জন্মে, তাহা ঐ নিমিত্তকে সর্ব্বদাই কেন জন্মায় না, ইত্যাদি প্রকার আপত্তি অনিবার্য্য। এবং দ্রব্যান্তরস্থ কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ বলিলে ঐ পদার্থ নিত্য, কি অনিত্য? অনিত্য হইলে কালান্তরস্থায়ী? অথবা ক্ষণবিনাশী? ইহাও বলা আবশ্যক। কিন্তু উহার সমস্ত পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার আপত্তি অনিবার্য্য। ফলকথা, শরীরে চৈতন্য স্বীকার করিলে তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার আর কোন কারণান্তরই বলা যায় না। সুতরাং শরীর বর্ত্তমান থাকিতে কারণের উচ্ছেদ বা অভাব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত শরীরে চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। কারণান্তরের নিবৃত্তিবশতঃ সংস্কারের নিবৃত্তির ন্যায় শরীরে চৈতন্যের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের মূল তাৎপর্য্য।

বস্তুতঃ বেগ নামক সংস্কার সামান্য গুণ, উহা রূপাদির ন্যায় বিশেষ গুণের অন্তর্গত নহে। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান, বিশেষ গুণ বলিয়াই স্বীকৃত। কিন্তু চৈতন্যের আধার দ্রব্য সত্ত্বেই চৈতন্যের নাশ হওয়ায় চৈতন্য রূপাদির ন্যায় "যাবদ্দ্রব্যভাবী" বিশেষ গুণ নহে। আধার দ্রব্যের নাশ-জন্যই যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাকে বলে "যাবদ্দ্রব্যভাবী" গুণ; যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণাদি। আধার দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতেও যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাকে

বলে "অযাবদ্দ্রব্যভাবী" গুণ (প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, কাশী সংস্করণ, ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষি এই সূত্রে রূপাদি বিশেষ গুণের "যাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব" প্রকাশ করিয়া, প্রশস্তপাদোক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ গুণের সত্তা সূচনা করিয়া গিয়াছেন এবং চৈতন্য, রূপাদির ন্যায় "যাবদ্দ্রব্যভাবী" বিশেষ গুণ নহে, উহা "অযাবদ্দ্রব্যভাবী" বিশেষ গুণ, সুতরাং উহা শরীরের বিশেষ গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যাহা শরীরের বিশেষগুণ হইবে, তাহা রূপাদির ন্যায় "যাবদ্দ্রব্য-ভাবী"ই হইবে। চৈতন্য যখন রূপাদির ন্যায় "যাবদ্দ্রব্যভাবী" বিশেষ গুণ নহে, অর্থাৎ চৈতন্যের আধার বিদ্যমান থাকিতেও যখন চৈতন্যের বিনাশ হয়, তখন উহা শরীরের বিশেষ গুণ নহে, ইহাই মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য। বেগ নামক সংস্কার শরীরের বিশেষ গুণ নহে। সুতরাং উহা চৈতন্যের ন্যায় "অযাবদ্দ্রব্যভাবী" হইলেও শরীরের গুণ হইতে পারে। চৈতন্য বিশেষ গুণ, সুতরাং উহা শরীরের বিশেষ গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে শরীরের গুণই নহে, ইহাই সিদ্ধ হইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ এই সূত্রে "যাবচ্ছরীরভাবিত্বাৎ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলেও মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে "যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"ও ঐরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্য। যচ্চ মন্যেত সতি শ্যামাদিগুণে দ্রব্যে শ্যামাদ্যুপরমো দৃষ্টঃ, এবং চেতনোপরমঃ স্যাদিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আর যে মনে করিবে, শ্যামাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বিদ্যমান থাকিলেও শ্যামাদি গুণের বিনাশ দেখা যায়, এইরূপ (শরীর বিদ্যমান থাকিলেও) চৈতন্যের বিনাশ হয়।

সূত্র। ন পাকজগুণান্তরোৎপত্তেঃ ॥৪৮॥ ৩১৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ শ্যামাদি-রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে কোন সময়ে একেবারে রূপের অভাব হয় না,—কারণ, (ঐ দ্রব্যে) পাকজন্য গুণান্তরের উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। নাত্যন্তং রূপোপরমো দ্রব্যস্য, শ্যামে রূপে নিবৃত্তে পাকজং গুণান্তরং রক্তং রূপ[১]মুৎপদ্যতে। শরীরে তু চেতনামাত্রোপ-রমোঽত্যন্তমিতি।

১। গুণবাচক "শুক্ল" "রক্ত" প্রভৃতি শব্দ অন্য পদার্থের বিশেষণবোধক না হইলেই পুংলিঙ্গ হইয়া থাকে। এখানে "রক্ত" শব্দ রূপের বিশেষণ-বোধক হওয়ায় "রক্তং রূপং" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণিও "রক্তং রূপং" এইরূপই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন, "বস্তুন্তরবিশেষণতানাপন্নস্যৈব শুক্লাদিপদস্য পুংস্ত্বানুশাসনাৎ"।—ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, জাগদীশী।

অনুবাদ। দ্রব্যের আত্যন্তিক রূপাভাব হয় না, শ্যাম রূপ নষ্ট হইলে পাকজন্য গুণান্তর রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শরীরে চৈতন্যমাত্রের অত্যন্তাভাব হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, রূপাদি বিশেষ গুণ যে যাবদ্‌দ্রব্যভাবী, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতেও তাহার শ্যাম রক্ত প্রভৃতি রূপের বিনাশ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ চৈতন্য শরীরের বিশেষ গুণ হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতেও উহা বিনষ্ট হইতে পারে। শরীরের বিশেষ গুণ হইলেই যে শরীর থাকিতে উহা বিনষ্ট হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। মহর্ষি এতদুত্তরে এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতে কখনই তাহাতে একেবারে রূপের অভাব হয় না। কারণ, ঐ ঘটাদিদ্রব্যে এক রূপের বিনাশ হইলে তখনই তাহাতে পাকজ গুণান্তরের অর্থাৎ অগ্নিসংযোগজন্য রক্তাদি রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্যাম ঘট অগ্নিকুণ্ডে পক্ক হইলে যখন তাহার শ্যাম রূপের নাশ হয়, তখনই ঐ ঘটে রক্ত রূপ উৎপন্ন হওয়ায় কোন সময়েই ঐ ঘট রূপশূন্য হয় না। কিন্তু সময়বিশেষে একেবারে চৈতন্যশূন্য শরীরও প্রত্যক্ষ করা যায়।

অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজঃপদার্থের যেরূপ সংযোগ জন্মিলে পার্থিব পদার্থের রূপাদির পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বজাত রূপাদির বিনাশ এবং অপর রূপাদির উৎপত্তি হয়, তাদৃশ তেজঃসংযোগের নাম পাক। ঘটাদি দ্রব্যে প্রথম যে রূপাদি গুণ জন্মে, তাহা ঐ ঘটাদি দ্রব্যের "কারণগুণপূর্ব্বক" অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যের কারণ কপালাদি দ্রব্যের রূপাদিগুণ-জন্য। পরে অগ্নিপ্রভৃতি তেজঃপদার্থের বিলক্ষণ সংযোগ-জন্য যে রূপাদি গুণ জন্মে, উহাকে বলে "পাকজ গুণ" (বৈশেষিক দর্শন, ৭ম অঃ, ১ম আঃ, ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য)। পৃথিবী দ্রব্যেই পূর্ব্বোক্তরূপ পাক জন্মে। জলাদি দ্রব্যে পাকজন্য রূপাদির নাশ না হওয়ায় উহাতে পূর্ব্বোক্ত পাক স্বীকৃত হয় নাই। বৈশেষিক মতে ঘটাদি দ্রব্য অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তখন ঐ ঘটাদির বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র পূর্ব্বোক্তরূপ বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগ হইতে না পারায় কেবল ঐ ঘটাদি দ্রব্যের আরম্ভক পরমাণুসমূহেই পূর্ব্বোক্ত পাকজন্য পূর্ব্বরূপাদির বিনাশ ও অপর-রূপাদির উৎপত্তি হয়। পরে ঐ সমস্ত বিভক্ত পরমাণুসমূহের দ্বারা পুনর্ব্বার দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তিক্রমে অভিনব ঘটাদিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই মতে পূর্ব্বজাত ঘটেই অন্য রূপাদি জন্মে না, নবজাত অন্য ঘটেই রূপাদি জন্মে। "প্রশস্তপাদভাষ্য" ও "ন্যায়কন্দলী"তে এই মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন দ্রষ্টব্য। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পূর্ব্বঘটের নাশ ও অপর ঘটের উৎপত্তি, এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন। বৈশেষিক মতে ঘটাদি দ্রব্যের পুনরুৎপত্তি কল্পনায় মহাগৌরব বলিয়া ন্যায়াচার্য্যগণ ঐ মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মত এই যে, ঘটাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র। ঘটাদি দ্রব্য অগ্নিমধ্যে অবস্থান করিলে ঐ ঘটাদি দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহের

দ্বারা ঐ দ্রব্যের মধ্যেও অগ্নি প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং উহার পরমাণুর ন্যায় দ্ব্যণুকাদি অবয়বী দ্রব্যেও পাক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। ঐরূপ পাকজন্য সেখানে সেই পূর্ব্বজাত ঘটাদি দ্রব্যেরই পূর্ব্বরূপাদির নাশ ও অপর রূপাদি জন্মে। সেখানে পূর্ব্বজাত সেই ঘটাদি দ্রব্য বিনষ্ট হয় না। ন্যায়াচার্য্যগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি গোতমের এই সূত্র ও ইহার পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, যে দ্রব্যে শ্যামাদি গুণের নাশ হয়, ঐ দ্রব্যেই পাকজন্য গুণান্তরের উৎপত্তি হয়, ইহাই মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হইতে পারে না। সুধীগণ ইহা প্রণিধান করিবেন ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিসিদ্ধেঃ পাকজানামপ্রতিষেধঃ ॥ ॥৪৯॥৩২০॥

অনুবাদ। পরন্তু পাকজ গুণসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বীর অর্থাৎ বিরোধী গুণের সিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। যাবৎসু দ্রব্যেষু পূর্ব্বগুণপ্রতিদ্বন্দ্বিসিদ্ধিস্তাবৎসু পাকজোৎপত্তির্দৃশ্যতে, পূর্ব্বগুণৈঃ সহ পাকজানামবস্থানস্যাগ্রহণাৎ। ন চ শরীরে চেতনা-প্রতিদ্বন্দ্বিসিদ্ধৌ সহানবস্থায়ি গুণান্তরং গৃহ্যতে, যেনানুমীয়েত তেন চেতনায়া বিরোধঃ। তস্মাদপ্রতিষিদ্ধা চেতনা যাবচ্ছরীরং বর্ত্তেত? নতু বর্ত্ততে, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনা ইতি।

অনুবাদ। যে সমস্ত দ্রব্যে পূর্ব্বগুণের প্রতিদ্বন্দ্বীর (বিরোধী গুণের) সিদ্ধি আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যে পাকজ গুণের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, পূর্ব্বগুণসমূহের সহিত পাকজ গুণসমূহের অবস্থানের অর্থাৎ একই সময়ে একই দ্রব্যে অবস্থিতির জ্ঞান হয় না। কিন্তু শরীরে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিসিদ্ধিতে "সহানবস্থায়ি" (বিরোধী) গুণান্তর গৃহীত হয় না, যদ্দ্বারা সেই গুণান্তরের সহিত চৈতন্যের বিরোধ অনুমিত হইবে। সুতরাং অপ্রতিষিদ্ধ (শরীরে স্বীকৃত) চৈতন্য "যাবচ্ছরীর" অর্থাৎ শরীরেব স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক? কিন্তু বর্ত্তমান থাকে না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে।

টিপ্পনী। শরীরে রূপাদি গুণের কখনই আত্যন্তিক অভাব হয় না, কিন্তু চৈতন্যের আত্যন্তিক অভাব হয়। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা রূপাদি গুণ ও চৈতন্যের এই বৈধর্ম্ম্য বলিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা অপর একটি বৈধর্ম্ম্য বলিয়াছেন। মহর্ষির বক্তব্য এই যে, শরীরস্থ রূপাদি গুণ সপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু চৈতন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পাকজন্য রূপাদি গুণ যে সমস্ত দ্রব্যে উৎপন্ন হয়, সেই সকল দ্রব্যে

ঐ রূপাদি গুণ পূর্ব্বগুণের সহিত অবস্থান করে না। পূর্ব্বগুণের বিনাশ হইলে তখনই ঐ সকল দ্রব্যে পাকজন্য রূপাদি গুণ অবস্থান করে। সুতরাং পূর্ব্বজাত রূপাদি গুণ যে পাকজন্য রূপাদি গুণের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ বিরোধী, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীরে উহার বিরোধী অন্য কোন গুণ প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় সেই গুণে চৈতন্যের বিরোধ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ শরীরে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন গুণান্তর নাই। সুতরাং শরীরে চৈতন্য স্বীকার করিলে উহা শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। পাকজন্য রূপাদি গুণের ন্যায় চৈতন্যের বিরোধী গুণান্তর না থাকায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত শরীরে চৈতন্যের যে স্থায়িত্ব, তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না। শরীর বিদ্যমান থাকিতেও চৈতন্যের বিনাশ হয়। সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ নহে॥ ৪৯॥

ভাষ্য। ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে—

সূত্র। শরীরব্যাপিত্বাৎ ॥৫০॥৩২১॥

অনুবাদ। যেহেতু (চৈতন্যের) শরীরব্যাপিত্ব আছে।

ভাষ্য। শরীরং শরীরাবয়বাশ্চ সর্ব্বে চেতনোৎপত্ত্যা ব্যাপ্তা ইতি ন ক্বচিদনুৎপত্তিশ্চেতনায়াঃ, শরীরবচ্ছরীরাবয়বাশ্চেতনা ইতি প্রাপ্তং চেতনবহুত্বং। তত্র যথা প্রতিশরীরং চেতনবহুত্বে সুখদুঃখজ্ঞানানাং ব্যবস্থা লিঙ্গং, এবমেকশরীরেঽপি স্যাৎ? নতু ভবতি, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি।

অনুবাদ। শরীর এবং শরীরের সমস্ত অবয়ব চৈতন্যের উৎপত্তি কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত; সুতরাং (শরীরের) কোন অবয়বে চৈতন্যের অনুৎপত্তি নাই, শরীরের ন্যায় শরীরের সমস্ত অবয়ব চেতন, এ জন্য চেতনের বহুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর ও ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব চেতন হইলে একই শরীরে বহু চেতন স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যেমন প্রতিশরীরে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে চেতনের বহুত্বে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের ব্যবস্থা (নিয়ম) লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক হয়, এইরূপ এক শরীরেও হউক? কিন্তু হয় না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে।

টিপ্পনী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শরীর এবং শরীরের প্রত্যেক অবয়বেই চৈতন্যের উৎপত্তি হওয়ায় চৈতন্য সর্ব্বশরীরব্যাপী, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীর এবং শরীরের প্রত্যেক অবয়বকেই চেতন বলিতে হইবে। তাহা হইলে একই শরীরে বহু চেতন স্বীকার

করিতে হয়। সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ, ইহা বলা যায় না। এক শরীরে বহু চেতন স্বীকারে বাধা কি ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, উহা নিষ্প্রমাণ। কারণ, সুখ দুঃখ ও জ্ঞানের ব্যবস্থাই আত্মার ভেদের লিঙ্গ বা অনুমাপক। অর্থাৎ একের সুখ দুঃখ ও জ্ঞান জন্মিলে অপরের সুখ দুঃখ ও জ্ঞান জন্মে না, অপরে উহার প্রত্যক্ষ করে না, এই যে ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে, উহাই ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অনুমাপক। পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ নিয়মবশতঃই প্রতিশরীরে বিভিন্ন আত্মা আছে, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ এক শরীরে বহু চেতন স্বীকার করিতে হইলে একশরীরেও পূর্ব্বোক্তরূপ সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থাই তদ্বিষয়ে লিঙ্গ বা অনুমাপক হইবে। কারণ, উহাই আত্মার বহুত্বের লিঙ্গ। কিন্তু একশরীরে পূর্ব্বোক্তরূপ সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা নাই। কারণ, একশরীরে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান জন্মিলে সেই শরীরে সেই একই চেতন তাহার সেই সমস্ত সুখদুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং সেই স্থানে বহু চেতন স্বীকারের কোন কারণ নাই। ফলকথা, যাহা আত্মার বহুত্বের প্রমাণ, তাহা (সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা) একশরীরে না থাকায় এক শরীরে আত্মার বহুত্ব নিষ্প্রমাণ। চৈতন্য শরীরের গুণ, ইহা স্বীকার করিলে এক শরীরে ঐ নিষ্প্রমাণ চেতনবহুত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার এই যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৫৫শ সূত্রের বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে মহর্ষির কথিত "শরীরব্যাপিত্ব" চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সাধক হেতু নহে। কিন্তু শরীরে চৈতন্য স্বীকার করিলে এক শরীরেও বহু চেতন স্বীকার করিতে হয়, ইহাই ঐ সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত ॥ ৫০ ॥

ভাষ্য। যদুক্তং ন ক্বচিচ্ছরীরাবয়বে চেতনায়া অনুৎপত্তিরিতি সা—

সূত্র। ন কেশনখাদিষ্বনুপলব্ধেঃ ॥৫১॥৩২২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্যের অনুৎপত্তি নাই, এই যে উক্ত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ শরীরের সর্ব্বাবয়বেই চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, কারণ, কেশ ও নখাদিতে (চৈতন্যের) উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। কেশেষু নখাদিষু চানুৎপত্তিশ্চেতনায়া ইত্যনুপপন্নং শরীরব্যাপিত্বমিতি।

অনুবাদ। কেশসমূহে ও নখাদিতে চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, এ জন্য (চৈতন্যের) শরীরব্যাপকত্ব উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, পূর্ব্বসূত্রে চৈতন্যের যে শরীরব্যাপিত্ব বলা হইয়াছে, উহা উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্যের অনুৎপত্তি নাই, সর্ব্বাবয়বেই চৈতন্য জন্মে, ইহা বলা যায় না। কারণ, শরীরের অবয়ব কেশ ও নখাদিতে

চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না,—সুতরাং কেশ ও নখাদিতে চৈতন্য জন্মে না, ইহা স্বীকার্য্য। উদ্দ্যোতকর এই সূত্রকে দৃষ্টান্তসূত্র বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের কথা এই যে, কেশ নখাদিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শরীরাবয়বত্ব হেতুর দ্বারা হস্ত পদাদি শরীরাবয়বে অচেতনত্ব সাধন করাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রেত[১]। অর্থাৎ যেগুলি শরীরের অবয়ব, সেগুলি চেতন নহে, যেমন কেশ নখাদি। হস্ত পদাদি শরীরের অবয়ব, সুতরাং উহা চেতন নহে। তাহা হইলে শরীর ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলির চেতনত্ববশতঃ এক শরীরে যে চেতনবহুত্বের আপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, শরীরের অবয়বগুলি চেতন নহে, ইহা কেশ নখাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর গূঢ় তাৎপর্য্য। এই সূত্রের পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে অনেক পুস্তকে "সা ন" এইরূপ পাঠ আছে। কোন পুস্তকে "স ন" এইরূপ পাঠও দেখা যায়। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থে এই সূত্রের প্রথমে "নঞ্" শব্দ গৃহীত হওয়ায়, "সা" এই পর্য্যন্ত ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকারের "সা" এই পদের সহিত সূত্রের প্রথমস্থ নঞ্‌ শব্দের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "সা" এই পদে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুৎপত্তির অভাব উৎপত্তিই ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ ॥ ৫১ ॥

সূত্র। ত্বক্‌পর্য্যন্তত্বাচ্ছরীরস্য কেশনখাদিষ্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ॥৫২॥৩২৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) শরীরের "ত্বক্‌পর্য্যন্তত্ব"বশতঃ অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত চর্ম্ম আছে, সেই পর্য্যন্তই শরীর, এ জন্য কেশ ও নখাদিতে (চৈতন্যের) প্রসঙ্গ (আপত্তি) নাই।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং শরীরলক্ষণং, ত্বক্‌পর্য্যন্তং জীব-মনঃসুখ-দুঃখ-সংবিত্ত্যায়তনভূতং শরীরং, তস্মান্ন কেশাদিষু চেতনোৎপদ্যতে। অর্থকারিতস্তু শরীরোপনিবন্ধঃ কেশাদীনামিতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ, জীব, মনঃ, সুখ, দুঃখ ও সংবিত্তির (জ্ঞানের) আয়তনভূত অর্থাৎ আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপ শরীর—ত্বক্‌পর্য্যন্ত, অতএব কেশাদিতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কেশাদির শরীরের সহিত "উপনিবন্ধ" (সংযোগসম্বন্ধবিশেষ) অর্থকারিত অর্থাৎ প্রয়োজনজনিত।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথার খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন

১। দৃষ্টান্তসূত্রমিতি ন করচরণাদয়শ্চেতনাঃ, শরীরাবয়বত্বাৎ কেশনখাদিবদিতি দৃষ্টান্তার্থং সূত্রমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

যে, শরীর ত্বক্‌পর্য্যন্ত, অর্থাৎ চর্ম্মই শরীরের পর্য্যন্ত বা শেষ সীমা। যেখানে চর্ম্ম নাই, তাহা শরীরও নহে, শরীরের অবয়বও নহে। কেশ নখাদিতে চর্ম্ম না থাকায় উহা শরীরের অবয়ব নহে। সুতরাং উহাতে চৈতন্যের আপত্তি হইতে পারে না। মহর্ষির কথার সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—শরীরের লক্ষণ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব।—(১ম অঃ, ১ম আঃ, ১১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। যেখানে চর্ম্ম নাই, সেখানে কোন ইন্দ্রিয় নাই। সুতরাং জীবাত্মা, মনঃ ও সুখদুঃখাদির অধিষ্ঠানরূপ শরীর ত্বক্‌পর্য্যন্ত, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত চর্ম্ম আছে, সেই পর্য্যন্তই শরীর। কারণ, কেশ নখাদিতে চর্ম্ম না থাকায় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই। সুতরাং উহা ইন্দ্রিয়াশ্রয় না হওয়ায় শরীর নহে, শরীরের কোন অবয়বও নহে। এই জন্যই কেশ নখাদিতে চৈতন্য জন্মে না। কেশ নখাদি শরীরের অবয়ব না হইলে উহাতে শরীরাবয়বত্ব অসিদ্ধ। সুতরাং শরীরাবয়বত্ব হেতুর দ্বারা হস্ত পদাদির অবয়বে চৈতন্যের অভাব সাধন করিতে কেশ নখাদি দৃষ্টান্তও হইতে পারে না। কেশ নখাদি শরীরের অবয়ব না হইলেও উহাদিগের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ঐ প্রয়োজনবশতঃই উহারা শরীরের সহিত সৃষ্ট ও শরীরে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,—কেশাদির শরীরের সহিত সংযোগবিশেষ "অর্থকারিত"। "অর্থ" শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন। কেশ নখাদির যে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, তাহার সিদ্ধির জন্যই অদৃষ্টবিশেষবশতঃ শরীরের সহিত কেশ নখাদির সংযোগবিশেষ জন্মিয়াছে। সুতরাং ঐ সংযোগবিশেষকে অর্থকারিত বা প্রয়োজনজনিত বলা যায়॥ ৫২ ॥

ভাষ্য। ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা—

অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে—

সূত্র। শরীরগুণবৈধর্ম্ম্যাৎ ॥৫৩॥৩২৪॥

অনুবাদ। যেহেতু (চৈতন্যে) শরীরের গুণের বৈধর্ম্ম্য আছে।

ভাষ্য। দ্বিবিধঃ শরীরগুণোঽপ্রত্যক্ষশ্চ গুরুত্বং, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যশ্চ রূপাদিঃ। বিধান্তরন্তু চেতনা, নাপ্রত্যক্ষা সংবেদ্যত্বাৎ, নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা মনোবিষয়ত্বাৎ, তস্মাদ্‌দ্রব্যান্তরগুণ ইতি।

অনুবাদ। শরীরের গুণ দ্বিবিধ, (১) অপ্রত্যক্ষ (যেমন) গুরুত্ব, এবং (২) বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, (যেমন) রূপাদি। কিন্তু চৈতন্য প্রকারান্তর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রকার হইতে ভিন্ন প্রকার। (কারণ) সংবেদ্যত্ব অর্থাৎ মানস-প্রত্যক্ষবিষয়ত্ববশতঃ চৈতন্য (১) অপ্রত্যক্ষ নহে। মনের বিষয়ত্ব অর্থাৎ মনো-গ্রাহ্যত্ববশতঃ (২) বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অতএব (চৈতন্য) দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ শরীরভিন্ন দ্রব্যের গুণ।

টিপ্পনী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে এই সূত্র দ্বারা আরও একটি হেতু বলিয়াছেন যে, শরীরের গুণসমূহের সহিত চৈতন্যের বৈধর্ম্ম্য আছে, সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে পারে না। মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শরীরের গুণ দুই প্রকার—এক প্রকার অতীন্দ্রিয়, অন্য প্রকার বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে হয়। সুতরাং শরীরে যে গুরুত্বরূপ গুণ আছে, উহা অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রিয় গুণ। এবং শরীরে যে রূপাদি গুণ আছে, উহা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ। শরীরে এই দ্বিবিধ গুণ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার আর কোন গুণ সিদ্ধ নাই। কিন্তু চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত প্রকারদ্বয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুণ। কারণ, জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রিয় গুণ নহে। মনোমাত্রগ্রাহ্য বলিয়া বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যও নহে। সুতরাং শরীরের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ গুণের সহিত চৈতন্যের বৈধর্ম্ম্যবশতঃ চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে পারে না। শরীরের গুণ হইলে তাহা গুরুত্বের ন্যায় একেবারে অতীন্দ্রিয় হইবে, অথবা রূপাদির ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। পরন্তু শরীরের যেগুলি বিশেষ গুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ), সেগুলি চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানও বিশেষ গুণ বলিয়াই সিদ্ধ, সুতরাং উহা শরীরের গুণ হইলে রূপাদির ন্যায় শরীরের বিশেষ গুণ হইবে। কিন্তু উহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এই তাৎপর্য্যেই উদ্দ্যোতকর শেষে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,[১] চৈতন্য বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় সুখাদির ন্যায় শরীরের গুণ নহে। ভাষ্যে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ই বুঝিতে হইবে। মন ইন্দ্রিয় হইলেও ন্যায়দর্শনে ইন্দ্রিয়-বিভাগ-সূত্রে (১ম অঃ, ১ম আঃ, ১২শ সূত্রে) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ না থাকায়, ন্যায়দর্শনে "ইন্দ্রিয়" শব্দের দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ই বিবক্ষিত বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণসূত্রভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য॥ ৫৩॥

সূত্র। ন রূপাদীনামিতরেতরবৈধর্ম্ম্যাৎ ॥৫৪॥৩২৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু রূপাদির অর্থাৎ শরীরের গুণ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শেরও পরস্পর বৈধর্ম্ম্য আছে।

ভাষ্য। যথা ইতরেতরবিধর্ম্মাণো রূপাদয়ো ন শরীরগুণত্বং জহতি, এবং রূপাদিবৈধর্ম্ম্যাচ্চেতনা শরীরগুণত্বং ন হাস্যতীতি।

অনুবাদ। যেমন পরস্পর বৈধর্ম্ম্যযুক্ত রূপাদি শরীরের গুণত্ব ত্যাগ করে না, এইরূপ রূপাদির বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত চৈতন্য শরীরের গুণত্ব ত্যাগ করিবে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, শরীরের গুণের

১। ন শরীরগুণশ্চেতনা, বাহ্যকরণাপ্রত্যক্ষত্বাৎ সুখাদিবদিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

বৈধর্ম্ম্য থাকিলেই যে তাহা শরীরের গুণ হয় না, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য থাকায় ঐ রূপাদিও শরীরের গুণ হইতে পারে না। রূপের চাক্ষুষত্ব আছে, কিন্তু রস, গন্ধ ও স্পর্শের চাক্ষুষত্ব নাই। রসের রাসনত্ব বা রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে রূপ, গন্ধ ও স্পর্শে উহা নাই। এইরূপ গন্ধ ও স্পর্শে যথাক্রমে যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব ও ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে, রূপ এবং রসে তাহা নাই। সুতরাং রূপাদি পরস্পর বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট। কিন্তু তাহা হইলেও যেমন উহারা শরীরের গুণ হইতেছে, তদ্রূপ ঐ রূপাদির বৈধর্ম্ম্য থাকিলেও চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে পারে। ফলকথা, পূর্ব্বসূত্রোক্ত "শরীরগুণবৈধর্ম্ম্য" শরীরগুণত্বাভাবের সাধক হয় না। কারণ, রূপাদিতে উহা ব্যভিচারী ॥ ৫৪ ॥

সূত্র। ঐন্দ্রিয়কত্বাদ্রূপাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥৫৫॥৩২৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) রূপাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ববশতঃ (এবং অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ) প্রতিষেধ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

ভাষ্য। অপ্রত্যক্ষত্বাচ্চেতি। যথেতরেতরবিধর্ম্মাণো রূপাদয়ো ন দ্বৈবিধ্যমতিবর্ত্তন্তে, তথা রূপাদিবৈধর্ম্ম্যাচ্চেতনা ন দ্বৈবিধ্যমতিবর্ত্তেত যদি শরীরগুণঃ স্যাদিতি, অতিবর্ত্ততে তু, তস্মান্ন শরীরগুণ ইতি।

ভূতেন্দ্রিয়মনসাং জ্ঞান-প্রতিষেধাৎ সিদ্ধে সত্যারম্ভো বিশেষজ্ঞাপনার্থঃ। বহুধা পরীক্ষ্যমাণং তত্ত্বং সুনিশ্চিততরং ভবতীতি।

অনুবাদ। এবং অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ। (তাৎপর্য্য) যেমন পরস্পর বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট রূপাদি দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম করে না, তদ্রূপ চৈতন্য যদি শরীরের গুণ হয়, তাহা হইলে রূপাদির বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম না করুক? কিন্তু অতিক্রম করে, সুতরাং (চৈতন্য) শরীরের গুণ নহে।

ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানের প্রতিষেধপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধ হইলেও আরম্ভ অর্থাৎ শেষে আবার এই প্রকরণের আরম্ভ বিশেষ জ্ঞাপনের জন্য। বহু প্রকারে পরীক্ষ্যমাণ তত্ত্ব সুনিশ্চিততর হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, রূপাদি গুণের "ঐন্দ্রিয়কত্ব" অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকায় উহাদিগের শরীরগুণত্বের প্রতিষেধ হয় না। মহর্ষির সূত্র পাঠের দ্বারা সরলভাবে তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য থাকিলেও ঐ বৈধর্ম্ম্য উহাদিগের শরীরগুণত্বের বাধক হয় না।

কারণ, চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম শরীরের গুণবিশেষের বৈধর্ম্ম্য হইলেও সামান্যতঃ শরীরগুণের বৈধর্ম্ম্য নহে। শরীরে যে রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের বোধ হয়, ঐ চারিটি গুণই বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং উহারা শরীরের গুণ হইতে পারে। প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না, এইরূপ হইলেই সেই গুণে সামান্যতঃ শরীরগুণের বৈধর্ম্ম্য থাকে রূপাদি গুণে ঐ বৈধর্ম্ম্য নাই। কিন্তু চৈতন্যে সামান্যতঃ শরীরগুণের ঐ বৈধর্ম্ম্য থাকায় চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই ভাবেই মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রোক্ত "ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের পরে "অপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ" এই বাক্যের পূরণ করিয়া এই সূত্রে অপ্রত্যক্ষত্বও মহর্ষির অভিমত আর একটি হেতু, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, শরীরে রূপাদি যে সমস্ত গুণ আছে, সে সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা অতীন্দ্রিয়। এই দুই প্রকার ভিন্ন শরীরে আর কোন প্রকার গুণ নাই। পূর্ব্বোক্ত ৫৩শ সূত্রভাষ্যেই ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন। এখানে পূর্ব্বোক্ত ঐ সিদ্ধান্তকেই আশ্রয় করিয়া ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, শরীরস্থ রূপাদি গুণগুলি পরস্পর বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট হইলেও উহারা পূর্ব্বোক্ত দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয়, এই প্রকারদ্বয় হইতে অতিরিক্ত কোন প্রকার হয় না; সুতরাং শরীরস্থ রূপাদি গুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য যেমন উহাদিগের তৃতীয়প্রকারতার প্রয়োজক হয় না, তদ্রূপ চৈতন্যে যে রূপাদি গুণের বৈধর্ম্ম্য আছে, উহাও চৈতন্যের তৃতীয়প্রকারতার প্রয়োজক হইবে না। সুতরাং চৈতন্যকে শরীরের গুণ বলিলে উহাও পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রকার হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুণ হইতে পারে না। চৈতন্যে রূপাদির বৈধর্ম্ম্য থাকিলেও তৎপ্রযুক্ত উহা পূর্ব্বোক্ত দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে উহা অতীন্দ্রিয় হইবে অথবা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু চৈতন্য ঐরূপ দ্বিবিধ গুণের অন্তর্গত কোন গুণ নহে। উহা অতীন্দ্রিয়ও নহে, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে। উহা সুখ-দুঃখাদির ন্যায় মনোমাত্রগ্রাহ্য; সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় শরীরে চৈতন্য নাই, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ ভূতের চৈতন্য-খণ্ডনের দ্বারাই চৈতন্য যে ভূতাত্মক শরীরের গুণ নহে, ইহা মহর্ষি পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তথাপি শরীর চেতন নহে অর্থাৎ চেতন বা আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকারে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য মহর্ষি শেষে আবার এই প্রকরণটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির উদ্দেশ্য সমর্থনের জন্য শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্ব বহুপ্রকারে পরীক্ষ্যমাণ হইলে সুনিশ্চিততর হয়, অর্থাৎ ঐ তত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ নিশ্চয় জন্মে, তদপেক্ষা আরও দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে। বস্তুতঃ শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ যে মোহ বা মিথ্যা জ্ঞান সর্ব্ব-জীবের অনাদিকাল হইতে আজন্মসিদ্ধ, উহা নিবৃত্ত করিতে যে আত্মদর্শন আবশ্যক, তাহাতে আত্মা শরীর নহে, ইত্যাদি প্রকারে আত্মার মনন আবশ্যক। বহু হেতুর দ্বারা বহুপ্রকারে মনন করিলেই উহা আত্মদর্শনের সাধন হইতে পারে। শাস্ত্রেও বহু হেতুর দ্বারাই মননের বিধি পাওয়া

যায়[১]। সুতরাং মননশাস্ত্রের বক্তা মহর্ষি গোতমও ঐ শ্রুতিসিদ্ধ মননের নির্ব্বাহের জন্য নানা প্রকারে নানা হেতুর দ্বারা আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

শরীরগুণব্যতিরেকপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। পরীক্ষিতা বুদ্ধিঃ, মনস ইদানীং পরীক্ষাক্রমঃ, তৎ কিং প্রতিশরীরমেকমনেকমিতি বিচারে—

অনুবাদ। বুদ্ধি পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন মনের পরীক্ষার "ক্রম" অর্থাৎ স্থান উপস্থিত, সেই মন প্রতিশরীরে এক, কি অনেক, এই বিচারে (মহর্ষি বলিতেছেন),—

সূত্র। জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ ॥ ৫৬॥৩২৭ ॥

অনুবাদ। জ্ঞানের অযৌগপদ্যবশতঃ অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক জ্ঞান জন্মে না, এ জন্য মন এক।

ভাষ্য। অস্তি খলু বৈ জ্ঞানাযৌগপদ্যমেকৈকস্যেন্দ্রিয়স্য যথাবিষয়ং, করণস্যৈকপ্রত্যয়নির্ব্বৃত্তৌ সামর্থ্যাৎ,—ন তদেকত্বে মনসো লিঙ্গং। যত্তু খল্বিদমিন্দ্রিয়ান্তরাণাং বিষয়ান্তরেষু জ্ঞানাযৌগপদ্যমিতি তল্লিঙ্গং। কস্মাৎ? সম্ভবতি খলু বৈ বহুষু মনঃস্বিন্দ্রিয়-মনঃসংযোগযৌগপদ্যমিতি জ্ঞানযৌগপদ্যং স্যাৎ, নতু ভবতি, তস্মাদ্বিষয়ে প্রত্যয়পর্য্যায়াদেকং মনঃ।

অনুবাদ। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনের (একই ক্ষণে) একমাত্র জ্ঞানের উৎপাদনে সামর্থ্যবশতঃ এক এক ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয়ে জ্ঞানের অযৌগপদ্য আছেই, তাহা মনের একত্বে লিঙ্গ (সাধক) নহে। কিন্তু এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহে জ্ঞানের অযৌগপদ্য, তাহা (মনের একত্বে) লিঙ্গ। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) মন বহু হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের যৌগপদ্য সম্ভব হয়, এ জন্য জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) যৌগপদ্য হইতে পারে, কিন্তু হয় না; অতএব বিষয়ে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের নিজ বিষয়ে প্রত্যক্ষের ক্রমবশতঃ মন এক।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার কথিত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া, ক্রমানুসারে ষষ্ঠ প্রমেয় মনের পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়জন্য যে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের

১। "মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ"। "উপপত্তিভিঃ" বহুভির্হেতুভিরনুমাতব্যঃ, অন্যথা বহুবচনানুপপত্তেঃ। পঞ্চতা—মাথুরী টীকা।

সংযোগও কারণ। কিন্তু প্রতিশরীরে একই মন ক্রমশঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি মনই পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহা বিচার্য্য। কেহ কেহ প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার করিয়া উহা উপপাদন করিতে প্রতি শরীরে পাঁচটি মনই স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কারে" শঙ্কর মিশ্রের কথার দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। (বৈশেষিক দর্শন, ৩য় অঃ, ২য় আঃ, ৩য় সূত্রের "উপস্কার" দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবশতঃ প্রতি শরীরে মন এক অথবা মন পাঁচটি, এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে। মহর্ষি গোতম ঐ সংশয় নিরাসের জন্যও এই সূত্রের দ্বারা প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম, মহর্ষি কণাদের ন্যায় প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মন এক। কারণ, জ্ঞানের অর্থাৎ মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয়জন্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহার যৌগপদ্য নাই। একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না, অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য নাই, ইহা মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত। মনের একত্ব সমর্থনের জন্য মহর্ষি কণাদ ও গোতম "জ্ঞানাযৌগপদ্য" হেতুর উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম আরও অনেক সূত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং যুগপৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তিই মনের লিঙ্গ বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষি গোতম যে জ্ঞানের অযৌগপদ্যকে এই সূত্রে মনের একত্বের হেতু বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এক একটি ইন্দ্রিয় যে, তাহার নিজ বিষয়ে একই ক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহা সর্ব্বসম্মত, কিন্তু উহা মনের একত্বের সাধক নহে। কারণ, যাহা জ্ঞানের করণ, তাহা একই ক্ষণে একটিমাত্র জ্ঞান জন্মাইতেই সমর্থ, একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞান জন্মাইতে জ্ঞানের করণের সামর্থ্যই নাই। সুতরাং মন বহু হইলেও একই ক্ষণে এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একাধিক জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষের যে উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের যে অযৌগপদ্য, তাহাই মনের একত্বের সাধক। কারণ, মন বহু হইলে একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মনের সংযোগ হইতে পারে, সুতরাং একই ক্ষণে মনঃসংযুক্ত অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু একই ক্ষণে ঐরূপ অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না, উহা অনুভবসিদ্ধ নহে, একই মনের সহিত ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের সংযোগজন্য কালভেদেই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং প্রতিশরীরে মন এক। মন এক হইলে অতিসূক্ষ্ম একই মনের একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় কারণের অভাবে একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

সূত্র। ন যুগপদনেকক্রিয়োপলব্ধেঃ ॥৫৭॥৩২৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ প্রতি শরীরে মন এক নহে। কারণ, (একই ব্যক্তির) যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। অয়ং খল্বধ্যাপকোঽধীতে, ব্রজতি, কমণ্ডলুং ধারয়তি, পন্থানং পশ্যতি, শৃণোত্যারণ্যজান্ শব্দান্, বিভ্যদ্[১]ব্যাললিঙ্গানি বুভুৎসতে, স্মরতি চ গন্তব্যং স্থানীয়[২]মিতি ক্রমস্যাগ্রহণাদ্‌যুগপদেতাঃ ক্রিয়া ইতি প্রাপ্তং মনসো বহুত্বমিতি।

অনুবাদ। এই এক অধ্যাপকই অধ্যয়ন করিতেছেন, গমন করিতেছেন, কমণ্ডলু ধারণ করিতেছেন, পথ দেখিতেছেন, আরণ্যজ অর্থাৎ অরণ্যবাসী সিংহাদি হইতে উৎপন্ন শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, ভীত হইয়া ব্যাললিঙ্গ অর্থাৎ হিংস্র জন্তুর চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এবং গন্তব্য নগরী স্মরণ করিতেছেন, এই সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় এই সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ জন্মে, এ জন্য মনের বহুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঐ অধ্যাপকের একই শরীরে বহু মন আছে, ইহা বুঝা যায়।

টিপ্পনী। প্রতি শরীরে মনের বহুত্ববাদীর যুক্তি এই যে, একই ব্যক্তির যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক ক্রিয়া জন্মে, ইহা উপলব্ধি করা যায়, সুতরাং প্রতিশরীরে বহু মনই বিদ্যমান থাকে। প্রতি শরীরে একটিমাত্র মন হইলে যুগপৎ অনেক ক্রিয়া জন্মিতে পারে না। মহর্ষি এই যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন একই অধ্যাপক কমণ্ডলু ধারণ করতঃ কোন গ্রন্থ বা স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে এবং পথ দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থানে যাইতেছেন, তখন অরণ্যবাসী কোন হিংস্র জন্তুর শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়বশতঃ ঐ হিংস্র জন্তু কোথায়, কি ভাবে আছে এবং উহা বস্তুতঃ হিংস্র জন্তু কি না, ইহা অনুমান করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া হিংস্র জন্তুর অসাধারণ চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছা করেন এবং সত্বরই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে ব্যগ্র হইয়া পুনঃ পুনঃ গন্তব্য স্থানকে স্মরণ করেন। ঐ অধ্যাপকের এই সমস্ত ক্রিয়া কালভেদে ক্রমশঃ জন্মে, ইহা বুঝা যায় না। ঐ সমস্ত ক্রিয়াই একই সময়ে জন্মে, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং ঐ অধ্যাপকের শরীরে এবং ঐরূপ একই সময়ে বহুক্রিয়াকারী জীবমাত্রেরই শরীরে বহু মন আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, একই মনের দ্বারা যুগপৎ নানাজাতীয় নানা ক্রিয়া জন্মিতে পারে না। সূত্রে "ক্রিয়া" শব্দের দ্বারা ধাত্বর্থরূপ ক্রিয়াই বিবক্ষিত ॥৫৭॥

১। অনেক পুস্তকেই এখানে "বিভেতি" এইরূপ পাঠ থাকিলেও কোন প্রাচীন পুস্তকে এবং জয়ন্ত ভট্টের উদ্ধৃত পাঠে "বিভ্যৎ" এইরূপ পাঠই আছে। ন্যায়মঞ্জরী, ৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। এখানে বহু পাঠান্তর আছে। কোন পুস্তকে "স্থানীয়ং" এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। "স্থানীয়" শব্দের দ্বারা নগরী বুঝা যায়। অমরকোষ, পুরবর্গ, ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য। "তাৎপর্য্যটীকায়" পাওয়া যায়,; "সংস্তায়নং স্থাপনং"।

সূত্র। অলাতচক্রদর্শনবত্তদুপলব্ধিরাশুসঞ্চারাৎ ॥
॥৫৮॥৩২৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) আশুসঞ্চার অর্থাৎ অতিদ্রুতগতিপ্রযুক্ত "অলাতচক্র" দর্শনের ন্যায় সেই (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ একই ব্যক্তির অধ্যয়নাদি অনেক ক্রিয়া ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রম হয়।

ভাষ্য। আশুসঞ্চারাদলাতস্য ভ্রমতো বিদ্যমানঃ ক্রমো ন গৃহ্যতে, ক্রমস্যাগ্রহণাদবিচ্ছেদবুদ্ধ্যা চক্রবদ্‌বুদ্ধির্ভবতি, তথা বুদ্ধীনাং ক্রিয়াণাঞ্চাশুবৃত্তিত্বাদ্বিদ্যমানঃ ক্রমো ন গৃহ্যতে, ক্রমস্যাগ্রহণাদ্‌যুগপৎ ক্রিয়া ভবন্তীত্যভিমানো ভবতি।

কিং পুনঃ ক্রমস্যাগ্রহণাদ্‌যুগপৎক্রিয়াভিমানোঽথ যুগপদ্‌ভাবাদেব যুগপদনেকক্রিয়োপলব্ধিরিতি? নাত্র বিশেষপ্রতিপত্তেঃ কারণমুচ্যত ইতি। উক্তমিন্দ্রিয়ান্তরাণাং বিষয়ান্তরেষু পর্য্যায়েণ বুদ্ধয়ো ভবন্তীতি, তচ্চাপ্রত্যাখ্যেয়মাত্মপ্রত্যক্ষত্বাৎ। **অথাপি দৃষ্টশ্রুতানর্থাংশ্চিন্তয়তঃ ক্রমেণ বুদ্ধয়ো বর্ত্তন্তে ন যুগপদনেনানুমাতব্যমিতি।** বর্ণপদবাক্যবুদ্ধীনাং তদর্থবুদ্ধীনাঞ্চাশুবৃত্তিত্বাৎ ক্রমস্যাগ্রহণং। কথং? বাক্যস্থেষু খলু বর্ণেষূচ্চরৎসু[১] প্রতিবর্ণং তাবচ্ছ্রবণং ভবতি, শ্রুতং বর্ণমেকমনেকং বা পদভাবেন প্রতিসন্ধত্তে, প্রতিসন্ধায় পদং ব্যবস্যতি, পদব্যবসায়েন স্মৃত্যা পদার্থং প্রতিপদ্যতে, পদসমূহপ্রতিসন্ধানাচ্চ বাক্যং ব্যবস্যতি, সম্বদ্ধাংশ্চ পদার্থান্ গৃহীত্বা বাক্যার্থং প্রতিপদ্যতে। ন চাসাং ক্রমেণ বর্ত্তমানানাং বুদ্ধীনামাশুবৃত্তিত্বাৎ ক্রমো গৃহ্যতে, তদেতদনুমানমন্যত্র বুদ্ধিক্রিয়াযৌগপদ্যাভিমানস্যেতি। ন চাস্তি মুক্তসংশয়া যুগপদুৎপত্তির্বুদ্ধীনাং, যয়া মনসাং বহুত্বমেকশরীরেঽনুমীয়েত ইতি।

১। "উৎ"শব্দপূর্ব্বক চর ধাতু সকর্ম্মক হইলেই তাহার উত্তর আত্মনেপদের বিধান আছে। ভাষ্যকার এখানে উৎপত্তি অর্থেই "উৎ"শব্দপূর্ব্বক "চর"ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। "উচ্চরৎসু" এই বাক্যের ব্যাখ্যা "উৎপদ্যমানেষু"।

অনুবাদ। ঘূর্ণনকারী অলাতের (অলাতচক্র নামক যন্ত্রবিশেষের) বিদ্যমান ক্রম অর্থাৎ উহার ঘূর্ণনক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও উহা দ্রুতগতি প্রযুক্ত গৃহীত হয় না, ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় অবিচ্ছেদ-বুদ্ধিবশতঃ চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে। তদ্রূপ বুদ্ধিসমূহের এবং ক্রিয়াসমূহের আশুবৃত্তিত্ব অর্থাৎ অতিশীঘ্র উৎপত্তিপ্রযুক্ত বিদ্যমান ক্রম গৃহীত হয় না। ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ হইতেছে, এইরূপ ভ্রম জন্মে।

(প্রশ্ন) ক্রমের অজ্ঞানবশতঃই কি যুগপৎ ক্রিয়ার ভ্রম হয় অথবা যুগপৎ উৎপত্তিবশতঃই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় ? এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের কারণ কথিত হইতেছে না। (উত্তর) ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহ বিষয়ে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষের অযৌগপদ্য আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ (মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ববশতঃ) প্রত্যাখ্যান করা যায় না, অর্থাৎ একই ক্ষণে যে নানা ইন্দ্রিয়জন্য নানা প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা মনের দ্বারা অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং উহা অস্বীকার করা যায় না। পরন্তু দৃষ্ট ও শ্রুত বহু পদার্থবিষয়ক চিন্তাকারী ব্যক্তির ক্রমশঃ বুদ্ধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ইহার দ্বারা (অন্যত্রও বুদ্ধির অযৌগপদ্য) অনুমেয়। [উদাহরণ দ্বারা জ্ঞানের অযৌগপদ্য বুঝাইতেছেন] বর্ণ, পদ ও বাক্যবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের এবং সেই পদ ও বাক্যের অর্থবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের "আশুবৃত্তিত্ব"বশতঃ অর্থাৎ অবিচ্ছেদে অতিশীঘ্র উৎপত্তিপ্রযুক্ত ক্রমের জ্ঞান হয় না। (প্রশ্ন) কিরূপ ? (উত্তর) বাক্যস্থিত বর্ণসমূহ উৎপদ্যমান হইলে অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণকালে প্রত্যেক বর্ণের শ্রবণ হয়,—শ্রুত এক বা অনেক বর্ণ পদরূপে প্রতিসন্ধান করে, প্রতিসন্ধান করিয়া পদ নিশ্চয় করে,—পদ নিশ্চয়ের দ্বারা স্মৃতিরূপ পদার্থ বোধ করে, এবং পদসমূহের প্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত বাক্য নিশ্চয় করে, এবং সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর যোগ্যতাবিশিষ্ট পদার্থসমূহকে বুঝিয়া বাক্যার্থ বোধ করে। কিন্তু ক্রমশঃ বর্ত্তমান অর্থাৎ ক্ষণবিলম্বে ক্রমশঃ জায়মান এই (পূর্ব্বোক্ত) বুদ্ধিসমূহের আশুবৃত্তিত্ববশতঃ ক্রম গৃহীত হয় না,- সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বর্ণশ্রবণাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্য বা ক্রমিকত্ব অন্যত্র বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যৌগপদ্য ভ্রমের অনুমান অর্থাৎ অনুমাপক হয়। বুদ্ধিসমূহের নিঃসংশয় যুগপদুৎপত্তিও নাই, যদ্দ্বারা এক শরীরে মনের বহুত্ব অনুমিত হইবে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, একই ব্যক্তির কোন সময়ে অধ্যয়ন, গমন, পথদর্শন প্রভৃতি যে অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, ঐ সমস্ত ক্রিয়াও যুগপৎ জন্মে না—অবিচ্ছেদে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে। কিন্তু অবিচ্ছেদে অতিশীঘ্র ঐ সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়ায় উহার ক্রম থাকিলেও ঐ ক্রমের জ্ঞান হয় না, এজন্য উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে অর্থাৎ একই ক্ষণে গমনাদি ঐ সমস্ত ক্রিয়া জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। মহর্ষি ইহা সমর্থন করিতে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন—"অলাতচক্রদর্শন"। "অলাত" শব্দের অর্থ অঙ্গার, উহার অপর নাম উল্মুক[১]। প্রাচীন কালে মধ্যভাগে অঙ্গার সন্নিবিষ্ট করিয়া এক প্রকার যন্ত্রবিশেষ নির্ম্মিত হইত। উহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে তখন (বর্ত্তমান দেশপ্রসিদ্ধ আতসবাজীর ন্যায়) উহা অতি দ্রুতবেগে চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হওয়ায় উহা "অলাতচক্র" নামে কথিত হইয়াছে। সুপ্রাচীন কাল হইতেই নানা শাস্ত্রের নানা গ্রন্থে ঐ "অলাত-চক্র" দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যুদ্ধবিশেষে পূর্ব্বোক্ত "অলাতচক্রের" প্রয়োগ হইত। "ধনুর্ব্বেদসংহিতা"য় ঐ "অলাতচক্রে"র উল্লেখ দেখা যায়[২]। মহর্ষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "অলাতচক্রে"র ঘূর্ণনকালে যেমন ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘূর্ণনক্রিয়া একই ক্ষণে জায়মান বলিয়া দেখা যায়, তদ্রূপ অনেক স্থলে ক্রিয়া ও বুদ্ধি বস্তুতঃ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও একই ক্ষণে উৎপন্ন বলিয়া বুঝা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ উপলব্ধি ভ্রম। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, "অলাত-চক্রে"র ঘূর্ণন ক্রিয়াজন্য যে যে স্থানের সহিত উহার সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম স্থানের সহিত সংযোগের অনন্তরই দ্বিতীয় স্থানের সহিত সংযোগ জন্মে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, পূর্ব্বসংযোগের ধ্বংস ব্যতীত উত্তরসংযোগ জন্মিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বসংযোগের অনন্তরই অপর সংযোগ, তাহার অনন্তরই অপর সংযোগ, এইরূপে আকাশে নানা স্থানের সহিত ক্রমশঃই ঐ অলাতচক্রের বিভিন্ন নানা সংযোগ স্বীকার্য্য হওয়ায় ঐ সমস্ত বিভিন্ন সংযোগের জনক যে অলাতচক্রের ঘূর্ণনক্রিয়া, উহাও ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া, উহা একটিমাত্র ক্রিয়া নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ ঘূর্ণনক্রিয়াসমূহের যে ক্রম আছে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ অলাতচক্রের আশুসঞ্চার অর্থাৎ অতিদ্রুত ঘূর্ণনপ্রযুক্ত ঐ সমস্ত ঘূর্ণন-ক্রিয়ার ক্রম বুঝিতে পারা যায় না। ঐ ঘূর্ণন-ক্রিয়ার বিচ্ছেদ না থাকায় অবিচ্ছেদবুদ্ধিবশতঃ ঐ স্থলে চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে। সুতরাং এ সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে। অর্থাৎ একই ক্ষণে ঐ ঘূর্ণনক্রিয়াসমূহ জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম জ্ঞান হইয়া থাকে। "দোষ" ব্যতীত ভ্রম হইতে পারে না। ভ্রমের বিশেষ কারণের নাম দোষ। তাই মহর্ষি এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমের কারণ দোষ বলিয়াছেন "আশুসঞ্চার"। অলাতচক্রের অতিদ্রুত সঞ্চার অর্থাৎ অতিদ্রুত ঘূর্ণনই তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রমের বিশেষ কারণ, উহাই সেখানে দোষ। এইরূপ স্থলবিশেষে যে সমস্ত বুদ্ধি ও যে সমস্ত ক্রিয়া অবিচ্ছেদে শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয়, তাহার ক্রম

১। অলাতোঽঙ্গারমুল্মুকং।—অমরকোষ, বৈশ্যবর্গ।

২। গজানাং পর্ব্বতারোহণং অলাতচক্রাদিভির্ভীতিবারণং।—ধনুর্ব্বেদসংহিতা।

থাকিলেও অবিচ্ছেদে অতিশীঘ্র উৎপত্তিবশতঃ সেখানে ঐ সমস্ত ক্রিয়া ও বুদ্ধির ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় তাহাতেও যৌগপদ্যের ভ্রম হয়। ফলকথা, অলাতচক্রের ঘূর্ণনক্রিয়া দৃষ্টান্তে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত একই ব্যক্তির অধ্যয়ন, গমন, পথদর্শন প্রভৃতি অনেক ক্রিয়াও ক্রমশঃ জন্মে, এবং উহার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় ঐ সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। ঐ ক্রিয়াসমূহ ও বুদ্ধিসমূহের যৌগপদ্য ভ্রমের কারণ দোষ — ঐ ক্রিয়াসমূহ ও বুদ্ধিসমূহের "আশুবৃত্তিত্ব"। ভাষ্যকার উৎপত্তি অর্থেও "বৃত"ধাতু ও "বৃত্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি শীঘ্র যাহার বৃত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহাকে "আশুবৃত্তি" বলা যায়। অবিচ্ছেদে অতি শীঘ্র উৎপত্তিই "আশুবৃত্তিত্ব", তৎপ্রযুক্ত অনেক ক্রিয়াবিশেষ ও অনেক বুদ্ধিবিশেষের যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই প্রশ্ন করিবেন যে, ক্রিয়াসমূহের ক্রমের জ্ঞান না হওয়াতেই তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রম হয় অথবা ক্রিয়াসমূহের বস্তুতঃ যুগপৎ উৎপত্তি হয় বলিয়াই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, ইহা কিরূপে বুঝিব? এ বিষয়ে সংশয়নিবর্ত্তক বিশেষ জ্ঞানের কারণ কিছুই বলা হয় নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, শেষে নিজেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য নানাজাতীয় নানা বুদ্ধি যে, ক্রমশঃই জন্মে, উহা একই ক্ষণে জন্মে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষের ঐ অযৌগপদ্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, উহা আত্মপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ উহা মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই ঐ অযৌগপদ্য বুঝিতে পারা যায়। "আত্মন্" শব্দের দ্বারা এখানে মন বুঝিলে "আত্মপ্রত্যক্ষ" শব্দের দ্বারা সহজেই মানস প্রত্যক্ষের বিষয়, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা সর্ব্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদ্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের কথা এই যে, যে স্থলে বিষয়বিশেষে একাগ্রমনা হইয়া সেই বিষয়ের দর্শনাদি করে, সে স্থলে বিলম্বেই নানা জ্ঞান জন্মে, এবং সেইরূপ স্থলেই সেই সমস্ত নানা জ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের দ্বারা বুঝা যায়। সর্ব্বত্রই সকল জ্ঞানের অযৌগপদ্য মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। পরন্তু অনেক স্থলে অনেক জ্ঞান যে যুগপৎই জন্মে, ইহা আমাদিগের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভাষ্যকার এই জন্যই শেষে মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, দৃষ্ট ও শ্রুত বহু বিষয় চিন্তা করিলে তখন ক্রমশঃই নানা বুদ্ধি জন্মে, যুগপৎ নানা বুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদ্য অর্থাৎ ক্রমিকত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার উদাহরণের উল্লেখপূর্ব্বক শেষে তাঁহার অভিমত অনুমান বুঝাইতে বলিয়াছেন যে,—কেহ কোন বাক্যের উচ্চারণ করিলে, ঐ বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তির প্রথমে ক্রমশঃ ঐ বাক্যস্থ প্রত্যেক বর্ণের শ্রবণ হয়, তাহার পরে শ্রুত এক বা অনেক বর্ণকে এক একটি পদ বলিয়া বুঝে, তাহার পরে পদজ্ঞানজন্য পদার্থের স্মরণ করে, তাহার পরে সেই বাক্যস্থ সমস্ত পদগুলির জ্ঞান হইলে ঐ পদসমূহকে একটি বাক্য বলিয়া বুঝে, তাহার পরে পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থগুলির পরস্পর যোগ্যতা সম্বন্ধের জ্ঞানপূর্ব্বক বাক্যার্থ বোধ করে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণজ্ঞান, পদজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞান এবং পদার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থ-

জ্ঞান, এই সমস্ত বুদ্ধি যে ক্রমশঃই জন্মে, ইহা সর্ব্বসম্মত। ঐ সমস্ত বুদ্ধির আশুবৃত্তিত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবিচ্ছেদে শীঘ্র উৎপত্তি হওয়ায় উহাদিগের ক্রম থাকিলেও ঐ ক্রম বুঝা যায় না। সুতরাং ঐ সমস্ত বুদ্ধিতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বর্ণজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানগুলি যে, একই ক্ষণে জন্মে না, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে, ইহা উভয় পক্ষের সম্মত, সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে অন্যান্য জ্ঞানমাত্রেরই ক্রমিকত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থলে বর্ণ-জ্ঞানাদি বুদ্ধিসমূহের ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় তাহাতে যৌগপদ্যের ভ্রম হয়, ইহাও উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য, সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে অন্যত্রও বুদ্ধিসমূহ ও ক্রিয়াসমূহের যৌগপদ্য ভ্রম হয়,—ইহা অনুমান-সিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইহা অন্যত্র বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যৌগপদ্য ভ্রমের অনুমান অর্থাৎ অনুমাপক হয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি মুক্তসংশয় অর্থাৎ নিঃসংশয় বা উভয় পক্ষের স্বীকৃত নহে। অর্থাৎ এক ক্ষণেও যে নানা বুদ্ধি জন্মে, ইহা কোন দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত নহে। সুতরাং উহার দ্বারা এক শরীরে বহু মন আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। ফলকথা, কোন স্থলে বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং বুদ্ধির যৌগপদ্যবাদী তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তের অনুমান করিতে পারেন না। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের স্বীকৃত না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না এবং ক্রমশঃ নানা বুদ্ধি জন্মিলেও অবিচ্ছেদে অতি শীঘ্র উৎপত্তিবশতঃ বুদ্ধির ক্রম বুঝা যায় না, সুতরাং তাহাতে যৌগপদ্যের ভ্রম জন্মে, ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং তদ্দ্বারা অন্য বুদ্ধিমাত্রেরই যৌগপদ্যের অনুমান হইতে পারে॥ ৫৮॥

সূত্র। যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু ॥৫৯॥৩৩০॥

অনুবাদ। এবং যথোক্তহেতুত্ববশতঃ (মন) অণু।

ভাষ্য। অণু মন একঞ্চেতি ধর্ম্মসমুচ্চয়ো জ্ঞানাযৌগপদ্যাৎ। মহত্ত্বে মনসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযোগাদ্যুগপদ্বিষয়গ্রহণং স্যাদিতি।

অনুবাদ। জ্ঞানের অযৌগপদ্যবশতঃ মন অণু এবং এক, ইহা ধর্ম্মসমুচ্চয় (জানিবে)। মনের মহত্ত্ব থাকিলে মনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ যুগপৎ বিষয়জ্ঞান হইতে পারে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত জ্ঞানাযৌগপদ্য হেতুর দ্বারা যেমন প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ মনের অণুত্বও সিদ্ধ হয়। তাই মহর্ষি এই সূত্রে "যথোক্তহেতুত্বাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুই প্রকাশ করিয়া "চ" শব্দের দ্বারা মনে অণুত্ব ও একত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়ের সমুচ্চয় (সম্বন্ধ) প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন অণু এবং প্রতি শরীরে এক[১]। প্রতি শরীরে বহু

১। মহর্ষি চরকও এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। "অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ"—চরকসংহিতা—শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৭শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মন থাকিলে যেমন একই সময়ে নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত নানা মনের সংযোগবশতঃ নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তদ্রূপ মন মহৎ বা বৃহৎ পদার্থ হইলেও একই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ একই মনের সংযোগবশতঃ সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষের যখন যৌগপদ্য নাই, জ্ঞানমাত্রেরই অযৌগপদ্য যখন অনুমান প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, তখন মনের অণুত্বও স্বীকার করিতে হইবে। মন পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভবই হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের অভাবে একই সময়ে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তিই মনের অস্তিত্বের সাধক বলিয়াছেন। এখানে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত হেতু যে অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম মনেরই সাধক হয়, ইহা সুব্যক্ত করিয়াছেন। মূলকথা, অনেক সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করিলেও মহর্ষি কণাদ ও গোতম কুত্রাপি জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার না করায় প্রতি শরীরে মনের একত্ব ও অণুত্বই সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞানের অযৌগপদ্য সিদ্ধান্তই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের মূল। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অনেক স্থলেই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর, উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণও মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তানুসারে মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিকাচার্য্যগণও ঐ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে নিরবয়ব ভূতবিশেষকেই মন বলিয়াছেন[১]। তিনি পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর যাহা চরম অংশ, তাহা প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ যাহা "ত্রসরেণু" নামে কথিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, নিত্য, উহা হইতে সূক্ষ্ম ভূত আর নাই, উহাই নিরবয়ব ভূত। মন ঐ নিরবয়ব ভূত (ত্রসরেণু)-বিশেষ। সুতরাং তাঁহার মতে মনের মহত্ত্ব অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, মনের মহত্ত্বপ্রযুক্ত একই সময়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলেও অদৃষ্ট-বিশেষবশতঃ তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই জন্মে। মনের অণুত্ব পক্ষেও ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ ঐ সিদ্ধান্তেও স্বীকার্য্য। রঘুনাথ শিরোমণি এইরূপ নবীন মতের সৃষ্টি করিলেও আর কোন নৈয়ায়িক মনকে ভূতবিশেষ বলেন নাই। কারণ, শরীরমধ্যস্থ নিরবয়ব অসংখ্য ভূত বা অসংখ্য ত্রসরেণুর মধ্যে কোন্ ভূতবিশেষ মন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং ঐরূপ অনন্ত ভূতবিশেষকেই মন বলিতে হয়। পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণির ঐ নবীন মত মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। মহর্ষি মনকে অণুই বলিয়াছেন এবং জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের এবং তাহার অণুত্বের সাধক বলিয়াছেন। অদৃষ্টবিশেষের কারণত্ব অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন করিলে মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি উপপন্ন হয় না। পরন্তু মনের বিভুত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকারেরও কোন বাধা থাকে না। মনের বিভুত্বও অতি প্রাচীন মত। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্য-

১। মনোঽপি চাসমবেতং ভূতং। অদৃষ্টবিশেষোপগ্রহস্ত নিয়ামকত্বাচ্চ নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাবয়োঃ সমানং।—পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।

পাদের দশম সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই মত পাওয়া যায়। উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র তৃতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার ব্যাখ্যায় মনের বিভুত্ব সিদ্ধান্তের অনুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃত বিচারদ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়া, মনের অণুত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। সেখানে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে[১], যদি মন বিভু হইলেও অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ থাকিলেও অদৃষ্ট-বিশেষবশতঃই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে মনের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং মন অসিদ্ধ হইলে আশ্রয়াসিদ্ধিবশতঃ তাহাতে বিভুত্বের অনুমানই হইতে পারে না। কেহ কেহ জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন করিতে বলিয়াছিলেন যে, একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক জ্ঞানের সমস্ত কারণ থাকিলেও তখন যে বিষয়ে প্রথম জিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে, সেই বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মে, জিজ্ঞাসাবিশেষই জ্ঞানের ক্রমের নির্ব্বাহক। উদ্দ্যোতকর এই মতের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে মন স্বীকারের কোনই প্রয়োজন থাকে না। অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসাবিশেষের অভাবেই একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে মন না থাকিলেও ক্ষতি নাই। পরন্তু যেখানে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষেরই ইচ্ছা জন্মে, সেখানে জিজ্ঞাসার অভাব না থাকায় ঐ অনেক প্রত্যক্ষের যৌগপদ্যের আপত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং ঐ আপত্তি নিরাসের জন্য অতি সূক্ষ্ম মন অবশ্য স্বীকার্য্য। উদ্দ্যোতকর আরও বিশেষ বিচারের দ্বারা মন এবং মনের অণুত্ব-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। (১ম অঃ, ১ম আঃ, ১৬শ সূত্রের বার্ত্তিক দ্রষ্টব্য)। জিজ্ঞাসা-বিশেষই জ্ঞানের ক্রম নির্ব্বাহ করে, এই মত উদয়নাচার্য্যও (মনের বিভুত্ববাদ খণ্ডন করিতে) অনুরূপ যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কেবল পূর্ব্বোক্ত যুগপৎ নানাজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তিই মনের অস্তিত্বের সাধক নহে। স্মৃতি প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান মন না থাকিলে জন্মিতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত জ্ঞানও মনের অস্তিত্বের সাধক। ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে ইহা বলিয়াছেন। পরন্তু যুগপৎ নানাজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের অণুত্বের সাধক হওয়ায় মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে উহাকে তাঁহার সম্মত অতিসূক্ষ্ম মনঃপদার্থের লিঙ্গ (সাধক) বলিয়া-ছেন। শেষে এই মনঃপরীক্ষাপ্রকরণে তাঁহার অভিমত জ্ঞানাযৌগপদ্য যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের অণুত্বের এবং প্রতিশরীরে একত্বেরই সাধক, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন ॥৫৯॥

মনঃপরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥

ভাষ্য। মনসঃ খলু ভোঃ সেন্দ্রিয়স্য শরীরে বৃত্তিলাভো নান্যত্র শরীরাৎ, জ্ঞাতুশ্চ পুরুষস্য শরীরায়তনা বুদ্ধ্যাদয়ো বিষয়োপভোগো জিহাসিতহান-

---

১। যদি চ মনসো বৈভবেঽপ্যদৃষ্টবশাৎ ক্রম উপপাদ্যেত, তদা মনসোঽসিদ্ধেরাশ্রয়াসিদ্ধিরেব বৈভবহেতুনামিতি। —ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

মভীপ্সিতাবাপ্তিশ্চ সর্ব্বে চ শরীরাশ্রয়া ব্যবহারাঃ। তত্র খলু বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ, কিময়ং পুরুষকর্ম্মনিমিত্তঃ শরীরসর্গঃ? আহো স্বিদ্ভূতমাত্রাদকর্ম্ম-নিমিত্ত ইতি। শ্রূয়তে খল্বত্র বিপ্রতিপত্তিরিতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়-সহিত মনের শরীরেই বৃত্তিলাভ হয় অর্থাৎ শরীরের মধ্যেই মনের কার্য্য জন্মে, শরীরের বাহিরে মনের বৃত্তিলাভ হয় না। এবং জ্ঞাতা পুরুষের বুদ্ধি প্রভৃতি, বিষয়ের উপভোগ, জিহাসিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অভীপ্সিত বিষয়ের প্রাপ্তি শরীরাশ্রিত এবং সমস্ত ব্যবহারই শরীরাশ্রিত অর্থাৎ শরীর ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যই হইতে পারে না। কিন্তু সেই শরীর-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় জন্মে,—"এই শরীর-সৃষ্টি কি আত্মার কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষজন্য? অথবা কর্ম্ম-নিমিত্তক নহে, ভূতমাত্রজন্য, অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ পঞ্চভূতজন্য? যেহেতু এই বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি শ্রুত হয়।

ভাষ্য। তত্রেদং তত্ত্বং—

অনুবাদ। তন্মধ্যে ইহা তত্ত্ব—

সূত্র। পূর্ব্বকৃত-ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ ॥৬০॥৩৩১॥*

* পূর্ব্বপ্রকরণে মহর্ষি মনের পরীক্ষা করায় এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মনকেই সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা সত্য। কিন্তু মহর্ষি যেরূপ যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বপ্রকরণে মনের অণুত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে মন যে নিরবয়ব দ্রব্য, ইহা বুঝা যায়। মনের অবয়ব না থাকিলে নিরবয়ব-দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা মনের নিত্যত্বই অনুমানসিদ্ধ হয়। মনের নিত্যত্ব স্বীকার-পক্ষে লাঘবও আছে। পরন্তু মহর্ষি গোতম পূর্ব্বে মনের আত্মত্বের আশঙ্কা করিয়া যেরূপ যুক্তির দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার মতে মন নিত্য, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মনের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলে মনকে আত্মা বলা যায় না। দেহাদির ন্যায় মনের অস্থায়িত্বের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি মনের আত্মত্ব-বাদের খণ্ডন করেন নাই কেন? ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। পরন্তু ন্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের "তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" (৩।২।২) এই সূত্রের দ্বারা মনের নিত্যত্বই তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। এই সমস্ত কারণে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কোন ন্যায়াচার্য্যই এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত মনকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মনের আশ্রয় শরীরকেই গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষির এই প্রকরণের শেষ সূত্রগুলিতে প্রণিধান করিলেও শরীরসৃষ্টির অদৃষ্টজন্যত্বই যে, এখানে তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য শ্রুতিতে মনের সৃষ্টিও কথিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতির দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়াচার্য্যগণের কথা এই যে, অনুমানপ্রমাণের দ্বারা যখন মনের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়, তখন শ্রুতিতে যে মনের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, উহার অর্থ শরীরের সহিত সর্ব্বপ্রথম মনের সংযোগের সৃষ্টি, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান বা যুক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় না। শ্রুতিতে যে, অনেক স্থানে ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ আছে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রুতিব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণও নানা স্থানে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ মনের সাহায্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যুর

অনুবাদ। (উত্তর) পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক অদৃষ্টের) সম্বন্ধ-প্রযুক্ত সেই শরীরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ শরীর-সৃষ্টি আত্মার কর্ম্ম বা অদৃষ্টনিমিত্তক, ইহাই তত্ত্ব)।

ভাষ্য। পূর্ব্বশরীরে যা প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভলক্ষণা, তৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্মোক্তং, তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তৎফলস্যানুবন্ধ আত্মসমবেতস্যাবস্থানং, তেন প্রযুক্তেভ্যো ভূতেভ্যস্তস্যোৎপত্তিঃ শরীরস্য, ন স্বতন্ত্রেভ্য ইতি। যদধিষ্ঠানোঽয়মাত্মাঽয়মহমিতি মন্যমানো যত্রাভিযুক্তো যত্রোপভোগতৃষ্ণয়া বিষয়ানুপলভমানো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সংস্করোতি, তদস্য শরীরং. তেন সংস্কারেণ ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণেন ভূতসহিতেন পতিতেঽস্মিন্ শরীরে শরীরান্তরং নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নস্য চাস্য পূর্ব্বশরীরবৎ পুরুষার্থক্রিয়া, পুরুষস্য চ পূর্ব্বশরীরবৎ প্রবৃত্তিরিতি। কর্ম্মাপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যঃ শরীরসর্গে সত্যেতদুপপদ্যত ইতি। দৃষ্টা চ পুরুষগুণেন প্রযত্নেন প্রযুক্তেভ্যো ভূতেভ্যঃ পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থানাং দ্রব্যাণাং রথ-প্রভৃতীনামুৎপত্তিঃ, তয়ানুমাতব্যং "শরীরমপি পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থ-মুৎপদ্যমানং পুরুষস্য গুণান্তরাপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্য উৎপদ্যত" ইতি।

অনুবাদ। পূর্ব্বশরীরে বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মরূপ যে প্রবৃত্তি, তাহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মজনিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাহার ফল। আত্মাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান হইয়া তাহার অবস্থান সেই ফলের "অনুবন্ধ"। তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের অনুবন্ধ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে সেই শরীরের উৎপত্তি হয়, স্বতন্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না। "যদধিষ্ঠান" অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত এই আত্মা "আমি ইহা" এইরূপ অভিমান করতঃ যাহাতে অভিযুক্ত

পরক্ষণেই মনের বিনাশ স্বীকার করা যায় না। মৃত্যুর পরেও যে মন থাকে, ইহাও শ্রুতিসিদ্ধ। মহর্ষি কণাদ ও গোতম সূক্ষ্মশরীরের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইঁহাদিগের সিদ্ধান্তে নিত্য মনই অদৃষ্টবিশেষবশতঃ অভিনব শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং মৃত্যুকালে বহির্গত হয়। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, মৃত্যু-কালে জীবের আতিবাহিক শরীর নামে এক শরীরের উৎপত্তি হয়। তাহার সহিত সম্বন্ধ হইয়া জীবের মনই স্বর্গ ও নরকে গমন করিয়া শরীরান্তরে প্রবিষ্ট হয়। (প্রশস্তপাদভাষ্য, কন্দলী সহিত, ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রশস্তপাদের উক্ত মতই বৈশেষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও সম্মত বুঝা যায়। মৃত্যুকালে আতিবাহিক শরীরবিশেষের উৎপত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে।

অর্থাৎ আসক্ত হইয়া, যাহাতে উপভোগের আকাঙ্ক্ষাপ্রযুক্ত বিষয়সমূহকে উপলব্ধি করতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে সংস্কৃত করে অর্থাৎ সফল করে, তাহা এই আত্মার শরীর, এই শরীর পতিত হইলে ভূতবর্গসহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সেই সংস্কারের দ্বারা শরীরান্তর উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন এই শরীরের অর্থাৎ পরজাত শরীরান্তরের পূর্ব্ব-শরীরের ন্যায় পুরুষার্থক্রিয়া অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনসম্পাদক চেষ্টা জন্মে, এবং পুরুষের পূর্ব্বশরীরের ন্যায় প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ম্মসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের সৃষ্টি হইলে ইহা উপপন্ন হয়। পরন্তু প্রযত্নরূপ পুরুষগুণ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন-সমর্থ রথ প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়,—তদ্দ্বারা পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থ উৎপদ্যমান শরীরও পুরুষের গুণান্তরসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমান করা যায়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বপ্রকরণে প্রতিশরীরে মনের একত্ব ও অণুত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া শেষে ঐ মনের আশ্রয় শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থন করিতে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি প্রদর্শনের জন্য ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সহিত মনের শরীরেই বৃত্তিলাভ হয়, শরীরের বাহিরে অন্য কোন স্থানে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় এবং মনের বৃত্তিলাভ হয় না। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা যে বিষয়-জ্ঞান ও সুখদুঃখাদির উৎপত্তি, তাহাই ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিলাভ। পরন্তু পুরুষের বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি এবং বিষয়ের উপভোগ, অনিষ্ট-বর্জ্জন ও ইষ্টপ্রাপ্তিও শরীররূপ আশ্রয়েই হইয়া থাকে, শরীরই ঐ বুদ্ধি প্রভৃতির আয়তন বা অধিষ্ঠান, এইরূপ পুরুষের সমস্ত ব্যবহারই শরীরাশ্রিত। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপ্রকরণে মহর্ষি যে মনের পরীক্ষা করিয়াছেন, ঐ মন, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় শরীরের মধ্যে থাকিয়াই তাহার কার্য্য সম্পাদন করে। শরীরের বাহিরে মনের কোন কার্য্য হইতে পারে না। শরীরই মনের আশ্রয়। সুতরাং শরীরের পরীক্ষা করিলে শরীরাশ্রিত মনেরই পরীক্ষা হয়, এ জন্য মহর্ষি মনের পরীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার শরীরের পরীক্ষা করিতেছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, সর্ব্বতোভাবে ঈক্ষাই পরীক্ষা, সুতরাং কোন বস্তুর স্বরূপের পরীক্ষার ন্যায় ঐ বস্তুর সম্বন্ধী অর্থাৎ অধিকরণ বা আশ্রয়ের পরীক্ষাও প্রকারান্তরে ঐ বস্তুরই পরীক্ষা। অতএব মহর্ষি পূর্ব্বপ্রকরণে মনের স্বরূপের পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণে যে শরীর পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা প্রকারান্তরে মনেরই পরীক্ষা। সুতরাং মনের স্বরূপের পরীক্ষার পরে এই প্রকরণের আরম্ভ অসংগত হয় নাই। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না; বিচার-মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক, সুতরাং পুনর্ব্বার শরীরের পরীক্ষার মূল সংশয় ও তাহার কারণ বলা আবশ্যক। এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত শরীর বিষয়ে আরও একপ্রকার সংশয় জন্মে। নাস্তিকসম্প্রদায় ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন,—"শরীর-সৃষ্টি কেবল ভূতজন্য, অদৃষ্টজন্য নহে"। আস্তিক-সম্প্রদায় বলিয়াছেন,—"শরীর-সৃষ্টি পুরুষের

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল অদৃষ্টজন্য।" সুতরাং নাস্তিক ও আস্তিক, এই উভয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত শরীর-সৃষ্টি বিষয়ে সংশয় জন্মে যে, "এই শরীর-সৃষ্টি কি আত্মার পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফল-জন্য অথবা কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ ভূতমাত্রজন্য ?" এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথম পক্ষকেই তত্ত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় নিরাসের জন্যই মহর্ষি এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে পূর্ব্বজন্ম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট এবং ঐ অদৃষ্টের আত্মগুণত্ব এবং আত্মার অনাদিত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত সমর্থন করাও মহর্ষির গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

সূত্রে "পূর্ব্বকৃত" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বশরীরে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে পরিগৃহীত শরীরে অনুষ্ঠিত শুভ ও অশুভ কর্ম্মই বিবক্ষিত। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মরূপ যে "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন, পূর্ব্বশরীরে অনুষ্ঠিত সেই প্রবৃত্তিই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। সেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই ঐ কর্ম্মের ফল। ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্মফল আত্মারই গুণ, উহা আত্মাতেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতিই ঐ কর্ম্মফলের "অনুবন্ধ"। ঐ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের "অনুবন্ধই" পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের প্রেরক বা প্রয়োজক হইয়া তদ্দ্বারা শরীরের সৃষ্টি করে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলানুবন্ধনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের সৃষ্টি হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যাহা আত্মার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সুখদুঃখ ভোগের স্থান, এবং যাহাতে "আমি ইহা" এইরূপ অভিমান অর্থাৎ ভ্রমাত্মক আত্মবুদ্ধিবশতঃ যাহাতে আসক্ত হইয়া, যাহাতে উপভোগের আকাঙ্ক্ষায় বিষয় ভোগ করতঃ আত্মা—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহাই শরীর। সুতরাং কেবল ভূতবর্গ পূর্ব্বোক্তরূপ শরীরের উৎপাদক হইতে পারে না। ভূতবর্গ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কারই পূর্ব্বশরীর বিনষ্ট হইলে অপর শরীর উৎপন্ন করে। সেই একই আত্মারই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কারজন্য তাহারই অপর শরীরের উৎপত্তি হওয়ায় পূর্ব্বশরীরের ন্যায় সেই অপর শরীরেও সেই আত্মারই প্রয়োজনসম্পাদক ক্রিয়া জন্মে, এবং পূর্ব্বশরীরে যেমন সেই আত্মারই প্রবৃত্তি (প্রযত্নবিশেষ) হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অপর শরীরেও সেই আত্মারই প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভূতবর্গ হইতে শরীরের সৃষ্টি হইলে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত শরীরই কেবল ভূতমাত্রজন্য হইলে সমস্ত আত্মার পক্ষে সমস্ত শরীরই তুল্য হয়। সকল শরীরের সহিতই বিশ্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সংযোগ থাকায় সকল শরীরেই সকল আত্মার সুখদুঃখাদি ভোগ হইতে পারে। কিন্তু অদৃষ্টবিশেষসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরবিশেষের সৃষ্টি হইলে যে আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই শরীরই সেই আত্মার নিজ শরীর,—অদৃষ্টবিশেষজন্য সেই শরীরের সহিতই সেই আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে, সুতরাং সেই শরীরই সেই আত্মার সুখদুঃখাদি-ভোগের অধিষ্ঠান হয়। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,—পুরুষের

প্রয়োজন-নির্ব্বাহে সমর্থ বা পুরুষের উপভোগসম্পাদক রথ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহা কেবল ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয় না। কোন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত কেবল কাষ্ঠের দ্বারা রথ প্রভৃতি এবং পুষ্পের দ্বারা মাল্য প্রভৃতি দ্রব্য জন্মে না। ঐ সকল দ্রব্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যে পুরুষের উপভোগ সম্পাদন করে, সেই পুরুষের প্রযত্নরূপ গুণ-প্রেরিত ভূত হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি হয়, ইহা দৃষ্ট। অর্থাৎ পুরুষের গুণবিশেষ যে, তাহার উপভোগজনক দ্রব্যের উৎপত্তিতে কারণ, তাহা সর্ব্বসম্মত। রথাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ইহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা পুরুষের উপভোগজনক শরীরও ঐ পুরুষের কোন গুণ-বিশেষসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমান করা যায়[১]। তাহা হইলে পুরুষের শরীর যে ঐ পুরুষের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণবিশেষজন্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। কারণ, শরীর সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাতে প্রযত্ন প্রভৃতি গুণ জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বশরীরে আত্মার যে প্রযত্নাদি গুণ জন্মিয়াছিল, অপর শরীরের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা ঐ আত্মাতে থাকে না। সুতরাং এমন কোন গুণবিশেষ স্বীকার করিতে হইবে, যাহা পূর্ব্বশরীরের বিনাশ হইলেও ঐ আত্মাতেই বিদ্যমান থাকিয়া অপর শরীরের উৎপাদন এবং সেই অপর শরীরে সেই আত্মারই সুখদুঃখাদি ভোগ সম্পাদন করে। সেই গুণবিশেষের নাম অদৃষ্ট ; উহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে দ্বিবিধ, উহা "সংস্কার" নামে এবং "কর্ম্ম" নামেও কথিত হইয়াছে। ঐ কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট নামক গুণবিশেষসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের সৃষ্টি হয়॥ ৬০॥

ভাষ্য। অত্র নাস্তিক আহ—

অনুবাদ। এই সিদ্ধান্তে নাস্তিক বলেন,—

সূত্র। ভূতেভ্যো মূর্ত্ত্যুপাদানবত্তদুপাদানং ॥৬১॥৩৩২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ভূতবর্গ হইতে (উৎপন্ন) "মূর্ত্তিদ্রব্যের" অর্থাৎ সাবয়ব বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের গ্রহণের ন্যায় তাহার (শরীরের) গ্রহণ হয়।

ভাষ্য। যথা কর্ম্মনিরপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যো নির্ব্বৃত্তা মূর্ত্তয়ঃ সিকতা-শর্করা-পাষাণ-গৈরিকাঞ্জনপ্রভৃতয়ঃ পুরুষার্থকারিত্বাদুপাদীয়ন্তে, তথা কর্ম্ম-নিরপেক্ষেভ্যো ভূতেভ্যঃ শরীরমুৎপন্নং পুরুষার্থকারিত্বাদুপাদীয়ত ইতি।

অনুবাদ। যেমন অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন সিকতা (বালুকা), শর্করা (কঙ্কর), পাষাণ, গৈরিক (পর্ব্বতীয় ধাতুবিশেষ), অঞ্জন (কজ্জল) প্রভৃতি "মূর্ত্তি" অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যসমূহ পুরুষার্থকারিত্ববশতঃ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন-

১। পুরুষবিশেষগুণপ্রেরিতভূতপূর্ব্বকং শরীরং, কার্য্যত্বে সতি পুরুষার্থক্রিয়াসামর্থ্যাৎ, যৎ পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থং তৎ পুরুষবিশেষগুণপ্রেরিতভূতপূর্ব্বকং দৃষ্টং যথা রথাদি, ইত্যাদি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন শরীর পুরুষার্থ-সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়া, এখন নাস্তিকের মত খণ্ডন করিবার জন্য এই সূত্রের দ্বারা নাস্তিকের পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন। নাস্তিক পূর্ব্বজন্মাদি কিছুই মানেন না, তাঁহার মতে অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের উৎপত্তি হয়। তাঁহার কথা এই যে, অদৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়াও ভূতবর্গ পুরুষের ভোগসম্পাদক অনেক মূর্ত্ত দ্রব্যের উৎপাদন করে। যেমন বালুকা পাষাণ প্রভৃতি অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরুষের প্রয়োজনসাধক বলিয়া পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তদ্রূপ শরীরও অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরুষের ভোগসম্পাদক বলিয়া পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ফলকথা, পাষাণাদি দ্রব্যের ন্যায় অদৃষ্ট ব্যতীতও শরীরের সৃষ্টি হইতে পারে, শরীর সৃষ্টিতে অদৃষ্ট অনাবশ্যক এবং অদৃষ্টের সাধক কোন প্রমাণও নাই। সূত্রে "মূর্ত্তি" শব্দের দ্বারা মূর্ত্ত অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যই এখানে বিবক্ষিত বুঝা যায়॥ ৬১॥

সূত্র। ন সাধ্যসমত্বাৎ ॥৬২॥৩৩৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মত প্রমাণসিদ্ধ হয় না ; কারণ, সাধ্যসম।

ভাষ্য। যথা শরীরোৎপত্তিরকর্ম্মনিমিত্তা সাধ্যা, তথা সিকতা-শর্করা-পাষাণ-গৈরিকাঞ্জনপ্রভৃতীনামপ্যকর্ম্মনিমিত্তঃ সর্গঃ সাধ্যঃ, সাধ্য-সমত্বাদসাধনমিতি। "ভূতেভ্যো মূর্ত্ত্যুপাদানব" দিতি চানেন সাধ্যং।*

অনুবাদ। যেমন অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্ট যাহার নিমিত্ত নহে, এমন শরীরোৎপত্তি সাধ্য, তদ্রূপ সিকতা, শর্করা, পাষাণ, গৈরিক, অঞ্জন প্রভৃতিরও অকর্ম্ম-নিমিত্তক সৃষ্টি সাধ্য, সাধ্যসমত্ব প্রযুক্ত সাধন হয় না। কারণ, ভূতবর্গ হইতে "মূর্ত্ত দ্রব্যের উপাদানের ন্যায়" ইহাও অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত দৃষ্টান্তও এই নাস্তিক কর্ত্তৃক সাধ্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সাধ্যসমত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত মত প্রমাণসিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, নাস্তিক, সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যদি শরীর-সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা অনুমান করেন, তাহা হইলে ঐ অনুমানের হেতু বলিতে হইবে। কেবল

---

* এখানে কোন কোন পুস্তকে "সাম্যং" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠে পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যের যোগ করিয়া "সাম্যং ন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঐরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু ঐ দৃষ্টান্তও উভয় পক্ষের স্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ নহে। নাস্তিক যেমন শরীরসৃষ্টি অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা সাধন করিবেন, তদ্রূপ সিকতা প্রভৃতির সৃষ্টিও অদৃষ্টজন্য নহে, ইহাও সাধন করিবেন। কারণ, আমরা উহা স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে শরীরের ন্যায় সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যের সৃষ্টিও জীবের অদৃষ্টজন্য। কারণ, যে হেতুর দ্বারা শরীর সৃষ্টির অদৃষ্টজন্যত্ব সিদ্ধ হয়, সেই হেতুর দ্বারাই সিকতা প্রভৃতিরও অদৃষ্টজন্যত্ব সিদ্ধ হয়। আমাদিগের পক্ষে যেমন রথ প্রভৃতি সর্ব্বসম্মত দৃষ্টান্ত আছে, নাস্তিকের পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্ত নাই। নাস্তিকের পরিগৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার সাধ্যের ন্যায় অসিদ্ধ বলিয়া "সাধ্যসম"; সুতরাং উহা সাধক হইতে পারে না, এবং ঐ দৃষ্টান্তে আমাদিগের সাধ্যসাধক হেতুতে তিনি ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেও পারেন না। কারণ, সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যেও আমরা জীবের অদৃষ্টজন্যত্ব স্বীকার করি ॥ ৬২ ॥

সূত্র। নোৎপত্তিনিমিত্তত্বান্মাতাপিত্রোঃ ॥৬৩॥৩৩৪॥

অনুবাদ। না, অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তও সমান হয় নাই; কারণ, মাতা ও পিতার অর্থাৎ বীজভূত শোণিত ও শুক্রের (শরীরের) উৎপত্তিতে নিমিত্ততা আছে।

ভাষ্য। বিষমশ্চায়মুপন্যাসঃ। কস্মাৎ? নির্ব্বীজা ইমা মূর্ত্তয় উৎপদ্যন্তে, বীজপূর্ব্বিকা তু শরীরোৎপত্তিঃ। মাতাপিতৃশব্দেন লোহিতরেতসী বীজভূতে গৃহ্যেতে। তত্র সত্ত্বস্য গর্ভবাসানুভবনীয়ং কর্ম্ম পিত্রোশ্চ পুত্রফলানুভবনীয়ে কর্ম্মণী মাতুর্গর্ভাশ্রয়ে শরীরোৎপত্তিং ভূতেভ্যঃ প্রযোজয়ন্তীত্যুপপন্নং বীজানুবিধানমিতি।

অনুবাদ। পরন্তু এই উপন্যাসও অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তবাক্যও বিষম হইয়াছে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) নির্ব্বীজ অর্থাৎ শুক্র ও শোণিতরূপ বীজ যাহার কারণ নহে, এমন এই সমস্ত মূর্ত্তি (পাষাণাদি দ্রব্য) উৎপন্ন হয়, কিন্তু শরীরের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক অর্থাৎ শুক্রশোণিতজন্য। "মাতৃ" শব্দ ও "পিতৃ" শব্দের দ্বারা (যথাক্রমে) বীজভূত শোণিত এবং শুক্র গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে জীবের গর্ভবাসপ্রাপ্তিজনক অদৃষ্ট এবং মাতা ও পিতার পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অদৃষ্টদ্বয় মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হইতে শরীরোৎপত্তি সম্পাদন করে, এ জন্য বীজের অনুবিধান উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। সিকতা প্রভৃতি দ্রব্য অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা স্বীকার করিলেও নাস্তিক ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা শরীর সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ দৃষ্টান্ত শরীরের তুল্য পদার্থ নহে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত

করিতে বলিয়াছেন যে, শরীরের উৎপত্তি শুক্র ও শোণিতরূপ বীজজন্য। সিকতা পাষাণ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ ঐ বীজজন্য নহে। সুতরাং সিকতা প্রভৃতি হইতে শরীরের বৈষম্য থাকায় শরীর সিকতা প্রভৃতির ন্যায় অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা বলা যায় না। ঐরূপ বলিলে শরীর শুক্র-শোণিতজন্য নহে, ইহাও বলিতে পারি। ফলকথা,কোন বিশেষ হেতু ব্যতীত পূর্ব্বোক্তরূপ বিষম দৃষ্টান্তের দ্বারা শরীর অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা সাধন করা যায় না। মাতা ও পিতা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তির কারণ নহে, এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,·সূত্রে "মাতৃ" শব্দের দ্বারা মাতার লোহিত অর্থাৎ শোণিত এবং "পিতৃ" শব্দের দ্বারা পিতার রেত অর্থাৎ শুক্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। বীজভূত শোণিত ও শুক্রই গর্ভাশয়ে শরীরের উৎপত্তির কারণ হয়। যে কোন প্রকার শুক্র ও শোণিতের মিশ্রণে গর্ভ জন্মে না। ভাষ্যকার শেষে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তি কিরূপ অদৃষ্টজন্য, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে আত্মা গর্ভাশয়ে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই আত্মার গর্ভবাসপ্রাপ্তিজনক অদৃষ্ট এবং মাতা ও পিতার পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অদৃষ্টদ্বয় মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তির প্রযোজক হয়। সুতরাং বীজের অনুবিধান উপপন্ন হয়। অর্থাৎ গর্ভাশয়ে শরীরের উৎপত্তিতে মাতা ও পিতার অদৃষ্টবিশেষও কারণ হওয়ায় সেই মাতা ও পিতারই শোণিত ও শুক্ররূপ বীজও যে কারণ, উহা সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় নির্ব্বীজ নহে, ইহা উপপন্ন হয়। উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, বীজের অনুবিধান প্রযুক্ত গর্ভাশয়ে উৎপন্ন সন্তানের মাতা ও পিতা যে জাতীয়, ঐ সন্তানও তজ্জাতীয় হইয়া থাকে। ভাষ্যে "অনুভবনীয়" এই প্রয়োগে কর্তৃবাচ্য "অনীয়" প্রত্যয় বুঝিতে হইবে, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন। অনুপূর্ব্বক "ভূ" ধাতুর দ্বারা এখানে প্রাপ্তি অর্থ বুঝিলে "অনুভবনীয়" শব্দের দ্বারা প্রাপ্তিজনক বা প্রাপ্তিকারক, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য-টীকাকার অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন, "অনুভবঃ প্রাপ্তিঃ"। ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৩ ॥

সূত্র। তথাহারস্য ॥৬৪॥৩৩৫।

অনুবাদ। এবং যেহেতু আহারের (শরীরের উৎপত্তিতে নিমিত্ততা আছে)।

ভাষ্য। "উৎপত্তিনিমিত্তত্বা"দিতি প্রকৃতং। ভুক্তং পীতমাহারস্তস্য পক্তিনির্ব্বৃত্তং রসদ্রব্যং মাতৃশরীরে চোপচীয়তে বীজে গর্ভাশয়স্থে বীজসমানপাকং, মাত্রয়া চোপচয়ো বীজে যাবদ্‌ব্যূহসমর্থঃ সঞ্চয় ইতি। সঞ্চিতঞ্চ কললার্ব্বুদ-মাংস-পেশী-কণ্ডরা-শিরঃপাণ্যাদিনা চ ব্যূহেনেন্দ্রিয়াধি-ষ্ঠানভেদেন ব্যূহ্যতে, ব্যূহে চ গর্ভনাড্যাবতারিতং রসদ্রব্যমুপচীয়তে যাবৎ প্রসবসমর্থমিতি। ন চায়মন্নপানস্য স্থাল্যাদিগতস্য কল্পত ইতি। এতস্মাৎ কারণাৎ কর্ম্মনিমিত্তত্বং শরীরস্য বিজ্ঞায়ত ইতি।

অনুবাদ। "উৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ" এই বাক্য প্রকৃত, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র হইতে ঐ বাক্যের অনুবৃত্তি এই সূত্রে অভিপ্রেত। ভুক্ত ও পীত "আহার" অর্থাৎ ভুক্ত ও পীত দ্রব্যই সূত্রে "আহার" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। বীজ গর্ভাশয়স্থ হইলে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে শুক্র ও শোণিত মিলিত হইলে বীজের তুল্য পাক-বিশিষ্ট সেই আহারের পরিপাকজাত রসরূপ দ্রব্য মাতার শরীরেই উপচিত অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং যে কাল পর্য্যন্ত ব্যূহসমর্থ অর্থাৎ শরীরনির্ম্মাণসমর্থ সঞ্চয় (বীজ সঞ্চয়) হয়, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত অংশতঃ অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া বীজে উপচয় (বৃদ্ধি) হয়। সঞ্চিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে মিলিত বীজই কলল, অর্ব্বুদ, মাংস, পেশী, কণ্ডরা, মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি ব্যূহরূপে এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানবিশেষরূপে পরিণত হয়। এবং ব্যূহ অর্থাৎ বীজের পূর্ব্বোক্তরূপ পরিণাম হইলে রসরূপ দ্রব্য যাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রসব-সমর্থ হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গর্ভনাড়ীর দ্বারা অবতারিত হইয়া উপচিত অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আহারের পূর্ব্বোক্তরূপ পরিণাম স্থালী প্রভৃতিস্থ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। এই হেতুবশতঃ শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব বুঝা যায়।

টিপ্পনী। মহর্ষি সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত শরীরের বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শন করিতে এই সূত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, মাতা ও পিতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যরূপ যে আহার, তাহাও পরম্পরায় গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত। সুতরাং সিকতা প্রভৃতি দ্রব্য শরীরের তুল্য পদার্থ নহে। পূর্ব্বসূত্র হইতে "উৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ" এই বাক্যের অনুবৃত্তি করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রকরণানুসারে শরীরের উৎপত্তিই পূর্ব্বসূত্রে "উৎপত্তি" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। "আহার" শব্দের দ্বারা ভোজন ও পানরূপ ক্রিয়া বুঝা যায়। মহর্ষি আত্মনিত্যত্বপ্রকরণে "প্রেত্যা-হারাভ্যাসকৃতাৎ" ইত্যাদি সূত্রে ঐরূপ অর্থেই "আহার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে "আহারের" পরিপাকজন্য রসের শরীরোৎপত্তির নিমিত্ততা ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভুক্ত ও পীত দ্রব্যই এই সূত্রোক্ত "আহার" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে দ্রব্যকে আহরণ বা সংগ্রহ করে, এইরূপ অর্থে "আহার" শব্দ সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা অন্নাদি ও জলাদি দ্রব্যও বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে এখানে কালবিশেষে মাতার ভুক্ত অন্নাদি এবং পীত জলাদিই "আহার" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত বুঝা যায়। ঐ ভুক্ত ও পীত দ্রব্যরূপ আহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না। এ জন্য ভাষ্যকার পরম্পরায় উহার শরীরোৎপত্তিনিমিত্ততা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে শুক্র ও শোণিতরূপ বীজ গর্ভাশয়ে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে নিহিত হয়, তখন হইতে মাতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের "পক্তিনির্ব্বৃত্ত" অর্থাৎ পরিপাকজাত রস নামক দ্রব্য মাতৃশরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ রস

নামক দ্রব্য বীজসমানপাক অর্থাৎ মাতার শরীরে শুক্র ও শোণিতরূপ বীজের ন্যায় তৎকালে ঐ রসেরও পরিপাক হয়। পূর্ব্বোক্ত রস এবং শুক্র শোণিতরূপ বীজের তুল্যভাবে পরিপাকক্রমে যে কাল পর্য্যন্ত উহাদিগের ব্যূহ সমর্থ অর্থাৎ কলল, অর্ব্বুদ ও মাংস প্রভৃতি পরিণামযোগ্য সঞ্চয় জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্ত "মাত্রা" বা অংশরূপে অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া ঐ শুক্রশোণিতরূপ বীজের বৃদ্ধি হইতে থাকে[১]। পরে ঐ সঞ্চিত বীজই ক্রমশঃ কলল, অর্ব্বুদ, মাংস, পেশী, কণ্ডরা, মস্তক এবং হস্তাদি ব্যূহরূপে এবং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠানভূত অঙ্গবিশেষরূপে পরিণত হয়। ঐরূপ ব্যূহ বা পরিণামবিশেষ জন্মিলে যে কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত "রস" নামক দ্রব্য প্রসবসমর্থ অর্থাৎ প্রসব ক্রিয়ার অনুকূল হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ "রস" নামক দ্রব্য গর্ভনাড়ীর দ্বারা অবতারিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অন্ন ও পানীয় দ্রব্য যখন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে থাকে, তখন তাহার রসের পূর্ব্বোক্তরূপ উপচয় ও সঞ্চয় হইতে পারে না, তজ্জন্য শরীরের উৎপত্তিও হয় না। সুতরাং শরীর যে অদৃষ্টবিশেষজন্য, ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষ-সাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই যে শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ প্রযুক্ত বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী ৬৬ম সূত্রভাষ্যে ইহা সুব্যক্ত হইবে। এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন যে, কলল, কণ্ডরা, মাংস, পেশী প্রভৃতি শরীরের আরম্ভক শোণিত ও শুক্রের পরিণাম-বিশেষ। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই এখানে প্রথমে "অর্ব্বুদে"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বীজের প্রথম পরিণাম "অর্ব্বুদ" নহে—প্রথম পরিণামবিশেষের নাম "কলল"। দ্বিতীয় পরিণামের নাম "অর্ব্বুদ"। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গর্ভের দ্বিতীয় মাসে "অর্ব্বুদের" উৎপত্তি বলিয়াছেন[২]। কিন্তু গর্ভোপনিষদে এক রাত্রে "কলল" এবং সপ্তরাত্রে "বুদ্‌বুদে"র উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে[৩]। যাহা হউক, গর্ভাশয়ে মিলিত শুক্রশোণিতরূপ বীজের প্রথমে তরলভাবাপন্ন যে অবস্থাবিশেষ জন্মে, তাহার নাম "কলল", উহার দ্বিতীয় অবস্থাবিশেষের নাম "বুদ্বুদ"। উদ্দ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্রও সর্ব্বাগ্রে "কললে"রই উল্লেখ করিয়াছেন এবং "গর্ভোপনিষৎ" ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যানুসারে ভাষ্যে "কললার্ব্বুদ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝিয়াছি। শরীরে যে সকল স্নায়ু আছে, তন্মধ্যে বৃহৎ স্নায়ুগুলির নাম "কণ্ডরা"। ইহাদিগের দ্বারা আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুত বলিয়াছেন, "ষোড়শ কণ্ডরাঃ"। দুই চরণে চারিটি, দুই হস্তে চারিটি, গ্রীবাদেশে চারিটি এবং পৃষ্ঠদেশে চারিটি "কণ্ডরা" থাকে। সুশ্রুতসংহিতায় স্ত্রীলিঙ্গ "কণ্ডরা" শব্দই আছে। সুতরাং ভাষ্যে "কণ্ডর" ইত্যাদি পাঠ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। সুশ্রুত বলিয়াছেন, "পঞ্চ পেশী-শতানি ভবন্তি।" শরীরে ৫০০ শত পেশী জন্মে; তন্মধ্যে

১। সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিতবিশেষকেই "গর্ভ" বলা হইয়াছে। এবং তেজকে ঐ শুক্রশোণিতরূপ গর্ভের পাচক এবং আকাশকে বর্দ্ধক বলা হইয়াছে।

২। প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতো ধাতুর্বিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ ॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ৩য় অঃ, ৭৫ শ্লোক।

৩। ঋতুকালে সংপ্রয়োগাদেকরাত্রোষিতং কললং ভবতি, সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্বুদং ভবতি" ইত্যাদি।—গর্ভোপনিষৎ।

৪০০ শত পেশী শাখাচতুষ্টয়ে থাকে, ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে থাকে এবং ৩৪টি পেশী ঊর্দ্ধজত্রুতে থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, "পেশী পঞ্চশতানি চ।" ভাষ্যোক্ত "কণ্ডরা," "পেশী" এবং শরীরের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বিশেষ বিবরণ সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থানে দ্রষ্টব্য ॥৬৪॥

সূত্র। প্রাপ্তৌ চানিয়মাৎ ॥৬৫॥৩৩৬॥

অনুবাদ। এবং যে হেতু প্রাপ্তি (পত্নী ও পতির সংযোগ) হইলে (গর্ভাধানের) নিয়ম নাই।

ভাষ্য। ন সর্ব্বো দম্পত্যোঃ সংযোগো গর্ভাধানহেতুর্দৃশ্যতে, তত্রাসতি কর্ম্মণি ন ভবতি সতি চ ভবতীত্যনুপপন্নো নিয়মাভাব ইতি। কর্ম্মনিরপেক্ষেষু ভূতেষু শরীরোৎপত্তিহেতুষু নিয়মঃ স্যাৎ ? ন হ্যত্র কারণাভাব ইতি।

অনুবাদ। পত্নী ও পতির সমস্ত সংযোগ গর্ভাধানের হেতু দৃষ্ট হয় না। সেই সংযোগ হইলে অদৃষ্ট না থাকিলে (গর্ভাধান) হয় না, অদৃষ্ট থাকিলেই (গর্ভাধান) হয়, এ বিষয়ে নিয়মাভাব উপপন্ন হয় না। (কারণ) কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতবর্গ শরীরোৎপত্তির হেতু হইলে নিয়ম হউক ? যেহেতু এই সমস্ত থাকিলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শরীরোৎপাদক ভূতবর্গ থাকিলে কারণের অভাব থাকে না।

টিপ্পনী। শরীর অদৃষ্টবিশেষসাপেক্ষ ভূতবর্গজন্য, অদৃষ্টবিশেষ ব্যতীত শরীরের উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, পত্নী ও পতির সন্তানোৎপাদক সংযোগবিশেষ হইলেও অনেক স্থলে গর্ভাধান হয় না। গর্ভাধানের প্রতিবন্ধক ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই নাই, উপযুক্ত সময়ে পতি ও পত্নীর উপযুক্ত সংযোগও হইতেছে, কিন্তু সমগ্র জীবনেও গর্ভাধান হইতেছে না, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং পত্নী ও পতির উপযুক্ত সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং গর্ভাধানে অদৃষ্টবিশেষও কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অদৃষ্টবিশেষ থাকিলেই গর্ভাধানের দৃষ্ট কারণসমূহজন্য গর্ভাধান হয়, অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে উহা হয় না। কিন্তু যদি অদৃষ্টবিশেষকে অপেক্ষা না করিয়া পত্নী ও পতির সংযোগবিশেষের পরে ভূতবর্গই শরীরের উৎপাদক হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনিয়ম অর্থাৎ পত্নী ও পতির সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইরূপ নিয়মের অভাব উপপন্ন হয় না। কারণ, গর্ভাধানে অদৃষ্টবিশেষ কারণ না হইলে পত্নী ও পতির সংযোগবিশেষ হইলেই অন্য কারণের অভাব না থাকায় সর্ব্বত্রই গর্ভাধান হইতে পারে। পত্নী ও পতির সমস্ত সংযোগই গর্ভ উৎপন্ন করিতে পারে। সুতরাং পত্নী ও পতির সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইরূপ নিয়ম হউক ? কিন্তু ঐরূপ নিয়ম নাই, ঐরূপ নিয়মের অভাব অনিয়মই আছে। গর্ভাধানে অদৃষ্টবিশেষকে কারণরূপে স্বীকার না করিলে ঐ অনিয়মের উপপত্তি হয় না ॥৬৫॥

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তি-নিমিত্তং কর্ম্ম ॥৬৬ ॥৩৩৭॥

অনুবাদ। পরন্তু কর্ম্ম (অদৃষ্টবিশেষ) যেমন শরীরের উৎপত্তির নিমিত্ত, তদ্রূপ সংযোগের অর্থাৎ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগের উৎপত্তির নিমিত্ত।

ভাষ্য। যথা খল্বিদং শরীরং ধাতুপ্রাণসংবাহিনীনাং নাড়ীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাঞ্চ স্নায়ুত্বগস্থি-শিরাপেশী-কলল-কণ্ডরাণাঞ্চ শিরোবাহূদরাণাং সক্থ্নাঞ্চ[1] কোষ্ঠগানাং বাতপিত্তকফানাঞ্চ মুখ-কণ্ঠ-হৃদয়ামাশয়-পক্বাশয়াধঃ-স্রোতসাঞ্চ পরমদুঃখসম্পাদনীয়েন সন্নিবেশেন ব্যূহিতমশক্যং পৃথিব্যা-দিভিঃ কর্ম্মনিরপেক্ষৈরুৎপাদয়িতুমিতি কর্ম্মনিমিত্তা শরীরোৎপত্তিরিতি বিজ্ঞায়তে। এবঞ্চ প্রত্যাত্মনিয়তস্য নিমিত্তস্যাভাবান্নিরতিশয়ৈরাত্মভিঃ সম্বন্ধাৎ সর্ব্বাত্মনাঞ্চ সমানৈঃ পৃথিব্যাদিভিরুৎপাদিতং শরীরং পৃথিব্যাদি-গতস্য চ নিয়মহেতোরভাবাৎ সর্ব্বাত্মনাং সুখদুঃখসংবিত্ত্যায়তনং সমানং প্রাপ্তং। যত্তু প্রত্যাত্মং ব্যবতিষ্ঠতে তত্র শরীরোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম্মব্যবস্থা-হেতুরিতি বিজ্ঞায়তে। পরিপচ্যমানো হি প্রত্যাত্মনিয়তঃ কর্ম্মাশয়ো যস্মিন্না-ত্মনি বর্ত্ততে তস্যৈবোপভোগায়তনং শরীরমুৎপাদ্য ব্যবস্থাপয়তি। তদেবং "শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগনিমিত্তং কর্ম্মে"তি বিজ্ঞায়তে। প্রত্যাত্ম-ব্যবস্থানন্তু শরীরস্যাত্মনা সংযোগং প্রচক্ষ্মহে ইতি।

অনুবাদ। ধাতু এবং প্রাণবায়ুর সংবাহিনী নাড়ীসমূহের এবং শুক্রপর্য্যন্ত ধাতুসমূহের এবং স্নায়ু, ত্বক্, অস্থি, শিরা, পেশী, কলল ও কণ্ডরাসমূহের এবং মস্তক, বাহু, উদর ও সক্থি অর্থাৎ উরুদেশের এবং কোষ্ঠ[2]গত বায়ু, পিত্ত ও

১। সমস্ত পুস্তকেই "সক্থ্নাং' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু শরীরে সক্থি (উরু) দুইটিই থাকে। "শিরোবাহূদর-সক্থ্নাঞ্চ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন বক্তব্য থাকে না।

২। আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্বাশয় প্রভৃতি স্থানের নাম কোষ্ঠ।—"স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ। হৃদুণ্ডুকঃ ফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥" সুশ্রুত, চিকিৎসিতস্থান।" ২য় অঃ, ৯ম শ্লোক।

শ্লেষ্মার এবং মুখ, কণ্ঠ, হৃদয়, আমাশয়,[১] পক্বাশয়[২], অধোদেশ ও স্রোতঃ[৩] অর্থাৎ ছিদ্রবিশেষসমূহের অতিকষ্টসম্পাদ্য (অতিদুষ্কর) সন্নিবেশের (সংযোগ-বিশেষের) দ্বারা ব্যূহিত অর্থাৎ নির্ম্মিত এই শরীর অদৃষ্টনিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি ভূতকর্ত্তৃক উৎপাদন করিতে অশক্য, এ জন্য যেমন শরীরোৎপত্তি অদৃষ্টজন্য, ইহা বুঝা যায়, এইরূপই প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত নিমিত্ত (অদৃষ্ট) না থাকায় নিরতিশয় (নির্ব্বিশেষ) সমস্ত আত্মার সহিত (সমস্ত শরীরের) সম্বন্ধ (সংযোগ) থাকায় সমস্ত আত্মার সম্বন্ধেই সমান পৃথিব্যাদি ভূতকর্ত্তৃক উৎপাদিত শরীর পৃথিব্যাদিগত নিয়ম-হেতুও না থাকায় সমস্ত আত্মার সমান সুখদুঃখ ভোগায়তন প্রাপ্ত হয়,—[অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাত্মনিয়ত অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে সর্ব্বজীবের সমস্ত শরীরই তুল্যভাবে সমস্ত আত্মার সুখদুঃখ ভোগের আয়তন (অধিষ্ঠান) হইতে পারে, সর্ব্বশরীরেই সকল আত্মার সুখদুঃখভোগ হইতে পারে] কিন্তু যাহা (শরীর) প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত অদৃষ্ট সেই শরীরে ব্যবস্থার কারণ, ইহা বুঝা যায়। যেহেতু পরিপচ্যমান অর্থাৎ ফলোন্মুখ প্রত্যাত্মনিয়ত কর্ম্মাশয় (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট) যে আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে, সেই আত্মারই উপভোগায়তন শরীর উৎপাদন করিয়া ব্যবস্থাপন করে। সুতরাং এইরূপ হইলে কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ (শরীরবিশেষের সহিত আত্মবিশেষের) সংযোগের কারণ, ইহা বুঝা যায়। প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থানই অর্থাৎ সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়ামক সম্বন্ধবিশেষকেই (আমরা) আত্মার সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ বলি।

টিপ্পনী। শরীর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অদৃষ্টবিশেষজন্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, প্রকারান্তরে আবার উহা সমর্থন করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা শরীরবিশেষে আত্মবিশেষের সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপাদন করিবার জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট-বিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ-

---

১। নাভি ও স্তনের মধ্যগত স্থানের নাম আমাশয়। "নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ"।—সুশ্রুত।

২। মলদ্বারের উপরে নাভির নিম্নে পক্বাশয়। মলাশয়েরই অপর নাম পক্বাশয়।

৩। "স্রোতস্" শব্দটি শরীরের অন্তর্গত ছিদ্রবিশেষেরই বাচক। সুশ্রুত অনেক প্রকার স্রোতের বর্ণনা করিয়া শেষে সামান্যতঃ স্রোতের পরিচয় বলিয়াছেন,—"মূলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রসৃতন্ত্বভিবাহি যৎ। স্রোতস্তদিতি বিজ্ঞেয়ং শিরাধমনিবর্জ্জিতং॥"—শারীরস্থান, নবম অধ্যায়ের শেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১২ অধ্যায়ে—১৩শ শ্লোকের ("স্রোতাংসি তস্মাজ্জায়ন্তে সর্ব্বপ্রাণেষু দেহিনাং।") টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "স্রোতাংসি নাড়ীমার্গাঃ"। বনপর্ব্বের ঐ অধ্যায়ে যোগীদিগের "পক্বাশয়" "আমাশয়" প্রভৃতির বর্ণন দ্রষ্টব্য।

বিশেষোৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ যে অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই অদৃষ্ট-বিশেষের আশ্রয় আত্মবিশেষের সহিতই সেই শরীরের সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাতেও ঐ অদৃষ্ট-বিশেষই কারণ। ঐ অদৃষ্টবিশেষ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষেরই সংযোগবিশেষ উৎপন্ন করিয়া, তদ্দ্বারা শরীরবিশেষেই আত্মার সুখদুঃখভোগের ব্যবস্থাপক হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমে "যথা" ইত্যাদি "কর্ম্মনিমিত্তা শরীরোৎপত্তিরিতি বিজ্ঞায়তে" ইত্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা সূত্রোক্ত "শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ" এই দৃষ্টান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, পরে "এবঞ্চ" ইত্যাদি "সংযোগনিমিত্তং কর্ম্মেতি বিজ্ঞায়তে" ইত্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা সূত্রোক্ত "সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম্ম" এই বাক্যের তাৎপর্য্য যুক্তির দ্বারা সমর্থনপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার সার মর্ম্ম এই যে, নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেরূপ সন্নিবেশের দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হয়, ঐ সন্নিবেশ অতি দুষ্কর। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত কেবল ভূতবর্গ, ঐরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সন্নিবেশবিশিষ্ট শরীর সৃষ্টি করিতেই পারে না। এ জন্য যেমন শরীরোৎপত্তি অদৃষ্ট-বিশেষজন্য, ইহা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শরীরবিশেষে সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে সমস্ত শরীরেই সমস্ত আত্মার সমান ভাবে সুখ দুঃখাদি ভোগ হইতে পারে, শরীরোৎপাদক পৃথিব্যাদি ভূতবর্গে সুখ দুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক কোন গুণবিশেষ না থাকায় এবং প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত ঐরূপ কোন কারণবিশেষ না থাকায় সমস্ত আত্মার সহিত সমস্ত শরীরেরই তুল্য সংযোগবশতঃ সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগের অধিষ্ঠান হইতে পারে। এ জন্য শরীরোৎপাদক অদৃষ্টবিশেষ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ-বিশেষ উৎপন্ন করে, ঐ অদৃষ্টবিশেষই ঐ সংযোগবিশেষের বিশেষ কারণ, ইহা সিদ্ধ হয়। এক আত্মার অদৃষ্ট অন্য আত্মাতে থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শরীরবিশেষের উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবিশেষই থাকে, সুতরাং উহা শরীরবিশেষেই আত্মবিশেষের অর্থাৎ যে শরীর যে আত্মার অদৃষ্টজন্য, সেই শরীরেই সেই আত্মার সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক হয়, ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতেই ঐ অদৃষ্টবিশেষরূপ কারণকে "প্রত্যাত্মনিয়ত" বলিয়াছেন। কিন্তু যদি প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত অর্থাৎ যে আত্মাতে যে অদৃষ্ট জন্মিয়াছে, ঐ অদৃষ্ট সেই আত্মাতেই থাকে, অন্য আত্মাতে থাকে না, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট অদৃষ্টরূপ কারণ না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ হইয়া সমস্ত শরীরের সম্বন্ধেই সমান হয়। সমস্ত শরীরেই সমস্ত আত্মার তুল্য সংযোগ থাকায় "ইহা আমারই শরীর, অন্যের শরীর নহে" ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও উপপন্ন হয় না "ব্যবস্থা" বলিতে নিয়ম। প্রত্যেক আত্মাতে সুখদুঃখাদি ভোগের যে ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা শরীরও যে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরই কোন এক আত্মারই শরীর, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং শরীরের উৎপত্তির কারণ যে অদৃষ্ট, তাহাই ঐ শরীরে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থার হেতু বা নির্ব্বাহক, ইহাই স্বীকার্য্য। অদৃষ্টবিশেষকে কারণরূপে স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে না। শরীরোৎপত্তিতে অদৃষ্টবিশেষ কারণ হইলে যে আত্মাতে যে অদৃষ্টবিশেষ ফলোন্মুখ হইয়া ঐ আত্মারই সুখদুঃখাদি

ভোগসম্পাদনের জন্য যে শরীরবিশেষের সৃষ্টি করে, ঐ শরীরবিশেষই সেই আত্মার সুখদুঃখাদি ভোগের অধিষ্ঠান হয়। পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টবিশেষ, তাহার আশ্রয় আত্মারই সুখদুঃখাদি ভোগায়তন শরীর সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থার নির্ব্বাহক হয়।

এখানে ন্যায়মতে আত্মা যে প্রতিশরীরে ভিন্ন এবং বিভু অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী দ্রব্য, ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইতঃপূর্ব্বে আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য দ্রব্য, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আত্মা যে নিরবয়ব দ্রব্য, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে না। নিরবয়ব দ্রব্য অতি সূক্ষ্ম অথবা অতি মহৎ হইতে পারে। কিন্তু আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে পারে না। আত্মা পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলে পরমাণুগত রূপাদির ন্যায় আত্মগত সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু "আমি সুখী", "আমি দুঃখী" ইত্যাদি প্রকারে আত্মাতে সুখদুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেহাদি ভিন্ন আত্মাতে ঐরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে অথবা মানস প্রত্যক্ষে মহৎ পরিমাণের কারণত্ব স্বীকার না করিলেও আত্মাকে পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলা যায় না। কারণ, আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলে একই সময়ে শরীরের সর্ব্বাবয়বে তাহার সংযোগ না থাকায় সর্ব্বাবয়বে সুখদুঃখাদির অনুভব হইতে পারে না। যাহা অনুভবের কর্ত্তা, তাহা শরীরের একদেশস্থ হইলে সর্ব্বদেশে কোন অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়ে শরীরের সর্ব্বাবয়বেও শীতাদি স্পর্শ এবং দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং শরীরের সর্ব্বাবয়বেই অনুভবকর্ত্তা আত্মার সংযোগ আছে, আত্মা অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য নহে, ইহা স্বীকার্য্য। জৈনসম্প্রদায় আত্মাকে দেহপরিমাণ স্বীকার করিয়া আত্মার সংকোচ ও বিকাস স্বীকার করিয়াছেন। পিপীলিকার আত্মা হস্তীর শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার বিকাস বা বিস্তার হওয়ায় হস্তীর দেহের তুল্য পরিমাণ হয়। হস্তীর আত্মা পিপীলিকার শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার সংকোচ হওয়ায় পিপীলিকার দেহের তুল্যপরিমাণ হয়, ইহাই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আত্মার মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করিলে আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। অতি সূক্ষ্ম অথবা অতি মহৎ, এই দ্বিবিধ ভিন্ন মধ্যম পরিমাণ কোন দ্রব্যই নিত্য নহে। মধ্যমপরিমাণ দ্রব্য মাত্রই সাবয়ব। সাবয়ব না হইলে তাহা মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে না। মধ্যম পরিমাণ হইয়াও দ্রব্য নিত্য হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু আত্মার সংকোচ ও বিকাস স্বীকার করিলে আত্মাকে নিত্য বলা যাইবে না। কারণ, সংকোচ ও বিকাস বিকারবিশেষ, উহা সাবয়ব দ্রব্যেরই ধর্ম্ম। আত্মা সর্ব্বথা নির্ব্বিকার পদার্থ। অন্য কোন সম্প্রদায়ই আত্মার সংকোচ বিকাসাদি কোনরূপ বিকার স্বীকার করেন নাই। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা যখন আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং অতি সূক্ষ্ম মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, তখন আত্মা যে আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিতই আত্মার সংযোগ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে সমস্ত আত্মারই বিভুত্ববশতঃ সমস্ত শরীরের সহিতই তাহার সংযোগ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলেও আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের যে বিলক্ষণ সম্বন্ধবিশেষ জন্মে, মহর্ষি উহাকেও "সংযোগ" নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মার

বিভুত্ববশতঃ তাহার পরিগৃহীত নিজ শরীরেও তাহার যে সামান্যসংযোগ থাকে, উহা হইতে পৃথক্ আর একটি সংযোগ সেখানে জন্মে না, ঐরূপ পৃথক্ সংযোগ স্বীকার করা ব্যর্থ, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে আত্মার নিজ শরীরে যে সংযোগ, তাহা বিশিষ্ট বা বিজাতীয় সংযোগ এবং অন্যান্য শরীর ও অন্যান্য মূর্ত্ত দ্রব্যে তাহার যে সংযোগ, তাহা সামান্য সংযোগ, ইহা বলা যাইতে পারে। অদৃষ্টবিশেষজন্যই শরীরবিশেষে আত্মবিশেষের বিজাতীয় সংযোগ জন্মে, ঐ বিজাতীয় সংযোগ প্রত্যেক আত্মাতে শরীরবিশেষে সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক হয়। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার শরীরবিশেষে সুখদুঃখ ভোগের "ব্যবস্থান" অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়মের নির্ব্বাহক যে সংযোগবিশেষ, তাহাকেই এখানে আমরা সংযোগ বলিয়াছি। সূত্রে "সংযোগ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ বিশিষ্ট বা বিজাতীয় সংযোগই মহর্ষির বিবক্ষিত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য নব্য নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বোক্ত সংযোগের নাম বলিয়াছেন "অবচ্ছেদকতা।" যে আত্মার অদৃষ্টবিশেষজন্য যে শরীরের পরিগ্রহ হয়, সেই শরীরেই সেই আত্মার "অবচ্ছেদকতা" নামক সংযোগবিশেষ জন্মে, এজন্য সেই আত্মাকেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন বলা হইয়া থাকে। আত্মার বিভুত্ববশতঃ অন্যান্য শরীরে তাহার সংযোগ থাকিলেও ঐ সংযোগ ঘটাদি মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগের ন্যায় সামান্য সংযোগ, উহা "অবচ্ছেদকতা"রূপ বিজাতীয় সংযোগ নহে। সুতরাং আত্মা অন্যান্য শরীরে সংযুক্ত হইলেও অন্যান্য শরীরাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় অন্যান্য সমস্ত শরীরে তাহার সুখদুঃখাদিভোগ হয় না। কারণ, শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সুখদুঃখাদিভোগ হইয়া থাকে। অদৃষ্টবিশেষজন্য যে আত্মা যে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই শরীরই সেই আত্মার অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং সেই আত্মাই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন। অতএব সেই শরীরেই সেই আত্মার সুখদুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

সূত্র। এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৬৭॥৩৩৮॥

অনুবাদ। ইহার দ্বারা (পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা) "অনিয়ম" অর্থাৎ শরীরের ভেদ বা নানাপ্রকারতা "প্রত্যুক্ত" অর্থাৎ উপপাদিত হইয়াছে।

ভাষ্য। যোঽয়মকর্ম্মনিমিত্তে শরীরসর্গে সত্যনিয়ম ইত্যুচ্যতে, অয়ং "শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম্মে"-ত্যনেন প্রত্যুক্তঃ। কস্তাবদয়ং নিয়মঃ ? যথৈকস্যাত্মনঃ শরীরং তথা সর্ব্বেষামিতি নিয়মঃ। অন্যস্যান্যথাঽন্যস্যান্যথেত্যনিয়মো ভেদো ব্যাবৃত্তি-র্ব্বিশেষ ইতি। দৃষ্টা চ জন্মব্যাবৃত্তিরুচ্চাভিজনো নিকৃষ্টাভিজন ইতি,—প্রশস্তং নিন্দিতমিতি, ব্যাধিবহুলমরোগমিতি, সমগ্রং বিকলমিতি, পীড়া-

বহুলং সুখবহুলমিতি, পুরুষাতিশয়লক্ষণোপপন্নং বিপরীতমিতি, প্রশস্ত-লক্ষণং নিন্দিতলক্ষণমিতি, পটিন্দ্রিয়ং মৃদ্বিন্দ্রিয়মিতি। সূক্ষ্মশ্চ ভেদোঽপরিমেয়ঃ। সোঽয়ং জন্মভেদঃ প্রত্যাত্মনিয়তাৎ কর্ম্মভেদাদুপপদ্যতে। অসতি কর্ম্মভেদে প্রত্যাত্মনিয়তে নিরতিশয়ত্বাদাত্মনাং সমানত্বাচ্চ পৃথিব্যাদীনাং পৃথিব্যাদিগতস্য নিয়মহেতোরভাবাৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মনাং প্রসজ্যেত,—ন ত্বিদমিত্থম্ভূতং জন্ম, তস্মান্নাকর্ম্মনিমিত্তা শরীরোৎপত্তিরিতি।

উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্ম্মক্ষয়োপপত্তেঃ। কর্ম্মনিমিত্তে শরীরসর্গে তেন শরীরেণাত্মনো বিয়োগ উপপন্নঃ। কস্মাৎ ? কর্ম্মক্ষয়োপপত্তেঃ। উপপদ্যতে খলু কর্ম্মক্ষয়ঃ, সম্যগ্‌দর্শনাৎ প্রক্ষীণে মোহে বীতরাগঃ পুনর্ভবহেতু কর্ম্ম কায়-বাঙ্‌মনোভির্ন করোতি ইত্যুত্তরস্যানুপচয়ঃ পূর্ব্বোপচিতস্য বিপাকপ্রতিসংবেদনাৎ প্রক্ষয়ঃ। এবং প্রসবহেতোরভাবাৎ পতিতেঽস্মিন্ শরীরে পুনঃ শরীরান্তরানুপপত্তেরপ্রতিসন্ধিঃ। অকর্ম্ম-নিমিত্তে তু শরীরসর্গে ভূতক্ষয়ানুপপত্তেস্তদ্বিয়োগানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। শরীরসৃষ্টি অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য হইলে এই যে "অনিয়ম," ইহা উক্ত হয়,—এই অনিয়ম "কর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত, তদ্রূপ সংযোগোৎপত্তির নিমিত্ত" এই কথার দ্বারা (পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা) "প্রত্যুক্ত" অর্থাৎ সমাহিত বা উপপাদিত হইয়াছে। (প্রশ্ন) এই নিয়ম কি ? (উত্তর) এক আত্মার শরীর যে প্রকার, সমস্ত আত্মার শরীর সেই প্রকার, ইহা নিয়ম। অন্য আত্মার শরীর অন্যপ্রকার, অন্য আত্মার শরীর অন্য প্রকার, ইহা অনিয়ম (অর্থাৎ) ভেদ, ব্যাবৃত্তি, বিশেষ। জন্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ শরীরের ভেদ বা বিশেষ দৃষ্টও হয়, (যথা) উচ্চ বংশ, নীচ বংশ। প্রশস্ত, নিন্দিত। রোগবহুল, রোগশূন্য। সম্পূর্ণাঙ্গ, অঙ্গহীন। দুঃখবহুল, সুখবহুল। পুরুষের উৎকর্ষের লক্ষণযুক্ত, বিপরীত অর্থাৎ পুরুষের অপকর্ষের লক্ষণযুক্ত। প্রশস্তলক্ষণযুক্ত, নিন্দিতলক্ষণ-যুক্ত। পটু ইন্দ্রিয়যুক্ত, মৃদু ইন্দ্রিয়যুক্ত। সূক্ষ্ম ভেদ কিন্তু অসংখ্য। সেই এই জন্মভেদ অর্থাৎ শরীরের পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্থূলভেদ এবং অসংখ্য সূক্ষ্মভেদ প্রত্যাত্মনিয়ত অদৃষ্টভেদপ্রযুক্ত উপপন্ন হয়। প্রত্যাত্মনিয়ত অদৃষ্টভেদ না থাকিলে সমস্ত আত্মার নিরতিশয়ত্ব (নির্ব্বিশেষত্ব) বশতঃ এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের তুল্যত্ববশতঃ পৃথিব্যাদিগত নিয়ম হেতু না থাকায় সমস্ত আত্মার সমস্ত জন্ম প্রসক্ত

হয়, অর্থাৎ অদৃষ্ট জন্মের কারণ না হইলে সমস্ত আত্মারই সর্ব্বপ্রকার জন্ম হইতে পারে। কিন্তু এই জন্ম এই প্রকার নহে অর্থাৎ সমস্ত আত্মারই এক প্রকার জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ হয় না, সুতরাং শরীরের উৎপত্তি অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য নহে।

পরন্তু অদৃষ্ট বিনাশের উপপত্তিবশতঃ সেই শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগ উপপন্ন হয়। বিশদার্থ এই যে, শরীর সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য হইলে সেই শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগ উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) অদৃষ্ট বিনাশের উপপত্তি-বশতঃ। (বিশদার্থ) যেহেতু অদৃষ্ট বিনাশ উপপন্ন হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রযুক্ত মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইলে বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষশূন্য আত্মা—শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা পুনর্জ্জন্মের কারণ কর্ম্ম করে না, এ জন্য উত্তর অদৃষ্টের উপচয় হয় না, অর্থাৎ নূতন অদৃষ্ট আর জন্মে না, পূর্ব্বসঞ্চিত অদৃষ্টের বিপাকের (ফলের) প্রতি-সংবেদন (উপভোগ) বশতঃ বিনাশ হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী আত্মার পুনর্জ্জন্মজনক অদৃষ্ট না থাকিলে জন্মের হেতুর অভাববশতঃ এই শরীর পতিত হইলে পুনর্ব্বার শরীরান্তরের উপপত্তি হয় না, অতএব "অপ্রতিসন্ধি"[১] অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের অভাবরূপ মোক্ষ হয়। কিন্তু শরীরসৃষ্টি অকর্ম্মনিমিত্তক হইলে অর্থাৎ কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্রজন্য হইলে ভূতের বিনাশের অনুপপত্তিবশতঃ সেই শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগের অর্থাৎ আত্মার শরীর সম্বন্ধের আত্যন্তিক নিবৃত্তির (মোক্ষের) উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। শরীর অদৃষ্টবিশেষজন্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে আর একটি যুক্তির সূচনা করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব ব্যবস্থাপনের দ্বারা "অনিয়মের' সমাধান হইয়াছে। অর্থাৎ শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে নিয়মের আপত্তি হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত যে "অনিয়ম", তাহার সমাধান বা উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "অনিয়মে"র ব্যাখ্যার জন্য প্রথমে উহার বিপরীত "নিয়ম" কি? এই প্রশ্ন করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, সমস্ত আত্মার এক প্রকার শরীরই "নিয়ম", ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই "অনিয়ম"। ভাষ্যকার "ভেদ" শব্দের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "অনিয়মের" স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে "ব্যাবৃত্তি"

১। "প্রতিসন্ধি" শব্দের অর্থ পুনর্জ্জন্ম। সুতরাং "অপ্রতিসন্ধি" শব্দের দ্বারা পুনর্জ্জন্মের অভাব বুঝা যায়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭২ পৃষ্ঠায় নিম্নটিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। অত্যন্তাভাব অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসে প্রাচীনগণ অনেক স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগও করিয়াছেন। "কিরণাবলী" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য "বাদিনামবিবাদঃ" এই বাক্যে "অবিবাদঃ" এইরূপ পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার, উদয়নাচার্য্যের উক্ত প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া উহার উপপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

ও "বিশেষ" শব্দের দ্বারা ঐ "ভেদেরই" বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা প্রত্যেক আত্মার পরিগৃহীত শরীরের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি বা বিশেষই সূত্রে "অনিয়ম" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। এই "অনিয়ম" সর্ব্ববাদিসম্মত; কারণ, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে জন্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ জন্ম বা শরীরের বিশেষ দৃষ্ট হয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন। কাহারও উচ্চ কুলে জন্ম, কাহারও নীচ কুলে জন্ম, কাহারও শরীর প্রশস্ত, কাহারও বা নিন্দিত, কাহারও শরীর জন্ম হইতেই রোগবহুল, কাহারও বা নীরোগ ইত্যাদি প্রকার শরীরভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শরীরসমূহের সূক্ষ্ম ভেদও আছে, তাহা অসংখ্য। ফল কথা, জীবের জন্মভেদ বা শরীরভেদ সর্ব্ববাদিসম্মত। জীবমাত্রেরই শরীরে অপর জীবের শরীর হইতে বিশেষ বা বৈষম্য আছে। পূর্ব্বোক্তরূপ এই জন্মভেদই সূত্রোক্ত "অনিয়ম"। প্রত্যাত্মনিয়ত অদৃষ্টভেদপ্রযুক্তই ঐ জন্মভেদ বা "অনিয়মের" উপপত্তি হয়। কারণ, অদৃষ্টের ভেদানুসারেই তজ্জন্য শরীরের ভেদ হইতে পারে। প্রত্যেক আত্মাতে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপাদক যে ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবিশেষ থাকে, তজ্জন্য প্রত্যেক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই লাভ করে। অদৃষ্টরূপ কারণের বৈচিত্র্যবশতঃ বিচিত্র শরীরেরই সৃষ্টি হয়, সকল আত্মার একপ্রকার শরীরের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ হয়, শরীরের উৎপাদক পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের তুল্যতাবশতঃ তাহাতেও শরীরের বৈচিত্র্যসম্পাদক কোন হেতু নাই। সুতরাং সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর হইতে পারে। অর্থাৎ শরীরবিশেষের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সংযোগের উৎপাদক (অদৃষ্টবিশেষ) না থাকায় সর্ব্বশরীরেই সমস্ত আত্মার সংযোগ সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আপত্তিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। উপসংহারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, জন্ম ইত্থম্ভূত নহে, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর নহে, এবং সমস্ত আত্মার শরীর এক প্রকারও নহে। সুতরাং শরীরের উৎপত্তি অকর্ম্মনিমিত্তক নহে, অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না। ভাষ্যে "জন্মন্" শব্দের দ্বারা প্রকরণানুসারে এখানে শরীরই বিবক্ষিত বুঝা যায়।

শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থন করিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে নিজে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শরীরের সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য হইলেই সময়ে ঐ অদৃষ্টের বিনাশবশতঃ শরীরের সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ অর্থাৎ আত্মার মোক্ষ হইতে পারে। কারণ, তত্ত্বসাক্ষাৎকারজন্য আত্মার মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ঐ মিথ্যাজ্ঞানমূলক রাগ ও দ্বেষের অভাবে তখন আর আত্মা পুনর্জ্জন্মজনক কোনরূপ কর্ম্ম করে না, সুতরাং তখন হইতে আর তাহার কর্ম্ম-ফলরূপ অদৃষ্টের সঞ্চয় হয় না। ফলভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইলে, তখন ঐ আত্মার কোন অদৃষ্ট থাকে না। সুতরাং পুনর্জ্জন্মের কারণ না থাকায় আর ঐ আত্মার শরীরান্তর-পরিগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষের উপপত্তি হয়। কিন্তু শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য হইলে ঐ ভূতবর্গের আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায় পুনর্ব্বার শরীরান্তর-পরিগ্রহ হইতে পারে। কোন

দিনই শরীরের সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ হইতে পারে না। অর্থাৎ অদৃষ্ট, জন্ম বা শরীরোৎপত্তির কারণ না হইলে কোন দিনই কোন আত্মার মুক্তি হইতে পারে না।

তাৎপর্য্যটীকাকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা বলেন, শরীর-সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য নহে, কিন্তু প্রকৃত্যাদিজন্য ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়া ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই স্ব স্ব বিকার (মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি) উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই ক্রমশঃ শরীরাকারে পরিণত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট প্রকৃতির পরিণামের প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তিরই কারণ হয়। যেমন কৃষক জলপূর্ণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জল প্রেরণ করিতে ঐ জলের গতির প্রতিবন্ধক সেতু-ভেদ মাত্রই করে, কিন্তু ঐ জল তাহার নিম্নগতি-স্বভাববশতঃই তখন অপর ক্ষেত্রে যাইয়া ঐ ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করে। এইরূপ প্রকৃতিই নিজের স্বভাববশতঃ নানাবিধ শরীর সৃষ্টি করে, অদৃষ্ট শরীর সৃষ্টির কারণ নহে। অদৃষ্ট কুত্রাপি প্রকৃতির পরিণামের প্রবর্ত্তক নহে, কিন্তু সর্বত্র প্রকৃতির পরিণামের প্রতিবন্ধকের নিবর্ত্তক মাত্র। যোগ-দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন, যথা—"নিমিত্তম প্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"—(কৈবল্যপাদ, তৃতীয় সূত্র ও ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত মতবাদী-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মত-নিরাসের জন্যই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপে মহর্ষি-সূত্রের অবতারণা করিয়া সূত্রোক্ত "অনিয়ম" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন 'অব্যাপ্তি।' "নিয়ম" শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি, সুতরাং ঐ নিয়মের বিপরীত "অনিয়ম"কে অব্যাপ্তি বলা যায়। সমস্ত আত্মার সমস্ত শরীরবত্তাই "নিয়ম।" কোন আত্মার কোন শরীর, কোন আত্মার কোন শরীর, অর্থাৎ এক আত্মার একটীই নিয়ত শরীর, অন্যান্য শরীর তাহার শরীর নহে, ইহাই "অনিয়ম"। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্তরূপ অনিয়মকেই সূত্রোক্ত 'অনিয়ম' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর অর্থাৎ বিচিত্র শরীরবত্তাই সূত্রোক্ত "অনিয়ম" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে সমস্ত শরীরই একপ্রকার হইতে পারে, শরীরের বৈচিত্র্য হইতে পারে না, এই কথা বলিলে শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থনে যুক্ত্যন্তরও বলা হয়। উদ্দ্যোতকরও "শরীরভেদঃ প্রাণিনামনেকরূপঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত যুক্ত্যন্তরেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের মতেও "এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তঃ" এইরূপই সূত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়। "ন্যায়সূচীনিবন্ধে"ও ঐরূপই সূত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। "ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে" বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও ঐরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি, শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থনের দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত "নিয়মে"র খণ্ডন করিয়া "অনিয়মে"রই সমাধান বা উপপাদন করায় "অনিয়মঃ প্রত্যুক্তঃ" এই কথার দ্বারা অনিয়ম নিরস্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে না। অন্যান্য স্থলে নিরস্ত অর্থে "প্রত্যুক্ত" শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও এখানে ঐরূপ অর্থ সংগত হয় না। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ইহা লক্ষ্য করিয়া

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "প্রত্যুক্তঃ সমাহিত ইত্যর্থঃ"। অর্থাৎ শরীরের অদৃষ্টজন্যত্ব সমর্থনের দ্বারা অনিয়মের সমাধান বা উপপাদন হইয়াছে। শরীর অদৃষ্টজন্য না হইলে ঐ অনিয়মের সমাধান হয় না, পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মেরই আপত্তি হয়। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "যোঽয়ং" ইত্যাদি সন্দর্ভেও "অনিয়ম ইত্যুচ্যতে" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, শরীর অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্টজন্য নহে, এই সিদ্ধান্তেও যে "অনিয়ম" কথিত হয়, অর্থাৎ শরীরের নানাপ্রকারতা বা বৈচিত্র্যরূপ যে "অনিয়ম" পূর্ব্বপক্ষবাদীরাও বলেন বা স্বীকার করেন, তাহা শরীর অদৃষ্টজন্য হইলেই সমাহিত হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে উহার সমাধান হইতে পারে না। পরন্তু (ভাষ্যোক্ত) নিয়মেরই আপত্তি হয় ॥ ৬৭ ॥

সূত্র। তদদৃষ্টকারিতমিতি চেৎ? পুনস্তৎ-প্রসঙ্গোঽপবর্গে ॥৬৮॥৩৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই শরীর "অদৃষ্টকারিত" অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত, ইহা যদি বল? (উত্তর) অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও পুনর্ব্বার সেই শরীরের প্রসঙ্গ (শরীরোৎপত্তির আপত্তি) হয়।

ভাষ্য। অদর্শনং খল্বদৃষ্টমিত্যুচ্যতে। অদৃষ্টকারিতা ভূতেভ্যঃ শরীরোৎপত্তিঃ। ন জাত্বনুৎপন্নে শরীরে দ্রষ্টা নিরায়তনো দৃশ্যং পশ্যতি, তচ্চাস্য দৃশ্যং দ্বিবিধং, বিষয়শ্চ নানাত্বঞ্চাব্যক্তাত্মনোঃ, তদর্থঃ শরীরসর্গঃ, তস্মিন্নবসিতে চরিতার্থানি ভূতানি ন শরীরমুৎপাদয়ন্তীত্যুপপন্নঃ শরীর-বিয়োগ ইতি এবঞ্চেন্মন্যসে, পুনস্তৎপ্রসঙ্গোঽপবর্গে, পুনঃ শরীরোৎপত্তিঃ প্রসজ্যেত ইতি। যা চানুৎপন্নে শরীরে দর্শনানুৎপত্তিরদর্শনাভিমতা, যা চাপবর্গে শরীরনিবৃত্তৌ দর্শনানুৎপত্তিরদর্শনভূতা, নৈতয়োরদর্শনয়োঃ ক্বচিদ্বিশেষ ইত্যদর্শনস্যানিবৃত্তেরপবর্গে পুনঃ শরীরোৎপত্তিপ্রসঙ্গ ইতি।

চরিতার্থতা বিশেষ ইতি চেৎ? ন, করণাকরণয়োরারম্ভ-দর্শনাৎ। চরিতার্থানি ভূতানি দর্শনাবসানান্ন শরীরান্তরমারভন্তে ইত্যয়ং বিশেষ এবঞ্চেদুচ্যতে? ন, করণাকরণয়োরারম্ভদর্শনাৎ। চরিতার্থানাং ভূতানাং বিষয়োপলব্ধিকরণাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরারম্ভো দৃশ্যতে, প্রকৃতি-পুরুষয়োর্নানাত্বদর্শনস্যাকরণান্নিরর্থকঃ শরীরারম্ভঃ পুনঃ পুনর্দৃশ্যতে। তস্মাদকর্ম্মনিমিত্তায়াং ভূতসৃষ্টৌ ন দর্শনার্থা শরীরোৎপত্তির্যুক্তা, যুক্তা

তু কর্ম্মনিমিত্তে সর্গে দর্শনার্থা শরীরোৎপত্তিঃ। কর্ম্মবিপাক-সংবেদনং দর্শনমিতি।

অনুবাদ। অদর্শনই অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনই (সূত্রে) "অদৃষ্ট" এই শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। (পূর্ব্বপক্ষ) ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তি "অদৃষ্টকারিত" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদর্শনজনিত। শরীর উৎপন্ন না হইলে নিরাশ্রয় দ্রষ্টা অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে অধিষ্ঠানশূন্য কেবল আত্মা কখনও দৃশ্য দর্শন করে না। সেই দৃশ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) বিষয় অর্থাৎ উপভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এবং (২) অব্যক্ত ও আত্মার (প্রকৃতি ও পুরুষের) নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ। শরীর সৃষ্টি সেই দৃশ্য দর্শনার্থ, সেই দৃশ্য দর্শন অবসিত (সমাপ্ত) হইলে ভূতবর্গ চরিতার্থ হইয়া শরীর উৎপাদন করে না, এ জন্য শরীর-বিয়োগ অর্থাৎ শরীরের সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ বা মোক্ষ উপপন্ন হয়, এইরূপ যদি মনে কর? (উত্তর) মোক্ষ হইলে পুনর্ব্বার সেই শরীর-প্রসঙ্গ হয়, পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি প্রসক্ত হয়। (কারণ) শরীর উৎপন্ন না হইলে দর্শনের অনুৎপত্তি যাহা অদর্শন ভূত এবং মোক্ষে শরীর-নিবৃত্তি হইলে দর্শনের অনুৎপত্তি যাহা অদর্শন ভূত, এই অদর্শনদ্বয়ের কোন অংশে বিশেষ নাই, এ জন্য মোক্ষে অদর্শনের নিবৃত্তি না হওয়ায় পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তির আপত্তি হয়।

(পূর্ব্বপক্ষ) চরিতার্থতা বিশেষ, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলা যায় না। কারণ, করণ ও অকরণে (শরীরের) আরম্ভ দেখা যায়। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) দর্শনের সমাপ্তিবশতঃ চরিতার্থ ভূতবর্গ শরীরান্তর আরম্ভ করে না, ইহা বিশেষ, এইরূপ যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ মোক্ষকালে ভূতবর্গের চরিতার্থতাকে বিশেষ বলা যায় না। কারণ, করণ ও অকরণে (শরীরের) আরম্ভ দেখা যায়। বিশদার্থ এই যে, বিষয় ভোগের করণ-(উৎপাদন)-প্রযুক্ত চরিতার্থ ভূতবর্গের পুনঃ পুনঃ শরীরারম্ভ দৃষ্ট হয়, (এবং) প্রকৃতি ও পুরুষের নানাত্ব দর্শনের অকরণ প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ নিরর্থক শরীরারম্ভ দৃষ্ট হয়। অতএব ভূতসৃষ্টি অকর্ম্মনিমিত্তক হইলে দর্শনার্থ শরীরোৎপত্তি যুক্ত হয় না। কিন্তু সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্টজন্য হইলে দর্শনার্থ শরীরোৎপত্তি যুক্ত হয়। কর্ম্মফলের ভোগ দর্শন।

টিপ্পনী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকারই তত্ত্বদর্শন, উহাই মুক্তির কারণ। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনই জীবের বন্ধনের মূল। সুতরাং জীবের শরীরসৃষ্টি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি এই সূত্রে "অদৃষ্ট" শব্দের

দ্বারা সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনকেই গ্রহণ করিয়া, প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে সাংখ্যমত প্রকাশ করিয়া, ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, শরীরই আত্মার বিষয়ভোগাদির অধিষ্ঠান; সুতরাং শরীর উৎপন্ন না হইলে অধিষ্ঠান না থাকায় দ্রষ্টা, দৃশ্য দর্শন করিতে পারে না। রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ, এই দ্বিবিধ দৃশ্য দর্শনের জন্যই শরীরের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দৃশ্য দর্শন সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ চরম দৃশ্য যে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ, তাহার দর্শন হইলে শরীরোৎপাদক ভূতবর্গের শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন সমাপ্ত হওয়ায় ঐ ভূতবর্গ চরিতার্থ হয়, তখন আর উহারা শরীর সৃষ্টি করে না। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন করিয়া কেহ মুক্ত হইলে চিরকালের জন্য তাহার শরীরের সহিত আত্যন্তিক বিয়োগ হয়, আর কখনও তাহার শরীর পরিগ্রহ হইতে পারে না। সুতরাং শরীর সৃষ্টিতে অদৃষ্টকে কারণ না বলিলেও আত্মার শরীরের সহিত আত্যন্তিক বিয়োগের অনুপপত্তি নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর মূল তাৎপর্য্য। মহর্ষি এই মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও মোক্ষাবস্থায় পুনর্ব্বার শরীর সৃষ্টির আপত্তি হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির উত্তরের তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের দর্শনের অনুৎপত্তি অর্থাৎ ঐ ভেদ দর্শন না হওয়াই "অদর্শন" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মোক্ষকালেও শরীরাদির অভাবে কোনরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়ায় তখনও পূর্ব্বোক্ত ঐ অদর্শন আছে। তাহা হইলে শরীর সৃষ্টির কারণ থাকায় মোক্ষকালেও শরীর-সৃষ্টিরূপ কার্য্যের আপত্তি অনিবার্য্য। যদি বল, শরীর-সৃষ্টির পূর্ব্বে যে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী যে পূর্ব্বোক্তরূপ অদর্শন, তাহাই শরীর-সৃষ্টির কারণ; সুতরাং মুক্ত পুরুষের ঐ অদর্শন না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে ভূতবর্গ আর শরীর সৃষ্টি করিতে পারে না। ভাষ্যকার এই জন্য বলিয়াছেন যে, শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে যে অদর্শন থাকে, এবং শরীর-নিবৃত্তির পরে অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় যে অদর্শন থাকে, এই উভয় অদর্শনের কোন অংশেই বিশেষ নাই। সুতরাং যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী অদর্শন শরীর সৃষ্টির কারণ হয়, তদ্রূপ মোক্ষকালীন অদর্শনও শরীর সৃষ্টির কারণ হইবে। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনের অনুৎপত্তিরূপ যে অদর্শনকে শরীরোৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে, মোক্ষকালেও ঐ কারণের নিবৃত্তি অর্থাৎ অভাব না থাকায় মুক্ত পুরুষের পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তির আপত্তি কেন হইবে না?

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনরূপ তত্ত্বদর্শন হইলে তখন শরীরোৎপাদক ভূতবর্গ চরিতার্থ হওয়ায় মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে তাহারা আর শরীর সৃষ্টি করে না। যাহার প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে চরিতার্থ" বলে। তত্ত্বদর্শন সমাপ্ত হইলে ভূতবর্গের যে "চরিতার্থতা" হয়, তাহাই তত্ত্বদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতবর্গ হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভেদক আছে। সুতরাং তত্ত্বদর্শনের পূর্ব্বকালীন "অদর্শন" হইতে মোক্ষকালীন "অদর্শনে"র বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায় মোক্ষকালীন "অদর্শন" মুক্ত পুরুষের শরীর সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বশরীরে রূপাদি বিষয়ের উপলব্ধির করণ প্রযুক্ত চরিতার্থ ভূতবর্গও পুনঃ পুনঃ শরীরের সৃষ্টি করিতেছে এবং প্রকৃতি ও

পুরুষের ভেদ দর্শনের অকরণপ্রযুক্ত অচরিতার্থ ভূতবর্গও পুনঃ পুনঃ নিরর্থক শরীরের সৃষ্টি করিতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, ভূতবর্গ চরিতার্থ হইলেই যে, তাহারা আর শরীর সৃষ্টি করে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বদেহে রূপাদি বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায় ভূতবর্গ চরিতার্থ হইলেও আবার তাহারা শরীরের সৃষ্টি করে। যদি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ভূতবর্গ চরিতার্থ না হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনই শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত কোন শরীরের দ্বারাই ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় নিরর্থক শরীর সৃষ্টি হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনই যে শরীর সৃষ্টির একমাত্র প্রয়োজন, ইহা বলা যায় না। রূপাদি বিষয় ভোগও শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব্বশরীরের দ্বারা ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় চরিতার্থ ভূতবর্গও যখন পুনর্ব্বার শরীর সৃষ্টি করিতেছে, তখন ভূতবর্গ চরিতার্থ হইলে আর শরীর সৃষ্টি করে না, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। ভাষ্যকার এইরূপে পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, অতএব ভূতসৃষ্টি অদৃষ্টজন্য না হইলে দর্শনের জন্য যে শরীর সৃষ্টি, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না, কিন্তু সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য হইলেই দর্শনের জন্য শরীর সৃষ্টি যুক্তিযুক্ত হয়। দর্শন কি ? তাই শেষে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফলের ভোগ অর্থাৎ অদৃষ্টজন্য সুখ দুঃখের মানস প্রত্যক্ষই "দর্শন"। তাৎপর্য্য এই যে, যে দর্শনের জন্য শরীর সৃষ্টি হইতেছে, তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন নহে। কর্ম্মফল-ভোগই পূর্ব্বোক্ত "দর্শন' শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। ঐ কর্ম্ম-ফল-ভোগরূপ দর্শন অনাদি কাল হইতে প্রত্যেক শরীরেই হইতেছে, সুতরাং কোন শরীরের সৃষ্টিই নিরর্থক হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদদর্শনই শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত শরীরের সৃষ্টিই নিরর্থক হয়। মূলকথা, শরীর-সৃষ্টি কর্ম্মফলরূপ অদৃষ্টজনিত হইলেই পূর্ব্বোক্ত দর্শনার্থ শরীর-সৃষ্টির উপপত্তি হয় ; প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনরূপ অদৃষ্টজনিত হইলে পুনঃ পুনঃ শরীর-সৃষ্টি সার্থক হয় না ; পরন্তু মোক্ষ হইলেও পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে। উদ্দ্যোতকর এখানে বিচার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি বল, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন বলিতে ঐ দর্শনের অভাব নহে, ঐ ভেদদর্শনের ইচ্ছাই "অদর্শন" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত—উহাই শরীর সৃষ্টির কারণ। মোক্ষকালে ঐ দিদৃক্ষা বা দর্শনেচ্ছা না থাকায় পুনর্ব্বার আর শরীরোৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাহা হইলে প্রকৃতির পরিণাম বা সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ দর্শনেচ্ছা না থাকায় শরীর সৃষ্টি হইতে পারে না। শরীর সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ইচ্ছার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তখন দর্শনেচ্ছা শরীরোৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। যদি বল, সমস্ত শক্তিই প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকায় শক্তিরূপে বা কারণরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছা থাকে, সুতরাং তখনও শরীর সৃষ্টির কারণের অভাব নাই। কিন্তু এইরূপ বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে ঐ দর্শনেচ্ছা থাকায় পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং মোক্ষ হইতেই পারে না। সাংখ্যমতে যখন কোন কালে কোন কার্য্যেরই অত্যন্ত বিনাশ হয় না, মূল প্রকৃতিতে সমস্ত কার্য্য বিদ্যমানই থাকে, তখন মোক্ষকালেও অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন হইলেও প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছা বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু দর্শনের অভাবই

যদি অদর্শন হয়, তাহা হইলে মোক্ষকালেও ঐ দর্শনের অভাব থাকায় পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে। এ জন্য যদি মিথ্যাজ্ঞানকেই অদর্শন বলা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের আবির্ভাব না হওয়ায় তখন বুদ্ধির ধর্ম্ম মিথ্যাজ্ঞান জন্মিতে পারে না, সুতরাং কারণের অভাবে শরীর সৃষ্টি হইতে পারে না। মূল প্রকৃতিতে মিথ্যাজ্ঞানও সর্ব্বদা থাকে, সময়ে তাহার আবির্ভাব হয়, ইহা বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে উহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং তখনও শরীরোৎপত্তির আপত্তি অনিবার্য্য। তাই মহর্ষি সাংখ্যমতের সমস্ত সমাধানেরই খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, "পুনস্তৎপ্রসঙ্গোঽপবর্গে।"

ভাষ্য। **তদদৃষ্টকারিতমিতি চেৎ?** কস্যচিদ্দর্শনমদৃষ্টং নাম পরমাণূনাং গুণবিশেষঃ ক্রিয়াহেতুস্তেন প্রেরিতাঃ পরমাণবঃ সংমূর্চ্ছিতাঃ শরীরমুৎপাদয়ন্তীতি, তন্মনঃ সমাবিশতি স্বগুণেনাদৃষ্টেন প্রেরিতং, সমনস্কে শরীরে দ্রষ্টুরুপলব্ধির্ভবতীতি। এতস্মিন্ বৈ দর্শনে গুণানুচ্ছেদাৎ **পুনস্তৎপ্রসঙ্গোঽপবর্গে।** অপবর্গে শরীরোৎপত্তিঃ, পরমাণুগুণস্যাদৃষ্টস্যানুচ্ছেদ্যত্বাদিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই শরীর অদৃষ্টজনিত, ইহা যদি বল ? বিশদার্থ এই যে, কাহারও দর্শন অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত, অদৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণবিশেষ, ক্রিয়াহেতু অর্থাৎ পরমাণুসমূহের ক্রিয়াজনক, সেই অদৃষ্টকর্ত্তৃক প্রেরিত পরমাণুসমূহ "সংমূর্চ্ছিত" (পরস্পর সংযুক্ত) হইয়া শরীর উৎপাদন করে, স্বকীয় গুণ অদৃষ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মন সেই শরীরে প্রবেশ করে, সমনস্ক অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট শরীরে দ্রষ্টার উপলব্ধি হয়। এই দর্শনেও অর্থাৎ এই মতেও গুণের অনুচ্ছেদবশতঃ মোক্ষে পুনর্ব্বার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয় (অর্থাৎ) মোক্ষাবস্থায় শরীরের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, পরমাণুর গুণ অদৃষ্টের উচ্ছেদ হইতে পারে না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে সাংখ্যমতানুসারে এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষে কল্পান্তরে এই সূত্রের দ্বারাই অন্য একটি মতের খণ্ডন করিবার জন্য মহর্ষির "তদদৃষ্টকারিতমিতি চেৎ" এই পূর্ব্বপক্ষবোধক বাক্যের উল্লেখ করিয়া, উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন দর্শনকারের মতে অদৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণ এবং মনের গুণ—ঐ অদৃষ্টই পরমাণুসমূহ ও মনের ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এবং ঐ অদৃষ্টকর্ত্তৃক প্রেরিত পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া শরীরের উৎপাদন করে। মন নিজের অদৃষ্টকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই শরীরে প্রবেশ করে, তখন সেই শরীরে দ্রষ্টার সুখ দুঃখের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, পরমাণুগত অদৃষ্ট পরমাণুর ক্রিয়া উৎপন্ন করিলে পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগ উৎপন্ন

হওয়ায় ক্রমশঃ শরীরের সৃষ্টি হয়, সুতরাং এই মতে শরীর অদৃষ্টকারিত অর্থাৎ পরম্পরায় অদৃষ্টজনিত, কিন্তু আত্মার অদৃষ্টজনিত নহে· কারণ এই মতে অদৃষ্ট আত্মার গুণই নহে। ভাষ্যকার এই মতের খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্ত সূত্রের শেষোক্ত "পুনস্তৎপ্রসঙ্গোঽপবর্গে" এই উত্তর-বাক্যের উল্লেখ করিয়া, এই মতেও সাংখ্যমতের ন্যায় মোক্ষ হইলেও পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তির আপত্তি হয়, এইরূপ উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণু ও মন নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহার বিনাশ না থাকায় আশ্রয়-নাশজন্য তদ্গত অদৃষ্টগুণের বিনাশ অসম্ভব। এবং পরমাণু ও মন সুখ দুঃখের ভোক্তা না হওয়ায় আত্মার ভোগজন্যও পরমাণু ও মনের গুণ অদৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একের ভোগজন্য অপরের অদৃষ্টের ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপ আত্মার তত্ত্বজ্ঞানজন্যও পরমাণু ও মনের গুণ অদৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অপরের অদৃষ্টের বিনাশ হয় না। পরন্তু যে প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ ভোগমাত্রনাশ্য, উহাও পরমাণু ও মনের গুণ হইলে আত্মার ভোগজন্য উহার বিনাশও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে শরীরোৎপত্তির প্রযোজক অদৃষ্টবিশেষের কোনরূপেই বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষকালেও পরমাণু ও মনে উহা বিদ্যমান থাকায় মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি অনিবার্য্য। অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ সেই অদৃষ্টবিশেষ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পরমাণুসমূহ মুক্ত পুরুষেরও শরীর সৃষ্টি করিতে পারে। ভাষ্যকার শেষে কল্পান্তরে মহর্ষির এই সূত্রের পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যাখ্যান্তর করিয়া, এই সূত্রের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত মতান্তরেরও খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতান্তরও যে, অতি প্রাচীন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকার পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত মতান্তরের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে পূর্ব্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জৈন সম্প্রদায়ের মতে "অদৃষ্ট—পার্থিবাদি পরমাণুসমূহ এবং মনের গুণ। সেই পার্থিবাদি পরমাণুসমূহ নিজের অদৃষ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই শরীর সৃষ্টি করে এবং মন নিজের অদৃষ্টকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই শরীরে প্রবেশ করে এবং ঐ মনই স্বকীয় অদৃষ্টপ্রযুক্ত পুদ্গলের সুখ দুঃখের উপভোগ সম্পাদন করে। কিন্তু অদৃষ্ট পুদ্গলের ধর্ম্ম নহে" বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পূর্ব্বোক্ত মতকে জৈন মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা জৈন মত বলিয়া বুঝিতে পারি না। পরন্তু জৈন দর্শনগ্রন্থের দ্বারা জৈন মতে অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ নহে, ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। জৈনদর্শনের "প্রমাণনয়-তত্ত্বালোকালঙ্কার" নামক প্রামাণিক গ্রন্থে, যে সূত্রে[১] আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সূত্রে আত্মা যে অদৃষ্টবান্, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের টীকাকার জৈন মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য সেখানে বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছে,— অদৃষ্ট আত্মার পারতন্ত্র্য বা বদ্ধতার নিমিত্ত, সুতরাং অদৃষ্ট পৌদ্গলিক পদার্থ। কারণ যাহা পুদ্গল পদার্থ, তাহাই অপরের বদ্ধতার নিমিত্ত হয়, যেমন শৃঙ্খল। অদৃষ্টও শৃঙ্খলের ন্যায় আত্মাকে বদ্ধ

১। "চৈতন্যস্বরূপঃ পরিণামী কর্ত্তা সাক্ষাদ্ভোক্তা স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ পৌদ্গলিকাদৃষ্টবাংশ্চায়ং।" প্রমাণনয়—৫৬শ সূত্র।

করিয়াছে। তাই সূত্রে অদৃষ্টকে "পৌদ্‌গলিক" বলা হইয়াছে। আত্মা ঐ অদৃষ্টের আধার। রত্নপ্রভাচার্য্যের কথায় বুঝা যায় যে, জৈনমতে ন্যায় বৈশেষিক মতের ন্যায় অদৃষ্ট আত্মার বিশেষ গুণ নহে,—কিন্তু অদৃষ্ট আত্মাতেই থাকে, আত্মাই উহার আধার। জৈন দার্শনিক নেমিচন্দ্রের প্রাকৃতভাষায় রচিত "দ্রব্যসংগ্রহে"র "সুহদুখ্‌খং পুদ্‌গলকম্মফলং পভুং জেদি" (৯) এই বাক্যের দ্বারাও জৈন মতে আত্মাই যে, পুদ্‌গল-কর্ম্মফল সুখ ও দুঃখের ভোক্তা, সুতরাং ঐ ভোগজনক অদৃষ্টের আশ্রয়, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ফলকথা, অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা জৈনমত বলিয়া কোন জৈন দর্শনগ্রন্থে দেখিতে পাই না। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারও জৈনমত বলিয়া ঐ মতের প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা যে ভাবে ঐ মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ মতে অদৃষ্ট যে, আত্মার ধর্ম্মই নহে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উহা জৈন মত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। জৈন দর্শন পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, জৈন মতে পদার্থ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। (১) জীব ও (২) অজীব। চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থ ই জীব। তন্মধ্যে সংসারী জীব দ্বিবিধ, (১) সমনস্ক ও (২) অমনস্ক। যাহার মন আছে, সেই জীব সমনস্ক। যাহার মন নাই, সেই জীব অমনস্ক। সমনস্ক জীবের অপর নাম "সংজ্ঞী"। হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের জন্য যে বিচারণাবিশেষ, উহার নাম "সংজ্ঞা"। উহা সকল জীবের নাই ; সুতরাং জীবমাত্রই "সংজ্ঞী" নহে। পূর্ব্বোক্ত জীব ও অজীবের মধ্যে অজীব পাঁচ প্রকার। (১) পুদ্‌গল, (২) ধর্ম্ম, (৩) অধর্ম্ম, (৪) আকাশ ও (৫) কাল। যে বস্তুতে স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ থাকে, তাহা "পুদ্‌গল" নামে কথিত হইয়াছে[১]। জৈনমতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু, এই চারিটি দ্রব্যেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে, সুতরাং ঐ চারিটি দ্রব্যই পুদ্‌গল। এই পুদ্‌গল দ্বিবিধ—অণু ও স্কন্ধ। ("অণবঃ স্কন্ধাশ্চ"। তত্ত্বার্থসূত্র, ৫।২৫।)। "পুদ্‌গলের" সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশকে অণু বা পরমাণু বলা হয়, উহাই অণু পুদ্‌গল। দ্ব্যণুকাদি অন্যান্য দ্রব্য স্কন্ধ পুদ্‌গল। জৈনমতে মন দ্বিবিধ। ভাব মন ও দ্রব্য মন। ঐ দ্বিবিধ মনই পৌদ্‌গলিক পদার্থ। কিন্তু জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব "তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক" গ্রন্থে ইহা স্পষ্ট বলিয়াও ঐ গ্রন্থের অন্যত্র (কাশীসংস্করণ, ১৯৬ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন যে, ভাব মন জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং উহা আত্মাতেই অন্তর্ভূত। দ্রব্য মনের রূপ রসাদি থাকায় উহা পুদ্‌গল দ্রব্যবিকার। জৈনদর্শনের অধ্যাপকগণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থবিরোধের সমাধান করিবেন। পরন্তু ঐ "তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকেই গতি ও স্থিতির কারণ বলিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরে "অদৃষ্টহেতুকে গতিস্থিতী ইতি চেন্ন পুদ্‌গলেষভাবাৎ" (৩৭) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, সুখ দুঃখ ভোগের হেতু অদৃষ্টনামক আত্মগুণই গতি ও স্থিতির কারণ, ইহা বলা যায় না। কারণ, "পুদ্‌গল" পদার্থে উহা নাই। "পুদ্‌গল" অচেতন পদার্থ, সুতরাং তাহাতে পুণ্য ও পাপের কারণ না থাকায় তজ্জন্য "পুদ্‌গলে"র গতি ও স্থিতি হইতে পারে না। এইরূপে তিনি অন্যান্য যুক্তির দ্বারাও পুণ্য অপুণ্য, গতি ও স্থিতির কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন

১। "স্পর্শ-রস-গন্ধ-বর্ণবন্তঃ পুদ্‌গলাঃ।"—জৈন পণ্ডিত উমাস্বামিকৃত "তত্ত্বার্থসূত্র" ।৫।২৩।

করিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই যে, গতি ও স্থিতির কারণ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার বিচারের দ্বারা জৈন মতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যে, অদৃষ্ট হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং ঐ অদৃষ্ট পরমাণু প্রভৃতি "পুদ্‌গল" পদার্থে থাকে না, উহা জড়ধর্ম্ম নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং জৈন মতে অদৃষ্ট, পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা আমরা কোনরূপেই বুঝিতে পারি না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাৎপর্য্যটীকানুসারেই পূর্ব্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু জৈনমতে পরমাণু ও মন পুদ্‌গল পদার্থ। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকায় পাঠ আছে, "ন চ পুদ্‌গলধর্ম্মোঽদৃষ্টং।" পুদ্‌গল শব্দের দ্বারা আত্মা বুঝা যায় না। কারণ, জৈনমতে আত্মা 'পুদ্‌গল' নহে, পরন্তু উহার বিপরীত চৈতন্যস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়াও মনে হয় না। আমাদিগের মনে হয়, অদৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা কোন সুপ্রাচীন মত। ঐ মতের প্রতিপাদক মূল গ্রন্থ বহু পূর্ব্ব হইতেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পরে উক্ত মতের সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান কোন জৈনগ্রন্থে উক্ত মত পাওয়া যায় না। সুধীগণ এখানে তাৎপর্য্যটীকা দেখিয়া এবং পূর্ব্বলিখিত জৈনগ্রন্থের কথাগুলি দেখিয়া প্রকৃত রহস্য নির্ণয় করিবেন ॥৬৮॥

সূত্র। মনঃকর্ম্মনিমিত্তত্বাচ্চ সংযোগাব্যুচ্ছেদঃ ॥ ॥৬৯॥৩৪০॥*

অনুবাদ। এবং মনের কর্ম্মনিমিত্তকত্ববশতঃ সংযোগাদির উচ্ছেদ হয় না, [অর্থাৎ শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্ম্মজন্য (মনের গুণ অদৃষ্টজন্য) হইলে ঐ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না]।

ভাষ্য। মনোগুণেনাদৃষ্টেন সমাবেশিতে মনসি সংযোগব্যুচ্ছেদো ন স্যাৎ। তত্র কিং কৃতং শরীরাদপসর্পণং মনস ইতি। কর্ম্মাশয়ক্ষয়ে তু কর্ম্মাশয়ান্তরাদ্বিপচ্যমানাদপসর্পণোপপত্তিরিতি। অদৃষ্টাদেবাপসর্পণমিতি চেৎ ? যোঽদৃষ্টঃ[১] শরীরোপসর্পণহেতুঃ স এবাপসর্পণহেতুরপীতি।

* অনেক পুস্তকে এই সূত্রের শেষে "সংযোগানুচ্ছেদঃ" এইরূপ পাঠই আছে। ন্যায়সূচীনিবন্ধে "সংযোগাদ্যনুচ্ছেদঃ" এইরূপ পাঠ আছে। মুদ্রিত "ন্যায়বার্ত্তিকে"ও ঐরূপ পাঠ থাকিলেও কোন ন্যায়বার্ত্তিক পুস্তকে "সংযোগাব্যুচ্ছেদঃ" এইরূপ পাঠই আছে। ভাষ্যকারের "সংযোগব্যুচ্ছেদো ন স্যাৎ" এই ব্যাখ্যার দ্বারাও ঐরূপ পাঠই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। এখানে "আদি" শব্দেরও কোন প্রয়োজন এবং ব্যাখ্যা দেখা যায় না।

১। এখানে সমস্ত পুস্তকেই পুংলিঙ্গ "অদৃষ্ট" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ন্যায়বার্ত্তিকেও ঐরূপ পাঠ দেখা যায়। পরবর্ত্তী ৭১ সূত্রের বার্ত্তিকেও "অণুমনসোরদৃষ্টঃ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন কালে "অদৃষ্ট" শব্দের যে পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ হইত, ইহা বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলঙ্কদেবের "তত্ত্বার্থ-রাজবার্ত্তিক" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যেখানে আত্মগুণ অদৃষ্টই গতি ও স্থিতির নিমিত্ত, এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা

ন, একস্য জীবনপ্রায়ণহেতুত্বানুপপত্তেঃ। এবঞ্চ সতি একোঽদৃষ্টো জীবনপ্রায়ণয়োর্হেতুরিতি প্রাপ্তং, নৈতদুপপদ্যতে।

অনুবাদ। মনের গুণ অদৃষ্ট কর্ত্তৃক (শরীরে) মন সমাবেশিত হইলে সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সেই মতে শরীর হইতে মনের অপসর্পণ (বহির্গমন) কোন্ নিমিত্তজন্য হইবে? কিন্তু কর্ম্মাশয়ের (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের) বিনাশ হইলে ফলোন্মুখ অন্য কর্ম্মাশয়প্রযুক্ত (শরীর হইতে মনের) অপসর্পণের উপপত্তি হয়। (পূর্ব্বপক্ষ) অদৃষ্টবশতঃই অর্থাৎ অদৃষ্ট কোন পদার্থপ্রযুক্তই অপসর্পণ হয়, ইহা যদি বল? বিশদার্থ এই যে, যে অদৃষ্ট পদার্থ শরীরে (মনের) উপসর্পণের হেতু, তাহাই অপসর্পণের হেতুও হয়। (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না, কারণ, একই পদার্থের জীবন ও মরণের হেতুত্বের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে একই অদৃষ্ট পদার্থ জীবন ও মরণের হেতু, ইহা প্রাপ্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। শরীরের সৃষ্টি অদৃষ্টজন্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, মহর্ষি এখন মনের পরীক্ষা সমাপ্ত করিতে শেষে এই সূত্রের দ্বারা শরীর মনের কর্ম্মনিমিত্তক নহে অর্থাৎ অদৃষ্ট মনের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রের দ্বারাই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষের খণ্ডন করিবার জন্য সূত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মন যদি তাহার নিজের গুণ অদৃষ্টকর্ত্তৃক শরীরে সমাবেশিত হয় অর্থাৎ মন যদি নিজের অদৃষ্টবশতঃই শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীরের সহিত মনের সংযোগের উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, শরীর হইতে মনের যে অপসর্পণ, তাহা কিন্নিমিত্তক হইবে? তাৎপর্য্য এই যে, অদৃষ্ট মনের গুণ হইলে ঐ অদৃষ্টের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, আত্মার ফলভোগজন্য

হইয়াছে, সেখানে ঐ গ্রন্থেও "অদৃষ্টো নামাত্মগুণোঽস্তি," এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং জৈনসম্প্রদায় আত্মগুণ অদৃষ্ট বুঝাইতে পুংলিঙ্গ "অদৃষ্ট" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে ঐ অদৃষ্ট ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, ইহাও ঐ গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।—যাঁহারা অদৃষ্টকে মনের গুণ বলিতেন, তাঁহারা "অদৃষ্ট" শব্দের পুংলিঙ্গেই প্রয়োগ করিতেন, তদনুসারেই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে "অদৃষ্ট" শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জৈন গ্রন্থে "অদৃষ্টো নামাত্মগুণোঽস্তি" এইরূপ প্রয়োগ কেন হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে। জৈনসম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ভিন্ন কোন অদৃষ্ট পদার্থই এখানে "অদৃষ্ট" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইলে এবং উহাই মনের গুণ বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত বুঝিলে এখানে ঐ অর্থে পুংলিঙ্গ "অদৃষ্ট" শব্দের প্রয়োগও সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সূত্রে "মনঃকর্ম্ম-নিমিত্তত্বাচ্চ" এই বাক্যে "কর্ম্মন্" শব্দের দ্বারা কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই যে, মহর্ষির বিবক্ষিত এবং ঐ অদৃষ্টই মনের গুণ নহে, ইহাই তাঁহার এই সূত্রে বক্তব্য, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। তবে যাঁহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকেই মনের গুণ বলিতেন, তাঁহারা "অদৃষ্ট" শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগই করিতেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে। সুধীগণ এখানে প্রকৃত তত্ত্বের বিচার করিবেন।

মনের গুণ অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে না। অদৃষ্টের বিনাশ না হইলে সেই অদৃষ্টজন্য শরীরের সহিত মনের যে সংযোগ, তাহারও বিনাশ হইতে পারে না। নিমিত্তের অভাব না হইলে নৈমিত্তিকের অভাব কিরূপে হইবে? শরীর হইতে মনের যে অপসর্পণ অর্থাৎ বহির্গমন বা বিয়োগ, তাহার কারণ অদৃষ্টবিশেষের ধ্বংস, কিন্তু অদৃষ্ট মনের গুণ হইলে উহার ধ্বংস হইতে না পারায় কারণের অভাবে মনের অপসর্পণ সম্ভব হয় না। কিন্তু অদৃষ্ট আত্মার গুণ হইলে এক শরীরের আরম্ভক অদৃষ্ট ঐ আত্মার প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগজন্য বিনষ্ট হইলে তখন ফলোন্মুখ অন্য শরীরারম্ভক অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত পূর্ব্বশরীর হইতে মনের অপসর্পণ হইতে পারে। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, যদি বল, অদৃষ্টবিশেষবশতঃই শরীর হইতে মনের অপসর্পণ হয়, অর্থাৎ যে অদৃষ্ট শরীরের সহিত মনের সংযোগের কারণ, সেই অদৃষ্টই শরীরের সহিত মনের বিয়োগের কারণ, সুতরাং সেই অদৃষ্টবশতঃই শরীর হইতে মনের অপসর্পণ হয়, কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, একই পদার্থ জীবন ও মরণের কারণ হইতে পারে না। শরীরের সহিত মনের সংযোগ হইলে তাহাকে জীবন বলা যায় এবং শরীরের সহিত মনের বিয়োগ হইলে তাহাকে মরণ বলা যায়। জীবন ও মরণ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা একই সময়ে হইতে পারে না। কিন্তু যদি যাহা জীবনের কারণ, তাহাই মরণের কারণ হয়, তাহা হইলে সেই কারণজন্য একই সময়ে জীবন ও মরণ উভয়ই হইতে পারে। একই সময়ে উভয়ের কারণ থাকিলে উভয়ের আপত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং একই অদৃষ্টের জীবনহেতুত্ব ও মরণহেতুত্ব স্বীকার করা যায় না। ফল কথা, অদৃষ্ট মনের গুণ হইলে ঐ অদৃষ্টের বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য শরীরের সহিত যে মনঃসংযোগ জন্মিয়াছে, তাহার বিনাশ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। অদৃষ্ট আত্মার গুণ হইলে পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তি হয় না কেন? ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ ও মনের শরীর হইতে বহির্গমনরূপ "অপসর্পণ" এবং দেহান্তরের উৎপত্তি হইলে পুনর্ব্বার সেই দেহে গমনরূপ "উপসর্পণ" যে আত্মার অদৃষ্টজনিত, ইহা বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন[১]। অবশ্য একই অদৃষ্ট "অপসর্পণ" ও "উপসর্পণে"র হেতু, ইহা কণাদের তাৎপর্য্য নহে ॥ ৬৯ ॥

সূত্র। নিত্যত্ব প্রসঙ্গশ্চ প্রায়ণানুপপত্তেঃ ॥৭০॥৩৪১॥

অনুবাদ। পরন্তু "প্রায়ণে"র অর্থাৎ মৃত্যুর উপপত্তি না হওয়ায় (শরীরের) নিত্যত্বাপত্তি হয়।

ভাষ্য। বিপাকসংবেদনাৎ কর্ম্মাশয়ক্ষয়ে শরীরপাতঃ প্রায়ণং, কর্ম্মাশয়ান্তরাচ্চ পুনর্জ্জন্ম। ভূতমাত্রাত্তু কর্ম্মনিরপেক্ষাচ্ছরীরোৎপত্তৌ

১। অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।—৫, ২, ১৭।

কস্য ক্ষয়াচ্ছরীরপাতঃ প্রায়ণমিতি। প্রায়ণানুপপত্তেঃ খলু বৈ নিত্যত্ব-প্রসঙ্গং বিদ্মঃ। যাদৃচ্ছিকে তু প্রায়ণে প্রায়ণভেদানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। কর্ম্মফল ভোগ প্রযুক্ত কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হইলে শরীরের পতনরূপ "প্রায়ণ" হয় এবং অন্য কর্ম্মাশয় প্রযুক্ত পুনর্জ্জন্ম হয়। কিন্তু অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতমাত্রপ্রযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হইলে কাহার বিনাশপ্রযুক্ত শরীরপাতরূপ প্রায়ণ (মৃত্যু) হইবে? প্রায়ণের অনুপপত্তিবশতঃই (শরীরের) নিত্যত্বাপত্তি বুঝিতেছি। প্রায়ণ যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ নির্নিমিত্তক হইলে কিন্তু প্রায়ণের ভেদের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ মনের গুণ অদৃষ্টজন্য হইলে ঐ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে[১], তাহাতে ক্ষতি কি? এই জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীরের সহিত মনের সংযোগের উচ্ছেদ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। সুতরাং শরীরের নিত্যত্বের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মফল-ভোগজন্য প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে যে শরীরপাত হয়, তাহাকেই মৃত্যু বলে। কিন্তু শরীর যদি ঐ কর্ম্মজন্য না হয়, যদি কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্র হইতেই শরীরের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষয়রূপ কারণের অভাবে কাহারই মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং শরীরের নিত্যত্বাপত্তি হয় অর্থাৎ কারণের অভাবে শরীরের বিনাশ হইতে পারে না। শরীর-বিনাশ বা মৃত্যু যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ উহার কোন কারণ নাই, বিনা কারণেই উহা হইয়া থাকে, ইহা বলিলে মৃত্যুর ভেদ উপপন্ন হয় না। কেহ গর্ভস্থ হইয়াই মরিতেছে, কেহ জন্মের পরেই মরিতেছে, কেহ কুমার হইয়া মরিতেছে, ইত্যাদি বহুবিধ মৃত্যুভেদ হইতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুও অদৃষ্ট-বিশেষজন্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহার কারণ নাই, তাহা গগনের ন্যায় নিত্য, অথবা গগনকুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যু নিত্যও নহে, অলীকও নহে ॥ ৭০ ॥

ভাষ্য। "পুনস্তৎপ্রসঙ্গোঽপবর্গে" ইত্যেতৎ সমাধিৎসুরাহ—

অনুবাদ। "অপবর্গে পুনর্ব্বার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয়" ইহা অর্থাৎ এই পূর্ব্বোক্ত দোষ সমাধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া (পূর্ব্বপক্ষবাদী) বলিতেছেন,—

সূত্র। অণুশ্যামতানিত্যত্ববদেতৎ স্যাৎ ॥৭১॥৩৪২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্বের ন্যায় ইহা হউক?

ভাষ্য। যথা অণোঃ শ্যামতা নিত্যাঽগ্নিসংযোগেন প্রতিবদ্ধা ন পুন-রুৎপদ্যতে এবমদৃষ্টকারিতং শরীরমপবর্গে পুনর্নোৎপদ্যত ইতি।

১। ননু ভবতু সংযোগাব্যুচ্ছেদঃ, কিং নো বাধ্যত ইত্যত আহ শরীরস্য "নিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চ" ইত্যাদি।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনুবাদ। যেমন পরমাণুর শ্যাম রূপ নিত্য অর্থাৎ কারণশূন্য অনাদি, (কিন্তু) অগ্নি সংযোগের দ্বারা প্রতিবদ্ধ (বিনষ্ট) হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় না, এইরূপ অদৃষ্টজনিত শরীর অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মোক্ষ হইলেও পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে, এই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, পরমাণুর শ্যাম রূপ যেমন নিত্য অর্থাৎ উহার কারণ নাই, উহা পার্থিব পরমাণুর স্বাভাবিক গুণ, কিন্তু পরমাণুতে অগ্নিসংযোগ হইলে তজ্জন্য ঐ শ্যাম রূপের বিনাশ হয়, আর উহার পুনরুৎপত্তিও হয় না, তদ্রূপ অনাদি কাল হইতে আত্মার যে শরীরসম্বন্ধ হইতেছে, মোক্ষাবস্থায় উহা বিনষ্ট হইলে আর উহার পুনরুৎপত্তি হইবে না। উদ্দ্যোতকর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন পরমাণুর শ্যাম রূপ নিত্য (নিষ্কারণ) হইলেও অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পরমাণু ও মনের গুণ অদৃষ্ট নিত্য হইলেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহার বিনাশ হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ঐ অদৃষ্ট একেবারে বিনষ্ট হইলে আর মোক্ষাবস্থায় পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে না। পরমাণু ও মনের সুখদুঃখভোগ না হইলেও আত্মার তত্ত্বজ্ঞানজন্য পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পরমাণু ও মনের গুণ সমস্ত অদৃষ্টই চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্ব বলিতে এখানে নিষ্কারণত্বই বিবক্ষিত; পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষভাগে "অণুশ্যামতানিত্যত্ববদ্বা" এই সূত্র দ্রষ্টব্য ॥ ৭১ ॥

সূত্র। নাকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গাৎ ॥৭২॥৩৪৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত বলা যায় না। কারণ, অকৃতের অভ্যাগম-প্রসঙ্গ অর্থাৎ অকৃত কর্ম্মের ফলভোগের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। নায়মস্তি দৃষ্টান্তঃ, কস্মাৎ? অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। অকৃতং প্রমাণতোঽনুপপন্নং তস্যাভ্যাগমোঽভ্যুপপত্তির্ব্যবসায়ঃ, এতচ্ছ্রদ্দধানেন প্রমাণতোঽনুপপন্নং মন্তব্যং। তস্মান্নায়ং দৃষ্টান্তো ন প্রত্যক্ষং ন চানুমানং কিঞ্চিদুচ্যত ইতি। তদিদং দৃষ্টান্তস্য সাধ্যসমত্বমভিধীয়ত ইতি।

অথবা **নাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ**, অণুশ্যামতাদৃষ্টান্তেনাকর্ম্মনিমিত্তাং শরীরোৎপত্তিং সমাদধানস্যাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ। অকৃতে সুখদুঃখহেতৌ কর্ম্মণি পুরুষস্য সুখং দুঃখমভ্যাগচ্ছতীতি প্রসজ্যেত। ওমিতি ব্রুবতঃ প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধঃ।

প্রত্যক্ষবিরোধস্তাবৎ ভিন্নমিদং সুখদুঃখং প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষং সর্ব্বশরীরিণাং। কো ভেদঃ? তীব্রং মন্দং, চিরমাশু, নানাপ্রকারমেক-

প্রকারমিত্যেবমাদির্ব্বিশেষঃ। ন চাস্তি প্রত্যাত্মনিয়তঃ সুখদুঃখহেতুবিশেষঃ, ন চাসতি হেতুবিশেষে ফলবিশেষো দৃশ্যতে। কর্ম্মনিমিত্তে তু সুখদুঃখযোগে কর্ম্মণাং তীব্রমন্দতোপপত্তেঃ, কর্ম্মসঞ্চয়ানাঞ্চোৎকর্ষাপকর্ষভাবান্নানা-বিধৈকবিধভাবাচ্চ কর্ম্মণাং সুখদুঃখভেদোপপত্তিঃ। সোহয়ং হেতুভেদাভা-বাদ্দৃষ্টঃ সুখদুঃখভেদো ন স্যাদিতি প্রত্যক্ষবিরোধঃ।

অথাহনুমানবিরোধঃ,—দৃষ্টং হি পুরুষগুণব্যবস্থানাৎ সুখদুঃখব্যবস্থানং। যঃ খলু চেতনাবান্ সাধননির্ব্বর্ত্তনীয়ং সুখং বুদ্ধা তদীপ্সন্ সাধনাবাপ্তয়ে প্রযততে, স সুখেন যুজ্যতে, ন বিপরীতঃ। যশ্চ সাধননির্ব্বর্ত্তনীয়ং দুঃখং বুদ্ধা তজ্জিহাসুঃ সাধনপরিবর্জ্জনায় যততে, স চ দুঃখেন ত্যজ্যতে, ন বিপরীতঃ। অস্তি চেদং যত্নমন্তরেণ চেতনানাং সুখদুঃখব্যবস্থানং, তেনাপি চেতনগুণান্তরব্যবস্থাকৃতেন ভবিতব্যমিত্যনুমানং। তদেতদকর্ম্মনিমিত্তে সুখদুঃখযোগে বিরুধ্যত ইতি। তচ্চ গুণান্তরমসংবেদ্যত্বাদদৃষ্টং বিপাক-কালানিয়মাচ্চাব্যবস্থিতং। বুদ্ধ্যাদয়স্তু সংবেদ্যাশ্চাপবর্গিণশ্চেতি।

অথাগমবিরোধঃ,—বহু খল্বিদমার্ষমৃষীণামুপদেশজাতমনুষ্ঠানপরিবর্জ্জনা-শ্রয়মুপদেশফলঞ্চ শরীরিণাং বর্ণাশ্রমবিভাগেনানুষ্ঠানলক্ষণা প্রবৃত্তিঃ, পরিবর্জ্জনলক্ষণা নিবৃত্তিঃ, তচ্চোভয়মেতস্যাং দৃষ্টৌ[১] "নাস্তি কর্ম্ম সুচরিতং দুশ্চরিতং বাহকর্ম্মনিমিত্তঃ পুরুষাণাং সুখদুঃখযোগ" ইতি বিরুধ্যতে।

সেয়ং পাপিষ্ঠানাং মিথ্যাদৃষ্টিরকর্ম্মনিমিত্তা শরীরসৃষ্টিরকর্ম্মনিমিত্তঃ সুখ-দুঃখ-যোগ ইতি।

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়মাহ্নিকম্।

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥

১। "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারা দার্শনিক মতবিশেষের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রও বুঝা যায়। প্রাচীন কালে দর্শনশাস্ত্র অর্থেও "দর্শন" শব্দের ন্যায় "দৃষ্টি" শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে এই আহ্নিকের সর্ব্বপ্রথম সূত্রের ভাষ্যটিপ্পনীর শেষে কিছু আলোচনা করিয়াছি। আরও বক্তব্য এই যে, মনুসংহিতার শেষে "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ" (১২।৯৫) ইত্যাদি শ্লোকে দর্শন শাস্ত্র অর্থেই "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। চার্ব্বাকাদি দর্শন বেদবাহ্য বা বেদবিরুদ্ধ। এ জন্য ঐ সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকেই "কুদৃষ্টি" বলা হইয়াছে। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতিও উক্ত শ্লোকে চার্ব্বাকাদি দর্শন শাস্ত্রকেই "কুদৃষ্টি" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত শ্লোকে "কুদৃষ্টি" শব্দের দ্বারা শাস্ত্র-বিশেষই বিবক্ষিত বুঝা যায়। সুতরাং সুপ্রাচীন কালেও যে, দর্শনশাস্ত্র অর্থে "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

অনুবাদ। ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত পরমাণুর নিত্যত্ব, দৃষ্টান্ত হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। (বিশদার্থ) "অকৃত" বলিতে প্রমাণ দ্বারা অনুপপন্ন পদার্থ, তাহার "অভ্যাগম" বলিতে অভ্যুপপত্তি, ব্যবসায় অর্থাৎ স্বীকার। ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্ব যিনি স্বীকার করিতেছেন, তৎকর্ত্তৃক প্রমাণ দ্বারা অনুপপন্ন অর্থাৎ অপ্রামাণিক পদার্থ স্বীকার্য্য। অতএব ইহা দৃষ্টান্ত হয় না। (কারণ, উক্ত বিষয়ে) প্রত্যক্ষ প্রমাণ কথিত হইতেছে না, কোন অনুমান প্রমাণও কথিত হইতেছে না। সুতরাং ইহা দৃষ্টান্তের সাধ্যসমত্ব কথিত হইতেছে।

অথবা (অর্থান্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর শ্যাম রূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা শরীরোৎপত্তিকে অকর্ম্মনিমিত্তক বলিয়া যিনি সমাধান করিতেছেন, তাঁহার মতে অকৃতের অভ্যাগম দোষের আপত্তি হয়। (অর্থাৎ) সুখজনক ও দুঃখজনক কর্ম্ম অকৃত হইলেও পুরুষের সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসক্ত হউক ? অর্থাৎ উক্ত মতে আত্মা পূর্ব্বে কোন কর্ম্ম না করিয়াও সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। "ওম্" এই শব্দবাদীর অর্থাৎ যিনি "ওম্" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক উহা স্বীকার করিবেন, তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের (শাস্ত্রপ্রমাণের) বিরোধ হয়।

প্রত্যক্ষ-বিরোধ (বুঝাইতেছি)—বিভিন্ন এই সুখ ও দুঃখ প্রত্যেক আত্মার অনুভবনীয়ত্ববশতঃ সমস্ত শরীরীর প্রত্যক্ষ। (প্রশ্ন) ভেদ কি ? অর্থাৎ সর্ব্বশরীরীর প্রত্যক্ষ সুখ ও দুঃখের বিশেষ কি ? (উত্তর) তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, অচিরস্থায়ী, নানাপ্রকার, একপ্রকার, ইত্যাদি প্রকার বিশেষ। কিন্তু (পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে) প্রত্যাত্মনিয়ত সুখ ও দুঃখের হেতু বিশেষ নাই। হেতু বিশেষ না থাকিলেও ফলবিশেষ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধ কর্ম্মনিমিত্তক হইলে কর্ম্মের তীব্রতা ও মন্দতার সত্তাবশতঃ এবং কর্ম্মসঞ্চয়ের অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতাবশতঃ এবং কর্ম্মসমূহের নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও দুঃখের ভেদের উপপত্তি হয়। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে) হেতুভেদ না থাকায় দৃষ্ট এই সুখ-দুঃখভেদ হইতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরোধ।

অনন্তর অনুমান-বিরোধ (বুঝাইতেছি)—পুরুষের গুণনিয়মবশতঃই সুখ দুঃখের নিয়ম দৃষ্ট হয়। কারণ, যে চেতন পুরুষ সুখকে সাধনজন্য বুঝিয়া সেই সুখকে লাভ

করিতে ইচ্ছা করতঃ (ঐ সুখের) সাধন প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন, তিনি সুখযুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ অর্থাৎ যিনি সুখসাধন প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন না, তিনি সুখযুক্ত হন না। এবং যে চেতন পুরুষ দুঃখকে সাধনজন্য বুঝিয়া সেই দুঃখ ত্যাগে ইচ্ছা করতঃ (সেই দুঃখের) সাধন পরিত্যাগের জন্য যত্ন করেন, তিনিই দুঃখমুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ অর্থাৎ যিনি দুঃখের সাধন পরিত্যাগের জন্য যত্ন করেন না, তিনি দুঃখমুক্ত হন না। কিন্তু যত্ন ব্যতীত চেতনসমূহের এই সুখ-দুঃখ ব্যবস্থাও আছে, সেই সুখ-দুঃখ ব্যবস্থাও চেতনের অর্থাৎ আত্মার গুণান্তরের ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে, ইহা অনুমান। সেই এই অনুমান, সুখ-দুঃখসম্বন্ধ অকর্ম্মনিমিত্তক হইলে বিরুদ্ধ হয়। সেই গুণান্তর অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ অদৃষ্ট, এবং ফলভোগের কাল নিয়ম না থাকায় অব্যবস্থিত। বুদ্ধি প্রভৃতি কিন্তু অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি গুণ কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অপবর্গী অর্থাৎ আশুবিনাশী।

অনন্তর আগম-বিরোধ (বুঝাইতেছি),—অনুষ্ঠান ও পরিবর্জ্জনাশ্রিত এই বহু আর্ষ (অর্থাৎ) ঋষিগণের উপদেশসমূহ (শাস্ত্র) আছে। উপদেশের ফল কিন্তু শরীরীদিগের অর্থাৎ মানবগণের বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে অনুষ্ঠানরূপ প্রবৃত্তি এবং পরিবর্জ্জন-রূপ নিবৃত্তি। কিন্তু সেই উভয় অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দর্শনে (পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মতে) "পুণ্য কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম নাই, পুরুষসমূহের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ অকর্ম্মনিমিত্তক," এ জন্য বিরুদ্ধ হয়।

"শরীর-সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক নহে, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ কর্ম্মনিমিত্তক নহে" সেই ইহা পাপিষ্ঠদিগের (নাস্তিকদিগের) মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই চরম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে জীবের অকৃত কর্ম্মের ফলভোগের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ নহে, উহা সাধ্যসম, সুতরাং উহা দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, পরমাণুর শ্যাম রূপের যে নিত্যত্ব (কারণশূন্যত্ব), তাহা "অকৃত" অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে। পরন্তু পরমাণুর শ্যাম রূপ যে কারণজন্য, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ[১]। সুতরাং

১। নচ পরমাণুশ্যামতাপ্যকারণা পার্থিবরূপত্বাৎ লোহিতাদিবদিতানুমানেন তস্যাপি পাকজত্বাভ্যুপগমাদিতি ভাবঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া উহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে অকৃত অর্থাৎ অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকার করিতে হয়। পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণ কথিত না হওয়ায় উহা সিদ্ধ পদার্থ নহে। সুতরাং উহা সাধ্য পদার্থের তুল্য হওয়ায় "সাধ্যসম"। ভাষ্যকারের প্রথম পক্ষে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের সাধ্যসমত্ব প্রকাশ করিয়া উহা যে দৃষ্টান্তই হয় না, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। এই পক্ষে সূত্রে "অকৃত" শব্দের অর্থ অপ্রামাণিক। "অভ্যাগম" বলিতে "অভ্যুপপত্তি," উহার অপর নাম "ব্যবসায়"। ব্যবসায় শব্দের দ্বারা এখানে স্বীকারই বিবক্ষিত। "প্রসঙ্গ" শব্দের অর্থ আপত্তি। তাহা হইলে সূত্রে "অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকারের আপত্তি।

"অকৃত" শব্দের দ্বারা অপ্রামাণিক, এই অর্থ সহজে বুঝা যায় না। অকৃত কর্ম্মই "অকৃত" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ। তাই ভাষ্যকার শেষে কল্পান্তরে যথাশ্রুত সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি পরমাণুর শ্যাম রূপকে দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়া শরীর-সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক নহে, ইহা সমাধান করিতেছেন, তাঁহার মতে অকৃত কর্ম্মের ফলভোগের আপত্তি হয়। অর্থাৎ সুখজনক ও দুঃখজনক কর্ম্ম না করিলেও পুরুষের সুখ ও দুঃখ জন্মিতে পারে, এইরূপ আপত্তি হয়। উহা স্বীকার করিলে তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মতবাদীর ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, অনুমানবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়। প্রত্যক্ষ-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুখ ও দুঃখ সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, আশুস্থায়ী, নানাপ্রকার, এক প্রকার, ইত্যাদি প্রকারে সুখ ও দুঃখ বিশিষ্ট অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক ভেদ বা বিশেষ আছে। কিন্তু যিনি সুখ ও দুঃখের হেতু কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট মানেন না, তাঁহার মতে প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত সুখদুঃখজনক হেতুবিশেষ না থাকায় সুখ ও দুঃখের পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ হইতে পারে না। কারণ, হেতুবিশেষ ব্যতীত ফলবিশেষ হইতে পারে না। কর্ম্ম বা অদৃষ্টকে সুখ ও দুঃখের হেতুবিশেষরূপে স্বীকার করিলে ঐ কর্ম্মের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ সুখ ও দুঃখের তীব্রতা ও মন্দতা উপপন্ন হয়। কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এবং নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও দুঃখের পূর্ব্বোক্ত ভেদও উপপন্ন হয়। কিন্তু সুখদুঃখসম্বন্ধ অদৃষ্টজন্য না হইলে পূর্ব্বোক্ত সুখদুঃখভেদ উপপন্ন হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে সুখ ও দুঃখের হেতুবিশেষ না থাকায় দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে পূর্ব্বোক্তরূপ সুখদুঃখভেদ, তাহা হইতে পারে না, এ জন্য প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষ হয়।

অনুমান-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পুরুষের গুণের নিয়মপ্রযুক্তই সুখ ও দুঃখের নিয়ম দেখা যায়। সুখার্থী যে পুরুষ সুখসাধন লাভের জন্য যত্ন করেন, তিনিই সুখ লাভ করেন, তাহার বিপরীত পুরুষ সুখ লাভ করেন না এবং দুঃখপরিহারার্থী যে পুরুষ দুঃখসাধন বর্জ্জনের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারই দুঃখপরিহার হয়, উহার বিপরীত পুরুষের দুঃখ পরিহার হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তি আত্মার প্রযত্নরূপ গুণজন্য,

এবং কেহ সুখী, কেহ-দুঃখী, ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও আত্মার গুণের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা দেখা যায়। কিন্তু অনেক স্থলে প্রযত্ন ব্যতীতও সহসা সুখের কারণ উপস্থিত হইয়া সুখ উৎপন্ন করে এবং সহসা দুঃখ নিবৃত্তির কারণ উপস্থিত হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি করে। কুতর্কদ্বারা সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; চিন্তাশীল মানবমাত্রই জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অনুভব করিয়াছেন। তাহা হইলে ঐরূপ স্থলে আত্মার কোন গুণান্তরই সুখদুঃখের কারণ ও ব্যবস্থাপক, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সুখ দুঃখের ব্যবস্থা বা নিয়ম যখন আত্মার গুণ-ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তখন তদ্দৃষ্টান্তে প্রযত্ন ব্যতিরেকে যে সুখদুঃখব্যবস্থা আছে, তাহাও আত্মার গুণান্তরের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয়। ফলকথা, ব্যবস্থিত যে সুখ ও দুঃখ এবং ঐ দুঃখের নিবৃত্তি, তাহা যে, আত্মার গুণবিশেষজন্য, ইহা সর্ব্বসম্মত। যদিও সর্ব্বত্রই আত্মগুণ অদৃষ্টবিশেষ ঐ সুখাদির কারণ, কিন্তু যিনি তাহা স্বীকার করিবেন না, কেবল প্রযত্ন নামক গুণকেই যিনি সুখাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন, তিনিও অনেক স্থলে প্রযত্ন ব্যতীতও সুখাদি জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ ঐরূপ স্থলেও ঐ সুখাদির কারণরূপে আত্মার গুণান্তর স্বীকার করিতে বাধ্য। অদৃষ্টই সেই গুণান্তর। উহা প্রত্যক্ষের বিষয় না হওয়ায় উহার নাম "অদৃষ্ট", এবং উহার ফলভোগের কালনিয়ম না থাকায় উহা অব্যবস্থিত। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মগুণের মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং তৃতীয় ক্ষণে উহাদিগের বিনাশ হয়। কিন্তু অদৃষ্ট নামক আত্মগুণ অতীন্দ্রিয়, এবং ফলভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা বিদ্যমান থাকে। কোন্ সময়ে কোন্ অদৃষ্টের ফলভোগ হইবে, সেই সময়ের নিয়ম নাই। কর্ম্মফলদাতা স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহা জানেনও না। যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে উহা জানিতে পারেন, তিনি মানুষ নহেন। উদ্দ্যোতকর এখানে "ধর্ম্ম ও অধর্ম্মনামক কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া তখনই কেন ফল দান করে না ?" এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের ফল-ভোগকালের নিয়ম নাই। কোন স্থলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া অবিলম্বেও ফল দান করে। কোন স্থলে অন্য কর্ম্মফল প্রতিবন্ধক থাকায় তখন সেই কর্ম্মের ফল হয় না। কোন স্থলে সেই কর্ম্মের সহকারী ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ অন্য নিমিত্ত না থাকায় তখন সেই কর্ম্মের ফল হয় না অথবা উহার সহকারী অন্য কর্ম্ম প্রতিবন্ধক থাকায় উহার ফল হয় না, এবং অন্য জীবের কর্ম্মবিশেষ প্রতিবন্ধক হওয়ায় অনেক সময়ে নিজ কর্ম্মের ফলভোগ হয় না। এইরূপ নানা কারণেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদা ফলজনক হয় না। উদ্দ্যোতকর এইরূপে এখানে অনেক সারতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে এ বিষয়ে অতি সুন্দর ভাবে মহাসত্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "দুর্ব্বিজ্ঞেয়া চ কর্ম্মগতিঃ, সা ন শক্যা মনুষ্যধর্ম্মণাঽবধারয়িতুং।" অর্থাৎ কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়, মানুষ তাহা অবধারণ করিতে পারে না। মূলকথা, সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি অদৃষ্টজন্য, এবং কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও ঐ অদৃষ্টের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা পূর্ব্বোক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং যিনি জীবের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধকে অদৃষ্টজন্য বলেন না, তাঁহার মত পূর্ব্বোক্ত অনুমান-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হয়।

আগম-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জনের কর্ত্তব্যতাবোধক ঋষিগণের বহু বহু যে উপদেশ অর্থাৎ শাস্ত্র আছে, তাহার ফল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগানুসারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জনরূপ নিবৃত্তিই ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার মতে পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম নাই, জীবের সুখদুঃখ সম্বন্ধ "অকর্ম্মনিমিত্ত" অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য নহে, তাহার মতে শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ উহা উপপন্নই হয় না। কারণ, পুণ্য ও পাপ বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট পদার্থ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা বা নিয়ম কোনরূপেই সম্ভব হয় না; অকর্ত্তব্য কর্ম্মেও প্রবৃত্তি এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মেও নিবৃত্তির সমর্থন করা যায়। সুতরাং ঋষিগণের শাস্ত্র প্রণয়নও ব্যর্থ হয়। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে আগমের বিরোধবশতঃ উক্ত মত স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মতবাদী নাস্তিকেরও শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তিনিও আর কোনরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যবস্থার উপপাদন করিতে পারিবেন না। পরন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট না থাকিলে জগতে সুখদুঃখের ব্যবস্থা ও নানা প্রকারভেদও উপপাদন করা যায় না, শরীরাদির বৈচিত্র্যও উপপাদন করা যায় না, ইত্যাদি কথাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ভাষ্যকারের দ্বিতীয় কল্পের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পরমাণুগত অদৃষ্ট শরীরসৃষ্টির কারণ হইলে ঐ অদৃষ্ট নিত্য, উহা কাহারও কৃত কর্ম্মজন্য নহে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মতে জীবগণ অকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে আস্তিকগণের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্তি এবং ঋষিগণের শাস্ত্রপ্রণয়ন, এই সমস্তই ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঐ সমস্তই ব্যর্থ, ইহা কোনরূপেই সমর্থন করা যাইবে না। সুতরাং অদৃষ্ট আত্মারই গুণ এবং আত্মার বিচিত্র শরীরসৃষ্টি ও সুখদুঃখ ভোগ অদৃষ্টজন্য। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক অদৃষ্টবশতঃই আত্মার অভিনব শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় এবং ঐ অদৃষ্টানুসারেই সুখ দুঃখের ভোগ ও উহার ব্যবস্থার উপপত্তি হয়।

এখানে লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক যে, মহর্ষি এই অধ্যায়ে শেষ প্রকরণের দ্বারা জীবের বিচিত্র শরীরসৃষ্টি যে, তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলজন্য, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট ব্যতীত আর কোনরূপেই যে, ঐ বিচিত্র সৃষ্টির উপপত্তি হইতেই পারে না, ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করায় ইহার দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব ও অনাদিকাল হইতে শরীরপরিগ্রহ সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, আত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব্বজন্মাদি তত্ত্ব, যাহা মুমুক্ষুর প্রধান জ্ঞাতব্য এবং ন্যায়দর্শনের যাহা একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য, তাহার সাধক চরম যুক্তিও মহর্ষি শেষে এই প্রকরণের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টবাদ স্বীকার করেন না, নিজ জীবনেই সহস্রবার অদৃষ্ট-বাদের অকাট্য প্রমাণ প্রকটমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইলেও যাঁহারা উহা দেখিয়াও দেখেন না, সত্যের অপলাপ করিয়া নানা কুতর্ক করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে অদৃষ্টবাদ আশ্রয় করিয়া আত্মার

নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত বুঝান যায় না। তাই মহর্ষি প্রথম আহ্নিকে আত্মার নিত্যত্ব-পরীক্ষা-প্রকরণে উক্ত বিষয়ে অন্যান্য যুক্তিই বলিয়াছেন। যথাস্থানে সেই সমস্ত যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ যুক্তি এই যে, আত্মা নিত্য না হইলে আত্মার পূর্ব্বজন্ম সম্ভবই হয় না। পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্য পানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কারণ, পূর্ব্বজন্মে স্তন্য পানের ইষ্টসাধনত্ব অনুভব না করিলে নবজাত শিশুর তদ্বিষয়ে স্মরণ সম্ভব না হওয়ায় ঐ প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। কিন্তু মৃগাদি শিশুও জন্মের পরেই জননীর স্তন্যপানে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। অতএব স্বীকার্য্য যে, আত্মা নিত্য, অনাদি কাল হইতেই আত্মার নানাবিধ শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। পূর্ব্বজন্মে সেই আত্মাই স্তন্যপানের ইষ্টসাধনত্ব অনুভব করায় পরজন্মে সেই আত্মার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতেছে। আত্মা নিত্য না হইলে আর কোনরূপে উহা সম্ভব হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পরমজ্ঞানী সুরেশ্বরাচার্য্যও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে (শঙ্করাচার্য্যকৃত দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রের টীকায়) আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন প্রসিদ্ধ যুক্তিই সরল সুন্দর দুইটি শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন[১]।

বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার যুক্তির দ্বারাও যে, সকলেই আত্মার পূর্ব্বজন্মাদি বিশ্বাস করিবেন, ইহাও কোন দিন সম্ভব নহে। সুচিরকাল হইতেই ইহকালসর্ব্বস্ব চার্ব্বাকের শিষ্যগণ কোনরূপ যুক্তির দ্বারাই পরকালাদি বিশ্বাস করিতেছেন না। আর এই যে, বহু কাল হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নানা প্রদেশে এক বিরাট সম্প্রদায় (থিওসফিষ্ট্) আত্মার পরলোক ও পূর্ব্বজন্মাদি সমর্থন করিতে নবীন ভাবে নানারূপ যুক্তির প্রচার করিতেছেন, আত্মার পরলোকাদি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতেও কি সর্ব্বদেশে সকলেই উহা স্বীকার করিতেছেন? বেদাদি শাস্ত্রে প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতীত ঐ সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসবশতঃ প্রথমতঃ শাস্ত্র হইতে ঐ সমস্ত তত্ত্বের শ্রবণ করিয়া, ঐ শ্রবণলব্ধ সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য নানা যুক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত শ্রুত তত্ত্বের মনন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের ঐ মনন-নির্ব্বাহের জন্যই মহর্ষি গোতম এই ন্যায়শাস্ত্রে ঐ সমস্ত বিষয়ে নানারূপ যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত বেদোপদিষ্ট মননে অধিকারী, সুতরাং তাঁহারাই এই ন্যায়দর্শনে অধিকারী। ফলকথা, শ্রদ্ধা ব্যতীত ঐ সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। পরন্তু সাধুসঙ্গ ও ভগবদ্ভজনাদি ব্যতীতও কেবল দর্শনশাস্ত্রোক্ত যুক্তি বিচারাদির দ্বারাও ঐ সমস্ত তত্ত্বের চরম জ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা আবশ্যক। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া" ইত্যাদি। কিন্তু ইহাও

১। পূর্ব্বজন্মানুভূতার্থ-স্মরণান্মৃগশাবকঃ।
জননীস্তন্য-পানায় স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে॥
তস্মান্নিশ্চীয়তে স্থায়ীত্যাত্মা দেহান্তরেষ্বপি।
স্মৃতিং বিনা ন ঘটতে স্তন্যপানং শিশোর্যতঃ॥—"মানসোল্লাস", ৭ম উঃ। ৬। ৭।

চিন্তা করা আবশ্যক যে, কাল-প্রভাবে অনেক দিন হইতে এ দেশেও আমাদিগের মধ্যে কুশিক্ষা ও কুতর্কের বহুল প্রচারবশতঃ জন্মান্তর ও অদৃষ্ট প্রভৃতি বৈদিক সিদ্ধান্তে বদ্ধমূল সংস্কারও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। তাই সংসারে ও সমাজে ক্রমে নানারূপ অশান্তির বৃদ্ধি হইতেছে। মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত বিচারের সাহায্যে "আমার এই শরীরাদি সমস্তই আমার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল অদৃষ্টজন্য, আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করিতেই এই দেশে, এই কালে, এই কুলে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমার কর্ম্মফল আমার অবশ্য ভোগ্য", এইরূপ চিন্তার দ্বারা ঐ পুরাতন সংস্কার রক্ষিত হয়। কোন সময়-বিশেষে কর্তৃত্বাভিমানেরও একটু হ্রাস সম্পাদন করিয়া ঐ সংস্কার চিত্ত-শুদ্ধিরও একটু সহায়তা করে; তাহাতে সময়ে একটু শান্তিও পাওয়া যায়, নচেৎ সংসারে শান্তির আর কি উপায় আছে? "অশান্তস্য কুতঃ সুখং?" অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে পুরাতন সংস্কার রক্ষার জন্যও ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রোক্ত যুক্তিসমূহের অনুশীলন করা আবশ্যক ॥ ৭২ ॥

শরীরাদৃষ্টনিষ্পাদ্যত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত ॥

এই অধ্যায়ের প্রথম তিন সূত্র (১) ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ। তাহার পরে তিন সূত্র (২) শরীরব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ। তাহার পরে ৮ সূত্র (৩) চক্ষুরদ্বৈত-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্র (৪) মনোব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ। তাহার পরে ৯ সূত্র (৫) আত্মনিত্যত্বপ্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্র (৬) শরীরপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২০ সূত্র (৭) ইন্দ্রিয়ভৌতিকত্বপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্র (৮) ইন্দ্রিয়নানাত্ব-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ সূত্র (৯) অর্থ-পরীক্ষা-প্রকরণ। ৭৩ সূত্র ও ৯ প্রকরণে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম ৯ সূত্র (১) বুদ্ধ্যনিত্যতা-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ সূত্র (২) ক্ষণভঙ্গ-প্রকরণ। তাহার পরে ২৪ সূত্র (৩) বুদ্ধ্যাত্মগুণত্ব-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্র (৪) বুদ্ধ্যুৎপন্নাপ-বর্গিত্ব-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্র (৫) বুদ্ধিশরীরগুণব্যতিরেক-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্র (৬) মনঃপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১৩ সূত্র (৭) শরীরাদৃষ্টনিষ্পাদ্যত্ব-প্রকরণ। ৭২ সূত্রে ও ৭ প্রকরণে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত। ১৬ প্রকরণ ও ১৪৫ সূত্রে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৪	এইরূপ "নৈরাত্ম্যদর্শন"	এইরূপে "নৈরাত্ম্যদর্শন"
২৩০ (৪ পং)	বিভু বলিলে	বিভু বলিলেও
২৩১	যেগীর ক্রমশঃ	যোগীর ক্রমশঃ
২৩৮	ন কারণস্থ	ন কারণস্থা
২৩৯	এই শব্দের	এই শব্দের
২৫১	ঐ সংযোগের	ঐ সংযোগের
	যৌগপাদ্য	যৌগপদ্য
	যুগপদস্মরণস্থ	যুগপদস্মরণস্থ
২৫৫	আত্মার (পূর্ব্বোক্তপ্রকার	আত্মার ইত্থম্ভূত
	সামর্থ্য) নহে,	সামর্থ্য নহে,
২৫৬	নানা জ্ঞান জন্মাইতে	নানা জ্ঞান জন্মাইতে ও
	অর্থাৎ "প্রাতিভ" জ্ঞানেরও	অর্থাৎ "প্রাতিভ" জ্ঞানেরও যে,
২৫৮	সংস্কার	সংস্কার
২৬৫	পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ শরীরই	শরীরই
২৬৮	পার্থিবাদি শরীরসমূহে	শরীরসমূহে
২৭০	প্রযত্ন	প্রযত্ন
২৭১	নিনৃত্তিও	নিবৃত্তিও
২৯৩	ক্রিয়া বিষে	ক্রিয়া বিষয়ে
২৯৫	হওায়	হওয়ায়
২৯৮	হইয়া থাক্রে,	হইয়া থাকে,
২৯৯	প্রতিজ্ঞা ক্বরিয়া	প্রতিজ্ঞা করিয়া
৩২১	লক্ষ্মেঃ	লক্ষ্মেঃ
৩২৫	এ সমস্ত	ঐ সমস্ত
	মুলকং	মুল্যকং
৩২৬	দৃষ্ট ও শ্রুভ	দৃষ্ট ও শ্রুত
	ও বাক্যস্থ	ঐ বাক্যস্থ

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

গৌতমসূত্র

বা

ন্যায়দর্শন

ও

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)

চতুর্থ খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৪৩৷১ আপার সাকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য—সদস্য পক্ষে —১।০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে —১৷৹,

সাধারণ পক্ষে—২৲

কলিকাতা
২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী।

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী।

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

—০—

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষ্য। মনসোঽনন্তরং প্রবৃত্তিঃ পরীক্ষিতব্যা, তত্র খলু যাবদ্ধর্ম্মা-ধর্ম্মাশ্রয়শরীরাদি পরীক্ষিতং, সর্ব্বা সা প্রবৃত্তেঃ পরীক্ষা, ইত্যাহ—

অনুবাদ। মনের অনন্তর অর্থাৎ মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ প্রমেয় মনের পরীক্ষার অনন্তর এখন "প্রবৃত্তি" (পূর্ব্বোক্ত সপ্তম প্রমেয়) পরীক্ষণীয়, তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়, অর্থাৎ আত্মা ও শরীরাদি যে পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা, ইহা (মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা) বলিতেছেন,—

সূত্র। প্রবৃত্তির্যথোক্তা ॥১॥৩৪৪॥

ভাষ্য। তথা পরীক্ষিতেতি।

অনুবাদ। "প্রবৃত্তি" যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্য। প্রবৃত্ত্যনন্তরাস্তর্হি দোষাঃ পরীক্ষ্যন্তামিত্যত আহ—

অনুবাদ। তাহা হইলে "প্রবৃত্তি"র অনন্তরোক্ত "দোষ" পরীক্ষিত হউক? এজন্য (মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্র) বলিতেছেন—

সূত্র। তথা দোষাঃ ॥২॥৩৪৫॥

ভাষ্য। তথা পরীক্ষিতা ইতি।

অনুবাদ। সেইরূপ অর্থাৎ প্রবৃত্তির ন্যায় "দোষ" পরীক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্য। বুদ্ধিসমানাশ্রয়ত্বাদাত্মগুণাঃ, প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ পুনর্ভবপ্রতি-সন্ধানসামর্থ্যাচ্চ সংসারহেতবঃ,—সংসারস্যানাদিত্বাদনাদিনা প্রবন্ধেন প্রবর্ত্তন্তে,—মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তত্ত্বজ্ঞানাত্তন্নিবৃত্তৌ রাগদ্বেষপ্রবন্ধোচ্ছেদে-ঽপবর্গ ইতি প্রাদুর্ভাব-তিরোধানধর্ম্মকা, ইত্যেবমাদ্যুক্তং দোষাণামিতি।

অনুবাদ। বুদ্ধির সমানাশ্রয়ত্ববশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাতেই উৎপন্ন হয়, এজন্য [দোষসমূহ] আত্মার গুণ, (এবং) "প্রবৃত্তি"র (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের) কারণত্ববশতঃ এবং পুনর্জ্জন্ম সৃষ্টির সামর্থ্যবশতঃ সংসারের হেতু, (এবং) সংসারের অনাদিত্ববশতঃ অনাদিপ্রবাহরূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে (এবং) তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষের প্রবাহের উচ্ছেদ হইলে মোক্ষ হয়, এজন্য (পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ) "প্রাদুর্ভাবতিরোধানধর্ম্মক", অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশালী, দোষসমূহের সম্বন্ধে ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ে আত্মা প্রভৃতি যে দ্বাদশ পদার্থকে "প্রমেয়" নামে উল্লেখপূর্ব্বক যথাক্রমে ঐসমস্ত প্রমেয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রমানুসারে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, ও মন এই ছয়টি প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন। মনের পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে এখন সপ্তম প্রমেয় "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা কর্ত্তব্য, কিন্তু মহর্ষি তাহা কেন করেন নাই? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তি" যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হওয়ায়, এখানে আবার উহা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে "প্রবৃত্তি"র অনন্তর-কথিত সপ্তম প্রমেয় "দোষে"র পরীক্ষা কর্ত্তব্য, মহর্ষি তাহাও কেন করেন নাই? এজন্য মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সেইরূপ "দোষ"ও পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়—আত্মার পরীক্ষার দ্বারা যেমন "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারা ঐ "প্রবৃত্তি"র তুল্য "দোষ"-সমূহেরও পরীক্ষা হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, মনের পরে "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা কর্ত্তব্য, কিন্তু মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও শরীরাদি প্রমেয়ের যে পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয়ের যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সমস্ত "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা। অর্থাৎ সেই পরীক্ষার দ্বারাই "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা নিষ্পন্ন হওয়ায়, এখানে আর পৃথক্ করিয়া "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা করেন নাই। "প্রবৃত্তি-র্যথোক্তা" এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ইহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বভাষ্যে "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, "ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়" শব্দের দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" যে, আত্মাশ্রিত, অর্থাৎ উহা আত্মারই গুণ, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে, ইহা সূচনা করিয়াছেন।

এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" (১।১৭) —এই সূত্রের দ্বারা বাচিক, মানসিক ও শারীরিক "আরম্ভ", অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার শুভ ও অশুভ কর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঐ "প্রবৃত্তি"কে প্রযত্ন-বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, ঐ সূত্রে "আরম্ভ" শব্দের দ্বারা কর্ম্ম অর্থই সহজে বুঝা যায়। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন[১]। পরন্তু

শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানও মুমুক্ষুর অত্যাবশ্যক, সুতরাং মহর্ষি গোতম যে, তাঁহার কথিত প্রমেয়ের মধ্যে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"জন্য যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ জন্মে, তাহাকেও মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর এখানে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—(১) কারণরূপ, এবং (২) কার্য্যরূপ। প্রথম অধ্যায়ে "প্রবৃত্তি"র লক্ষণসূত্রে (১।১৭) কারণরূপ "প্রবৃত্তি" কথিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক কার্য্যরূপ "প্রবৃত্তি" "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষ" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রে কথিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উহার কার্য্য। সুতরাং ঐ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"কে কারণরূপ প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"কে কার্য্যরূপ প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে। শুভকর্ম্ম দশ প্রকার এবং অশুভ কর্ম্ম দশ প্রকার কথিত হওয়ায়, ঐ কারণরূপ প্রবৃত্তি বিংশতি প্রকার। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে ঐ বিংশতি প্রকার কারণরূপ প্রবৃত্তির বর্ণন করিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে মহর্ষি যে, "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক কার্য্যরূপ প্রবৃত্তিই বলিয়াছেন, ইহাও সেখানে প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা ও ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, বাক্য, মন ও শরীরজন্য যে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই উভয়ই মহর্ষি গোতমের অভিমত "প্রবৃত্তি"। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মার পূর্ব্বজন্মকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিজন্যই শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা হইয়াছে। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" আত্মারই গুণ, সুতরাং আত্মাই ঐ "প্রবৃত্তির"র কারণ শুভাশুভ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"র কর্ত্তা। আত্মার কৃত ঐ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"ই আত্মার সংসারের কারণ এবং ঐ "প্রবৃত্তির"র আত্যন্তিক অভাবেই অপবর্গ হয়, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মাদি প্রমেয়ের পরীক্ষার দ্বারাই প্রতিপন্ন হওয়ায়, মহর্ষির কথিত সপ্তম প্রমেয় "প্রবৃত্তি"র সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য, যাহা পরীক্ষণীয়, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মাদি প্রমেয়ের পরীক্ষার দ্বারাই পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষি এখানে পৃথক্‌ভাবে আর "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা করেন নাই। এইরূপ "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারা উহার অনন্তরোক্ত অষ্টম প্রমেয় "দোষে"রও পরীক্ষা হইয়াছে। কারণ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাম "দোষ"। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (১।১৮)—এই সূত্রের দ্বারা প্রবৃত্তির জনকত্বই ঐ "দোষে"র সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহই জীবের "প্রবৃত্তি"র জনক। সুতরাং "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারা উহার জনক—রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ "দোষে"রও

১। প্রবৃত্তিরত্র বাগাদেঃ পুণ্যাপুণ্যময়ী ক্রিয়া।—তার্কিকরক্ষা।

পরীক্ষা হইয়াছে। দোষসমূহ কিরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, দোষসমূহ বুদ্ধির সমানাশ্রয়, অর্থাৎ বুদ্ধির আধারই দোষসমূহের আধার, সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় দোষসমূহও আত্মারই গুণ, এবং দোষসমূহ প্রবৃত্তির হেতু ও পুনর্জন্ম সৃষ্টিতে সমর্থ, সুতরাং সংসারের কারণ। এবং সংসার অনাদি, সুতরাং সংসারের কারণ দোষসমূহও অনাদিপ্রবাহরূপে উৎপন্ন হইতেছে, এবং তত্ত্বজ্ঞানজন্য ঐ দোষসমূহের অন্তর্গত মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে, কারণের অভাবে রাগ ও দ্বেষের প্রবাহের উচ্ছেদপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়, সুতরাং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, দোষসমূহের সম্বন্ধে ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিশদ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ "দোষ" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ "প্রবৃত্তি"র তুল্য। কারণ, অভীষ্ট বিষয়ের অনুচিন্তনরূপ বুদ্ধি হইতে পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ জন্মে, সুতরাং বুদ্ধির আশ্রয় আত্মাই ঐ দোষসমূহের আশ্রয় বা আধার হওয়ায়, ঐ দোষসমূহও আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" যে, আত্মারই গুণ, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মগুণত্ব-রূপে দোষসমূহ প্রবৃত্তির তুল্য হওয়ায়, "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারাই ঐরূপে দোষসমূহও পরীক্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সংসার অনাদি, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্বপরীক্ষা-প্রকরণে "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ" (১।২৪)—এই সূত্রের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সংসারের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি এবং উহার কারণ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষও অনাদি, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অনাদিত্বরূপেও ঐ দোষসমূহ "প্রবৃত্তি"র তুল্য হওয়ায়, "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারাই ঐরূপে দোষসমূহও পরীক্ষিত হইয়াছে। পরন্তু মহর্ষি "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ" ইত্যাদি (১।২) দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্য মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ হইলে, রাগ ও দ্বেষের প্রবাহের উচ্ছেদ হওয়ায়, যে ক্রমে অপবর্গ হয় বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষের উৎপত্তি ও বিনাশ কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাও দোষসমূহ যে উৎপত্তি-বিনাশশালী, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ মহর্ষিকথিত "দোষ" নামক অষ্টম প্রমেয়ের সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব পূর্ব্বেই পরীক্ষিত হইয়াছে। যাহা অপরীক্ষিত আছে, তাহাই মহর্ষি পরবর্ত্তী প্রকরণে পরীক্ষা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের একবাক্যতা গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তি" যেমন উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট, তদ্রূপ দোষসমূহও উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট"। অর্থাৎ "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র লক্ষণ সিদ্ধই আছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় না হওয়ায়, পরীক্ষা হইতে পারে না। তাই মহর্ষি "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ যেভাবে পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাহার দোষ থাকিলেও "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব মহর্ষির অবশ্য-বক্তব্য, তাহা যে মহর্ষি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মাদি প্রমেয়ের পরীক্ষার দ্বারাই যে ঐ সকল তত্ত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং মহর্ষির অবশ্যকর্ত্তব্য "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র

পরীক্ষা যে পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যায় মহর্ষির বক্তব্যের কোন অংশে ন্যূনতা নাই। পরন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে যেভাবে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম সূত্রের সহিত দ্বিতীয় সূত্রের সম্বন্ধ প্রকটিত হওয়ায়, প্রকরণভেদের আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, বাক্যভেদ হইলেই প্রকরণভেদ হয় না। তাহা হইলে ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্র ও দ্বিতীয় সূত্রে একটি প্রকরণ কিরূপে হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও সেখানে লিখিয়াছেন, প্রথমদ্বিতীয়সূত্রাভ্যামেকং প্রকরণং।১।২।

প্রবৃত্তিদোষসামান্যপরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥১॥

ভাষ্য। "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা" ইত্যুক্তং, তথা চেমে মানের্ষ্যাঽসূয়া-বিচিকিৎসা-মৎসরাদয়ঃ, তে কস্মান্নোপসংখ্যায়ন্ত ইত্যত আহ—

অনুবাদ। "দোষসমূহ প্রবর্ত্তনালক্ষণ" অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব দোষসমূহের লক্ষণ, ইহা (পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণসূত্র) উক্ত হইয়াছে। এই মান, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বিচিকিৎসা, (সংশয়) এবং মৎসর প্রভৃতি সেইরূপই, অর্থাৎ মান প্রভৃতিও পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণাক্রান্ত,—সেই মানাদি কেন কথিত হইতেছে না?—এজন্য মহর্ষি (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন,—

সূত্র। তৎ ত্রৈরাশ্যং রাগ-দ্বেষ-মোহার্থান্তরভাবাৎ॥ ॥৩॥৩৪৬॥

অনুবাদ। সেই দোষের "ত্রৈরাশ্য" অর্থাৎ তিনটি রাশি বা পক্ষ আছে; যে হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের অর্থান্তরভাব (পরস্পর ভেদ) আছে।

ভাষ্য। তেষাং দোষাণাং ত্রয়ো রাশয়স্ত্রয়ঃ পক্ষাঃ। রাগপক্ষঃ—কামো মৎসরঃ স্পৃহা তৃষ্ণা লোভ ইতি। দ্বেষপক্ষঃ—ক্রোধ ঈর্ষ্যাঽসূয়া দ্রোহোঽমর্ষ ইতি। মোহপক্ষো—মিথ্যাজ্ঞানং বিচিকিৎসা মানঃ প্রমাদ ইতি। ত্রৈরাশ্যান্নোপসংখ্যায়ন্ত ইতি। লক্ষণস্য তর্হ্যভেদাৎ ত্রিত্বমনুপপন্নং? নানুপপন্নং, রাগদ্বেষমোহার্থান্তরভাবাৎ আসক্তি-

লক্ষণো রাগঃ, অমর্ষলক্ষণো দ্বেষঃ, মিথ্যাপ্রতিপত্তিলক্ষণো মোহ ইতি। **এতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং সর্ব্বশরীরিণাং,** বিজানাত্যয়ং শরীরী রাগমুৎপন্নমস্তি মেঽধ্যাত্মং রাগধর্ম্ম ইতি। বিরাগঞ্চ বিজানাতি নাস্তি মেঽধ্যাত্মং রাগধর্ম্ম ইতি। এবমিতরয়োরপীতি। মানের্ষ্যাঽসূয়াপ্রভৃতয়স্ত ত্রৈরাশ্যমনুপতিতা ইতি নোপসংখ্যায়ন্তে।

অনুবাদ। সেই দোষসমূহের তিনটি রাশি (অর্থাৎ) তিনটি পক্ষ আছে। (১) রাগপক্ষ; যথা—কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ। (২) দ্বেষপক্ষ; যথা—ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ। (৩) মোহপক্ষ; যথা—মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান ও প্রমাদ। ত্রৈরাশ্যবশতঃ, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের পূর্ব্বোক্ত পক্ষত্রয় থাকায় (কাম, মৎসর, মান, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি) কথিত হয় নাই।

(পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে লক্ষণের অভেদপ্রযুক্ত (দোষের) ত্রিত্ব অনুপপন্ন ?—(উত্তর) অনুপপন্ন নহে। যেহেতু, রাগ, দ্বেষ ও মোহের অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ আছে। রাগ আসক্তিস্বরূপ, দ্বেষ অমর্ষস্বরূপ, মোহ মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ। এই দোষত্রয় সর্ব্বজীবের প্রত্যাত্মবেদনীয়। (বিশদার্থ) —এই জীব "আমার আত্মাতে রাগরূপ ধর্ম্ম আছে" এই প্রকারে উৎপন্ন রাগকে জানে; "আমার আত্মাতে রাগরূপ ধর্ম্ম নাই" এই প্রকারে "বিরাগ" অর্থাৎ রাগের অভাবকেও জানে। এইরূপ অন্য দুইটির অর্থাৎ দ্বেষ ও মোহের সম্বন্ধেও বুঝিবে,—অর্থাৎ রাগের ন্যায় দ্বেষ ও মোহ এবং উহার অভাবও জীবের মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মান, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি কিন্তু ত্রৈরাশ্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ-ত্রয়ের অন্তর্গত, এজন্য কথিত হয় নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (১।১৮)—এই সূত্রের দ্বারা দোষের লক্ষণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তিজনকত্ব। দোষ ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, সুতরাং দোষসমূহ প্রবৃত্তির জনক। কিন্তু কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, এবং মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান, প্রমাদ, এই সমস্ত পদার্থও প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং ঐ কাম প্রভৃতি পদার্থও মহর্ষিকথিত দোষলক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণসূত্রে দোষের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত কাম, মৎসর প্রভৃতিও মহর্ষির বক্তব্য, মহর্ষি কেন তাহা বলেন নাই? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূচনার জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, সেই দোষের "ত্রৈরাশ্য" অর্থাৎ তিনটি রাশি বা পক্ষ আছে। "রাশি" শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ; "পক্ষ" বলিতে এখানে প্রকারবিশেষই অভিপ্রেত। রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাম "দোষ"। ঐ দোষের তিনটি পক্ষ, যথা (১) রাগপক্ষ, (২) দ্বেষপক্ষ, (৩)

মোহপক্ষ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, এই কএকটি—পদার্থ রাগপক্ষ, অর্থাৎ রাগেরই প্রকারবিশেষ। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, এই কএকটি পদার্থ—দ্বেষপক্ষ, অর্থাৎ দ্বেষেরই প্রকারবিশেষ। এবং মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান, প্রমাদ, এই কএকটি পদার্থ—মোহপক্ষ, অর্থাৎ মোহেরই প্রকার-বিশেষ। সামান্যতঃ যে রাগ, দ্বেষ, ও মোহকে দোষ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাম, মৎসর প্রভৃতি ঐ দোষেরই বিশেষ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" এই সূত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা এবং ঐ সূত্রোক্ত দোষ-লক্ষণের দ্বারা কাম, মৎসর প্রভৃতিও সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে "দোষ" বলিয়াছেন, ঐ দোষের পূর্ব্বোক্ত পক্ষত্রয়ে "কাম", "মৎসর" প্রভৃতিও অন্তর্ভূত থাকায়, মহর্ষি বিশেষ করিয়া "কাম", "মৎসর" প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রবৃত্তিজনকত্বই দোষের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, ঐ লক্ষণের ভেদ না থাকায়, দোষকে একই বলিতে হয়; উহার ত্রিত্ব উপপন্ন হয় না। এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রে হেতু বলিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহের "অর্থান্তরভাব" অর্থাৎ পরস্পর ভেদ আছে। অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ, যাহা "দোষ" বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা পরস্পর ভিন্নপদার্থ। কারণ, বিষয়ে আসক্তি বা অভিলাষ-বিশেষকে "রাগ" বলে। অমর্ষকে "দ্বেষ" বলে। মিথ্যাজ্ঞানকে "মোহ" বলে। সুতরাং ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহের সামান্য লক্ষণ (প্রবৃত্তিজনকত্ব) এক হইলেও উহার লক্ষ্য দোষ একই পদার্থ হইতে পারে না। ঐ দোষের আন্তর্গণিক ভেদক লক্ষণ তিনটি থাকায়, উহার ত্রিত্ব উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয় (রাগ, দ্বেষ, মোহ) নিজের আত্মাতেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আত্মাতে কোন বিষয়ে রাগ উৎপন্ন হইলে, তখন "আমি এই বিষয়ে রাগবিশিষ্ট"—এইরূপে মনের দ্বারা ঐ রাগের প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ কোন বিষয়ে রাগ না থাকিলে, মনের দ্বারা ঐ রাগের অভাবেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ দ্বেষ ও দ্বেষের অভাব এবং মোহ ও মোহের অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে। ফলকথা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষ যে, পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ, ইহা মানস অনুভবসিদ্ধ, ঐ দোষত্রয়ের ভেদক লক্ষণত্রয়ও (রাগত্ব, দ্বেষত্ব ও মোহত্ব) আত্মার মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং দোষের ত্রিত্বই উপপন্ন হয়।

ভাষ্যকারোক্ত কাম, মৎসর প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, স্ত্রীবিষয়ে অভিলাষবিশেষ "কাম"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, পুরুষবিষয়ে স্ত্রীর অভিলাষ-বিশেষও যখন কাম, তখন স্ত্রীবিষয়ে অভিলাষ বিশেষকেই কাম বলা যায় না। রমণেচ্ছাই "কাম"[১]। নিজের প্রয়োজনজ্ঞান ব্যতীত অপরের অভিমত নিবারণে ইচ্ছা "মৎসর"। যেমন

১। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন, "মৈথুনেচ্ছা" কামঃ। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার লিখিয়াছেন যে, কেবল "কাম"শব্দ মৈথুনেচ্ছারই বাচক। "স্বর্গকাম" ইত্যাদি বাক্যে অন্য শব্দের সহিত "কাম"শব্দের যোগবশতঃ ইচ্ছা মাত্র অর্থ বুঝা যায়।

কেহ রাজকীয় জলাশয় হইতে জলপানে প্রবৃত্ত হইলে, ব্যক্তিবিশেষের উহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা জন্মে। ঐরূপ ইচ্ছাই "মৎসর"। পরকীয় দ্রব্যের গ্রহণবিষয়ে ইচ্ছা "স্পৃহা"। যে ইচ্ছাবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ হয়, সেই ইচ্ছার নাম "তৃষ্ণা"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, "আমার এই বস্তু নষ্ট না হউক"—এইরূপ ইচ্ছা "তৃষ্ণা"। এবং উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষায় ইচ্ছারূপ কর্পিণ্যও তৃষ্ণাবিশেষ। ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরদ্রব্যগ্রহণবিষয়ে ইচ্ছা "লোভ"। পুর্ব্বোক্ত "কাম," "মৎসর" প্রভৃতি সমস্তই আসক্তি বা ইচ্ছাবিশেষ, সুতরাং ঐ সমস্ত রাগপক্ষ, অর্থাৎ রাগেরই প্রকারবিশেষ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্ব্বোক্ত "কাম" প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত "মায়া" ও "দম্ভ"কেও রাগপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া, পর-প্রতারণার ইচ্ছাকে "মায়া" এবং ধার্ম্মিকত্বাদিরূপে নিজের উৎকর্ষ খ্যাপনের ইচ্ছাকে "দম্ভ" বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে" ইচ্ছা-পদার্থ নিরূপণ করিয়া, উহার ভেদ বর্ণন করিতে "কাম," "অভিলাষ", "রাগ", "সংকল্প", "কারুণ্য," "বৈরাগ্য", "উপধা", "ভাব" ইত্যাদিকে ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঐ "কাম" প্রভৃতির স্বরূপও বলিয়াছেন। (কাশী সংস্করণ—২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতির কারণ দ্বেষবিশেষই "ক্রোধ"। সাধারণ বস্তুতে অপরেরও স্বত্ব থাকায়, ঐ বস্তুর গ্রহীতার প্রতি দ্বেষবিশেষ "ঈর্ষ্যা"। সাধারণ ধনাধিকারী দুর্দ্দান্ত জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে ঐরূপ দ্বেষবিশেষ অর্থাৎ ঈর্ষ্যা জন্মে। উদ্দ্যোতকরের ভাবানুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ "ঈর্ষ্যা"র ঐরূপই স্বরূপ বলিয়াছেন। যেরূপ স্থলেই হউক, "ঈর্ষ্যা" যে, দ্বেষবিশেষ, এবিষয়ে সংশয় নাই। পরের গুণাদি বিষয়ে দ্বেষবিশেষ—"অসূয়া"। বিনাশের জন্য দ্বেষবিশেষ "দ্রোহ"। ঐ দ্রোহজন্যই হিংসা জন্মে। কেহ কেহ হিংসাকেই দ্রোহ বলিয়াছেন। অপকারী ব্যক্তির অপকারে অসমর্থ হইয়া, সেই অপকারী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষবিশেষ "অমর্ষ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ "অমর্ষের" পরে "অভিমান"কেও দ্বেষপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অপকারী ব্যক্তির অপকারে অসমর্থ হইলে, নিজের আত্মাতে যে দ্বেষবিশেষ জন্মে, তাহাই "অভিমান"। উদ্দ্যোতকর "ঈর্ষ্যা" ও "দ্রোহ"কে দ্বেষপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়াও শেষে —উহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় "ঈর্ষ্যা"কে ও "দ্রোহ"কে কেন যে, ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াছেন[১], তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুধীগণ ইহা অবশ্য চিন্তা করিবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঐরূপ বলেন নাই।

মোহপক্ষের অন্তর্গত "মিথ্যাজ্ঞান" বলিতে বিপর্য্যয়, অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয়। "বিচিকিৎসা" বলিতে সংশয়। গুণবিশেষের আরোপ করিয়া নিজের উৎকর্ষ জ্ঞানের নাম "মান"। কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত বিষয়েও পরে যে, অকর্ত্তব্যত্ব বুদ্ধি এবং অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত বিষয়েও পরে যে, কর্ত্তব্যত্ব বুদ্ধি তাহার নাম "প্রমাদ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এতদ্ব্যতীত "তর্ক", "ভয়" এবং "শোক"কেও মোহপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের

১। সাধারণে বস্তুনি পরাভিনিবেশপ্রতিষেধেচ্ছা ঈর্ষ্যা।" "পরাপকারেচ্ছা দ্রোহঃ।"—ন্যায়বার্ত্তিক—

আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপক-পদার্থের আরোপ, অর্থাৎ ভ্রমবিশেষ "তর্ক"। অনিষ্টের হেতু উপস্থিত হইলে, উহার পরিত্যাগে অযোগ্যতা-জ্ঞান "ভয়"। ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ হইলে, উহার লাভে অযোগ্যতাজ্ঞান "শোক"। পূর্ব্বোক্ত "মিথ্যাজ্ঞান" ও "বিচিকিৎসা" প্রভৃতি সমস্তই মোহ বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, সুতরাং ঐসমস্তই মোহপক্ষ।

মহর্ষি এই সূত্রে যে রাগ, দ্বেষ ও মোহের অর্থান্তরভাবকে হেতু বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা দোষের ত্রিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ হেতুকে দোষের ত্রিত্বেরই সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দোষের ত্রিত্ব সিদ্ধ হইলেই, পূর্ব্বোক্ত "ত্রৈরাশ্য" সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং মহর্ষি-সূত্রোক্ত হেতু দোষের ত্রিত্বের সাধক হইয়া পরম্পরায় উহার ত্রৈরাশ্যেরও সাধক হইয়াছে। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি এই সূত্রে দোষের "ত্রৈরাশ্য"কে সাধ্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত "কাম", "মৎসর" প্রভৃতি এবং "ক্রোধ", "ঈর্ষ্যা" প্রভৃতি এবং "মিথ্যাজ্ঞান, ও "বিচিকিৎসা" প্রভৃতি যথাক্রমে রাগপক্ষ, দ্বেষপক্ষ ও মোহপক্ষে (ত্রৈরাশ্যে) অন্তর্ভূত থাকায়, মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। ইহাই এই সূত্রে মহর্ষির মূল বক্তব্য ॥৩॥

সূত্র। নৈকপ্রত্যনীকভাবাৎ ॥ ৪ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ ভিন্নপদার্থ নহে; কারণ, উহারা "একপ্রত্যনীক" অর্থাৎ একতত্ত্বজ্ঞানই উহাদিগের প্রত্যনীক (বিরোধী)।

ভাষ্য। নার্থান্তরং রাগাদয়ঃ, কস্মাৎ? একপ্রত্যনীকভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানং সম্যঙ্‌মতিরার্য্যপ্রজ্ঞা সংবোধ ইত্যেকমিদং প্রত্যনীকং ত্রয়াণামিতি।

অনুবাদ। রাগ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু (ঐ রাগাদির) একপ্রত্যনীকত্ব আছে। তত্ত্বজ্ঞান (অর্থাৎ) সম্যক্ মতি আর্য্যপ্রজ্ঞা; সম্যক্ বোধ এই একই তিনটির (রাগ, দ্বেষ ও মোহের) প্রত্যনীক অর্থাৎ বিরোধী।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শনের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ নহে, উহারা একই পদার্থ। কারণ, এক তত্ত্বজ্ঞানই ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহের "প্রত্যনীক" অর্থাৎ বিরোধী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, যাহার বিরোধী বা বিনাশক এক, তাহা একই পদার্থ। যেমন কোন দ্রব্যদ্বয়ের বিভাগ হইলে, ঐ বিভাগ দুই দ্রব্যে বিভিন্ন বিভাগদ্বয় নহে, একসংযোগই ঐ বিভাগের বিরোধী হওয়ায়, ঐ বিভাগ এক, তদ্রূপ এক তত্ত্বজ্ঞানই রাগ, দ্বেষ ও মোহের বিরোধী হওয়ায়, ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহও একই পদার্থ। যাহা একনাশকনাশ্য, তাহা এক, এই নিয়মানুসারে একতত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব হেতুর দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের একত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার "তত্ত্বজ্ঞান"

বলিয়া শেষে "সম্যঙ্মতি," "আর্য্যপ্রজ্ঞা" [১] ও "সংবোধ"—এই তিনটি শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানেরই বিবরণ বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা তত্ত্বজ্ঞাননামে প্রসিদ্ধ, তাহাকে কেহ "সম্যঙ্-মতি", কেহ "আর্য্যপ্রজ্ঞা", কেহ "সংবোধ" বলিয়াছেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মতেই ঐ তত্ত্বজ্ঞানই রাগ, দ্বেষ ও মোহের বিরোধী বা বিনাশক। মনে হয়, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার "সম্যঙ্মতি" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিবরণ করিয়াছেন॥ ৪॥

সূত্র। ব্যভিচারাদহেতুঃ ॥৫॥৩৪৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ অহেতু, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নত্বসাধনে পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা হেতু নহে, উহা হেত্বাভাস; কারণ, উহা ব্যভিচারী।

ভাষ্য। একপ্রত্যনীকাঃ পৃথিব্যাং শ্যামাদয়োঽগ্নিসংযোগেনৈকেন, একযোনয়শ্চ পাকজা ইতি।

অনুবাদ। পৃথিবীতে শ্যাম প্রভৃতি (শ্যাম, রক্ত, শ্বেত প্রভৃতি রূপ ও নানাবিধ রসাদি) এক অগ্নিসংযোগপ্রযুক্ত "একপ্রত্যনীক" অর্থাৎ এক অগ্নিসংযোগনাশ্য, এবং পাকজন্য শ্যাম প্রভৃতি "একযোনি" অর্থাৎ অগ্নিসংযোগরূপ এককারণজন্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু ব্যভিচারী, সুতরাং উহা হেতু হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির বুদ্ধিস্থ ব্যভিচার বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে শ্যাম, রক্ত প্রভৃতি রূপ ও নানাবিধ রসাদি জন্মে, তাহা ঐ পৃথিবীতে বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগ হইলে নষ্ট হয়। সুতরাং এক অগ্নিসংযোগই পৃথিবীর শ্যাম, রক্ত প্রভৃতি রূপ ও রসাদির প্রত্যনীক অর্থাৎ বিরোধী। কিন্তু ঐ রূপ-রসাদি অভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং যাহার প্রত্যনীক, অর্থাৎ বিরোধী এক, অর্থাৎ যাহা এক বিনাশক-নাশ্য, তাহা অভিন্ন, এইরূপ নিয়মে ব্যভিচারবশতঃ একপ্রত্যনীকত্ব, রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নত্বসাধনে হেতু হয় না। পরন্তু পৃথিবীতে বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগরূপ পাকজন্য পূর্ব্বতন রূপাদির বিনাশ হইলে যে নূতন রূপাদির উৎপত্তি হয়, তাহাকে পাকজ রূপাদি বলে। ঐ পাকজ রূপাদি এক অগ্নিসংযোগজন্য। একই অগ্নিসংযোগ, পৃথিবীতে রূপ-রসাদি নানা পদার্থের "যোনি" অর্থাৎ জনক। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ রূপাদি অভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং এক মিথ্যাজ্ঞানরূপ কারণজন্য রাগ, দ্বেষ ও নানাবিধ মোহের উৎপত্তি হওয়ায়, রাগ, দ্বেষ ও মোহে একযোনিত্ব (এককারণজন্যত্ব) থাকিলেও, তদ্দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, একনাশকনাশ্যত্বের ন্যায় এককারণজন্যত্বও পদার্থের

১। আর্য্যপ্রজ্ঞেতি ভাষ্যং। আরাৎ তত্ত্বাদ্‌যাতা আর্য্যা। আর্য্যা চাসৌ প্রজ্ঞা চেতি আর্য্যপ্রজ্ঞা। সম্যগ্‌বোধঃ সংবোধঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

অভিন্নত্বসাধনে ব্যভিচারী। পাকজন্য রূপ-রসাদি এককারণজন্য হইলেও ঐ রূপাদি যখন বিভিন্নপদার্থ, তখন এককারণজন্যত্বও রাগাদির অভিন্নত্বসাধক হয় না ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। সতি চার্থান্তরভাবে—

সূত্র। তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ ॥ ॥৬॥৩৪৯॥

অনুবাদ। অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ থাকাতেই, সেই রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহ পাপীয়ান্, অর্থাৎ অনর্থের মূল বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ, মোহশূন্য জীবের "ইতরে"র অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। মোহঃ পাপঃ, পাপতরো বা, দ্বাবভিপ্রেত্যোক্তং, কস্মাৎ? নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ, অমূঢ়স্য রাগদ্বেষৌ নোৎপদ্যেতে, মূঢ়স্য তু যথাসংকল্পমুৎপত্তিঃ। বিষয়েষু রঞ্জনীয়াঃ সংকল্পা রাগহেতবঃ, কোপনীয়াঃ সংকল্পা দ্বেষহেতবঃ, উভয়ে চ সংকল্পা ন মিথ্যাপ্রতিপত্তিলক্ষণত্বান্মোহাদন্যে, তাবিমৌ মোহযোনী রাগদ্বেষাবিতি। তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ মোহনিবৃত্তৌ রাগদ্বেষানুৎপত্তিরিত্যেকপ্রত্যনীকভাবোপপত্তিঃ। এবঞ্চ কৃত্বা তত্ত্বজ্ঞানাদ্- "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি ব্যাখ্যাতমিতি।

অনুবাদ। মোহ পাপ, অথবা পাপতর, উভয়কে অভিপ্রায় করিয়া ("পাপীয়ান্" এই পদ) উক্ত হইয়াছে [অর্থাৎ রাগ ও মোহ এবং দ্বেষ ও মোহ, এই উভয়ের মধ্যে মোহ পাপতর, এই তাৎপর্য্যে মহর্ষি "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্"—এই বাক্য বলিয়াছেন]। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন? (উত্তর) যেহেতু, মোহশূন্য জীবের ইতরের (রাগ ও দ্বেষের) উৎপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে,—মোহশূন্য জীবের রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু মোহবিশিষ্ট জীবেরই সংকল্পানুরূপ (রাগ ও দ্বেষের) উৎপত্তি হয়। বিষয়সমূহে রঞ্জনীয় সংকল্পসমূহ রাগের হেতু; কোপনীয় সংকল্পসমূহ দ্বেষের হেতু; উভয় সংকল্পই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রঞ্জনীয় এবং কোপনীয়—এই দ্বিবিধ সংকল্পই মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া মোহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, সেই জন্য এই রাগ ও দ্বেষ "মোহযোনি" অথাৎ মোহরূপকারণজন্য। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মোহের নিবৃত্তি হইলে, রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না, এজন্য "একপ্রত্যনীকভাবের" অথাৎ এক তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বের উপপত্তি হয়। এইরূপ করিয়া অর্থাৎ

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের উত্তর উত্তরের অপায় হইলে, তদনন্তরের অপায়-প্রযুক্ত অপবর্গ হয়", ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টিপ্পনী। রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ হইলেই মোহকে রাগ ও দ্বেষের কারণ বলা যাইতে পারে, তাই মহর্ষি ঐ দোষত্রয়ের বিভিন্নপদার্থত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সেই রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা পাপ, অর্থাৎ অনর্থের মূল। কারণ, মোহশূন্য জীবের রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, মূঢ় জীবেরই যখন রাগ ও দ্বেষ জন্মে, তখন মোহই রাগ ও দ্বেষের মূল-কারণ, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রে এবং এই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষসূত্রে সংকল্পকে রাগাদির কারণ বলিয়াছেন। এই সূত্রে মোহকে রাগ ও দ্বেষের কারণ বলিয়াছেন। এজন্য ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, বিষয়-সমূহে রঞ্জনীয়[১] সংকল্প রাগের কারণ এবং কোপনীয় সংকল্প দ্বেষের কারণ; ঐ দ্বিবিধ সংকল্পই মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া, মোহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ যে সংকল্প রাগ ও দ্বেষের কারণ, উহাও মোহবিশেষ, সুতরাং সংকল্পজন্য রাগ ও দ্বেষ "মোহযোনি" অর্থাৎ মোহজন্য, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকেই "সংকল্প" বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও সেখানে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রে "সংকল্প"শব্দের ঐরূপ অর্থ ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে স্পষ্ট করিয়া রাগ ও দ্বেষের কারণ "সংকল্প"কে মোহই বলায়, তাঁহার মতে ঐ "সংকল্প" যে ইচ্ছাপদার্থ নহে, জ্ঞানপদার্থ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে মোহপ্রযুক্ত বিষয়ের সুখসাধনত্বের অনুস্মরণ এবং দুঃখসাধনত্বের অনুস্মরণকে "সংকল্প" বলিয়াছেন। সুখসাধনত্বের অনুস্মরণ রঞ্জনীয় সংকল্প, উহা রাগের কারণ। দুঃখসাধনত্বের অনুস্মরণ কোপনীয় সংকল্প, উহা দ্বেষের কারণ। ঐ দ্বিবিধ অনুস্মরণরূপ দ্বিবিধ সংকল্পই মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ, সুতরাং উহাও মোহমূলক মোহ, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের তাৎপর্য্য মনে হয়। এই আহ্নিকের শেষসূত্রের ব্যাখ্যায় এবিষয়ে তাৎপর্য্যটীকাকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা এবং এবিষয়ে অন্যান্য কথা সেই সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহমাত্রের নিবৃত্তি হইলেও, তখন ঐ কারণের অভাবে উহার কার্য্য রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না; কখনও সাধারণ রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হইলেও, যে রাগ ও দ্বেষ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রযোজক, তাদৃশ রাগ, দ্বেষ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং একতত্ত্বজ্ঞানই মোহকে বিনষ্ট করিয়া রাগ ও দ্বেষের নিবর্ত্তক হওয়ায়, রাগ, দ্বেষ ও মোহের "একপ্রত্যনীকভাব" উপপন্ন হয়। একতত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মোহ

১। "রঞ্জয়তি" এবং "কোপয়তি" এই অর্থে এখানে "রঞ্জনীয়" এবং "কোপনীয়" এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। "রঞ্জনীয়াঃ কোপনীয়া ইতি কর্ত্তরি কৃত্যো ভব্যগেয়াদি পাঠাৎ।"—তাৎপর্য্যটীকা

এবং রাগ ও দ্বেষের "প্রত্যনীক" অর্থাৎ বিরোধী বা নিবর্ত্তক, এজন্য ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষত্রয়ের "একপ্রত্যনীকভাব" অর্থাৎ একপ্রত্যনীকত্ব বা একনাশকনাশ্যত্ব আছে। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা শেষে রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপে উহাদিগের একপ্রত্যনীকতার উপপাদন করিয়া শেষে ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের "দুঃখজন্ম—" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের উদ্ধারপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে যেরূপে অপবর্গ হয়, তাহা ঐ সূত্রের ভাষ্যেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—ইহা বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মোহের নিবৃত্তি হইলে, রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, এই জন্যই রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই দোষত্রয় একপ্রত্যনীক, কিন্তু ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নতাবশতঃই উহারা একপ্রত্যনীক নহে। অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপে উহাদিগের একপ্রত্যনীকতা উপপন্ন হয়, সুতরাং একপ্রত্যনীকত্ব আছে বলিয়াই যে, ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহ অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার বিপরীতভাবে এই সূত্রের মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান কেবল মোহেরই নিবর্ত্তক, রাগ ও দ্বেষের নিবর্ত্তক নহে। সুতরাং রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই দোষত্রয়কে একপ্রত্যনীক বলা যাইতে পারে না। ঐ দোষত্রয়ে একতত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব না থাকায়, উহাতে "একপ্রত্যনীকভাব"ই নাই। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ, প্রকৃত স্থলে ঐ হেতু যেমন ব্যভিচারী বলিয়া হেতু হয় না, তদ্রূপ উহা ঐ দোষত্রয়ে অসিদ্ধ বলিয়াও হেতু হয় না। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা কিন্তু তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য সহজে বুঝা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুকে অসিদ্ধ বলাই মহর্ষির অভিমত হইলে, পূর্ব্বসূত্রে প্রথমে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, ইহাই মনে হয়। সুধীগণ বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন।

সূত্রে "পাপ" শব্দের উত্তর "ঈয়সুন্" প্রত্যয়সিদ্ধ "পাপীয়স্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একের অতিশয় বিবক্ষা—স্থলেই "তরপ্" ও "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের বিধান আছে [১]। কিন্তু বহু পদার্থের মধ্যে একের অতিশয় বিবক্ষাস্থলে "তমপ্" ও "ইষ্ঠন্" প্রত্যয়েরই বিধান থাকায়, এখানে "পাপতমঃ" অথবা "পাপিষ্ঠঃ" এইরূপ প্রয়োগই মহর্ষির কর্ত্তব্য। কারণ, মহর্ষি এখানে "তেষাং" এই বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়া দোষত্রয়ের মধ্যে মোহের অতিশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এইজন্য প্রথমে এখানে "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের অর্থকে মহর্ষির অবিবক্ষিত মনে করিয়া "মোহঃ পাপঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের সার্থক্য সম্পাদনের জন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পাপতরো বা," এবং ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়কে অভিপ্রায় করিয়া ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, রাগ ও মোহের মধ্যে এবং দ্বেষ ও মোহের মধ্যে 'মোহ পাপীয়ান্'—এই

১। দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ ।৫।৩।৫৭।

অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। ৫। ৩। ৫৫।—পাণিনি-সূত্র।

তাৎপর্য্যেই মহর্ষি এখানে "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্"—এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের অনুপপত্তি নাই। বার্ত্তিককার ও বৃত্তিকার ঐরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া, এখানে বলিয়াছেন যে, সূত্রে "তেষাং" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারাই নির্দ্ধারণ বোধিত হইয়াছে। "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের দ্বারা অতিশয় মাত্র বোধিত হইয়াছে। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে এখানে "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের কিরূপে উপপাদন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। সূত্রে "নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ" এই স্থলে "নঞ্" শব্দের অর্থের সহিত "উৎপত্তি" শব্দার্থের অন্বয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত। মহর্ষিসূত্রে অন্যত্রও ঐরূপ প্রয়োগ আছে। পরবর্ত্তী ১৪শ সূত্র ও সেখানে নিম্নটিপ্পনী দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। প্রাপ্তস্তর্হি—

সূত্র। নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবাদর্থান্তরভাবো দোষেভ্যঃ ॥ ॥৭।৩৫০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে, অর্থাৎ মোহ, রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত হইলে, "নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব"বশতঃ দোষ হইতে (মোহের) অর্থান্তরভাব অর্থাৎ-ভেদ প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য। অন্যদ্ধি নিমিত্তমন্যচ্চ নৈমিত্তিকমিতি দোষনিমিত্তত্বাদদোষো মোহ ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু নিমিত্ত অন্য, এবং নৈমিত্তিক অন্য, সুতরাং দোষের নিমিত্ততা-বশতঃ মোহ দোষ হইতে ভিন্ন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, মোহ, রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত হইলে, রাগ ও দ্বেষ ঐ মোহরূপ নিমিত্তজন্য বলিয়া নৈমিত্তিক, এবং মোহ, নিমিত্ত, সুতরাং মোহ এবং রাগ ও দ্বেষের "নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব" স্বীকৃত হইতেছে। তাহা হইলে মোহ "দোষ" হইতে পারে না। কারণ, নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক ভিন্নপদার্থই হইয়া থাকে। যাহা নিমিত্ত, তাহা নৈমিত্তিক হইতে পারে না। সুতরাং মোহকে দোষের নিমিত্ত বলিলে, উহাকে "দোষ" বলা যায় না। উহাকে দোষ হইতে অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থই বলিতে হয় ॥ ৭ ॥

সূত্র। ন দোষলক্ষণাবরোধান্মোহস্য ॥৮॥৩৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ মোহ দোষ নহে, ইহা বলা যায় না কারণ, মোহের দোষলক্ষণের দ্বারা "অবরোধ" (সংগ্রহ) হয়।

ভাষ্য। "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা" ইত্যনেন দোষলক্ষণেনাবরুধ্যতে দোষেষু মোহ ইতি।

অনুবাদ। "দোষসমূহ প্রবর্ত্তনালক্ষণ" (অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব দোষের লক্ষণ) এই দোষলক্ষণের দ্বারা দোষসমূহের মধ্যে মোহ সংগৃহীত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, দোষের যাহা লক্ষণ (প্রবৃত্তিজনকত্ব), তাহা মোহেও আছে, মোহও সেই দোষলক্ষণের দ্বারা দোষমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং মোহ দোষ নহে, ইহা বলা যায় না। মোহ দোষান্তরের নিমিত্ত হইলেও নিজেও দোষলক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং মোহ ও দোষবিশেষ বলিয়া দোষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে॥ ৮॥

সূত্র। নিমিত্তনৈমিত্তিকোপপত্তেশ্চ তুল্যজাতীয়ানামপ্রতিষেধঃ॥৯॥৩৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) পরন্তু তুল্যজাতীয় পদার্থের মধ্যে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের উপপত্তি (সত্তা)-বশতঃ (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। দ্রব্যাণাং গুণানাং বাঽনেকবিধবিকল্পো নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে তুল্যজাতীয়ানাং দৃষ্ট ইতি।

অনুবাদ। তুল্যজাতীয় দ্রব্যসমূহ ও গুণসমূহের নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবপ্রযুক্ত অনেকবিধ বিকল্প (নানাপ্রকার ভেদ) দৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। মোহ দোষ নহে, এই পূর্ব্বপক্ষসাধনে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমতহেতু দোষনিমিত্তত্ব। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ঐ হেতুর অপ্রযোজকত্ব সূচনা করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ হেতুর ব্যভিচারিত্ব সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, একই পদার্থ নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক হইতে পারে না বটে, কিন্তু একজাতীয় পদার্থের মধ্যে কেহ নিমিত্ত ও কেহ নৈমিত্তিক হইতে পারে। একজাতীয় দ্রব্য তাহার সজাতীয় দ্রব্যান্তরের নিমিত্ত হইতেছে। একজাতীয় গুণ তাহার সজাতীয় গুণান্তরের নিমিত্ত হইতেছে। এইরূপ দোষত্বরূপে সজাতীয় মোহ, রাগ ও দ্বেষরূপ দোষান্তরের নিমিত্ত হইতে পারে। সুতরাং দোষের নিমিত্ত বলিয়া মোহ দোষ নহে, এই পূর্ব্বপক্ষ সাধন করা যায় না। রাগ ও দ্বেষ, মোহের সজাতীয় দোষ হইলেও, মোহ হইতে ভিন্নপদার্থ, সুতরাং মোহ, রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত হইবার কোন বাধাও নাই॥ ৯॥

দোষত্রৈরাশ্যপ্রকরণ সমাপ্ত॥ ২॥

ভাষ্য। দোষানন্তরং প্রেত্যভাবঃ,—তস্যাসিদ্ধিরাত্মনো নিত্যত্বাৎ, ন খলু নিত্যং কিঞ্চিজ্জায়তে ম্রিয়তে বেতি জন্মমরণয়োর্নিত্যত্বাদাত্মনোঽনুপপত্তিঃ, উভয়ঞ্চ প্রেত্যভাব ইতি। তত্রায়ং সিদ্ধার্থানুবাদঃ।

অনুবাদ। দোষের অনন্তর প্রেত্যভাব (পরীক্ষণীয়)। [পূর্ব্বপক্ষ] আত্মার নিত্যত্ববশতঃ সেই প্রেত্যভাবের সিদ্ধি হয় না, কারণ, নিত্য কোন বস্তু জন্মে না, অথবা মৃত হয় না, অতএব আত্মার নিত্যত্ববশতঃ জন্ম ও মরণের উপপত্তি হয় না, কিন্তু উভয় অর্থাৎ আত্মার জন্ম ও মরণ "প্রেত্যভাব"। তদ্বিষয়ে ইহা অর্থাৎ মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তসূত্র সিদ্ধ অর্থের অনুবাদ।

সূত্র। আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাব-সিদ্ধিঃ ॥১০॥৩৫২॥

অনুবাদ। (উত্তর) আত্মার নিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রেত্যভাবের সিদ্ধি হয়।

ভাষ্য। নিত্যোঽয়মাত্মা প্রৈতি পূর্ব্বশরীরং জহাতি ম্রিয়ত ইতি। প্রেত্য চ পূর্ব্বশরীরং হিত্বা ভবতি জায়তে শরীরান্তরমুপাদত্ত ইতি। তচ্চৈতদুভয়ং "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাব" ইত্যত্রোক্তং, পূর্ব্বশরীরং হিত্বা শরীরান্তরোপাদানং প্রেত্যভাব ইতি। তচ্চৈতন্নিত্যত্বে সম্ভবতীতি। যস্য তু সত্ত্বোৎপাদঃ সত্ত্ব নিরোধঃ প্রেত্যভাবস্তস্য কৃতহানমকৃতাভ্যাগমশ্চ দোষঃ। উচ্ছেদহেতুবাদে ঋষ্যুপদেশাশ্চানর্থকা ইতি।

অনুবাদ। নিত্য এই আত্মা প্রেত হয়, (অর্থাৎ) পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করে—মৃত হয়। এবং মৃত হইয়া (অর্থাৎ) পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া উৎপন্ন হয়, (অর্থাৎ) জন্মে, শরীরান্তর গ্রহণ করে। সেই এই উভয় অর্থাৎ আত্মার পূর্ব্বশরীর ত্যাগরূপ মরণ এবং শরীরান্তরগ্রহণরূপ পুনর্জ্জন্মই "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ"—এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। (ফলিতার্থ)—পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর-গ্রহণ "প্রেত্যভাব"। সেই ইহাই অর্থাৎ আত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ মরণ ও জন্মই (আত্মার) নিত্যত্বপ্রযুক্ত সম্ভব হয়। কিন্তু যাঁহার (মতে) আত্মার উৎপত্তি ও আত্মার বিনাশ "প্রেত্যভাব", তাঁহার (মতে) কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদে" অর্থাৎ মৃত্যুকালে আত্মারই উচ্ছেদ বা বিনাশ হয় এবং শরীরের সহিত আত্মারও উৎপত্তি হয়, এই মতে ঋষিদিগের উপদেশও ব্যর্থ হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি "দোষ"-পরীক্ষার অনন্তর ক্রমানুসারে "প্রেত্যভাবের" পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মার নিত্যত্বপ্রযুক্ত "প্রেত্যভাবের" সিদ্ধি হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার প্রেত্যভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" (১। ১৯)—এই সূত্রের দ্বারা মরণের পরে পুনর্জ্জন্মকেই প্রেত্যভাব বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। মরণের পরে জন্ম, জন্মের পরে মরণ, এইভাবে জন্ম ও মরণই প্রেত্যভাব। কিন্তু নিত্য-পদার্থের জন্ম ও মরণ না থাকায়, আত্মার জন্ম ও মরণরূপ প্রেত্যভাব কোন মতেই সম্ভব নহে। আত্মা অনিত্য হইলে, তাহার প্রেত্যভাব সম্ভব হইতে পারে। তৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বপক্ষব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে,—বৈনাশিক (বৌদ্ধ)-সম্প্রদায়ের মতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সুতরাং তাঁহাদিগের মতেই আত্মার জন্ম ও মরণরূপ প্রেত্যভাব সম্ভব হয়। যদি বল, যাহা মৃত বা বিনষ্ট, তাহার আর উৎপত্তি হইতে পারে না, বৌদ্ধমতেও বিনষ্টের পুনরুৎপত্তি হয় না। এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির অনন্তর বিনাশই "প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। যেমন নিদ্রার অনন্তর মুখব্যাদান করিলেও, "মুখং ব্যাদায় স্বপিতি" অর্থাৎ "মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাইতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ "ভূত্বা প্রায়ণং" অর্থাৎ উৎপত্তির অনন্তর মরণ এই অর্থেই "প্রেত্যভাব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। নিত্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের অভাবে "প্রেত্যভাব" অসম্ভব হওয়ায়, যখন অনিত্য পদার্থেরই "প্রেত্যভাব" স্বীকার করিতে হইবে, তখন "প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই অবশ্যস্বীকার্য্য। মূলকথা, নিত্য আত্মার প্রেত্যভাব" অসম্ভব হওয়ায়, উহা অসিদ্ধ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। মহর্ষি এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মার নিত্যত্বপ্রযুক্তই "প্রেত্যভাবের" সিদ্ধি হয়। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি কাল হইতে একই আত্মার পুনঃ পুনঃ এক শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর শরীর পরিগ্রহই "প্রেত্যভাব"। শরীরের সহিত আত্মার বিনাশ হইলে, সেই আত্মারই পুনর্ব্বার শরীরান্তর পরিগ্রহ সম্ভব না হওয়ায়, "প্রেত্যভাব" হইতে পারে না। আত্মা অনাদি ও অবিনাশী হইলে, সেই আত্মারই পুনর্ব্বার অভিনব শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায়, "প্রেত্য-ভাব" হইতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা আত্মার প্রেত্যভাব ও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, আত্মার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হইলে, অনাদিত্ব ও পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগের পরে অপর শরীরগ্রহণরূপ "প্রেত্যভাব"ই সিদ্ধ হয়। সুতরাং তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপনের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রেত্যভাবও সিদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে এই সূত্রকে "সিদ্ধার্থানুবাদ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির অভিমত প্রেত্যভাবে"র ব্যাখ্যা করিতে "প্রৈতি" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পূর্ব্বশরীরং জহাতি, উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ম্রিয়তে"। অর্থাৎ প্র-পূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর অর্থ মরণ। মরণ বলিতে এখানে পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ। প্র-পূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্" প্রত্যয় হইলে "প্রেত্য"শব্দ সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এখানে ঐ "প্রেত্য" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,"পূর্ব্ব-শরীরং হিত্বা", পরে "ভবতি" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "জায়তে"; উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "শরীরান্তরমুপাদত্তে"। অর্থাৎ "প্রেত্যভাব" শব্দের অন্তর্গত "ভাব" শব্দটি "ভূ" হইতে নিষ্পন্ন। "ভূ" ধাতুর অর্থ এখানে শরীরান্তরগ্রহণরূপ জন্ম। তাহা হইলে

"প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ। আত্মার স্বরূপতঃ বিনাশ ও উৎপত্তি না থাকিলেও, পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগরূপ মরণ ও অপর শরীর গ্রহণরূপ জন্ম হইতে পারে। আত্মার নিত্যত্বপক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ মরণ ও জন্ম সম্ভব হয়। সুতরাং "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" ।১।১।১৯।—এই সূত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ মরণ ও জন্মকেই মহর্ষি "প্রেত্যভাব" বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নিত্য আত্মা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের মতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। তাঁহারা "প্রেত্যভাব" শব্দের অন্তর্গত ধাতুদ্বয়ের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, আত্মার বিনাশ ও উৎপত্তিকেই "প্রেত্যভাব" বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির অভিমত "প্রেত্যভাবে"র ব্যাখ্যা করিয়া শেষে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আত্মার স্বরূপতঃ বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, উহাকেই "প্রেত্যভাব" বলিলে যে আত্মা, পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই আত্মা ফলভোগকাল পর্য্যন্ত না থাকায়, তাহার "কৃতহানি" দোষ হয়। এবং যে আত্মা সেই পূর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা নহে, তাহারই সেই কর্ম্মের ফলভোগ স্বীকার করিতে হইলে, "অকৃতাভ্যাগম" দোষ হয়। স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ অসম্ভব হইলে, সর্ব্বত্রই আত্মার "কৃতহানি" দোষ অনিবার্য্য। এবং পরকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ হইলে, "অকৃতাভ্যাগম" দোষ অনিবার্য্য। (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রভাষ্য ও তৃতীয় খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদে" ঋষিদিগের উপদেশও ব্যর্থ হয়। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-সম্প্রদায়ের এই "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদ" অতি প্রাচীন মত। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ "ব্রহ্মজালসুত্তে"ও এই বাদের উল্লেখ দেখা যায়[১]; "যোগদর্শনে"র ব্যাসভাষ্যেও পৃথগ্‌ভাবে "উচ্ছেদবাদ" ও হেতুবাদে"র উল্লেখ দেখা যায়[২]। মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে না, আত্মার বিনাশ হয়, আত্মার উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশই মৃত্যু, এই মত "উচ্ছেদবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। এবং সকল পদার্থেরই হেতু আছে, নির্হেতুক অর্থাৎ কারণশূন্য কিছুই নাই। সুতরাং আত্মারও অবশ্য হেতু আছে, শরীরের সহিত আত্মারও উৎপত্তি হয়, এই মত "হেতুবাদ"-নামে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার উচ্ছেদ হইলে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আত্মা না থাকিলে, আত্মার কর্ম্মজন্য পারলৌকিক ফলভোগ অসম্ভব, এবং আত্মার হেতু থাকিলে, অর্থাৎ শরীরের সহিত আত্মার উৎপত্তি হইলে, ঐ আত্মা পূর্ব্বে না থাকায়, তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলভোগও অসম্ভব। সুতরাং ঋষিগণ কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মবিশেষের বর্জ্জন করিতে যে সমস্ত উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও নিষ্ফল হয়। সুতরাং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ কোনরূপেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে

১। "সন্তি ভিক্‌খবে একে সমণ ব্রাহ্মণা উচ্ছেদবাদা সতসস উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং পঞ্‌ঞাপেন্তি সত্ত হি বৎথুহি" ইত্যাদি—ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘনিকায়। ১।৩।৯—১০।

২। "তত্র হাতুঃ স্বরূপমুপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতীতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ।"—যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ১৫শ সূত্রভাষ্য।

না। স্বয়ং বুদ্ধদেবও যে, নানাকর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনেক কর্ম্মের বার্ত্তা বলিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে উপপন্ন হইবে? তাঁহার মতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে, তাঁহার ঐ সমস্ত উপদেশ কিরূপে সার্থক হইবে? ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। আত্মার নিত্যত্ব ও "প্রেত্যভাব"-বিষয়ে নানা যুক্তি তৃতীয় অধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা হইতে ৮৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। কথমুৎপত্তিরিতি চেৎ,—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) কিরূপে উৎপত্তি হয়, ইহা যদি বল ?—

সূত্র। ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ ॥১১॥৩৫৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যক্ত হইতে ব্যক্তসমূহের (উৎপত্তি হয়) অর্থাৎ ব্যক্তই ব্যক্তের উপাদানকারণ, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। কেন প্রকারেণ কিং ধর্ম্মকাৎ কারণাদ্ব্যক্তং শরীরাদ্যুৎপদ্যত? ইতি,—ব্যক্তাদ্ভূতসমাখ্যাতাৎ পৃথিব্যাদিতঃ পরমসূক্ষ্মান্নিত্যাদ্ব্যক্তং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপকরণাধারং[১] প্রজ্ঞাতং দ্রব্যমুৎপদ্যতে। ব্যক্তঞ্চ খল্বিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং, তৎসামান্যাৎ কারণমপি ব্যক্তং। কিং সামান্যং? রূপাদিগুণযোগঃ। রূপাদিগুণযুক্তেভ্যঃ পৃথিব্যাদিভ্যো নিত্যেভ্যো রূপাদিগুণযুক্তং শরীরাদ্যুৎপদ্যতে। প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ—দৃষ্টো হি রূপাদিগুণযুক্তেভ্যো মৃৎপ্রভৃতিভ্যস্তথাভূতস্য দ্রব্যস্যোৎপাদঃ, তেন চাদৃষ্টস্যানুমানমিতি। রূপাদীনামন্বয়দর্শনাৎ প্রকৃতিবিকারয়োঃ পৃথিব্যাদীনাং নিত্যানামতীন্দ্রিয়াণাং কারণভাবোঽনুমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) কি প্রকারে কি ধর্ম্মবিশিষ্ট কারণ হইতে ব্যক্ত শরীরাদি উৎপন্ন হয়?—(উত্তর) ভূত নামক অতি সূক্ষ্ম নিত্য পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্তসদৃশ পরমাণু হইতে শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, উপকরণ ও আধাররূপ প্রজ্ঞাত (প্রমাণসিদ্ধ) অব্যক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই কিন্তু ব্যক্ত, সেই ব্যক্তের সাদৃশ্যপ্রযুক্ত (তাহার) কারণও অর্থাৎ মূলকারণ পরমাণুও ব্যক্ত। (প্রশ্ন) সাদৃশ্য কি? (উত্তর) রূপাদিগুণবত্তা। রূপাদিগুণবিশিষ্ট নিত্য

১। এখানে সমাহার দ্বন্দ্বসমাস বুঝিতে হইবে। "শরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপকরণাধারমিতি একবদ্ভাবেন নপুংসকত্বং।"—তাৎপর্য্যটীকা।

পৃথিব্যাদি (পার্থিবাদি পরমাণুসমূহ) হইতে রূপাদিগুণবিশিষ্ট শরীরাদি উৎপন্ন হয়। কারণ, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য আছে। (বিশদার্থ) যেহেতু রূপাদি গুণ-বিশিষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে তথাভূত (রূপাদিবিশিষ্ট) দ্রব্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাই অদৃষ্টের, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অনুমান হয়। প্রকৃতি ও বিকারে রূপাদির অন্বয় দর্শনপ্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় নিত্য পৃথিব্যাদির (পার্থিবাদি পরমাণুসমূহের) কারণত্ব অনুমিত হয়।

টিপ্পনী। "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা করিতে মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে যেরূপে নিত্য আত্মার "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধি বলিয়াছেন, উহা বুঝিতে আত্মার শরীরাদির উৎপত্তি এবং কি প্রকারে কিরূপ কারণ হইতে ঐ উৎপত্তি হয়, ইহা বুঝা আবশ্যক। পরন্তু ভাবকার্য্যের সৃষ্টির মূল কারণ বিষয়ে সুপ্রাচীন কাল হইতে নানা মতভেদ আছে। সুতরাং আত্মার প্রেত্যভাব বুঝিতে এখানে কি প্রকারে কিরূপ কারণ হইতে শরীরাদির উৎপত্তি হয়, এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই মহর্ষি এখানে প্রেত্যভাবের পরীক্ষায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নানুসারে শরীরাদির মূল কারণ বিষয়ে নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়। সূত্রে "উৎপত্তি" শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও, "ব্যক্তাৎ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা "উৎপত্তি" শব্দের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্রার্থ-ব্যাখ্যায় "ব্যক্তানাং" এই পদের পরে "উৎপত্তিঃ" এই পদের অধ্যাহার করিয়াছেন। "ন্যায়সূত্র-বিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য "ব্যক্তাৎ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থই উৎপত্তি, ইহা বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, মহর্ষি গোতমের মতে সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত পদার্থ (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) ব্যক্ত কার্য্যের মূল কারণ নহে, কিন্তু পার্থিবাদি পরমাণু শরীরাদি ব্যক্ত দ্রব্যের মূল কারণ, ইহা এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের নিজ সিদ্ধান্ত "পরমাণুকারণবাদ" বা "আরম্ভবাদ"ই যে সূচিত হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। জয়ন্তভট্ট ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন [১]।

মহর্ষি তাঁহার অভিমত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে অনুমান-প্রমাণ সূচনা করিতে এই সূত্রে হেতু বলিয়াছেন, "প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ"। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, রূপাদি-গুণবিশিষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য হইতে রূপাদি-গুণবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হওয়ায়, মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যে উহার সজাতীয় ঘটাদি দ্রব্যের কারণত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং উহার দ্বারা পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় অতি সূক্ষ্ম নিত্য দ্রব্যই যে, পৃথিব্যাদি জন্যদ্রব্যের মূল কারণ, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। কারণ, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ

১। ব্যক্তাদিতি কপিলাভ্যুপগতত্রিগুণাত্মকাব্যক্তরূপকারণনিষেধেন পরমাণুনাং শরীরাদৌ কার্য্যে কারণত্বমাহ।—ন্যায়মঞ্জরী, ৫০২ পৃষ্ঠা।

স্থূল দ্রব্য উহার অবয়বে আশ্রিত, ইহা উপলব্ধ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ জন্যদ্রব্যের অবয়বই যে উহার উপাদান-কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ সমস্ত জন্যদ্রব্যের অবয়ব যেমন উহার উপাদান-কারণ, তদ্রূপ সেই অবয়বের উপাদান-কারণ তাহার অবয়ব, এইরূপ সেই অবয়বের উপাদান-কারণ তাহার অবয়ব, এইরূপে সেই অবয়বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যে অবয়বের আর বিভাগ বা ভঙ্গ হইতে পারে না, যাহার আর অবয়ব বা অংশ নাই, এমন অতি সূক্ষ্ম অবয়বে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে। পৃথিব্যাদি স্থূল ভূতের অবয়ব-ধারার কুত্রাপি বিশ্রাম স্বীকার না করিয়া, উহাদিগের অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে, সুমেরু পর্ব্বতও সর্ষপের পরিমাণের তুল্যত্বাপত্তি হয়। কারণ, যেমন সুমেরু পর্ব্বতের অবয়বের কোন স্থানে বিশ্রাম না থাকিলে, উহা অনন্ত হয়, তদ্রূপ সর্ষপের অবয়বেরও কোন স্থানে বিশ্রাম না থাকিলে, উহার অবয়বও অনন্ত হওয়ায়, সুমেরু ও সর্ষপকে তুল্যপরিমাণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু সুমেরু ও সর্ষপের অবয়ব ধারার কোন স্থানে বিশ্রাম স্বীকার করিলে, সুমেরুর অবয়বপরম্পরা হইতে সর্ষপের অবয়ব-পরম্পরার সংখ্যার ন্যূনতা সিদ্ধ হওয়ায়, সুমেরু হইতে সর্ষপের ক্ষুদ্রপরিমাণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পৃথিব্যাদি স্থূল ভূতের অবয়ব-ধারার কোন একস্থানে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে। যে অবয়বে উহার বিশ্রাম স্বীকার করা যাইবে, তাহার আর বিভাগ করা যায় না, তাহার আর অবয়ব বা অংশ নাই, সুতরাং তাহার উপাদান-কারণ না থাকায়, তাহাকে নিত্যদ্রব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ঐরূপ নিরবয়ব নিত্যদ্রব্যই "পরমাণু" নামে কথিত হইয়াছে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়—উহাই পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের সর্ব্বশেষ অংশ, এজন্য ভাষ্যকার উহাকে পরমসূক্ষ্ম ভূত বলিয়াছেন। পার্থিবাদি পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে পৃথিব্যাদি জন্যদ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "দ্ব্যণুক"। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা "ত্র্যণুক" এবং "ত্রসরেণু" নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম—নানাবিধ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। ইহারই নাম "পরমাণুকারণবাদ", এবং ইহারই নাম "আরম্ভবাদ"।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ভাষ্যকার মহর্ষির "ব্যক্তাৎ" এই পদের অন্তর্গত "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়া সূত্র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয় বিষয়, এবং ঐ শরীরাদির উপকরণ (সাধন) ও আধার যে সমস্ত জন্যদ্রব্য, "প্রজ্ঞাত" অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, সেই সমস্ত জন্যদ্রব্য "ব্যক্ত" হইতে, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পরমসূক্ষ্ম নিত্যভূত (পার্থিবাদি পরমাণু) হইতে উৎপন্ন হয়। পার্থিবাদি পরমাণুসমূহই শরীরাদি সমস্ত জন্য-দ্রব্যের মূল কারণ। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকেই "ব্যক্ত" বলা যায়, সূত্রোক্ত "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরমাণু কিরূপে বুঝা যায়? এইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এখানে "ব্যক্তে"র সাদৃশ্যবশতঃ অতীন্দ্রিয় পার্থিবাদি পরমাণু ও "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। রূপাদিগুণবত্তাই সেই সাদৃশ্য। ঘটাদি ব্যক্তদ্রব্যে যেমন রূপাদি গুণ আছে,

তদ্রূপ উহার মূলকারণ পরমাণুতেও রূপাদি গুণ আছে। কারণের বিশেষ গুণজন্যই কার্য্যদ্রব্যে তাহার সজাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। মূলকারণ পরমাণুতে রূপাদি গুণ না থাকিলে, তাহার কার্য্য "দ্ব্যণুকে" রূপাদি জন্মিতে পারে না। সুতরাং "ত্র্যণুক," প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যেও রূপাদি গুণবত্তা অসম্ভব হয়। সুতরাং পার্থিবাদি পরমাণুসমূহেও রূপাদি গুণবত্তা স্বীকৃত হওয়ায়, ঐ পরমাণুসমূহ ব্যক্ত না হইলেও, ব্যক্তসদৃশ, তাই মহর্ষি "ব্যক্তাৎ" এই পদে "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা ঘটাদি ব্যক্তদ্রব্যের সদৃশ অতীন্দ্রিয় পরমাণুকে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি এখানে ব্যক্তসদৃশ বা ব্যক্তজাতীয় অর্থে "ব্যক্ত" শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঐরূপ গৌণপ্রয়োগ করিয়া রূপাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই যে, তাদৃশ দ্রব্যের উপাদানকারণ হয়, ইহা সূচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পরমাণুতে শরীরাদি ব্যক্তদ্রব্যের সাদৃশ্য (রূপাদিগুণবত্তা) বলিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রূপাদিগুণবিশিষ্ট পৃথিব্যাদি নিত্যদ্রব্যসমূহ (পার্থিবাদিপরমাণুসমূহ) হইতে রূপাদিগুণবিশিষ্ট শরীরাদি উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এখানে "ব্যক্তাৎ" এই পদে "ব্যক্ত" শব্দের ফলিতার্থ বুঝা যায়, রূপাদিগুণবিশিষ্ট নিত্যদ্রব্য, অর্থাৎ পার্থিবাদি পরমাণু। উহা ব্যক্ত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) না হইলেও, তৎসদৃশ বলিয়া "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এখানে সূত্রার্থে ভ্রম-নিবারণের জন্য উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, কেবল রূপাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ হইতেই যে, তাদৃশ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা সূত্রার্থ নহে। কারণ, রূপাদিশূন্য সংযোগও দ্রব্যের কারণ। কিন্তু ব্যক্ত শরীরাদি-দ্রব্যের উৎপত্তিতে যে সমস্ত কারণ (সামগ্রী) আবশ্যক, তন্মধ্যে রূপাদিগুণবিশিষ্ট পরমাণুই মূলকারণ, ইহাই সূত্রকারের তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় আহ্নিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণে "পরমাণু-কারণবাদে"র আলোচনা দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

সূত্র। ন ঘটাদ্ঘটানিষ্পত্তেঃ ॥১২॥৩৫৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ ব্যক্তদ্রব্য ব্যক্তদ্রব্যের কারণ নহে। কারণ, ঘট হইতে ঘটের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ইদমপি প্রত্যক্ষং, ন খলু ব্যক্তাদ্ঘটাদ্ব্যক্তো ঘট উৎপদ্যমানো দৃশ্যত ইতি। ব্যক্তাদ্ব্যক্তস্যানুৎপত্তিদর্শনান্ন ব্যক্তং কারণমিতি।

অনুবাদ। ব্যক্ত ঘট হইতে ব্যক্ত ঘট উৎপদ্যমান দৃষ্ট হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষ। ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের অনুৎপত্তির দর্শনবশতঃ ব্যক্ত কারণ নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা তাঁহার অভিমত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ঘট হইতে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় না, তখন ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না। যদি ব্যক্ত দ্রব্য হইতে ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ঘট হইতে ঘটের উৎপত্তি হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্য হইতে ঘটাদি ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ

বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যক্ত ব্যক্তের কারণ—ইহা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ঘটনামক ব্যক্ত দ্রব্য হইতে ঘটনামক ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাও ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং ব্যক্ত (ঘট) হইতে ব্যক্তের (ঘটের) অনুৎপত্তির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যক্ত ব্যক্তের কারণ নহে, ইহা বলিতে পারি। ফলকথা, ঘট হইতে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় না, তখন ব্যক্তের কারণ ব্যক্ত, এইরূপ কার্য্যকারণভাবে ব্যভিচারবশতঃ ব্যক্ত ব্যক্তের কারণ নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ ॥১২॥

সূত্র। ব্যক্তাদ্‌ঘটনিষ্পত্তেরপ্রতিষেধঃ ॥১৩॥৩৫৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যক্ত (মৃত্তিকা) হইতে ঘটের উৎপত্তি হওয়ায়, প্রতিষেধ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত কারণত্বের প্রতিষেধ) নাই।

ভাষ্য। ন ব্রুমঃ সর্ব্বং সর্ব্বস্য কারণমিতি, কিন্তু যদুৎপদ্যতে ব্যক্তং দ্রব্যং তত্তথাভূতাদেবোৎপদ্যত ইতি। ব্যক্তঞ্চ তন্মৃদ্দ্রব্যং কপাল-সংজ্ঞকং, যতো ঘট উৎপদ্যতে। ন চৈতন্নিহ্নুবানঃ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং লব্ধু-মর্হতীতি। তদেতত্তত্ত্বং।

অনুবাদ। সমস্ত পদার্থ সমস্ত পদার্থের কারণ, ইহা আমরা বলি না, কিন্তু যে ব্যক্তদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা তথাভূত অর্থাৎ ব্যক্ত দ্রব্য হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহাই আমরা বলি। যাহা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, কপাল নামক সেই মৃত্তিকারূপ দ্রব্য, ব্যক্তই। ইহার অপলাপকারী অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্যকারণভাবকেও স্বীকার করেন না, তিনি কোন বিষয়ে অভ্যনুজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। সেই ইহা অর্থাৎ পার্থিবাদি পরমাণু হইতে শরীরাদি ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই তত্ত্ব।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত ভ্রান্তিমূলক পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ব্যক্ত দ্রব্যে ব্যক্তদ্রব্যের কারণত্বের প্রতিষেধ (অভাব) নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-রূপ কার্য্যকারণভাবে ব্যভিচার না থাকায়, ব্যক্তদ্রব্যে ব্যক্তদ্রব্যের কারণত্বই সিদ্ধ আছে। অবশ্য ব্যক্ত ঘট হইতে ব্যক্ত ঘটের উৎপত্তি হয় না, ইহা সত্য, কিন্তু আমরা ত সমস্ত ব্যক্তদ্রব্য হইতেই সমস্ত ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা বলি নাই। যে ব্যক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যক্ত দ্রব্য হইতেই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ রূপাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই ঐরূপ দ্রব্যের উপাদান-কারণ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। কপাল নামক মৃত্তিকারূপ যে দ্রব্য হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, ঐ দ্রব্য ব্যক্তই ; সুতরাং ব্যক্তদ্রব্যই ব্যক্ত দ্রব্যের উপাদানকারণ, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার নাই। কপাল নামক মৃত্তিকাবিশেষ হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, এবং তন্তু প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্য হইতে বস্ত্রাদির উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যিনি এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্য

কারণভাবও স্বীকার করেন না, তিনি কোন বিষয়েই অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। অর্থাৎ ঐরূপ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে, তাঁহার কোন কথাই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সার্ব্বজনীন অনুভবের অপলাপ করিলে, তাঁহার বিচারে অধিকারই থাকে না। সুতরাং কপাল ও তন্তু প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্য যে, ঘট ও বস্ত্র প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহা সকলেরই অবশ্যস্বীকার্য্য। তাহা হইলে রূপাদিগুণবিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় পার্থিবাদি পরমাণুই যে, তথাবিধ ব্যক্ত দ্রব্যের মূলকারণ অর্থাৎ পরমাণু-হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত জন্যদ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যস্বীকার্য্য। মহর্ষি গোতমের মতে ঐ সিদ্ধান্তই তত্ত্ব॥১৩॥

প্রেত্যভাবপরীক্ষাপ্রকরণসমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। অতঃপরং প্রাবাদুকানাং দৃষ্টয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে—

অনুবাদ। অতঃপর (মহর্ষির নিজ মত প্রদর্শনের অনন্তর) "প্রাবাদুক"গণের (বিভিন্ন বিরুদ্ধমতবাদী দার্শনিকগণের) "দৃষ্টি" অর্থাৎ নানাবিধ দর্শন বা মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

সূত্র। অভাবাদ্ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ ॥১৪॥৩৫৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অভাব হইতেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়। কারণ, (বীজাদির) উপমর্দ্দন (বিনাশ) না করিয়া (অঙ্কুরাদির) প্রাদুর্ভাব হয় না।

ভাষ্য। **অসতঃ সদুৎপদ্যতে** ইত্যয়ং পক্ষঃ, কস্মাৎ? **উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ**—উপমৃদ্য বীজমঙ্কুর উৎপদ্যতে নানুপমৃদ্য, ন চেদ্বীজোপমর্দ্দোহঙ্কুরকারণং, অনুপমর্দ্দেহপি বীজস্যাঙ্কুরোৎপত্তিঃ স্যাদিতি।

অনুবাদ। অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতেই সৎ (ভাবপদার্থ) উৎপন্ন হয়, ইহা পক্ষ অর্থাৎ ইহাই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু উপমর্দ্দন করিয়াই প্রাদুর্ভাব হয়। বিশদার্থ এই যে, বীজকে উপমর্দ্দন (বিনাশ) করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, উপমর্দ্দন না করিয়া, উৎপন্ন হয় না। যদি বীজের বিনাশ অঙ্কুরের কারণ না হয়, তাহা হইলে বীজের বিনাশ না হইলেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হউক?

টিপ্পনী। মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষাপ্রসঙ্গে "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা শরীরাদির মূল কারণ সূচনা করিয়া, তাঁহার মতে পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুই জন্যদ্রব্যের মূল কারণ, এই সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বসূত্রভাষ্যের শেষে "তদেতত্তত্ত্বং" এই কথা বলিয়া মহর্ষি গোতমের মতে উহাই যে, তত্ত্ব, ইহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এখন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্যই,এখানে কতিপয় মতান্তরের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন ব্যতীত নিজ মতের প্রতিষ্ঠা হয় না, এবং প্রকৃত তত্ত্বের পরীক্ষা করিতে হইলে, নানা মতের সমালোচনা করিতেই হইবে। তাই মহর্ষি এখানে অন্যান্য মতেরও প্রদর্শনপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ সকল মতকে 'প্রাবাদুক" গণের "দৃষ্টি" বলিয়াছেন। যাঁহারা নানাবিরুদ্ধ মত বলিয়াছেন, যাঁহাদিগের মত কেবল স্বসম্প্রদায়মাত্রসিদ্ধ, অন্য সম্প্রদায়ের অসম্মত, তাঁহারা প্রাচীনকালে "প্রাবাদুক' নামে কথিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত মত "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারাও কথিত হইত। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার সাংখ্যদর্শনতাৎপর্য্যেও "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারা যে, সাংখ্যশাস্ত্র ও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারে, ইহা সেখানে বলিয়াছি। এসম্বন্ধে অন্যান্য কথা এই অধ্যায়ের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়," অর্থাৎ অভাবই জগতের উপাদান-কারণ, এই মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ ও হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করতঃ পূর্ব্বপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "অভাব হইতে ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয়"—ইহাই পক্ষ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত। কারণ, "উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভাব হয়[১]," ভূগর্ভে বীজের উপমর্দ্দন অর্থাৎ বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং বীজের বিনাশ অঙ্কুরের কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। বীজের বিনাশরূপ

১। সূত্রে হেতুবাক্য বলা হইয়াছে, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"। এই বাক্যের প্রথমোক্ত "নঞ্" শব্দের সহিত শেষোক্ত "প্রাদুর্ভাব" শব্দের যোগই এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত। সুতরাং ঐ বাক্যের দ্বারা উপমর্দ্দন না করিয়া প্রাদুর্ভাবের অভাবই বুঝা যায়। তাহা হইলে উপমর্দ্দন করিয়া প্রাদুর্ভাব, ইহাই ঐ বাক্যের ফলিতার্থ হয়। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থ গ্রহণ করিয়াই হেতুবাক্য বলিয়াছেন, "উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"। এই সূত্রে দূরস্থ "নঞ্" শব্দার্থ অভাবের সহিত শেষোক্ত "প্রাদুর্ভাব" পদার্থের অন্বয়বোধ হইবে। বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে স্থলবিশেষে ঐরূপ অন্বয় বোধও হয়, ইহা নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিও বলিয়াছেন। "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" নামক গ্রন্থের শেষভাগে রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি সূত্রং। অনুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাভাবাদিতদর্থঃ"। "পদার্থতত্ত্বনিরূপণের" দ্বিতীয় টীকাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌম পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থনপূর্ব্বক মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত "নামূর্ত্তস্যেতরোৎপত্তেঃ" এই সূত্রবাক্যেও যে দূরস্থ "নঞ্" শব্দের সহিত শেষোক্ত উৎপত্তি" শব্দের যোগই মহর্ষির অভিমত, ইহাও তিনি সেই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "দ্বিতীয়া ব্যুৎপত্তিবাদে" মহানৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও পূর্ব্বোক্ত উভয় বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ যে হেতুত্ব, উহার বিশেষণভাবে এবং যথাক্রমে "উৎপত্তি" ও "প্রাদুর্ভাবে"র বিশেষ্যভাবে "নঞ্" শব্দার্থ অভাবের অন্বয়বোধ হয়, ইহা লিখিয়াছেন। যথা, 'নামূর্ত্তস্যেতরোৎপত্তেঃ' 'নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবা'দিত্যাদৌ নঞর্থমাত্রস্য পঞ্চম্যর্থহেতুতায়াং বিশেষণত্বেন প্রকৃত্যর্থস্য চ বিশেষ্যত্বেনান্বয়াৎ।"—ব্যুৎপত্তিবাদ।

অভাবকে অঙ্কুরের কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে, বীজবিনাশের পূর্ব্বেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা এই যে, বীজ বিনষ্ট হইলেই যখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তখন বীজের অভাবকে অঙ্কুরের উপাদান-কারণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বীজ বিনষ্ট হইলে, তখন ঐ বীজের কোনরূপ সত্তা থাকে না, উহা অভাব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সেই অভাবই তখন অঙ্কুরের উপাদান হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপ বস্ত্রনির্ম্মাণ করিতে যে সমস্ত তন্তু গ্রহণ করা হয়, তাহাও ঐ বস্ত্রের উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট হয়। সেই পূর্ব্ব তন্তুর বিনাশরূপ অভাব হইতেই বস্ত্রের উৎপত্তি হয়। সেইস্থলে পূর্ব্ব তন্তুর বিনাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহা সিদ্ধ হইবে। কারণ, অঙ্কুর দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই ভাবমাত্রের উপাদান অভাব, ইহা অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়[১]। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"—এই হেতুবাক্য এখানে উপলক্ষণ। উহার দ্বারা এখানে "অসত উৎ-পাদাৎ", এইরূপ হেতুবাক্যও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা অসৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহার অভাব থাকে, তাহারই উৎপত্তি হওয়ায়, ঐ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়, ঐ অভাবই ভাবের উপাদান, ইহাও পূর্ব্বোক্ত মতবাদিগণের কথা বুঝিতে হইবে। শেষোক্ত যুক্তি অনুসারে কার্য্যের প্রাগভাবই সেই কার্য্যের উপাদান, ইহাই বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতবাদীরা যে কার্য্যের প্রাগভাবকে ও কার্য্যের উপাদান বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বোক্ত মতের বর্ণন করিতে ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি পূর্ব্বোক্ত মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া বেদান্তদর্শনের "নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ" ইত্যাদি—(২।২।২৬।২৭) দুইটি সূত্রের দ্বারা শারীরক-ভাষ্যে এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অভাব নিঃস্বরূপ, শশশৃঙ্গ প্রভৃতিও অভাব অর্থাৎ অবস্তু। নিঃস্বরূপ অভাব বা অবস্তু ভাব-পদার্থের উপাদান হইলে, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি হইতেও বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, অভাবের কোন বিশেষ নাই। অভাবের বিশেষ স্বীকার করিলে, উহাকে ভাবপদার্থই স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু অভাবই ভাবের উপাদান হইলে, ঐ অভাব হইতে উৎপন্ন ভাবমাত্রই অভাবান্বিত বলিয়াই প্রতীত হইত। কিন্তু কার্য্যদ্রব্য ঘট-পটাদি অভাবান্বিত বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ নানা যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, ইহাও বলিয়াছেন যে, বৈনাশিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় জগতের মূল কারণ বিষয়ে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াও শেষে আবার অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া স্বীকৃত পূর্ব্বসিদ্ধান্তের অপলাপ করিয়াছেন। কিন্তু নানাবিধ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়বিশেষ অভাবকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিলে, তাঁহাদিগের নানা মতের পরস্পর বিরোধের সমাধান হইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অনেক দার্শনিক গ্রন্থ

১। পটাদিকং অভাবোপাদানকং ভাবকার্য্যত্বাৎ অঙ্কুরাদিবৎ।

বহুদিন হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের সমস্ত মত ও যুক্তি-বিচারাদি সম্পূর্ণরূপে এখন আর জানিবার উপায় নাই। সে যাহা হউক, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এইরূপ হেতুবাক্যের দ্বারা কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মতে ঐ অভাব শশশৃঙ্গাদির ন্যায় নির্ব্বিশেষ অবস্তু, ইহা আমরা শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। শঙ্করাচার্য্য কল্পনা করিয়া উহা বৌদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত উপনিষদেই পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত আছে[1]। অনাদিকাল হইতেই যে ঐরূপ মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা "একে আহুঃ" এইরূপ বাক্যের দ্বারা উপনিষদেই স্পষ্ট বর্ণিত আছে। ঐ মত পরবর্ত্তী বৌদ্ধবিশেষেরই উদ্ভাবিত নহে। মহর্ষি গোতম এখানে এই মতের খণ্ডন করিয়া, উপনিষদে উহা যে, পূর্ব্বপক্ষরূপেই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইয়াছেন। বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপেও নানা বিরুদ্ধ মতের বর্ণন আছে। দর্শনকার মহর্ষিগণ অতিদুর্ব্বোধ বেদার্থে ভ্রান্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া বিচার দ্বারা সেই সমস্ত পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাসপূর্ব্বক বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক তন্মধ্যে অনেক পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বৈদিক-সম্প্রদায়ের নিকটে পূর্ব্বপক্ষ-বোধক অনেক শ্রুতি ও নিজ মতের প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মূলকথা, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই পূর্ব্বোক্ত মতের মূল। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন, "এবং কিল শ্রূয়তে—অসদেবেদমগ্র আসীদিতি"। এবং পরে এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনকালে তিনিও লিখিয়াছেন—"শ্রুতিস্তু পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়া" ইত্যাদি। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে ॥১৪॥

ভাষ্য। অত্রাভিধীয়তে—

অনুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষে (উত্তর) কথিত হইতেছে—

সূত্র। ব্যাঘাতাদপ্রয়োগঃ ॥১৫॥৩৫৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাঘাতবশতঃ প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ "উপমর্দ্দন করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়"—এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না।

ভাষ্য। উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাদিত্যযুক্তঃ প্রয়োগো ব্যাঘাতাৎ। যদুপ-

---

১। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।—ছান্দোগ্য ।৬।২।১।
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত।—তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী।৭।১।

মৃদ্নাতি ন তদুপমৃদ্য প্রাদুর্ভবিতুমর্হতি, বিদ্যমানত্বাৎ। যচ্চ প্রাদুর্ভবতি ন তেনাপ্রাদুর্ভূতেনাবিদ্যমানেনোপমর্দ্দ ইতি।

অনুবাদ। ব্যাঘাতবশতঃ "উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এই প্রয়োগ অযুক্ত। (ব্যাঘাত বুঝাইতেছেন) যাহা উপমর্দ্দন করে, তাহা (উপমর্দ্দনের পূর্ব্বেই) বিদ্যমান থাকায়, উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। এবং যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, (পূর্ব্বে) অপ্রাদুর্ভূত (সুতরাং) অবিদ্যমান সেই বস্তু কর্ত্তৃক (কাহারও) উপমর্দ্দন হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়," এই সাধ্য সাধনের জন্য "উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এই যে হেতুবাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, ব্যাঘাতবশতঃ ঐরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না। অর্থাৎ ঐ হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায়, উহার দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি অসম্ভব। সূত্রকারোক্ত "ব্যাঘাত" বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে বস্তু উপমর্দ্দনের কর্ত্তা, তাহা উপমর্দ্দনের পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং তাহা উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। এবং যে বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে না থাকায়, পূর্ব্বে কাহারও উপমর্দ্দন করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, উপমর্দ্দন বলিতে বিনাশ। প্রাদুর্ভাব বলিতে উৎপত্তি। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে বীজের বিনাশ করিয়া উহার পরে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহার মতে বীজবিনাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা নাই। কারণ, তখন অঙ্কুর জন্মেই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার মতে বীজকে বিনষ্ট করিয়া যে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে, তাহা বীজবিনাশের পূর্ব্বে না থাকায়, বীজ বিনাশ করিতে পারে না। যাহা বীজ-বিনাশের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, সুতরাং যাহা বীজবিনাশের পূর্ব্বে "অবিদ্যমান, তাহা বীজবিনাশক হইতে পারে না। আর যদি বীজবিনাশের জন্য তৎপূর্ব্বেই অঙ্কুরের সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া, অর্থাৎ বীজবিনাশের অনন্তর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, যাহা বীজবিনাশের পূর্ব্বেই বিদ্যমান আছে, তাহা বীজবিনাশের পরে উৎপন্ন হইবে কিরূপে? পূর্ব্বেই যাহা বিদ্যমান থাকে, পরে তাহারই উৎপত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, অঙ্কুরে বীজবিনাশকত্ব এবং বীজ-বিনাশের পরে প্রাদুর্ভাব, ইহা ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। বিনাশকত্ব ও বিনাশের পরে প্রাদুর্ভাব, এই উভয় কোন এক পদার্থে থাকিতে পারে না। ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধই সূত্রোক্ত "ব্যাঘাত" শব্দের অর্থ ॥১৫॥

সূত্র। নাতীতানাগতয়োঃ কারকশব্দপ্রয়োগাৎ ॥
॥১৬॥৩৫৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থে কারকশব্দের (কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকবোধক শব্দের) প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য। অতীতে চানাগতে চাবিদ্যমানে কারকশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। পুত্রো জনিষ্যতে, জনিষ্যমাণং পুত্রমভিনন্দতি, পুত্রস্য জনিষ্যমাণস্য নাম করোতি, অভূৎ কুম্ভঃ, ভিন্নং কুম্ভমনুশোচতি, ভিন্নস্য কুম্ভস্য কপালানি, অজাতাঃ পুত্রাঃ পিতরং তাপয়ন্তীতি বহুলং ভাক্তাঃ প্রয়োগা দৃশ্যন্তে। কা পুনরিয়ং ভক্তিঃ? আনন্তর্য্যং ভক্তিঃ। আনন্তর্য্যসামর্থ্যাদুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবার্থঃ, প্রাদুর্ভবিষ্যন্নঙ্কুর উপমৃদ্নাতীতি ভাক্তং কর্তৃত্বমিতি।

অনুবাদ। অবিদ্যমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ পদার্থেও কারক শব্দগুলি প্রযুক্ত হয়। যথা —"পুত্র উৎপন্ন হইবে", "ভাবী পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছে", "ভাবী পুত্রের নাম করিতেছে",—"কুম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল", "ভগ্ন কুম্ভকে অনুশোচনা করিতেছে",—"ভগ্ন কুম্ভের কপাল", "অনুৎপন্ন পুত্রগণ পিতাকে দুঃখিত করিতেছে" ইত্যাদি ভাক্তপ্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। (প্রশ্ন) এই ভক্তি কি? অর্থাৎ "বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়"—এইরূপ ভাক্ত প্রয়োগের মূল "ভক্তি" এখানে কি? (উত্তর) আনন্তর্য্য ভক্তি, অর্থাৎ বীজবিনাশ ও অঙ্কুরোৎপত্তির যে আনন্তর্য্য, তাহাই এখানে ঐরূপ প্রয়োগের মূলীভূত ভক্তি। আনন্তর্য্য-সামর্থ্যপ্রযুক্ত উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভাব রূপ অর্থ, অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগের তাৎপর্য্যার্থ (বুঝা যায়)। "ভাবী অঙ্কুর (বীজকে) উপমর্দ্দন করে" এই প্রয়োগে (অঙ্কুরের) ভাক্ত কর্তৃত্ব।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, উহার খণ্ডন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে,বীজের উপমর্দ্দনের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা না থাকিলেও, ভাবী অঙ্কুর বীজের উপমর্দ্দনের কর্তৃকারক হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। কারণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থেও কর্তৃকর্ম্মাদি কারকবোধক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতীত পদার্থে কারকবোধক শব্দের প্রয়োগ, যথা—"কুম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল", "ভগ্ন কুম্ভকে অনুশোচনা করিতেছে", "ভগ্ন কুম্ভের কপাল"। পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগদ্বয়ে যথাক্রমে অতীত কুম্ভ ও উৎপত্তিক্রিয়ার কর্তৃকারক এবং অনুশোচনা ক্রিয়ার কর্ম্মকারক হইয়াছে। "ভগ্ন কুম্ভের কপাল" এই প্রয়োগে যদিও "কুম্ভ" শব্দ কোন কারকবোধক নহে, তথাপি "কুম্ভস্য" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা

জনকত্ব সম্বন্ধের বোধ হওয়ায়, কপালে কুম্ভের জনন বা উৎপাদন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝা যায়। সুতরাং কুম্ভের সহিতও ঐ জননক্রিয়ার সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, ঐ স্থলে "কুম্ভ" শব্দও পরম্পরায় কারকবোধক শব্দ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এই ভাবের কথাই লিখিয়াছেন। ভবিষ্যৎ পদার্থে কারকবোধক শব্দের প্রয়োগ যথা—"পুত্র উৎপন্ন হইবে", "ভাবী পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছে", "ভাবী পুত্রের নাম করিতেছে", "অনুৎপন্ন পুত্রগণ পিতাকে দুঃখিত করিতেছে"। যদিও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকায়, ক্রিয়ার নিমিত্ত হইতে পারে না, সুতরাং মুখ্য কারক হয় না, তথাপি অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ভাক্ত কর্তৃত্বাদি গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত-ভাক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে; ঐরূপ ভাক্ত প্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগের ন্যায় "ভাবী অঙ্কুর বীজকে উপমর্দ্দন করে" এইরূপও ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে। "ভক্তি"-প্রযুক্ত ভ্রম জ্ঞানকে যেমন ভাক্ত প্রত্যয় বলা হয়, তদ্রূপ "ভক্তি"-প্রযুক্ত প্রয়োগকে ভাক্ত প্রয়োগ বলা যায়। যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত যে সাদৃশ্য, তাহাই ভাক্ত প্রত্যয়ের মূলীভূত "ভক্তি"। ঐ সাদৃশ্য উপমান এবং উপমেয়, এই উভয় পদার্থেই থাকে, উহা উভয়ের সমান ধর্ম্ম, এজন্য "উভয়েন ভজ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাচীনগণ উহাকে 'ভক্তি" বলিয়াছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি" কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এখানে আনন্তর্য্যই "ভক্তি"। তাৎপর্য্য এই যে, বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুরের উৎপত্তি হওয়ায়, অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের যে আনন্তর্য্য আছে, উহাই এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি"। ঐ আনন্তর্য্যরূপ "ভক্তি"র সামর্থ্যবশতঃ বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এইরূপ তাৎপর্য্যেই "বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে। বীজবিনাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা না থাকায়, ঐ প্রয়োগে অঙ্কুরে বীজবিনাশের মুখ্য কর্তৃত্ব নাই। উহাকে বলে ভাক্ত কর্তৃত্ব। ফলকথা, বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগের তাৎপর্য্যার্থ। ঐ আনন্তর্য্য-বশতঃই পূর্ব্বোক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ আনন্তর্য্যই পূর্ব্বোক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি"। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায় যে, এখানে বিনাশ্য বীজ, ও বিনাশক অঙ্কুর—এই উভয়েরও যে আনন্তর্য্য (অব্যবহিতত্ব) আছে, তাহা ঐ উভয়ের সমান ধর্ম্ম হওয়ায়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি"। ঐ সামান্য ধর্ম্ম উভয়াশ্রিত বলিয়া উহাকে "ভক্তি" বলা যায়॥১৬॥

সূত্র। ন বিনষ্টেভ্যোঽনিষ্পত্তিঃ ॥১৭॥৩৫৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগ হইতে পারিলেও

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, বিনষ্ট (বীজাদি) হইতে (অঙ্কুরাদির) উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ন বিনষ্টাদ্বীজাদঙ্কুর উৎপদ্যত ইতি তস্মান্নাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি।

অনুবাদ। বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, এইমত খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা মূল যুক্তি বলিয়াছেন যে, বিনষ্ট বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হইতে পারে না এবং বীজাদির বিনাশ হইতেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। সূত্রে চরমপক্ষে "বিনষ্ট" শব্দের দ্বারা বিনাশ অর্থ মহর্ষির বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, বীজবিনাশের অনন্তর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এইরূপ তাৎপর্য্যে "বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়"—এইরূপ ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে, ঐরূপ ভাক্ত প্রয়োগের নিষেধ করি না। কিন্তু বিনষ্ট বীজ অথবা বীজের বিনাশ অঙ্কুরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য। কারণ, যাহা বিনষ্ট, কার্য্যের পূর্ব্বে তাহার সত্তা না থাকায়, তাহা কোন কার্য্যের কারণই হইতে পারে না। যদি বল, বীজের বিনাশরূপ অভাবই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, ইহাই আমার মত, ইহাই আমি বলিয়াছি। কিন্তু তাহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, বীজের বিনাশরূপ অভাবকে অবস্তু বলিলে, উহা কোন বস্তুর উপাদান-কারণ হইতে পারে না। জগতের মূল কারণ অসৎ বা অবস্তু, কিন্তু জগৎ সৎ বা বাস্তব পদার্থ, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। কারণ, সজাতীয় পদার্থই সজাতীয় পদার্থের উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। যাহা অভাব বা অবস্তু, তাহা উপাদাম-কারণ হইলে, তাহাতে রূপ-রসাদি গুণ না থাকায়, অঙ্কুরাদি কার্য্যে রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তিও হইতে পারে না। পরন্তু, ঐরূপ অভাবের কোন বিশেষ না থাকায়, শালিবীজের বিনাশরূপ অভাব হইতে যবের অঙ্কুরও উৎপন্ন হইতে পারে। কারণের ভেদ না থাকিলে, কার্য্যের ভেদ হইতে পারে না। অবস্তু অভাবকে বস্তুর উপাদানকারণ বলিলে, ঐ কারণের ভেদ না থাকায়, উহার শক্তিভেদও থাকিতে পারে না। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। বীজের বিনাশরূপ অভাবকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, উহাও অঙ্কুরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। কারণ, দ্রব্যপদার্থই উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। রূপ-রসাদি-গুণশূন্য অভাবপদার্থ কোন দ্রব্যের উপাদান হইলে, ঐ দ্রব্যে রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তিও হইতে পারে না ; সুতরাং অভাবপদার্থকে উপাদান-কারণ বলা যায় না। বীজের

বিনাশরূপ অভাবকে অঙ্কুরের নিমিত্তকারণ বলিলে, তাহা স্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥১৭॥

সূত্র। ক্রমনির্দ্দেশাদপ্রতিষেধঃ ॥১৮॥৩৬০॥

অনুবাদ। ক্রমের নির্দ্দেশবশতঃ, অর্থাৎ প্রথমে বীজের বিনাশ, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মকে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করায়, (আমাদিগের মতেও ঐ ক্রমের) প্রতিষেধ নাই, অর্থাৎ উহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু ঐ হেতু অভাবই ভাবের উপাদানকারণ, এই সিদ্ধান্তের সাধক হয় না।

ভাষ্য। উপমর্দ্দপ্রাদুর্ভাবয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মঃ ক্রমঃ,' স খল্বভাবাদ্ভাবোৎপত্তের্হেতু নির্দ্দিশ্যতে, স চ ন প্রতিষিধ্যত ইতি। ব্যাহতব্যূহানামবয়বানাং পূর্ব্বব্যূহনিবৃত্তৌ ব্যূহান্তরাদ্দ্রব্যনিষ্পত্তির্নাভাবাৎ। বীজাবয়বাঃ কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ প্রাদুর্ভূতক্রিয়াঃ পূর্ব্বব্যূহং জহতি, ব্যূহান্তরঞ্চাপদ্যন্তে, ব্যূহান্তরাদঙ্কুর উৎপদ্যতে। দৃশ্যন্তে খলু অবয়বাস্তৎসংযোগাশ্চাঙ্কুরোৎপত্তিহেতবঃ। ন চানিবৃত্তে পূর্ব্বব্যূহে বীজাবয়বানাং শক্যং ব্যূহান্তরেণ ভবিতুমিত্যুপমর্দ্দপ্রাদুর্ভাবয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মঃ ক্রমঃ, তস্মান্নাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি। ন চান্যদ্বীজাবয়বেভ্যোঽঙ্কুরোৎপত্তিকারণমিত্যুপপদ্যতে বীজোপাদাননিয়ম ইতি।

অনুবাদ। উপমর্দ্দ ও প্রাদুর্ভাবের অর্থাৎ বীজাদির বিনাশ ও অঙ্কুরাদির উৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়ম "ক্রম", সেই "ক্রম"ই অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট (কথিত) হইয়াছে, কিন্তু সেই "ক্রম" প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ "ক্রম" আমরাও স্বীকার করি। (ভাষ্যকার মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছেন)—"ব্যাহতব্যূহ" অর্থাৎ যাহাদিগের পূর্ব্ব আকৃতি বিনষ্ট হইয়াছে, এমন অবয়বসমূহের পূর্ব্ব আকৃতির বিনাশপ্রযুক্ত অন্য আকৃতি হইতে দ্রব্যের (অঙ্কুরাদির) উৎপত্তি হয়, অভাব হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, বীজের অবয়বসমূহ কোন কারণজন্য উৎপন্নক্রিয় হইয়া পূর্ব্ব আকৃতি পরিত্যাগ করে এবং অন্য আকৃতি প্রাপ্ত হয়, অন্য আকৃতি হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। যেহেতু অবয়বসমূহ এবং তাহার সংযোগসমূহ অর্থাৎ বীজের সমস্ত

অবয়ব এবং উহাদিগের পরস্পর সংযোগরূপ অভিনব ব্যূহ বা আকৃতিসমূহ অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু দৃষ্ট হয়। কিন্তু বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্ব আকৃতি বিনষ্ট না হইলে, অন্য আকৃতি জন্মিতে পারে না, এজন্য উপমর্দ্দ ও প্রাদুর্ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়মরূপ "ক্রম" আছে, অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু বীজের অবয়বসমূহ হইতে অন্য অর্থাৎ ঐ অবয়ব ভিন্ন অঙ্কুরোৎপত্তির উপাদান-কারণ নাই। এজন্য বীজের উপাদানের (গ্রহণের) নিয়ম অর্থাৎ অঙ্কুরের উৎপাদনে বীজগ্রহণেরই নিয়ম উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এই বাক্যের দ্বারা বীজের বিনাশ না হইলে, অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ প্রথমে বীজের বিনাশ, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি, এইরূপ যে "ক্রম," অর্থাৎ বীজ বিনাশ ও অঙ্কুরোৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়ম, তাহাকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তসাধনে আর কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। সুতরাং আমার সিদ্ধান্তেও ঐ "ক্রমে"র প্রতিষেধ বা অভাব নাই। অর্থাৎ আমার মতেও বীজবিনাশের অনন্তর অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, আমিও ঐরূপ ক্রম স্বীকার করি। কিন্তু উহার দ্বারা বীজের বিনাশরূপ অভাবই যে অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, ইহা সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনপূর্ব্বক মহর্ষির এই চরম যুক্তি সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহ অর্থাৎ পূর্ব্বজাত পরস্পর সংযোগরূপ আকৃতি বিনষ্ট হইলে, অভিনব যে ব্যূহ বা আকৃতি জন্মে, উহা হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, বীজের বিনাশরূপ অভাব হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। কারণ, বীজের অবয়বসমূহ এবং উহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগসমূহ অঙ্কুরের কারণ, ইহা দৃষ্ট। যে সমস্ত পরমাণু হইতে সেই বীজের সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ সমস্ত পরমাণুর পুনর্ব্বার পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগজন্য দ্ব্যণুকাদিক্রমে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। বীজের বিনাশের পরক্ষণেই অঙ্কুর জন্মে না। পৃথিবী ও জলাদির সংযোগে ক্রমশঃ বীজের অবয়বসমূহে ক্রিয়া জন্মিলে তদ্দ্বারা সেই অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহ অর্থাৎ পূর্ব্বজাত পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহার পরেই বীজের বিনাশ হয়। তাহার পরে বীজের সেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরমাণুসমূহে পুনর্ব্বার অন্য ব্যূহ, অর্থাৎ অভিনব বিলক্ষণ-সংযোগ জন্মিলে, উহা হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। বীজের সেই সমস্ত অবয়বের অভিনব ব্যূহ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই অঙ্কুর জন্মে না। কেবল বীজবিনাশই অঙ্কুরের কারণ হইলে, বীজচূর্ণ হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং বীজের অবয়বসমূহ ও উহাদের অভিনব ব্যূহ—অঙ্কুরের কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহের বিনাশ না হইলে, তাহাতে অন্য ব্যূহ জন্মিতেই পারে না, সুতরাং অঙ্কুরের উৎপত্তিস্থলে পূর্ব্বে বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহের বিনাশ ও তজ্জন্য বীজের

বিনাশ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বত্র বীজের বিনাশ হওয়ায়, ঐ বীজ-বিনাশ ও অঙ্কুরোৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মরূপ যে "ক্রম," তাহা আমাদিগের সিদ্ধান্তেও অব্যাহত আছে। কারণ, আমাদিগের মতেও বীজবিনাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের আনন্তর্য্য থাকিলেও ঐরূপ অনন্তর্য্যবশতঃ বীজ বিনাশে অঙ্কুরের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, বীজবিনাশের পরে বীজের অবয়বসমূহের অভিনব ব্যূহ উৎপন্ন হইলে, তাহার পরেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বীজের অবয়বকেই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বীজের বিনাশব্যতীত বীজের অবয়বসমূহের যে অভিনব ব্যূহ জন্মিতে পারে না, সেই অভিনব ব্যূহের আনন্তর্য্যপ্রযুক্তই অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের আনন্তর্য্য। কারণ, সেই অভিনব ব্যূহের অনুরোধেই অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে বীজবিনাশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং অঙ্কুরোৎপত্তিতে বীজবিনাশের আনন্তর্য্য অন্যপ্রযুক্ত হওয়ায়, উহার দ্বারা অঙ্কুরে বীজবিনাশের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের সহকারি-কারণত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হয়। যেমন, ঘটাদি দ্রব্যে পূর্ব্বরূপাদির বিনাশ না হইলে, পাকজন্য অভিনব রূপাদির উৎপত্তি হইতে পারে না; এজন্য আমরা পাকজন্য অভিনব রূপাদির প্রতি পূর্ব্বরূপাদির বিনাশকে নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করি, তদ্রূপ বীজের বিনাশ ব্যতীত অঙ্কুরের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায়, অঙ্কুরের প্রতি বীজের বিনাশকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করি। আমাদিগের মতে অভাব অবস্তু নহে। ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবপদার্থও কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু অভাবপদার্থ কাহারও উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহাদিগের মতে অভাব অবস্তু, তাঁহাদিগের মতে উহার কোন বিশেষ না থাকায়, সমস্ত অভাব হইতেই সমস্ত ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে (নবম কারিকার টীকায়) বলিয়াছেন যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে, অভাব সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ব-কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, ইত্যাদি আমি "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা"য় বলিয়াছি। তাৎপর্য্য-টীকায় ইহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে, নিঃস্বরূপ বা অবস্তু অভাব, অঙ্কুরের উপাদান হইলে, সর্ব্বথা বিনষ্ট শালিবীজ ও যববীজের কোন বিশেষ না থাকায়, শালিবীজ রোপণ করিলে, শালির অঙ্কুরই হইবে, যববীজ রোপণ করিলে, উহা হইতে শালির অঙ্কুর হইবে না, এইরূপ নিয়ম থাকে না। শালিবীজ রোপণ করিলে, উহার বিনাশরূপ অভাব হইতে যবের অঙ্কুরও উৎপন্ন হইতে পারে। পরন্তু কারণের শক্তিভেদপ্রযুক্তই ভিন্নশক্তিযুক্ত নানা কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অসৎ অর্থাৎ অবস্তু অভাবকে উপাদান-কারণ বলিলে, ঐ কারণের ভেদ না থাকায়, তাহার শক্তিভেদ অসম্ভব হওয়ায়, ঐ অভাব হইতে ভিন্নশক্তিযুক্ত নানা কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। পরন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, এই মতে অসত্তেরই

উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব (প্রাগভাব) থাকে, উহাই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ, ইহা বলিলে, সেই কার্য্যের প্রাগভাব অনাদি বলিয়া সেই কার্য্যেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রাগভাবসমূহেরও স্বাভাবিক কোন ভেদ না থাকায়, উহা হইতে বিভিন্ন শক্তিযুক্ত বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং বীজের বিনাশ প্রভৃতি এবং অঙ্কুরের প্রাগভাব প্রভৃতি কোন অভাবই অঙ্কুরাদি কার্য্যের উপাদান হইতে পারে না। কিন্তু অভাবকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা কার্য্যের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ"—"অসতঃ সজ্জায়ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, "অসৎ" হইতে "সতে"র উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বপক্ষ, উহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। কারণ, "সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য।৬।২।১।) সিদ্ধান্ত-শ্রুতির দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইয়াছে। পরন্তু "অসদেব"—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শূন্যতার বিবর্ত্ত, অর্থাৎ রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শূন্যতায় কল্পিত, উহার সত্তাই নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহার কোন সত্তাই নাই, তাহার কোন জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন উহাকে "অসৎ" বলা যায় না। "অসৎ খ্যাতি" আমরা স্বীকার করি না। পরন্তু সর্ব্বশূন্যতা স্বীকার করিলে জ্ঞাতার, অভাবে জ্ঞানেরও অভাব হইয়া পড়ে। জ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিলে, সর্ব্বশূন্যতাবাদী কোন বিচারই করিতে পারেন না। সুতরাং শূন্যতা অর্থাৎ অভাবই জগতের উপাদান-কারণ অথবা জগৎ শূন্যতারই বিবর্ত্ত, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং "অসদেব"—ইত্যাদি শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-তাৎপর্য্যে উক্ত হয় নাই। উহা পূর্ব্বপক্ষতাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে "একে আহুঃ' এই বাক্যের দ্বারাও ঐ তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এবং পূর্ব্বোক্ত "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতিতেই যে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি অঙ্কুরের প্রতি বীজের অবয়বসমূহই উপাদান-কারণ হয়, তাহা হইলে অঙ্কুরার্থী কৃষকগণ অঙ্কুরের জন্য নিয়মতঃ বীজকেই কেন গ্রহণ করে? বীজ অঙ্কুরের কারণ না হইলে, অঙ্কুরের জন্য বীজগ্রহণের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যখন অঙ্কুরের প্রতি বীজের অবয়বসমূহই উপাদান-কারণ, উহা ভিন্ন অঙ্কুরের উপাদান-কারণ আর কিছুই হইতে পারে না, তখন সেই উপাদান-কারণ লাভের জন্যই অঙ্কুরার্থী ব্যক্তিরা নিয়মতঃ বীজের উপাদান (গ্রহণ) করে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন বীজের অবয়বসমূহ পুনর্ব্বার অভিনব সংযোগবিশিষ্ট না হইলে যখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, তখন ঐ কারণ সম্পাদনের জন্য অঙ্কুরার্থীদিগের বীজের উপাদান, অর্থাৎ বীজের গ্রহণ অবশ্যই করিতে হইবে। বীজকে পরিত্যাগ করিয়া

অঙ্কুরের উপাদান-কারণ সেই বীজাবয়ব-সমূহকে গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং পরম্পরা-সম্বন্ধে বীজও অঙ্কুরের কারণ ॥ ১৮ ॥

শূন্যতোপাদানপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। অথাপর আহ—

অনুবাদ। অনন্তর অপরে বলেন,—

সূত্র। ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ॥ ১৯ ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ঈশ্বরই (সর্ব্বকার্য্যের) কারণ, যেহেতু পুরুষের (জীবের) কর্ম্মের বৈফল্য দেখা যায়।

ভাষ্য। পুরুষোঽয়ং সমীহমানো নাবশ্যং সমীহাফলং প্রাপ্নোতি, তেনানুমীয়তে পরাধীনং পুরুষস্য কর্ম্মফলারাধনমিতি, যদধীনং স ঈশ্বরঃ, তস্মাদীশ্বরঃ কারণমিতি।

অনুবাদ। "সমীহমান" অর্থাৎ কর্ম্মকারী এই জীব, অবশ্যই (নিয়মতঃ) কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না, তদ্দ্বারা জীবের কর্ম্মফলপ্রাপ্তি পরাধীন, ইহা অনুমিত হয়,—যাহার অধীন, তিনি ঈশ্বর, অতএব ঈশ্বরই কারণ।

টিপ্পনী। মহর্ষি "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়"—এই মত খণ্ডন করিয়া, এখন আর একটি মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে সেই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। ভাষ্যকার প্রথমে "অপর আহ" এই বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, "ঈশ্বরঃ কারণং,"—ইহা যে অপরের মত, মহর্ষি গোতমের মত নহে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ-কর্ত্তা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর যে, জগতের কারণ, ইহা ত মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, উহা মতান্তর বা পূর্ব্বপক্ষরূপে তিনি কিরূপে বলিবেন? পরবর্ত্তী একবিংশ সূত্রের দ্বারা যাহা তিনি তাঁহার নিজেরও সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এই সূত্রে "ঈশ্বরঃ কারণং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কারণ, জীব বা তাহার কর্ম্মাদি কারণ নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ, ইহাই এখানে মহর্ষির খণ্ডনীয় মতান্তর। মহর্ষির "পুরুষ-কর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই হেতুবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষই যে, তাঁহার অভিমত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পুরুষ অর্থাৎ জীব, নানাবিধ ফললাভের জন্য নানাবিধ কর্ম্ম করে, কিন্তু অবশ্যই সেইসমস্ত কর্ম্মের ফললাভ করে না, অর্থাৎ (নিয়মতঃ) সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই

সকল কর্ম্মের ফললাভ করে না। অনেক সময়েই অনেক কর্ম্ম বিফল হয়। সুতরাং জীবের কর্ম্মফললাভ নিজের অধীন নহে, নিজের ইচ্ছানুসারেই জীবের কর্ম্মফল লাভ হয় না, ইহা স্বীকার্য্য, ইহা জীবমাত্রেরই পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে জীবের কর্ম্মফললাভ পরাধীন। জীব নিজের ইচ্ছানুসারে কর্ম্মফল লাভ করিলে, অর্থাৎ কর্ম্মের সাফল্য তাহার স্বাধীন হইলে, জীবের কোন কর্ম্মই নিষ্ফল হইত না, দুঃখভোগও হইত না। সুতরাং জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল যাঁহার অধীন, জীবের সুখ ও দুঃখ যাঁহার ইচ্ছানুসারে নিয়মিত, এমন এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ আছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে অনাদিকাল হইতে জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগ এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তাঁহারই নাম ঈশ্বর। তিনি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ জীবের কর্ম্মানুসারে জীবের সুখদুঃখাদি ফল বিধান করেন না। নিজের ইচ্ছানুসারেই জীবের সুখ-দুঃখাদি ফলবিধান ও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। তিনি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কিছুই করিতে পারেন না—ইহা বলিলে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব থাকে না, সুতরাং তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, জীবের কর্ম্ম বা কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন, ইহাই স্বীকার্য্য। সর্ব্বজীবের প্রভু সেই ইচ্ছাময়ের অবন্ধ্য ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বজীবের সুখদুঃখাদি ভোগ হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা নিত্য, ঐ ইচ্ছার কোন কারণ নাই। জীবের সুখদুঃখাদি বিষয়ে তাঁহার কিরূপ ইচ্ছা আছে, তাহা জীবের বুঝিবার শক্তি নাই। সর্ব্বজীবের প্রভু সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জীবের কোনরূপ অনুযোগও হইতে পারে না। মূলকথা, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, অথবা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এইরূপ মতভেদে "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, ইহাই মহর্ষি গোতমের অভিমত পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে মহর্ষি গোতম এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ এই মতকেই প্রকাশ করিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকারের এইরূপ তাৎপর্য্যকল্পনার কারণ বুঝা যায় যে, মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষাপ্রসঙ্গে "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং"—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জগতের উপাদান-কারণবিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে ঐ নিজ সিদ্ধান্তের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্যই ঐ বিষয়ে অন্যান্য প্রাচীন মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রকরণে অভাবই জগতের উপাদান-কারণ, এই মতের খণ্ডন করায়, এই প্রকরণেও "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মহর্ষি যে জগতের উপাদান-কারণ বিষয়েই অন্য মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বপ্রকরণের ভাবানুসারে এই প্রকরণেও মহর্ষির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য

বুঝিয়া, মহর্ষির "ঈশ্বরঃ কারণং" এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম (জগতের) কারণ, অর্থাৎ উপাদান-কারণ—এই মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক-সম্প্রদায় ভিন্ন আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া ব্রহ্মের উপাদানত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সুবর্ণ যেমন কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। অন্যথা আর কোনরূপেই ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের যে জগদুপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আর কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শারীরক ভাষ্যে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব সমর্থন করিতে অনেক স্থানে মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সুবর্ণ যেমন কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে ঐ সমস্ত পরিণাম মিথ্যা। কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা, সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, তাঁহার কার্য্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদী সমস্ত সম্প্রদায়ের মতেই ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ সত্য। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে "মায়া" শব্দ আছে, উহার অর্থ ব্রহ্মের শক্তি, উহা মিথ্যা পদার্থ নহে। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ তাঁহার জগদাকারে পরিণাম হইলেও, তাঁহার স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় না, সুতরাং নিত্যতারও ব্যাঘাত হয় না, ব্রহ্ম, পরিণামী নিত্য। ইহাদিগের বিশেষ কথা এই যে, বেদান্তসূত্রে পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কারণ, "উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" এবং দেবাদিবদপি লোকে (২।১।২৪।২৫) এই দুই সূত্রের দ্বারা যেরূপে ব্রহ্মের পরিণাম সমর্থিত হইয়াছে, এবং উহার পরেই "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা" (২।১।২৬)—এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের পরিণামের অনুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করিয়া "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭) —এই সূত্রের দ্বারা যেরূপে ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম (বিবর্ত্ত নহে), এই সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম, ইহাই বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত না হইলে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "ক্ষীর" দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত হয় না এবং পরে "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা"—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষপ্রকাশও কোনরূপে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ জগৎ ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ পরিণাম না হইলে, অর্থাৎ জগৎ অবিদ্যাকল্পিত হইলে, "ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম হইলে, তাঁহার নিরবয়বত্ব বা নিরংশত্ববোধক শাস্ত্রের ব্যাঘাত হয়, এজন্য সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই পরিণাম স্বীকার করিতে হইলে, দুগ্ধের ন্যায় তাঁহার স্বরূপের হানি হয়, মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে," এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবকাশই হয় না। ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম হইলেই, ঐরূপ

পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তর উপপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদী সকল সম্প্রদায়ই নানাপ্রকারে নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ এবিষয়ে বহু বিচার করিয়া "বিবর্ত্তবাদ" খণ্ডন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্ব-সংবাদিনী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া "পরিণামবাদ"ই যে, বেদান্তের সিদ্ধান্ত, ইহা বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকার হয় না, তিনি সর্ব্বথা অবিকৃত থাকিয়াই জগৎ প্রসব করেন, এই বিষয়ে তিনি চিন্তামণিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "চিন্তামণি"নামে মণিবিশেষ নিজে অবিকৃত থাকিয়াই নানাদ্রব্য প্রসব করে, ইহা লোকে এবং শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে[১]। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"গ্রন্থেও আমরা পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদ-সমর্থনে "মণি" দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই[২]। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত "পরিণামবাদ" যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই নানাপ্রকারে সমর্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিবর্ত্তবাদ-বিদ্বেষী মহাদার্শনিক রামানুজ শ্রীভাষ্যে নিজ সিদ্ধান্তের অতিপ্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব সমর্থন করিবার জন্য অনেক স্থানে বেদান্তসূত্রের যে বোধায়নকৃত বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ বোধায়ন অতিপ্রাচীন, তাঁহার গ্রন্থও এখন অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ব্রহ্মের পরিণাম-বাদ সমর্থন করিয়াই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। এই ভাস্করাচার্য্যও অতি প্রাচীন। প্রাচীন নৈয়ায়িকবর্য্য উদয়নাচার্য্যও "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে ব্রহ্মপরিণামবাদী ঐ ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন[৩]। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"—ইত্যাদি অনেক শ্রুতির দ্বারা এবং

১। প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ, চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যাণি প্রসূতে ইতি।—সর্ব্বসংবাদিনী।

২। অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়?॥—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা—৭ম প°।

৩। "ব্রহ্ম পরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে"।
("কুসুমাঞ্জলি" ২য় স্তবকের ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদয়নকৃত বিচার দ্রষ্টব্য)
ভাস্করগ্রিদণ্ডিমতভাষ্যকারঃ।—বর্দ্ধমানকৃত "প্রকাশ" টীকা।

উপাদান-কারণের সত্তা ভিন্ন কার্য্যের কোন বাস্তব সত্তা নাই, কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা, ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়া, সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিতে রজতের ন্যায় এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বা আরোপিত। অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি হয়, শুক্তিতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। রজ্জু যেমন মিথ্যাসর্পের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান-কারণ, ব্রহ্মও তদ্রূপ এই মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান-কারণ। আর কোন রূপেই ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম স্বীকার করিলে, তাঁহার শ্রুতিসিদ্ধ নির্ব্বিকারত্বাদি কোনরূপে উপপন্ন হয় না। ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, কিন্তু ব্রহ্ম অবিকৃত, ব্রহ্মের কিছুমাত্র বিকার হয় নাই, ইহা বলিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত "বিবর্ত্তবাদ'কেই আশ্রয় করিতে হইবে। এই মতে জগৎ মিথ্যা বা মায়িক। এই মতই "বিবর্ত্তবাদ," "মায়াবাদ" "একান্তাদ্বৈতবাদ" ও "অনির্ব্বাচ্যবাদ" প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার করিলেও, তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ স্বামী "মাণ্ডুক্য কারিকা'য় এই মতের সুপ্রকাশ করিয়াছেন। আরও নানা কারণে এই মত যে অতি প্রাচীন মত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় যে, ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতমের সময়েও প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। সে যাহা হউক, মূলকথা তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাব জগতের উপাদান-কারণ না হউক, কিন্তু "ঈশ্বরঃ কারণং"—অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইবেন, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, ইহাই সিদ্ধান্ত বলিব। অথবা এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা-বশতঃ এই জগৎ ব্রহ্মেই আরোপিত, ব্রহ্মেই এই জগতের মিথ্যা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। কর্ম্মবাদী যদি বলেন যে, চেতন জীবগণ অনাদিকাল হইতে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদিগের ঐ সমস্ত কর্ম্মজন্যই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে জীবগণের কর্ম্মই কারণ, উহাতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং ঈশ্বর জগতের কারণই নহেন। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবক্তা মহর্ষি বলিয়াছেন, "পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জীবের কর্ম্ম, কিছুরই কারণ হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা চেতন পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ জীব অনাদি কালের অসংখ্য কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না এবং জীব যখন নিষ্ফল কর্ম্মও করে এবং নিষ্ফল বুঝিয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন জীবকে কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা চেতন বলা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ চেতনকেই কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বলা যায়। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য সর্ব্বজ্ঞ চেতন অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার্য্য হইলে, তাঁহাকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিব। তাই বলিয়াছেন, "ঈশ্বরঃ কারণং"

তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্তরূপে এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিলেও, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণ ঐরূপ ব্যাখ্যাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্তরূপ 'পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া, শেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই এই জগতের নিমিত্তকারণ, এই মত খণ্ডনের জন্যই এখানে মহর্ষির এই প্রকরণ। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই মত খণ্ডনের জন্যই যে, মহর্ষি এখানে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ দেখি না"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের অনেক পরবর্ত্তী "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও প্রথমে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, "বস্তুতঃ এখানে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ করিবার জন্যই মহর্ষি "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই সূত্রটি সিদ্ধান্তসূত্র। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে "প্রসঙ্গতঃ এখানে জগতের কারণরূপে ঈশ্বরসিদ্ধির জন্যই মহর্ষির এই প্রকরণ," ইহা অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়া তন্মতানুসারেও তিন সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা পরে প্রকটিত হইবে। ফল-কথা, পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণ এখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। পরম-প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার দ্বারাও মহর্ষি যে, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর এই জগতের কারণ, এই মতকেই এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। [বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাবশতঃই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁহার ইচ্ছায় কোনরূপ অনুযোগই হইতে পারে না, ইহাও অতি প্রাচীন মত। নকুলীশ পাশুপত-সম্প্রদায় এই মতের সমর্থন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।[1] শৈবাচার্য্য মহামনীষী ভাসর্ব্বজ্ঞের "গণকারিকা" গ্রন্থের রত্নটীকায় এই মতের ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র নকুলীশ পাশুপত-দর্শন"-প্রবন্ধে ঐ মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া, পরে "শৈবদর্শন" প্রবন্ধে ঐ মতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ, এই মত প্রাচীন কালে এক প্রকার "ঈশ্বরবাদ" নামেও কথিত হইত। প্রাচীন পালি বৌদ্ধ গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্তরূপ "ঈশ্বরবাদের" উল্লেখ দেখা যায়[2]। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও উক্ত মতকে অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। "বুদ্ধচরিত"

১। "কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ং।
অতঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণকারণং"॥
("সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" নকুলীশ পাশুপতদর্শন দ্রষ্টব্য)।

২। "ইস্সরো সব্বলোকস্স সচে কপ্পেতি জীবিতং।
ইদ্ধিব্যসনভাবঞ্চ কম্মং কল্যাণপাপকং।
নিদ্দেসকারী পুরিসো ইস্সরো তেন লিপ্পতিং॥
—মহাবোধিজাতক, (জাতক, ৫ম খণ্ড—২৩৮ পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থে অশ্বঘোষও উক্ত মতকে অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন[১]। মহর্ষি গোতম এখানে "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ "ঈশ্বরবাদ"কেই পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, ঐ মতের খণ্ডনের দ্বারা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই নিজ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মন্তব্য পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে॥১৯॥

সূত্র। ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ॥২০॥৩৬২॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ একমাত্র ঈশ্বরই জগতের কারণ নহেন, যেহেতু জীবের কর্ম্মের অভাবে অর্থাৎ জীব কোন কর্ম্ম না করিলে, ফলের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ঈশ্বরাধীনা চেৎ ফলনিষ্পত্তিঃ স্যাদপি, তর্হি পুরুষস্য সমীহামন্তরেণ ফলং নিষ্পদ্যেতেতি।

অনুবাদ। যদি ফলের উৎপত্তি ঈশ্বরের অধীন হয়, তাহা হইলে জীবের কর্ম্মব্যতীতও ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ নহেন। কারণ, জীব কর্ম্ম না করিলে, তাহার কোন ফলনিষ্পত্তি হয় না। যদি একমাত্র ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বফলের বিধাতা হন, তাহা হইলে, জীব কিছু না করিলেও তাহার সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হইতে পারে। সুতরাং জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাই স্বীকার্য্য। জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর তাহার শুভাশুভ ফল বিধান করেন এবং তজ্জন্য জগতের সৃষ্টি করেন। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকরও এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই কারণ হইলে, জীবের কর্ম্ম ব্যতিরেকেও সুখ ও দুঃখের উপভোগ হইতে পারে। তাহা হইলে কর্ম্মলোপ ও মোক্ষের অভাবও হইয়া পড়ে, এবং ঈশ্বরের একরূপতাবশতঃ কার্য্যও একরূপই হয়—জগতের বৈচিত্র্য হইতে পারে না। পরবর্ত্তী সূত্রের "বার্ত্তিকে"ও উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যিনি কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার মতে মোক্ষের অভাব প্রভৃতি দোষ হয়। কিন্তু ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ হইলে এই সমস্ত দোষ হয় না। কারণ, জীবের দুঃখ-

---

১। "সর্গং বদন্তীশ্বরতস্তথান্যে তত্র প্রযত্নে পুরুষস্য কোঽর্থঃ।
য এব হেতুর্জগতঃ প্রবৃত্তৌ হেতুর্নিবৃত্তৌ নিয়তঃ স এব"॥
—বুদ্ধচরিত, ৯ম সর্গ—৫৩ শ শ্লোক॥

জনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টবশতঃই ঈশ্বর জীবের দুঃখ সম্পাদন করেন, ইহা সিদ্ধান্ত হইলে, মুক্ত আত্মার সমস্ত অদৃষ্টের ধ্বংস হওয়ায় আর তাহার কোন দিনই দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষ উপপন্ন হইতে পারে। উদ্দ্যোতকরের এই সমস্ত কথার দ্বারা তাঁহার মতেও মহর্ষি যে পূর্ব্বসূত্রে কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এই মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যথাশ্রুত ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকারেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্ম-পরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদে"র নিরাস করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় বা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের খণ্ডনই কর্ত্তব্য। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় নিরাসের কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকারও এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় নিরাসের কোন যুক্তির ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি "ইদমত্রাকূতং" এই কথা বলিয়া, এই সূত্রের "আকূত" অর্থাৎ গূঢ় আশয় বর্ণন করিতে নিজেই সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদে"র অযৌক্তিকতা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ হইতেই পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি কেহ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ বলেন, এই জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন। মহর্ষি যে, এই সূত্রের দ্বারা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত্ব মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে এখানে বলিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, মহর্ষি "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ" এবং কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ততাবাদের খণ্ডন করিয়া (পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা) নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা কিরূপে "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদে"র খণ্ডন করিয়াছেন, এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা কিরূপে ঐ মতদ্বয়ের নিরাস হয়, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার কিছুই বলেন নাই। "ন্যায়-সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রথমে তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারেই পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ, এই মতের খণ্ডনেই মহর্ষি গোতমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "পুরুষকর্ম্ম" বলিতে দৃষ্ট কারণমাত্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। পুরুষের কর্ম্ম এবং দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ও মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত কপাল ও কপালিকা প্রভৃতি দৃষ্ট কারণের অভাবে ফল নিষ্পত্তি হয় না, অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং ঘটাদি কার্য্যে ঐ সমস্ত দৃষ্ট কারণও আবশ্যক, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইলে ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত কপাল কপালিকা প্রভৃতি দ্রব্যেরই উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং ঐ দৃষ্টান্তে

দ্ব্যণুকের উৎপত্তিতে ঐ দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণুরই উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, ঈশ্বরের উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিলেও, শেষে তিনিও উহা প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করেন নাই। এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝাও যায় না। জীব কর্ম্ম না করিলে ঈশ্বর তাহাকে স্বেচ্ছাবশতঃ ফল প্রদান করেন না। ঈশ্বর কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই কাহাকে সুখ এবং কাহাকে দুঃখ প্রদান করিলে, তাঁহার পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি হয়। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই জীবকে সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন, জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এই বৈদিক সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ, এই অবৈদিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে স্পষ্ট বুঝা যায়। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা সুব্যক্ত হইবে ॥২০॥

সূত্র। তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ॥ ২১ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ। "তৎকারিতত্ব"বশতঃ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকারিত বা ঈশ্বরজনিত, ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা, এজন্য "অহেতু" অর্থাৎ পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত "জীবের কর্ম্মের অভাবে ফলের উৎপত্তি হয় না" এই হেতু জীবের কর্ম্মই তাহার সমস্ত ফলের কারণ ঈশ্বর কারণ নহেন, এই বিষয়ে হেতু (সাধক) হয় না।

ভাষ্য। পুরুষকারমীশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি, ফলায় পুরুষস্য যতমানস্যে-শ্বরঃ ফলং সম্পাদয়তি। যদা ন সম্পাদয়তি, তদা পুরুষকর্ম্মাফলং ভবতীতি। তস্মাদীশ্বরকারিতত্বাদহেতুঃ "পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তে"-রিতি।

অনুবাদ। ঈশ্বর পুরুষকারকে অর্থাৎ জীবের কর্ম্মকে অনুগ্রহ করেন, (অর্থাৎ) ঈশ্বর ফলের নিমিত্ত প্রযত্নকারী জীবের ফল সম্পাদন করেন। যে সময়ে সম্পাদন করেন না, সেই সময়ে জীবের কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। অতএব "ঈশ্বর-কারিতত্ব"বশতঃ "জীবের কর্ম্মের অভাবে ফলের উৎপত্তি হয় না", ইহা অহেতু, [অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মই তাহার সমস্ত ফলের কারণ, ঈশ্বর নহেন, ইহা সিদ্ধ হয় না, ঐ হেতু কেবল জীবের কর্ম্মেরই ফলজনকত্বের সাধক হয় না]।

টিপ্পনী। "জীবের কর্ম্মের অভাবে ফলনিষ্পত্তি হয় না", এই হেতুর দ্বারা মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে জীবের কর্ম্মের কারণত্ব সিদ্ধ করিয়া, কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহা হইলে কেবল জীবের কর্ম্মকেই জগতের কারণ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মানুসারেই তাহার সুখ-দুঃখাদি ফলভোগ এবং তজ্জন্য জগতের সৃষ্টি হয়। ইহাতে ঈশ্বরের কারণত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। মীমাংসক-সম্প্রদায়বিশেষও ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ফল-কথা, পূর্ব্বসূত্রে যে হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মের কারণত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে, ঐ হেতুর দ্বারা কেবল জীবের কর্ম্মই কারণ, ইহাই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত যে, কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব, তাহা সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলিয়াছি, উহা জীবের কর্ম্মই কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন, এই বিষয়ে হেতু হয় না। অর্থাৎ ঐ হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মও কারণ, ইহাই সিদ্ধ হয়; কেবল জীবের কর্ম্মই কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকারিত। ভাষ্যকার এই সূত্রস্থ "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের "তৎকারিতত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ঈশ্বর-কারিতত্বাৎ"। এবং ঐ "ঈশ্বরকারিতত্ব" বুঝাইবার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অনুগ্রহ করেন, অর্থাৎ কোন ফলের জন্য কর্ম্মকারী জীবের ঐ ফল সম্পাদন করেন। ঈশ্বর যে সময়ে ফল সম্পাদন করেন না, সে সময়ে ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ জীবের কিরূপ কর্ম্ম আছে এবং কোন্ সময়ে ঐ কর্ম্মের কিরূপ ফলভোগ হইবে, ইহা ঈশ্বরই জানেন, তদনুসারে ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফল সম্পাদন করেন, তিনি জীবের কর্ম্মফল সম্পাদন না করিলে, জীবের কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। সুতরাং অনেক সময়ে জীবের কর্ম্মের বৈফল্য দেখা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে মহর্ষি "তৎকারিতত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের দ্বারা এখানে জীবের কর্ম্মের ফলকেই ঈশ্বরকারিত বলিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং জীবের কর্ম্মফলের প্রতি কেবল কর্ম্মই কারণ নহে, কর্ম্মফলবিধাতা ঈশ্বরও কারণ, ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা প্রকটিত হয়। তাহা হইলে পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা কেবল জীবের কর্ম্মের কারণত্ব-সাধক হেতু হয় না, ইহাও মহর্ষির "তৎকারিতত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অবশ্য মহর্ষি যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুকেই এই সূত্রে "অহেতু" বলিয়াছেন, ইহা ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিলেও, উহা কোন্ সাধ্যের সাধক হেতু হয় না, তাহা বলেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার যেভাবে জীবের কর্ম্মফলের ঈশ্বরকারিতত্ব বুঝাইয়া, কর্ম্মফললাভে কর্ম্মের ন্যায় ঈশ্বরকেও কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে, ঈশ্বরনিরপেক্ষ কেবল কর্ম্মই ঐ কর্ম্মফলের কারণ নহে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ হয় না, ইহা এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। জৈমিনির মতে ঈশ্বরনিরপেক্ষ কর্ম্মই কর্ম্মফলের কারণ, ইহা বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও উল্লেখ

করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম শেষে এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াও, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কারণ, মহর্ষির নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে, ঐ মতের খণ্ডন করা এখানে অত্যাবশ্যক।

পরন্তু, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে,"জীবের কর্ম্মব্যতীত ফলের উৎপত্তি হয় না" এই (পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত) হেতুর দ্বারা যদি জীবের কর্ম্মের ফলজনকত্ব সিদ্ধ হয়,তাহা হইলে, জীবের কর্ম্ম সর্ব্বত্রই সফল হইবে। কারণ, যাহা ফলের কারণ বলিয়া সিদ্ধ, তাহা থাকিলে ফল অবশ্যই হইবে, নচেৎ তাহাকে ফলের কারণই বলা যায় না। কিন্তু জীব কর্ম্ম করিলেও যখন অনেক সময়ে ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, তখন জীবের কর্ম্মকে ফলের কারণ বলা যায় না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ইহারও উত্তর বলিয়াছেন যে, "জীবের কর্ম্মব্যতীত ফলের উৎপত্তি হয় না", এই হেতু জীবের কর্ম্মের সর্ব্বত্র ফলজনকত্বের সাধক হেতু হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা। তিনি জীবের কর্ম্মের ফল সম্পাদন না করিলে, ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। জীব কর্ম্ম না করিলে, ঈশ্বর তাহার সুখদুঃখাদি ফল বিধান করেন না, এজন্য জীবের ফললাভে তাহার কর্ম্মও কারণ, ইহাই পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু জীব কোন ফললাভের জন্য যে কর্ম্ম করে, কেবল সেই কর্ম্মই তাহার সেই ফললাভের কারণ নহে। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ এবং সেই ফললাভের প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্টবিশেষের অভাব এবং সেই কর্ম্মের ফলভোগের কাল, এই সমস্তও সেই ফললাভে কারণ। জীবের সেই সমস্ত অদৃষ্ট এবং ফললাভের প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্টবিশেষ এবং কোন্ সময়ে কিরূপে কোন্ স্থানে ঐ কর্ম্মের ফল-ভোগ হইবে, ইত্যাদি সেই সর্ব্বজ্ঞ এবং জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, সুতরাং তদনুসারে তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধান করেন। ফললাভের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণ না থাকিলে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মের ফলবিধান করেন না। সুতরাং অনেক সময়ে জীবের কর্ম্মের বৈফল্যের উপপত্তি হয়। ফলকথা, জীবের ফললাভে তাহার কর্ম্ম কারণ হইলেও, ঐ কর্ম্ম সর্ব্বত্র ফলজনক হইবে, এ বিষয়ে পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু অহেতু, অর্থাৎ ঐ হেতু জীবের কর্ম্মের সর্ব্বত্র ফলজনকত্বের সাধক হয় না, ইহাও পক্ষান্তরে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐরূপ তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করা যায়।

উদ্দ্যোতকর এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের কর্ত্তা হইলে, জীবের সেই কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কর্ত্তা যাহা সহকারী কারণরূপে অবলম্বন করেন, তাহা ঐ কর্ত্তার কৃত পদার্থ নহে, তাহাতে ঐ কর্ত্তার কারণত্ব নাই, ইহা দেখা যায়। সুতরাং ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকার্য্যে জীবের কর্ম্মকে সহকারী কারণরূপে অবলম্বন করিলে, জীবের ঐ কর্ম্মে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বকর্তৃত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্য করেন না। তিনি জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ জগৎকর্ত্তা,

এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়া উদ্দ্যোতকর মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আমরা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ, ইহা বলি না। কিন্তু আমরা বলি, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অনুগ্রহ করেন। কর্ম্মের অনুগ্রহ কি ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, জীবের যে কর্ম্ম যেরূপ, এবং যে সময়ে উহার ফলভোগ হইবে, সেই সময়ে সেইরূপে ঐ কর্ম্মের বিনিয়োগ করা অর্থাৎ উহার যথাযথ ফল-বিধান করাই কর্ম্মের অনুগ্রহ। উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারা তাঁহার মতে এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ বুঝা যায় যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের কর্ত্তা হইলে, ঐ কর্ম্মে তাঁহার যে কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকিবে না—ঐ কর্ম্মে যে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকিবে না, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জীবের যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি করিতেছেন, ঐ কর্ম্মও ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই ঐ কর্ম্মের প্রয়োজক কর্ত্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জীবের ঐ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলপ্রাপ্তি সম্ভবই হয় না। ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের কর্ত্তা হইলেও, ঐ কর্ম্মেও তাঁহার ঈশ্বরত্ব আছে। তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্বের বাধা নাই। তাহা হইলে পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনে হেতু হয় না। পরন্তু, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই মতের খণ্ডনেই হেতু হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মের সহকারি-কারণত্ব সিদ্ধ হইলে, ঈশ্বর ঐ কর্ম্মের কারণ হইতে পারেন না বলিয়া, উহার দ্বারা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা যায় না। কারণ, জীবের কর্ম্মও ঈশ্বরনিমিত্তক। তাৎপর্য্যটীকা-কারও এইরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায়। ফলকথা, আমরা মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে পারি যে, (১) পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত হেতু কেবল (ঈশ্বরনিরপেক্ষ) জীবের কর্ম্মের ফলজনকত্ব বা জগৎকারণত্বের সাধক হেতু হয় না এবং (২) জীবের কর্ম্মের সর্ব্বত্র ফলজনকত্বের সাধক হেতু হয় না, এবং (৩) জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনেও হেতু হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মের কারয়িতা এবং ফলবিধাতা। সূত্রে বহু অর্থের সূচনা থাকে, ইহা সূত্রের লক্ষণেও কথিত আছে[১], সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ অর্থই সূচিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে, এই সূত্রের দ্বারা কেবল কর্ম্ম বা কেবল ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্তকারণ নহেন, কিন্তু

১। সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি। যথাহুঃ—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ" ॥ ইতি।

—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রভাষ্য, ভামতী।

জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হওয়ায়, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবের ফললাভে তাহার কর্ম্ম বা পুরুষকার কারণ হইলে, উহা সর্ব্বত্র সফল হউক? পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই আপত্তির নিরাসের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা শেষে বলিয়াছেন যে, জীব পুরুষকার করিলেও অনেক সময় উহার যে ফল হয় না, ঐ ফলাভাব "তৎকারিত" অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবিশেষের অভাবপ্রযুক্ত। জীব পুরুষকার করিলেও, তাহার ফললাভের কারণান্তর অদৃষ্টবিশেষ না থাকায়, অনেক সময়ে ঐ পুরুষকার সফল হয় না। সুতরাং জীবের পুরুষকার "অহেতু" অর্থাৎ ফলের উপধায়ক নহে—সর্ব্বত্র ফলজনক নহে। বৃত্তিকার এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "পুরুষকর্ম্মাভাব"কেই গ্রহণ করিয়া, এখানে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পুরুষের (জীবের) কর্ম্মের অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অভাব। এবং জীবের ফলাভাবকেই এখানে "তৎকারিত" অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অভাবপ্রযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং সূত্রোক্ত "অহেতু" শব্দের ব্যাখ্যায় জীবের পুরুষকারকে অহেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং "অহেতু" শব্দের দ্বারা ফলের অনুপধায়ক এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রে কোন হেতু কথিত হইলে, পরসূত্রে "অহেতু" শব্দের প্রয়োগ করিলে, ঐ "অহেতু" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুকেই "অহেতু" বলা হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। মহর্ষির সূত্রে অন্যত্রও অনেক স্থলে পদার্থপরীক্ষায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুই পরসূত্রে "অহেতু" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে "অহেতু" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুকেই "অহেতু" বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেলে, বৃত্তিকারের ন্যায় অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ কষ্টকল্পনা করিয়া "অহেতু" শব্দের দ্বারা "পুরুষকার ফলের অনুপধায়ক" এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করা সমুচিত মনে হয় না। পরন্তু, বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় এই সূত্রের দ্বারা আপত্তিবিশেষের নিরাস হইলেও, জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরকারিত, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা, সুতরাং জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন হয় না। সুতরাং এই প্রকরণে সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। ভাষ্যকার এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত ঈশ্বরকেই মহর্ষির বুদ্ধিস্থরূপে গ্রহণ করিয়া, "তৎকারিতত্বাৎ"—এই হেতু বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ঈশ্বরকারিতত্বাৎ"। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় মহর্ষির বক্তব্যের কোন ন্যূনতা নাই। উদ্দ্যোতকরও শেষে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রে "তৎকারিতত্বাৎ" এই বাক্য বলিয়া, ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি প্রথম সূত্রের দ্বারা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া, শেষে দুইটি সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপূর্ব্বক জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মূল-কথা এই যে, জীব কর্ম্ম করিলেও, যখন অনেক সময়ে ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই জীবের কর্ম্মের সাফল্য ও বৈফল্য হয়, তখন জীবের সুখ-দুঃখাদি ফললাভে ঈশ্বর বা তাঁহার ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জীবের কর্ম্মকে কারণ বলা যায় না। সুতরাং জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত-কারণ, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে এখানে সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির মূল বক্তব্য বুঝিতে হইবে যে, জীবের সুখ-দুঃখাদি ফললাভে তাহার কর্ম্ম কারণ না হইলে, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ হইলে, জীব সুখ-দুঃখাদিজনক কোন কর্ম্ম না করিলেও, তাহার সুখ-দুঃখাদি ফললাভ হইতে পারে। পরন্তু, জীবের সুখ-দুঃখাদি ফলের বৈষম্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য কোন-রূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বভূতে সমান পরমকারুণিক পরমেশ্বর কেবল নিজের ইচ্ছাবশতঃ কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী এবং কাহাকে দেবতা, কাহাকে মনুষ্য ও কাহাকে পশু করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার রাগ ও দ্বেষমূলক ঐরূপ বিষম সৃষ্টি বলা যায় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" (গীতা। ৯। ২৯)। সুতরাং তিনি জীবের বিচিত্র কর্ম্মানুসারেই বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। জীবের নিজ কর্ম্মানুসারেই শুভাশুভ ফল ও বিচিত্র শরীরাদি লাভ হইতেছে। শ্রুতিও ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন"। "যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে"। (বৃহদারণ্যক। ৪। ৪। ৫) বেদান্ত-দর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি"। (২য় অ°, ১ম পা°, ৩৪শ সূত্র)। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বিচিত্র জীবদেহের সৃষ্টি ও সংহার করায়, তাঁহার বৈষম্য (পক্ষপাত) এবং নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষের আশঙ্কা নাই। শারীরক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মেঘ যেমন ব্রীহি, যব প্রভৃতি শস্যের সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ, কিন্তু ঐ ব্রীহি, যব প্রভৃতি শস্যের বৈষম্যে সেই বীজগত অসাধারণ শক্তিবিশেষই কারণ, এইরূপ ঈশ্বরও দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ, কিন্তু ঐ দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির বৈষম্যে সেই সেই জীবগত অসাধারণ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষই কারণ। তাহা হইলে ঈশ্বর—দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির সৃষ্টিকার্য্যে সেই সেই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসাপেক্ষ হওয়ায়, তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিতা দোষ হয় না এবং জীবের কর্ম্মানুসারেই এক সময়ে জগতের সংহার করায়, তাঁহার নির্দ্দয়তা দোষও হয় না। কিন্তু ঈশ্বর যদি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া, কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই বিষম সৃষ্টি করেন এবং জগতের সংহার করেন, তাহা হইলেই, তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ অনিবার্য্য হয়। ঐরূপ ঈশ্বর সাধারণ লোকের ন্যায় রাগ ও দ্বেষের অধীন হওয়ায়, তাঁহাকে জগতের কারণও বলা যায় না। তাই বাদরায়ণ ইহার সমাধান করিতে বলিয়াছেন,—"সাপেক্ষত্বাৎ"। ভাষ্যকার

শঙ্কর উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ; ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ"। ঈশ্বর যে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই বিচিত্র বিষম সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব? তাই বাদরায়ণ সূত্রশেষে বলিয়াছেন, "তথাহি দর্শয়তি"। অর্থাৎ শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক সমস্ত শাস্ত্রই ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্কর উহা প্রদর্শন করিতে এখানে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি "কৌষীতকী" শ্রুতি এবং পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" ইত্যাদি "বৃহদারণ্যক" শ্রুতি এবং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" ইত্যাদি ভগবদ্গীতার (৪।১১) বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূলকথা, জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, ইহাই শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই বিষম সৃষ্টি এবং জীবের সুখ দুঃখাদি ফল বিধান করায়, তাঁহার পক্ষপাতিতা দোষের কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, তিনি নিজে কেবল স্বেচ্ছাবশতঃ অথবা রাগ ও দ্বেষবশতঃ কাহাকে সুখী এবং কাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন না। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই সেই সেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফল প্রদানের জন্যই তিনি ঐরূপ বিষমসৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহাকে রাগও দ্বেষের বশবর্ত্তী বলা যায় না। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র শারীরক-ভাষ্যের "ভামতী" টীকায় দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সভাতে নিযুক্ত কোন সভ্য যুক্তবাদীকে যুক্তবাদী বলিলে এবং অযুক্তবাদীকে অযুক্তবাদী বলিলে, অথবা সভাপতি যুক্তবাদীকে অনুগ্রহ করিলে এবং অযুক্তবাদীকে নিগ্রহ করিলে, তাঁহাকে রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী বলা যায় না। পরন্তু, তাঁহাকে মধ্যস্থই বলা যায়। এইরূপ ঈশ্বরও পুণ্যকর্ম্মা জীবকে অনুগ্রহ করিয়া এবং পাপকর্ম্মা জীবকে নিগ্রহ করিয়া মধ্যস্থই আছেন। তিনি যদি পুণ্য-কর্ম্মা জীবকে নিগ্রহ করিতেন এবং পাপকর্ম্মা জীবকে অনুগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার মাধ্যস্থ থাকিত না; তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা যাইত। কিন্তু তিনি জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই সুখ-দুঃখাদি ফল বিধান করায়, তাঁহার পক্ষপাত দোষের কোন সম্ভা-বনাই নাই। এবং জগতের সংহার করায়, তাঁহার নির্দ্দয়তা দোষের আশঙ্কাও নাই। কারণ, সমগ্র জীবের অদৃষ্টের বৃত্তি নিরোধের কাল উপস্থিত হইলে, তখন প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। সেই সময়কে লঙ্ঘন করিলে, ঈশ্বর অযুক্তকারী হইয়া পড়েন। সুতরাং জীবের সুষুপ্তির ন্যায় সমগ্র জীবের অদৃষ্টানুসারেই সমগ্র জীবের ভোগ নিবৃত্তি বা বিশ্রামের জন্য যে কাল নির্দ্ধারিত আছে, সেই কাল উপস্থিত হইলে, তিনি জীবের অদৃষ্টানুসারেই অবশ্যই জগতের সংহার করিবেন। তাহাতে তাঁহার নির্দ্দয়তা দোষের কোন কারণ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বকার্য্যেই জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্বেরও ব্যাঘাত হয় না। কারণ, যিনি প্রভু, তিনি সেবকগণের নানাবিধ সেবাদি কর্ম্মানুসারে নানাবিধ ফল প্রদান করিলে, তাঁহার প্রভুত্বের ব্যাঘাত হয় না। সর্ব্বোত্তম সেবককে তিনি যে ফল প্রদান করেন, ঐ ফল তিনি মধ্যম সেবক বা অধম সেবককে প্রদান না করিলেও, তাঁহার ফল প্রদানের সামর্থ্যের বাধা হয় না।

এইরূপ ঈশ্বর অপক্ষপাতে সর্ব্বজীবের কর্ম্মফলভোগ সম্পাদনের জন্যই জীবের কর্ম্মানুসারেই বিষমসৃষ্টি করিয়া সুখ-দুঃখাদি ফলবিধান করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ঈশ্বরত্বের কোন বাধা হয় না।

"ভামতী"কার বাচস্পতি মিশ্র শেষে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি"[১] ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে,ঈশ্বর যাহাকে এই লোক হইতে উর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন এবং যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই অসাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। সুতরাং শ্রুতির দ্বারাই তাঁহার দ্বেষ ও পক্ষপাত প্রতিপন্ন হওয়ায়, পূর্ব্ববৎ বৈষম্য দোষের আপত্তিবশতঃ তাঁহাকে জগতের কারণ বলা যায় না। এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করাইয়া সুখী ও দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন,ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, ঐ শ্রুতির দ্বারাই ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, যে শ্রুতির দ্বারা জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, উহার দ্বারাই আবার তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের অভাব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? শ্রুতির দ্বারা ঐরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেই পারে না। যদি বল, ঐ শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের প্রতিষেধ করি না, কিন্তু তাঁহার বৈষম্য মাত্র অর্থাৎ পক্ষপাতিত্বই বক্তব্য। এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন যে সমস্ত শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরের রাগ-দ্বেষাদি কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তার সম্ভাবনাই নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই সমস্ত বহু শ্রুতির সমন্বয়ের জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "উন্নিনীষতে" এবং "অধোনিনীষতে"—এই দুই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, জীবের তজ্জাতীয় পূর্ব্বকর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ জীব তজ্জাতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বর জীবের সেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই তাহাকে উর্দ্ধলোকে এবং অধোলোকে লইবার জন্য তাহাকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পুনঃ পুনঃ যে জাতীয় কর্ম্মকলাপ করিয়াছে, তজ্জাতীয় সেই পূর্ব্বকর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ ইহজন্মেও তজ্জাতীয় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। জীবের অনন্ত কর্ম্ম-রাশির মধ্যে যে কর্ম্মের ফলেই যে জীব আবার স্বর্গজনক কোন কর্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিবে এবং নরকজনক কোন কর্ম্ম করিয়া নরক লাভ করিবে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই জীবকে তাহার সেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া তাহার সেই কর্ম্মলভ্য স্বর্গ ও নরকরূপ ফলের বিধান করেন, ইহাতে তাঁহার রাগ ও দ্বেষ প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, তিনি জীবের অনাদি-কালের সর্ব্বকর্ম্মসাপেক্ষ। তিনি সেই কর্ম্মানুসারেই জীবকে নানাবিধ কর্ম্ম করাইতেছেন,জগতের

১। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি, তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।—কৌষীতকী উপনিষৎ, ৩য় অঃ। ৮। শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত শ্রুতি-পাঠে—"এনং" এই পদ নাই।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তাই পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত আপত্তি নিরাসের জন্য একই হেতু বলিয়া গিয়াছেন—"সাপেক্ষত্বাৎ"। জীব যে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহা "ভগবদ্গীতা"তেও কথিত হইয়াছে।[১] বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে অন্য শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২]

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গুরুতর পূর্ব্বপক্ষ আছে যে, জীব রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ স্বাধীনভাবেই কর্ম্ম করিতেছে, উহাতে জীবের স্বাধীনকর্তৃত্বই স্বীকার্য্য। কারণ, জীবের যে সমস্ত কর্ম্ম দেখা যায়, তাহাতে ঈশ্বরের কোন অপেক্ষা বা প্রয়োজন বুঝা যায় না। পরন্তু, রাগ-দ্বেষশূন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিলে, তিনি সকল জীবকে ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত করিতেন। তাহা হইলে সকল জীবই ধার্ম্মিক হইয়া সুখীই হইত। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সুতরাং তাঁহার বৈষম্য দোষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঈশ্বর জীবের যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে বিষমসৃষ্টি করেন, জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, ইহা বলা হইয়াছে, সেই কর্ম্মও ঈশ্বর করাইয়াছেন, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে জীবের কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, তজ্জন্য জীবের দুঃখভোগে ঈশ্বরই মূল এবং জীব কোন পাপকর্ম্ম করিলে, তজ্জন্য তাহার কোন অপরাধও হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, জীবের ঐ কর্ম্মে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। জীব সকল কর্ম্মেই ঈশ্বরপরতন্ত্র। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ অনিবার্য্য। সুতরাং জীবের স্বাধীনকর্তৃত্বই স্বীকার্য্য। তাহা হইলেই ঈশ্বরকে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ বলা যায় এবং তাহাতে বৈষম্য দোষের আপত্তিও নিরস্ত হয়। সুতরাং তাহাকে জগৎকর্ত্তাও বলা যায়। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ভগবান্ বাদরায়ণ নিজেই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন, "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ।২।৩।৪১। অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই জীবকে কর্ম্ম করাইতেছেন, তিনি প্রযোজক কর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এখানে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতিকেই সূত্রোক্ত "শ্রুতি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মে তাহার স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইলে, পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি কিরূপে নিরস্ত হইবে? এতদুত্তরে ভগবান্ বাদরায়ণ উহার পরেই দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন, "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"। অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন না হইলেও, জীবের কর্তৃত্ব আছে,

---

১। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপি সঃ॥ —গীতা। ৬।৪৪।

২। "জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥"

জীব অবশ্যই কর্ম্ম করিতেছে. ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্ন বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই, তদনুসারে জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। অন্যথা শ্রুতিতে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ব্যর্থ হয়। জীবের কর্ত্তৃত্ব ও তন্মূলক ফলভোগ না থাকিলে, শ্রুতিতে বিধি ও নিষেধ সার্থক হইতেই পারে না। সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যই থাকে না। ভগবান্ বাদরায়ণ ইহার পূর্ব্বে "কর্ত্রধিকরণে", "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ" (২।৩।৩৩)—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। পরে "পরায়ত্তাধিকরণে" পূর্ব্বোক্ত "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদি দুই সূত্রের দ্বারা জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব যে, ঈশ্বরের অধীন, এবং ঈশ্বর জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলে, জীবের কর্ম্মে তাহার স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, ঈশ্বরের জীবকৃত কর্ম্ম-সাপেক্ষতা উপপন্ন হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজেই এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে,[১] জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও, জীব যে কর্ম্ম করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, জীব কর্ম্ম করিতেছে, ঈশ্বর তাহাকে কর্ম্ম করাইতেছেন। জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা, ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা। প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, প্রযোজক কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরকে কারয়িতা বলিলে, জীবকে কর্ত্তা বলিতেই হইবে। কিন্তু জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও, জীবকৃত কর্ম্মের ফলভোগ জীবেরই হইবে। কারণ, রাগ-দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া জীবই সেই কর্ম্ম করিতেছে। সেই কর্ম্ম-বিষয়ে জীবের ইচ্ছা ও প্রযত্ন অবশ্যই জন্মিতেছে, নচেৎ তাহাকে কর্ত্তাই বলা যায় না। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইলে, ভোক্তৃত্বও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, প্রভুর অধীন ভৃত্য প্রভুর আদেশানুসারে কোন সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করিলেও, তজ্জন্য ঐ ভৃত্যের কি কোন পুরস্কার ও তিরস্কার বা সমুচিত ফলভোগ হয় না? ভৃত্য যখন নিজে সেই কর্ম্ম করিয়াছে, এবং তাহার যখন রাগ-দ্বেষাদি আছে, তখন তাহার ঐ কর্ম্মজন্য ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু, সেখানে প্রযোজক সেই প্রভুরও রাগ-দ্বেষাদি থাকায়, তাঁহারও সেই কর্ম্মের প্রযোজকতাবশতঃ সমুচিত ফলভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইলেও, তিনি রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ কাহাকে সুখী করিবার জন্য সাধু কর্ম্ম এবং কাহাকে দুঃখী করিবার জন্য অসাধু কর্ম্ম করান না। তাঁহার মিথ্যা জ্ঞান না থাকায়, রাগ-দ্বেষাদি নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সমান। তিনি বলিয়াছেন, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"। সুতরাং তিনি জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই ঐ কর্ম্মের ফলভোগ সম্পাদনের জন্য জীবকে অন্য কর্ম্ম করাইতেছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি হইতে পারে না। সংসার অনাদি, সুতরাং জীবের অনাদি কর্ম্মপরম্পরা গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব

১। ননু কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বমেব জীবস্য পরায়ত্তে কর্ত্তৃত্বে নোপপদ্যতে, নৈষ দোষঃ, পরায়ত্তেঽপি হি কর্ত্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ। কুর্ব্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি। অপিচ পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যেদানীং কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যেত্যনবদ্যং। —শারীরক-ভাষ্য।

কর্ম্মানুসারেই জীবকে কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহা বুঝিলে, পূর্ব্বোক্ত আপত্তি নিরস্ত হইয়া যায়। "ভামতী"-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকার শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রবলতর বায়ুর ন্যায় জীবকে একেবারে সর্ব্বথা অধীন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না, কিন্তু জীবের সেই সেই কর্ম্মে রাগাদি উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারাই জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তখন জীবের নিজের কর্তৃত্বাদিবোধও জন্মে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব অবশ্যই আছে, এজন্য ইষ্টপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহারে ইচ্ছুক জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ সার্থক হয়। ফলকথা, ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবেরই কর্তৃত্ব, স্বতন্ত্র জীবের কর্তৃত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে শেষে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি"—ইত্যাদি শ্রুতির সহিত মহাভারতের "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়ং" [১] ইত্যাদি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, যে সময়ে কোন জীবেরই শরীরাদি সম্বন্ধরূপ জন্মই হয় নাই, সেই সময়ে কোন জীবেরই কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায়, সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি জীবের বিচিত্র কর্ম্মজন্য হইতেই পারে না, সুতরাং ঈশ্বর যে, জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়াও কেবল স্বেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি সমানই হইবে। উহা বিষম হইতে পারে না। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণ নিজেই এই আপত্তির সমর্থনপূর্ব্বক উহার সমাধান করিতে বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মা বিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ।২।১।৩৫। অর্থাৎ জীবের সংসার অনাদি, সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। যে সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কোন দিনই সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টি নাই। প্রলয়ের পরে যে আবার নূতন সৃষ্টি হয়, ঐ সৃষ্টিকেই প্রথম সৃষ্টি বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সৃষ্টির পূর্ব্বেও আরও অসংখ্যবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বেই সমস্ত জীবেরই জন্ম ও কর্ম্ম থাকায়, ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই জীবের বিচিত্র কর্ম্মানুসারে হইয়াছে,ইহা বলা যাইতে পারে। প্রলয়ের পরে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে (যাহা প্রথম সৃষ্টি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত), ঐ সৃষ্টিও জীবের পূর্ব্বজন্মের বিচিত্র কর্ম্মজন্য। অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে সংসারী জীবগণ যেসমস্ত বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ও সেই নূতন সৃষ্টির সহকারী কারণ। ঈশ্বর ঐ সহকারী কারণকে অপেক্ষা করিয়াই বিষমসৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে তিনি ঐ ধর্ম্মা-ধর্ম্মকেও কারণরূপে গ্রহণ করেন। তাই তাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর জীবের বিচিত্র কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া, কেবল নিজেই সৃষ্টির কারণ হইলে, যখন সৃষ্টির বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে না, তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিতেই জীবের বিচিত্র ধর্ম্মা-ধর্ম্মকে সহকারী কারণরূপে অবলম্বন করেন, সুতরাং জীবের সংসার অনাদি, এই সিদ্ধান্ত

১। "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা ॥
—মহাভারত, বনপর্ব্ব—৩০ অ°।

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান্ বাদরায়ণ পরে "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ"— এই সূত্রের দ্বারা সংসারের অনাদিত্ববিষয়ে যুক্তি এবং শাস্ত্রপ্রমাণ আছে বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সংসার সাদি হইলে, অকস্মাৎ সংসারের উদ্ভব হওয়ায়, মুক্ত জীবেরও পুনর্ব্বার সংসারের উদ্ভব হইতে পারে এবং কর্ম্ম না করিয়াও, প্রথম সৃষ্টিতে জীবের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কারণ, তখন ঐ সুখ-দুঃখাদির বৈষম্যের আর কোন হেতু নাই। জীবের কর্ম্ম ব্যতীত তাহার শরীর সৃষ্টি হয় না, শরীর ব্যতীতও কর্ম্ম করিতে পারে না, এজন্য অন্যোন্যাশ্রয় দোষও এইরূপ স্থলে হয় না। কারণ, যেমন বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হইতে পারে না এবং অঙ্কুর না হইলেও, বৃক্ষের উৎপত্তি অসম্ভব হওয়ায়, বীজ জন্মিতে পারে না, এজন্য বীজের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা ও ঐ অঙ্কুরের পূর্ব্বেও বীজের সত্তা স্বীকার্য্য, তদ্রূপ জীবের কর্ম্ম ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না এবং সৃষ্টি না হইলেও জীব কর্ম্ম করিতে পারে না, এজন্য সৃষ্টিও কর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকার্য্য। জীবের সংসার অনাদি হইলে, ঐরূপ কার্য্য-কারণ-ভাব সম্ভব হইতে পারে এবং সমস্ত সৃষ্টিই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য হইতে পারায়, সমস্ত সৃষ্টিরই বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে জীবের সংসারের অনাদিত্ববিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রকাশ করিতে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এই শ্রুতি (ঋগ্‌বেদসংহিতা, ১০।১৯০।৩) এবং "ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" এই ভগবদ্গীতা (১৫।৩)-বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ জীবের সংসার বা সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা বেদ এবং বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং এই সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের উপরেই বেদমূলক সমস্ত সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা নিত্য হইলে, ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করা যায় না, জীবাত্মার সংসারের অনাদিত্ব অসম্ভবও বলা যায় না। কোন পদার্থই অনাদি হইতে পারে না, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, যিনি ঐ কথা বলিবেন, তাঁহার নিজের বর্ত্তমান শরীরাদির অভাব কতদিন হইতেছিল, ইহা বলিতে হইলে, উহা অনাদি—ইহাই বলিতে হইবে। তাঁহার ঐ শরীরাদির প্রাগভাব (উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন অভাব) যেমন অনাদি, তদ্রূপ তাঁহার সংসারও অনাদি হইতে পারে। অভাবের ন্যায় ভাবও অনাদি হইতে পারে। মহর্ষি গোতমও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে আত্মার সংসারের অনাদিত্বও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মার শরীরাদি সৃষ্টি আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য, ইহা সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মার সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু, ঐ প্রকরণের দ্বারা জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্যই বিচিত্র শরীরাদির সৃষ্টি সমর্থন করায়, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই জগতের সৃষ্টি করেন, তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ, সুতরাং তাঁহার বৈষম্যাদি দোষের সম্ভাবনা নাই, ইহাও সূচিত হইয়াছে।

মীমাংসক-সম্প্রদায় বিশেষ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জীবের কর্ম্মই জগতের নিমিত্তকারণ। কর্ম্ম নিজেই ফল প্রসব করে, উহাতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর মানিয়া তাঁহাকে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ বলিলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না,—ঐরূপ ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজনও নাই, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। সাংখ্য-সম্প্রদায়-বিশেষও ঐরূপ নানা যুক্তির উল্লেখ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা জড়প্রকৃতিকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি দোষের কোন আশঙ্কাই নাই। কারণ, জড়পদার্থ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলে, তাহার পক্ষপাতাদি দোষ বলা যায় না। কিন্তু এই মতদ্বয় যুক্তি ও শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় উহা স্বীকার করেন নাই। কারণ, জীবের কর্ম্ম অথবা সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি, জড়পদার্থ বলিয়া, উহা কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য জন্মাইতে পারে না। চেতনের প্রেরণা ব্যতীত কোন জড়পদার্থ কোন কার্য্য জন্মাইয়াছে, ইহার নির্ব্বিবাদ দৃষ্টান্ত নাই। জীবকুলের অসংখ্য বিচিত্র অদৃষ্টের ফলে যে সৃষ্টি হইবে, তাহাতে ঐ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা কোন চেতন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। অসর্ব্বজ্ঞ জীব নিজেই তাহার অনাদি কালের সঞ্চিত অনন্ত অদৃষ্টের দ্রষ্টা হইতে না পারায়, অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না।

পরন্তু, সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবের শরীরাদি না থাকায়, তখন জীব তাহার অদৃষ্ট অথবা সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির প্রেরক হইতে পারে না। এইরূপ নানাযুক্তির দ্বারা নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, তাঁহাকেই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বরকেই ঐ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া, ঈশ্বরকেও সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। পরন্তু, নানা শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক নানা শাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতৃত্ব [১] বর্ণিত আছে। অনন্ত জীবের অনাদি-কালসঞ্চিত অনন্ত অদৃষ্টের মধ্যে কোন্ সময়ে, কোন স্থানে, কিরূপে কোন্ অদৃষ্টের কিরূপ ফল হইবে, ইত্যাদি সেই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জানেন, সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কেহই অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতা, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য এবং ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম এখানে এই শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও "ফলমত উপপত্তেঃ" এবং "শ্রুতত্বাচ্চ"—৩।২।৩৮।৩৯, এই দুই সূত্রের দ্বারা যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণের সূচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন। পরে "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব"—এই সূত্রের দ্বারা জৈমিনির মতের উল্লেখ করিয়া

১। "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ"।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। ৬।১১।

"একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"।—কঠ। ৫। ১৩।

"স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ"।—বৃহদারণ্যক।৪।৪।২৪।

—"পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" (৩।২।৪১)—এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতা, এই মতই শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া, তাঁহার নিজের সম্মত ইহা প্রকাশ করিয়া জৈমিনির মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রে বাদরায়ণের "হেতু-ব্যপ দশাৎ"—এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মের কারয়িতা এবং উহার ফলবিধাতা হেতু বলিয়া ব্যপদিষ্ট (কথিত) হইয়াছেন। সুতরাং জীবের কর্ম্ম নিজেই ফলপ্রসূ, ঈশ্বর ঐ কর্ম্মফলের হেতু নহেন, এই জৈমিনির মত শ্রুতিসিদ্ধ নহে, পরন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ। তাই বাদরায়ণ ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। বাদরায়ণের পূর্ব্বোক্ত নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শঙ্কর শেষে ভগবদ্গীতার "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি" (৭।২১) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" টীকায় বাদরায়ণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তির দ্বারা অতিসুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণের "হেতুব্যপ-দেশাৎ"—এই বাক্যের ন্যায় এই সূত্রে মহর্ষি গোতমের "তৎকারিতত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরকারিত, ঈশ্বরই জীবের সমস্ত কর্ম্মের কারয়িতা এবং উহার ফলবিধাতা, ইহা বুঝিলে মহর্ষি গোতমও ঐ বাক্যের দ্বারা জীবের কর্ম্ম ঈশ্বরকে অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ফল প্রসব করে, এই মতের অপ্রামাণিকতা সূচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। মূলকথা, যে ভাবেই হউক, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে এই প্রকরণের দ্বারা মহর্ষি কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, এই সুপ্রাচীন মতের খণ্ডন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, কেবল কর্ম্ম অথবা কেবল ঈশ্বরও জগতের নিমিত্তকারণ নহেন, কর্ম্ম ও ঈশ্বর পরস্পর সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের যে, পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি হয় না, ইহাও সমর্থিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম এখানে প্রসঙ্গতঃ জগতের নিমিত্ত-কারণরূপে ঈশ্বরসিদ্ধির জন্যই পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহা অপর নৈয়ায়িকগণ বলেন। তাঁহাদিগের মতে মহর্ষি প্রথমে "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর কার্য্যমাত্রের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বাক্যের দ্বারা কোন মতান্তর বা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করেন নাই। কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা ব্যতীত কোন কার্য্য জন্মে না, ইহা ঘটাদি কার্য্য দেখিয়া নিশ্চয় করা যায়। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে যে "দ্ব্যণুক" প্রভৃতি কার্য্য জন্মিয়াছে, তাহারও অবশ্য কর্ত্তা আছে, এইরূপ বহু অনুমানের দ্বারা জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়। সুতরাং "ঈশ্বরঃ কারণং", অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের কর্ত্তারূপ নিমিত্তকারণ। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, জীবই জগতের নিমিত্তকারণ হইবে, জীবই সৃষ্টির প্রথমে দ্ব্যণুকের কর্ত্তা; ঈশ্বর-স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, এজন্য মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য সূত্রশেষে বলিয়াছেন, "পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন

নিষ্ফল কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়, তখন জীবের অজ্ঞতা সর্ব্বসিদ্ধ, সুতরাং জীব "দ্ব্যণুকে"র নিমিত্ত-কারণ হইতেই পারে না। কারণ, যে ব্যক্তির কার্য্যের উপাদানকারণ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই ঐ কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে। দ্ব্যণুকের উপাদানকারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণু, তদ্বিষয়ে জীবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায়, "দ্ব্যণুকে"র কর্তৃত্ব জীবের পক্ষে অসম্ভব। প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট ব্যতীত যখন কোন ফলনিষ্পত্তি (কার্য্যোৎপত্তি) হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারা জীবগণকেই "দ্ব্যণুকা"দি কার্য্যমাত্রের কর্ত্তা বলা যায়। সুতরাং কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, এইরূপ অনুমানের দ্বারা জীব ভিন্ন ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। মহর্ষি "ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষেরই সূচনা করিয়া উহার খণ্ডন করিতে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"তৎকারিতত্বাদ-হেতুঃ"। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টও "তৎকারিত" অর্থাৎ ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত জীবের কর্ম্ম ও তজ্জন্য অদৃষ্টও জন্মিতে পারে না। পরন্তু, কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন পদার্থ কোন কার্য্যের কারণ হয় না। সুতরাং অচেতন অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে কোন চেতন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত আর কোন পুরুষই অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের জ্ঞাতা ও অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে যে হেতুর দ্বারা জীবেরই জগৎকর্তৃত্ব বলা হইয়াছে, উহা ঐ বিষয়ে হেতু হয় না। কারণ, অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা-রূপে যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে, তাঁহাকেই জগৎকর্ত্তা বলিতে হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নিজে এই প্রকরণের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই যে অনেক নৈয়ায়িক ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মহর্ষি গোতমের "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকর্তৃত্ব সমর্থন করিতে নানারূপ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বৃত্তিকারের কথার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। বৃত্তিকারের বহুপরবর্ত্তী "ন্যায়সূত্র-বিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও শেষে এই প্রকরণকে প্রসঙ্গতঃ ঈশ্বরসাধক বলিয়াই নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ন্যায় ব্যাখ্যান্তরও প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ জগতের উপাদান-কারণবিষয়ে যেমন সুপ্রাচীন কাল হইতে নানা বিপ্রতিপত্তি হইয়াছে, জগতের নিমিত্ত-কারণ-বিষয়েও তদ্রূপ নানা বিপ্রতিপত্তি হইয়াছে। উপনিষদেও ঐ বিপ্রতিপত্তির স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়[১]। সুতরাং মহর্ষি তাঁহার "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জগতের উপাদান-কারণ-বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এবং ঐ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিয়া, পরে "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জগতের নিমিত্তকারণ-বিষয়ে নিজ

১। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। —শ্বেতাশ্বতর।৬।১।

সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলে এই প্রকরণের সুসঙ্গতি হয়। কারণ, মহর্ষি পূর্ব্বে পরমাণু-সমূহকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সূচনা করায়, জগতের নিমিত্ত-কারণ কি? জগতের উপাদানকারণ পরমাণুসমূহের অধিষ্ঠাতা জগৎকর্ত্তা কোন চেতন পুরুষ আছেন কিনা? এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—ইত্যাদি প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তদুত্তরে মহর্ষি এই প্রকরণের প্রারম্ভে "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলে, তাঁহার বক্তব্যের ন্যূনতা থাকে না। সুতরাং মহর্ষি "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি প্রথম সূত্রের দ্বারা ঈশ্বর পরামাণুসমূহ ও জীবের অদৃষ্টসমূহের অধিষ্ঠাতা জগৎকর্ত্তা নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ সূত্রের দ্বারা তিনি কোন মতান্তর বা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করেন নাই, ইহা বুঝিলে পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সুসঙ্গতি হয়। কিন্তু ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক যে, এই সূত্রে মহর্ষির শেষোক্ত "পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য-বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া প্রথমোক্ত "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরই কারণ, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রকরণের অসঙ্গতি নাই। কারণ, ভাষ্যকার প্রভৃতির এই ব্যাখ্যা-পক্ষেও এই প্রকরণের দ্বারা পরে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষি পূর্ব্বে যে পরমাণুসমূহকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন, ঐ পরমাণুসমূহের অধিষ্ঠাতা জগতের নিমিত্ত কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরও সূচিত হইয়াছে। পরন্তু এই পক্ষে এই প্রকরণের দ্বারা জীবের কর্ম্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই অবৈদিক মতও খণ্ডিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি শেষসূত্রে "তৎকারিতত্বাৎ" এই বাক্য বলিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পরে জগতের নিমিত্তকারণ-বিষয়ে নানা বিপ্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়া, তন্মধ্যে ন্যায্য কি? —এই প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন,"ঈশ্বর ইতি ন্যায্যং"। পরে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎ-কর্ত্তৃত্ব সমর্থনপূর্ব্বক নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। মূলকথা, মহর্ষি গোতমের "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষসূত্রই হউক, আর সিদ্ধান্তসূত্রই হউক, উভয় পক্ষেই মহর্ষির এই প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদ নাই, ন্যায়দর্শনকার গোতম মুনি ঈশ্বর ও তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধান্তরূপে ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই, ইহা কোন মতেই বলা যায় না। তবে প্রশ্ন হয় যে, ঈশ্বর মহর্ষি গোতমের সম্মত পদার্থ হইলে, তিনি সর্ব্বপ্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ করিতে ঈশ্বরের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন নাই কেন? ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের ন্যায় ঈশ্বরের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা নাই কেন? এতদুত্তরে প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। (১ম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই

অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত কথার আলোচনা হইবে। এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইহাও বলা যায় যে, মহর্ষি গোতম, দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থ বলিতে প্রথম অধ্যায়ে "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ" ইত্যাদি (৯ম) সূত্রে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়কেই বলিয়াছেন। সুতরাং গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই আত্মত্বরূপে ঈশ্বরও কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ একই আত্মত্ব যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই উভয়েরই ধর্ম্ম, ঈশ্বরও যে আত্মজাতীয়, ইহা পরবর্ত্তী ভাষ্যে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের মতেও "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মাও ঈশ্বর, এই উভয়কেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় তাঁহারা যে গোতমোক্ত ঐ "আত্মন্" শব্দের দ্বারা কেবল জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় জীবাত্মা, ইহাই বুঝা যায়। তাঁহারা গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় আত্মার উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের নামও করেন নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি গোতমের আত্মার (১০ম) লক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যায় শেষে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রোক্ত বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়েরই লক্ষণ। সুতরাং তাঁহার মতে মহর্ষি উহার পূর্ব্বসূত্রে যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়কেই বলিয়াছেন, ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়কেই প্রকাশ করিয়া আত্মার লক্ষণ-সূত্রে ঐ উভয় আত্মারই লক্ষণ বলিলে, তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার পরীক্ষা করিয়া পরমাত্মা ঈশ্বরের কোনরূপ পরীক্ষা করেন নাই কেন? এতদুত্তরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের পক্ষে বলা যায় যে, মহর্ষি তাঁহার কথিত সমস্ত পদার্থেরই পরীক্ষা করেন নাই। যে সমস্ত পদার্থে অন্যের কোনরূপ সংশয় হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না। বিচারমাত্রই সংশয়পূর্ব্বক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে এ সকল কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বর-বিষয়ে সামান্যতঃ কাহারও কোনরূপ সংশয় নাই। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্যও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর-বিষয়ে কাহারও বিশেষ সংশয় জন্মিলে মহর্ষি গোতমের প্রদর্শিত পরীক্ষার প্রণালী অনুসরণ করিয়া পরীক্ষার দ্বারা ঐ সংশয় নিরাস করিতে হইবে। বৃত্তিকারের মতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "যত্র সংশয়স্তত্রৈবমুত্তরোত্তরপ্রসঙ্গঃ" (১।৭)—এই সূত্রের দ্বারা যে পদার্থে সংশয় হইবে, সেই পদার্থেই পূর্ব্বোক্তরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। এজন্যই মহর্ষি তাঁহার কথিত "প্রয়োজন", "দৃষ্টান্ত" ও "সিদ্ধান্ত" প্রভৃতি পদার্থের পরীক্ষা করেন নাই। পরন্তু ইহাও বলা যায় যে, মহর্ষি এখানে "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে এই প্রকরণের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ-বিশেষের নিরাস করিয়া যে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, উহাই তাঁহার পূর্ব্বকথিত ঈশ্বর নামক প্রমেয়-বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য-পরীক্ষা।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই প্রকরণের যে ব্যাখ্যান্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মহর্ষির অভিমত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলে এই প্রকরণের দ্বারা সরলভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকর্তৃত্বাদি সিদ্ধান্ত পরীক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর-বিষয়ে অন্যান্য কথা পরবর্তী ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। **গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্যাত্মকল্পাৎ[১] কল্পান্তরানুপপত্তিঃ।** অধর্ম্ম-মিথ্যাজ্ঞান-প্রমাদহান্যা ধর্ম্মজ্ঞান-সমাধি-সম্পদা চ বিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্য চ ধর্ম্মসমাধিফলমণিমাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যং। সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্ম্মঃ[২] প্রত্যাত্মবৃত্তীন্ ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয়ান্ পৃথিব্যাদীনি চ ভূতানি প্রবর্ত্তয়তি। এবঞ্চ স্বকৃতাভ্যাগমস্যালোপেন[৩] নির্ম্মাণ-প্রাকাম্যমীশ্বরস্য স্বকৃতকর্ম্মফলং বেদিতব্যং। **আপ্তকল্পশ্চায়ং।** যথা পিতাঽপত্যানাং তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাং। ন চাত্মকল্পাদন্যঃ কল্পঃ সম্ভবতি। ন তাবদস্য বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্ম্মো লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুং। আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতা ঈশ্বর ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্মলিঙ্গৈর্নিরুপাখ্যমীশ্বরং প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুং। স্বকৃতাভ্যাগমলোপেন[৪] প্রবর্ত্তমানস্যাস্য যদুক্তং প্রতিষেধজাতমকর্ম্মনিমিত্তে শরীরসর্গে তৎ সর্ব্বং প্রসজ্যেত ইতি।

অনুবাদ। গুণবিশিষ্ট আত্মান্তর অর্থাৎ আত্মবিশেষ পরমাত্মা ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে আত্ম-প্রকার হইতে অন্য প্রকারের উপপত্তি হয় না। অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদের অভাবের দ্বারা এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাধি ও সম্পদের দ্বারা বিশিষ্ট আত্মান্তর ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরেরই ধর্ম্ম ও সমাধির ফল অণিমাদি

১। "আত্মকল্পা"দিত্যত্র আত্মপ্রকারাদাত্মজাতীয়াদিতি যাবৎ। সংসারিভ্য আত্মভ্যো বিশেষমাহ—"অধর্ম্মে"তি।"—তাৎপর্য্যটীকা।

২। নন্বস্য কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবাৎ কুতো ধর্ম্মঃ ? তথা চাণিমাদিকমৈশ্বর্য্যং কার্য্যরূপং বিনৈব কর্ম্মণা, ইত্যকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ ইত্যত আহ—"সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্ম্ম ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

৩। প্রবর্ত্তয়তু কিমেতাবতা ইত্যত আহ—"এবঞ্চ স্বকৃতাভ্যাগমস্যালোপেনে"তি। মাভূদ্বাহ্যানুষ্ঠানং, সংকল্পলক্ষণানুষ্ঠানজনিতধর্ম্মফলমৈশ্বর্য্যং জগন্নির্ম্মাণফলমিতি নাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

৪। পুরুষৈর্যৎকর্ম্ম কৃতং তৎ ফলাভ্যাগমালোপেন প্রবর্ত্তমানস্য ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য * এই ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম্মই প্রত্যেক জীবস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মসমষ্টিকে এবং পৃথিব্যাদি ভুতবর্গকে (স্মৃষ্টির জন্য) প্রবৃত্ত করে। এইরূপ হইলেই নিজকৃত কর্ম্মের অভ্যাগমের (ফলপ্রাপ্তির) লোপ না হওয়ায়, অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার জন্য ঈশ্বরের নিজকৃত যে সংকল্পরূপ কর্ম্ম, তাহার ফলপ্রাপ্তির অভাব না হওয়ায়, "নির্ম্মাণ প্রাকাম্য" অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে জগন্নির্ম্মাণ ঈশ্বরের নিজকৃত কর্ম্মফল জানিবে। এবং এই ঈশ্বর "আপ্তকল্প" অর্থাৎ অতি বিশ্বস্ত আত্মীয়ের ন্যায় সর্ব্বজীবের নিঃস্বার্থ অনুগ্রাহক। যেমন সন্তানগণের সম্বন্ধে পিতা, তদ্রূপ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে ঈশ্বর পিতৃভূত অর্থাৎ পিতৃতুল্য। কিন্তু আত্মার প্রকার হইতে (ঈশ্বরের) অন্য প্রকার সম্ভব হয় না। (কারণ) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত এই ঈশ্বরের লিঙ্গভূত (অনুমাপক) কোন ধর্ম্ম উপপাদন করিতে পারা যায় না। আগম অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেও ঈশ্বর দ্রষ্টা, বোদ্ধা ও সর্ব্বজ্ঞ, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু আত্মার লিঙ্গ বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষিত (সুতরাং) প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম-প্রমাণের বিষয়াতীত ঈশ্বরকে অর্থাৎ নির্গুণ ঈশ্বরকে কে উপপাদন করিতে সমর্থ হয়? [অর্থাৎ ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে, তিনি প্রমাণসিদ্ধই হইতে পারেন না, সুতরাং ঈশ্বর বুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট আত্মবিশেষ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।)

* (১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) প্রাকাম্য, (৬) বশিত্ব, (৭) ঈশিত্ব, (৮) যত্রকামাবসায়িত্ব,—এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে কথিত আছে এবং ঐগুলি প্রযত্নবিশেষ বলিয়াও অনেকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়া যায়, মহান্ দেহকেও ঐরূপ সূক্ষ্ম করা যায়, তাহার নাম—(১) "অণিমা"। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে অতি গুরু দেহকেও এমন লঘু করা যায় যে, সূর্য্যকিরণ আশ্রয় করিয়াও উর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়, তাহার নাম—(২) লঘিমা। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে সূক্ষ্মকেও মহান্ করা যায়, তাহার নাম—(৩) মহিমা। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারাও চন্দ্রস্পর্শ করিতে পারে, তাহার নাম—(৪) প্রাপ্তি। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে জলের ন্যায় সমান ভূমিতেও নিমজ্জন করিতে পারে অর্থাৎ ডুব দিয়া উঠিতে পারে, তাহার নাম—(৫) প্রাকাম্য। "প্রাকাম্য" বলিতে ইচ্ছার অভিঘাত না হওয়া অর্থাৎ অব্যর্থ ইচ্ছা। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে ভূত ও ভৌতিক সমস্তই বশীভূত হয় এবং নিজে অপর কাহারও বশীভূত হয় না, তাহার নাম—(৬) বশিত্ব। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে ভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থেরই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সামর্থ্য জন্মে তাহার নাম—(৭) ঈশিত্ব। (৮) "যত্রকামাবসায়িত্ব" বলিতে সত্যসংকল্পতা। ঐ অষ্টম ঐশ্বর্য্যের ফলে যখন যেরূপ সংকল্প জন্মে, ভূতপ্রকৃতিসমূহের সেইরূপেই অবস্থান হয়। যোগদর্শন, বিভূতিপাদের ৪৫শ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তদনুসারেই "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে (২৩শ কারিকার টীকায়) শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগীদিগের "ভূত জয়" হইলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে ঈশ্বরের ঐ অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাধির ফল।

"স্বকৃতাভ্যাগমে"র (জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির) লোপ করিয়া অর্থাৎ জীবগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহকে অপেক্ষা না করিয়া (সৃষ্টিকার্য্যে) প্রবর্ত্তমান এই ঈশ্বরের সম্বন্ধে শরীরসৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক না হইলে, যে সমস্ত দোষ উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত দোষ প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বে পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুসমূহকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়া পরে, অভাবই জগতের উপাদানকারণ, এই মতের খণ্ডনের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্ব্বক এই প্রকরণের দ্বারা শেষে যে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন, তাঁহার মতে ঐ ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বর সগুণ, কি নির্গুণ? জীবাত্মা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় অথবা সজাতীয়? সজাতীয় হইলে জীবাত্মা হইতে ঈশ্বরের বিশেষ কি?—ইত্যাদি প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, গুণবিশিষ্ট আত্মান্তর ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বর সগুণ এবং আত্মজাতীয় অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও বিজাতীয় দ্রব্যান্তর নহেন, ঈশ্বরও আত্মবিশেষ। তাই তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও "পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ",—এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকে আত্মবিশেষই বলিয়াছেন। ঈশ্বর যে, আত্মান্তর অর্থাৎ আত্মবিশেষ, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে আত্মপ্রকার হইতে সেই ঈশ্বরের আর কোন প্রকারের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মজাতীয় ভিন্ন আর কোন পদার্থ, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সুতরাং ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় পুরুষ। তিনি জীবাত্মার সজাতীয় হইতে পারেন না। এজন্য ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে, "আত্মকল্প" (আত্মার প্রকার) হইতে ঈশ্বরের "অন্যকল্প" (অন্য প্রকার) সম্ভবই নহে। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ঈশ্বরই পরমাত্মা, তিনিও আত্মজাতীয় অর্থাৎ আত্মত্ববিশিষ্ট। একই আত্মত্ব জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দ্বিবিধ আত্মারই ধর্ম্ম। কারণ, আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতন হইতে পারে না। বুদ্ধি (জ্ঞান) যখন জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেরও বিশেষ গুণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঈশ্বরকেও আত্ম-বিশেষই বলিতে হইবে। ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য বলিয়া তিনি জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় হইতে পারেন না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের বুদ্ধ্যাদি গুণবত্তা-বশতঃ তিনিও আত্মজাতীয়। ঈশ্বরের বুদ্ধ্যাদি গুণের নিত্যতাবশতঃ তিনি জীবাত্মা হইতে বিজাতীয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে জলীয় ও তৈজস পরমাণুর রূপাদি নিত্য, তদ্ভিন্ন জল ও তেজের রূপাদি অনিত্য, সুতরাং জলীয় ও তৈজস পরমাণু জল ও তেজ হইতে বিজাতীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। অতএব গুণের নিত্যতা ও অনিত্যতা-প্রযুক্ত ঐ

গুণাশ্রয় দ্রব্যের বিভিন্ন জাতীয়তা সিদ্ধ হয় না। একই আত্মত্ব জাতি যে, জীবাত্মা ও ঈশ্বর —এই উভয়েই আছে ইহা "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরে ঐ আত্মত্ব জাতি স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের মতের উল্লেখ করিয়াও তিনি ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ, শ্রুতিতে বহুস্থানে জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা বুঝাইতেও কেবল "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ঈশ্বরে আত্মত্ব না থাকিলে, শ্রুতিতে ঐরূপ মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে না আত্মত্বরূপে জীবাত্মাও ঈশ্বর, এই উভয়ই "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হইলে, "আত্মন্" শব্দের দ্বারা ঐ দ্বিবিধ আত্মাই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ শ্লোকের "পরমাত্মনে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য শেষে বলিয়াছেন যে, "আত্মন্" শব্দ জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ চেতন, এই অর্থেরই বাচক। তিনি ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি স্বীকার করেন নাই, ঐ জাতি-বিষয়ে যুক্তিও দুর্লভ বলিয়াছেন। জ্ঞানবিশিষ্ট বা চেতনই "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হইলেও, ঈশ্বরও "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হইতে পারেন। কারণ, জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরও জ্ঞানবিশিষ্ট। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, মহর্ষি কণাদ নববিধ দ্রব্যের উদ্দেশ করিতে বৈশেষিক-দর্শনের পঞ্চম সূত্রে যে "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মহর্ষি গোতম দ্বাদশবিধ "প্রমেয়" পদার্থের উদ্দেশ করিতে ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের নবম সূত্রে যে, "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মাকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও কণাদসম্মত নববিধ দ্রব্যের উদ্দেশ করিতে "আত্মন্" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী" কার শ্রীধর ভট্ট লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব"—ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীধর ভট্টও যে বৈশেষিক-দর্শনে ঐ "আত্মন্"শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও ঈশ্বর— এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বরও কণাদের স্বীকৃত দ্রব্যপদার্থ। সুতরাং তিনি দ্রব্যপদার্থের বিভাগ করিতে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। মহর্ষি কণাদ ও গোতম "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়া জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়কে গ্রহণ করিলেও, আত্মবিচার-স্থলে জীবাত্মবিষয়েই সংশয়মূলক বিচারের কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া তাহাই করিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, প্রকৃত বিষয়ে এখানে ভাষ্যকারের কথা এই যে, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান যখন জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা ঈশ্বরেরও গুণ, তখন ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় পুরুষ নহেন, তিনিও আত্মজাতীয় বা আত্মবিশেষ। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও ঈশ্বরকে "পুরুষবিশেষ" বলিয়াছেন। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান যে, জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেরও গুণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য,— ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, যে বুদ্ধি ব্যতীত আর কোন পদার্থকেই ঈশ্বরের "লিঙ্গ" অর্থাৎ সাধক বা অনুমাপক বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জড়পদার্থ কখনও কোন চেতনের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যজনক হয় না। কুম্ভকারের

প্রযত্নাদি ব্যতীত কেবল মৃত্তিকাদি কারণ, ঘটের উৎপাদক হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। সুতরাং পরমাণু প্রভৃতি জড়পদার্থও অবশ্য কোন বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতন পদার্থের সাহায্যেই জগৎ সৃষ্টি করে, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবাত্মার দেহাদি না থাকায়, তাহার বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় এবং জীবাত্মার অসর্ব্বজ্ঞতা-বশতঃ জীবাত্মা পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ কোন আত্মবিশেষই পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ যেহেতু পরমাণু প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইয়াও জগতের কারণ, অতএব ঐ পরমাণু প্রভৃতি কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এইরূপ অনুমানের দ্বারা নিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ঐরূপ নিত্যবুদ্ধি স্বীকার না করিলে, কোন হেতুর দ্বারাই ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইলে, তাঁহার বুদ্ধি-রূপ গুণ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপেই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান নামক গুণ ঈশ্বরের লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়। তাই পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি ব্যতীত আর কোন পদার্থই ঈশ্বরের লিঙ্গ বা অনুমাপকরূপে উপপাদন করিতে পারা যায় না। অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানবান্ নহেন) ইহাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানবান্, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের যে প্রামাণ্য নাই, ইহা মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত। শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান যে, "ন্যায়াভাস," উহা ন্যায়ই নহে, তাহা ভাষ্যকারও প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্ট বলিয়াছেন। এজন্য ভাষ্যকার এখানে পরেই আবার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর দ্রষ্টা, বোদ্ধা, ও সর্ব্বজ্ঞাতা অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, ইহা শ্রুতির দ্বারাও সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, স বেত্তি বেদ্যং", এই (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর দ্রষ্টা, বোদ্ধা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় এবং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" এই (মুণ্ডক, ২।২।৭) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু বায়ুপুরাণে ঈশ্বরের যে ছয়টি অঙ্গ কথিত হইয়াছে[১] তন্মধ্যেও সর্ব্বজ্ঞতা এবং

১। বায়ুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে "বিদিত্বা সপ্তসূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরং" এই শ্লোকের পরেই ঈশ্বরের ষড়ঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্ব্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য"।—১২অঃ, ৩৩শ শ্লোক।

সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া অঙ্গের তুল্য হওয়ায়, অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র "প্রকাশ" টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং "বৌদ্ধাধিকারে"র টিপ্পনীতে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ঈশ্বরের বায়ুপুরাণোক্ত ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টীকায় ঈশ্বরের ষড়ঙ্গতা-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পরে দশাব্যয়তা-বিষয়েও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে"॥

অনাদিবুদ্ধি ঈশ্বরের অঙ্গ বলিয়া কথিত হওয়ায়, ঈশ্বর যে জ্ঞানবান্ জ্ঞানস্বরূপ নহেন, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু বায়ুপুরাণে ঈশ্বরে জ্ঞান প্রভৃতি দশটি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য পদার্থ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, ইহাও কথিত হওয়ায়, নিত্য জ্ঞান যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানবান্, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যোগদর্শনের সমাধিপাদের "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং"—এই (২৫শ) সূত্রের ভাষ্যটীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র বায়ুপুরাণের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের ষড়ঙ্গতা ও দশাব্যয়তা শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রের ভাষ্যেও "সর্ব্বজ্ঞ"-পদার্থের ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে, "যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তি-র্জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ"। অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, যাহা হইতে অধিক জ্ঞানবান্ আর কেহই নাই, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত অনুমান-প্রমাণ বা যুক্তির সাহায্যে আগম-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের যে জ্ঞানরূপ গুণবত্তা বা জ্ঞানাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শ্রুতিতে যেখানে ঈশ্বরকে "জ্ঞান" বলা হইয়াছে, সেখানে এই "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা জ্ঞাতা বা জ্ঞানাশ্রয়, এই অর্থই বুঝিতে হইবে এবং যেখানে "বিজ্ঞান" বলা হইয়াছে, সেখানে যাহার বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক যথার্থ জ্ঞান আছে, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। যেমন প্রমাতা অর্থেও "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, ঐ অর্থে ঈশ্বরকেও "প্রমাণ" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ এই অর্থেও শ্রুতিতে ঈশ্বরকে "জ্ঞান" ও "বিজ্ঞান" বলা হইতে পারে। "জ্ঞান" ও "বিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানবান্—এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রুতির "সর্ব্বজ্ঞ" ও "সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ—এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে না। কেহ বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে "জ্ঞান," "বিজ্ঞান" ও "আনন্দ" বলা হইয়াছে, ঐগুলি ব্রহ্মের নামই কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। সে যাহা হউক, মূলকথা জ্ঞান যে ঈশ্বরের গুণ, ইহা অনুমান ও আগম-প্রমাণসিদ্ধ, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য।

ভাষ্যকার শেষে আবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার সুদৃঢ় সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের দ্বারা যিনি "নিরুপাখ্য" অর্থাৎ উপাখ্যাত বা বিশেষিত নহেন, এমন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-প্রমাণের অতীত বিষয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারাই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতেই পারে না। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বরে কোন প্রমাণ না থাকায়, কোন ব্যক্তিই তাদৃশ ঈশ্বরকে উপপাদন করিতে পারেন না। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, এই তিনটি বিশেষ গুণ, যাহা আত্মার লিঙ্গ বা সাধক বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ তিনটি বিশেষ গুণ পরমাত্মা ঈশ্বরেরও লিঙ্গ। ঈশ্বরও যখন আত্ম-বিশেষ, এবং জড় পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা জগৎকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ, তখন তাহাতেও জীবাত্মার ন্যায় বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, এই তিনটি বিশেষ গুণ অবশ্য আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, আত্মলিঙ্গ ঐ তিনটি বিশেষ গুণের দ্বারা নিরুপাখ্য হইলে, অর্থাৎ ঈশ্বর ঐ গুণত্রয়ের

দ্বারা বস্তুতঃ উপাখ্যাত বা বিশেষিত নহেন, তিনি বস্তুতঃ নির্গুণ, ইহা বলিলে প্রমাণাভাবে ঐ ঈশ্বরের সিদ্ধিই হয় না। কারণ, তাদৃশ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও ঐরূপ ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়, উহার দ্বারা বুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হয়। আগম-প্রমাণের দ্বারাও বুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হওয়ায়, নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আগমের প্রতিপাদ্য নহেন। কারণ, একই ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—এই উভয়ই শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। ফলকথা, বুদ্ধ্যাদি গুণশূন্য ঈশ্বরে কোন প্রমাণ না থাকায়, যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে বুদ্ধ্যাদি গুণশূন্য বলিবেন, তাঁহার মতে ঈশ্বরের সিদ্ধিই হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য বুঝিতে ভাষ্যকারোক্ত "নিরুপাখ্য" এবং "প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীত" এই দুইটি শব্দের সার্থক্য বুঝা আবশ্যক। ঈশ্বর অনুমান-প্রমাণ বা তর্কের বিষয়ই নহেন, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য হইলে, ঐ দুইটি শব্দের কোন সার্থক্য থাকে না এবং ভাষ্যকার প্রথমে যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বুদ্ধ্যাদি-গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া পরে "আগমাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আগম প্রমাণ হইতেও ঐরূপ ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন, তাহা বিরুদ্ধ হয়। ভাষ্যকার "আগমাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে আগমের বিষয় বলিয়া পরেই আবার তাঁহাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত আগমেরও অবিষয় বলিবেন, ভাষ্যকারের ঐ কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই। তাৎপর্য্য-টীকাকারের কথার[১] দ্বারাও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যে ঈশ্বরকে অনুমান বা যুক্তির দ্বারা মনন করিতে হইবে, শ্রবণের পরে যাহার মননও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি যে, একেবারে অনুমান বা তর্কের বিষয়ই নহেন, ইহাই বা কিরূপে বলা যায়। ঈশ্বর শাস্ত্রবিরোধী বা বুদ্ধিমাত্র কল্পিত কেবল তর্কের বিষয় নহেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শেষে তর্কমাত্রেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিতে পারেন নাই। তিনিও বুদ্ধিমাত্র কল্পিত কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন।[২] কিন্তু নৈয়ায়িকগণও শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করেন না। তাঁহারাও এ বিষয়ে অনুকূল শাস্ত্রও প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে বেদ পৌরুষেয়, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ, নচেৎ আর কোনরূপেই তাঁহাদিগের মতে বেদের প্রামাণ্য সম্ভবই হয় না। সুতরাং তাঁহারা, ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রথমেই ঈশ্বরবাক্য বেদকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন

১। যদি চায়ং বুদ্ধ্যাদিগুণৈর্নোপাখ্যায়েত, প্রমাণাভাবাদনুপপন্ন এব স্যাদিত্যাহ, বুদ্ধ্যাদিভিশ্চেতি।
—তাৎপর্য্যটীকা।

২। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না। কারণ, ঈশ্বরসিদ্ধির পূর্ব্বে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া বেদকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যায় না। এই কারণেই নৈয়ায়িকগণ প্রথমে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ করিয়া, পরে ঐ সমস্ত অনুমান যে বেদবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ঈশ্বরসাধক সমস্ত তর্ক যে, কেবল বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত কুতর্ক নহে, ইহা প্রদর্শন করিতে উহার অনুকূল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে ঈশ্বরসাধক অনেক অনুমান প্রদর্শন ও বিচার দ্বারা উহার সমর্থনপূর্ব্বক শেষে শ্রুতির দ্বারা উহা সমর্থন করিতে "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ৩৩) শ্রুতির উল্লেখ করিয়া কিরূপে যে উহার দ্বারা তাঁহার প্রদর্শিত অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি শ্রুতির "মন্তব্যঃ"—এই বিধি অনুসারেই শ্রুতিসিদ্ধরূপেই ঈশ্বরের মনন নির্ব্বাহের জন্য ঈশ্বরবিষয়ে অনেকপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাধীন বুদ্ধি বা শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কের দ্বারা তিনি ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে যান নাই। কারণ, শাস্ত্রকে একেবারে অপেক্ষা না করিয়া অথবা শাস্ত্রবিরোধী কোন তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহা নৈয়য়িকেরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, কেবল শাস্ত্র দ্বারাও নির্ব্বিবাদে জগৎকর্ত্তা নিত্য ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না। তাহা হইলে সাংখ্য ও মীমাংসক-সম্প্রদায়বিশেষ সকলশাস্ত্রবিশ্বাসী হইয়াও জগৎকর্ত্তা নিত্যসর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে বিবাদ করিতে পারিতেন না। বেদনিষ্ণাত ভট্টকুমারিলের "শ্লোকবার্ত্তিকে" জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অপূর্ব্ব তীব্র প্রতিবাদের উদ্ভব হইত না। তাঁহারা জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সাধক বেদাদি শাস্ত্রের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের অতিদুর্ব্বোধ তাৎপর্য্যে যে সুচিরকাল হইতেই নানা মতভেদ হইয়াছে এবং উহা অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রকৃত বেদার্থ নির্দ্ধারণের জন্য জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর-বিষয়েও ন্যায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য। গোতমোক্ত ন্যায় প্রয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা যে তত্ত্ব নির্ণীত হইবে, তাহাই শ্রুতিসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতির ঐরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ন্যায়াচার্য্যগণ এইরূপেই সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ নির্ণীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেহ কোন তর্ককেই শাস্ত্রবিরোধী বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু একেবারে তর্ক পরিত্যাগ করিয়াও কেহ কোন শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ আস্তিকগণও বিবাদ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর যে, বস্তুতঃই বেদাদিশাস্ত্রসিদ্ধ, বেদাদি শাস্ত্রের ঐ বিষয়ে অন্যরূপ তাৎপর্য্য যে প্রকৃত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতেও নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরবিষয়ে বহু অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে জগৎকর্ত্তা নিত্য ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন এবং তিনি বুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট, নির্গুণ নহেন। ন্যায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার জ্ঞানাদি গুণবত্তা সমর্থন করায়, জীবাত্মার সজাতীয় ঈশ্বরও যে, তাঁহার মতে সগুণ, ইহা বুঝা যায়। বিশেষতঃ এই প্রকরণের শেষসূত্রে (তৎকারিতত্বাৎ"

এই বাক্যের দ্বারা) ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্ব ও জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত সূচনা করায়, তাঁহার মতে ঈশ্বর যে, বুদ্ধ্যাদি-গুণবিশিষ্ট, তিনি নির্গুণ নহেন, ইহাও বুঝা যায়।

অবশ্য সাংখ্য-সম্প্রদায় আত্মার নির্গুণত্বই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য তাহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। "নির্গুণত্বান্নচিদ্ধর্ম্মা" এই (১।১৪৬) সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে এবং উহার পরবর্ত্তিসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা উক্ত সাংখ্যমত সমর্থন করিয়াছেন। বেদাদি অনেক শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা যে আত্মার নির্গুণত্ব ও চৈতন্যস্বরূপত্বও বুঝা যায়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে, উপনিষদের বিচার করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও অসিদ্ধান্ত বলিয়া সহসা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার নির্গুণত্ব-পক্ষে যেমন শাস্ত্র ও যুক্তি আছে, সগুণত্ব-পক্ষেও ঐরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আছে। নির্গুণত্ববাদীরা যেমন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষের শাস্ত্রবাক্যের অনুরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া "আমি জানি," "আমি সুখী", "আমি দুঃখী" —ইত্যাদি প্রকার সার্ব্বজনীন প্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ আত্মার সগুণত্ববাদীরাও ঐ সমস্ত প্রতীতিকে ভ্রম না বলিয়া নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্রের অনুরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, জীবাত্মার জ্ঞানাদিগুণবত্তা যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ, এবং "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা" ইত্যাদি (প্রশ্ন উপনিষৎ)-শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তখন যে সকল শ্রুতিতে আত্মাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, মুমুক্ষু আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন। ঐ সমস্ত শ্রুতি ও তন্মূলক নানা শাস্ত্রবাক্যে আত্মবিষয়ক ধ্যান-বিশেষের প্রকারই কথিত হইয়াছে। জীবাত্মার অভিমান-নিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তার জন্যই এইরূপ ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার নির্গুণত্ব অবাস্তব আরোপিত,—সগুণত্বই বাস্তবতত্ত্ব। এইরূপ যে সমস্ত শ্রুতি ও তন্মূলক নানাশাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষু ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন। ব্রহ্মের সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বকামদাতৃত্ব এবং অন্যান্য গুণবত্তা চিন্তা করিলে, মুমুক্ষুর তাঁহার নিকটে ঐশ্বর্য্যাদি লাভে কামনা জন্মিতে পারে। সর্ব্বকামপ্রদ ঈশ্বরের নিকটে তাহার অভ্যুদয়লাভে কামনা উপস্থিত হইয়া তাহাকে যোগভ্রষ্ট করিতে পারে। তাহা হইলে মুমুক্ষুর নির্ব্বাণলাভ সুদূরপরাহত হয়! সুতরাং উচ্চাধিকারী মুমুক্ষু ব্রহ্মের বাস্তব গুণরাশি ভুলিয়া যাইয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াই ধ্যান করিবেন। ঐরূপ ধ্যান তাঁহার নির্ব্বাণলাভে সহায়তা করিবে। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ব্রহ্মের ঐরূপ ধ্যানের প্রকারই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সগুণত্বই সত্য, নির্গুণত্ব অবাস্তব হইলেও, উহা অধিকারিবিশেষের পক্ষে ধ্যেয়। নৈয়ায়িক মতে আত্মার নির্গুণত্বাদি-বোধক শাস্ত্রবাক্যের যে পূর্ব্বোক্তরূপই তাৎপর্য্য, ইহা "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন।[১]

১। "নিরঞ্জনাববোধার্থো ন চ সন্নপি তৎপরঃ" ।৩।১৭।

আত্মনো যন্নিরঞ্জনত্বং বিশেষগুণশূন্যত্বং তদ্ধ্যেয়মিত্যেবম্পরো ন ত্বকর্তৃত্ববোধনপর ইত্যর্থঃ।—প্রকাশটীকা।

সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও উদয়নাচার্য্যের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। আত্মার অন্যান্য রূপেও অরোপাত্মক ধ্যান বা উপাসনা-বিশেষ উপনিষদেও বহু স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও সেই সমস্ত উপাসনাকে অরোপাত্মক উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই রূপ নিগু‍র্ণত্বাদিরূপে আত্মোপাসনাই উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় নিগু‍র্ণ ব্রহ্মবাদ একেবারেই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে নিগু‍র্ণ ব্রহ্মবিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিশ্বাসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, নিগু‍র্ণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অতীত বিষয়, ঐরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কে উপপাদন করিতে পারে? অর্থাৎ ঈশ্বর নিগু‍র্ণ হইলে, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের সিদ্ধিই হয় না।

পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নিগু‍র্ণ বলিলেও, একেবারে সমস্ত গুণশূন্য বলা যাইতে পারে না। বৈশেষিক-শাস্ত্রোক্ত গুণকেই ঐ "গুণ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিলে সংখ্যা, পরিমাণ ও সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণ যে, আত্মাতে আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে এবং অন্যত্রও—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগু‍র্ণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ "নিগু‍র্ণ" শব্দের অন্তর্গত "গুণ" শব্দের অর্থ যে বিশেষগুণ—গুণমাত্র নহে, ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে, ঐ "গুণ" শব্দের দ্বারা বিশিষ্ট গুণবিশেষের ব্যাখ্যা করিয়া, আত্মার সগুণত্ববাদীরাও নিগু‍র্ণত্ব-বোধক শ্রুতির উপপত্তি করিতে পারেন। ঐ রূপ কোন ব্যাখ্যা করিলে নিগু‍র্ণত্ব ও সগুণত্ববোধক দ্বিবিধ শ্রুতির কোন বিরোধ থাকে না। নিগু‍র্ণ ব্রহ্মবাদের বিস্তৃতপ্রতিবাদ-কারী বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ নিগু‍র্ণত্ববোধক শ্রুতির সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় আচার্য্য রামানুজও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বুদ্ধ্যাদিগুণশূন্য হইতেই পারেন না। তাদৃশ ঈশ্বরে কোন প্রমাণ নাই। রামানুজ অন্যভাবে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত প্রমাণই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক। নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণের বিষয়ই হয় না। যাহাকে "নির্ব্বিকল্পক" প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, তাহাতেও সবিশেষ বস্তুই বিষয় হয়। সুতরাং প্রমাণাভাবে নিগু‍র্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতেই পারে না। শ্রুতি ও তন্মূলক নানা শাস্ত্রে ব্রহ্মের নিগু‍র্ণত্ববোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সমস্ত প্রাকৃত-হেয়গুণশূন্য। ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণশূন্য, ইহা ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নহে।[২] কারণ, পরব্রহ্ম বাসুদেব, অপ্রাকৃত অশেষকল্যাণগুণের আকর। তিনি সর্ব্বথা নিগু‍র্ণ হইতেই পারেন না। যে শাস্ত্র নানা স্থানে পরব্রহ্মের নানাগুণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই আবার তাঁহাকে সর্ব্বথা গুণশূন্য বলিতে পারেন

২। কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি। নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে—ইত্যাদি।

"নিগু‍র্ণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ"। ইত্যাদি।—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "রামানুজদর্শন"।

না। পরব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্রদ্বারা সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ, এইরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। রামানুজ নানা প্রমাণের দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, একই ব্রহ্ম দিব্য কল্যাণযোগে সগুণ, এবং প্রাকৃত হেয়গুণ-শূন্য বলিয়া নির্গুণ, এইরূপ বিষয়ভেদে একই ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং শঙ্করের ন্যায় সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দ্বৈবিধ্য কল্পনা সঙ্গত নহে।[১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ শ্রীভাষ্যে নৈয়ায়িকের ন্যায় বলিয়াছেন, "চেতনত্বং নাম চৈতন্যগুণযোগঃ। অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেবেতি"। অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণ-বত্তাই চেতনত্ব, চৈতন্যরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেই, চেতন বলা যায়। সুতরাং "তদৈক্ষত", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ কথিত হইয়াছে, যে ঈক্ষণ চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া উহা সাংখ্যসম্মত জড়-প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, বেদান্তদর্শনে "ঈক্ষতের্না শব্দং" এই সূত্রের দ্বারা সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতির জগৎকারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই ঈক্ষণরূপ গুণ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণ, ব্রহ্মে না থাকিলে, ব্রহ্মও সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির তুল্য অর্থাৎ জড় হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ; তিনি জ্ঞানস্বভাব, ইহাও নানা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ তদনুসারে ব্রহ্মকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, তাঁহারা ব্রহ্মের গুণবত্তাও সমর্থন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীও "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে রামানুজের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে,[২] যে সমস্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের উপাধি বা গুণের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণেরই প্রতিষেধ করিয়া "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি কল্যাণ-গুণবত্তাই কথিত হইয়াছে। এইরূপ "নির্গুণং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ও ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণ নিষেধেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণশূন্য, ধর্ম্মশূন্য হইলে তাহাতে নির্গুণব্রহ্মবাদীর নিজ সম্মত নিত্যত্ব ও বিভুত্বাদিও নাই বলিতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী "ভগবৎসন্দর্ভে"ও শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মের সগুণত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থক শাস্ত্রপ্রমাণও তিনি সেখানে প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের চতুর্থ পাদে বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—"তস্মাদপ্রাকৃতানন্তগুণরত্নাকরো হরিঃ সর্ব্ববেদবাচ্যঃ"। "নির্গুণচিন্মাত্রস্তু অলীকমেব"। মূলকথা, বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ ব্রহ্ম বা

১। "দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃতহেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদবর্ণনে-নৈকস্যৈবাগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্ব্বচনমিতি দিক্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

২। তথোপাধিপ্রতিষেধবাক্যে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যং" ইত্যাদৌ প্রাকৃতহেয়-গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বাদি কল্যাণগুণযোগো ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং" ইত্যাদিনা। "নির্গুণং নিরঞ্জনং" ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়ত্বমেব। সর্ব্বতো নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ সিসাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ।—সর্ব্বসংবাদিনী।

ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাঁহারাও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম অলীক, উহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের কথাও পাওয়া যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে ঈশ্বরকে "গুণবিশিষ্ট" বলিয়াছেন, ইহাতে অনেক সম্প্রদায়ের মতভেদ না থাকিলেও, ঈশ্বরে কি কি গুণ আছে, এ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতভেদ পাওয়া যায়। বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি গুণের মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, (সামান্য গুণ) এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন (বিশেষ গুণ)—এই অষ্ট গুণ ঈশ্বরে আছে, ইহা "তর্কামৃত" গ্রন্থে নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং "ভাষা-পরিচ্ছেদে" বিশ্বনাথ পঞ্চানন লিখিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট ইহা মতান্তর বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অপর প্রাচীন বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরে ইচ্ছা ও প্রযত্ন নাই, ঈশ্বরের জ্ঞানই তাঁহার অব্যাহত ক্রিয়া-শক্তি, তদ্দ্বারাই ইচ্ছা ও প্রযত্নের কার্য্য সিদ্ধি হয়। সুতরাং ইচ্ছা ও প্রযত্ন ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ছয়টি গুণ ঈশ্বরে আছে। ইহাও অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই শ্রীধর ভট্ট ঐ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে ষড়্‌গুণের আধার এবং জীবাত্মাকে চতুর্দ্দশ গুণের আধার বলিয়া প্রকাশ করায়, তাঁহার নিজের মতেও ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ("ন্যায়কন্দলী," কাশী-সংস্করণ, ১০ম পৃষ্ঠা ও ৫৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ কিন্তু "সৃষ্টি-সংহার-বিধি" (৪৮শ পৃষ্ঠা) বলিতে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহার-বিষয়ে ইচ্ছা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্টও ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তিরূপ ইচ্ছাও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্টের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ঈশ্বরকে "ষড়্‌গুণ" বলিয়া শেষে আবার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে অব্যাহত নিত্য বুদ্ধির ন্যায় অব্যাহত নিত্য ইচ্ছাও আছে। তিনি ঈশ্বরে "প্রযত্ন"গুণের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ সকলেই ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সমর্থন করিতে ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ক নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন সমর্থন করিয়াছেন [১]। তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন না থাকিলে, তিনি কর্ত্তা হইতে পারেন না। যিনি যে বিষয়ের কর্ত্তা, তদ্বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর জগতের কর্ত্তারূপে সিদ্ধ হইলে, তাঁহার সর্ব্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন সেই ঈশ্বরসাধক প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ যিনি শ্রুতিতে "সত্যকাম" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং শ্রুতি যাহাকে "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" বলিয়াছেন, তাঁহার যে, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন আছে, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। "কৃ" ধাতুর অর্থ কৃতি অর্থাৎ "প্রযত্ন" নামক গুণ। যিনি "কৃতিমান্" অর্থাৎ যাহার "প্রযত্ন"

১। বুদ্ধিবদিচ্ছা প্রযত্নাবপি তস্য নিত্যৌ সকর্ত্তৃকত্বসাধনান্তর্গতৌ বেদিতব্যৌ ইত্যাদি।—তাৎপর্য্যটীকা। সর্ব্বগোচরে জ্ঞানে সিদ্ধে চিকীর্ষা প্রযত্নয়োরপি তথাভাবঃ ইত্যাদি।—আত্মতত্ত্ববিবেক।

নামক গুণ আছে, তাঁহাকেই কর্ত্তা বলা যায়। প্রযত্নবান্ পুরুষই কর্তৃ-শব্দের মুখ্য অর্থ। ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন সমর্থন করিতে জয়ন্ত ভট্ট শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" এই শ্রুতিতে "কাম" শব্দের অর্থ ইচ্ছা, "সংকল্প" শব্দের অর্থ প্রযত্ন। ঈশ্বরের প্রযত্ন সংকল্পবিশেষাত্মক। জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াও, শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্তরালে জগতের স্থিতিকালে "এই কর্ম্ম হইতে এই পুরুষের এই ফল হউক" এইরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরের জন্মে। জয়ন্ত ভট্টের কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষের যে উৎপত্তিও হয়, ইহা বুঝা যায়। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্ট ও প্রশস্তপাদ বাক্যের "মহেশ্বরস্য সিসৃক্ষা সর্জ্জনেচ্ছা জায়তে" এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ঈশ্বরের যে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, যদিও যুগপৎ অসংখ্য কার্য্যোৎপত্তিতে ব্যাপ্রিয়মাণ ঈশ্বরেচ্ছা একই, তথাপি ঐ ইচ্ছা কদাচিৎ সংহারার্থ ও কদাচিৎ সৃষ্ট্যর্থ হয়। জয়ন্ত ভট্টও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্টের মত বুঝা যায় যে, ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলেও, উহার সৃষ্টি-সংহার প্রভৃতি কার্য্যবিষয়কত্ব নিত্য নহে, উহা কালবিশেষ-সাপেক্ষ। এই জন্যই শাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা ও সংহারবিষয়ক ইচ্ছার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হইলেও, উহা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়কত্ববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান নাই। ("ন্যায়কন্দলী," ৫২ পৃষ্ঠা ও "ন্যায়মঞ্জরী," ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জয়ন্ত ভট্ট ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় ঈশ্বরের ধর্ম্মও স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ঈশ্বরের নিত্যসুখও স্বীকার করিয়াছেন[১]। তিনি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর নিত্যসুখবিশিষ্ট, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ, পরন্তু তিনি উহার যুক্তিও বলিয়াছেন যে, যিনি সুখী নহেন, তাঁহার এতাদৃশ সৃষ্টিকার্য্যারম্ভের যোগ্যতাই থাকিতে পারে না। জয়ন্ত ভট্টের এই যুক্তি প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, উদয়নাচার্য্য ও গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ নিত্যসুখে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে আনন্দ শব্দের অর্থ সুখ নহে, উহার লাক্ষণিক অর্থ দুঃখাভাব, ইহাই তাঁহারা বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষভাগে মুক্তি-বিচারে নিত্যসুখে প্রমাণাভাব সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, "আনন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে "আনন্দ" শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগবশতঃ উহার দ্বারা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ, আনন্দস্বরূপ অর্থে "আনন্দ" শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ। সুতরাং "আনন্দং" এই বাক্যের দ্বারা আনন্দবিশিষ্ট এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও বাৎস্যায়নের ন্যায় নিত্যসুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়, তাঁহার মতেও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "আনন্দ" শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখাভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম আনন্দবিশিষ্ট অর্থাৎ দুঃখাভাববিশিষ্ট

১। ধর্ম্মস্তু ভূতানুগ্রহবতো বস্তুস্বাভাব্যাদ্ ভবন্ন বার্য্যতে, তস্য চ ফলং পরমার্থনিষ্পত্তিরেব। সুখন্তস্য নিত্যমেব, নিত্যানন্দত্বেনাগমাৎ প্রতীতেঃ। অসুখিতস্য চৈবম্বিধকার্য্যারম্ভযোগ্যতাঽভাবাৎ।—ন্যায়মঞ্জরী, ২০১ পৃষ্ঠা।

(সুখবিশিষ্ট নহেন) ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথানুসারে পরবর্ত্তী অনেক নব্যনৈয়ায়িকও ঐ শ্রুতির ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যে যে, "আনন্দ" শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগই আছে, ইহাও দেখা আবশ্যক। সুতরাং বৈদিক প্রয়োগে "আনন্দ" শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ দেখিয়া উহার দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ নহেন, ইহা সমর্থন করিতে "অসুখং" এইরূপ শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিতে আপত্তি করেন নাই। পরন্তু তিনি শেষে অদৃষ্ট-বিচার-স্থলে বিষ্ণুপ্রীতির ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বরে জন্যসুখ নাই, এই কথা বলায়, তিনি শেষে যে, ঈশ্বরে নিত্যসুখও স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। অর্থাৎ ঈশ্বর নিত্যসুখস্বরূপ নহেন, কিন্তু নিত্যসুখের আশ্রয়। "তর্কসংগ্রহ"-দীপিকার টীকাকার নীলকণ্ঠ নিজে পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, নব্যনৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরে নিত্যসুখ স্বীকার করিয়া, নিত্যসুখের আশ্রয়ত্বই ঈশ্বরের লক্ষণ বলিয়াছেন। "দিনকরী" প্রভৃতি কোন কোন টীকাগ্রন্থেও নব্যমত বলিয়া ঈশ্বরের নিত্যসুখের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই নব্যনৈয়ায়িকগণের পরিচয় ঐসকল গ্রন্থের টীকাকারও বলেন নাই। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে "অখণ্ডানন্দবোধায়" এই বাক্যের ন্যায়-মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে [1] নৈয়ায়িকগণ নিত্যসুখ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কোন নৈয়ায়িকই যেমন আত্মাকে জ্ঞান ও সুখস্বরূপ স্বীকার করেন না, তদ্রূপ নিত্যসুখও স্বীকার করেন না। কিন্তু গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট যে, পরমাত্মা ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিয়া, উহা সমর্থন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা রঘুনাথ শিরোমণি "নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মোক্ষ", এই ভট্ট মতের পরিষ্কার করায়, ঐ মতাবলম্বনেই তিনি এখানে পরমাত্মাকে "অখণ্ডানন্দবোধ" বলিয়াছেন। যাঁহা হইতে অর্থাৎ যাঁহার উপাসনার দ্বারা অখণ্ড আনন্দের বোধ অর্থাৎ নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ। বস্তুতঃ রঘুনাথ শিরোমণি "বৌদ্ধাধিকার-টিপ্পনী"তে (শেষে) নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মোক্ষ, এই মতের সমর্থন করিয়া ঐ মতের প্রকর্ষ-খ্যাপন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিজেও ঐ মত গ্রহণ করিলে, তাঁহার মতেও যে, আত্মার নিত্যসুখ আছে, উহা অপ্রামাণিক নহে, ইহা গদাধর ভট্টাচার্য্যেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি "বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনী"র শেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা জ্ঞান ও সুখস্বরূপ নহেন, কিন্তু পরমাত্মাতে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যসুখ আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত

১। অত্র নিত্যসুখজ্ঞানবতে নিত্যসুখজ্ঞানাত্মকায় ইতি বা ব্যাখ্যানং বেদান্তিনামেব শোভতে, ন তু নৈয়ায়িকানাং, তৈর্নিত্যসুখস্যাত্মনি জ্ঞানসুখাভেদস্য বাহনভ্যুপগমাৎ" ইত্যাদি।—গদাধর টীকা।

প্রকাশ করায়,[১] তিনি যে, ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিতেন—ঈশ্বরকে নিত্যসুখ-স্বরূপ বলিতেন না, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে এখানে ইহাও অবশ্য বক্তব্য এই যে, এখন অদ্বৈত-মতানুরাগী কেহ কেহ যে, রঘুনাথ শিরোমণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে "অখণ্ডানন্দবোধায়" এই বাক্য দেখিয়া নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিকেও অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া ঘোষণা করিতেছেন, উহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য কারণ, রঘুনাথ শিরোমণির নিজ সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহার কথিত "অখণ্ডানন্দবোধ" শব্দের দ্বার নিত্যানন্দ ও নিত্যবোধস্বরূপ—এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহাতে অখণ্ড (নিত্য) আনন্দ ও অখণ্ড জ্ঞান আছে, এইরূপ অর্থই বুঝা যাইতে পারে। রঘুনাথ শিরোমণি শেষে তাঁহার "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে ঈশ্বরের পরিমাণ-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া, উহা অস্বীকার করিয়াছেন এবং "পৃথকত্ব" গুণপদার্থই নহে, এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মূলকথা ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে, এ বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নানা মত-ভেদ হইয়াছে। ঈশ্বর সংখ্যা প্রভৃতি পাঁচটি সামান্য গুণ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন—এই তিনটি বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট, (মহেশ্বরেঽষ্টৌ) ইহাই এখন প্রচলিত মত। প্রাচীন নৈয়ায়িক-দিগের মধ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরের ধর্ম্মও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট ধর্ম্ম এবং নিত্যসুখও স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে নব্যনৈয়ায়িকদিগের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভাষ্যকার ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশ করিয়া, পরে ঐ ভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদ-শূন্য এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাধি ও সম্পদ্‌বিশিষ্ট আত্মান্তর। অর্থাৎ জীবাত্মার অধর্ম্ম, মিথ্যা-জ্ঞান ও প্রমাদ আছে, ঈশ্বরের ঐ সমস্ত কিছুই নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ঐ অধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম আছে, মিথ্যা-জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) আছে, এবং প্রমাদের বিপরীত সমাধি অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে একাগ্রতা বা অপ্রমাদ আছে। এবং সম্পৎ অর্থাৎ অণিমাদি সম্পত্তি (অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য) আছে। জীবাত্মার ঐ সম্পৎ নাই। ভাষ্যকার এখানে "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ' (শ্বেতাশ্বতর, ১।৯) এই শ্রুতি অনুসারেই ঈশ্বর জ্ঞ, জীব অজ্ঞ ; ঈশ্বর ঈশ, জীব অনীশ, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। পরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাধির ফল, এবং ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টসমষ্টি এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্ত করে। এইরূপ হইলেই ঈশ্বরের নিজকৃত কর্ম্মফলপ্রাপ্তির লোপ না হওয়ায়, "নির্ম্মাণপ্রাকাম্য"

১। জীবাত্মা তাবৎ সুখজ্ঞানবিরুদ্ধস্বভাবো জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নসুখদুঃখবান্ অনুভববলেন ধর্ম্মাধর্ম্মবাংশ্চ ন্যায়াগমাভ্যাং সিদ্ধঃ। তত্র চ বাধিতে মিথো বিরুদ্ধস্বভাবাভ্যাং জ্ঞানসুখাভ্যামভেদে ন শ্রুতেস্তাৎপর্য্যং। পরমাত্মনি তু সার্ব্বজ্ঞ্য-জগৎকর্ত্তৃত্বাদিশালিতয়া ন্যায়াগমাভ্যাং সিদ্ধে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদিকাঃ শ্রুতয়ো মুখ্যার্থাবাধান্নিত্যজ্ঞানানন্দং বোধয়ন্তি, তত্র চ ন বিপ্রতিপদ্যামহে" ইতি।—বৌদ্ধাধিকার-টিপ্পনী (শেষভাগ দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রে জগৎসৃষ্টি তাঁহার নিজকৃত কর্ম্মফল জানিবে। তৎপর্য্যটীকাকার এখানে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের কর্ম্মানুষ্ঠান না থাকায়, তাঁহার ধর্ম্ম হইতে পারে না এবং তাঁহার কর্ম্ম ব্যতীতও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য জন্মিলে, তাঁহার অকৃত কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তির আপত্তি হয়, এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসমষ্টি ও পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে প্রবৃত্ত করে। অর্থাৎ ঈশ্বরের বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকিলেও, সৃষ্টির পূর্ব্বে "সংকল্প"রূপ যে অনুষ্ঠান বা কর্ম্ম জন্মে, তজ্জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম-বিশেষ জন্মে, ঐ ধর্ম্ম-বিশেষের ফল—তাঁহার ঐশ্বর্য্য ; ঐ ঐশ্বর্য্যের ফল তাহার "নির্ম্মাণ-প্রাকাম্য", অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রে জগন্নির্ম্মাণ। এইরূপ হইলে ঈশ্বরের নিজকৃত কর্ম্ম এবং তজ্জন্য ধর্ম্ম ও তাহার ফলপ্রাপ্তি স্বীকৃত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাস হয়। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনিত্য ; কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য, কি অনিত্য, এই বিচারে উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে নিত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যোগভাষ্যের টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত "জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং আরও অনেক শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারাও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে নিত্য, ইহাই বুঝা যায়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য হইলে ভাষ্যকার যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয়, এজন্য উদ্দ্যোতকর প্রথমে ঐ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জনক নহে। কিন্তু সৃষ্টির সহকারি-কারণ সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টির প্রবর্ত্তক। সুতরাং ঈশ্বরের ধর্ম্ম ব্যর্থ নহে। উদ্দ্যোতকর শেষে নিজমত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষই হয় না। তৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ঈশ্বরের যে ধর্ম্ম আছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নিত্য, ঐ উভয় শক্তির দ্বারাই সমস্ত কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হওয়ায়, ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বীকার অনাবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নিত্য, সুতরাং তাঁহার ঐ শক্তিদ্বয়রূপ ঈশনা বা ঐশ্বর্য্য নিত্য, কিন্তু তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অনিত্য। ভাষ্যকার সেই অনিত্য ঐশ্বর্য্যকেই ঈশ্বরের ধর্ম্মের ফল বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভাষ্যকারের মতে ঈশ্বরের নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ ঐশ্বর্য্য আছে, অনিত্য ঐশ্বর্য্য কর্ম্মবিশেষজন্য ধর্ম্মবিশেষের ফল, ইহাই অন্যত্র দেখা যায়। কর্ম্মব্যতীত উহা উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা হইলে অকৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিরও আপত্তি হয়। তাই ভাষ্যকার ঈশ্বরের সেই অনিত্য ঐশ্বর্য্যের কারণরূপে তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের বাহ্যকর্ম্ম না থাকিলেও, "সংকল্প"রূপ কর্ম্মকে ঐ ধর্ম্মের কারণ বলিয়াছেন। ফল-কথা, ভাষ্যকার যখন ঈশ্বরের "সংকল্প"জন্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া, তাহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে ঐ ধর্ম্মের ফল বলিয়াছেন, তখন উদ্দ্যোতকর উহা স্বীকার না করিলেও, তাৎপর্য্যটীকাকারের পূর্ব্বোক্ত কথানুসারে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ মতই বুঝিতে হইবে, নচেৎ অন্য কোনরূপে

ভাষ্যকারের ঐ কথার উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকারের মতে ঈশ্বরের যে ধর্ম্ম জন্মে, উহা তাঁহার স্বর্গাদিজনক নহে, কিন্তু উহা তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের জনক হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টিও ভূতবর্গকে সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্ত করে। সুতরাং ঈশ্বরের স্বেচ্ছামাত্রে জগন্নির্ম্মাণ তাঁহার নিজকৃত কর্ম্মেরই ফল হওয়ায়, "অকৃতাভ্যাগম" দোষের আপত্তি হয় না।

এখানে ভাষ্যকারোক্ত "সংকল্প" শব্দের অর্থ কি, তাহা তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যক্ত করেন নাই। "সংকল্প" শব্দের ইচ্ছা অর্থগ্রহণ করিলে[১] উহার দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানবিশেষরূপ তপস্যাও বুঝা যাইতে পারে। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়, উপ° ২।৬) শ্রুতিতে যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ তিনি তপস্যা করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের এই তপস্যা কি? মুণ্ডক উপনিষৎ বলিয়াছেন—"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (১।১।৯) অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষই তাঁহার তপস্যা। শ্রীভাষ্যে রামানুজ—"স তপোঽতপ্যত" ইত্যাদি শ্রুতিতে "তপস্" শব্দের দ্বারা সিসৃক্ষু পরমেশ্বরের জগতের পূর্ব্বতন আকার পর্য্যালোচনারূপ জ্ঞানবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট জগতের আকারকে চিন্তা করিয়া সেইরূপ আকারবিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য[২]। এবং "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে রামানুজ বলিয়াছেন যে, "বহু স্যাং" এইরূপে সংকল্পরূপ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হন[৩]। "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ"—এই (২।৩) মনুবচনের ব্যাখ্যায় জীবের সর্ব্বক্রিয়ার মূল সংকল্প কি? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রার্থনা ও অধ্যবসায়ের পূর্ব্বোৎপন্ন পদার্থস্বরূপ-নিরূপণরূপ জ্ঞানবিশেষকেই "সংকল্প" বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে ঈশ্বরের জ্ঞানবিশেষকেও তাঁহার "সংকল্প" বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানে ঈশ্বরে জ্ঞানবিশেষরূপ তপস্যা ও "সঙ্কল্প" শব্দের দ্বারা বুঝিয়া ঐ "সংকল্প"-

---

১। ইচ্ছাবিশেষ অর্থে "সংকল্প" শব্দের প্রয়োগ বহু স্থানেই পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (৮।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং বেদান্তদর্শনে ঐ শ্রুতিবর্ণিত-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যায় "সংকল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ" (৪।৪।৮) এই সূত্রে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই অভিপ্রেত বুঝা যায়। "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি (১।৮) মনুবচনে সিসৃক্ষু পরমেশ্বরের যে অভিধ্যান কথিত হইয়াছে, উহাও যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষ, ইহা মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। প্রশস্তপাদ ভাষ্যে সৃষ্টিসংহারবিধির বর্ণনায় "মহেশ্বরস্যাভিধ্যানমাত্রাৎ" এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্টও বলিয়াছেন, "মহেশ্বরস্যাভিধ্যানমাত্রাৎ সংকল্পমাত্রাৎ"।

২। অত্র 'তপস্' শব্দেন প্রাচীনজগদাকারপর্য্যালোচনরূপং জ্ঞানমভিধীয়তে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। প্রাক্‌সৃষ্টং জগৎসংস্থানমালোচ্য ইদানীমপি তৎসংস্থানং জগদসৃজদিত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য। ১ম অঃ। ৪।২৭।

৩। "তপসা জ্ঞানেন" .. ... চীয়তে উপচীয়তে। "বহু স্যাং" ইতি সংকল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতীত্যর্থঃ—শ্রীভাষ্য।১।২।২৩।

জনিত ধর্ম্মবিশেষ সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান-কারণ ভূতবর্গের প্রবর্ত্তক বা প্রেরক হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করে, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এবং ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বর বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন, তিনি মুক্ত ও বদ্ধ হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার আত্মা, ইহাও বুঝা যায়। কারণ, ঈশ্বরের মিথ্যাজ্ঞান না থাকায়, তাঁহাকে বদ্ধ বলা যায় না, এবং তাঁহার কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও তজ্জন্য অণিমাদি ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহাকে মুক্তও বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাঁহার কোন কালেই বন্ধন নাই, তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। উদ্দ্যোতকরও ঈশ্বরকে মুক্ত ও বদ্ধ হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু যোগদর্শনের সমাধিপাদের ২৪শ সূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, এই সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে। আরও অনেক গ্রন্থে ঐ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, সাংখ্যসূত্রকার "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" (১। ৯৩) এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বর মুক্তও নহেন, বদ্ধও নহেন, সুতরাং তৃতীয় প্রকার সম্ভব না হওয়ায়, ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না, এই কথা বলিয়া যে ঈশ্বরের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ঈশ্বর মুক্ত ও বদ্ধ হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকারও হইতে পারেন; তিনি নিত্য-মুক্তও হইতে পারেন।

যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের একটি বিশেষ যুক্তি এই যে, ঐরূপ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোনই স্বার্থ বা প্রয়োজন না থাকায়, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায়, সৃষ্টিকর্ত্তৃস্বরূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই প্রয়োজন ব্যতীত কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন পূর্ণকাম ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত কিছুই না থাকায়, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কোন প্রয়োজনই সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজনাভাববশতঃ তাঁহার অকর্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"আপ্তকল্পশ্চায়ং"। "আপ্ত" শব্দের অর্থ এখানে বিশ্বস্ত বা সুহৃৎ।[১] ঈশ্বর "আপ্তকল্প" অর্থাৎ বিশ্বস্ততুল্য। তাৎপর্য্য এই যে, আপ্ত ব্যক্তি (পিত্রাদি) যেমন নিজের স্বার্থকে অপেক্ষা না করিয়াও, কেবল অপরের (পুত্রাদির) অনুগ্রহের জন্যই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তদ্রূপ ঈশ্বরও নিজের কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও, কেবল জীবগণের অনুগ্রহার্থ জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ভাষ্যকার তাঁহার এই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেই পরে ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন অপত্যগণের সম্বন্ধে পিতা, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বজীবের সম্বন্ধে পিতৃসদৃশ। ভাষ্যে "পিতৃভূত" এই বাক্যে "ভূত" শব্দের অর্থ সদৃশ।[২] অর্থাৎ পিতা যেমন তাঁহার অপত্যগণের সম্বন্ধে আপ্ত, অর্থাৎ অতিবিশ্বস্ত বা পরমসুহৃৎ, তিনি নিজের

১। "ব্রীড়ানতৈরাপ্তজনোপনীতঃ"—ইত্যাদি (কিরাতার্জ্জুনীয়, ৩।৪২শ)—শ্লোকে "আপ্ত" শব্দের বিশ্বস্ত অর্থই প্রাচীন ব্যাখ্যাকার-সম্মত বুঝা যায়।

২। "ভূত" শব্দ, সদৃশ অর্থে ত্রিলিঙ্গ। "যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু"।—অমরকোষ নানার্থবর্গ। ৭১। "বিতানভূতং বিততং পৃথিব্যাং"—কিরাতার্জ্জুনীয়। ৩,৪২॥

স্বার্থের জন্য অপত্যগণকে প্রতারণা করেন না,—নিঃস্বার্থভাবে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্যই অনেক কার্য্য করেন, তদ্রূপ জগৎপিতা পরমেশ্বরও সর্ব্বজীবের সম্বন্ধে আপ্ত, সুতরাং তিনি নিজের স্বার্থ না থাকিলেও, সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য করুণাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারাও এখানে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে সর্ব্বজীবের প্রতি অনুগ্রহই প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনাভাববশতঃ তাঁহার অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আপত্তি হয় যে, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের প্রতি করুণাবশতঃই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কেবল সুখীই সৃষ্টি করিতেন; দুঃখী সৃষ্টি করিতেন না। অর্থাৎ তিনি জগতে দুঃখের সৃষ্টি করিতেন না। কারণ, যিনি পরমকারুণিক, তাঁহার দুঃখপ্রদানে সামর্থ্যসত্ত্বেও তিনি কাহাকেও দুঃখ প্রদান করেন না। নচেৎ তাঁহাকে পরমকারুণিক বলা যায় না। ঈশ্বর জীবের সুখজনক ধর্ম্ম ও দুঃখজনক অধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারেই জীবের সুখদুঃখের সৃষ্টি করেন, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষ। তাই ঐ কর্ম্মফলের বৈচিত্র্য-বশতঃই সৃষ্টির বৈচিত্র্য হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত সমাধানও এখানে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ঐ সিদ্ধান্তে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহের অধিষ্ঠাতা,—তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখরূপ ফলজনক হয় না, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্ব্বজীবের প্রতি করুণাবশতঃই সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজীবের দুঃখজনক অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করিবেন কেন? তিনি উহাতে অধিষ্ঠান করিলেই যখন জীবের দুঃখের উৎপত্তি অবশ্যই হইবে, তখন তিনি উহাতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন না। কারণ, যিনি পরমকারুণিক, তিনি কাহারও কিছুমাত্র দুঃখের সৃষ্টির জন্য কিছু করেন না। নচেৎ তাঁহাকে পরমকারুণিক বা করুণাময় বলা যায় না। ভাষ্যকার এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের স্বকৃত কর্ম্মফলপ্রাপ্তির লোপ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, "শরীরসৃষ্টি জীবের কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই মতে যেসমস্ত দোষ বলিয়াছি, সেই সমস্ত দোষের প্রসক্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরসৃষ্টি জীবের কর্ম্মনিমিত্তক নহে —এই নাস্তিক মতে মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ের শেষপ্রকরণে অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সেখানে শেষসূত্রে যে "অকৃতাভ্যাগম" দোষ বলিয়াছেন, উহা স্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও আগম-বিরোধ হয় বলিয়া, ভাষ্যকার সেখানে যথাক্রমে ঐ বিরোধত্রয় বুঝাইয়াছেন। (তৃতীয় অধ্যায়ের শেষসূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলপ্রাপ্তি লোপ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থাৎ ঈশ্বর করুণাবশতঃ জীবগণের অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান না করিয়া, কেবল স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তাহাতে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষবিরোধ প্রভৃতি দোষেরও প্রসক্তি হয়। তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিচিত্র শরীরের এবং বিবিধ দুঃখের উৎপত্তিও হইতে

পারে না. জীবগণের সুখের তারতম্যও হইতে পারে না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর পরমকারুণিক হইলেও, তিনি জীবগণের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের বিচিত্র ফলভোগ সম্পাদনের জন্য জীবগণের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মকেই সহ-কারি-কারণরূপে গ্রহণ করিয়া, তদনুসারেই বিশ্বসৃষ্টি করেন; তিনি কোন জীবেরই অবশ্য-ভোগ্য কর্ম্মফল-ভোগের লোপ করেন না। অবশ্য ঈশ্বর পরমকারুণিক হইলে, তিনি জীব-গণের দুঃখজনক অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করিবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর পরম-কারুণিক হইলেও, তিনি বস্তুর সামর্থ্য অন্যথা করিতে পারেন না। অতএব তিনি বস্তুস্বভাবকে অনুসরণ করতঃ জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, উভয়কেই সহকারি-কারণ-রূপে গ্রহণ করিয়া বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি জীবগণের অনাদিকালসঞ্চিত অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান না করিলে, ঐ অধর্ম্মসমূহের কোন দিন বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, উহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখভোগ সমাপ্ত হইলেই, উহা বিনষ্ট হইবে, ইহাই উহার স্বভাব। যে সমস্ত অধর্ম্ম ফলবিরোধী অর্থাৎ যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখের ভোগ হইলেই, উহা বিনষ্ট হইবে, সেই সমস্ত অধর্ম্ম, তাহার ফল প্রদান না করিয়া বিনষ্ট হইতে পারে না। ঐ সমস্ত অধর্ম্ম যখন জীবের কর্ম্মজন্য ভাবপদার্থ, তখন উহার কোন দিন বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের প্রভাবেও উহা অবিনাশী অর্থাৎ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর জীবগণের নিয়তি লঙ্ঘন না করিয়া, তাহা দিগের দুঃখজনক অধর্ম্মসমূহেও অধিষ্ঠান করেন, তিনি উহা করিতে বাধ্য। কারণ, তিনি বস্তুর সামর্থ্য বা স্বভাবের অন্যথা করিয়া সৃষ্টি করিলে, বিচিত্র সৃষ্টি হইতে পারে না। জীবের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ না হইলে "কৃতহানি" দোষও হয়।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও শেষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃই সৃষ্টি ও সংহার করেন। সকল জীবের সংসার অনাদি, সুতরাং অনাদি কাল হইতে সকল জীবই শুভ ও অশুভ নানা কর্ম্ম-জন্য নানা সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সুদৃঢ় নিগড়বদ্ধ হওয়ায়, মোক্ষ-নগরীর পুরদ্বারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অনাদিকাল হইতে জীবগণ অসংখ্য দুঃখভোগ করিতেছে। সুতরাং কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। কিন্তু জীবগণের পূর্ব্বকৃত প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ না হইলে, সেই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ক্ষয় হইতে পারে না। সুতরাং জীবের সেই কর্ম্মফলভোগ-নির্ব্বাহের জন্য পরমেশ্বর কৃপা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। কর্ম্মবিশেষের ফলভোগ-নির্ব্বাহের জন্য তিনি নরকাদি সৃষ্টিও করেন। এইরূপ সুদীর্ঘকাল নানা কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বিশ্বসংহারও করেন। সুতরাং এই সমস্তই তাঁহার কৃপামূলক। বস্তুতঃ জীবের সুখভোগের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-ভোগও সেই কৃপাময় পরমেশ্বরের কৃপামূলক। তিনি জীবগণের প্রতি কৃপাবশতঃই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করেন। অজ্ঞ মানব তাঁহার কৃপা বুঝিতে না পারিয়াই নানা কল্পনা করে।

বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও "সৃষ্টি-সংহার-বিধি"র বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, সংসারে নানাস্থানে পুনঃ পুনঃ নানাবিধ শরীরপরিগ্রহ করিয়া, নানাবিধ দুঃখপ্রাপ্ত সর্ব্বজীবের রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহারেচ্ছা জন্মে এবং পরে পুনর্ব্বার সর্ব্বজীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলভোগ-নির্ব্বাহের জন্য মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে। "ন্যায়কন্দলী-কার" শ্রীধরাচার্য্য সেখানে প্রশস্তপাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও, তিনি পরার্থেই সৃষ্টি করেন, তিনি জীবগণের কর্ম্মফল ভোগ-নির্ব্বাহের জন্যই বিশ্বসৃষ্টি করেন ; তিনি করুণাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, কেবল সুখময়ী সৃষ্টি করিতে পারেন না। কারণ, তিনি জীবগণের বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াই সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর যে জীবগণের অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করতঃ দুঃখের সৃষ্টি করেন, ইহাতে তাঁহার কারুণিকত্বেরও হানি হয় না। পরন্তু তাহাতে তাঁহার জীবগণের প্রতি করুণারই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, দুঃখভোগ ব্যতীত জীবের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বরের দুঃখসৃষ্টি অধিকারি-বিশেষের বৈরাগ্যজনন দ্বারা মোক্ষলাভের সহায় হওয়ায়, উহা তাঁহার জীবের প্রতি করুণারই পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ জীবগণ অনাদিকাল হইতে অনাদিকর্ম্মফল-ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য পুনঃ পুনঃ বিচিত্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। অনাদি পরমেশ্বরও জীবগণের অনাদি কর্ম্ম-ফলভোগ নির্ব্বাহের জন্য অনাদিকাল হইতে বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছেন। পরমেশ্বর অনাদি এবং সমস্ত জীবাত্মা ও তাহাদিগের সংসার ও কর্ম্মফল—ধর্ম্মাধর্ম্মও অনাদি। জীবাত্মার ধর্ম্মের ফল সুখ, এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ। জীবগণ অনাদিকাল হইতে ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে এবং শরীরবিশেষ পরিগ্রহ করিয়া শুভাশুভ নানাবিধ কর্ম্মও করিতেছে। তাহার ফলে শরীরবিশেষ লাভ করতঃ মোক্ষলাভে অধিকারী হইয়া, মোক্ষলাভের উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে, চিরকালের জন্য দুঃখবিমুক্ত হইবে। বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষলাভে অধিকারী হওয়া যায় না। সুতরাং সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ অসংখ্য দুঃখভোগ সম্পাদন করিয়া জীবের বৈরাগ্য-সম্পাদনের জন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই বিশ্বসৃষ্টি করেন, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর কিসের জন্য সৃষ্টি করেন ? তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন দুঃখ নাই, সুতরাং তাঁহার হেয় ও উপাদেয় কিছু না থাকায়, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই পূর্ব্ব-পক্ষের অবতারণা করিয়া "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে,ঈশ্বর ক্রীড়ার জন্য জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা এক সম্প্রদায় বলেন এবং ঈশ্বর বিভূতি-খ্যাপনের জন্য জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা অপর সম্প্রদায় বলেন। কিন্তু এই উভয় মতই অযুক্ত। কারণ, যাঁহারা ক্রীড়া ব্যতীত আনন্দলাভ করেন না, তাঁহারাই ক্রীড়ার জন্য আনন্দ ভোগ করিতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের দুঃখ আছে, তাঁহারাই সুখভোগের জন্য ক্রীড়া করেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কোন দুঃখ না থাকায়, তিনি সুখের জন্য ক্রীড়া

করিতে পারেন না। তিনি কোন প্রয়োজন ব্যতীতই ক্রীড়া করেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, একেবারে প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়া হইতে পারে না। এইরূপ বিভূতি-খ্যাপনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিভূতি-খ্যাপন করিয়া ঈশ্বরের কোনই উৎকর্ষলাভ হয় না। বিভূতি-খ্যাপন না করিলেও, তাঁহার কোন অপকর্ষ বা ন্যূনতা হয় না। সুতরাং তিনি বিভূতি-খ্যাপনের জন্য কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ফলকথা, বিভূতি-খ্যাপনও কোন প্রয়োজন ব্যতীত হইতে পারে না। আপ্তকাম পরমেশ্বরের যখন কিছুমাত্র স্বার্থ বা প্রয়োজন নাই, তখন তিনি বিভূতি-খ্যাপনের জন্যও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন কেন? উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "তৎস্বাভাব্যাৎ প্রবর্ত্তত ইত্যদুষ্টং"। অর্থাৎ ঈশ্বর ঐ প্রবৃত্তি-স্বভাবসম্পন্ন বলিয়াই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এই পক্ষ নির্দ্দোষ। যেমন ভূমি প্রভৃতি ধারণাদি-ক্রিয়া-স্বভাবসম্পন্ন বলিয়াই, ধারণাদি ক্রিয়া করে, তদ্রূপ ঈশ্বরও প্রবৃত্তিস্বভাব-সম্পন্ন বলিয়াই প্রবৃত্ত হন। প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব— স্বভাবের উপরে কোন অনুযোগ করা যায় না। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কিছুই প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব বলিয়াই, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যদি বল, প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব হইলে, কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, সতত প্রবৃত্তিই হইতে পারে। তাহা হইলে ক্রমিক সৃষ্টির উপপত্তি হয় না; অর্থাৎ সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, প্রবৃত্তি-স্বভাবসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সতত একরূপই আছেন। একরূপ কারণ হইতে কার্য্যভেদও হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন প্রকৃতির ন্যায় জড়পদার্থ নহেন, তিনি প্রবৃত্তিস্বভাব সম্পন্ন হইলেও, বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতনপদার্থ। সুতরাং তিনি তাঁহার কার্য্যে কারণান্তরসাপেক্ষ হওয়ায়, সতত প্রবৃত্ত হন না। অর্থাৎ তিনি প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন হইলেও, একই সময়ে সকল কার্য্যের সৃষ্টি করেন না। যখন যে কার্য্যে তাঁহার অপেক্ষিত সহকারী কারণগুলি উপস্থিত হয়, তখন তিনি সেই কার্য্য উৎপাদন করেন। সকল কার্য্যের সমস্ত কারণ যুগপৎ উপস্থিত হয় না, তাই যুগপৎ সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সৃষ্টিকার্য্যে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট-সমষ্টি ও উহার ফলভোগকাল প্রভৃতি অনেক কারণই অপেক্ষিত, সুতরাং ঐ সমস্ত কারণ যুগপৎ সম্ভব না হওয়ায়, যুগপৎ সকল কার্য্য জন্মিতে পারে না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমকল্পে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের স্বভাবই এই যে, তিনি কোন সময়ে বিশ্বের সৃষ্টি করেন, এবং কোন সময়ে বিশ্বের সংহার করেন। কালবিশেষে উদয় ও কাল-বিশেষে অস্তগমন যেমন সূর্য্যদেবের স্বভাব, এবং উহা জীবগণের কর্ম্মসাপেক্ষ, তদ্রূপ কাল-বিশেষে বিশ্বের সৃষ্টি ও কালবিশেষে বিশ্বের সংহার করাও পরমেশ্বরের স্বভাব এবং তাঁহার ঐ স্বভাবও জীবগণের কর্ম্মসাপেক্ষ। সুতরাং পরমেশ্বরের ঐরূপ স্বভাবের মূল কি? এইরূপ প্রশ্নও নিরুত্তর নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু অদ্বৈতমতাচার্য্য ভগবান্ গৌড়পাদ

স্বামীও "মাণ্ডূক্য-কারিকা"য় বলিয়াছেন যে, ১ এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ভোগের জন্য সৃষ্টি করেন, অপর সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা ঈশ্বরের স্বভাব; কারণ, তিনি আপ্তকাম, সুতরাং তাঁহার কোন স্পৃহা থাকিতে পারে না। ফলকথা, গৌড়পাদও স্পৃহা ব্যতীত ভোগ ও ক্রীড়া অসম্ভব বলিয়া জগৎসৃষ্টিকে ঈশ্বরের স্বভাবই বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে সৃষ্টিপ্রবৃত্তিই ঈশ্বরের স্বভাব। ঈশ্বর সেই স্বভাববশতঃই জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। গৌড়পাদ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মতেও সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর স্বার্থে অথবা পরার্থেও জগৎ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু সৃষ্টি তাঁহার স্বভাব। বিবর্ত্তবাদি-গৌড়পাদের মতে ঐ "স্বভাব" তাঁহার সম্মত মায়াই বুঝা যায়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোনরূপ প্রয়োজনই সম্ভব হয় না বলিয়া, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, এইরূপ মতও সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সুপ্রাচীন কাল হইতেই ঐ মতের সমর্থন ও নানা প্রকারে উহার খণ্ডনও হইয়াছে। তাই বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ"—(২।১।৩২) এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যং" (২।১।৩৩) এই সূত্রের দ্বারা উহার পরিহার করিয়াছেন। বাদরায়ণের ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও এই বিশ্বসৃষ্টি আমাদিগের পক্ষে অতি গুরুতর ব্যাপার বা অসাধ্য ব্যাপারের ন্যায়ই মনে হয়, তথাপি পরমেশ্বর অপরিমিতশক্তি বলিয়া, ইহা তাঁহার কেবল লীলা মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অনায়াসেই স্বেচ্ছামাত্রেই জগতের সৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। কারণ, কষ্টসাধ্য কার্য্যই কেহ প্রয়োজন ব্যতীত করেন না। কিন্তু যাঁহার যে কার্য্যে কিছুমাত্র কষ্ট বা পরিশ্রম নাই, এমন অনেক কার্য্য অনেক সময়ে অনেকে প্রয়োজন ব্যতীতও করিয়া থাকেন। "ভামতী"কার বাচস্পতি মিশ্র প্রথমে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্যই নিষ্প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোন প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায়, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোন প্রয়োজনের অনুসন্ধান ব্যতীতও অনেক সময়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের যাদৃচ্ছিক অনেক ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। সুতরাং জগতে নিষ্প্রয়োজন কার্য্যও আছে, ইহা স্বীকার্য্য। অন্যথা "ধর্ম্মসূত্র"কারদিগের "ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং" অর্থাৎ বৃথা চেষ্টা করিবে না, এই নিষেধ নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে। কারণ, বৃথা চেষ্টা অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য ক্রিয়া যদি অলীকই হয়, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মসূত্রে তাহার নিষেধ হইতে পারে না। এখানে বৈদান্তিকচূড়ামণি মহামনীষী অপ্যয়দীক্ষিত "বেদান্তকল্পতরু"র "পরিমল" টীকায় বলিয়াছেন যে, কাহারও সুখ হইলে, ঐ সুখের অনুভবপ্রযুক্ত নিষ্প্রয়োজন

১। ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা। —মাণ্ডূক্য-কারিকা। ১।৯।

হাস্য ও গানাদিরূপ ক্রিয়া দেখা যায়। সেখানে তাহার ঐ হাস্যাদি ক্রিয়ায় কিছুমাত্র প্রয়োজন সম্ভাবনা করা যায় না। দুঃখের উদ্রেক হইলে যেমন কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়াও রোদন করে, তদ্রূপ সুখের উদ্রেক হইলেও, কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়াই যে হাস্য-গানাদি করে, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এইজন্য ঐ হাস্য-রোদনাদি ক্রিয়ায় লোকে কারণই জিজ্ঞাসা করে, প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে না। অর্থাৎ কারণ ও প্রয়োজন সর্ব্বত্র এক পদার্থ নহে। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির কারণ আছে, কিন্তু প্রয়োজন নাই। অপ্যয়দীক্ষিত শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে ক্রীড়া বা লীলাবিশেষের প্রয়োজন, তাৎকালিক আনন্দ, সেই লীলা-বিশেষরূপ ক্রীড়াই "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে" ইত্যাদি [১] শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হাস্য ও গানাদির ন্যায় প্রয়োজনশূন্য যে "লীলা" বেদান্তসূত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা ঐ শ্রুতিতে "ক্রীড়া" শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ বেদান্তসূত্রোক্ত "লীলা" ও পূর্ব্বোক্ত "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে" এই শ্রুতিবাক্যোক্ত "ক্রীড়া" একপদার্থ নহে। কারণ, ঐ ক্রীড়ার প্রয়োজন তাৎকালিক আনন্দ,—কিন্তু বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যে তাঁহার লীলা বলা হইয়াছে, ঐ লীলার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং উক্ত শ্রুতি ও বেদান্তসূত্রে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে মধ্বাচার্য্যও বাদরায়ণের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে,[২] যেমন লোকে মত্ত ব্যক্তির সুখের উদ্রেকবশতঃই কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই, নৃত্যগীতাদি লীলা হয়, ঈশ্বরেরও এইরূপই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ারূপ লীলা হয়। মধ্বাচার্য্য ইহা অন্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতে "নারায়ণ-সংহিতা"র যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। "ভগবৎ-সন্দর্ভে" শ্রীজীব গোস্বামীও মধ্বাচার্য্যের উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য যে, ভগবানের লীলা, চেতন ও অচেতন—সর্ব্ববিধ সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের সেই লীলার উপকরণ, ইহা শ্রীভাষ্যে আচার্য্য

১। "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমিতি চাপরে। দেবস্যৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥"—এই শ্লোক অপ্যয়দীক্ষিত মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া বেদান্তসূত্রের সহিত উক্ত শ্রুতিবিরোধের পরিহার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যও উক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে এবং "ভগবৎ-সন্দর্ভে" শ্রীজীব গোস্বামীও "দেবস্যৈব (ষ) স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—এই বচন শ্রুতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কোন মাণ্ডুক্য উপনিষদের মধ্যে ঐরূপ শ্রুতি তাঁহারা পাইয়াছিলেন,ইহা বুঝা যায়। কিন্তু প্রচলিত মাণ্ডুক্য উপনিষদের মধ্যে ঐরূপ শ্রুতি পাওয়া যায় না। প্রচলিত "মাণ্ডুক্য-কারিকা" গৌড়পাদ-বিরচিত গ্রন্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে "ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে"—ইত্যাদি কারিকা পাওয়া যায়। সুধীগণ ইহার মূলানুসন্ধান করিবেন।

২। কিন্তু যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদিলীলা, ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া, এবমেবেশ্বরস্য। নারায়ণসংহিতায়াঞ্চ—"সৃষ্ট্যাদিকং হরিনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাদ্যথা মত্তস্য নর্ত্তনং॥ পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ। মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মনঃ॥"—ইতি, "দেবস্যৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি শ্রুতিঃ।"—মধ্বভাষ্য।

রামানুজও বলিয়াছেন [১] এবং ঋষি-বাক্যের দ্বারাও উহা সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তানুসারে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত পরিহার প্রকাশ করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রতিপাদক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, তাহা পরমার্থ-বিষয় নহে। কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতি অবিদ্যাকল্পিত নামরূপব্যবহার-বিষয়ক, এবং ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনেই উহার তাৎপর্য্য, ইহাও বিস্মৃত হইবে না। তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর হইতে জগতের সত্য সৃষ্টি হয় নাই। অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে সর্পের মিথ্যাসৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মে এই জগতের মিথ্যাসৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি ? এইরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। কারণ, যে অনাদি অবিদ্যা এই মিথ্যাসৃষ্টির মূল, উহা স্বভাবতঃই কার্য্যোন্মুখী, উহা নিজ কার্য্যে কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে যে সর্পের মিথ্যাসৃষ্টি হয়, এবং তজ্জন্য তখন ভয়-কম্পাদি জন্মে, তাহা যে কোনই প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। "ভামতী"কার-বাচস্পতি মিশ্র ইহা দৃষ্টান্তাদির দ্বারা সম্যক্ বুঝাইয়াছেন। অবশ্য সৃষ্টি অসত্য হইলে, তাহাতে কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না থাকায়, ঐ মতে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এবং ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষের আপত্তির সর্ব্বোত্তম খণ্ডন হয়, ইহা সত্য, কিন্তু বেদান্তসূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" এবং "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি"—ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা যে, সৃষ্টির সত্যতাই স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহাও চিন্তনীয়। "ভামতী"কার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র ইহা চিন্তা করিয়া লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করিয়াই অর্থাৎ সেই পক্ষেই বাদরায়ণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার নিজমতে সৃষ্টি সত্য নহে। কিন্তু যদি সৃষ্টির অসত্যতাই বাদরায়ণের নিজের প্রকৃত মত হয়, তাহা হইলে তিনি সেখানে নিজমতানুসারে পৃথক্ সূত্রের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত পরিহার বা চরম উত্তর কেন বলেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। তিনি সেখানে নিজের মত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার বিপরীত মত (সৃষ্টির সত্যতা) স্বীকার করিয়াই, তাঁহার কথিত পূর্ব্বপক্ষের পরিহার করিলে, তাঁহার নিজের মূলসিদ্ধান্তে যে অপরের সংশয় বা ভ্রম জন্মিতে পারে, ইহাও ত তাঁহার অজ্ঞাত নহে। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি আর কোন ভাষ্যকারই বেদান্তসূত্রের দ্বারা সৃষ্টির অসত্যতা (বিবর্ত্তবাদ) বুঝেন নাই। পরন্তু "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" (২।১২৪) ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা তাঁহারা পরিণামবাদেই বাদরায়ণের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন। পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। সে যাহাই হউক, পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত

১। সর্ব্বাণি চিদচিদ্বস্তুনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি স্থূলদশাপন্নানি চ পরস্য ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি, সৃষ্ট্যাদয়শ্চ লীলেতি ভগবদ্‌দ্বৈপায়নপরাশরাদিভিরুক্তং। "অব্যক্তাদিবিশেষান্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতং। ক্রীড়া হরেরিদং সর্ব্বং ক্ষরমিত্যুপধার্য্যতাং॥" "ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়"।—(বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১৮) "বালঃ ক্রীড়নকৈরিব"—(বায়ুপুরাণ, উত্তর, ৩৬।৯৬) ইত্যাদিভিঃ। বক্ষ্যতি চ "লোকবত্তু লীলাকৈবল্য"মিতি।—বেদান্ত-দর্শন, ১মঅ০. ৪র্থ পা০, ২৭শ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

সূত্রানুসারে বৈদান্তিক-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহার-ক্রিয়ার কোনরূপ প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। এবং উক্ত বিষয়ে উহাই প্রাচীন মত বলিয়া বুঝা যায়। এই মতে ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন নহে। প্রয়োজন ব্যতীতও অনেক সময়ে অনেক ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ও হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" টীকায় ইহা সমর্থন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"য় এখানে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "আপ্তকল্পশ্চায়ং" এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বর যে, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ অর্থাৎ পরার্থেই সৃষ্ট্যাদি করেন, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার গূঢ় কারণ এই যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে নিষ্প্রয়োজন কোন কর্ম্ম নাই। সর্ব্বকর্ম্মই সপ্রয়োজন, এই মতই তিনি পূর্ব্বে সমর্থন করিয়াছেন (১ম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও যে, কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না (প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে)—এই মতও প্রাচীনকাল হইতে সমর্থিত হইয়াছে। ভট্টকুমারিল প্রভৃতি যুক্তিনিপুণ মীমাংসকগণও ঐ মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে তিনি যে, পরার্থেই সৃষ্টি করেন, ইহাই বলিতে হইবে। পরন্তু সুধীগণের বিবেচনার জন্য এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, সৃষ্টি ও সংহারের ন্যায় ঈশ্বরের সমস্ত কর্ম্মই ত তাঁহার লীলা, সমস্ত কর্ম্মই ত তিনি অনায়াসেই করিতেছেন। সুতরাং লীলা বলিয়া যদি তাঁহার সৃষ্টি ও সংহারকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সমর্থন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মও নিষ্প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং" ইত্যাদি (২২) শ্লোকের দ্বারা ব্যাসদেব ঈশ্বর যে মানবের মঙ্গলের জন্যই কর্ম্ম করেন, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। যোগদর্শন-ভাষ্যেও (সমাধিপাদ, ২৫শ সূত্রভাষ্যে) ঈশ্বরের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, ভূতানুগ্রহই প্রয়োজন, ইহা কথিত হইয়াছে। সমস্তই ঈশ্বরের লীলা বলিয়া উহার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতে পারিলে, ঐরূপ প্রয়োজন-বর্ণনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং শাস্ত্রে যে স্থানে ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই, ইহা বলা হইয়াছে, সেখানে ঈশ্বরের নিজের কোন স্বার্থ নাই, এইরূপ তাৎপর্য্যও আমরা বুঝিতে পারি। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" এই বাক্যের দ্বারাও আপ্তকামত্ববশতঃ তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ না থাকায়, তদ্বিষয়ে স্পৃহা হইতে পারে না, এইরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। ঈশ্বর পরার্থেও সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার পরার্থবিষয়েও স্পৃহা নাই—ইহা ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ, করুণাময় পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ করুণাই ত তাঁহার পরার্থে স্পৃহা, তাহা ত অস্বীকার করা যাইবে না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবানের অবতারের যে প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে [১], তাহার ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "ষট্‌সন্দর্ভে"র অন্তর্গত "ভগবৎ-সন্দর্ভে"

১। তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥—ভাগবত, ১।৭।২৫ (এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় "ভগবৎসন্দর্ভ" দ্রষ্টব্য)।

ভক্তগণের ভজন সুখকে ভগবদবতারের প্রয়োজন বলিয়া সমর্থন করিতে ভগবানের করুণাগুণের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত বচনের "পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ" এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া পরমেশ্বরের প্রয়োজনান্তর-বুদ্ধি নাই, ইহাই শেষে বলিয়াছেন। মূলকথা, ঈশ্বর অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যও যে পরার্থেই করেন, এই মতও সহসা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। "ন প্রয়োজনবত্বাৎ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রেরও এই মতানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে[১]।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার দুঃখিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কারুণিক ব্যক্তিগণ পরের দুঃখ বুঝিয়া দুঃখী হইয়াই পরার্থে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহাই দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের দুঃখ স্বীকার করিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। স্বার্থপ্রযুক্ত ঈশ্বর পরার্থে প্রবৃত্ত হন, ইহা বলিলেও, স্বার্থবত্তাবশতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই ঐ কর্ম্মফলভোগ-সম্পাদনের জন্য পরার্থেই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এই সিদ্ধান্তেও অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। কারণ, জীবের কর্ম্মব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না, আবার সৃষ্টি ব্যতীতও কর্ম্ম

১। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "ন প্রয়োজনবত্বাৎ" (৩২)—এই সূত্রকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, চেতন ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায়, তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রে "প্রবৃত্তীনাং" এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সূত্রকে সিদ্ধান্ত-সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া সূত্রকারের বুদ্ধিস্থ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপক্ষে ঐ সূত্রের দ্বারা ইহাও সরলভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, প্রয়োজনাভাববশতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই, ইহা বলা যায় না। কেন বলা যায় না? তাই বলিয়াছেন—"প্রয়োজনবত্বাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রয়োজন আছে। স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে পরার্থই অর্থাৎ জীবের প্রতি অনুগ্রহই প্রশস্ত প্রয়োজন। তাই সূত্রকার ঐ প্রশস্ত প্রয়োজন-বোধের জন্য প্রয়োজন না বলিয়া, "প্রয়োজনবত্ব" বলিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী দুই সূত্রে "ঈশ্বরস্য" এই পদের অধ্যাহার সকল ব্যাখ্যাতেই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে "ন প্রয়োজনবত্বাৎ" এই প্রথম সূত্রেও "ঈশ্বরস্য" এই পদের অধ্যাহারই সূত্রকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া বুঝা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে, স্বার্থব্যতীত ঈশ্বরের পরার্থেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তাই আবার দ্বিতীয় সূত্র বলা হইয়াছে, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং"। অর্থাৎ লোকে ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থব্যতীতও পরার্থে প্রবৃত্তি দেখা যায়। পরন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই সৃষ্টি কেবল লীলামাত্র, অর্থাৎ তিনি অনায়াসেই এই সৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার স্বার্থ না থাকিলেও, পরার্থে প্রবৃত্তি হইতে পারে। ইহাতেও আপত্তি হইবে যে, ঈশ্বর পরার্থে সৃষ্টি ও সংহার করিলেও, তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয়, এজন্য আবার তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি"—অর্থাৎ সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ বলিয়া, তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয় না। বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বর পরার্থেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় কিনা, তাহা সুধীগণ উপেক্ষা না করিয়া বিচার করিবেন। "ন প্রয়োজনবত্বাৎ"—এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষসূত্র না হইলেও, কোন ক্ষতি নাই। বেদান্তদর্শনে ন্যায়দর্শনের ন্যায় অনেকস্থলে পূর্ব্বপক্ষসূত্র না বলিয়াও, সিদ্ধান্তসূত্র বলা হইয়াছে। যথা,—"ঈক্ষতের্নাশব্দং" (১।১।৫) ইত্যাদি

হইতে পারে না। জীবের সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে গেলেও, অন্ধপরম্পরা-দোষবশতঃ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরে বেদান্তদর্শনের "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২।২।৩৭)—এই সূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ মাত্র, এই মতে অসামঞ্জস্য বুঝাইতে পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর করুণাময় হইলেও, তাঁহার দুঃখের কারণ দুরদৃষ্ট না থাকায়, তাঁহার দুঃখ হইতে পারে না। তিনি কারুণিক অজ্ঞ মানবাদির ন্যায় দুঃখী হইয়া পরার্থে প্রবৃত্ত হন না। কারুণিক হইলেই যে, পরের দুঃখ বুঝিয়া সকলেই দুঃখী হইবেন, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে ঈশ্বরের দুঃখ সকলেরই স্বীকার্য্য হওয়ায়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব কেহই বলিতে পারেন না। কারণ, ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার দুঃখশূন্য ও করুণাময় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ঈশ্বর পরার্থে প্রবৃত্ত হইলেও, সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহার কোনরূপ স্বার্থাভিসন্ধিও হইতেই পারে না। কারণ, তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন স্বার্থই অপ্রাপ্ত নহে। সুতরাং এতাদৃশ অদ্বিতীয় পুরুষবিশেষের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আপত্তিই হইতে পারে না। পরন্তু ঈশ্বর জগতের সত্য সৃষ্টি করেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইলে, তিনি যে জীবের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই জগতের সৃষ্টি করেন, এবং জীবের সংসার বা সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ অন্য কোনরূপেই ঈশ্বরের এই বিষম সৃষ্টির উপপত্তি হইতেই পারে না। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ঐ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং উহার পরে বেদান্তসূত্রানুসারেই জীবের সংসারের অনাদিত্বও শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বে সে সকল কথা লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষতা ও জীবের সংসারের অনাদিত্ব, যাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বে বেদান্তসূত্রানুসারে শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্তে অন্যোন্যাশ্রয় ও অনবস্থা প্রভৃতি প্রামাণিক বলিয়া দোষ হইতে পারে না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের উল্লেখ করিয়া, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন, এই সিদ্ধান্তও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। "এষ হ্যেবৈনং সাধু-কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মধ্বাচার্য্য ঐ বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণের একটি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব-মতের খণ্ডন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করাই মহর্ষির এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, ইহাই আমরা বুঝিয়াছি। তাই ভাষ্যকারও সর্ব্বশেষে "স্বকৃতাভ্যাগমলোপেন চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষির এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য ঐ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন।

১। "তস্যাপি পূর্ব্বকর্ম্মকারণমিত্যনাদিত্বাৎ কর্ম্মণঃ। ভবিষ্যপুরাণে চ—"পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ। অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চনেতি।—বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ৩৫ সূত্রের মধ্বভাষ্য।

উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহার সমর্থিত জগৎকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শাস্ত্রদ্বারাও সমর্থন করিতে মহাভারত ও মনুসংহিতার বচন[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে উদয়নাচার্য্যও উক্ত বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি মনীষি-গণও মহাভারতের ঐ বচন ("অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়ং" ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহামনীষী মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" "শৈবদর্শনে" নকুলীশ-পাশুপত-সম্প্রদায়ের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্বমত সমর্থন করিতে মহা-ভারতের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুঃখিতা দ্রৌপদীর সাক্ষেপ উক্তির মধ্যে মহাভারতের বনপর্ব্বের ৩০শ অধ্যায়ে ঐ শ্লোকটি দেখিতে পাই। সেখানে দ্রৌপদী ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়াই নানা কথা বলিয়াছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাই পরে (৩১শ অধ্যায়ে) যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর উক্তির যে প্রতিবাদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রারম্ভেই দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের "নাস্তিক্যন্তু প্রভাষসে" এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারতের ঐ বচনের দ্বারা কিরূপে আস্তিক মত সমর্থিত হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুধীগণ মহাভারতের বনপর্ব্বের ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায় পাঠ করিয়া দ্রৌপদীর উক্তি ও যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক উহার প্রতিবাদের তাৎপর্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক মহাভারতের ঐ শ্লোক জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থক হয় কি না, ইহা নির্ণয় করিবেন। "প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং" ইত্যাদি (৬১ম) সাংখ্য-কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ স্বামী এবং সুশ্রুত-সংহিতার শারীরস্থানের "স্বভাবমীশ্বরং কালং" ইত্যাদি (১১শ) শ্লোকের টীকায় ডল্লনাচার্য্য কিন্তু ঈশ্বরই সর্ব্বকার্য্যের কারণ, এই সম্প্রদায়বিশেষ-সম্মত মতান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেই মহাভারতের "অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়ং" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ বচনের তাৎপর্য্য কিরূপ বুঝিয়াছিলেন, ইহাও অবশ্য চিন্তা করা আবশ্যক। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি মনীষিগণের উদ্ধৃত ঐ বচনের চতুর্থ পাদে স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু মহাভারতের উক্ত বচনে (মুদ্রিত মহাভারত পুস্তকে) এবং গৌড়পাদের উদ্ধৃত ঐ বচনে চতুর্থ পাদে "স্বর্গং নরকমেব বা" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। পাঠান্তর থাকিলেও, উভয় পাঠে অর্থ একই। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না, ইহাও দেখা আবশ্যক। যথাশক্তি অনুসন্ধান করিয়াও অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে

১। অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥
(স্বর্গং নরকমেব বা)—বনপর্ব্ব, ৩০ অ°, ২৮শ শ্লোক।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি, তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা, তদা সর্ব্বং নিমীলতি॥—মনুসংহিতা। ১। ৫২।

ঐ বচন দেখিতে পাই নাই। সুধীগণ অনুসন্ধান করিয়া তথ্য নির্ণয় করিবেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য উক্ত বচনের দ্বারা কিরূপে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্বমত সমর্থন করিয়াছেন, উক্ত বচনের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত কিরূপে বুঝা যায়, এবং গৌড়পাদ স্বামী প্রভৃতি মতান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেই ঐ বচন কেন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যচিন্তনীয়।

যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে, তাঁহার শরীরবত্তা আবশ্যক হয়। কারণ, যাহার শরীর নাই, তাহার কোন কার্য্যেই কর্তৃত্ব সম্ভবই হয় না। শরীরশূন্য ব্যক্তির কোন কার্য্যে কর্তৃত্ব আছে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু আমাদিগের ঘটাদি-কার্য্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে—(ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ) ইত্যাদি প্রকার অনুমানের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের কর্তৃরূপে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে গেলে, আমাদিগের ন্যায় শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরই সিদ্ধ হইবেন। কারণ, পরিদৃশ্যমান ঘটাদি-কার্য্য শরীরবিশিষ্ট চেতন কর্তৃক, ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যমাত্রের কর্ত্তা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, ঐ কর্ত্তা শরীরবিশিষ্ট, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া যে ঈশ্বর স্বীকৃত হইতেছেন, তাঁহার শরীর না থাকায়, তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবই হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ ঈশ্বরের সিদ্ধিও হইতে পারে না। যদি বল, ঈশ্বরের জ্ঞানাদির ন্যায় শরীরও আছে, তাহা হইলে তাঁহার ঐ শরীর নিত্য, কি অনিত্য—ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। কারণ, নিত্য-শরীরে কিছুমাত্র প্রমাণ না থাকায়, উহা স্বীকার করা যায় না। শরীর কাহারই নিত্য হইতে পারে না। পরন্তু ঐ শরীর পরিচ্ছিন্ন হইলে, সর্ব্বত্র উহার সত্তা না থাকায়, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ঐ শরীরের দ্বারা যুগপৎ নানাকার্য্য-কর্তৃত্বও সম্ভব হয় না। অনিত্য শরীর স্বীকার করিলেও ঐ শরীরের পরিচ্ছিন্নতাবশতঃ পূর্ব্বোক্ত দোষ অনিবার্য্য। পরন্তু ঈশ্বরের ঐ অনিত্য শরীরের স্রষ্টা কে, ইহা বলা আবশ্যক। স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার ঐ শরীরের স্রষ্টা, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ শরীরসৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার শরীরান্তর না থাকায়, তিনি তখন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ঐ শরীরের স্রষ্টা অন্য ঈশ্বর স্বীকার করিলে, সেই ঈশ্বরের শরীরের স্রষ্টা আবার অন্য ঈশ্বরও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে, অনবস্থা-দোষ অপরিহার্য্য এবং উহা প্রমাণবিরুদ্ধ ও সকল সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। ফলকথা, ঈশ্বরকে যখন কোনরূপেই শরীরী বলা যাইবে না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত-প্রকার যুক্তি অবলম্বনে নাস্তিক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকের "ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্যত্বাৎ" ইত্যাদি প্রকার অনুমানে "ঈশ্বরো যদি কর্ত্তা স্যাৎ তদা শরীরী স্যাৎ" ইত্যাদি প্রকারে প্রতিকূল তর্কের এবং "শরীরজন্যত্ব" উপাধির উদ্ভাবন করিয়া, ঐ অনুমানের খণ্ডন করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যটীকা"য় বাচস্পতি মিশ্র এবং "আত্মতত্ত্ববিবেক" ও "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে

উদয়নাচার্য্য, "ন্যায়কন্দলী" গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য্য, "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট এবং "ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকগণ বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমস্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও, সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে, ইহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সমস্ত বিচার প্রকাশ করা এখানে সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, শরীরবত্তাই কর্ত্তৃত্ব নহে। তাহা হইলে মৃত ও সুপ্ত ব্যক্তিরও কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু কার্য্যানুকূল নিজ প্রযত্নের দ্বারা কার্য্যের অন্যান্য কারকসমূহের প্রেরকত্ব অথবা ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্নবত্ত্বই কর্ত্তৃত্ব। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও, তাঁহার ঐ কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে। আমরা শরীর ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে না পারিলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অশরীর হইয়াও ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদিগের অনিত্য প্রযত্ন শরীরসাপেক্ষ হইলেও, ঈশ্বরের নিত্যপ্রযত্নরূপ কর্ত্তৃত্ব শরীরসাপেক্ষ নহে। পরন্তু শরীরের ব্যাপার ব্যতীত যে কোন ক্রিয়ারই উৎপাদন করা যায় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, জীবাত্মা তাহার নিজ প্রযত্নের দ্বারা নিজ শরীরে যখন চেষ্টারূপ ক্রিয়ার উৎপাদন করে, তখন ঐ শরীরের দ্বারাই ঐ শরীরে ঐ ক্রিয়ার উৎপাদন করে না। তৎপূর্ব্বে তাহার শরীরের কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া থাকে না। জীবাত্মার জ্ঞান-বিশেষজন্য ইচ্ছাবিশেষ জন্মিলে, তজ্জন্য প্রযত্নবিশেষের অনন্তরই শরীরে চেষ্টারূপ ক্রিয়া জন্মে। এইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নজন্য কার্য্যদ্রব্যের মূলকারণ পরমাণুসমূহে প্রথম ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। তাহার ফলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইহাতে প্রথমেই তাঁহার শরীরের কোন অপেক্ষা নাই। পরন্তু ঘটাদি দৃষ্টান্তে কার্য্যত্বহেতুতে সামান্যতঃ কর্ত্তৃজন্যত্বেরই ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। শরীর-বিশিষ্ট-কর্ত্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্য সামান্যতঃ কর্ত্তৃজন্য, এইরূপই অনুমান হয়। সেই দ্ব্যণুকাদির কর্ত্তা শরীরী, ইহা ঐ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই দ্ব্যণুকাদি-কার্য্যের যিনি কর্ত্তা, তিনি উহার উপাদান-কারণের দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠাতা, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে তিনি যে দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর দ্রষ্টা, সুতরাং অতীন্দ্রিয়দর্শী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, উপাদান-কারণের দ্রষ্টা না হইলে, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অতীন্দ্রিয়দর্শিত্ব সিদ্ধ হইলে তিনি যে শরীর ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার যে আমাদিগের ন্যায় শরীরাদির অপেক্ষা নাই, ইহাও সিদ্ধ হইবে। অবশ্য আমাদিগের পরিদৃষ্ট সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তাই শরীরী; শরীর ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারেন, ইহা আমরা দেখি না, কিন্তু সমস্ত কর্ত্তাই যে একরূপ, ইহাও, ত দেখি না। কেহ দুই হস্তের দ্বারা যে ভার উত্তোলন করেন, অপরে এক হস্তের দ্বারাও সেই ভার উত্তোলন করেন, এবং কোন অসাধারণ শক্তি-শালী পুরুষ এক অঙ্গুলি দ্বারাই ঐ ভার উত্তোলন করেন, ইহাও ত দেখা যায়। সুতরাং কর্ত্তার শক্তির তারতম্যপ্রযুক্ত নানা কর্ত্তার নানারূপে কার্য্যকারিতা সম্ভব হয়, ইহা

স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্, যেখানে শক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে, শরীর ব্যতীত ও ইচ্ছামাত্রে জগৎসৃষ্টি করিবেন, ইহা কোন মতেই অসম্ভব নহে। কিন্তু কর্ত্তা ব্যতীত দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অসম্ভব। কারণ, কার্য্যমাত্রই কারণজন্য। বিনা কারণে কার্য্য জন্মিতে পারিলে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। কার্য্যের কারণের মধ্যে কর্ত্তা অন্যতম নিমিত্তকারণ। উহার অভাবে কোন কার্য্য জন্মিতে পারে না। অন্য সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলেও, কর্ত্তার অভাবে যে, কার্য্য জন্মে না, ইহা সকলেরই পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে দ্ব্যণুকাদির কর্ত্তা কেহ আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই কর্ত্তা যে অতীন্দ্রিয়দর্শী, সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তিনি অস্মদাদি হইতে বিলক্ষণ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তিনি জগৎকর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং ঐরূপ ঈশ্বর যে, শরীর ব্যতীতও কার্য্য করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরসাধক পূর্ব্বোক্ত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নের নিত্যত্বও সিদ্ধ হয়, তাঁহার কর্তৃত্ব শরীরসাপেক্ষ হইতেই পারে না। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার শরীরপরিগ্রহও আবশ্যক হয়। কারণ, শরীরসাধ্য কর্ম্ম-বিশেষ ব্যতীত লোকশিক্ষা সম্ভব হয় না। তাই উদয়নাচার্য্যও অশরীর ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সমর্থন করিয়াও, সৃষ্টির পরে ব্যবহারাদি শিক্ষার জন্য ঈশ্বর যে শরীরবিশেষ পরিগ্রহ করেন, ইহা বলিয়াছেন[১]। ঈশ্বরের নিজের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট না থাকিলেও, জীবগণের অদৃষ্টবশতঃই তাঁহার ঐ শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন। ঈশ্বর যে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সময়বিশেষে শরীরপরিগ্রহ করেন, ইহা "ভগবদ্গীতা" প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যও তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে "ভগবদ্গীতা" হইতে ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ করুণাময় পরমেশ্বর যে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেও কত বার কত প্রকার শরীরপরিগ্রহ করিয়াছেন ও করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে তাঁহার শরীরের কোন অপেক্ষা নাই, তিনি স্বেচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি ও সংহার করেন এবং করিতে পারেন, ইহাই নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও "বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং" (২।১।৩১)—এই সূত্রের দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিশূন্য ঈশ্বরের যে সৃষ্টিসামর্থ্য আছে, ইহা সিদ্ধান্তরূপে সূচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ৩। ৯) শ্রুতিতে দেহেন্দ্রিয়াদিশূন্য ঈশ্বরেরও তত্তৎ-কার্য্যসামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে উক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া, সূত্রকার বাদরায়ণের উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

১। গৃহ্লাতি হীশ্বরোঽপি কার্য্যবশাৎ শরীরমন্তরান্তরা দর্শয়তি চ বিভূতিমিতি।—"ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" পঞ্চম স্তবকের পঞ্চম কারিকার এবং দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারিকার উদয়নকৃত গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অপ্রাকৃত নিত্য দেহ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রাকৃত হস্ত-পাদাদি ও প্রাকৃত চক্ষুরাদি নাই, ইহাই কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের যে কোনরূপ শরীরাদিই নাই, ইহা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যে জ্যোতীরূপ, ইহা "জ্যোতির্দীব্যতে" (ছান্দোগ্য, ৩।১৩।) এবং "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (মুণ্ডক, ২।২।৯) ইত্যাদি বহুতর শ্রুতির দ্বারা বুঝা যায়। শ্রুতির ঐ "জ্যোতিষ্" শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করার কোন কারণ নাই। সুতরাং ঈশ্বর জ্যোতিঃপদার্থ হইলে, তাঁহার রূপের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, জ্যোতিঃপদার্থ একেবারে রূপশূন্য হইতে পারে না। তবে ঈশ্বরের ঐ রূপ অপ্রাকৃত; প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা উহা দেখা যায় না। তাই শ্রুতিও অন্যত্র বলিয়াছেন,—"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য"। ঈশ্বরের কোন প্রকার রূপ না থাকিলে চক্ষুর দ্বারা উহার দর্শনের কোন প্রসক্তিই হয় না, সুতরাং "ন চক্ষুষা পশ্যতি" এই নিষেধই উপপন্ন হয় না। পরন্তু "যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং", "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং", "বিবৃণুতে তনূং স্বাং"—ইত্যাদি (মুণ্ডক, ৩।১।৩।৭। এবং ৩।২।৩) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের রূপ ও তনু আছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" এইরূপ শ্রুতি আছে, কিন্তু "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" এইরূপ শ্রুতিও আছে এবং যেমন "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি শ্রুতি আছে, তদ্রূপ "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখং" ইত্যাদি শ্রুতিও আছে এবং "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" ইত্যাদি বহুতর শাস্ত্রবাক্যও আছে। সুতরাং সমস্ত শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় করিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহাদি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত দেহাদি আছে। ব্রহ্মের রূপাদির অভাববোধক শাস্ত্র-বাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য্য না বুঝিলে, আর কোনরূপেই তাঁহার রূপাদি-বোধক শাস্ত্রের সহিত উহার বিরোধপরিহার বা সমন্বয় হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "ভগবৎসন্দর্ভ"ও উহার অনুব্যাখ্যা "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্তরূপে আরও বহুতর প্রমাণাদির উল্লেখ ও বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যকার পরমবৈষ্ণব রামানুজও অশেষকল্যাণগুণগণনিধি ভগবান্ বাসুদেবের দিব্যদেহ ও অপ্রাকৃত রূপাদি সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" (১।১।২১) এই সূত্রের শ্রীভাষ্য দ্রষ্টব্য। মধ্বাচার্য্যও "রূপোপন্যাসাচ্চ" (১।১।২৩) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া, পরে "অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা" (২।২।৪১) এই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের যে বুদ্ধি, মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, ইহাও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণও সকলেই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত-রূপাদি ও তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,[১] যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন-বিশিষ্ট কর্ত্তা, অতএব তিনি সবিগ্রহ অর্থাৎ

১। তথাচ প্রয়োগঃ, ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ, জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবৎকর্ত্তৃত্বাৎ কুলালাদিবৎ। স চ বিগ্রহো নিত্যঃ, ঈশ্বরত্বানন্যত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদিবদিতি।—ভগবৎসন্দর্ভ।

দেহবিশিষ্ট, দেহ ব্যতীত কেহ কর্ত্তা হইতে পারেন না, কর্ত্তা হইলেই তিনি অবশ্য দেহী হইবেন। ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। পরন্তু ঈশ্বরের ঐ দেহ নিত্য ; কারণ, তাঁহার জ্ঞানাদির ন্যায় তাঁহার দেহও তাঁহার কার্য্যের করণ অর্থাৎ সাধন। সুতরাং তাঁহার দেহ অনিত্য হইলে, উহা অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহের সাধন হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের ঐ দেহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও, অপরিচ্ছিন্ন। শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি অপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে, তচ্চ যুক্তং, অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ"। এই মতে ঈশ্বরের ঐ শ্রীবিগ্রহ ও হস্তপদাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, উহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন, ঐ বিগ্রহই ঈশ্বর, তাহাতে দেহ ও দেহীর ভেদ নাই ; তাঁহার বিগ্রহ বা দেহই তিনি, এবং তিনিই ঐ বিগ্রহ।

উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, যদি ভক্তগণের অনুভবই উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আর কোন বিচার বা বিতর্ক নাই। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও যখন বহু বিচার করিয়া পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের মতেও উক্ত বিচারের কর্ত্তব্যতা আছে, বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝিতে আরও অনেক বিচার আবশ্যক মনে হয়। প্রথম বিচার্য্য এই যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ ও ঈশ্বর একই পদার্থ হইলে, ঈশ্বর যখন অপরিচ্ছিন্ন, তখন বিগ্রহরূপ তিনিই আবার পরিচ্ছিন্ন হইবেন কিরূপে? যদি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির মহিমায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ অচিন্ত্য শক্তির মহিমায় দেহ ব্যতীতও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামী যে তাঁহার কর্ত্তৃত্বকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরেরও বিগ্রহবত্তা বা দেহবত্তার অনুমান করিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়? যদি অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ দেহ ব্যতীতও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বহেতুর দ্বারা তাঁহার দেহের সিদ্ধি হইতে পারে না। পরন্তু কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার ন্যায় জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের দেহের অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার আত্মা বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন জড়দেহই সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, কর্ত্তৃত্ব-নির্ব্বাহের জন্য যে দেহ আবশ্যক, তাহা কর্ত্তা হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব হেতুর দ্বারা কর্ত্তার স্ব-স্বরূপ দেহ সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মতে ঈশ্বরের দেহ তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও, তাঁহার কার্য্যের করণ। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরের যে অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ও হস্ত-পদাদি আছে, যাহা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সমস্তই ঈশ্বরের দর্শনাদি কার্য্যের সাধন থাকায়, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কিরূপে উপপত্তি হইবে, ইহাও বিচার্য্য। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের দর্শনাদি-কার্য্যের কোন সাধন বা করণ না থাকিলেও, তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাবশতঃই দর্শনাদি করেন। কিন্তু যদি তাঁহার কোন প্রকার চক্ষুরাদিও থাকে এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই

সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনাদি কার্য্যের কোন সাধন নাই, ইহা বলা যায় না। শ্রীজীব গোস্বামীও ঈশ্বরের দেহকে তাঁহার করণ বলিয়া ঐ দেহের নিত্যত্বানুমান করিয়াছেন। পরন্তু ঈশ্বরের স্ব-স্বরূপ দেহে তাঁহার যে অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অপ্রাকৃত হস্তপদাদি আছে, তাহাও যখন পূর্ব্বোক্ত মতে ঈশ্বরেরই স্বরূপ, ঐ সমস্তই সচ্চিদানন্দময়, তখন উহাতে দেহ,ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োজন কি ? এবং উহাতে দেহ প্রভৃতির কি লক্ষণ আছে, ইহাও বিচার্য্য। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত মতে ভক্তগণ সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের যে চরণসেবাই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া, সাধনার দ্বারা তাঁহার পার্ষদ হইয়া, ঐ চরণসেবাই করেন ; সেই চরণও যখন তাঁহারই স্বরূপ—উহা মানবাদির চরণের ন্যায় সংবাহনাদি সেবার যোগ্যই নহে, তখন কিরূপে যে সেই পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার চরণসেবা করেন, ইহাও বিশেষরূপে বিচার্য্য। যদি বলা যায় যে, সেই আনন্দময়ের সেবাই তাঁহার চরণসেবা বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ চরণসেবা কিরূপ, তাহা বক্তব্য। সেই আনন্দময় বিগ্রহে পরম-প্রেমসম্পন্ন হইয়া থাকাই যদি তাঁহার চরণসেবা বলিতে হয়, তাহা হইলে ঐ "চরণ" শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তাহা হইলে ভক্ত অধিকারি-বিশেষের সাধনা-বিশেষের জন্যই এবং তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় প্রেমলাভের জন্যই শাস্ত্রবিশেষে ভগবানের দেহাদি বর্ণিত হইয়াছে ; ঐ সকল শাস্ত্রের মুখ্য অর্থে তাৎপর্য্য নাই, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও ত ঐ সকল শাস্ত্র-বাক্যের সর্ব্বাংশে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরের দেহাদি স্বীকার করিয়া, উহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপই বলিয়াছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত হস্তপদাদি স্বীকার করিয়াও ঐ সমস্তকে তাঁহা হইতে ভিন্নপদার্থ বলেন নাই। তাঁহারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শাস্ত্রের নানাবাক্যের গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলিয়াছি, শাস্ত্র-বিচার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে এবং বুঝিতে হইলে আরও অনেক বিচার করা আবশ্যক। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ সে বিচার করিবেন। আমরা এখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদবাদ-সম্বন্ধে যথাশক্তি কিছু আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার গোতম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই, ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া এবং পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বর যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন আত্মা, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা জীবাত্মার দেহাদিভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের ৬৬ম ও ৬৭ম সূত্রে যেরূপ যুক্তির দ্বারা তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু একই আত্মা সর্ব্বশরীরবর্ত্তী হইলে, একের সুখাদি জন্মিলে তখন সর্ব্বশরীরেই সুখাদির অনুভব হয় না কেন? এতদুত্তরে আত্মার একত্ববাদি-সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, জ্ঞান ও সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে—উহা আত্মার উপাধি—অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম ; অন্তঃ

করণেই ঐ সমস্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং আত্মা এক হইলেও, প্রতি শরীরে অন্তঃকরণের ভেদ থাকায়, কোন এক অন্তঃকরণে সুখাদি জন্মিলেও, তখন উহা অন্য অন্তঃকরণে উৎপন্ন না হওয়ায়, অন্য অন্তঃকরণে উহার অনুভব হয় না। কিন্তু মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে যখন জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি গুণকে জীবাত্মারই নিজের গুণ বলিয়া সমর্থন করিতে, ঐ সমস্ত মনের গুণ নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে প্রতি শরীরে জীবাত্মার বাস্তব-ভেদ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখাদি ব্যবস্থা কোনরূপেই উপপন্ন হয় না, কোন এক শরীরে জীবাত্মার সুখ-দুঃখাদি জন্মিলে অপর শরীরে উহার উৎপত্তি ও অনুভবের আপত্তির নিরাস হইতে পারে না। সুতরাং গোতম-মতে জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে বস্তুতঃই ভিন্ন, অতএব অসংখ্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাহা হইলে বিভিন্ন অসংখ্য জীবাত্মা হইতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ কোনরূপেই সম্ভব না হওয়ায়, গোতম মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যে বস্তুতঃই ভিন্ন পদার্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব-বিচারে অনেক কথা বলা হইয়াছে। (তৃতীয় খণ্ড, ৮৬—৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্মের যে, কোনরূপ ভেদই নাই, ইহা নহে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কার না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐ ভেদ অবিদ্যাকৃত ঔপাধিক, সুতরাং উহা বাস্তব-ভেদ নহে। যেমন আকাশ বস্তুতঃ এক হইলেও, ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন আকাশের কল্পনা করা হয়, ঘটাকাশ হইতে পটাকাশের বাস্তব কোন ভেদ না থাকিলেও যেমন ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয়ের ভেদপ্রযুক্তই উহার ভেদ-ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব কোন ভেদ না থাকিলেও, অবিদ্যাদি উপাধিপ্রযুক্তই উহার ভেদ-ব্যবহার হয়। জীবাত্মার সংসারকালে অবিদ্যাকৃত ঐ ভেদজ্ঞানবশতঃই ভেদমূলক উপাসনাদি কার্য্য চলিতেছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, তখন অবিদ্যার নাশ হওয়ায়, অবিদ্যাকৃত ঐ ভেদও বিনষ্ট হয়। অনেক শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ বুঝা যায়, তাহা ঐ অবিদ্যা-কৃত অবাস্তব ভেদ। উহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের দ্বারা এবং আরও অনেক শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদই প্রকৃত তত্ত্বরূপে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। উপনিষদে যে যে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ আছে, তাহার উপক্রম উপসংহারাদি পর্য্যালোচনা করিলেও, জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদেই যে, উপনিষদের তাৎপর্য্য, ইহা নিশ্চয় করা যায়। এবং উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের অভেদদর্শনই অবিদ্যা-নিবৃত্তি বা মোক্ষের কারণ-রূপে কথিত হওয়ায়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদই বাস্তবতত্ত্ব, ভেদ মিথ্যা কল্পিত, ইহা নিশ্চয় করা যায়।

জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদবাদী অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই পূর্ব্বোক্তরূপ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা উপনিষদের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদ

সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রারম্ভে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি প্রথম শ্রুতিতে দেহরূপ এক বৃক্ষে যে দুইটি পক্ষীর কথা বলিয়া, তন্মধ্যে একটি কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং অপরটি কর্ম্মফলের ভোক্তা নহে, কিন্তু, কেবল দ্রষ্টা, ইহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাই ঐ শ্রুতিতে বিভিন্ন দুইটি পক্ষিরূপে কল্পিত এবং ঐ উভয় বস্তুতঃই ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়[১]। ঐ শ্রুতির পরার্দ্ধে দুইটি "অন্য" শব্দের দ্বারাও ঐ উভয়ের বাস্তব-ভেদ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। নচেৎ ঐ "অন্য" শব্দদ্বয়ের সার্থকতা থাকে না। তাহার পরে মুণ্ডক উপনিষদের ঐ স্থানেই দ্বিতীয় শ্রুতির পরার্দ্ধে "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর যে জীবাত্মা হইতে "অন্য", ইহাও আবার বলা হইয়াছে। ঐ শ্রুতিতেও "অন্য" শব্দের সার্থকতা কিরূপে হয়, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। তাহার পরে তৃতীয় শ্রুতি বলা হইয়াছে, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য-মুপৈতি॥"—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের সহিত পরমসাম্য (সাদৃশ্য) লাভ করেন, ইহাই শেষে কথিত হওয়ায়, জীব ও ব্রহ্মের যে বাস্তব-ভেদ আছে, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়েও "অন্য" শব্দের দ্বারা সেই বাস্তব-ভেদই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, শেষোক্ত শ্রুতিতে যে "সাম্য" শব্দ আছে, উহার মুখ্য অর্থ সাদৃশ্য। উহার দ্বারা অভিন্নতা অর্থ বুঝিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু, "সাম্য" শব্দের অভিন্নতা অর্থে লক্ষণা স্বীকার সঙ্গতও হয় না। কারণ, তাহা হইলে "সাম্য" শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে না। রাজ-সদৃশ ব্যক্তিকে রাজা বলিলে লক্ষণার দ্বারা রাজসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায় এবং ঐরূপ প্রয়োগও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত রাজাকে রাজসম বলিলে, লক্ষণার দ্বারা রাজা, এইরূপ অর্থ বুঝা যায় না, এবং ঐরূপ প্রয়োগও কেহ করেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত

১। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥—মুণ্ডক, ৩।১।১। শ্বেতাশ্বতর, ৪।৬।

জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদ সমর্থন করিতে রামানুজ প্রভৃতি সকলেই উক্ত শ্রুতি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, "পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণ" নামক শ্রুতিতে উক্ত শ্রুতির যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত শ্রুতিতে অন্তঃকরণ ও জীবাত্মাই যথাক্রমে কর্ম্মফলের ভোক্তা ও দ্রষ্টা, দুইটী পক্ষিরূপে কথিত। কারণ, উহাতে শেষে স্পষ্ট করিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ"। সুতরাং উক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব-ভেদ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই। রামানুজ প্রভৃতি ও শ্রীজীব গোস্বামী এই কথার উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, "পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে" "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ" এই বাক্যে "সত্ত্ব" শব্দের অর্থ জীবাত্মা, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমাত্মা। কারণ, জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তিনি ভোক্তা নহেন, ইহা বলা যায় না। সুতরাং এখানে "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা বুঝা যায় না; পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। "সত্ত্ব" শব্দের জীবাত্মা অর্থ অভিধানেও কথিত হইয়াছে এবং ঐ অর্থে "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগও প্রচুর আছে। "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের দ্বারাও পরমাত্মা বুঝা যায়। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি"—গীতা।

শ্রুতিতে "সাম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ সাদৃশ্যই বুঝিতে হইলে, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ যে বাস্তব, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। কারণ, বাস্তব-ভেদ না থাকিলে, সাম্য বা সাদৃশ্য বলা যায় না। পরন্তু ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি ব্রহ্মের সাদৃশ্যই লাভ করেন এবং উহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, ইহা "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" (গীতা, ১৪।২)—এই ভগবদ্বাক্যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ সমান-ধর্ম্মতা, অভিন্নতা নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়া গীতার ঐ শ্লোকের ভাষ্যে তাঁহার নিজমতানুসারে "সাধর্ম্ম্য' শব্দের যে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না, ইহার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু, ঐ "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিলে, ঐ শ্লোকে সাধর্ম্ম্য শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। পরন্তু, ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি একেবারে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে, ঐ শ্লোকের "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"—এই পরার্দ্ধের সার্থক্য থাকে না। কিন্তু ঐ সাধর্ম্ম্য শব্দের মুখ্য অর্থে প্রয়োগ হইলেই, ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ সম্যক্রূপে সার্থক হয়। কারণ, ব্রহ্মদর্শী মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত কিরূপ সাধর্ম্ম্য লাভ করেন? ইহা বলিবার জন্যই ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ বলা হইয়াছে—"সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"॥ অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী মুক্ত পুরুষ পুনঃ সৃষ্টিতেও দেহাদি লাভ করেন না এবং তিনি প্রলয়েও ব্যথিত হন না। ব্রহ্মদর্শনের ফলে তাঁহার সমস্ত অদৃষ্টের ক্ষয় হওয়ায় তাঁহার আর জন্মাদি হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মের সহিত সাধর্ম্ম্য। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার তত্ত্বতঃ ভেদ থাকায় তিনি তখন জগৎসৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা হইতে পারেন না। এখন যদি পূর্ব্বোক্ত মুণ্ডক উপনিষদে "সাম্য" শব্দ এবং ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা মুক্তিকালেও জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ বুঝা যায়, তাহা হইলে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মসাদৃশ্য-প্রাপ্তিই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেই শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মৈব ভবতি"। যেমন কোন ব্যক্তির রাজার ন্যায় প্রভূত ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব লাভ হইলে তাঁহাকে "রাজৈব" এইরূপ কথাও বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষকে শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মৈব"। বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেই ঐরূপ প্রয়োগ সুচিরকাল হইতেই হইতেছে। কিন্তু কোন প্রকৃত রাজাকে লক্ষ্য করিয়া "রাজসাধর্ম্ম্যমাগতঃ" এইরূপ প্রয়োগ হয় না। মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকা"র তর্কপাদে সাংখ্যমতের ব্যাখ্যান করিতে এবং অন্যত্র নিজ মত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতি এবং ভগবদ্গীতায় "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই ভগবদ্বাক্যে সাম্য ও সাধর্ম্ম্য শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই উহার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদই সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি উহা সমর্থন করিতে "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" (গীতা, ১৫।১৭) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে রামানুজ প্রভৃতি

আচার্য্যগণও উক্ত ভগবদ্‌বাক্যকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্র আরও বলিয়াছেন যে, ভগবদ্‌গীতায়—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫।৭) এই শ্লোকে যে, জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ নাই, ইহা বিবক্ষিত নহে। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর স্বামী, জীব তাঁহার কার্য্য-কারক ভৃত্য। যেমন রাজার কার্য্যকারী অমাত্যদিকে রাজার অংশ বলা হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের অভিমতকারী জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, অখণ্ড অদ্বিতীয় ঈশ্বরের খণ্ড বা অংশ হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্গীতায় ঐ শ্লোকে "অংশ" শব্দের মুখ্য অর্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। উহার গৌণার্থই সকলের গ্রাহ্য। মূলকথা, জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদবাদী সম্প্রদায়ও উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের বিচার করিয়া, নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিজ মত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি—(মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর) শ্রুতি এবং "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি (কঠ, ৩।১)—শ্রুতি এবং "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ১।৯)—শ্রুতি এবং "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য" এবং "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই (মুণ্ডক) শ্রুতি এবং "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" এই (শ্বেতাশ্বতর) শ্রুতি এবং "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" এবং "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই ভগবদ্গীতাবাক্য এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" (১।১।২১), "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (২।১।২২) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র এবং আরও বহু শাস্ত্রবাক্য প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে উপপন্ন হইবে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত সমগ্র জগতের ব্রহ্মাত্মকতাই বা কিরূপে উপপন্ন হইবে? এতদুত্তরে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের কথা এই যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মাত্মক না হইলেও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনাবিশেষের জন্যই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"—(৩।১৪) এই শ্রুতিতে "উপাসীত" এই ক্রিয়া পদের দ্বারা ঐরূপে উপাসনাই বিহিত হইয়াছে। যাহা ব্রহ্ম নহে,তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনা ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এবং আরও অন্যত্র বহু স্থানে বিহিত হইয়াছে, ইহা অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। "মনো ব্রহ্ম ইত্যু-পাসীত", "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনার বিধান স্পষ্টই বুঝা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও প্রারম্ভ হইতে ঐরূপ ভাবনাবিশেষরূপ বহুবিধ উপাসনার বিধান বুঝা যায়। সুতরাং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারাও "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "সোঽহং" এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্তরূপে উপাসনা-বিশেষের প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে, বাস্তব তত্ত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, ইহাই বুঝা যায়। বেদান্ত-

দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনা-বিশেষের বিচার হইয়াছে। ফলকথা, "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে আত্মগ্রহ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদই সত্য, ভেদ আরোপিত। কিন্তু নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য, অভেদই আরোপিত। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ না থাকিলেও মুমুক্ষু সাধক নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের অভেদের আরোপ করিয়াই "অহং ব্রহ্মাস্মি," "সোঽহং" এইরূপ ভাবনা করিবেন। তাঁহার ঐ ভাবনারূপ উপাসনা এবং ঐরূপ সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মভাবনারূপ উপাসনা, রাগদ্বেষাদির ক্ষীণতা সম্পাদন দ্বারা, চিত্তশুদ্ধির বিশেষ সাহায্য করিয়া, মোক্ষলাভের বিশেষ সাহায্য করিবে। এই জন্যই শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনাবিশেষ বিহিত হইয়াছে। মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপাসনার প্রকারই কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ঐ সমস্ত শ্রুতি উপাসনা-বিধির শেষ অর্থবাদ। বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাবশতঃই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি ভূতার্থবাদের প্রামাণ্য। নচেৎ ঐ সকল বাক্যের প্রামাণ্যই হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে "সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ" এই বিধিবাক্যের দ্বারা এবং "ইত্যেবমাচরেদ্ধীমান্" এই বিধিবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপে উপাসনারই কর্ত্তব্যতা বুঝা যায়। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সেখানে বাস্তব তত্ত্বের ন্যায় উপদিষ্ট হইলেও উহা বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। ফলকথা, নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ না থাকিলেও মুমুক্ষু সাধক নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের অভেদের আরোপ করিয়া "সোঽহং" ইত্যাদি প্রকারে ভাবনারূপ উপাসনা করিবেন। ঐরূপ উপাসনার ফলে সময়ে তাঁহার নিজের আত্মাতে এবং অন্যান্য সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হইবে। তাহার ফলে পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হইবে। তাহার ফলে প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ লাভ হইবে। এই মতে ভগবদ্‌গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং॥ ভক্ত্যা মা-মভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং"॥ (১৮শ অঃ, ৫৪।৫৫) এই দুই শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মুমুক্ষু সাধকের ত্রিবিধ উপাসনাবিশেষ শাস্ত্রদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম, জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, দ্বিতীয়, জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, তৃতীয়, জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বাশ্রয়রূপে ব্রহ্মের ধ্যান। পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ উপাসনার দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। তৃতীয় প্রকার উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা এবং জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, এই দ্বিবিধ উপাসনার ফলে রাগদ্বেষাদি-জনক ভেদবুদ্ধি এবং অসূয়াদিশূন্য হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে, তখন পরমেশ্বরে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয়, ইহাই পরাভক্তি। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষ সূত্রে "উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ"

এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ উপাসনারই সূচনা করিয়াছেন। পরন্তু পরব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎকার করিলেই মোক্ষলাভ হয়, অর্থাৎ ভেদদর্শনই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ,—ইহাই "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্ব-মেতি"—এই শ্বেতাশ্বতর (১।৬)—শ্রুতির দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা এবং প্রেরয়িতা অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া বুঝিলে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে, ইহা বলিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদই যে সত্য এবং ভেদ দর্শনই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদের সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দর্শন মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ বলিয়া শ্রুতিসিদ্ধ হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ দর্শনকে আর মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভেদ দর্শন বা সমগ্র জগতের ব্রহ্মাত্মকতা দর্শন মোক্ষের কারণ-রূপে কোন শ্রুতির দ্বারা বুঝা গেলে, উহা পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনাবিশেষের ফলে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা মোক্ষলাভের সহায় হয়, ইহাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ মোক্ষলাভের পরম্পরা কারণ বা প্রযোজকমাত্রকেও শাস্ত্র অনেক স্থানে মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণের ন্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। বিচার দ্বারা ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। নচেৎ মোক্ষলাভের সাক্ষাৎকারণ অর্থাৎ চরম কারণ নির্ণয় করা যাইবে না। মূল কথা, নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর মোক্ষলাভের সহায় উপাসনাবিশেষের প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে,—জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ তত্ত্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত পূর্ব্বোক্তরূপ মতেরই সূচনা করিয়াছেন। "বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনী"তে নব্য নৈয়ায়িক-শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণিরও এই ভাবের কথা পাওয়া যায়। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য-সমর্থিত অদ্বৈতবাদের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যটীকা"কার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়মত সমর্থন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেকে অদ্বৈতবাদের মূল মায়া বা অবিদ্যার খণ্ডন করিয়াই অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ মায়া বা অবিদ্যা কি? উহা কোথায় থাকে? উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? ইত্যাদি সম্যক্ না বুঝিলে অদ্বৈতবাদ বুঝা যায় না। অদ্বৈতবাদের মূল ঐ অবিদ্যার খণ্ডন করিতে পারিলেই এ বিষয়ে সকল বিবাদের অবসান হইতে পারে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্য জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধক ও অভেদবোধক দ্বিবিধ শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, এই উভয়কেই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরে জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ঈশ্বরে জীবের ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ নহে, ঐ

ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ অনাদি-সিদ্ধ। তাঁহারা "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি (২।৩।৪২)—ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি ভগবদ্‌গীতা (১৫।১৭)—বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম অংশী, জীব তাঁহার অংশ, সুতরাং অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের অংশাশি-ভাবে বাস্তব ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন এবং উহা সমর্থন করিতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধক ও অভেদবোধক দ্বিবিধ শ্রুতিকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। অণু জীব ব্রহ্মের অংশ; ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী, জীব অপূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, জীব মুক্ত হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ নহে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ; সুতরাং মুক্ত হইলেও তাহার সেই স্বরূপই থাকে। কারণ, কোন নিত্য বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং মুক্ত জীবও তখন জীবই থাকে, তাহার পূর্ণব্রহ্মতা হয় না—সর্ব্বশক্তিমত্তাও হয় না। কিন্তু জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জীবে, ব্রহ্মের অভেদও স্বীকার্য্য। এই ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদও অতি প্রাচীন মত। ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র (১) সনক, (২) সনন্দ, (৩) সনাতন ও (৪) সনৎকুমার ঋষি এই মতের প্রথম আচার্য্য বলিয়া ইহাঁদিগের নামানুসারে এই মতের সম্প্রদায় "চতুঃসন" সম্প্রদায় নামে কথিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবাগ্রণী নারদ মুনি পূর্ব্বোক্ত সনকাদি আচার্য্যের প্রথম শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। নারদ শিষ্য নিয়মানন্দাচার্য্যই পরে "নিম্বার্ক" অথবা "নিম্বাদিত্য" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে নিজের আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া সূর্য্যদেবকে ধারণ করায় তখন হইতে তাঁহার ঐ নামে প্রসিদ্ধি হয়, এইরূপ জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে। এই নিম্বার্ক স্বামী বেদান্তদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম "বেদান্তপারিজাত-সৌরভ"। নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য "বেদান্ত-কৌস্তুভ" নামে অপর এক ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরে ঐ ভাষ্যের অনেক টীকা বিরচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে কেশবাচার্য্য নামে উক্ত সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য ঐ ভাষ্যের এক টীকা প্রকাশ করেন, তাহাও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্ক স্বামী যে, নারদের উপদিষ্ট মতেরই ব্যাখ্যাতা, নারদ মুনিই তাঁহার গুরু, ইহা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের ভাষ্যে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন[২]।

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য অনন্তাবতার শ্রীমান্ রামানুজ বেদান্তদর্শনের শ্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া, ঐ মতের

১। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নিম্বার্ক লিখিয়াছেন,—"অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা"বিত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ" ইত্যাদি।

২। পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যত্র ইত্যাদি। নিম্বার্কভাষ্য।

খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি "সুবালোপনিষদে"'র সপ্তম খণ্ডের "যস্য পৃথিবী শরীরং" ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহ ও যুক্তির দ্বারা জীব ও জগৎ পরব্রহ্মের শরীর, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শরীর ও আত্মার যেমন স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত জগৎ ও জীবের স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না[১]। কিন্তু প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবাপন্ন জীব ও জড় জগৎ ব্রহ্মে বিলীন থাকায় তখন ঐ জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াও পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় না, সুতরাং তখন সেই জগৎ ও জীববিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তখন ঐ জগৎ ও জীববিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করিতেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং", "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। রামানুজ এই ভাবে জগৎ ও জীব-বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থন করায় তাঁহার মত "বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রামানুজ বলিয়াছেন, "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রলয়কালে সমগ্র জীব ও জগৎ স্থূল রূপ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মেই অবস্থিত ছিল অর্থাৎ ব্রহ্মে একীভূত ছিল, ইহাই বুঝা যায়। তখন জগতের স্বরূপ-নিবৃত্তি বা একেবারে অভাব বুঝা যায় না। "তমঃ পরে দেবে একীভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে ঐ একীভাবই কথিত হইয়াছে। যে অবস্থায় বিভিন্ন বস্তুরও পৃথক্‌রূপে জ্ঞান সম্ভব হয় না, তাহাকে একীভাব বলা যায়। প্রলয়কালে সূক্ষ্ম জীব ও সূক্ষ্ম জড়বিশিষ্ট ব্রহ্মে সমগ্র জীব ও জগতের ঐ একীভাব হয় বলিয়া তাদৃশ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন আর কিছুরই বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের উপাদান, জগৎ ঐ ব্রহ্মেরই পরিণাম (বিবর্ত্ত নহে) এবং সমগ্র জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, এ জন্য ব্রহ্মের শরীর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত[২]। সুতরাং ঐ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে জানিলে যে সমস্তই জানা যাইবে,এ বিষয়ে সন্দেহ কি? বিশিষ্ট ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার বিশেষণ সমগ্র জীব ও সমগ্র জগতেরও অবশ্য সাক্ষাৎকার হইবে। অতএব শ্রুতিতে যে, এক ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা আছে, তাহার অনুপপত্তি নাই। উহার দ্বারা এক ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই তাহাতে কল্পিত মিথ্যা, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। সমগ্র জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতই পূর্ব্বোক্ত "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি শ্রুতির অভিমত তত্ত্ব। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদ কথিত হইয়াছে,

১। জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ......ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা রামানুজ নানা শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ বিচার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ বাস্তব ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের শ্রীভাষ্যে রামানুজের ঐ সমস্ত কথা দ্রষ্টব্য।

২। "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে", "যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ", "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ", "তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ" "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ"।

উহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য, ব্রহ্ম জীবের ব্যাপক, জীব ব্রহ্মের শরীর[১]। জীব যে স্বরূপতঃই ব্রহ্ম, ইহা ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। কারণ, জীব যে, ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, ব্রহ্মের শরীরবিশেষ, এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে। পরন্তু জীবাত্মা অণু, ইহা শ্রুতির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবাত্মা অণু হইলে একই জীবাত্মা সর্ব্বশরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, সুতরাং জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বহু, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে এক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ সম্ভবই নহে। অণু জীব, বিভু (বিশ্বব্যাপী) ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইতেও পারে না। নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবাত্মাকে অণু বলিয়া স্বীকার করিয়াও বিভু ব্রহ্মের সহিত তাহার স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ, এই উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে একই পদার্থে স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ, উভয়ই বাস্তব তত্ত্ব হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ পদার্থ। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে জীবকে যে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, জীব ব্রহ্মের খণ্ড। কারণ, ব্রহ্ম অখণ্ড বস্তু, তাঁহার খণ্ড হইতে পারে না, উহা বলাই যায় না। সুতরাং, উহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি বা বিশেষণ। "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (২।৩।৪৫)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়াছেন যে, যেমন অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতির প্রভাকে উহার অংশ বলা হয়, এবং যেমন দেব মনুষ্যাদির দেহকে দেহীর অংশ বলা হয়, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু দেহ ও দেহীর ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ অবশ্যই আছে। পরন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ বুঝাই যায় না। কারণ, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে "ত্বং" "অয়ং" ও "আত্মা" এই সমস্ত পদ জীবাত্মা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় নাই। ঐ সমস্ত পদের অর্থ ব্রহ্ম। রামানুজের মতে "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যে "তৎ" পদের দ্বারা সর্ব্বদোষশূন্য, সকলকল্যাণগুণাধার, সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ব্রহ্মই বুঝা যায়। কারণ, ঐ শ্রুতির পূর্ব্বে "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে "তৎ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন। এবং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "ত্বং" পদের দ্বারাও যিনি চিদ্‌বিশিষ্ট, (চিৎ অর্থাৎ জীব যাঁহার বিশেষণ বা শরীর)—সেই ব্রহ্মই বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, চিদ্‌বিশিষ্ট অর্থাৎ জীব যাঁহার বিশেষণ বা শরীর, সেই ব্রহ্ম, সর্ব্বদোষশূন্য, সকলগুণাধার, সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ব্রহ্ম। সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "তৎ" ও "ত্বং" পদের এক ব্রহ্মই অর্থ হওয়ায় ঐরূপ অভেদনির্দ্দেশের অনুপপত্তি নাই এবং উহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদও প্রতিপন্ন হয় না। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" "রামানুজদর্শন" প্রবন্ধে মাধবাচার্য্যও "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন।

১। ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে। "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ "ত্বং অয়ং আত্মা' শব্দস্যাপি জীবশরীরব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ। বেদান্ত-তত্ত্বসার।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে বায়ুর অবতার পরমবৈষ্ণব শ্রীমান্ আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য একান্ত দ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ। তিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের অনুল্লিখিত অনেক শ্রুতি ও অনেক পুরাণবচনের দ্বারা একান্ত দ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ ভাষ্য মধ্বভাষ্য ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" "রামানুজদর্শনে"র পরে "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন"ও প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য বেদান্তদর্শনের "বিশেষণাচ্চ" (১।২।১২) এই সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার নিজমত সমর্থনের জন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদের সত্যতা-বোধক যে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে" ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সর্ব্বসম্বাদিনী" গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী মধ্বভাষ্যের নাম করিয়াই মধ্বাচার্য্যের প্রদর্শিত ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। মধ্বাচার্য্য বা আনন্দতীর্থের মতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অত্যন্ত ভেদই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত এবং বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব। তাঁহার মতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবের সাদৃশ্যবিশেষই প্রকটিত হইয়াছে; জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ প্রকটিত হয় নাই! কারন, অন্যান্য বহু শ্রুতি ও স্মৃতিতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদই সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের "আদিত্যো যূপঃ" এই বেদবাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যবিশেষ-বোধেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন যজ্ঞীয় যূপ আদিত্য না হইলেও উহাকে আদিত্যের সদৃশ বলিবার জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আদিত্যো যূপঃ", তদ্রূপ জীব ব্রহ্ম না হইলেও তাহাকে ব্রহ্মসদৃশ বলিবার জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। পরন্তু মুণ্ডক উপনিষদে যখন "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের পরম সাদৃশ্য লাভ করেন, ইহাই কথিত হইয়াছে, তখন পরবর্ত্তী "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই (মুণ্ডক ৩।২।৩) শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের সদৃশ হন, ব্রহ্মস্বরূপ হন না, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে[২]। কারণ, ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মস্বরূপ হইলে তাঁহার সম্বন্ধে ব্রহ্মের সাম্যলাভের কথা সংগত হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থে

১। "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা, সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণাঃ।" মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত পৈঙ্গীশ্রুতি। "আত্মাহি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ।" মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত ভাল্লবেয় শ্রুতি।

যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদঃ সত্যো বিনিশ্চয়াৎ।
এবমেবহি মে বাচং সত্যাং কর্ত্তুমিহার্হসি।
যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরং।
তেন সত্যেন মাং দেবাস্ত্রায়ন্তু সহ কেশবাঃ॥—মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত স্মৃতিবচন।

২। "নচ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতিবলাজ্জীবস্য পারমৈশ্বর্য্যং শক্যাশঙ্কং, "সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবে"দিতিবদ্বৃংহিতো ভবতীত্যর্থপরত্বাৎ।"—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।

"ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে "এব" শব্দেরই সাদৃশ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি অমরকোষের অব্যয়বর্গের 'বদ্‌বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া "এব" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।

"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মাধবাচার্য্য মধ্বমতের বর্ণন করিতে শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে[১], অথবা "স আত্মা তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যে "অতত্ত্বমসি" এইরূপ বাক্যই গ্রহণ করিয়া "ত্বং তন্ন ভবসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম নহ, তুমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য মহামনীষী মাধবমুকুন্দ "পরপক্ষগিরিবজ্র" নামক গ্রন্থের শেষে পক্ষান্তরে "অতত্ত্বমসি" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া "অতৎ" এই বাক্যে "নঞ্‌" শব্দের অর্থ সাদৃশ্য, ইহাই বলিয়াছেন[২]। অর্থাৎ যেমন "অব্রাহ্মণঃ" এই বাক্যে "নঞ্‌" শব্দের অর্থ সাদৃশ্য, সুতরাং "অব্রাহ্মণ" শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণ-সদৃশ, এই অর্থ বুঝা যায়, তদ্রূপ "অতৎ ত্বমসি" এই বাক্যে "অতৎ" শব্দের দ্বারা তৎসদৃশ অর্থাৎ ব্রহ্মসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। বস্তুতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে যদি "স আত্মা অতৎত্বমসি" এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদই বুঝিতে হয়, যে কারণেই হউক, যদি কষ্ট কল্পনা করিয়া ঐ বাক্যে "অতত্ত্বমসি" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পক্ষে মাধ্বমতানুসারে নঞ্‌ শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন, সন্দেহ নাই। মাধবাচার্য্য "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে" মাধ্বমতের বর্ণনা করিতে শেষে ঐ পক্ষে কেন যে ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহা চিন্তনীয়। মাধবাচার্য্য মাধ্বমতের সমর্থন করিতে "মহোপনিষৎ" বলিয়া যে সমস্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নয়টি দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থে ঐ সমস্ত শ্রুতি অনুসারে সেই নব দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা পাওয়ায় এবং ঐ গ্রন্থে দ্বৈতবাদ পক্ষে উপনিষদের উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিষদের দ্বারাই দ্বৈতবাদের বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত কথা এখানে সংক্ষেপে প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা উপনিষদের ব্যাখ্যার দ্বারা দ্বৈতবাদ বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন এবং অদ্বৈতবাদের সম্যক্‌ সমালোচনা করিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের "অথগুার্থগিরিনিপাত" প্রকরণের পরেই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যায় লক্ষণা বিচারেও বহু নূতন কথা পাওয়া যায়। পরন্তু সেখানে প্রথমে পক্ষান্তরে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে লক্ষণা ত্যাগ করিয়া "তৎ" শব্দের উত্তর তৃতীয়াদি বিভক্তির লোপ স্বীকারপূর্ব্বক "তত্ত্বমসি"

১। অথবা "তত্ত্বমসীত্যত্র স এবাত্মা, স্বাতন্ত্র্যাদিগুণোপেতত্বাৎ। অতত্ত্বমসি ত্বং তন্ন ভবসি, তদ্রহিতত্বা-দিত্যেকত্বমতিশয়েন নিরাকৃতং। তদাহ অতত্ত্বমিতি বা চ্ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতমিতি।"—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।

২। যদ্বা "শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ ঘটবদিত্যত্র যথাদৃষ্টান্তানুসারাদনিত্য ইতি পদচ্ছেদস্তথা ভেদবোধক-নবদৃষ্টান্তানুসারাৎ অতত্ত্বমসীতি পদচ্ছেদঃ নিশ্চিতস্তত্ত্বপূর্ণজ্ঞানানন্দত্বাদিনা নঞা সাদৃশ্যবোধনাৎ ইত্যাদি।"—পরপক্ষ-গিরিবজ্র, ১ম অধ্যায়, ৭ম প্রকরণ।

এই বাক্যের (১) "তেন ত্বং তিষ্ঠসি", (২) "তস্মৈ ত্বং তিষ্ঠসি", (৩) "ততঃ সঞ্জাতঃ," (৪) "তস্য ত্বং," (৫) "তস্মিন্ ত্বং," এই পাঁচ প্রকার অর্থেরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে[১]। মধ্বাচার্য্য নিজে পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিয়া মাধ্বমত সমর্থন করিবার জন্য "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের কষ্টকল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পরপক্ষগিরিবজ্র"কার নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মাধ্বমতের সমর্থন করিতেও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মাধ্বভাষ্যেও ঐরূপ কোন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই না। সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফলে এবং নিশ্চিন্তচিত্তে সতত শাস্ত্রচর্চ্চার ফলে ক্রমশঃ ঐরূপ আরও যে কত প্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? তবে নৈয়ায়িক ও মীমাংসক-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই।

সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, মধ্বাচার্য্য জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তিনি নিম্বার্কস্বামীর ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। মধ্বাচার্য্য বেদান্তদর্শনের "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে প্রথমে জীব ঈশ্বরের অংশ, এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পরে জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়েও শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করতঃ পরে অন্যান্য শ্রুতি ও বরাহপুরাণের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া,জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু জীব ঈশ্বরের অংশ হইলে জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়ে তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণের কিরূপে উপপত্তি হইবে? এবং তাহা হইলে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার যেমন ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ঈশ্বর হইতে বস্তুতঃই অভিন্ন, তদ্রূপ ঈশ্বরের অংশ জীবও ঈশ্বর হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের সহিত জীবের তুল্যতার আপত্তি হয়। মধ্বাচার্য্য পরে "প্রকাশাদিবন্নৈবংপরঃ" (২।৩।৪৬) ইত্যাদি কতিপয় বেদান্তসূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার সারকথা এই যে, মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ ঈশ্বরের স্বাংশ, অর্থাৎ স্বরূপাংশ, এবং জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। অংশ দ্বিবিধ—(১) স্বাংশ ও (২) বিভিন্নাংশ। মধ্বাচার্য্য "স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে" ইত্যাদি বরাহপুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মাধ্বভাষ্যের "তত্ত্বপ্রকাশিকা"

১। অস্তু বা তচ্ছব্দাৎ পরত্র তৃতীয়াদিবিভক্তেঃ 'সুপাং সুলুগিত্যাদিনা প্রথমৈকবচনাদেশো বা লুগ্ বা, তথাচ তেন ত্বং তিষ্ঠসি, তস্মৈ ত্বং তিষ্ঠসীতি বা, ততঃ সঞ্জাত ইতি বা তস্য ত্বমিতি বা, তস্মিংস্ত্বমিতি বা বাক্যার্থঃ, অনেন জীবেনাত্মনাহনুভূতঃ, পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি। সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ, সংপ্রতিষ্ঠাঃ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি বাক্যশেষা ইত্যাদি।—পরপক্ষগিরিবজ্র, ১ম অঃ, ৭।

টীকাকার জয়তীর্থ মুনি মধ্বাচার্য্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়ে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণের ন্যায় ঈশ্বরের স্বাংশ বা স্বরূপাংশ নহে এবং জীব ঈশ্বরের অংশ, এ বিষয়ে যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। নচেৎ উক্ত দ্বিবিধ শ্রুতির অন্য কোনরূপে বিরোধ পরিহার হইতে পারে না। সুতরাং মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত দ্বিবিধ শ্রুতির অন্যরূপে উপপত্তি সম্ভব না হওয়ায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়া, শাস্ত্রে যেখানে অভেদ কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে অংশত্ব। অর্থাৎ জীবে ঈশ্বরের অংশত্ব আছে, বাস্তব অভেদ নাই। মধ্বাচার্য্য পরে "আভাস এব চ" (২।৩।৫০) এই বেদান্তসূত্রের দ্বারা জীব যে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ, ইহাও সমর্থন করিয়া, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ ঈশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ নহেন বলিয়া জীবের সহিত উহাঁদিগের তুল্যত্বাপত্তির নিরাস করিয়াছেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্বাংশ এবং স্বরূপাংশ, এই দ্বিবিধ অংশ আছে, এ বিষয়েও বরাহপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। সেই প্রমাণে "প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে অংশে অংশীর সামান্য সাদৃশ্য আছে, তাহাকে বলে প্রতিবিম্বাংশ। ইহাই পূর্ব্বে "বিভিন্নাংশ" নামে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ, জীবও চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং অন্যান্যরূপে জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ থাকিলেও ঐ উভয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও আছে। এই জন্যই ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ জীব তাঁহার প্রতিবিম্বাংশ বলিয়াও কথিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত-সূত্রে "আভাস" শব্দের দ্বারা জীবের প্রতিবিম্বত্ববশতঃ মিথ্যাত্বই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের মতে জীব সত্য। জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ হইলেও মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ, জীবে ঈশ্বরের সাদৃশ্যপ্রযুক্তই জীবকে "আভাস" বলা হইয়াছে। ঐ তাৎপর্য্যেই "আভাস" ও "প্রতিবিম্ব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত "প্রতিবিম্বে স্বল্প-সাম্যং" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও উহাই সমর্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন পুত্রে পিতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যপ্রযুক্তই পুত্রকে পিতার প্রতিবিম্ব বা ছায়া বলা হয়, কিন্তু পুত্র পিতা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ ও সত্য, তদ্রূপ পরমেশ্বরের পুত্র জীবগণও তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য-প্রযুক্তই পরমেশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু জীবগণ পরমেশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ ও সত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অংশ দ্বিবিধ—স্বরূপাংশ ও বিভিন্নাংশ; মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ ঈশ্বরের স্বরূপাংশ বলিয়াই ঈশ্বর হইতে তাঁহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু জীব, ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে, ইহাই মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত, এবং বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মত, ইহা বুঝা যায়। এই মতে অংশ হইলেই তাহা অংশী হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হয় না। জীব ঈশ্বরের সম্বন্ধী, এই তাৎপর্য্যেও জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা যায়। ঐরূপ তাৎপর্য্যে ভিন্ন পদার্থও অংশ বলিয়া কথিত হয়, ইহা র

অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নিম্বার্ক স্বামী জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বরূপতঃই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই বাস্তব তত্ত্ব। পরবর্ত্তী কালে মধ্বশিষ্য ব্যাসতীর্থ ও মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও অনেক মহানৈয়ায়িক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাধ্বমতের বিশেষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে "ন্যায়ামৃত" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে অনেক সূক্ষ্ম বিচার পাওয়া যায়। মাধ্বসম্প্রদায়ের অমুদ্রিত অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও উক্ত মতের বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায়। ফলকথা, মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাচীন দ্বৈতবাদ যে দেশবিশেষে ও সম্প্রদায়বিশেষে বিশেষরূপে সমাদৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্ট মত গ্রহণ করিলেও তিনিও মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণও উক্ত বিষয়ে মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমার মনে হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত বৈষ্ণবগণও বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার সম্প্রদায়-রক্ষক শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের আধুনিক টিপ্পনীকারগণও ঐ ভাবের কথাই লিখিয়াছেন। সুতরাং এখানে উক্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের কথার সমালোচনা করা আবশ্যক। উক্ত মতের মূল বিষয়ে বহু জিজ্ঞাসার পরে কোন বহু-বিজ্ঞ বৃদ্ধ গোস্বামী পণ্ডিত মহোদয়ের নিকটে জানিতে পাই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী কল্পান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,[১] তদ্দ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তুর অংশ জীব, এবং ঐ ব্রহ্মের শক্তি মায়া ও ব্রহ্মের কার্য্য জগৎ, এই সমস্ত ঐ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। সেখানে "ব্যাখ্যালেশ"কার শ্রীধর স্বামীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, শ্রীধর স্বামীর মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই তত্ত্ব, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদবাদই চরম সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি অনেক গ্রন্থে যখন জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, তখন জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাবে ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। নিম্বার্ক স্বামীও ঐ জন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়কেই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 'তত্ত্বসন্দর্ভে' ব্রহ্মতত্ত্বকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। তিনি "পরমাত্মসন্দর্ভে"ও

১। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং। ভাগবত, ২য় শ্লোক। যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোহংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথগিতি বেদ্যং অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ।—স্বামিটীকা।

শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশ ও অভেদ নির্দ্দেশের উপপাদন করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ হইয়াছে, এবং যাঁহারা ভক্তিলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উপদেশ হইয়াছে। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামীর ঐ সকল কথা দ্বারা তিনি যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের ন্যায় অভেদও স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় ভক্ত সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ করিতে বলিয়াছিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" (মধ্যম খণ্ড, ২০শ পরিচ্ছেদ)। উক্ত শ্লোকে জীবের স্বরূপ বলিতে "ভেদাভেদ-প্রকাশ" এই কথার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই তত্ত্ব, ঐ উভয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গোস্বামিপাদগণ জীব ও ব্রহ্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে।

পূর্ব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের শেষে কল্পান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভেদাভেদবাদই বুঝা যায় না। কারণ, তিনি সেখানে জীবাদির উল্লেখ করিয়া "তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব" এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। সুতরাং উহার দ্বারা জীব প্রভৃতি সেই ব্রহ্মবস্তু হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে উহাদিগের বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই, এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তই তাঁহার বিবক্ষিত মনে হয়। পরন্তু শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে উহার দ্বারা শেষে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে শ্রীধর স্বামিপাদের যে ঐরূপই আশয়, অর্থাৎ তিনি যে ঐ শ্লোকের দ্বারা শেষে অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকেও তিনি শেষে অদ্বৈত সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপই তাৎপর্য্য, ইহাই মনে হয়। কিন্তু যদিও শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামীকে অমান্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীধরস্বামী মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিলেও শ্রীচৈতন্যদেব উহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে মায়াবাদের খণ্ডন করিয়াছিলেন, মায়াবাদের নিন্দাও করিয়াছিলেন, এমন কি, ইহাও বলিয়াছিলেন,—"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" (চৈতন্যচরিতামৃত,মধ্যখণ্ড,৬ষ্ঠ পঃ)। ফলকথা, শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাত সমস্ত মতই যে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত, ইহা কোনরূপেই বলা যাইবে না। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা কথিত হইলেও তদ্দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ, উভয়ই আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ হইলে তাহাতে স্বরূপতঃ ঈশ্বরের অভেদ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার পরে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথার দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের যে

স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ, উভয়ই তত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায় না। উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশ আছে, তদ্রূপ অভেদেরও প্রকাশ আছে। কিন্তু সেই অভেদ তত্ত্বতঃ অভেদ নহে, উহা জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বাদিপ্রযুক্ত অভেদ। শাস্ত্রে ঐরূপ অভেদ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য আছে, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ কথার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ বুঝা যায় না। কারণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্য শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব যে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ একেবারেই স্বীকার করিতেন না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতে শ্রীচৈতন্যদেবের যে সকল উক্তি "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আছে,—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীবে ঈশ্বর সহ করহ অভেদ ?॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে ?॥"

(মধ্যম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোকের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর মায়ার অধীশ অর্থাৎ মায়া তাঁহার অধীন, কিন্তু জীব মায়ার অধীন, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না। কারণ, জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্বতঃ অভেদ থাকিলে ঈশ্বরকেও মায়ার অধীন বলিতে হয়। ঈশ্বরেরও জীবগত দোষের আপত্তি হয়। দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান শক্তি বলিয়াই ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ জীবকে ঈশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন বলা যায় না। কারণ, জীব ঈশ্বরের শক্তি হইলে ঈশ্বর আশ্রয়, ঐ শক্তি তাঁহার আশ্রিত, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ শক্তি ও শক্তিমানের স্বরূপতঃ কখনই অভেদ থাকিতে পারে না। কারণ, আশ্রয় ও আশ্রিত সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হইয়া থাকে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আধুনিক কোন প্রখ্যাত বাঙ্গালী বৈষ্ণব, মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবও যে নিম্বার্ক-মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদী ছিলেন, ইহা সমর্থন করিতে নিজকৃত নিম্বার্কভাষ্য-ভূমিকায় পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকে এবং পরে যে বহু বিজ্ঞ গোস্বামী পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংশোধনপূর্ব্বক ব্যাখ্যা সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে "হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ স্থলে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" এইরূপ পাঠ প্রকৃত হইতেই পারে না। কারণ, ঐ স্থলে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের বর্ণনানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে জীব ও ঈশ্বরের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের খণ্ডন করিতেই ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে যখন জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদই নাই, তখন অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে ঐ ভেদ খণ্ডন করা কোন-

রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। যিনি জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদই মানেন না, তাহা বলেনও নাই, তাঁহাকে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এই কথা কিরূপে বলা যায়? শ্রীচৈতন্যদেব ঐ কথা কিরূপে বলিতে পারেন? ইহা অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে। অবশ্য ঐ স্থলে "হেন জীবে ভেদ কর" এইরূপ পাঠ হইলেও "ভেদ" শব্দের বিয়োগ বা বিভাগ অর্থ গ্রহণ করিয়া এক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং ঐ কথার দ্বারা অদ্বৈতবাদের খণ্ডনও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উহা প্রকৃত পাঠ নহে। "হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?" ইহাই প্রকৃত পাঠ[১]। তাহা হইলে এখন পাঠকগণ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করুন যে, উক্ত দুই শ্লোকে "হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহত অভেদ?" এবং "হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?" এই কথার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের কি মত বুঝা যায়। যদি ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদও থাকে, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা স্বরূপতঃ অভেদের ঐরূপ নিষেধ উপপন্ন হইতে পারে? পরন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্রও পাওয়া যায়, "কাহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর। কাহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥" (অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম পঃ)। উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদেরই নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথার দ্বারা শাস্ত্রে যাহাতে ঈশ্বরের সহিত ভেদ প্রকাশ ও অভেদ প্রকাশ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামী যে "অভেদ নির্দ্দেশ" বলিয়া উহার উপপাদন করিয়াছেন, তাহাই "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" "অভেদ প্রকাশ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেখানে "প্রকাশ" শব্দের প্রয়োগ কেন হইয়াছে, উহার অর্থ ও প্রয়োজন কি? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ ও জীব স্ফুলিঙ্গ কণার সদৃশ, ইহা কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদ বুঝা যায় না। কারণ, অন্যান্য শ্লোকের দ্বারা স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় ঈশ্বর ও জীবের অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের সহিত যথাসম্ভব সাদৃশ্যই সেখানে বুঝিতে হইবে, অসম্ভব সাদৃশ্য বুঝা যাইবে না। জীবচৈতন্য নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় এবং উহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত উহার অনেক অংশে সাদৃশ্য সম্ভবও নহে। পরন্তু জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হইলেও তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, এ জন্যই ভিন্ন পদার্থ হইয়াও ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ইহাই বলিয়াছেন[২] এবং তিনিও গোবিন্দভাষ্যে মাধ্বমতানুসারেই জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়াছেন। জীব ঈশ্বরের

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুথিশালায় সংরক্ষিত হস্ত-লিখিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে "হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পুস্তকের লিপিকাল ১০৮০ বঙ্গাব্দ।

২। স চ তদভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগদ্যতে ইত্যাদি।—সিদ্ধান্তরত্ন, ৮ম পাদ।

বিভিন্নাংশ বলিয়াই ঈশ্বরের সহিত তাহার স্বরূপতঃ অভেদ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও ঈশ্বরের অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ, এবং জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ, ইহা কথিত হইয়াছে। যথা—"স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥" (মধ্যম খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ)। ফলকথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব যে, নিম্বার্কমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী ছিলেন, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বহু শ্লোকের দ্বারাই তিনি মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদী ছিলেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। তবে উক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত মত নির্ণয় করিতে হইলে তিনি যে ভক্তচূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমুখে তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন,সেই সনাতন গোস্বামীর নিকটে শিক্ষিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের আদেশে বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,তিনি উক্ত বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থে নানা স্থানে নানারূপ কথা আছে। তাঁহাদিগের সমস্ত কথার সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মত নির্ণয় করা এবং তাঁহাদিগের নানা কথায় নানা আপত্তির নিরাস করা অতি দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। তথাপি বহু চিন্তা ও পরিশ্রমে ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেব নিম্বার্কমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত তাঁহার মতের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে তিনি যে মাধ্বমতকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও যে উক্ত মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমার বোধ হইয়াছে। ক্রমশঃ ইহার কারণ বলিতেছি।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকে তুল্যভাবে মধ্বাচার্য্যের প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে নিম্বার্ক অথবা অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই। পরন্তু শ্রীজীব গোস্বামীও "তত্ত্বসন্দর্ভে" "শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ" ইত্যাদি এবং "তত্ত্ববাদগুরূণাং... শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মধ্বাচার্য্যের প্রতি অত্যাদর প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মধ্বাচার্য্যের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অত্যাদরের কারণ প্রকাশ করিতে হেতু বলিয়াছেন, "স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ"। সুতরাং তাঁহার ঐ কথার দ্বারাও শ্রীজীবগোস্বামী যে, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির মতই সাদরে গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় তুল্যভাবে মধ্বাচার্য্যের

প্রভৃতিও অত্যাদর প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত মতানুসারেই গোবিন্দভাষ্যে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কারণ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মতই শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃত, ইহা তাঁহার গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে[1] এবং তিনি যে, মধ্বাচার্য্যের "তত্ত্ববাদ" আশ্রয় করিয়াই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের শেষ শ্লোকের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায়[2]। ঐ গ্রন্থের বিস্তৃতম টীকাকারও সেখানে ঐ শ্লোকের প্রয়োজন বুঝাইতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে "মাধ্বান্বয়দীক্ষিতভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থ" বলিয়াছেন[3]। ঐ শ্লোকের শেষে যে, "তত্ত্ববাদ" বলা হইয়াছে, উহা মাধ্ব সিদ্ধান্তেরই নামান্তর। তাই মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ "তত্ত্ববাদী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণও অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বর্ণিত আছে এবং মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব বলিলেও শ্রীচৈতন্যদেব পরিপূর্ণশক্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়াছিলেন, ইহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। (মধ্যমখণ্ড, ৯ম ও ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পরতত্ত্ব বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মত হইতে শ্রীচৈতন্যদেব যে, বিশিষ্ট মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ কেবল ভেদই আছে, এই মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী "তত্ত্বসন্দর্ভে" জীবস্বরূপ বর্ণনের পরে বলিয়াছেন যে,[4] এবস্তূত জীবসমূহের চিন্মাত্র যে স্বরূপ, তাহার সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃ সেই জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা এই গ্রন্থে বাচ্য। এখানে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, শ্রীজীব গোস্বামী

১। "অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরিস্বীকৃতমধ্বমুনিমতানুসারতো ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসুর্ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ" ইত্যাদি।

২। আনন্দতীর্থপ্রভূতমচ্যুতং মে চৈতন্যভাস্বৎপ্রভয়াতিফুল্লং।
চেতোঽরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবন্ত্বলিঃ সচ্ছবিতত্ত্ববাদঃ ॥
—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত "সিদ্ধান্তরত্নে"র শেষ শ্লোক।

৩। অথাত্মনঃ শ্রীমাধ্বান্বয়দীক্ষিতভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থত্বমাহ। "তত্ত্ববাদঃ";—সর্ব্বং বস্তু সত্যং ন কিঞ্চিদসত্যমস্তীতি মধ্বরাদ্ধান্তঃ।—উক্ত শ্লোকের টীকা।

৪। "এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপং তদৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেনচ তদভিন্নং যৎ তত্ত্বং তদত্র বাচ্যমিতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা প্রোক্তং"। তত্ত্বসন্দর্ভ। ঈশ্বরজ্ঞানার্থং জীবস্বরূপজ্ঞানং নির্ণীতং, অথ তৎসাদৃশ্যেনেশ্বরস্বরূপং নির্ণেতুং পূর্ব্বোক্তং যোজয়তি, "এবম্ভূতানা"মিত্যাদিনা। "তদৈবাকৃত্যে"তি, চিন্মাত্রত্বে সতি চেতয়িতৃত্বং যাকৃতির্জ্জাতিস্তয়া ইত্যর্থঃ। তদংশিত্বেন জীবাংশিত্বেন চেত্যর্থঃ"। "অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ"। জীবাদিশক্তিমদ্‌ব্রহ্মসমষ্টিঃ, জীবস্তু ব্যষ্টিঃ। তাদৃশজীবনিরূপণদ্বারা শাস্ত্রস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমুক্তং। অত্র জীবাদিশক্তিবিশিষ্টসমষ্টিব্রহ্মনিরূপণেন তস্য তথাত্বং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। —বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত টীকা।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রথমে জীবস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন কেন? ইহার কারণ বলিতেই—উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে যে, জীবস্বরূপ বুঝা আবশ্যক, ইহা প্র াশ করিয়াছেন। তিনি জীবসমূহকেও অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ের "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" ॥ এই (৫ম) শ্লোকের এবং বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি বচন[১] এবং আরও অনেক শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা জীবসমূহকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জীব ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান শক্তিবিশেষ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্‌গীতা-বাক্যের দ্বারা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। অসংখ্য জীবচৈতন্য ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের সহায়, জীব না থাকিলে তাঁহার সৃষ্ট্যাদি ও লীলা হইতে পারে না, এই জন্য জীবকে তাঁহার শক্তি বলা হইয়াছে। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" এই ভগবদ্‌গীতা-(১৮।৬১) বচনের দ্বারা প্রত্যেক জীবদেহে যে একই ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, এবং প্রত্যেক দেহে এক একটী জীবচৈতন্য সেই ঈশ্বরের অধীন হইয়া সেই ঈশ্বরের সহিতই নিত্য সংশ্লিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছে,ইহা বুঝিলে জীব ঈশ্বরের নিত্যসংশ্লিষ্ট শক্তি এবং তাঁহার মায়াশক্তির অধীন বলিয়া "তটস্থা শক্তি," ইহা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত জীব-শক্তি ঈশ্বরের নিত্য বিশেষণ; কারণ, ঈশ্বর সতত ঐ শক্তিবিশিষ্ট। ঈশ্বর তাঁহার বাস্তব অনন্ত শক্তি হইতে কখনই বিযুক্ত হন না, শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি কখনই থাকিতে পারে না। জীব প্রভৃতি অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট চৈতন্যই ঈশ্বর, তাঁহার নিত্য বিশেষণ ঐ অনন্তশক্তিকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নাই, পূর্ব্বোক্ত বাস্তব শক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বর-চৈতন্য হইতে অতিরিক্ত ব্রহ্মতত্ত্বও নাই, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে শ্রীজীব গোস্বামী জীব-শক্তিকে ঈশ্বরের নিত্য বিশেষণরূপ অংশ ও ব্যষ্টি লিখিয়াছেন এবং উহা বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে যে, তাঁহার জীবরূপ শক্তি বুঝা নিতান্ত আবশ্যক, সেই জন্যই তিনি পূর্ব্বে জীবস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে তিনি ব্রহ্মকে জীব হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলেন নাই, অর্থাৎ জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য যে তত্ত্বতঃ অভিন্ন বস্তু, ইহা তিনি বলেন নাই। কারণ, তিনি সেখানে ব্রহ্মকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিতে লিখিয়াছেন, "তদৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং যত্তত্ত্বং"। এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উক্ত বাক্যে ব্রহ্মে জীবের সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃ অভেদ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মও চৈতন্যস্বরূপ, জীবও চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং চিৎস্বরূপে ব্রহ্ম জীবের একাকৃতি অর্থাৎ সজাতীয়, এবং জীব ব্রহ্মের নিত্য-সিদ্ধ বিশেষণ, ব্রহ্ম কখনই জীবশক্তি হইতে বিযুক্ত হন না, জীবশক্তিকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ

১। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ —বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭।৬১।

নিঃশক্তি চৈতন্যমাত্রের অস্তিত্বই নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে জীবের অংশী বলা হইয়াছে। জীবকে ব্রহ্মের অংশ ও ব্যষ্টি বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ব-বশতঃ জীব হইতে অভিন্ন, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ বলা হয় না। তাহা হইলে শ্রীজীব গোস্বামী ঐ স্থলে "স্বরূপতস্তদভিন্নং" এই কথা না বলিয়া "তদ্বৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং" এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্বোক্ত স্থলে শ্রীজীব গোস্বামীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন, "অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ।" অর্থাৎ দণ্ডী পুরুষ যেমন তাঁহার বিশেষণ দণ্ড হইতে বিযুক্ত হন না, তাহা হইলে তাঁহাকে তখন দণ্ডী বলা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বর তাঁহার নিত্য-বিশেষণ জীবশক্তি হইতে কখনই বিযুক্ত হন না। তাই ঈশ্বরকে অংশী বলিয়া জীব শক্তিকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। দণ্ডী পুরুষের বিশেষণ দণ্ডকে যেমন ঐ দণ্ডী পুরুষের অংশ বলা যায়, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিত্যসম্বদ্ধ বিশেষণ জীবশক্তিকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডী পুরুষ ও দণ্ডের যেমন স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে। ফলকথা, এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় দণ্ডী পুরুষ ও তাঁহার দণ্ডকে যখন অংশী ও অংশের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অংশী ঈশ্বর ও অংশ জীবের দণ্ডী পুরুষ ও দণ্ডের ন্যায় স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ প্রদর্শনই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। নচেৎ তিনি অন্যান্য দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া ঐ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবেন কেন? এবং স্বরূপতঃ অভেদ পক্ষে তাঁহার ঐ দৃষ্টান্ত কিরূপেই বা সংগত হইবে? ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। এখন যদি অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদই তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত টীকাসন্দর্ভে "ন ভিদ্যতে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে "ন বিযুজ্যতে"। বিয়োগ বা বিভাগ অর্থেও 'ভিদ' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়, উহা অপ্রামাণিক নহে। পরন্তু শ্রীজীব গোস্বামী "তত্ত্বসন্দর্ভে" পূর্ব্বে জীব ও ঈশ্বরের অভেদবোধক শাস্ত্রের বিরোধপরিহারের জন্য জীব ও ঈশ্বর, এই উভয়ের চৈতন্যরূপতাবশতঃ যে অভেদ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশের আরও অনেক হেতু বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বরে স্বরূপতঃ অভেদ নাই বলিয়াই তিনি অভেদ-বোধক শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করিতে ঐ সমস্ত হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীজীব গোস্বামীর বক্তব্য[1] বুঝাইয়া, উপসংহারে তাঁহার মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়াই

১। "অত এব অভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন" ইত্যাদি।—তত্ত্বসন্দর্ভ। "কেন হেতুনা ইত্যাহ। উভয়োরীশজীবয়োশ্চিদ্রূপত্বেন হেতুনা। যথা গৌরশ্যাময়োস্তরুণকুমারয়োর্ব্বা বিপ্রয়োর্ব্বিপ্রত্বেনৈক্যং ততশ্চ জাত্যৈবাভেদে ন তু ব্যক্ত্যোরিত্যর্থঃ। তথাচাত্র "ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং"।—টীকা।

প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—"তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং।" তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝাইয়াছেন যে, যেমন গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অথবা যুবক ও বালক ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্বরূপে ঐক্য থাকায় জাতিরূপে অভেদ আছে; কিন্তু ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ নাই অর্থাৎ জাতিগত অভেদ থাকিলেও ব্যক্তিগত অভেদ নাই, তদ্রূপ জীবও চৈতন্যস্বরূপ, ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং উভয়েই চিৎস্বরূপে একজাতীয় বলিয়া শাস্ত্রে ঐরূপ তাৎপর্য্যে উভয়ের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে, কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ভেদই আছে। এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীজীব গোস্বামিপাদের পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন ও স্পষ্ট প্রকাশ করায় জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদ যে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের অষ্টম পাদে ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়া, ঐ মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। সেখানে তিনি জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে দোষও বলিয়াছেন[১] এবং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদও তত্ত্ব হইলে ঐ অভেদের জ্ঞানবশতঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইতে পারে না, ইহাও অনেক স্থানে বলিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ ভেদপক্ষই অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে মাধ্বসিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন। শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশ আছে কেন? ইহা বুঝাইতে তিনিও "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের শেষে ঐ অভেদ নির্দ্দেশের অনেক হেতু বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী "পরমাত্মসন্দর্ভে"ও শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশের ন্যায় অভেদ নির্দ্দেশও আছে, ইহা স্বীকার করিয়া, উহার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরানুপ্রবেশবশতঃ এবং শক্তিমান্ ব্যতিরেকে শক্তির অসম্ভাবশতঃ এবং জীব ও ঈশ্বর, এই উভয়ের চৈতন্যস্বরূপতার অবিশেষবশতঃ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। পরে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানেচ্ছু অধিকারিবিশেষের জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিলাভেচ্ছু অধিকারীদিগের জন্য জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। পরে "ভক্তিসন্দর্ভে" তিনি কৈবল্যকামী অধিকারিবিশেষের কৈবল্য মুক্তিলাভের কারণ জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবিশেষও বলিয়াছেন এবং সেখানে "অহংগ্রহ উপাসনা" অর্থাৎ সোঽহং জ্ঞানরূপ উপাসনা যে শুদ্ধ ভক্তগণের বিদ্বিষ্ট, তাঁহারা উহা করিতেই পারেন না, ইহাও বলিয়াছেন। সুতরাং কৈবল্যমুক্তি আছে এবং অধিকারিবিশেষের সাধনার ফলে উহা হইয়া থাকে। যাঁহারা কৈবল্য মুক্তিই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া উহাই ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐকাত্ম্যদর্শনরূপ জ্ঞানলাভের জন্য "সোঽহংজ্ঞান"রূপ উপাসনা করেন, এবং উহা তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়, ইহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদও স্বীকার করিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

১। যদি জীবেশয়োঃ স্বরূপেণৈবাভেদস্তর্হীশস্যাপি আংশিকসুখদুঃখভোগঃ, জীবস্য চ জগৎকর্তৃত্বাদি" ইত্যাদি। সিদ্ধান্তরত্ন, অষ্টমপাদ।

গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও বলিয়াছেন,—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥" (আদিখণ্ড, পঞ্চম পঃ)। ফলকথা, শ্রীজীব গোস্বামী জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদই তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি "পরমাত্মসন্দর্ভে" জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশের হেতু বলিয়া উহার অনুব্যাখ্যা "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈব একাকারত্বং বোধয়তি উপাসনাবিশেষার্থং ন তু বস্ত্বৈক্যং।" অর্থাৎ "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি যে অভেদবোধক বাক্য আছে, তাহা অধিকারিবিশেষের উপাসনাবিশেষের জন্য জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপতা প্রভৃতি কারণবশতঃই একাকারত্ব অর্থাৎ ঐ উভয়ের এক-জাতীয়ত্বের বোধক, কিন্তু বস্তুর ঐক্যবোধক নহে অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যে তত্ত্বতঃ এক বা অভিন্ন, ইহা ঐ সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, "তস্মাৎ তত্তদস-দ্ভাবাদ্ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানীত্যায়াতং" এবং বলিয়াছেন, "তস্মাৎ সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ।" এখানে "ভিন্নান্যেব" এবং "ভেদ এব" এই দুই স্থলে "এব" শব্দের দ্বারা স্বরূপতঃ অভেদেরই নিষেধ হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং "ন বস্ত্বৈক্যং" এই বাক্যের দ্বারাও জীব ও ঈশ্বর যে এক বস্তু নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামী যে, মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমা-দিগের সংশয় হয় না, এবং শ্রীজীব গোস্বামী নানা হেতুর উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের যে অভেদ নির্দ্দেশের উপপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথায় "অভেদ প্রকাশ" বলা হইয়াছে, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি। এখানে ইহা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক যে, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদও আছে, অভেদও আছে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ তাঁহাতে ঐ ভেদ ও অভেদ থাকিতে পারে, উহা তাঁহাতে বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই নিম্বার্কসম্প্রদায়-সম্মত জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার না করিয়া, একজাতীয়ত্বাদিপ্রযুক্ত অভেদ বলিলে ঐ মতকে ভেদাভেদবাদ বলা যায় না। তাহা হইলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দ্বৈতবাদিসম্প্রদায়কেও ভেদাভেদবাদী বলা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও চেতনস্বরূপে ও আত্মস্বরূপে জীব ও ঈশ্বর একজাতীয়। একজাতীয়ত্ব-বশতঃ তাঁহারাও জীব ও ঈশ্বরকে অভিন্ন বলিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভেদ অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভেদ না থাকিলে ভেদাভেদবাদ বলা যায় না। স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ, এই উভয়ই তত্ত্ব বলিলে সেই মতকেই "ভেদাভেদবাদ" বলা যায়। নিম্বার্কস্বামী ঐরূপ

সিদ্ধান্তই স্বীকার করায় তাঁহার মত "ভেদাভেদবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যখন জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদের খণ্ডনই করিয়াছেন, এবং উহা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদাভেদবাদেরও খণ্ডন করিয়াছেন, এবং উক্ত বিষয়ে মাধ্ব-সিদ্ধান্তেরই সমর্থনপূর্ব্বক স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদী বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে উপাদান কারণ ও তাহার কার্য্যের ভেদ ও অভেদ বিষয়ে নানা মতের উল্লেখ করিয়া, শেষে কোন সম্প্রদায়, উপাদান কারণ ও কার্য্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন, ইহা বলিয়াছেন। সেখানে পরে তাঁহার কথার দ্বারা তাঁহার নিজ মতেও যে, উপাদান কারণ ও কার্য্যের অচিন্ত্যভেদ ও অভেদ উভয়ই তত্ত্ব, ইহাও বুঝা যায়। সেখানে তিনি পূর্ব্বোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে,[১] অপর সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রহ্মপরিণামবাদী কোন সম্প্রদায়বিশেষ তর্কের দ্বারা উপাদান কারণ ও কার্য্যের ভেদ সাধন করিতে যাইয়া, তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় ভেদপক্ষে অসীম দোষ-সমূহ দর্শনবশতঃ উপাদান কারণ ও কার্য্যকে ভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারায়, অভেদ সাধন করিতে যাইয়া, ঐ পক্ষেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবশতঃ অসীম দোষসমূহের দর্শন হওয়ায় উপাদান কারণ ও কার্য্যকে অভিন্ন বলিয়াও চিন্তা করিতে না পারায় আবার ভেদও স্বীকার করিয়া, ঐ উভয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর উক্ত কথার দ্বারা, উক্ত মতবাদীদিগের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, উপাদান কারণ ও কার্য্যের ভেদ ও অভেদ, এই উভয় পক্ষেই তর্কের অবধি নাই, উহার কোন পক্ষেই তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় কেবল তর্কের দ্বারা উহার কোন পক্ষই সিদ্ধ করা যায় না। অথচ ঘটাদি কার্য্য ও উহার উপাদান কারণ মৃত্তিকাবিশেষের একরূপে ভেদ এবং অন্যরূপে যে অভেদও আছে, ইহাও অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ঐ উভয় পক্ষেই যখন অনেক যুক্তি আছে, তখন তর্ক পরিত্যাগ করিয়া, ঐ ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার্য্য। কিন্তু তর্ক করিতে গেলে যখন ঐ উভয় পক্ষেই অসীম দোষ দেখা যায়, এবং ঐ বিষয়ে তর্কের নিবৃত্তি না হওয়ায় ঐ ভেদ ও অভেদ উভয়কেই চিন্তা করিতে পারা যায় না, তখন ঐ উভয়কে "অচিন্ত্য" বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। "অচিন্ত্য" বলিতে এখানে তর্কের অবিষয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও "তত্ত্বসন্দর্ভের" টীকায় এক স্থানে "অচিন্ত্য" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, তর্কের অবিষয়। বস্তুতঃ যাহা "অচিন্ত্য", তাহা কেবল তর্কের বিষয় নহে। শ্রীজীব গোস্বামী

১। "অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ্ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতু-মশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদরপৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পাতঞ্জলিমতে চ ভেদ এব, শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব, অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।"—সর্ব্বসংবাদিনী।

প্রভৃতিও অনেক স্থানে উহা সমর্থন করিতে "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা কার্য্য ও কারণের ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়া, উহাকে তর্কের অবিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারা "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" এই কথাই বলিয়াছেন। আর যাঁহাদিগের মতে ঐ ভেদ ও অভেদ তর্কের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহারা কেবল "ভেদাভেদবাদ" এই কথাই বলিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মপরিণামবাদী অনেক বৈদান্তিক-সম্প্রদায় উপাদান কারণ ও কার্য্যের ভেদ ও অভেদ উভয়কেই তত্ত্ব বলিয়া ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়কেই তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও উহা লিখিয়াছেন এবং রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মতে স্বরূপতঃ কেবল ভেদই তত্ত্ব, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। শেষে তাঁহার নিজ মতে উপাদান কারণ ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য জগতের যে অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ উভয়ই তত্ত্ব, ইহা তাঁহার কথায় বুঝা যায়। তিনি সেখানে উহার উপপাদক হেতু বলিয়াছেন, "অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ।" অর্থাৎ ঈশ্বর যখন অচিন্ত্য শক্তিময়, তখন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে তাঁহাতে তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকিতে পারে, উহাও অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের বিষয় নহে। বস্তুতঃ শ্রীজীব গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম ও সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন চিন্তামণি নামে এক প্রকার মণি আছে, উহা তাহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াও স্বর্ণ প্রসব করে, ঐ স্বর্ণ সেই মণির সত্য পরিণাম, তদ্রূপ ঈশ্বরও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াও জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, জগৎ তাঁহার সত্য পরিণাম। এখানে জানা আবশ্যক যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেমন তাঁহার নিজসম্মত ও অচিন্ত্যশক্তি অনির্ব্বচনীয় মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, ঐ মায়ার মহিমায় ব্রহ্মে নানা বিরুদ্ধ কল্পনার সমর্থন করিয়া সকল দোষের পরিহার করিয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাঁহাদের নিজসম্মত ঈশ্বরের বাস্তব অচিন্ত্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির মহিমায় তাঁহাতে যে, নানা বিরুদ্ধ গুণেরও সমাবেশ আছে, অর্থাৎ তাঁহাতে গুণবিরোধ নাই এবং কোন প্রকার দোষ নাই, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে ইহাও বলিয়াছেন যে, জগৎ ঈশ্বরের সত্য পরিণাম, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সত্য অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে কিছুমাত্র বিকৃত হন না, ইহা জানিলে অর্থাৎ ঈশ্বরের বাস্তব অচিন্ত্য শক্তির জ্ঞানবশতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিবে, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদই গ্রাহ্য, অর্থাৎ উহাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ। মূলকথা, জগৎ ঈশ্বরের সত্য পরিণাম হইলে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ, জগৎ তাঁহার সত্য-কার্য্য, সুতরাং উপাদান কারণ ও কার্য্যের অভেদসাধক যুক্তির দ্বারা জগৎ ও ঈশ্বরের অভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু চেতন ঈশ্বর হইতে জড় জগতের একেবারে অভেদ কোনরূপেই বলা যায় না। এ জন্য ভেদ ও

স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগতের অত্যন্ত ভেদও বলা যায় না, অত্যন্ত অভেদও বলা যায় না ; ভেদ ও অভেদ, এই উভয় পক্ষেই তর্কের অবধি নাই। সুতরাং বুঝা যায় যে, উহা তর্কের বিষয় নহে, অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগতের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই আছে,—কিন্তু উহা অচিন্ত্য, কেবল তর্কের দ্বারা উহা সিদ্ধ করা যায় না, কিন্তু উহা স্বীকার্য্য। কারণ, ঈশ্বরই যখন জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন জগৎ যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং জড় জগৎ যে চেতন ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামীর "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থের পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বুঝা গেলেও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিন্তু বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে উপাদান-কারণ ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য জগতের অভেদ পক্ষই কেবল সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের অষ্টম পাদে কার্য্য ও কারণের ভেদাভেদবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা কার্য্য ও কারণের পূর্ব্বোক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদও পাই নাই। সে যাহা হউক, শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জগতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বুঝিতে পারিলেও ঐ মত যে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় স্বীকার করিতেন, অর্থাৎ উহাও কোন প্রাচীন মত, ইহা তাঁহার কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু উহা জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ নহে। জীবচৈতন্য নিত্য, উহা জগতের ন্যায় ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঈশ্বর জীবের উপাদান কারণ না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত মতে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইলেও জীবরূপে পরিণত হন নাই, জীব ব্রহ্মের বিবর্ত্তও নহে, অর্থাৎ অদ্বৈতমতানুসারে অবিদ্যাকল্পিত নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদসাধক কোন যুক্তি নাই। পরন্তু জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদসাধক বহু শাস্ত্র ও যুক্তি থাকায় স্বরূপতঃ কেবল ভেদই সিদ্ধ হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের চিৎস্বরূপে একজাতীয়ত্ব বা সাদৃশ্যাদিই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বর যে, স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ তত্ত্বতঃ একই বস্তু, ইহা বুঝা যাইবে না। তাই শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "নতু বস্ত্বৈক্যং", "ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানি", "সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ"। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্রীজীব গোস্বামীর "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে যেমন ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্ব জাতিরূপে অভেদ থাকিলেও ব্যক্তির স্বরূপতঃ অভেদ নাই, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অভেদ নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং।" পরন্তু তাঁহার গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে তিনি যে, শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃত পূর্ব্বোক্ত মাধ্বমতানুসারেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও লিখিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণের গ্রন্থে আরও অনেক স্থানে অনেক কথা পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা তাঁহারা যে মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদী

ছিলেন এবং ঐ ঐকান্তিক ভেদ বিশ্বাসবশতঃই ভক্তিসাধন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য কথা লিখিত হইল না। পাঠকগণ পূর্ব্বলিখিত সমস্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের সমালোচনা করিবেন।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতেই জীবাত্মা অণু, সুতরাং প্রতি শরীরে ভিন্ন ও অসংখ্য। সুতরাং তাঁহাদিগের সকলের মতেই জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ আছে। বস্তুতঃ জীবের অণুত্ব ও বিভুত্ব বিষয়ে সুপ্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৭ম অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকেও উক্ত মতভেদের সূচনা পাওয়া যায়। চরকসংহিতার শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়ে "দেহী সর্ব্বগতো হ্যাত্মা" এবং "বিভুত্বমত এবাস্য যস্মাৎ সর্ব্বগতো মহান্" (২৩।২৪) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা চরকের মতে জীবাত্মার বিভুত্ব বুঝা যায়। সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়েও প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েরই সর্ব্বগতত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে জীবাত্মা অণু বলিয়াই উপদিষ্ট, ইহাও সুশ্রুত বলিয়াছেন[১]। জীবের অণুত্ববাদী সকল সম্প্রদায়ই "বালাগ্র-শতভাগস্য" ইত্যাদি[২] শ্রুতি এবং "এষোঽণুরাত্মা" ইত্যাদি (মুণ্ডক, ৩।১।৯) শ্রুতির দ্বারা জীবের অণুত্ব ও নানাত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারাও জীবের সহিত ঈশ্বরের বাস্তব ভেদও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং যে ভাবেই হউক, জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদবাদ যে, সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের "অবিরোধশ্চন্দনবিন্দুবৎ" (২।৩।২৩) এই সূত্রকে সিদ্ধান্তসূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া, উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন হরিচন্দনবিন্দু শরীরের কোন একদেশস্থ হইলেও উহা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়, সর্ব্বশরীরেই উহার কার্য্য হয়, তদ্রূপ অণু জীব, শরীরের কোন এক স্থানে থাকিলেও সর্ব্বশরীরেই উহার কার্য্য সুখ দুঃখাদি ও তাহার উপলব্ধি জন্মে। মধ্বাচার্য্য সেখানে এ বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একটি বচনও[৩] উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত সেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" এইরূপ বাক্যকেও শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সমাধানের খণ্ডনপূর্ব্বক নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবের অণুত্ববাদকে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, জীবের বিভুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যেখানে জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়, অণুপরিমাণ নহে।

১। ন চায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষূপদিশ্যন্তে সর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ অসর্ব্বগতেষু চ ক্ষেত্রজ্ঞেষু ইত্যাদি।—শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৬।১৭।

২। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥—শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯।

৩। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ॥—মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।

অথবা জীবাত্মার উপাধি অন্তঃকরণের অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে[১]। জীবাত্মার ঐ অণুত্ব ঔপাধিক, উহা বাস্তব নহে। কারণ, বহু শ্রুতির দ্বারা জীবাত্মা মহান্, ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার বাস্তব অণুত্ব কখনই শ্রুতিসম্মত হইতে পারে না। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসকসম্প্রদায়ও অদ্বৈতবাদী না হইলেও জীবাত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যাদি ভগবদ্‌গীতা (২।২৪) বচনের দ্বারা জীবাত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরাণে ঐ সিদ্ধান্ত আরও সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে[২]। সুতরাং জীবাত্মার বিভুত্বই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইলে, শাস্ত্রে যে যে স্থানে জীবের অণুত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বোক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। কোন কোন স্থলে জীবাত্মার উপাধি অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্মশরীরই "জীব" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে সূক্ষ্মশরীরের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায় তাঁহাদিগের সম্মত অণু মনকেই সূক্ষ্ম-শরীরস্থানীয় বলিয়া উহার অণুত্ববশতঃই জীবাত্মার শাস্ত্রোক্ত অণুত্ববাদের উপপাদন করিতে পারেন। উপনিষদে যে, জীবের গতাগতি ও শস্যমধ্যে পতনাদি বর্ণিত আছে, তাহাও ঐ মনের সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে; ইহা তাহারা বলিতে পারেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ, মৃত্যুর পরে শরীর হইতে মনের বহির্নির্গমনের সময়ে আতিবাহিক শরীর-বিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া মনই যে তখন ঐ শরীরে আরূঢ় হইয়া স্বর্গ নরকাদিতে গমন করে, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও যে, উহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। (প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, কন্দলী সহিত, কাশী সংস্করণ, ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসকসম্প্রদায় জীবাত্মাকে প্রতি শরীরে ভিন্ন ও বিভু বলিয়া জীবাত্মাকেই কর্ত্তা ও সুখ-দুঃখ-ভোক্তা বলিয়াছেন। জীবাত্মা অণু হইলে শরীরের সর্ব্বাবয়বে উহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সর্ব্বাবয়বে জ্ঞানাদি জন্মিতে পারে না। প্রবল শীতে কম্পিতকলেবর জীব, সর্ব্বাবয়বেই যে, শীতবোধ করে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যাহার শীত বোধ হইবে, সেই জীবাত্মা অণু হইলে সর্ব্বাবয়বে তাহার সংযোগ থাকে না। অনিত্য সাবয়ব চন্দনবিন্দু, নিত্য নিরবয়ব জীবাত্মার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। জৈনসম্প্রদায়ের ন্যায় জীবাত্মার সংকোচ ও বিকাশ স্বীকার করিলে উহার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। কারণ, সাবয়ব অনিত্য পদার্থ ব্যতীত সংকোচ ও বিকাশ হইতে পারে না। এবং জীবাত্মা অণুপরিমাণ হইলে তাহাতে সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতেও পারে না। কারণ, আশ্রয় অণু হইলে তদ্‌গত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা হইলে পরমাণুগত রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ নানা যুক্তির দ্বারা নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় জীবাত্মার

১। তস্মাদ্‌ জ্ঞানিত্বাভিপ্রায়মিদমণুবচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যং।—বেদান্তদর্শন, ২য় অ, ৩য় পাং, ২০শ সূত্রের শারীরক ভাষ্য।

২। পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক গন্তাসীত্যেতদপার্থবৎ কথং॥—বিষ্ণুপুরাণ।২।১৫।২৪।

বিভুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। জৈনসম্প্রদায় জীবাত্মাকে দেহসমপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ মতের খণ্ডন বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩৪শ, ৩৫শ ও ৩৬শ সূত্রের শারীরক ভাষ্য ও ভামতী টীকায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হয় যে, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও বিভু হইলে উভয়ের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃই ভিন্ন পদার্থ হইলে ঐ উভয়ের অভেদ সম্বন্ধও নাই, অন্য কোন সম্বন্ধও নাই। সুতরাং পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, ইহা কিরূপে বলা যায়? জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার অদৃষ্টসমূহের সহিতও কোন সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বর উহার অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। সুতরাং জীবাত্মার অদৃষ্টসমূহের ফলোৎপত্তি কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বিভু পদার্থদ্বয়ের পরস্পর নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন এবং প্রমাণদ্বারা উহা প্রতিপাদন করেন। বিভু পদার্থের ক্রিয়া না থাকায় উহাদিগের ক্রিয়াজন্য সংযোগ উৎপন্ন হইতে পারে না বটে, কিন্তু ঐ সংযোগ নিত্য। আকাশাদি বিভু পদার্থ সতত পরস্পর সংযুক্তই আছে। উদ্দ্যোতকর এই মতের যুক্তিও বলিয়াছেন। এই মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সংযোগ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় পরমাত্মা জীবাত্মগত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। উদ্দ্যোতকর পরেই আবার বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বিভুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের মতে প্রত্যেক জীবাত্মার সক্রিয় মনের সহিত পরমাত্মা ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধ উৎপন্ন হওয়ায় সেই মনঃসংযুক্ত জীবাত্মার সহিতও ঈশ্বরের সংযুক্ত-সংযোগরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ জন্মে। সুতরাং সেই জীবাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সহিতও ঈশ্বরের পরম্পরা সম্বন্ধ থাকায় ঈশ্বর উহার অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। ফলকথা, উক্ত উভয় মতেই জীবাত্মার অদৃষ্টের সহিত ঈশ্বরের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে বিভুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ নাই, ইহাই এখন নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের প্রচলিত মত। কিন্তু প্রাচীন অনেক নৈয়ায়িক যে, উহা স্বীকার করিতেন এবং প্রাচীন কালেও উক্ত বিষয়ে মতভেদ ছিল, ইহা উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু বেদান্ত-দর্শনের "সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ" (২।২।৩৮) এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধের অনুপপত্তি সমর্থন করিতে উহাদিগের বিভুত্বই প্রথম হেতু বলিয়াছেন। সেখানে ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রও বিভুত্ববশতঃ ও নিরবয়বত্ববশতঃ বিভু পদার্থের পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বিভু পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগও সমর্থন করিয়াছেন[১]। ভামতী টীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত বিষয়ে দ্বিবিধ বিরুদ্ধ উক্তির দ্বারা বিভুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ বিষয়ে তখনও যে মতভেদ ছিল এবং কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় যে, বিভুদ্বয়ের নিত্য সংযোগ বিশেষরূপে সমর্থন

১। "তন্ন নিত্যয়োরাত্মাকাশয়োরজসংযোগে উভয়স্থা অপি যুতসিদ্ধেরভাবাৎ।" "ন চাজসংযোগো নাস্তি, তস্যানুমানসিদ্ধত্বাৎ। তথা হি আকাশমাত্মসংযোগি, মূর্ত্তদ্রব্যসঙ্গিত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যাদ্যনুমানং।"—বেদান্তদর্শন, ২য় অ০, ২য় পা০, ১৭শ সূত্রের শেষভাষ্য "ভামতী" দ্রষ্টব্য।

করিতেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" টীকায় অপরের কোন যুক্তির খণ্ডন করিতে উক্ত প্রাচীন মতবিশেষকেই আশ্রয় করিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের আর একটি বিশেষ আপত্তি এই যে, জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ও বিভু হইলে সমস্ত জীবদেহেই সমস্ত জীবাত্মার আকাশের ন্যায় সংযোগ সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্বদেহেই সমস্ত জীবাত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগ হইতে পারে। অদ্বৈত-বাদিসম্প্রদায় ইহা অকাট্য আপত্তি মনে করিয়া সকলেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, সর্ব্বজীবদেহের সহিত সকল জীবাত্মার সামান্য সংযোগসম্বন্ধ থাকিলেও যে জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষবশতঃ যে দেহবিশেষ পরিগ্রহ হইয়াছে, তাহার সহিতই সেই জীবাত্মার বিশেষ সংযোগ জন্মে। জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষ ও দেহবিশেষের সহিত সংযোগবিশেষই সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়ামক। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে ৬৬ ও ৬৭ সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতম নিজেই উক্ত আপত্তির পরিহার করিয়াছেন। সেখানেই তাঁহার তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা আবশ্যক বোধে নানা মতের আলোচনা করিতে যাইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অতিবাহুল্য ভয়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের মূল বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গোতম মতের ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া জীবাত্মা ও ঈশ্বরের যে বাস্তব ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নানাভাবে প্রাচীন কাল হইতে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় এবং আরও বহু সম্প্রদায় সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদ খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈত মতের সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদিগের যে, অদ্বৈত মতে নিষ্ঠা ছিল না, ইহাও তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। মহানৈয়ায়িক উদয়না-চার্য্যের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র কোন কোন উক্তি প্রদর্শন করিয়া এখন কেহ কেহ তাঁহাকে অদ্বৈত-মতনিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কারণ, উদয়নাচার্য্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে যে কোনরূপে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ গ্রন্থে কয়েক স্থলে অদ্বৈত মত আশ্রয় করিয়াও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই কোন স্থলে সেই বৌদ্ধমতের অপেক্ষায় অদ্বৈত মতের বলবত্তা ও শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। তদ্দ্বারা তাঁহার অদ্বৈতমতনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু তিনি যে ন্যায়মতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, তিনি ঐ "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে ন্যায়মতানুসারেই পরমপুরুষার্থ মুক্তির স্বরূপ ও কারণাদি বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তিনি ঐ গ্রন্থে উপনিষদের "সারসংক্ষেপ" প্রকাশ করিতে[1] "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যকে তাঁহার নিজসম্মত মুক্তি

১। আম্নায়সারসংক্ষেপস্তু "অশরীরং বাব সন্তং" ইত্যাদি। তদপ্রামাণ্যং প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-সিদ্ধান্তভেদ-তত্ত্বোপদেশ-পৌনঃপুন্যেষ্বনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্য ইতি চেন্ন, সতাৎপর্য্যকত্বাৎ। নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা জ্ঞেয়ো মুমুক্ষুভিরিতি-তাৎপর্য্যং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বশ্রুতীনাং। আত্মন এবৈকস্য জ্ঞানমপবর্গসাধনমিত্যদ্বৈতশ্রুতীনাং। দুরূহোহয়মিতি পৌনঃ-পুন্যশ্রুতীনাং। বহিঃ সংকল্পত্যাগো নির্ম্মমত্বশ্রুতীনাং। আত্মৈবোপাদেয় ইত্যাত্মশ্রুতীনাং। গারুড়বদনুষ্ঠানে তাৎপর্য্যং

বিষয়ে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদি বল, শ্রুতিতে জগতের মিথ্যাত্ব কথিত হওয়ায়, অর্থাৎ শ্রুতি সত্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করায় শ্রুতিতে মিথ্যা কথা (অনৃত-দোষ) আছে এবং শ্রুতিতে নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কথিত হওয়ায় ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধরূপ দোষ আছে, এবং শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ একই আত্মতত্ত্বের উপদেশ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ আছে, সুতরাং উক্ত দোষত্রয়বশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্য না থাকায় পূর্ব্বোক্ত মুক্তি বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না। এতদুত্তরে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে উক্ত দোষত্রয় নাই। কারণ, জগতের মিথ্যাত্বাদি-বোধক শ্রুতিসমূহের ভিন্ন ভিন্নরূপ তাৎপর্য্য আছে। মুমুক্ষু সাধক আত্মাতে পারমার্থিক-রূপে জগৎপ্রপঞ্চ নাই, এইরূপ ধ্যান করিবেন, ইহাই জগতের মিথ্যাত্ববোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। জগতের মিথ্যাত্বই সিদ্ধান্ত, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এক আত্মারই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই অদ্বৈত শ্রুতি অর্থাৎ আত্মার একত্ববোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। আত্মার একত্বই বাস্তব তত্ত্ব, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। আত্মা অতি দুর্ব্বোধ, ইহা প্রকাশ করাই পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্বোপদেশের তাৎপর্য্য। মুমুক্ষু বাহ্য সংকল্প ত্যাগ করিবেন, কোন বাহ্য বিষয়কে নিজের প্রিয় করিয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন না, ইহাই আত্মার নির্ম্মমত্ববোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। আত্মাই উপাদেয়, মুমুক্ষুর আত্মাই চরম জ্ঞেয়, ইহাই "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এইরূপ প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের বোধক শ্রুতিসমূহ এবং তন্মূলক সাংখ্যাদি দর্শনের তদনুসারে মুমুক্ষুর যোগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। উদয়নাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলে জৈমিনি মুনি বেদজ্ঞ, কপিল মুনি বেদজ্ঞ নহেন, এ বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় কি আছে ? আর যদি জৈমিনি ও কপিল, উভয়কেই বেদজ্ঞ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ব্যাখ্যাভেদ বা মতভেদ কেন হইয়াছে ? এখানে "জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাই মনে হয়। উদয়নাচার্য্য নিজে ঐ শ্লোক রচনা করিলে তিনি গোতম ও কণাদের নামও বলিতেন, ঐরূপ অসম্পূর্ণ উক্তি করিতেন না, ইহা মনে হয়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত কথায় উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, জৈমিনি ও কপিল প্রভৃতি দর্শনকার ঋষিগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। উহাঁদিগের মধ্যে কেহ বেদজ্ঞ, কেহ বেদজ্ঞ নহেন, ইহা যথার্থরূপে নির্ব্বিবাদে কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং নানা শ্রুতি ও তন্মূলক নানা দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই সমন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে শ্রুতি ও তন্মূলক ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের তত্ত্ব বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মতই না থাকায় নানা সিদ্ধান্তভেদ বলিয়া শ্রুতি ও তন্মূলক দর্শনশাস্ত্রে ব্যাঘাত বা মতবিরোধরূপ দোষ বস্তুতঃ নাই, ইহা

প্রকৃত্যাদিশ্রুতীনাং তন্মূলানাং সাংখ্যাদিদর্শনানাঞ্চেতিদিনেয়ং। অন্যথা "জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ কপিলো নেতি কা প্রমা। উভৌ চ যদি বেদজ্ঞৌ ব্যাখ্যাভেদস্তু কিংকৃতঃ ॥"—আত্মতত্ত্ববিবেক।

এখানে বুঝা যায়। প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপ সমন্বয় করিতে যাইয়া অদ্বৈত মতকে সিদ্ধান্তরূপেই স্বীকার করেন নাই। তিনি অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অনুকূল শ্রুতিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যেরূপে উহার তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যে ন্যায়মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাই সমর্থন করিবার জন্য ঐ শ্রুতিসমূহের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহাকে আমরা অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া আর কিরূপে বুঝিব? অবশ্য তিনি তাঁহার ব্যাখ্যায় ন্যায়মতের সমর্থনের জন্য অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন উপনিষদের "সারসংক্ষেপ" প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সমন্বয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ন্যায়মতেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া কোনরূপেই বুঝা যাইতে পারে না। পরন্তু উদয়নাচার্য্য "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র সর্ব্বশেষে মুমুক্ষু উপাসকের ধ্যানের ক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক নানা দর্শনের বিষয়ভেদ ও উদ্ভবের কারণ বর্ণন করিয়া যে ভাবে সকল দর্শনের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায় যে, মুমুক্ষু, শাস্ত্রানুসারে আত্মার শ্রবণ মননাদি উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে বাহ্য পদার্থই প্রকাশিত হয়। সেই বাহ্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার এবং চার্ব্বাকমতের উত্থান হইয়াছে। তাহার পরে তাঁহার নিকটে অর্থাকারে অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়াকারে আত্মার প্রকাশ হয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ত্রৈদণ্ডিক মতের উপসংহার ও বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচার বৌদ্ধ মতের উত্থান হইয়াছে এবং মুমুক্ষু সাধকের সেই অবস্থা প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি। উদয়নাচার্য্য এই ভাবে নানা দর্শনের নানা মতের উত্থানকে সাধকের ক্রমিক নানাবিধ অবস্থারই প্রতিপাদক বলিয়া শেষে সাধকের কোন্ অবস্থায় যে, কেবল আত্মারই প্রকাশ হয় এবং উহা আশ্রয় করিয়াই অদ্বৈত মতের উপসংহার হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধকের আত্মোপাসনার পরিপাকে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যে অবস্থায় আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুরই জ্ঞান হয় না। অনেক শ্রুতি সাধকের সেই অবস্থারই বর্ণন করিয়াছেন, আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তব সত্তাই নাই, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। উদয়নাচার্য্য শেষে আবার বলিয়াছেন যে, সাধকের পূর্ব্বোক্ত অবস্থাও থাকে না। পরে আত্মবিষয়েও তাহার সবিকল্পক জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং" ইত্যাদি। এখানে টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মুমুক্ষু আত্মাকে নির্দ্ধর্ম্মক অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মশূন্য বা নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধ্যান করিবেন, ইহাই "ন দ্বৈতং" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য। আমরা অনুসন্ধান করিয়াও "ন দ্বৈতং" ইত্যাদি শ্রুতির সাক্ষাৎ পাই নাই। কিন্তু দক্ষসংহিতায় ঐরূপ একটি বচন দেখিতে পাইয়াছি[১]। তদ্দ্বারা মহর্ষি দক্ষের বক্তব্য বুঝিতে পারি যে, যোগীর পক্ষে অবস্থাবিশেষে

১। দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈবচ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিতি তৎ পারমার্থিকং॥—দক্ষসংহিতা। ৭ম অঃ ৪৮।

দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত, সমস্তই প্রতিভাত হয়। কিন্তু দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে, ইহাই সেই পারমার্থিক। অর্থাৎ যোগীর নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে যে অবস্থা হয়, উহাই তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ। অদ্বৈতবাদী মহর্ষি দক্ষ উক্ত শ্লোকের দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রকৃত চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অন্য বচনের সাহায্যে বুঝা যায়। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কথার পরে বলিয়াছেন যে, সমস্ত সংস্কারের অভিভব হওয়ায় সাধকের নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে আত্মবিষয়েও যে কোন জ্ঞান জন্মে না, সকল জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, ঐ অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই চরম বেদান্তের উপসংহার হইয়াছে এবং ঐ অবস্থা প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি। মুদ্রিত পুরাতন "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে ইহার পরেই আছে, "সা চাবস্থা ন হেয়া মোক্ষনগরগোপুরায়মাণত্বাৎ।" কিন্তু হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে ঐ স্থলে "সা চাবস্থা ন হেয়া" এই অংশ দেখিতে পাই না। কোন পুস্তকে ঐ অংশ কর্ত্তিত দেখা যায়। টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও তাঁহার টীকাকার শ্রীরাম তর্কালঙ্কার (নব্যনৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশের পিতা) মহাশয়ও ঐ কথার কোন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা ইহার পূর্ব্বোক্ত অনেক কথার অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। অনেক কথার কোন ব্যাখ্যাও করেন নাই। তাঁহাদিগের অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার দ্বারা উদয়নাচার্য্যের শেষোক্ত কথাগুলির তাৎপর্য্যও সম্যক্ বুঝা যায় না। যাহা হউক, "সা চাবস্থা ন হেয়া" এই পাঠ প্রকৃত হইলে উদয়নাচার্য্যের বক্তব্য বুঝা যায় যে, আত্মোপাসক মুমুক্ষুর পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পরিত্যাজ্য নহে। কারণ, উহা মোক্ষনগরের পুরদ্বারসদৃশ। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থাকে মোক্ষনগরের পুরদ্বার সদৃশই বলিয়াছেন, অন্তঃপুরসদৃশ বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পরে মুমুক্ষুর আরও অবস্থা আছে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থারও নিবৃত্তি হয়, ইহা তাঁহার মত বুঝা যায়। উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কথার পরেই আবার বলিয়াছেন, "নির্ব্বাণস্তু তস্যাঃ স্বয়মেব, যদাশ্রিত্য ন্যায়দর্শনোপসংহারঃ।" এখানে টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি নিজে কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মতভেদে দ্বিবিধ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যায় "তস্যাঃ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি, "নির্ব্বাণ" শব্দের অর্থ অপবর্গ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "তস্যাঃ" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি, "নির্ব্বাণ" শব্দের অর্থ বিনাশ। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার স্বয়ংই নির্ব্বাণ হয় অর্থাৎ কালবিশেষসহকৃত সেই অবস্থা হইতেই উহার বিনাশ হয়, সেই নির্ব্বাণ বা বিনাশকে আশ্রয় করিয়া ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে, ইহাই দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার বিনাশ না হইলে অর্থাৎ মুমুক্ষুর ঐ অবস্থাই চরম অবস্থা হইলে ন্যায়দর্শনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অবস্থার নিবৃত্তি হয় বলিয়াই উহাকে অবলম্বন করিয়া ন্যায়দর্শন সার্থক হইয়াছে। এখানে উদয়নাচার্য্যের শেষ কথার দ্বারা তিনি যে, ন্যায়দর্শনকেই মুমুক্ষুর চরম অবস্থার প্রতিপাদক ও চরম সিদ্ধান্তবোধক বলিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার মতে নানা দর্শনে মুমুক্ষুর উপাসনাধীন ক্রমিক নানাবিধ অবস্থার প্রতিপাদন হইয়াছে এবং তজ্জন্যও নানা দর্শনের

উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে উপাসনার পরিপাকে সময়ে অদ্বৈতাবস্থা প্রভৃতি কোন কোন অবস্থা মুমুক্ষুর গ্রাহ্য ও আবশ্যক হইলেও সেই অবস্থাই চরম অবস্থা নহে। চরম অবস্থায় ন্যায়দর্শনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানই উপস্থিত হয়, তাহার ফলে ন্যায়দর্শনোক্ত মুক্তিই (যাহা পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন) জন্মে। এখন যদি উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র শেষোক্ত কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপই শেষ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি যে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা কিরূপে বলা যায়? তিনি উপনিষদের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করিতে অদ্বৈতশ্রুতি ও জগতের মিথ্যাত্ববোধক শ্রুতিসমূহের যেরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়াছেন এবং যে ভাবে নানা দর্শনের অভিনব সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও তিনি যে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। সুধীগণ উদয়নাচার্য্যের ঐ সমস্ত কথায় বিশেষ মনোযোগ করি ইহার বিচার করিবেন।

এখানে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, উদয়নাচার্য্য যে ভাবে নানা দর্শনের বিষয়-ভেদ ও উদ্ভবের কারণ বর্ণনপূর্ব্বক যে অভিনব সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসম্মত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সকল সম্প্রদায়ই ঐ ভাবে নিজের মতকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া অন্যান্য দর্শনের নানারূপ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু সে কল্পনা অন্য সম্প্রদায়ের মনঃপূত হইতে পারে না। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় তাঁহার নিজ মতকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ন্যায়াদি দর্শনের উদ্দেশ্যাদি বর্ণনপূর্ব্বক ষড়্দর্শনের সমন্বয় করিতে গিয়াছেন। "বামকেশ্বরতন্ত্রে"র ব্যাখ্যায় মহামনীষী ভাস্কররায় অধিকারিভেদকে আশ্রয় করিয়া সকল দর্শনের বিশদ সমন্বয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসুর উহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু ঐরূপ সমন্বয়ের দ্বারাও বিবাদের শান্তি হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা চরম সিদ্ধান্ত কি, এই বিষয়ে সর্ব্বসম্মত কোন উত্তর হইতে পারে না। সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া, অধিকারিভেদ আশ্রয় করিয়া অন্যান্য সিদ্ধান্তের কোনরূপ উদ্দেশ্য বর্ণন করিবেন। অপরের সিদ্ধান্তকে কেহই চরম সিদ্ধান্ত বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া কোন দিনই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং ঐরূপ সমন্বয়ের দ্বারা বিবাদ-নিবৃত্তির আশা কোথায়? অবশ্য অধিকারিভেদেই যে ঋষিগণ নানা মতের উপদেশ করিয়াছেন, ইহা সত্য; "অধিকারিবিভেদেন শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যেও উহাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চরম অধিকারী কে? চরম সিদ্ধান্ত কি? ইহা বলিতে যাওয়া বিপজ্জনক। কারণ, আমরা নিম্নাধিকারী, আমাদের গুরূপদিষ্ট সিদ্ধান্ত চরম সিদ্ধান্ত নহে, এইরূপ কথা কোন সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন না—সকলেরই উহা অসহ্য হইবে। মনে হয়, এই জন্যই প্রাচীন আচার্য্যগণ ঐরূপ সমন্বয় প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা ভিন্ন সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এখন এখানে অপক্ষপাত বিচারের কর্ত্তব্যতাবশতঃ ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই যে কোন কারণে অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদী হইলেও অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ, কাহারও বুদ্ধি-মাত্রকল্পিত অশাস্ত্রীয় মত নহে। অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষকে নিরস্ত করিবার জন্য এবং

বৌদ্ধভাব-ভাবিত তৎকালীন মানবগণের প্রতীতি সম্পাদনের জন্য তাঁহাদিগের সংস্কারানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত কোন নূতন মত নহে, সংস্কৃত বৌদ্ধমতবিশেষও নহে। কিন্তু অদ্বৈতবাদও বেদমূলক অতি প্রাচীন মত। শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারাই এই অদ্বৈতবাদের সমর্থন ও প্রচার করিয়াছেন। পরে তাঁহার প্রবর্ত্তিত গিরি, পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশনামী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় ভারতের অদ্বৈত-বিদ্যার গুরু, দ্বৈত-সাধনার চরম আদর্শ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবও যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ ও কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি ভক্তচূড়ামণি রামানন্দ রায়ের নিকটে দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, অষ্টম পঃ), সেই সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গুরুপরম্পরাক্রমে আজ পর্য্যন্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের রক্ষা করিতেছেন। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় পদ্মপুরাণের বচন বলিয়া মায়াবাদের নিন্দাবোধক যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যও উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সকল বচন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পরেই রচিত হইয়াছে, ইহা সেখানে "ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা" ইত্যাদি বচনের দ্বারা বুঝা যায়। পরন্তু ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে তদনুসারে আস্তিকসম্প্রদায়ের বেদান্তদর্শন ও যোগদর্শন ভিন্ন আর সমস্ত দর্শনেরই শ্রবণও পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ঐ সকল বচনের প্রথমে ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুর ব্যাখ্যেয় সাংখ্যদর্শনও তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং প্রথমেই বলা হইয়াছে, "যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।" সুতরাং অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও যে উক্ত বচনাবলীর প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, স্বীকার করিতেই পারেন না, ইহা বুঝা যায়। ঐ সমস্ত বচন সমস্ত পদ্মপুরাণ পুস্তকেও দেখা যায় না। পরন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য কলিযুগে ভগবান্ মহাদেব যে, শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাও কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত দেখা যায়[1] এবং তিনি বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতির যেরূপ অর্থ বলিয়াছেন, সেই অর্থই ন্যায্য, ইহাও শিবপুরাণে কথিত হইয়াছে বুঝা যায়[2]। সুতরাং পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত বচনাবলীর প্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার করা যায়? তাহা হইলে কূর্ম্মপুরাণ ও শিবপুরাণের বচনের প্রামাণ্যই বা কেন স্বীকৃত হইবে না? বস্তুতঃ যদি পদ্মপুরাণের উক্ত বচনাবলীর প্রামাণ্য স্বীকার্য্যই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ নাই, যাঁহারা সতত

১। "কলৌ রুদ্রো মহাদেবো লোকানামীশ্বরঃ পরঃ" ইত্যাদি—
করিষ্যত্যবতারাণি শঙ্করো নীললোহিতঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তপ্রতিষ্ঠার্থং ভক্তানাং হিতকাময়া।—কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৩০শ অঃ।

২। ব্যাকুর্ব্বন্ ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান্।
শ্রুতের্ন্যায্যঃ স এবার্থঃ শঙ্করঃ সবিতাননঃ॥"—শিবপুরাণ—৩য় খণ্ড, ১ম অঃ।

সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া নিজের ব্রহ্মজ্ঞানের দোহাই দিয়া নানা কুকর্ম্ম করিতেন ও করিবেন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ বেদান্তচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই পদ্মপুরাণে মায়াবাদের নিন্দা করা হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রে অন্যত্রও দেখিতে পাই,—"সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং সন্ত্যজেদন্ত্যজং যথা।" সাংসারিক সুখাসক্ত অনধিকারী, আমি ব্রহ্মজ্ঞ, ইহা বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হয়, ঐরূপ ব্যক্তির সংসর্গে শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের হানি হয়, এই জন্য ঐরূপ ব্যক্তি ত্যাজ্য, ইহা উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে। সুতরাং কালপ্রভাবে পূর্ব্বকালেও যে অনেক অনধিকারী অদ্বৈতমতানুসারে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া অনেকের গুরু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক হানি হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। দক্ষস্মৃতিতেও কুতপস্বীদিগের নানাবিধ প্রপঞ্চ কথিত হইয়াছে[১]। সুতরাং প্রাচীন কালেও যে কুতপস্বীদিগের অস্তিত্ব ছিল, ইহা বুঝা যায়।

মূলকথা, অদ্বৈতবাদ-বিরোধী পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থকার যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, উপনিষদে এবং অন্যান্য কোন শাস্ত্রেই যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক প্রমাণভূত কোন বাক্যই নাই, ইহা কোন দিন কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে প্রাচীন কাল হইতে সকল গ্রন্থকারই মুণ্ডক উপনিষদের "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতিবাক্যে "সাম্য" শব্দ এবং ভগবদ্গীতার "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ সমর্থন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে বক্তব্য এই যে, "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্রই ভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্যও বুঝা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে যে আত্যন্তিক "সাধর্ম্ম্য" বুঝাইতেও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের প্রয়োগ হইত, ইহা আমরা মহর্ষি গোতমের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের "অত্যন্তপ্রায়ৈকদেশসাধর্ম্ম্যাদুপমানাসিদ্ধিঃ" (৪৪শ) এই সূত্রের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আত্যন্তিক, প্রায়িক ও ঐকদেশিক, এই ত্রিবিধ সাধর্ম্ম্যই যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা প্রাচীন কালে গৃহীত হইত, ইহা উক্ত সূত্রের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোন স্থলে আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্য প্রযুক্তও যে, উপমানের সিদ্ধি হয়, ইহা সমর্থন করিতে "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর উহার উদাহরণ বলিয়াছেন, "রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।" "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"র টীকায় মহাদেব ভট্ট সাদৃশ্য পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় "গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ। রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব" এই শ্লোকে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকায় সাদৃশ্য থাকিতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকিলেও সাদৃশ্য স্বীকার্য্য, সেখানে সাদৃশ্যের লক্ষণে ভেদের উল্লেখ পরি-

---

১। লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রপঞ্চাঃ কুতপস্বিনাং ॥—দক্ষসংহিতা, ৭ম অং, । ৩৭।

ত্যাজ্য। অথবা যুগভেদে গগন, সাগর ও রামরাবণের যুদ্ধের ভেদ থাকায় এক যুগের গগনাদির সহিত অন্য যুগের গগনাদির সাদৃশ্যই উক্ত শ্লোকে বিবক্ষিত। এই জন্যই আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, যুগভেদ বিবক্ষা থাকিলে উক্ত শ্লোকে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ থাকায় উপমা অলঙ্কার হইবে। অন্যথা "অনন্বয়" অলঙ্কার হইবে। এখানে নৈয়ায়িক মহাদেব ভট্ট যুগভেদে গগনের ভেদ কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। ন্যায়মতে গগনের উৎপত্তি নাই। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একই গগন চিরবিদ্যমান। যাহা হউক, উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকিলেও যে, সাধর্ম্ম্য থাকিতে পারে, ইহা নব্য নৈয়ায়িক মহাদেব ভট্টও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ প্রামাণিক আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের দশম উল্লাসের প্রারম্ভে "সাধর্ম্ম্যমুপমা-ভেদে" এই বাক্যের দ্বারা উপমান ও উপমেয়ের ভেদ থাকিলে, ঐ উভয়ের সাধর্ম্ম্যকেই তিনি উপমা অলঙ্কার বলিয়াছেন। ঐ বাক্যে "ভেদে" এই পদের দ্বারা "অনন্বয়" অলঙ্কারে উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ নাই, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা তিনি সেখানে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "রাজীব-মিব রাজীবং" ইত্যাদি শ্লোকে উপমান ও উপমেয়ের অভেদবশতঃ "অনন্বয়" অলঙ্কার হইয়াছে, উপমা অলঙ্কার হয় নাই। ফলকথা, উপমান ও উপমেয়ের অভেদ স্থলেও যে, ঐ উভয়ের "সাধর্ম্ম্য" বলা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। ঐরূপ স্থলে সাধর্ম্ম্য—আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্য। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়সূত্রে ঐরূপ সাধর্ম্ম্যেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এবং আলঙ্কারিক-গণও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উপমান ও উপমেয়ের ভেদ ব্যতীত যদি সাধর্ম্ম্য সম্ভবই না হয়, উহা বলাই না যায়, তাহা হইলে মম্মট ভট্ট "সাধর্ম্ম্যমুপমাভেদে" এই লক্ষণ-বাক্যে "ভেদ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে, "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা একধর্ম্মবত্তাও বুঝা যাইতে পারে। কারণ, সমানধর্ম্মবত্তাই "সাধর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ। কিন্তু "সমান" শব্দ তুল্য অর্থের ন্যায় এক অর্থেরও বাচক। অমরকোষের নানার্থবর্গ প্রকরণে "সমানাঃ সৎসমৈকে স্যুঃ" এই বাক্যের দ্বারা "সমান" শব্দের "এক" অর্থও কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "সমানে বৃক্ষে পরিষস্বজাতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "সপত্নী" ইত্যাদি প্রয়োগে "সমান" শব্দের অর্থ এক, অর্থাৎ অভিন্ন। তাহা হইলে ভগবদ্গীতার "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা যখন একধর্ম্মবত্তাও বুঝা যায়, তখন উহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ-নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ এক-ধর্ম্মবত্তা প্রাপ্ত হন, ইহা উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। উক্ত মতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মভাবই সেই এক ধর্ম্ম বা অভিন্ন ধর্ম্ম। ফলকথা, যেরূপেই হউক, যদি পদার্থদ্বয়ের বাস্তব ভেদ না থাকিলেও "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" বলা যায়, তাহা হইলে আর "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দ প্রয়োগের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ নিশ্চয় করা যায় না। সুতরাং উহাকে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের ব্রহ্মাস্ত্র বলাও যায় না। কারণ, সাধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্য বুঝিলে উহার দ্বারা সেখানে পদার্থদ্বয়ের বাস্তব ভেদ সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য"

শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্যই বিবক্ষিত এবং মুণ্ডক উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ("নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি") শ্রুতিতে "সাম্য" শব্দের দ্বারাও আত্যন্তিক সাম্যই বিবক্ষিত, ইহা অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। কারণ, উক্ত শ্রুতিতে কেবল "সাম্য" না বলিয়া "পরম সাম্য" বলা হইয়াছে,—আত্যন্তিক সাম্যই পরমসাম্য। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মভাবই পরমসাম্য। দুঃখহীনতা প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যই বিবক্ষিত হইলে "পরম" শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। তবে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি জগৎসৃষ্টির কারণ হইবেন কি না, এবং পুনর্ব্বার তাঁহার জীবভাব ঘটিবে কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কাহারও ঐরূপ আপত্তিও হইতে পারে। তাই ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের শেষে বলা হইয়াছে, "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের অবিদ্যানিবৃত্তিই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহার আর কখনও জীবভাব হইতে পারে না। তাঁহাতে জগৎপ্রপঞ্চের কল্পনারূপ সৃষ্টিও হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসার জন্যও উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধ বলা হইতে পারে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাতেও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধের সার্থকতা আছে। পরন্তু ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্য বলিয়া পরে ১৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি"। পরে ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। সুতরাং শেষোক্ত "মদ্ভাব" ও "ব্রহ্মভূয়" শব্দের দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যের দ্বারাও তাহাই বিবক্ষিত বুঝা যায়। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৩শ শ্লোকেও আবার বলা হইয়াছে, "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। সুতরাং উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকেও "ব্রহ্মভূত" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, এই অর্থই বিবক্ষিত বুঝা যায়। উহার দ্বারা ব্রহ্মসদৃশ, এই অর্থ বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, উহার পূর্ব্বশ্লোকে যে, "ব্রহ্মভূয়" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার মুখ্য অর্থ ব্রহ্মভাব। সুতরাং পরবর্ত্তী শ্লোকেও "ব্রহ্মভূত" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, এই অর্থই সরল ভাবে বুঝা যায়। পরন্তু ভগবদ্গীতায় প্রথমে সাধর্ম্ম্য শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরে "ব্রহ্মসাম্যায় কল্পতে" এবং "ব্রহ্মতুল্যঃ প্রসন্নাত্মা" এইরূপ বাক্য কেন বলা হয় নাই এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে" এবং "ব্রহ্মাত্মৈকত্বমাপ্নোতি" ইত্যাদি ঋষিবাক্যের দ্বারা সরলভাবে কি বুঝা যায়, ইহাও অপক্ষপাতে চিন্তা করা আবশ্যক।

দ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা উপনিষদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্ত শ্রুতির[১] পূর্ব্বার্দ্ধে "ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম-চক্রে" এই বাক্যের সহিতই "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" এই তৃতীয় পাদের যোগ করিয়া

১। "সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥"—শ্বেতাশ্বতর।১।৬।

ব্যাখ্যা করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞান-প্রযুক্ত জীব ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করে অর্থাৎ সংসারে বদ্ধ হয়, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। তাহা হইলে কিন্তু উক্ত শ্রুতি অদ্বৈতবাদেরই সমর্থক হয়। উক্ত শ্রুতির শাঙ্কর ভাষ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে এবং ঐ ব্যাখ্যার যথার্থতা সমর্থনের জন্য পরে বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও বিষ্ণুধর্ম্মের বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মের বচনে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে, ইহা দেখা আবশ্যক। দ্বৈতবাদী মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অদ্বৈত ভাবনারূপ উপাসনাবিশেষেই যে তাৎপর্য্য বলিয়াছেন এবং "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে যে গৌণার্থক বলিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে এবং অন্যত্রও ঐ সমস্ত মতের সমালোচনা করিয়া "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে বস্তুতত্ত্ববোধক, ইহা উপনিষদের উপক্রমাদি বিচারের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য "মানসোল্লাস" গ্রন্থে সংক্ষেপে তাঁহার কথা প্রকাশ করিয়াছেন[১]। ইহাঁদিগের পরে ক্রমশঃ অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের বহু আচার্য্য পাণ্ডিত্যপ্রভাবে নানা গ্রন্থে নানারূপ সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত ঐ অদ্বৈতবাদের সেবা ও রক্ষা করিতেছেন।

অদ্বৈতবাদবিরোধী মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব দার্শনিক অনেক পুরাণ-বচনের দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেক বচনের দ্বারা অদ্বৈত মতেরও যে সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যারম্ভে ঐরূপ অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু তাহা দেখিবেন। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণের অনেক বচনের দ্বারাও অদ্বৈত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়[২]। দ্বৈতিগণ অতত্ত্বদর্শী, ইহাও বিষ্ণুপুরাণের কোন বচনে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে[৩]। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণের কোন কোন বচনের কষ্টকল্পনা করিয়া নিজমতানুসারে ব্যাখ্যা করিলেও অপক্ষপাতে বিষ্ণুপুরাণের সকল বচনের সমন্বয় করিয়া বুঝিতে গেলে তদ্দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই যে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু গরুড়পুরাণে যে "গীতাসার" বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অদ্বৈত সিদ্ধান্তই বিশদভাবে কথিত

১। নোপাসনাপরং বাক্যং প্রতিমাস্বীশবুদ্ধিবৎ।
ন চৌপচারিকং বাক্যং রাজবদ্রাজপূরুষে॥
জীবাত্মনা প্রবিষ্টোঽসাবীশ্বরঃ শ্রূয়তে যতঃ॥—মানসোল্লাস, ৩য় উ।২৪,২৫।

২। তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥
বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥—বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, ৯৩।৯৪॥

৩। তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি তৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ॥—বিষ্ণু।২।৩১।

হইয়াছে। "শব্দ-কল্পদ্রুমে"র পরিশিষ্ট খণ্ডে গরুড়পুরাণের ঐ "গীতাসার" (২৩৩ হইতে ২৩৬ অধ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে; অনুসন্ধিৎসু উহা দেখিবেন। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ "অধ্যাত্ম-রামায়ণে"র প্রথমেও (প্রথম অধ্যায়, ৪৭শ শ্লোক হইতে ৫৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত) অদ্বৈত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। পরে আরও বহু স্থানে ঐ সিদ্ধান্ত বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পুরাণেরও প্রামাণ্য স্বীকার করেন। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেও নানা স্থানে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। প্রথম শ্লোকেও "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা" এই তৃতীয় চরণের দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রামাণিক টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও শেষে মায়াবাদানুসারেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরাণের দশ লক্ষণের বর্ণনায় নবম লক্ষণ "মুক্তি"র যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সরল ভাবে অদ্বৈত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়[২]। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও উহার ব্যাখ্যায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে "ব্রহ্মস্তুতি"র মধ্যে আমরা মায়াবাদের সুস্পষ্ট বর্ণন দেখিতে পাই[৩]। সেখানে স্বপ্নতুল্য অসৎস্বরূপ জগৎ মায়াবশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত হইয়া "সৎ"পদার্থের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, ইহা কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং পরে কোন শ্লোকে ঐ সিদ্ধান্তই বুঝাইতে রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস দৃষ্টান্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও সেখানে মায়াবাদেরই ব্যাখ্যা ও তদনুসারেই দৃষ্টান্তব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে একাদশ স্কন্ধেও অনেক স্থানে অদ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। উপসংহারে দ্বাদশ স্কন্ধের অনেক স্থানেও আমরা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই[৪]। দ্বাদশ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণং," "ব্রহ্মভূতো

১। যদ্বা তস্যৈব পরমার্থসত্যত্বপ্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং, যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি ইত্যাদি স্বামিটীকা।

২। "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। ২য় স্কন্ধ, ১০ম অঃ, ষষ্ঠ শ্লোক। "অন্যথারূপং" অবিদ্যয়াঽধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি "হিত্বা" "স্বরূপেণ" ব্রহ্মতয়া "ব্যবস্থিতি"র্মুক্তিঃ।—স্বামিটীকা।

৩। "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখং।

ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥"

"আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতং।

জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥"—১০ম স্কন্ধ, ১৪শ অঃ, ২২।২৫।

নন্বজ্ঞানেন কথং ভবং তরন্তীতি, তত্রাজ্ঞানমূলত্বাদিত্যাহ "আত্মানমেবে"তি। "তেনৈব" অজ্ঞানেনৈব। 'প্রপঞ্চিতং' প্রপঞ্চঃ। "রজ্জ্বাং অহের্ভোগভবাভবৌ" সর্পশরীরস্যাধ্যাসাপবাদৌ যথেতি।—স্বামিটীকা।

৪। ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা।

এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।

তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ইত্যাদি।

—শ্রীমদ্‌ভাগবত। ১২শ স্কন্ধ। ৫ম অঃ। ৫—৬।

মহাযোগী” এবং “ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষেঃ” এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলে যে ব্রহ্মভাব কথিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বাচ্য ও প্রয়োজন বর্ণন করিতে “সর্ব্ববেদান্তসারং যৎ” ইত্যাদি যে শ্লোক[১] কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারেও অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট প্রকাশ বুঝিতে পারি। তাহা হইলে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তেই উহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্তু ভক্তিলিপ্সু অধিকারিবিশেষের জন্য ভক্তির মাহাত্ম্য খ্যাপন ও ভগবানের গুণ ও লীলাদি বর্ণন দ্বারা তাঁহাদিগের ভক্তিলাভের সাহায্য সম্পাদনের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে দ্বৈতভাবে দ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে কোন স্থানে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত কথিত হয় নাই, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন প্রামাণিক টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থানেই অদ্বৈত মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনেক ব্যাখ্যাকার নিজসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য নিজ মতে কষ্ট কল্পনা করিয়া অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেও মূল শ্লোকের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া সরলভাবে কিরূপ অর্থ বুঝা যায়, ইহা অপক্ষপাতে বিচার করাই কর্ত্তব্য। ফলকথা, শ্রীমদ্ভাগবতে যে, বহু স্থানে অদ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রকাশই আছে, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অধ্যাত্ম-প্রকরণেও অদ্বৈত মতানুসারেই সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে[২]। দক্ষ-সংহিতার শেষ ভাগে কোন কোন বচনের দ্বারা মহর্ষি দক্ষ যে অদ্বৈতিদিগেরই অবস্থার বর্ণন করিয়াছেন এবং অদ্বৈত পক্ষই তাঁহার নিজ পক্ষ বা নিজমত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়[৩]। মহাভারতের অনেক স্থানেও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রকাশ আছে। অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদের সমস্ত কথা এবং বিচার-প্রণালীও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদবিরোধী কোন কোন গ্রন্থকার যে, অদ্বৈতবাদকে সম্প্রদায়বিশেষের কল্পনামূলক একেবারে অশাস্ত্রীয় বলিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের অদ্বৈত-

---

১। সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং।
যদ্দ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং॥—১২শ স্কন্ধ। ১৩শ অঃ। ১২।

২। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ।
তথাত্মৈকোপ্যনেকস্তু জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥ ইত্যাদি।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ৩য় অঃ; ১৪৪শ্লোক

৩। য আত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং নৈব পশ্যতি।
ব্রহ্মীভূয় স এবং হি দক্ষপক্ষ উদাহৃতঃ॥
দ্বৈতপক্ষে সমাস্থা যে অদ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অদ্বৈতিনাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ॥
তত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যদি পশ্যতি।
ততঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থসঞ্চয়াঃ॥—দক্ষসংহিতা। ৭ম অঃ। ১১। ৫০। ৫১।

সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক সমস্ত বচনগুলিই অপ্রমাণ বা অন্যার্থক, ইহা শপথ করিয়া তাঁহারাও বলিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদের ক্রমশঃ সর্ব্বদেশেই প্রচার ও চর্চ্চা হইয়াছে। বিরোধী সম্প্রদায়ও উহার খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতবাদের সবিশেষ চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারাই বুঝা যায়। বঙ্গদেশেও পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে। বঙ্গের মহামনীষী কুল্লূক ভট্ট অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রেরও উপাসনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার "মনুসংহিতা"র টীকার প্রথমে নিজের উক্তির দ্বারাই জানা যায়। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-সমর্থক শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের টীকা করিয়া বঙ্গে অদ্বৈতবাদ-চর্চ্চার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুরের প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে অদ্বৈত-মতানুসারেই শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন, ইহারও প্রমাণ আছে। বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারাই জানা যায়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার "মলমাসতত্ত্বা"দি গ্রন্থে শারীরক ভাষ্যাদি বেদান্তগ্রন্থের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং "মলমাসতত্ত্বে" মুমুক্ষুকৃত্য প্রকরণে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি "আহ্নিকতত্ত্বে"র প্রথমে প্রাতরুত্থানের পরে পাঠ্য শ্লোকের মধ্যে "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্" ইত্যাদি অদ্বৈত-সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক সুপ্রসিদ্ধ ঋষিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে ঐ গ্রন্থে গায়ত্র্যর্থ ব্যাখ্যাস্থলে তিনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তানুসারেই গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তখন যে বঙ্গদেশেও অনেকে অদ্বৈত সিদ্ধান্তানুসারেই গায়ত্র্যর্থ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের গায়ত্র্যর্থ ব্যাখ্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রকাশ দেখিয়া, তিনি ও তাঁহার গুরুসম্প্রদায় যে, অদ্বৈতমতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার পরেও বঙ্গের অনেক গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের সংবাদ পাওয়া যায়। বঙ্গের ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদের গানেও আমরা অদ্বৈতবাদের সংবাদ শুনিতে পাই। মূল কথা, অদ্বৈতবাদ যে কারণেই হউক, অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বীকৃত না হইলেও উহাও শাস্ত্রমূলক সুপ্রাচীন মত, ইহা স্বীকার্য্য।

কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদও শাস্ত্রমূলক অতি প্রাচীন মত। মহর্ষি গোতম ও কণাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে দ্বৈতবাদের উপদেষ্টা, উহা অশাস্ত্রীয় ও কোন নবীন মত হইতে পারে না। "দ্বৈতবাদ" বলিতে এখানে আমরা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদবাদ গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ ভিন্ন সমস্ত বাদই (বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি) এখানে বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত বাদেই জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ স্বীকৃত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা বোধায়ন ও জামাতৃমুনি প্রভৃতি শ্রীভাষ্যকার রামানুজেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা সনক, সনন্দ প্রভৃতি, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈতবাদের কয়েকটি মূল আমরা বুঝিতে পারি। প্রথম, জীবাত্মার অণুত্ব। শাস্ত্রে অনেক স্থানে জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা জীবাত্মা অণুপরিমাণ,

এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলে, বিভু এক ব্রহ্মের সহিত অসংখ্য অণু জীবাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের নিজ মত সমর্থনে ইহাই মূল যুক্তি। তাঁহাদিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়, শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা জীবাত্মা বিভু হইয়াও প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং অসংখ্য, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার বাস্তব ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মহর্ষি গোতম ও কণাদ প্রভৃতি দ্বৈতবাদের উপদেষ্টা আচার্য্যগণের ইহাই মূল যুক্তি। তাঁহাদিগের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। তৃতীয়, বেদাদি শাস্ত্রে বহু স্থানে জীব ও ব্রহ্মের যে, ভেদ কথিত হইয়াছে, উহা অবাস্তব হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য জীবাত্মার কর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা প্রভৃতি চলিতেই পারে না। আমি ব্রহ্ম, বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে আমার কোন ভেদ নাই, ইহা শ্রবণ করিলে এবং ঐ তত্ত্বের মননাদি করিতে আরম্ভ করিলে তখন উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্তিই ব্যাহত হইয়া যাইবে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদই স্বীকার্য্য হইলে অভেদবোধক শাস্ত্রের অন্যরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ইহাও সমস্ত দ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের একটি প্রধান মূল যুক্তি। পরন্তু বৈষ্ণব মহাপুরুষ মধ্বাচার্য্য জীব ও ঈশ্বরের সত্য ভেদের বোধক যে সমস্ত শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত শ্রুতি অন্য সম্প্রদায় প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলেও এবং অন্যত্র উহা পাওয়া না গেলেও মধ্বাচার্য্য যে, ঐ সমস্ত শ্রুতি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কখনই বলা যায় না। তিনি তাঁহার প্রচারিত দ্বৈতবাদের প্রাচীন গুরু-পরম্পরা হইতেই ঐ সমস্ত শ্রুতি লাভ করিয়াছিলেন, কালবিশেষে সেই সম্প্রদায়ে ঐ সমস্ত শ্রুতির পঠন পাঠনাও ছিল, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তিনি অধিকারি-বিশেষের জন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিতে ঐ সমস্ত শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত ঐ সমস্ত শ্রুতিও দ্বৈতবাদের মূল বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পরন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত দক্ষ-সংহিতাবচনে "দ্বৈতপক্ষে সমাস্থা যে" এই বাক্যের দ্বারা অদ্বৈতবাদী মহর্ষি দক্ষও যে দ্বৈতপক্ষের এবং তাহাতে সম্যক্ আস্থাসম্পন্ন অধিকারিবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথমে দ্বৈতপক্ষে সম্যক্ আস্থাসম্পন্ন হইয়াও পরে অনেকে অদ্বৈত সাধনার অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহাও তাঁহার উক্ত বচনের দ্বারা বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রথমে দ্বৈত সিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিলে কেহই অদ্বৈত সাধনার অধিকারী হইতে পারেন না। বেদান্তশাস্ত্র যেরূপ ব্যক্তিকে অদ্বৈত সাধনার অধিকারী বলিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি চিরদিনই দুর্লভ। বেদান্তদর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে "অথ" শব্দের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তির যে অবস্থায় যে সময়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার সূচিত হইয়াছে এবং তদনুসারে বেদান্তসারের প্রারম্ভে সদানন্দ যোগীন্দ্র যেরূপ ব্যক্তিকে বেদান্তের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অদ্বৈতাচার্য্যগণও যেরূপ অধিকারীকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, তাহা দেখিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। বেদান্তশাস্ত্রে উক্তরূপ অধিকারিনিরূপণের দ্বারা অনধিকারীদিগকে অদ্বৈতসাধনা হইতে নিবৃত্ত করাও উদ্দেশ্য বুঝা যায়। নচেৎ অনধিকারী ও অধিকারীর নিরূপণ ব্যর্থ হয়। ফল কথা, প্রথমতঃ সকলকেই দ্বৈতসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে।

তৎপূর্ব্বে তাঁহারই অদ্বৈত-সাধনায় অধিকার হইতেই পারে না। সুতরাং শাস্ত্রে দ্বৈতসিদ্ধান্তও আছে। দ্বৈতবাদ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা দ্বৈতসিদ্ধান্তেই দৃঢ়নিষ্ঠাসম্পন্ন সাধনশীল অধিকারী, অথবা যাঁহারা দ্বৈতবুদ্ধিমূলক ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ জানিয়া ভক্তিই চাহেন, কৈবল্যমুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য চাহেন না, পরন্তু উহা তাঁহারা অভীষ্ট লাভের অন্তরায় বুঝিয়া উহাতে সতত বিরক্ত, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রে যে, দ্বৈত-বাদেরও উপদেশ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, সকল শাস্ত্রের কর্ত্তা বা মূলাধার পরমেশ্বর কোন অধিকারীকেই উপেক্ষা করিতে পারেন না, প্রকৃত ভক্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারেন না। তাই তাঁহারই ইচ্ছায় অধিকারিবিশেষের অভীষ্ট লাভের সহায়তার জন্য শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও সনকসম্প্রদায়, এই চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে; বেদান্তদর্শনের গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকাকার প্রথমেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাও তিনি সেখানে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই মহাজন, সকলেই ভগবানের প্রিয় ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারা বিভিন্ন অধিকারিবিশেষের অধিকার ও রুচি বুঝিয়াই তাঁহাদিগের সাধনার জন্য তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন এবং সেই উপদিষ্ট তত্ত্বে অধিকারিবিশেষের নিষ্ঠার সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্যই অন্য মতের খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্তু উহার দ্বারা তাঁহারা যে অন্যান্য শাস্ত্রসিদ্ধান্তকে একেবারেই অশাস্ত্রীয় মনে করিতেন, তাহা বলা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণও নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার ও রুচি অনুসারে অদ্বৈত সাধনাকে গ্রহণ না করিলেও এবং অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে চরম সিদ্ধান্ত না বলিলেও অধিকারিবিশেষের পক্ষে অদ্বৈত সাধনা ও তাহার ফল ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তি যে শাস্ত্র-সম্মত, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ভক্ত অধিকারী উহা চাহেন না, উহা পরমপুরুষার্থও নহে, ইহাই তাঁহাদিগের কথা। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভক্তিযোগ বর্ণনায়[১] "নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যের দ্বারা কেহ কেহ অর্থাৎ ভগবানের পদসেবাভিলাষী ভক্তগণ তাঁহার ঐকাত্ম্য চাহেন না, ইহাই প্রকটিত হওয়ায় কেহ কেহ যে, ভগবানের ঐকাত্ম্য ইচ্ছা করেন, সুতরাং তাঁহারা ঐ একাত্ম্য বা ব্রহ্মসাযুজ্যই লাভ করেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতেরও সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। অন্যথা উক্ত শ্লোকে "কেচিৎ" এই পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে কেন? ইহা অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশেষে ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংই যখন শ্রীমদ্ভাগবতকে "ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণ" এবং "কৈবল্যৈকপ্রয়োজন" বলিয়া গিয়াছেন, তখন অধিকারি-বিশেষের যে, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অদ্বৈতজ্ঞান বা ঐকাত্ম্য দর্শনের ফলে কৈবল্য বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, উহা অলীক নহে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণও অদ্বৈত জ্ঞান ও তাহার ফল "ঐকাত্ম্য"কে অশাস্ত্রীয় বলেন নাই। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ। যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥—৩য় স্কন্ধ, ২৫শ অঃ, ৩৫ শ্লোক। একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষং। মদর্থমীহা ক্রিয়া যেষাং। "প্রসজ্য" আসক্তিং কৃত্বা। "পৌরুষাণি" বীর্য্যাণি।—স্বামিটীকা।

মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥" (আদি, ৫ম পঃ)। পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। সাযুজ্য না চায় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥" (ঐ, ৩য় পঃ)। ফলকথা, অধিকারিবিশেষের জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে অদ্বৈত জ্ঞানেরও উপদেশ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে, বহু স্থানে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বর্ণন আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিলিপ্সু অধিকারীদিগের জন্যই বিশেষরূপে ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন ও ভক্তি-যোগের বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে অধিকারিভেদানুসারেই শাস্ত্রে নানা মত ও নানা সাধনার উপদেশ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত নানা মতের সমন্বয়ের আর কোন পন্থা নাই। অবশ্য ঐরূপ সমন্বয়-ব্যাখ্যার দ্বারাও যে সকল সম্প্রদায়ের বিবাদের শান্তি হয় না, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরন্তু ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সমস্ত আস্তিক দার্শনিকগণই বেদ হইতেই নানা বিরুদ্ধ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বেদবাক্যকেই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করিয়া নানারূপে ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যে নিজ বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহারা কেহই ঐ সকল সিদ্ধান্তের উদ্ভাবন ও সমর্থন করেন নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ঐরূপ বিষয়ে কেবল কাহারও বুদ্ধিমাত্রকল্পিত সিদ্ধান্ত পূর্ব্বকালে এ দেশে আস্তিক-সমাজে পরিগৃহীত হইত না। চার্ব্বাক-সম্প্রদায় এই জন্য শেষে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে কোন কোন স্থলে বেদের বাক্যবিশেষও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামনীষী ভর্ত্তৃহরিও নিজে কোন মতবিশেষের সমর্থন করিলেও অন্যান্য মতও যে, পূর্ব্বোক্তরূপে বেদের বাক্যবিশেষকে আশ্রয় করিয়া তদনুসারেই ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন[১]। ফল কথা, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে বেদার্থ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থিত না হওয়ায় বেদনিরপেক্ষ বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। মননশাস্ত্র বলিয়াই ন্যায়াদি দর্শনে বেদার্থ বিচার হয় নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক।

প্রকৃত কথা এই যে, সাধনা ব্যতীত বেদার্থ বোধ হইতে পারে না। যাঁহার পরমেশ্বর ও গুরুতে পরা ভক্তি জন্মিয়াছে, সেই মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়েই বেদপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহা ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক উপনিষৎ নিজেই বলিয়াছেন[২]। সুতরাং কুতর্ক বা জিগীষামূলক ব্যর্থ বিচার পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাঁহাতেই প্রপন্ন হইতে হইবে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝা যায় না এবং তাঁহাকে লাভ করা যায় না,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"—(কঠ) সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সকল বাদের চরম 'কৃপাবাদ"ই সার বুঝিয়া, তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী হইতেই প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

১। "তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্চিতা স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ" ॥—বাক্যপদীয়। ৭।

২। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ শ্লোক।

তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিলেই তাঁহাকে দেখা যাইবে, এবং তখনই কোন্ তত্ত্ব চরম জ্ঞেয় এবং সাধনার সর্ব্বশেষ ফল কি, ইত্যাদি বুঝা যাইবে। সুতরাং তখন আর কোন সংশয়ই থাকিবে না। তাই শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন,—"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ......তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক ২।২)। কিন্তু যে পরা ভক্তির ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যাইবে, যাহার ফলে তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, সেই ভক্তিও প্রথমে জ্ঞানসাপেক্ষ। কারণ, যিনি ভজনীয়, তাঁহার স্বরূপ ও গুণাদি বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না। তাই বেদে নানা স্থানে তাঁহার স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণন হইয়াছে। বেদজ্ঞ ঋষিগণ সেই বেদার্থ স্মরণ করিয়া, নানাবিধ অধিকারীর জন্য নানাভাবে সেই ভজনীয় ভগবানের স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণন করিয়াছেন। তাই মহর্ষি গোতমও সাধকের ঈশ্বর বিষয়ে ভক্তিলাভের পূর্ব্বাঙ্গ জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য ন্যায়দর্শনে এই প্রকরণের দ্বারা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ জগৎকর্ত্তা এবং তিনিই জীবের সকল কর্ম্মফলের দাতা। তিনি কর্ম্মফল প্রদান না করিলে কর্ম্ম সফল হয় না। অসংখ্য জীবের অসংখ্য বিচিত্র কর্ম্মানুসারেই তিনি অনাদি কাল হইতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও মহর্ষির এই প্রকরণের শেষ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যেই "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে ও শেষে আবার জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের কথা বলিব। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে" ॥২১॥

কেবলেশ্বরকারণতা-নিরাকরণ-প্রকরণ
(বার্ত্তিকাদি মতে ঈশ্বরোপাদানতা-প্রকরণ)
সমাপ্ত ॥৫॥

—— o ——

ভাষ্য। অপর ইদানীমাহ—

অনুবাদ। ইদানীং অর্থাৎ জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত্ব ব্যবস্থাপনের পরে অপর (নাস্তিকবিশেষ) বলিতেছেন,—

সূত্র। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টক-তৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥২২॥৩৬৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ভাবপদার্থের (শরীরাদির) উৎপত্তি নির্নিমিত্তক, যেহেতু কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি (নির্নিমিত্তক) দেখা যায়।

ভাষ্য। অনিমিত্তা শরীরাদ্যুৎপত্তিঃ, কস্মাৎ ? কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ, যথা কণ্টকস্য তৈক্ষ্ণ্যং, পর্ব্বতধাতূনাং চিত্রতা, গ্রাব্ণাং শ্লক্ষ্ণতা, নির্নিমিত্তঞ্চোপাদানবচ্চ দৃষ্টং, তথা শরীরাদিসর্গোঽপীতি।

অনুবাদ। শরীরাদির উৎপত্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ উহার নিমিত্ত-কারণ নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি দেখা যায়। (তাৎপর্য্যার্থ) যেমন কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পার্ব্বত্য ধাতুসমূহের নানাবর্ণতা, প্রস্তরসমূহের কাঠিন্য (ইত্যাদি) নির্নিমিত্ত এবং উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমিত্তকারণশূন্য, কিন্তু উপাদানকারণবিশিষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ শরীরাদি সৃষ্টিও নির্নিমিত্ত, কিন্তু উপাদান-কারণবিশিষ্ট।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রেত্যভাবের পরীক্ষা করিতে তাঁহার মতে শরীরাদি ভাব কার্য্যের উপাদান কারণ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বপ্রকরণের দ্বারা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোন চার্ব্বাক-সম্প্রদায় শরীরাদি ভাব-কার্য্যের উপাদান-কারণ স্বীকার করিলেও নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম ও শরীরাদি সৃষ্টির কারণ না হওয়ায় উহাঁর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। তাই মহর্ষি এখানে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত সিদ্ধান্তের বাধক নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীরাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তি "অনিমিত্ত" অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণশূন্য। সূত্রে "অনিমিত্ততঃ" এই স্থলে "অনিমিত্ত" এইরূপ প্রথমান্ত পদের উত্তর "তসিল" (তস্) প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা অনিমিত্ত অর্থাৎ নিমিত্তকারণ-শূন্য, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। ভাষ্যকারও সূত্রোক্ত "অনিমিত্ততঃ" এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অনিমিত্তা"। শরীরাদি ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক, ইহা বুঝিব কিরূপে, ঐ বিষয়ে প্রমাণ কি? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে, "কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ"। উদ্দ্যোতকর ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] যেমন কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি নিমিত্তকারণশূন্য এবং উপাদান-কারণবিশিষ্ট, তদ্রূপ শরীরাদি সৃষ্টিও নিমিত্তকারণশূন্য এবং উপাদানকারণবিশিষ্ট। উদ্দ্যোতকর শেষে এই সূত্রকে দৃষ্টান্তসূত্র বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের সাধক অনুমান বলিয়াছেন যে, রচনাবিশেষ যে শরীরাদি, তাহা নির্নিমিত্তক অর্থাৎ নিমিত্তকারণশূন্য, যেহেতু উহাতে সংস্থান অর্থাৎ আকৃতিবিশেষ আছে, যেমন কণ্টকাদি। অর্থাৎ তাঁহার মতে এই সূত্রে কণ্টকাদিকেই দৃষ্টান্ত-রূপে প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানই সূচিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট কণ্টকাদির নিমিত্ত-কারণের দর্শন না হওয়ায় কণ্টকাদির নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ কণ্টকাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট শরীরাদিরও নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এখানে কণ্টকাদিকেই সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্র ও ভাষ্যের দ্বারা কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতিই এখানে দৃষ্টান্ত বুঝা যায়। সে যাহা হউক,

---

১। যথা কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদি নির্নিমিত্তঞ্চ, উপাদানবচ্চ, তথা শরীরাদিসর্গোঽপি। তদিদং দৃষ্টান্তসূত্রং। কঃ পুনরত্র ন্যায়ঃ?—অনিমিত্তা রচনাবিশেষাঃ শরীরাদয়ঃ সংস্থানবত্ত্বাৎ, কণ্টকাদিবদিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা এই যে, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা কণ্টকের সংস্থান অর্থাৎ আকৃতি-বিশেষ। কণ্টকের অবয়বের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগই উহার আকৃতি। ঐ আকৃতির উপাদান-কারণ কণ্টকের অবয়ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং ঐ সমস্ত অবয়বই কণ্টকের উপাদান-কারণ। সুতরাং কণ্টক বা উহার তীক্ষ্ণতার উপাদান-কারণ নাই, ইহা বলা যায় না, প্রত্যক্ষসিদ্ধ কারণের অপলাপ করা যায় না। কিন্তু কণ্টকের এবং উহার তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির কর্ত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অন্য কোন নিমিত্ত-কারণেরও প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং উহার নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। এইরূপ পার্ব্বত্য ধাতুসমূহের নানাবর্ণতা ও প্রস্তরের কাঠিন্য প্রভৃতি বহু পদার্থ আছে, যাহার কর্ত্তা প্রভৃতি অন্য কোন কারণের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ঐ সমস্ত পদার্থ নিমিত্তকারণশূন্য, ইহাই স্বীকার্য্য। এইরূপ শরীরাদি ভাবকার্য্যের উপাদান-কারণ হস্তপদাদি অবয়ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া উহা স্বীকার্য্য। কিন্তু শরীরাদি ভাবকার্য্যের কর্ত্তা প্রভৃতি আর কোন কারণ বিষয়ে প্রমাণ নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কণ্টকাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা শরীরাদি সৃষ্টি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণশূন্য, কিন্তু উপাদানকারণবিশিষ্ট, ইহাই সিদ্ধ হয়। এখানে পূর্ব্বপ্রচলিত সমস্ত ভাষ্য-পুস্তকেই "নির্নিমিত্তকোপাদানং দৃষ্টং" এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "নির্নিমিত্তঞ্চ উপাদানবচ্চ।" উদ্দ্যোতকরের ঐ কথার দ্বারা ভাষ্যকারের "নির্নিমিত্ত-ঞ্চোপাদানবচ্চ দৃষ্টং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কোন ভাষ্যপুস্তকেও ঐরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইল। বস্তুতঃ ভাবকার্য্য নিমিত্তকারণশূন্য, কিন্তু উপাদান-কারণ-বিশিষ্ট, এইরূপ মতই এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষ্যপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচলিত পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝা যায় না। উদ্দ্যোতকরও পূর্ব্বোক্তরূপ মতই এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"কার উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষই এখানে পূর্ব্বপক্ষ বুঝা যায়। ফলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এখানে ভাবকার্য্যের উপাদান কারণ আছে, কিন্তু নিমিত্তকারণ নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। কিন্তু তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে ভাবকার্য্যের কোন নিয়ত কারণই নাই, ইহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষ। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র যেমন এই প্রকরণকে "আকস্মিকত্ব-প্রকরণ" বলিয়াছেন, তদ্রূপ নব্য নৈয়ায়িক বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। এই প্রকরণের ব্যাখ্যার পরে আকস্মিকত্ববাদের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥২২॥

সূত্র। অনিমিত্ত-নিমিত্তত্বান্নানিমিত্ততঃ ॥২৩॥৩৬৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) "অনিমিত্তে"র নিমিত্ততাবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী "অনি-মিত্ততঃ" এই বাক্যের দ্বারা অনিমিত্তকেই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত বলায় "অনিমিত্ততঃ" অর্থাৎ ভাবকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত নাই, ইহা আর বলিতে পারেন না।

ভাষ্য। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিরিত্যুচ্যতে, যতশ্চোৎপদ্যতে তন্নিমিত্তং, অনিমিত্তস্য নিমিত্তত্বান্নানিমিত্তা ভাবোৎপত্তিরিতি।

অনুবাদ। "অনিমিত্ত" হইতে ভাব কার্য্যের উৎপত্তি, ইহা উক্ত হইতেছে, কিন্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা নিমিত্ত। "অনিমিত্তে"র নিমিত্তভাবশতঃ ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়া, পরবর্ত্তী স্থত্রের দ্বারা ঐ উত্তরের খণ্ডন করায়, এই সূত্রোক্ত উত্তর, তাঁহার নিজের উত্তর নহে, উহা অপরের উত্তর, ইহা বুঝা যায়। তাই বার্ত্তিককার, তাৎপর্য্যটীকাকার ও বৃত্তিকার প্রভৃতি এই সূত্রোক্ত উত্তরকে অপরের উত্তর বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি নিজে যে এখানে কোন সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলেন নাই, ইহা পরবর্ত্তী স্থত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও বুঝা যায়। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অপরের কথা বলিয়াছেন যে, "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের দ্বারা "অনিমিত্ত"হইতে ভাবকার্য্যের উৎপত্তি কথিত হওয়ায় "অনিমিত্ত"ই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, "অনিমিত্ততঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা হেতুতা অর্থই বুঝা যায়। তাহা হইলে যখন "অনিমিত্ত"ই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহা বলা হয়, তখন ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ উহার নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহা আর বলা যায় না॥ ২৩॥

সূত্র। নিমিত্তানিমিত্তয়োরর্থান্তরভাবাদপ্রতিষেধঃ॥ ॥২৪॥৩৬৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিমিত্ত ও অনিমিত্তের অর্থান্তরভাব (ভেদ) বশতঃ প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তর হয় না।

ভাষ্য। অন্যদ্ধি নিমিত্তমন্যচ্চ নিমিত্তপ্রত্যাখ্যানং, নচ প্রত্যাখ্যানমেব প্রত্যাখ্যেয়ং, যথানুদকঃ কমণ্ডলুরিতি নোদকপ্রতিষেধ উদকং ভবতীতি।

স খল্বয়ং বাদোহকর্ম্মনিমিত্তঃ শরীরাদিসর্গ ইত্যেতস্মান্ন ভিদ্যতে, অভেদাত্তৎপ্রতিষেধেনৈব প্রতিষিদ্ধো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু নিমিত্ত অন্য, এবং নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান (অভাব) অন্য, কিন্তু প্রত্যাখ্যানই প্রত্যাখ্যেয় হয় না, অর্থাৎ নিমিত্তের অভাব (প্রত্যাখ্যান) বলিলে

উহা নিমিত্ত (প্রত্যাখ্যেয়) হয় না। যেমন "কমণ্ডলু অনুদক" (জলশূন্য), এই বাক্যের দ্বারা জলের প্রতিষেধ করিলে "জল আছে" ইহা বলা হয় না।

সেই এই বাদ অর্থাৎ "ভাব পদার্থের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক" এই পূর্ব্বপক্ষ, "শরীরাদি সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে ভিন্ন নহে, অভেদবশতঃ সেই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিষেধের দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ জানিবে। [অর্থাৎ তৃতীয়াধ্যায়ের শেষে "শরীরাদি সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনের দ্বারাই "ভাব কার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক", এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হওয়ায় মহর্ষি এখানে আর পৃথক্ সূত্রের দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই।]

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, নিমিত্ত ও অনিমিত্ত অর্থান্তর, অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, নিমিত্ত ও নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন পদার্থ। প্রত্যাখ্যানই প্রত্যাখ্যেয় হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের দ্বারা ভাবকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান বলা হইয়াছে। নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান বলিতে নিমিত্তের অভাব। নিমিত্ত ঐ অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া উহাকে প্রত্যাখ্যেয় বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী নিমিত্তকে প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অস্বীকার করায় নিমিত্ত তাঁহার প্রত্যাখ্যেয়, ইহাও বলা যায়। কিন্তু যাহা নিমিত্তের অভাব (প্রত্যাখ্যান), তাহা নিমিত্ত (প্রত্যাখ্যেয়) হইতে পারে না। কারণ, নিমিত্ত ও নিমিত্তের অভাব ভিন্ন পদার্থ। নিমিত্তের অভাব বলিলে নিমিত্ত বলা হয় না। যেমন "কমণ্ডলু জলশূন্য" এই কথা বলিলে কমণ্ডলুতে জল নাই, ইহাই বুঝা যায়; কমণ্ডলুতে জল আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। তদ্রূপ ভাবকার্য্যের নিমিত্ত নাই বলিলে নিমিত্ত আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। ফলকথা, "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যে "অনিমিত্ততঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হয় নাই; প্রথমা বিভক্তিই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ উহার নিমিত্তের অভাবই কথিত হইয়াছে। "অনিমিত্ত" অর্থাৎ নিমিত্তাভাবই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহা কথিত হয় নাই। নিমিত্তাভাব ও নিমিত্ত, পরস্পর বিরোধী ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং নিমিত্তাভাব বলিলে নিমিত্ত আছে, ইহাও বুঝা যায় না; কিন্তু নিমিত্ত নাই, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং নিমিত্তাভাবই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, ভাবকার্য্যের যে কোন নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিলে "অনিমিত্ততঃ" এই বাক্যের দ্বারা "নিমিত্ত নাই" এইরূপে সামান্যতঃ নিমিত্তের নিষেধ উপপন্ন হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা না বুঝিয়াই অপর সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর বলিয়াছেন। তাঁহা-দিগের ঐ প্রতিষেধ বা উত্তর ভ্রান্তিমূলক।

তবে ঐ পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর কি? সূত্রকার মহর্ষি এখানে নিজে কোন সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই কেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার শেষে

বলিয়াছেন যে, এই পূর্ব্বপক্ষ এবং তৃতীয়াধ্যায়ের শেষে মহর্ষির খণ্ডিত "শরীরাদি-সৃষ্টি জীবের কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই পূর্ব্বপক্ষ, ফলতঃ অভিন্ন। সুতরাং তৃতীয়াধ্যায়ে সেই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনের দ্বারাই এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বেই খণ্ডিত হওয়ায় মহর্ষি এখানে আর পৃথক্ সূত্রের দ্বারা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ের শেষ প্রকরণে নানা যুক্তির দ্বারা জীবের শরীরাদি সৃষ্টি যে, জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল—ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তক, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং জীবের শরীরাদি সৃষ্টিতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট নিমিত্ত-কারণরূপে পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হওয়ায় ভাবকার্য্যের উৎপত্তিতে কোন নিমিত্ত-কারণ নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বপ্রকরণে জীবের কর্ম্মফল অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরেরও নিমিত্তকারণত্ব সমর্থন করিয়া, প্রসঙ্গতঃ আবশ্যক বোধে শেষে পূর্ব্বপক্ষরূপে নাস্তিক মতবিশেষও প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য সম্প্রদায় ঐ পূর্ব্বপক্ষের যে অসদুত্তর বলিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির নিজের যাহা উত্তর, তাহা পূর্ব্বেই প্রকটিত হওয়ায় এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। এখানে তাঁহার উত্তর বুঝিতে হইবে যে, শরীরাদি-সৃষ্টিতে জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট নিমিত্ত-কারণ, ইহা পূর্ব্বে নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে, এবং ঐ অদৃষ্টরূপ নিমিত্ত-কারণ স্বীকার্য্য হইলে, উহার অধিষ্ঠাতা বা ফলদাতা ঈশ্বরও নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য, ইহাও পূর্ব্বপ্রকরণে বলা হইয়াছে। অতএব ভাব-কার্য্যের উৎপত্তির উপাদান-কারণ থাকিলেও কোন নিমিত্ত-কারণ নাই, এই মত কোনরূপেই উপপন্ন হয় না, উহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে।

উদ্দ্যোতকর এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কার্য্যই নির্নিমিত্তক অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণশূন্য, ইহা অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে গেলে যাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে হইবে, তিনি প্রতিপাদ্য পুরুষ, এবং যিনি প্রতিপাদন করিবেন, তিনি প্রতিপাদক পুরুষ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ প্রতিপাদন-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্মকারক পুরুষদ্বয় যে, ঐ প্রতিপাদন-ক্রিয়ার নিমিত্ত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ক্রিয়ার নিমিত্ত না হইলে তাহা কারক হইতে পারে না। সুতরাং কোন কার্য্যেরই নিমিত্ত নাই বলিয়া আবার উহা প্রতিপাদন করিতে গেলে, ঐ প্রতিপাদন ক্রিয়ার নিমিত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইবে। অথবা ঐ মত প্রতিপাদন না করিয়া নীরবই থাকিতে হইবে। পরন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাঁহার মত প্রতিপাদন করায় ঐ বাক্যকেও তিনি তাঁহার ঐ মত-প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। নচেৎ তিনি ঐ বাক্য প্রয়োগ করেন কেন? পরন্তু তিনি "সনিমিত্তা ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্য এবং "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের অর্থ-ভেদ স্বীকার না করিয়া পারেন না। সুতরাং তিনি যে বাক্যবিশেষের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহাই যে তাঁহার মত-প্রতিপাদনে নিমিত্ত, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ তিনি "সনিমিত্তা ভাবোৎপত্তিঃ" এইরূপ বাক্য কেন বলেন না? পরন্তু কার্য্য মাত্রেরই নিমিত্ত নাই বলিলে সর্ব্বলোক-

ব্যবহারের উচ্ছেদ হয়। কেবল শরীরাদিই নির্নিমিত্তক, এইরূপ অনুমান করিলেও কণ্টকাদি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, কণ্টকাদি যে নির্নিমিত্তক, ইহা উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে। ঘটপটাদি কার্য্যের কর্ত্তা প্রভৃতি নিমিত্ত-কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঘটপটাদি কার্য্যকে সনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐ ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে কণ্টকাদিরও সনিমিত্তকত্ব অনুমানসিদ্ধ হওয়ায় কণ্টকাদিরও নির্নিমিত্তকত্ব নাই। কণ্টকাদিরও অবশ্য নিমিত্ত-কারণ আছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ অনুমানে কণ্টকাদি দৃষ্টান্তও হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণও এই প্রকরণকে "আকস্মিকত্ব প্রকরণ" বলিয়াছেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে ভাব কার্য্যের কোনরূপ নিয়ত কারণ নাই, ইহাই এই প্রকরণের প্রথম সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ। বস্তুতঃ কোন নিয়ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ কার্য্য জন্মে, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় অকস্মাৎ হইয়া থাকে, এই মতই "আকস্মিকত্ববাদ" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই "আকস্মিকত্ববাদে"রই অপর নাম "যদৃচ্ছাবাদ"। এই "যদৃচ্ছাবাদ"ও অতি প্রাচীন মত। অনাদি কাল হইতেই আস্তিক মতের সহিত নানাবিধ নাস্তিক মতেরও প্রকাশ ও সমর্থন হইয়াছে। তাই উপনিষদেও আমরা সমস্ত নাস্তিক মতেরও পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচনা পাই। উপনিষদেও "কালবাদ", "স্বভাববাদ" ও "নিয়তিবাদে"র সহিত পূর্ব্বোক্ত "যদৃচ্ছাবাদে"রও উল্লেখ দেখিতে পাই[1]। সেখানে ভাষ্যকার ও "দীপিকা"কারের ব্যাখ্যার দ্বারাও "যদৃচ্ছাবাদ" যে "আকস্মিকত্ব-বাদে"রই নামান্তর, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐ কালবাদ ও স্বভাববাদ প্রভৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদও দেখা যায়। সুশ্রুতসংহিতাতেও স্বভাববাদ, ঈশ্বরবাদ, কালবাদ, যদৃচ্ছাবাদ, নিয়তিবাদ ও পরিণামবাদের উল্লেখ দেখা যায়[2]। কিন্তু সুশ্রুতসংহিতার প্রাচীন টীকাকার ডহ্লণাচার্য্য ঐ যদৃচ্ছাবাদের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

১। "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা"।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।১।২।

ইদানীং কালাদীনি ব্রহ্মকারণবাদপ্রতিপক্ষভূতানি বিচারবিষয়ত্বেন দর্শয়তি 'কালঃ স্বভাব" ইতি। "যোনি"শব্দঃ সম্বধ্যতে। কালো যোনিঃ কারণং স্যাৎ। কালো নাম সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ। স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ, অগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। নিয়তিরবিষমপুণ্যাপাপলক্ষণং কর্ম্ম। যদৃচ্ছা আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ।—শাঙ্কর ভাষ্য। কালো নিমেষাদিপরার্দ্ধান্তপ্রত্যয়োৎপাদকো ভূতো বর্ত্তমান আগামীতি ব্যবহ্রিয়মাণো জনৈঃ। "স্বভাবঃ" স্বস্য তত্তৎপদার্থস্য ভাবোঽসাধারণকার্য্যকারিত্বং, যথাঽগ্নের্দ্দাহাদিকারিত্বমপাং নিম্নদেশগমনাদি। "নিয়তিঃ" সর্ব্বপদার্থেষ্বনুগতাকারবন্নিয়মনশক্তিঃ। যথা ঋতুষ্বেব যোষিতাং গর্ভধারণং, ইন্দূদয়ে সমুদ্রবৃদ্ধিরিত্যাদি। "যদৃচ্ছা" কাকতালীয়ন্যায়েন সংবাদকারিণী কাচন শক্তিঃ। যথা ঋতুমতীনাং যোষিতাং কাসাঞ্চিৎ কস্মিংশ্চিদৃতৌ গর্ভধারণ-মিত্যাদি।—শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা।

২। বৈদ্যকেতু—"স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিস্তথা।
পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ"॥—শারীরস্থান।১।১১।

যো যতো ভবতি তৎ তন্নিমিত্তমিতি যাদৃচ্ছিকাঃ। যথা তৃণারণিনিমিত্তো বহ্নিরিতি।—ডহ্লণাচার্য্যটীকা।

ব্যাখ্যানুসারে যদৃচ্ছাবাদীরাও কার্য্যের নিয়ত নিমিত্ত স্বীকার করেন বুঝা যায়। সুতরাং ঐ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। পরন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বভাববাদ প্রভৃতি সমস্ত মতকেই আয়ুর্ব্বেদের মত বলিয়া, সুশ্রুতসংহিতা হইতেই ঐ সমস্ত মতেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শেষে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার জেজ্জট ও গয়দাসের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। জেজ্জটের মতে ঈশ্বর ভিন্ন স্বভাব, কাল, যদৃচ্ছা ও নিয়তি, এই সমস্তই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণামবিশেষ। সুতরাং ঐ সমস্তই মূল প্রকৃতি হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন পদার্থ না হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদের মতেও ঐ স্বভাব প্রভৃতি জগতের উপাদান-কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে। কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। গয়দাসের মতে সুশ্রুতোক্ত স্বভাব, ঈশ্বর ও কাল প্রভৃতি সমস্তই জগতের কারণ। তন্মধ্যে প্রকৃতির পরিণাম উপাদান-কারণ। স্বভাব প্রভৃতি প্রথমোক্ত পাঁচটি নিমিত্ত-কারণ। ফলকথা, "সুশ্রুত-সংহিতা"র প্রাচীন টীকাকারগণের মতে সুশ্রুতোক্ত "স্বভাবমীশ্বরং কালং" ইত্যাদি শ্লোক-বর্ণিত মত আয়ুর্ব্বেদেরই মত, ইহা বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত "বৈদ্যকে তু" এই বাক্যের দ্বারাও সরল ভাবে উহাই বুঝা যায়। কিন্তু কোন আধুনিক টীকাকার প্রাচীন ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পৃথুদর্শী"রা অর্থাৎ স্থূলদর্শীরা কেহ স্বভাব, কেহ ঈশ্বর, কেহ কাল, কেহ যদৃচ্ছা, কেহ নিয়তি ও কেহ পরিণামকে জগতের "প্রকৃতি" অর্থাৎ মূল কারণ মনে করেন। অর্থাৎ উহার কোন মতই আয়ুর্ব্বেদের মত নহে। আয়ুর্ব্বেদের মত পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে। অবশ্য "স্বভাববাদ" প্রভৃতির প্রাচীন ব্যাখ্যানুসারে "সুশ্রুতসংহিতা"র পূর্ব্বোক্ত "স্বভাবমীশ্বরং কালং" ইত্যাদি শ্লোকের নবীন ব্যাখ্যা সুসংগত হইতে পারে। কিন্তু ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে "বৈদ্যকে তু" এইরূপ বাক্য কেন প্রযুক্ত হইয়াছে ? উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে আয়ুর্ব্বেদের মত কথিত হইলে তৎপূর্ব্বেই "বৈদ্যকে তু" এই বাক্য কেন প্রযুক্ত হয় নাই ? ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "পরিণামঞ্চ" এই বাক্যের দ্বারা কিসের পরিণামকে কিরূপে কোন্ সম্প্রদায় জগতের প্রকৃতি বলিয়াছেন, উহা কিরূপেই বা সম্ভব হয় এবং ঐ শেষোক্ত মতও আয়ুর্ব্বেদের মত নহে কেন ? এই সমস্তও চিন্তা করা আবশ্যক। সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে যে "যদৃচ্ছাবাদের" কথা বলিয়াছি, উহা যে, "আকস্মিকত্ববাদে"রই নামান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ এখানে অকস্মাৎ। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৩১শ সূত্রে মহর্ষি গোতমও অকস্মাৎ অর্থে "যদৃচ্ছা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং মহর্ষি গোতমের সর্ব্বপ্রথম সূত্রের ভাষ্যে তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে, "আকস্মিক" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ বিনা কারণে উৎপন্ন, ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। (১ম খণ্ড, ৬১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কোন নিয়ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, ইহাই "আকস্মিকত্ববাদ" বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। "যদৃচ্ছা" শব্দের দ্বারাও ঐরূপ অর্থ বুঝা যায়। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩৩শ সূত্রের শঙ্করভাষ্যের "ভামতী" টীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের "যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাদ্বা" এই

বাক্যের ব্যাখ্যায় "কল্পতরু" টীকাকার অমলানন্দ সরস্বতী যাহা বলিয়াছেন[১], তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত "যদৃচ্ছা" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই বুঝা যায় এবং "যদৃচ্ছা" ও "স্বভাব" যে ভিন্ন পদার্থ, ইহাও বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রভৃতিতেও "স্বভাব" ও "যদৃচ্ছা"র পৃথক্ উল্লেখই দেখা যায়। কিন্তু স্বভাববাদীরাও যদৃচ্ছাবাদীদিগের ন্যায় নিজ মত সমর্থন করিতে কণ্টকের তীক্ষ্ণতাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। "বুদ্ধচরিত" গ্রন্থে অশ্বঘোষ "স্বভাববাদে"র উল্লেখ করিতে লিখিয়াছেন, "কঃ কণ্টকস্য প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং"[২]। জৈন পণ্ডিত নেমিচন্দ্রের প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "গোম্মট্‌সার" গ্রন্থেও "স্বভাববাদ" বর্ণনে ঐরূপ কথাই পাওয়া যায়[৩]। সুতরাং মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পূর্ব্বোক্ত "স্বভাববাদ"ই কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ সকলেই এই প্রকরণকে আকস্মিকত্ব-প্রকরণ নামে উল্লেখ করায় তাঁহাদিগের মতে "আকস্মিকত্ববাদ"ই মহর্ষির এই প্রকরণোক্ত পূর্ব্বপক্ষ, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যার দ্বারা ভাবকার্য্যের নিমিত্ত-কারণ নাই, কিন্তু উপাদান-কারণ আছে, এই মতই পূর্ব্বোক্ত সূত্রে কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় এবং "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"কার উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষও যে, সুপ্রাচীন কালে একপ্রকার "আকস্মিকত্ববাদ" নামে কথিত হইত, ইহা বুঝা যায়। পরে কার্য্যের নিয়ত কোন কারণই নাই, এই মতই "আকস্মিকত্ববাদ" নামে প্রসিদ্ধ ও সমর্থিত হওয়ায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ "আকস্মিকত্ববাদ"কেই এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে ন্যায়বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "আকস্মিকত্ব"বাদকে এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিলেও তিনি তাঁহার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে "আকস্মিকত্ববাদে"র নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। ফলকথা, ভাবকার্য্যের উপাদান-কারণ আছে, কিন্তু নিমিত্ত-কারণ নাই, এইরূপ মত আর কেহই "আকস্মিকত্ববাদ" বলিয়া উল্লেখ না করিলেও সুপ্রাচীন কালে উহাও যে এক

১। নিয়তনিমিত্তমনপেক্ষ্য যদা কদাচিৎ প্রবৃত্ত্যাদয়ো যদৃচ্ছা। স্বভাবস্তু স এব যাবদ্‌বস্তুভাবী ; যথা শ্বাসাদৌ। —কল্পতরু।

২। "কঃ কণ্টকস্য প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাং বা।
স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং ন কামকারোঽস্তি কুতঃ প্রযত্নঃ ॥—বুদ্ধচরিত। ৫২।

"সুশ্রুতসংহিতা"র টীকাকার ডহ্লণাচার্য্য "স্বভাববাদে"র ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন, 'তথাহি কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং, চিত্রং বিচিত্রং মৃগপক্ষিণাঞ্চ। মাধুর্য্যমিক্ষৌ কটুতা মরীচে, স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং।"—শারীরস্থান ১।১১—টীকা।

৩। "কো করই কণ্টয়াণং তিক্‌খত্তং মিগবিহংগমাদীণং।
বিবিহত্তং তু সহাও ইদি সব্বং পিয় সহাও ত্তি ॥—গোম্মট্‌সার, ৮৮৩ শ্লোক।

প্রকার "আকস্মিকত্ববাদ" নামে কথিত হইত, ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। নচেৎ অন্য কোনরূপে তাঁহাদিগের কথার সামঞ্জস্য হয় না। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রথম স্তবকে চতুর্থ কারিকায় "সাপেক্ষত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক কার্য্যকারণ ভাবের ব্যবস্থাপন করিয়া, শেষে "অকস্মাদেব ভবতীতি চেৎ?" এই বাক্যের দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদ"কে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া "হেতুভূতিনিষেধো ন" ইত্যাদি পঞ্চম কারিকা[১]র দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা কার্য্যের হেতু নিষেধ হইতে পারে না, অর্থাৎ কার্য্যের কিছুমাত্র কারণ নাই, ইহা বলা যায় না। (২) কার্য্যের "ভূতি" অর্থাৎ উৎপত্তিই হয় না, ইহাও বলা যায় না। (৩) কার্য্য নিজেই নিজের কারণ, কার্য্যের অতিরিক্ত কোন কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। (৪) এবং কোন "অনুপাখ্য" অর্থাৎ অলীক পদার্থই কার্য্যের কারণ, কার্য্যের বাস্তব কোন কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। অর্থাৎ "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ চতুর্ব্বিধ মতের কোন মতই সংস্থাপন করা যায় না। উদয়নাচার্য্য শেষে ঐ কারিকার দ্বারা "স্বভাববাদে"রও খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ঐ কারিকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যে "অকস্মাৎ" শব্দের অর্থ স্বভাব, উহার মধ্যে "কিম্" শব্দ ও "নঞ্" শব্দ নাই। নঞর্থক "অ" শব্দও পৃথক্ ভাবে উহার পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ "অকস্মাৎ" শব্দটি "অশ্বকর্ণ" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ব্যুৎপত্তিশূন্য, স্বভাব অর্থেই উহা রূঢ়। তাহা হইলে "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, কার্য্য স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। তাই উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কারিকার তৃতীয় চরণ বলিয়াছেন, "স্বভাববর্ণনা নৈবং"। অর্থাৎ স্বভাব হইতেই কার্য্য জন্মে, ইহাও বলা যায় না। কিন্তু স্বভাববাদিগণ যে, "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা স্বভাববাদের বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা আর কোথাও দেখা যায় না। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকার নব্য টীকাকার নবদ্বীপের হরিদাস তর্কাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম কারিকার অবতারণা করিতে লিখিয়াছেন,—"অকস্মাদেব ভবতি ন কিঞ্চিদপেক্ষ্য কার্য্যমিতি, অতএব "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনা"দিতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রং, তত্রাহ"। হরিদাস তর্কাচার্য্যের কথার দ্বারা "অকস্মাদেব ভবতি ন কিঞ্চিদপেক্ষ্য কার্য্যং" এই বাক্যটি যে, তাঁহার গুরুমুখশ্রুত আকস্মিকত্ববাদীদিগের সিদ্ধান্তসূত্র, ইহা মনে হয়। এবং "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি ন্যায়সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "অকস্মাদেব ভবতি" এই মতই যে, পূর্ব্বপক্ষরূপে কথিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য উদয়নাচার্য্য "সাপেক্ষত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা কার্য্য নিজের উৎপত্তিতে কিছু অপেক্ষা করে, নচেৎ কার্য্যের কাদাচিৎকত্বের

১। "হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ।
স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ" ॥—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ।১।৫।

ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্য্য কখনও আছে, কখনও নাই, ইহা হইতে পারে না, সর্ব্বদাই কার্য্যের উৎপত্তি অনিবার্য্য হওয়ায় কার্য্যের সর্ব্বকালবর্ত্তিত্বেরই আপত্তি হয়, এইরূপ যুক্তির দ্বারা কার্য্যের যে কারণ আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতেই "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদে"র খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং ঐ উভয় মতেই যে, কার্য্যের কোন নিয়ত কারণ নাই, ইহাও উদয়নাচার্য্যের ঐ বিচারের দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু স্বভাববাদীরা উদয়নাচার্য্যের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি চিন্তা করিয়া স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, কার্য্য যে কোন নিয়ত দেশকালেই উৎপন্ন হয়, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে উৎপন্ন হয় না, ইহাতে স্বভাবই নিয়ামক অর্থাৎ স্বভাবতঃই ঐরূপ হইয়া থাকে। "আকস্মিকত্ববাদ" হইতে "স্বভাববাদে"র এই বিশেষই উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও শেষে ঐ "স্বভাববাদে"র ব্যাখ্যা করিতে স্বভাববাদীদিগের কারিকা[1] উদ্ধৃত করিয়া স্বভাববাদের বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" চার্ব্বাকদর্শন প্রবন্ধে ঐ কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিচারের শেষে স্বভাববাদকেই বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "স্বভাব" বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি নিরাস করা যায় না। বস্তুতঃ ঐ "স্বভাবে"র কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, "স্বভাব" বলিলে স্বকীয় ভাব বা স্বীয় ধর্ম্মবিশেষ বুঝা যায়। এখন ঐ "স্বভাব" কি কার্য্যের স্বভাব, অথবা কারণের স্বভাব, ইহা বলা আবশ্যক। কার্য্যের স্বভাব বলিলে উহা কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে না থাকায় উহা নিয়ত দেশকালে কার্য্যের উৎপত্তির নিয়ামক হইতে পারে না। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের কোন স্বভাব থাকিতে পারে না। আর যদি ঐ স্বভাবকে কারণের স্বভাব বলা হয়, তাহা হইলে কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কারণের স্বভাব, ইহা কখনই বলা যায় না। কারণ স্বীকার করিতে হইলে আর "স্বভাববাদ" থাকে না, "স্বভাব" বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কারণের শক্তিই কারণের স্বভাব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তি বলিয়া অতিরিক্ত কোন পদার্থ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উহা খণ্ডন করিয়া কারণত্বই যে, কারণের শক্তি[2] এবং উহা কারণের স্বভাব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং কার্য্যের কারণ অস্বীকার করিয়া স্বভাববাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। "স্বভাব" বলিতে স্বরূপ, অর্থাৎ

১। নিত্যসত্ত্বা ভবন্ত্যন্যে নিত্যাসত্ত্বাশ্চ কেচন।
বিচিত্রাঃ কেচিদিত্যত্র তৎস্বভাবো নিয়ামকঃ॥
অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং (রচিতং) তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

২। "অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণং, ন কিঞ্চিৎ, তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢ়ং, নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোহসৌ তর্হি?—কারণত্বং" ইত্যাদি।—১৩শ কারিকার গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কার্য্য নিজেই তাহার স্বভাব, ইহা বলিলে কার্য্য নিজেই উৎপন্ন হয়, অথবা কার্য্য নিজেই নিজের কারণ, ইহাই বলা হয়। কিন্তু কার্য্যের পূর্ব্বে ঐ কার্য্য না থাকায় উহা কোনরূপেই তাহার কারণ হইতে পারে না। কার্য্যের কোন কারণই নাই, কার্য্য নিজের উৎপত্তিতে নিজের স্বভাব বা স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুকেই অপেক্ষা করে না, ইহা বলিলে সর্ব্বদা কার্য্যের উৎপত্তি ও স্থিতি অনিবার্য্য। তাই উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মতেরই খণ্ডন করিতে হেতু বলিয়াছেন, "অবধে-র্নিয়তত্বতঃ"। অর্থাৎ সকল কার্য্যেরই নিয়ত অবধি আছে। যাহা হইতে অথবা যে দেশ কালে কার্য্য জন্মে, যাহার অভাবে ঐ কার্য্য জন্মে না, তাহাকে ঐ কার্য্যের "অবধি" বলা যায়। ঐ "অবধি" নিয়ত অর্থাৎ উহা নিয়মবদ্ধ। সকল দেশ কালই সকল কার্য্যের অবধি নহে। তাহা হইলে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং কার্য্যবিশেষের প্রতি যখন দেশবিশেষ ও কালবিশেষই নিয়ত অবধি বলিয়া স্বীকার্য্য এবং উহা পরিদৃষ্ট সত্য, তখন আর পূর্ব্বোক্ত "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদ" কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। কারণ, কার্য্যের যাহা নিয়ত "অবধি" বলিয়া স্বীকার্য্য, তাহাই ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া কথিত হয়। কার্য্য মাত্রই তাহার ঐ নিয়ত কারণসাপেক্ষ। সুতরাং কার্য্য কোন নিয়ত কারণকে অপেক্ষা করে না, অথবা কার্য্য স্বভাবতঃই নিয়ত দেশকালে উৎপন্ন হয়, অতিরিক্ত কোন পদার্থ তাহাতে অপেক্ষিত নহে, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না। বস্তুতঃ যে সকল পদার্থ কখনও আছে, কখনও নাই, সেই সমস্ত পদার্থের ঐ "কাদাচিৎকত্ব" কারণের অপেক্ষাবশতঃই সম্ভব হয়, অন্যথা উহা সম্ভবই হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। টীকাকার বরদরাজ এ বিষয়ে বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তির কারিকাও[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূলকথা, উদয়নাচার্য্যের বিচারের দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদ" এই উভয় মতেই যে, কার্য্যের নিয়ত কোন প্রকার কারণ নাই, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি এবং টীকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি "স্বভাববাদ" পক্ষেই বিশেষ বিচার করিলেও উদয়নার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত "হেতুভূতিনিষেধো ন" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদ" এই উভয় মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারি। সুতরাং মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রের দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদে"র ন্যায় "স্বভাববাদ"কেও পূর্ব্ব-পক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যার দ্বারা অন্যরূপ পূর্ব্বপক্ষই বুঝা যায়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহর্ষি এখানে ঐ পূর্ব্ব-পক্ষের নিজে কোন প্রকৃত উত্তর বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকার প্রভৃতি বলিলেও পরবর্ত্তী কালে কোন নব্যসম্প্রদায় মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ২৩শ ও ২৪শ সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, ঐ দুই সূত্রের দ্বারা

১। তদাহ কীর্ত্তিঃ—

"নিত্যং সত্ত্বমসত্ত্বং বা হেতোরন্যানপেক্ষণাৎ।
অপেক্ষাতোহি ভাবানাং কাদাচিৎকত্বসম্ভবঃ"॥

(ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ৫ম কারিকার বরদরাজকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)।

মহর্ষি এখানেই যে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে ঐ ব্যাখ্যান্তরও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা থাকায়, উহা সূত্রের যথাশ্রুতার্থ ব্যাখ্যা না হওয়ায় ভাষ্যকার প্রভৃতির ন্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথও নিজে ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। পরন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির ন্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই প্রকরণকে "আকস্মিকত্ব-প্রকরণ" নামে উল্লেখ করায় তিনিও এখানে "স্বভাববাদ"কে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথার সমালোচনা করিয়া এখানে মহর্ষি গোতমের অভিমত পূর্ব্বপক্ষের মূল তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন। ২৪॥

আকস্মিকত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। অন্যে তু মন্যন্তে—

সূত্র। সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ ॥২৫॥৩৬৮॥

অনুবাদ। অন্য সম্প্রদায় কিন্তু স্বীকার করেন—(পূর্ব্বপক্ষ) "সমস্ত পদার্থই অনিত্য, যেহেতু উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক" [অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়ায় উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে কোন পদার্থেরই সত্তা না থাকায় সমস্ত পদার্থই অনিত্য]।

ভাষ্য। কিমনিত্যং নাম? যস্য কদাচিদ্ভাবস্তদনিত্যং। উৎপত্তিধর্ম্মকমনুৎপন্নং নাস্তি, বিনাশধর্ম্মকঞ্চ বিনষ্টং[1] নাস্তি। কিং পুনঃ সর্ব্বং? ভৌতিকঞ্চ শরীরাদি, অভৌতিকঞ্চ বুদ্ধ্যাদি, তদুভয়মুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকং বিজ্ঞায়তে, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমনিত্যমিতি।

অনুবাদ। অনিত্য কি? অর্থাৎ সূত্রোক্ত "অনিত্য" শব্দের অর্থ কি? (উত্তর) যে বস্তুর কদাচিৎ সত্তা থাকে অর্থাৎ কোন কালবিশেষেই যে বস্তু বিদ্যমান থাকে, সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকে না, সেই বস্তু অনিত্য। উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপন্ন না হইলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না, এবং বিনাশধর্ম্মক বস্তু বিনষ্ট হইলে (বিনাশের পরে) থাকে না। (প্রশ্ন) সর্ব্ব কি? অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ কি? (উত্তর) ভৌতিক (পঞ্চভূতজনিত) শরীরাদি এবং অভৌতিক

১। প্রচলিত ভাষ্য ও বার্ত্তিক পুস্তকে এখানে "অবিনষ্টং নাস্তি" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু "বিনষ্টং নাস্তি" ইহাই প্রকৃত পাঠ বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ঐ পাঠের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "বিনাশধর্ম্মকঞ্চ বিনষ্টং নাস্তি, অবিনষ্টঞ্চাস্তি"।

জ্ঞানাদি। সেই উভয়ই উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক বুঝা যায়। অতএব সেই সমস্তই অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বে সূত্র বলিয়াছেন—"আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ"। ১০। কিন্তু যদি সমস্ত পদার্থই অনিত্য হয়, তাহা হইলে আত্মাও অনিত্য হইবে। তাহা হইলে আর মহর্ষির পূর্ব্বকথিত যুক্তির দ্বারা "প্রেত্যভাব" সিদ্ধ হইতে পারে না। যদিও মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে নানা যুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে আত্মার নিত্যত্বসাধন করিয়াছেন, কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বানিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে আত্মার নিত্যত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না। সমস্ত পদার্থই অনিত্য, ইহা নিশ্চিত হইলে আত্মা নিত্য, এইরূপ অনুমান হইতেই পারে না। সুতরাং মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত প্রেত্যভাব পরীক্ষার পরিশোধনের জন্য "সর্ব্বানিত্যত্ববাদ" খণ্ডন করাও অত্যাবশ্যক। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন—"সর্ব্বমনিত্যং"। এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার ও তাৎপর্য্য টীকাকারের "অন্যে তু মন্যন্তে" এই বাক্যের দ্বারা প্রাচীন কালে যে, কোন সম্প্রদায় সর্ব্বানিত্যত্ববাদী ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বস্তুতঃ বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় সুপ্রাচীন চার্ব্বাকসম্প্রদায়ও সর্ব্বানিত্যত্ববাদী ছিলেন। তাঁহারা নিত্য পদার্থ কিছুই স্বীকার করেন নাই। মহর্ষি তাঁহাদিগের ঐ মতের সাধক হেতু বলিয়াছেন—"উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্বাৎ"। তাঁহারা সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করায় তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থেই উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম (উৎপত্তিমত্ত্ব) ও বিনাশরূপ ধর্ম্ম (বিনাশিত্ব) আছে। সূত্রোক্ত "অনিত্য" শব্দের অর্থ কি? অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী অনিত্য কাহাকে বলেন? ইহা না বুঝিলে তাঁহার কথিত হেতুতে তাঁহার সাধ্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। এ জন্য ভাষ্যকার ঐ প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যাহার কদাচিৎ (কোন কালবিশেষেই) সত্তা থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বকালে সত্তা থাকে না, তাহাকে বলে অনিত্য। উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মক হইলেই যে, অনিত্য হইবে, ইহা বুঝাইতে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপন্ন না হইলে থাকে না, অর্থাৎ উৎপত্তির পরেই তাহার সত্তা, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার কোন সত্তা নাই। এবং বিনাশধর্ম্মক অর্থাৎ যাহার বিনাশ হয়, সেই বস্তু বিনষ্ট হইলে থাকে না, অর্থাৎ বিনাশের পরে তাহার কোন সত্তাই নাই। উৎপত্তির পরে বিনাশের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই তাহার সত্তা থাকে। সুতরাং উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক হইলে সেই বস্তুর কালবিশেষেই সত্তা স্বীকার্য্য হওয়ায় সূত্রোক্ত ঐ হেতুর দ্বারা বস্তুর অনিত্যত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কিন্তু বস্তুমাত্রেরই যে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, ইহা আস্তিকসম্প্রদায় স্বীকার না করায় তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থে ঐ হেতু অসিদ্ধ। সর্ব্বানিত্যত্ববাদী নাস্তিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, আমরা ঘটাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমানসিদ্ধ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিব। ভৌতিক শরীরাদি এবং অভৌতিক জ্ঞানাদি সমস্ত পদার্থই "সর্ব্বমনিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় "সর্ব্ব"শব্দের অর্থ। অনুমান দ্বারা ঐ ভৌতিক ও অভৌতিক

দ্বিবিধ পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্ব হেতুর দ্বারা ঐ সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ঐ সমস্তই অনিত্য, জগতে নিত্য কিছু নাই ॥ ২৫ ॥

সূত্র। নানিত্যতা-নিত্যত্বাৎ ॥২৬॥৩৬৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা বলা যায় না। কারণ, অনিত্যতা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত সকল পদার্থের অনিত্যতা, নিত্য।

ভাষ্য। যদি তাবৎ সর্ব্বস্যানিত্যতা নিত্যা? তন্নিত্যত্বান্ন সর্ব্বমনিত্যং,—অথানিত্যা? তস্যামবিদ্যমানায়াং সর্ব্বং নিত্যমিতি।

অনুবাদ। যদি (পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত) সকল পদার্থের অনিত্যতা নিত্য হয়, তাহা হইলে সেই অনিত্যতার নিত্যত্ববশতঃ সকল পদার্থ অনিত্য হয় না। যদি (ঐ অনিত্যতাও) অনিত্য হয়, তাহা হইলে সেই অনিত্যতা বিদ্যমান না থাকিলে অর্থাৎ উহার বিনাশ হইলে তখন সকল পদার্থই নিত্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সর্ব্বানিত্যত্ববাদীর অভিমত যে, সকল পদার্থের অনিত্যতা, তাহা যখন তিনি নিত্যই বলিতে বাধ্য হইবেন, তখন আর তিনি সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা বলিতে পারেন না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বানিত্যত্ববাদীকে প্রশ্ন করা যায় যে, তাঁহার অভিমত সকল পদার্থের অনিত্যতা কি নিত্য? অথবা অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে আর সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার অভিমত অনিত্যতাই ত তাঁহার মতে নিত্য। উহাও তাঁহার "সর্ব্বমনিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বপদার্থের অন্তর্গত। আর যদি ঐ অনিত্যতাকেও তিনি অনিত্যই বলেন, তাহা হইলে ঐ অনিত্যতারও সর্ব্বকালে বিদ্যমানতা তিনি স্বীকার করিতে পারিবেন না। উহারও উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে উহার সত্তা থাকে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বপদার্থের ঐ অনিত্যতা যখন বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যখন ঐ অনিত্যতার সত্তাই থাকিবে না, তখন উহার অভাব নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বপদার্থের অনিত্যতার অভাব হইলে তখন আবার ঐ সমস্ত পদার্থই নিত্য, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে "সর্ব্বমনিত্যং" এই সিদ্ধান্ত আর বলা যাইবে না ॥২৬॥

সূত্র। তদনিত্যত্বমগ্নের্দ্দাহ্যং বিনাশ্যানুবিনাশবৎ ॥২৭॥৩৭০॥

অনুবাদ। (উত্তর) দাহ্য পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ অগ্নির বিনাশের ন্যায় সেই অনিত্যত্ব অনিত্য [অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বও সমস্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ নিজেও বিনষ্ট হয়, সুতরাং আমরা ঐ অনিত্যতাকেও অনিত্যই বলি]।

ভাষ্য। তস্যা অনিত্যতায়া অপ্যনিত্যত্বং। কথং? যথাঽগ্নির্দাহ্যং বিনাশ্যানু বিনশ্যতি, এবং সর্ব্বস্যানিত্যতা সর্ব্বং বিনাশ্যানুবিনশ্যতীতি।

অনুবাদ। সেই অনিত্যতারও অনিত্যত্ব, (প্রশ্ন) কিরূপে? (উত্তর) যেমন অগ্নি দাহ্য পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বিনষ্ট হয়, এইরূপ সমস্ত পদার্থের অনিত্যতা, সমস্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বিনষ্ট হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত কথার উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর (সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদীর) কথা বলিয়াছেন যে, আমরা সকল পদার্থের অনিত্যতাকে নিত্য বলি না, উহাকেও অনিত্যই বলি। বস্তুবিনাশের পরে ঐ বস্তুর অনিত্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন অগ্নি দাহ্য পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া শেষে নিজেও বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত পদার্থের অনিত্যতাও সমস্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া শেষে নিজেও বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য ঐ অনিত্যতাই যে, সকল পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা নহে, কিন্তু তথাপি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে সকল বস্তুর বিনাশের অনন্তর সেই সেই বস্তুর অনিত্যতাও বিনষ্ট হয়, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সর্ব্বস্যানিত্যতা সর্ব্বং বিনাশ্যানু বিনশ্যতীতি"। আপত্তি হইবে যে, অনিত্যতা অনিত্য হইলে ঐ অনিত্যতার বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অনিত্যতার বিনাশের পরে নিত্যতাই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই সূত্রে দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে, "অগ্নের্দাহ্যং বিনাশ্যানুবিনাশবৎ"। অর্থাৎ সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদীর গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি যে দাহ্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ঐ দাহ্য পদার্থ বিনষ্ট হইলে তখন আশ্রয়ের অভাবে ঐ অগ্নি থাকিতে পারে না, উহাও বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনিত্যতা যে বস্তুর ধর্ম্ম, ঐ বস্তু বিনষ্ট হইলে তখন আশ্রয়ের অভাবে ঐ অনিত্যতাও থাকিতে পারে না, উহাও বিনষ্ট হয়। বস্তুমাত্রেরই যখন বিনাশ হয়, তখন বস্তু বিনাশের পরে ঐ বস্তুর ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে? সুতরাং বস্তু বিনাশের পরে ঐ বস্তুর ধর্ম্ম অনিত্যতাও যে বিনষ্ট হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ বস্তুর অনিত্যতার বিনাশের পরে তখন নিত্যতাও থাকিতে পারে না। কারণ, তখন যে বস্তুতে নিত্যতার আপত্তি করিবে, সেই বস্তুই নাই, উহা বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে যেমন অনিত্যতা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ নিত্যতাও থাকিতে পারে না। ফলকথা, সর্ব্বানিত্যত্ববাদী সকল পদার্থের ধ্বংস স্বীকার করিয়া ঐ ধ্বংসেরও ধ্বংস স্বীকার করেন। অন্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, ধ্বংসের ধ্বংস হইলে তখন যে বস্তুর ধ্বংস, তাহার পুনরুদ্ভবের আপত্তি হয়। অর্থাৎ ঘটের ধ্বংসের ধ্বংস হইলে সেই ঘটের পুনরুদ্ভব হইতে পারে। কারণ, ঐ ঘটের ধ্বংস যখন বিনষ্ট হইবে, তখন সেই ধ্বংস নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তখন সেই ঘটের পূর্ব্ববৎ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ঘটের ধ্বংসকালে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না; কারণ, ঘটের ধ্বংস ঘটের বিরোধী। কিন্তু যখন ঐ ধ্বংস থাকিবে না, উহাও বিনষ্ট হইবে, তখন ঘটের বিরোধী না থাকায় সেই ঘটের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিনষ্ট ঘটের যখন আর পুনরুৎপত্তি হয় না, তখন উহার ধ্বংস চিরস্থায়ী, উহার ধ্বংসের ধ্বংস আর নাই,

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সর্ব্বানিত্যতাবাদী বলিবেন যে, ঘটের ধ্বংসের ধ্বংস হইলেও তখন সেই ঘটের পুনরুদ্ভব হইতে পারে না। কারণ, আমার মতে সেই ঘটধ্বংসের ধ্বংসেরও তখন ধ্বংস হয়। সুতরাং সেই তৃতীয় ধ্বংস, প্রথম ঘটধ্বংসস্বরূপ হওয়ায় তখনও ঘটের বিরোধী থাকায় ঐ ঘটের পুনরুদ্ভব হইতে পারে না, তখন সেই ঘটের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। পরন্তু ঘটের উদ্ভব, ঘটের কারণ-সমূহসাপেক্ষ। যে ঘটের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তখন উহার কারণসমূহ না থাকায় আর ঐ ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না। তজ্জাতীয় ঘটান্তরের উৎপত্তি হইলেও যে ঘটটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার করিলে সেই ধ্বংসের ধ্বংস এবং তাহার ধ্বংস, ইত্যাদিক্রমে অনন্ত ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। সকল পদার্থই অনিত্য, এই মতে সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। সুতরাং ধ্বংসনামক যে পদার্থ জন্মিবে, উহারও বিনাশ হইবে, এইরূপ সেই বিনাশেরও (ধ্বংসেরও) বিনাশ হইবে, এইরূপে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অনন্ত ধ্বংসের উৎপত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এইরূপ "অনবস্থা" নিষ্প্রমাণ বলিয়া উহা স্বীকার করা যায় না। ঐরূপ অনন্ত ধ্বংসের কল্পনাগৌরবও প্রমাণাভাবে স্বীকার করা যায় না। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে এই সব কথা না বলিয়া, যাহা তাঁহার প্রকৃত সমাধান, সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদখণ্ডনে যাহা পরম যুক্তি, তাহাই পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন ॥২৭॥

সূত্র। নিত্যস্যাপ্রত্যাখ্যানং যথোপলব্ধিব্যবস্থানাৎ ॥ ॥২৮॥৩৭১॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিত্যপদার্থের প্রত্যাখ্যান করা যায় না,—অর্থাৎ নিত্য-পদার্থই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, উপলব্ধি অনুসারে (অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বের) ব্যবস্থা (নিয়ম) আছে।

ভাষ্য। অয়ং খলু বাদো নিত্যং প্রত্যাচষ্টে, নিত্যস্য চ প্রত্যাখ্যান-মনুপপন্নং। কস্মাৎ? যথোপলব্ধিব্যবস্থানাৎ, যস্যোৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্ব-মুপলভ্যতে প্রমাণতস্তদনিত্যং, যস্য নোপলভ্যতে তদ্বিপরীতং। নচ পরমসূক্ষ্মাণাং ভূতানামাকাশ-কাল-দিগাত্ম-মনসাং তদ্‌গুণানাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাঞ্চোৎপত্তিবিনাশ-ধর্ম্মকত্বং প্রমাণত উপলভ্যতে, তস্মান্নিত্যান্যেতানীতি।

অনুবাদ। এই বাদ অর্থাৎ সকল পদার্থই অনিত্য, এই মত বা বাক্য, নিত্য পদার্থকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কিন্তু নিত্য পদার্থের প্রত্যাখ্যান উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু উপলব্ধি অনুসারে ব্যবস্থা আছে। বিশদার্থ এই

যে, প্রমাণের দ্বারা যে পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব উপলব্ধ হয়, সেই পদার্থ অনিত্য, যে পদার্থের (উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব) উপলব্ধ হয় না, সেই পদার্থ "বিপরীত" অর্থাৎ নিত্য। পরমসূক্ষ্ম ভূতসমূহের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুসমূহের, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনের এবং তাহাদিগের কতকগুলি গুণের (পরিমাণাদির) এবং সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্ব প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, অতএব এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত পরমাণু প্রভৃতি) নিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, নিত্য পদার্থের প্রত্যাখ্যান হয় না, অর্থাৎ নিত্য পদার্থ ই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, উপলব্ধি অনুসারেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের ব্যবস্থা আছে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থে উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্ব প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহাই অনিত্য, যাহাতে উহা প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয় না, তাহা নিত্য। তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বানিত্যত্ববাদী যে হেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব সাধন করেন, ঐ "উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব"রূপ হেতু সমস্ত পদার্থে প্রমাণসিদ্ধ নহে। ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ঐ সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্বের উপলব্ধি হওয়ায় ঐ সমস্ত পদার্থ অনিত্য। কিন্তু বৈশেষিক শাস্ত্রবর্ণিত পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এবং ঐ সকল দ্রব্যের পরিমাণাদি কতিপয় গুণ, এবং "জাতি", "বিশেষ" ও "সমবায়ে"র উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রমাণের দ্বারা ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্বের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং ঐ সকল পদার্থ নিত্য, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ফলকথা, সর্ব্বানিত্যত্ববাদী সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব সাধন করিতে যে "উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব"কে হেতু বলিয়াছেন, উহা পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতি অনেক পদার্থে না থাকায় উহা অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধ। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ঘটপটাদি যে সকল পদার্থে উহা প্রমাণসিদ্ধ, সেই সকল পদার্থে অনিত্যত্ব উভয়বাদিসিদ্ধ ; সুতরাং কেবল সেই সকল পদার্থে অনিত্যত্বের সাধন করিলে সিদ্ধ সাধন হইবে। সর্ব্বানিত্যত্ববাদীর কথা এই যে, পরমাণু প্রভৃতিরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি না হইলেও ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতিরও উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্বের অনুমানাত্মক উপলব্ধি হয়। সুতরাং পরমাণু প্রভৃতিরও অনুমানসিদ্ধ ঐ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এতদুত্তরে মহর্ষি গোতমের পক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, জন্য দ্রব্যের অবয়বের যে স্থানে বিশ্রাম, অর্থাৎ যাহার আর কোন অবয়ব বা অংশ নাই, এমন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই পরমাণু। উহার অবয়ব না থাকায় উপাদান কারণের অভাবে উৎপত্তি হইতে পারে না। বিনাশের কারণ না থাকায় বিনাশও হইতে পারে না। যে দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা পরমাণু নহে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণু পদার্থ মানিতে হইলে উহা উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ আকাশাদি পদার্থের নিত্যত্বে বিবাদ থাকিলেও আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধান্তে

আস্তিকসম্প্রদায়ের বিবাদ নাই এবং তৃতীয় অধ্যায়ে উহা বহু যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যদি কোন একটি পদার্থেরও নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আর সর্ব্বানিত্যত্ববাদী তাঁহার নিজমত সাধন করিতে পারেন না। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে চরমকথা বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থই নিত্য না থাকিলে "অনিত্য" এইরূপ শব্দ প্রয়োগই করা যায় না। কারণ, "অনিত্য" শব্দের শেষবর্ত্তী "নিত্য" শব্দের কোন অর্থ না থাকিলে "অনিত্য" এইরূপ সমাস হইতে পারে না। সুতরাং "অনিত্য" বলিতে গেলেই কোন নিত্য পদার্থ মানিতেই হইবে। তাহা হইলে আর "সর্ব্বমনিত্যং" এইরূপ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত ২৫শ সূত্রের বার্ত্তিকে ইহাও বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমনিত্যং" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে ঐ অনুমানে সমস্ত পদার্থই পক্ষ অর্থাৎ অনিত্যত্বরূপে সাধ্য হওয়ায় কোন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্য, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। অনিত্যত্বরূপে সিদ্ধ পদার্থই ঐ অনুমানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে। উদ্দ্যোতকরের এই কথায় বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে অনুমানে পক্ষের অন্তর্গত কোন পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িক যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ ও সাধ্য সমস্ত পদার্থে অনুমানে স্থলে সেই সিদ্ধ পদার্থ পক্ষের অন্তর্গত হইয়াও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। সুতরাং "সর্ব্বমনিত্যং" এইরূপ অনুমানে ঘটপটাদি সর্ব্বসিদ্ধ অনিত্য পদার্থ পক্ষের অন্তর্গত হইয়াও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ঘটপটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব নিশ্চয়—সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বানুমানে প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং ঘটপটাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা ঐরূপ অনুমানে "পক্ষতা"-রূপ কারণ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অনুমানের হেতু উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্ব সকল পদার্থে নাই। আকাশাদি নিত্য পদার্থে ঐ হেতু না থাকায় উহার দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের অনুমান হইতে পারে না,—উদ্দ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও ঐ দোষ সূচিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্যে বৈশেষিক শাস্ত্রবর্ণিত পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, মন এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণাদি কতিপয় গুণ এবং "জাতি", "বিশেষ" ও "সমবায়" নামক পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া মহর্ষি গোতমের এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করায় তাঁহার মতে বৈশেষিক শাস্ত্রবর্ণিত ঐ পরমাণু প্রভৃতি পদার্থ ও উহাদিগের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত যে, মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি কণাদের কোন কোন সিদ্ধান্তে মহর্ষি গোতমের সম্মতি না থাকিলেও দার্শনিক মূল সিদ্ধান্তে যে, কণাদ ও গোতম উভয়েই একমত, ইহা ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন হইতে সমস্ত ন্যায়াচার্য্যগণের গ্রন্থের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায়। তাই ন্যায়দর্শন বৈশেষিক দর্শনের সমান তন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে যে, পার্থিবাদি পরমাণু ও আকাশাদি পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই চিরপ্রচলিত সম্প্রদায়সিদ্ধ মত। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি কণাদ "অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তং" এবং "দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমাণু ও আকাশাদি দ্রব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সিদ্ধান্তে কণাদের যুক্তি এই যে, কোন দ্রব্য

অনিত্য বা জন্য হইলে তাহার সমবায়ি কারণ (উপাদান কারণ) থাকা আবশ্যক। ঘট পটাদি জন্য দ্রব্যের অবয়বই তাহার সমবায়ি কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাণু ও আকাশাদি দ্রব্যের কোন অবয়ব বা অংশ না থাকায় উহাদিগের সমবায়ি কারণ সম্ভব হয় না। সুতরাং নিরবয়ব দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্যের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপ পরমাণু ও আকাশাদি দ্রব্যের পরিমাণাদি কতিপয় গুণ এবং জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামে স্বীকৃত পদার্থত্রয়েরও অনিত্যত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঐ সমস্ত পদার্থকে অনিত্য বলিলে উহাদিগের উৎপাদক কারণ কল্পনা ও উৎপত্তি বিনাশ কল্পনায় নিষ্প্রমাণ কল্পনাগৌরব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থও নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে সকল পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ, সেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা এবং পরবর্তী প্রকরণের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তই তাঁহার সম্মত বুঝা যায়। পরমাণুর নিত্যত্ব ও পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি, এই আরম্ভবাদ যে কণাদের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা কণাদসূত্রের ব্যাখ্যান্তর করিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না, এবং মহর্ষি গোতম যে, ন্যায়দর্শনে কোন নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি তৎকালপ্রসিদ্ধ কণাদসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া উহার সমর্থনের দ্বারা কেবল তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য বিচারপ্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝি না। আমরা বুঝি, মহর্ষি কণাদ প্রথমে বৈশেষিকদর্শনে সৃষ্টি বিষয়ে আরম্ভবাদ ও আত্মার নানাত্বাদি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা মহর্ষি গোতমেরও নিজ সিদ্ধান্ত। তিনি ন্যায়দর্শনে অন্যভাবে অন্যান্য সিদ্ধান্ত ও যুক্তি প্রকাশ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মূল সিদ্ধান্তে মহর্ষি কণাদ ও গোতম একমত। ফল কথা, ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম কোন নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ন্যায়দর্শন অন্যান্য সকল দর্শনের অবিরোধী, ইহা বুঝিবার কোন বিশেষ কারণ আমরা দেখি না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে কোন অংশে নিজ মত সমর্থনের জন্য সসম্মানে মহর্ষি গোতমের সূত্র উদ্ধৃত করিলেও তিনি যে, গৌতম মত খণ্ডন করেন নাই, ইহাও আমরা বুঝি না। তিনি ন্যায়দর্শনের পূর্ব্বে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ বৈশেষিক দর্শনের সূত্র উদ্ধৃত করিয়া কণাদ-বর্ণিত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করাতেই তদ্দ্বারা গৌতম সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইয়াছে, ইহাই আমরা বুঝি। কণাদসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে ন্যায়দর্শন বা মহর্ষি গোতমের নামোল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে, তিনি কণাদের ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তকে গৌতম সিদ্ধান্ত বলিতেন না, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃত দক্ষিণা-মূর্ত্তিস্তোত্রের তাঁহার শিষ্য বিশ্বরূপ বা সুরেশ্বর আচার্য্য "মানসোল্লাস" নামে যে বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত আরম্ভবাদের বর্ণন করিয়া, উহা যে, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক উভয় সম্প্রদায়েরই মত, ইহা বলিয়াছেন[১]। পূর্ব্বোক্ত আরম্ভবাদ মহর্ষি গোতমের নিজের সিদ্ধান্ত নহে,

১। উপাদানং প্রপঞ্চস্য সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ।
মূদম্বিতো বটস্তস্মাদ্ভাসতে নেশ্বরাম্বিতঃ" ॥ ইত্যাদি। "ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি"।
"কালাকাশদিগাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে।
চতুর্ব্বিধাঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমাণবঃ" ॥ ইত্যাদি ॥—মানসোল্লাস—২য়—১।৬।২৯॥

উহা মহর্ষি কণাদেরই সিদ্ধান্ত, ইহাই তাঁহার গুরু শঙ্করাচার্য্যের মত হইলে তিনি কখনই ঐরূপ বলিতেন না। সেখানে তিনি প্রথমেই বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—'তথা নৈয়ায়িকা অপি'। সুতরাং তাঁহারা বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই জানিতেন, ইহাও উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রথমে বৈশেষিক দর্শনেই আরম্ভবাদের বিশদ বর্ণন হইয়াছে, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বাচার্য্যের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহা বুঝা যায়। পরন্তু এখানে ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের মতেও আকাশ নিত্য, ইহা বুঝা যায়। যথাস্থানে ইহার কারণ বলিয়াছি। এইরূপ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের "অন্তর্ব্বহিশ্চ" ইত্যাদি (২০শ) সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের মতে পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত স্পষ্টই বুঝা যায়। সেখানে আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনের দ্বারাও তাঁহার মতে আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্য ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় কণাদ ও গোতমের ঐ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয়সংহিতায় "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি (২।১) শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম হইতে যে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, আকাশ নিত্য পদার্থ নহে, ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। শব্দ যাহার গুণ, সেই পঞ্চম ভূত আকাশই যে, ঐ শ্রুতিতে আকাশ শব্দের বাচ্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, ঐ শ্রুতিমূলক নানা স্মৃতি ও নানা পুরাণে পূর্ব্বোক্তরূপ পঞ্চম ভূত আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি মনুও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে বলিয়াছেন, "আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ"। (১।৭৫)। স্মৃতি ও পুরাণের ন্যায় মহাভারতেও নানা স্থানে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বর্ণনায় পঞ্চম ভূত আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য ও বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মতে আকাশের অনিত্যত্ব যে শাস্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সম্মত আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তও সুপ্রাচীন প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তবাদীদিগের কথা এই যে, আকাশের যখন অবয়ব নাই, তখন তাহার সমবায়ি কারণ অর্থাৎ উপাদান কারণ সম্ভব না হওয়ায় আকাশের বাস্তব উৎপত্তি হইতেই পারে না। বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আকাশের উপাদান-কারণ। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম, দ্রব্যের উপাদান-কারণ হইতেই পারেন না। কারণ, জন্য দ্রব্য তাহার উপাদান-কারণান্বিতই প্রতীত হইয়া থাকে। মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটাদি দ্রব্যকে মৃত্তিকান্বিতই দেখা যায়। সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলাদি দ্রব্যকে সুবর্ণান্বিতই দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট কোন দ্রব্যই ঈশ্বরান্বিত বলিয়া বুঝা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর পরিদৃশ্যমান জন্য দ্রব্যের উপাদান-কারণ নহেন, ইহা স্বীকার্য্য। শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ করিতে "মানসোল্লাসে" বলিয়াছেন,—"মৃদন্বিতো ঘটস্তস্মাদ্ভাসতে নেশ্বরান্বিতঃ"। টীকাকার রামতীর্থ সেখানে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়সম্মত যুক্তি অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন[1]।

১। "অয়মর্থঃ। বিমতা অচেতনোপাদানকাঃ, অচেতনান্বিততয়া ভাসমানত্বাৎ। যঃ স্বগতত্বায়াং যদন্বিতো নিয়মেন

পরন্তু আর এক কথা এই যে, উপাদান-কারণের বিশেষ গুণ, সেই কারণজন্য দ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার্য্য। কারণ, শুক্ল সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রে শুক্ল রূপই উৎপন্ন হয়, উহাতে তখন নীলপীতাদি কোন রূপ জন্মে না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বস্ত্রের উপাদান-কারণ শুক্ল সূত্রগত শুক্ল রূপই সেখানে ঐ বস্ত্রে শুক্ল রূপ উৎপন্ন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ যে চৈতন্য, তজ্জন্য জগতেরও চৈতন্য জন্মিবে অর্থাৎ চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেহ এই আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিয়া জগতের চৈতন্য স্বীকারই করিয়াছিলেন, ইহা শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের বিচারের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু জগতের বাস্তব চৈতন্য শঙ্করও স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যাদি—(তৈত্তিরীয় ২।৬)—শ্রুতিবশতঃ চেতন ও অচেতন দুইটি বিভাগ স্বীকার করিয়া জগতের অচেতনত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তাই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে বৈশেষিক-সম্প্রদায়োক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি নিরাস করিতে "মহদ্দীর্ঘবদ্বা" (২।২।১১)—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, উপাদান-কারণের গুণ, তজ্জন্য দ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়ম বৈশেষিকসম্প্রদায়ও স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও পরমাণুদ্বয় হইতে যে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তাহাতে ঐ পরমাণুর সূক্ষ্মতম পরিমাণ রূপ গুণ, তজ্জাতীয় পরিমাণ জন্মায় না। তাঁহারা ঐ স্থলে ঐ পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্বসংখ্যাই ঐ দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ বলেন। এইরূপ বহু দ্ব্যণুকগত বহুত্ব সংখ্যাই সেই বহু দ্ব্যণুকজন্য স্থূলদ্রব্যের (ত্রসরেণুর) পরিমাণের কারণ বলেন। সংখ্যা ও পরিমাণ সজাতীয় গুণ নহে। সুতরাং উপাদান-কারণের গুণ, তজ্জন্য দ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়মে বৈশেষিকের নিজমতেই ব্যভিচারবশতঃ ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইলেও জগতের চেতনত্বের আপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ চেতন ব্রহ্ম হইতেও অচেতন জগতের উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উপাদান-কারণের যাহা বিশেষ গুণ, তাহাই সেই কারণজন্য দ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণান্তর উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়মই স্বীকার করিয়াছেন। ঐরূপ নিয়মে তাঁহাদিগের মতে কোন ব্যভিচার নাই। কারণ, তাঁহাদিগের মতে সংখ্যা ও পরিমাণ বিশেষ গুণ নহে, উহা সামান্য গুণ। চৈতন্য বিশেষ গুণ। পরমাণুর পরিমাণ পরমাণুর বিশেষ গুণ না হওয়ায় উহা দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ না হইলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার নাই। পরমাণুর রূপ রসাদি বিশেষ গুণই, ঐ পরমাণুজন্য দ্ব্যণুকের রূপরসাদি বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। শঙ্করাচার্য্য পরমাণুর পরিমাণরূপ সামান্য গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার কথিত বৈশেষিকোক্ত নিয়মে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেও তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য কিন্তু বৈশেষিক সিদ্ধান্ত বর্ণন করিতে পরমাণুগত রূপরসাদি বিশেষ গুণই কার্য্য দ্রব্যে সজাতীয় রূপরসাদি বিশেষ গুণান্তর উৎপন্ন করে, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা

ভাসতে, স তন্তূপাদানকো দৃষ্টঃ, যথা মৃদন্বিতত্বাহবভাসমানো ঘটো মৃদুপাদানকঃ, তথা চেমে, তস্মাত্তথেতি। তস্মাদীশ্বরান্বিতত্বা কসাপাবভাসাদর্শনাৎ নেশ্বরোপাদানকঃ প্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ।"—মানসোল্লাসটীকা। ২।১।

যায়[১]। টীকাকার রামতীর্থ সেখানে তাঁহার ঐ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াই বলিয়াছেন। মূলকথা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে আকাশের উপাদান-কারণ বলা যায় না। কারণ, আকাশ দ্রব্যপদার্থ। সুতরাং উহার উৎপত্তি হইলে উহার অবয়ব-দ্রব্যই উহার উপাদান-কারণ হইবে। কিন্তু আকাশের অবয়ব বা অংশ অথবা আকাশের মূল পরমাণু আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সর্ব্বব্যাপী আকাশ নিরবয়বদ্রব্য, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং আত্মার ন্যায় নিরবয়বদ্রব্য বলিয়া আকাশের নিত্যত্বই অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

পরন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে "অন্তরীক্ষমমৃতং" (২।৩।৩) এই শ্রুতিবাক্যে আকাশ "অমৃত," ইহা কথিত হওয়ায় এবং "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিত্য, ইহাও কথিত হওয়ায় শ্রুতির দ্বারা আকাশের নিত্যত্বও বুঝা যায়। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান ও শ্রুতির দ্বারা আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে গৌণ প্রয়োগ বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের কথা এই যে, ঘটপটাদি দ্রব্যের ন্যায় আকাশের কোন অবয়ব না থাকায় উপাদান-কারণের অভাবে আকাশের যখন উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং অন্য শ্রুতির দ্বারা আকাশের নিত্যত্বও বুঝা যায়, তখন "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও তন্মূলক স্মৃতির দ্বারা আকাশের মুখ্য উৎপত্তি বুঝা যাইতে পারে না। সুতরাং "আকাশং কুরু," "আকাশো জাতঃ" এইরূপ লৌকিক গৌণপ্রয়োগের ন্যায় শ্রুতিতেও "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ গৌণপ্রয়োগই বুঝিতে হইবে[২]। ব্রহ্ম হইতে প্রথমে নিত্য আকাশের প্রকাশ হওয়ায় শ্রুতিতে উহাই বলিতে পূর্ব্বোক্তরূপ গৌণপ্রয়োগই হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতিতে অনেক স্থলে ঐরূপ গৌণ প্রয়োগও হইয়াছে। "বেদান্তসারে" উদ্ধৃত "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুতিতে আত্মার যে পুত্ররূপে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা কখনই মুখ্য উৎপত্তি বলা যাইবে না। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যকে যেমন গৌণপ্রয়োগ বলিতেই হইবে এবং কোন গৌণার্থেই উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, তদ্রূপ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যকেও গৌণপ্রয়োগ বলিয়া কোন গৌণার্থেই উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আরও বহু শ্রুতিবাক্যেরও গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বৈদান্তিকসম্প্রদায়ও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত স্থলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আকাশের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "অন্তরীক্ষমমৃতং" এই শ্রুতি-

---

১। পরমাণুগতা এব গুণা রূপরসাদয়ঃ।
কার্য্যে সমানজাতীয়মারভন্তে গুণান্তরং ॥—মানসোল্লাস ।২।২।
"সমানজাতীয়মিতি বিশেষগুণাভিপ্রায়ং। দ্ব্যণুকাদিপরিমাণস্য পরমাণ্বাদিগতসংখ্যাযোনিত্বাঙ্গীকারাৎ, পরত্বাপরত্বয়োর্দ্দিক্কালপিণ্ডসংযোগযোনিত্বাঙ্গীকারাচ্চ।"—মানসোল্লাসটীকা।

২। তস্মাদ্যথা লোকে "আকাশং কুরু" "আকাশো জাত" ইত্যেবংজাতীয়কো গৌণপ্রয়োগো ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপ্যাকাশস্য এবংজাতীয়কো ভেদব্যপদেশো, গৌণো ভবতি। বেদেঽপি "আরণ্যানাকাশেষালভেরন্" ইতি, এবমুৎপত্তিশ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা। বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ৩য় পা, ৩য় সূত্রের শারীরকভাষ্য।

বাক্যে "অমৃত" শব্দের গৌণার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, আকাশের নিত্যত্ব পক্ষে যে অনুমান প্রমাণ আছে, উহাকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যেরই গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বিরোধ পরিহার করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঐ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ ও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহের সামঞ্জস্য-রক্ষা হয়। তাঁহারা যে সুপ্রাচীন কালেই মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সম্মত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপই বিচার করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রারম্ভে "বিয়দধিকরণে"র পূর্ব্বপক্ষভাষ্যে প্রথমে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষরূপে আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বৈশেষিকসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই বলিয়াছেন। "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে একই "সম্ভূত" শব্দ আকাশের পক্ষে গৌণ, বায়ু প্রভৃতির পক্ষে মুখ্য, ইহা কিরূপে সম্ভব, ইহাও তিনি সেখানে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে উদাহরণ প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও শেষে ঐ মত খণ্ডন করিতে শ্রুতিতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ গৌণ প্রয়োগ যে, হইতেই পারে না, ইহা বলেন নাই। কিন্তু আকাশের নিত্যত্ব, শ্রুতির সিদ্ধান্ত হইলে শ্রুতিতে যে এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়, এই কথা আছে, তাহার উপপত্তি হয় না, ইত্যাদি যুক্তির দ্বারাই শেষে আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্ম আকাশাদি সমস্ত পদার্থের উপাদান-কারণ হইলেই এক ব্রহ্মের জ্ঞানে আকাশাদি সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে, আর কোনরূপেই উহা হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার প্রধান কথা। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় তাঁহাদিগের নিজ সিদ্ধান্তেও এক ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভের উপপাদন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আকাশের নিত্যত্ব যে মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রাচীন কালে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক গুরুগণ যেরূপে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, তাহা শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন নৈয়ায়িকগণের ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের নানা বার্থ ব্যাখ্যার প্রয়াস অনাবশ্যক। এইরূপ পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও কালাদির নিত্যত্বও যে মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়েও সংশয় নাই। মহাভারতে অন্যান্য সিদ্ধান্তের ন্যায় মহর্ষি কণাদ ও গোতমের পূর্ব্বোক্ত ঐ আর্ষ সিদ্ধান্তও যে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়[১]। সেখানে "শাশ্বত," "অচল" ও "ধ্রুব", এই তিনটি শব্দের দ্বারা আকাশাদি ছয়টি দ্রব্যের যে মুখ্য নিত্যত্বই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ ঐ তিনটি শব্দ প্রয়োগের সার্থক্য থাকে না। ঐ তিনটি শব্দের দ্বারা সেখানে ষট্‌পদার্থের মুখ্য নিত্যত্বই প্রকটিত

১। "বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানচলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসো রাশীন্ কালষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥
আপশ্চৈবান্তরীক্ষঞ্চ পৃথিবী বায়ুপাবকৌ।
নাসীদ্ধি পরমং তেভ্যো ভূতেভ্যো মুক্তসংশয়ঃ॥
নোপপত্ত্যা ন বা যুক্ত্যা ত্বসদ্ব্রূয়াদসংশয়ম্।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব। ২৭৪ অঃ। ৬। ৭।

হইলে সেখানে অপ্, পৃথিবী, বায়ু ও পাবক শব্দের দ্বারা জলাদির পরমাণুই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝিতে হয়। নচেৎ স্থূল জলাদির মুখ্য নিত্যতা কোন মতেই উপপন্ন হয় না। কেহ কেহ মহাভারতের ঐ বচনের পূর্ব্বাপর বচন পর্য্যালোচনার দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিকশাস্ত্রোক্ত মতই মহাভারতের প্রকৃত মত, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে নানাস্থানে সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত মতেরও যে বহু বর্ণন আছে, ইহা অস্বীকার করিয়া সত্যের অপলাপ করা যায় না। মহাভারতে সুপ্রচীন নানা মতেরই বর্ণন আছে। পঞ্চম বেদ মহাভারত সর্ব্বজ্ঞানের আকর, মহাভারত-পাঠকের ইহা অবিদিত নাই॥ ২৮॥

সর্ব্বানিত্যত্ব-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ৭॥

ভাষ্য। অয়মন্য একান্তঃ—

অনুবাদ। ইহা অপর "একান্তবাদ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "একান্তবাদ" খণ্ডনের পরে মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা আর একটি "একান্তবাদ" বলিতেছেন।

সূত্র। সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ॥ ২৯॥ ॥ ৩৭২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সমস্ত অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটপটাদি সমস্ত বস্তুই নিত্য, যেহেতু পঞ্চভূত নিত্য।

ভাষ্য। ভূতমাত্রমিদং সর্ব্বং, তানি চ নিত্যানি, ভূতোচ্ছেদানুপপত্তেরিতি।

অনুবাদ। এই সমস্ত (দৃশ্যমান ঘটপটাদি) ভূতমাত্র, অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক, সেই পঞ্চভূত নিত্য, কারণ, ভূতসমূহের উচ্ছেদের অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। সকল পদার্থই অনিত্য হইলে যেমন মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ সকল পদার্থ নিত্য হইলেও উহার সিদ্ধি হয় না। কারণ, আত্মার শরীরাদিও যদি নিত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে উহার উৎপত্তি না হওয়ায় আত্মার "প্রেত্যভাব" বলাই যাইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধির জন্য সর্ব্বনিত্যত্ববাদও খণ্ডন করা আবশ্যক। তাই মহর্ষি পূর্ব্বপ্রকরণের দ্বারা সর্ব্বানিত্যত্ববাদ খণ্ডন করিয়া এই প্রকরণের দ্বারা সর্ব্বনিত্যত্ববাদ খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সকল পদার্থই নিত্য; কারণ, পঞ্চভূত নিত্য। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, দৃশ্যমান ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই ভূতমাত্র অর্থাৎ

পঞ্চভূতাত্মক। কারণ, ঘট মৃত্তিকা, শরীর মৃত্তিকা, ইত্যাদি প্রকার লৌকিক অনুভবের দ্বারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটাদি যে মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থের মূল যে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ঐ ঘটপটাদি পদার্থ অভিন্ন, সমস্তই ঐ পঞ্চভূতাত্মক, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ ঘটপটাদি পদার্থও নিত্য, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, মূল পঞ্চভূত নিত্য, উহাদিগের অত্যন্তবিনাশ কখনই হয় না এবং উহাদিগের অসত্তাও কোন দিন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকগণ পঞ্চ ভূতের উচ্ছেদ স্বীকার না করায় পঞ্চভূতাত্মক ঘটপটাদি পদার্থের নিত্যত্বই স্বীকার্য্য। পরে তিনি নৈয়ায়িক মতানুসারে ঘটপটাদি দ্রব্য পরমাণুস্বরূপ নহে, ইহা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়াই মহর্ষির সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব-নিত্যত্বমতকে সাংখ্যমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যং" (৫। ৭২) এই সাংখ্যসূত্রের দ্বারা এবং "হেতুমদনিত্যমব্যাপি" ইত্যাদি (১০ম) সাংখ্যকারিকার দ্বারা সাংখ্যমতেও সকল পদার্থ নিত্য নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে সৎকার্য্যবাদী সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব যাহা কার্য্য বা অনিত্য বলিয়া কথিত, তাহাও আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে, এবং উহার অত্যন্ত বিনাশও নাই। সুতরাং সর্ব্বদা সত্তারূপ নিত্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতে সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বলা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত কারণেই সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে সাংখ্যমত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্র-ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত কারণেই সাংখ্যমতে বুদ্ধি নিত্য, ইহা বলিয়াছেন। নিত্য বলিতে এখানে সর্ব্বদা সৎ, আবির্ভাব ও তিরোভাব-শূন্য নহে। কারণ, সাংখ্যমতে বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। তাই সাংখ্য-শাস্ত্রে উহাদিগের অনিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি এখানে সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থকে নিত্য বলিলে উহার সমর্থন করিতে পঞ্চভূতের নিত্যত্বকে হেতু বলিলেন কেন? ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। সাংখ্যমতে পঞ্চভূতেরও আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। সুতরাং সাংখ্য-মতে পঞ্চভূত প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় নিত্য নহে। সাংখ্যমতানুসারে সকল পদার্থের নিত্যত্ব সমর্থন করিতে হইলে মূল কারণ প্রকৃতির নিত্যত্ব অথবা সকল পদার্থের সর্ব্বদা সত্তাই হেতু বলা কর্ত্তব্য মনে হয়। আমরা কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থ সমস্তই ভূতমাত্র, অর্থাৎ পঞ্চভূত হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থই নিত্য। কারণ, নৈয়ায়িকগণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চ ভূতকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঘটপটাদি দ্রব্যকে ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন অতিরিক্ত দ্রব্য বলিলেও এখানে মহর্ষি গোতমের কথিত সর্ব্বনিত্যত্ববাদী তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পরমাণু ও আকাশ হইতে কোন পৃথক্ দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই, সমস্ত দ্রব্যই ঐ পঞ্চভূতাত্মক, এবং উহা ভিন্ন জগতে আর কোন পদার্থও নাই। সুতরাং তিনি পঞ্চভূত নিত্য বলিয়া পঞ্চভূতাত্মক সমস্ত পদার্থকেই নিত্য বলিতে পারেন। মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারাও

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এইরূপই তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুধীগণ এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার বিচার করিয়া পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে অপর "একান্ত" বলিয়াছেন। যে বাদে কোন এক পক্ষে "অন্ত" অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা "একান্তবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। সকল পদার্থ নিত্যই, এইরূপে নিত্যত্ব পক্ষেই নিয়ম স্বীকৃত হওয়ায় সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে "একান্তবাদ" বলা যায়। পূর্ব্বোক্তরূপ কারণে সর্ব্বানিত্যত্ববাদও "একান্তবাদ"। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সর্ব্বানিত্যত্ববাদের উল্লেখ করায় পরে সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে "অপর একান্ত" বলিয়াছেন। "একান্ত" শব্দের অর্থ এখানে একান্তবাদ। নিশ্চয়ার্থক "অন্ত" শব্দের দ্বারা নিয়ম অর্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকে। "অন্ত" শব্দের ধর্ম্ম অর্থও অভিধানে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারও ধর্ম্ম অর্থে "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৪১শ সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনী এবং ১ম খণ্ড, ৩৬০ ও ৩৬৩—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

সূত্র। নোৎপত্তি-বিনাশকারণোপলব্ধেঃ ॥৩০॥৩৭৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) না,—অর্থাৎ সকল পদার্থ নিত্য নহে,—কারণ, (ঘটাদি পদার্থের) উৎপত্তির কারণ ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। উৎপত্তিকারণঞ্চোপলভ্যতে, বিনাশকারণঞ্চ,—তৎ সর্ব্বনিত্যত্বে ব্যাহন্যত ইতি।

অনুবাদ। উৎপত্তির কারণও উপলব্ধ হয়, বিনাশের কারণও উপলব্ধ হয়, তাহা সকল পদার্থের নিত্যত্ব হইলে ব্যাহত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অনেক পদার্থের যখন উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ উপলব্ধ হইতেছে, তখন সেই সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে আর সকল পদার্থই নিত্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, সকল পদার্থই নিত্য হইলে অনেক পদার্থের যে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, তাহা ব্যাহত হয়, অর্থাৎ সেই সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের প্রত্যক্ষসিদ্ধ কারণের অপলাপ করিতে হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত নিত্য হইলেও তজ্জনিত ঘটপটাদি সমস্ত (ভৌতিক) পদার্থ ঐ নিত্য পঞ্চভূত হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং অনিত্য। ঘটপটাদি পদার্থকে ভিন্ন পদার্থ না বলিয়া পরমাণুসমষ্টি বলিলে উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয়। সুতরাং ঘটপটাদি পদার্থ নিত্যপঞ্চভূতজনিত পৃথক্ অবয়বী, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বিপ্রকরণে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঘটপটাদি দ্রব্য যখন পরমাণু হইতে ভিন্ন অবয়বী বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণেরও উপলব্ধি হইতেছে, তখন আর সকল পদার্থই নিত্য, ইহা বলা যায় না ॥ ৩০ ॥

সূত্র। তল্লক্ষণাবরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥৩১॥৩৭৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই ভূতের লক্ষণ দ্বারা অবরোধবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থই পূর্ব্বোক্ত নিত্য পঞ্চ ভূতের লক্ষণাক্রান্ত, এ জন্য (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) প্রতিষেধ (উত্তর) হয় না।

ভাষ্য। যস্যোৎপত্তিবিনাশকারণমুপলভ্যত ইতি মন্যসে, ন তদ্‌ভূতলক্ষণহীনমর্থান্তরং গৃহ্যতে, ভূতলক্ষণাবরোধাদ্‌ভূতমাত্রমিদমিত্যযুক্তোহয়ং প্রতিষেধ ইতি।

অনুবাদ। যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, ইহা মনে করিতেছ, তাহা ভূতলক্ষণশূন্য পদার্থান্তর অর্থাৎ নিত্য ভূত হইতে পৃথক্ পদার্থ গৃহীত হয় না,—ভূতলক্ষণাক্রান্ততাবশতঃ ইহা অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্য, ভূতমাত্র (নিত্যভূতাত্মক), এ জন্য এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তর অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয় বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করা হইতেছে, ঐ সকল দ্রব্যও মূল ভূতের লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যও বস্তুতঃ নিত্য ভূতমাত্র, উহারাও নিত্যভূত হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যও বস্তুতঃ নিত্য হওয়ায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তর অযুক্ত। পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণবত্তাই ভূতের লক্ষণ। ঐ লক্ষণ যেমন চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতে আছে, তদ্রূপ দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্যেও আছে,—ঘটপটাদি দ্রব্যও ঐ ভূতলক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং উহাও ভূত বলিয়াই গৃহীত হয়, ভূতলক্ষণশূন্য কোন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া গৃহীত হয় না। অতএব বুঝা যায়, ঐ ঘটপটাদি দ্রব্যও পরমাণু ও আকাশ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঘটপদাদি দ্রব্যও নিত্য। অতএব পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা ঘটপটাদি দ্রব্যের নিত্যত্ব প্রতিষেধ হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

সূত্র। নোৎপত্তি-তৎকারণোপলব্ধেঃ ॥৩২॥৩৭৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সকল পদার্থই নিত্য হইতে পারে না; কারণ, (ঘটপটাদি দ্রব্যের) উৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। কারণসমানগুণস্যোৎপত্তিঃ কারণঞ্চোপলভ্যতে, ন চৈতদুভয়ং নিত্যবিষয়ং,ন চোৎপত্তি-তৎকারণোপলব্ধিঃ শক্যা প্রত্যাখ্যাতুং, ন চাবিষয়া

কাচিদুপলব্ধিঃ। উপলব্ধিসামর্থ্যাৎ কারণেন সমানগুণং কার্য্যমুৎপদ্যত ইত্যনুমীয়তে। স খলূপলব্ধের্ব্বিষয় ইতি। এবঞ্চ তল্লক্ষণাবরোধোপপত্তিরিতি।

উৎপত্তিবিনাশকারণপ্রযুক্তস্য জ্ঞাতুঃ প্রযত্নো দৃষ্ট ইতি। **প্রসিদ্ধশ্চাবয়বী তদ্ধর্ম্মা,** উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মা চাবয়বী সিদ্ধ ইতি। **শব্দ-কর্ম্ম-বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চাব্যাপ্তিঃ,** "পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ" "তল্লক্ষণাবরোধা"চ্চেত্যনেন শব্দ-কর্ম্ম-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নাশ্চ ন ব্যাপ্তাঃ, তস্মাদনেকান্তঃ।

স্বপ্নবিষয়াভিমানবন্মিথ্যোপলব্ধিরিতি চেৎ? ভূতোপলব্ধৌ তুল্যং। যথা স্বপ্নে বিষয়াভিমান এবমুৎপত্তিবিনাশকারণাভিমান ইতি। এবঞ্চৈতদ্‌ভূতোপলব্ধৌ তুল্যং, পৃথিব্যাদ্যুপলব্ধিরপি স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ প্রসজ্যতে। **পৃথিব্যাদ্যভাবে সর্ব্বব্যবহারবিলোপ ইতি চেৎ? তদিতরত্র সমানং।** উৎপত্তিবিনাশকারণোপলব্ধিবিষয়স্যাপ্যভাবে সর্ব্বব্যবহারবিলোপ ইতি। সোঽয়ং নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাদবিষয়ত্বাচ্চোৎপত্তিবিনাশয়োঃ "স্বপ্নবিষয়াভিমানব"দিত্যহেতুরিতি।

অনুবাদ। কারণের সমানগুণের উৎপত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদিদ্রব্যে উপাদানকারণস্থ বিশেষ গুণের সজাতীয় বিশেষ গুণের উৎপত্তি এবং কারণ উপলব্ধ হয়। এই উভয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণোৎপত্তি ও কারণ, নিত্যবিষয়ক (নিত্যসম্বন্ধী) নহে। উৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধি অস্বীকার করিতেও পারা যায় না। নির্ব্বিষয়ক কোন উপলব্ধিও নাই। উপলব্ধির সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণোৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধির বলে উপাদান-কারণের সমানগুণবিশিষ্ট কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমিত হয়। তাহাই উপলব্ধির বিষয় (অর্থাৎ "ইহা ঘট", "ইহা পট", ইত্যাদি প্রকারে যে প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হইতেছে, তাহার বিষয় সেই কারণ-সমান-গুণবিশিষ্ট পৃথক্ জন্য দ্রব্য) এইরূপ হইলেও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্য দ্রব্য নিত্য ভূত হইতে উৎপন্ন পৃথক্ দ্রব্য হইলেও (উহাতে) সেই ভূতের লক্ষণাক্রান্ততার উপপত্তি হয়।

উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ-প্রেরিত জ্ঞাতার (আত্মার) প্রযত্ন দৃষ্ট হয়। [অর্থাৎ ঘটপটাদি পদার্থের বাস্তব উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিয়াই বিজ্ঞদিগের ঐ

উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; অন্যথা উহা হইতে পারে না]। পরন্তু তদ্ধর্ম্মা অবয়বী প্রসিদ্ধ। বিশদার্থ এই যে, উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অবয়বী (ঘটপটাদি দ্রব্য) সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বি-প্রকরণে যুক্তির দ্বারা উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু শব্দ, কর্ম্ম ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে (হেতুর) অব্যাপ্তি। বিশদার্থ এই যে, পঞ্চভূতের নিত্যত্ব এবং ভূত-লক্ষণাক্রান্তত্ব, ইহার দ্বারা শব্দ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন প্রভৃতি ব্যাপ্ত নহে, অতএব (পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতু) অনেকান্ত। অর্থাৎ "সর্ব্বং নিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় ঐ হেতু অব্যাপক, উহা সমস্ত পক্ষব্যাপক নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) স্বপ্নে বিষয়-ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা উপলব্ধি, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ভূতের উপলব্ধিতে তুল্য। বিশদার্থ এই যে, যেমন স্বপ্নে বিষয়ের ভ্রম হয়, এইরূপ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের ভ্রম হয়, এইরূপ হইলে ইহা ভূতের উপলব্ধিতে তুল্য, (অর্থাৎ) পৃথিব্যাদির উপলব্ধিও স্বপ্নে বিষয়-ভ্রমের ন্যায় প্রসক্ত হয়। পৃথিব্যাদির অভাবে সকল ব্যবহারের বিলোপ হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) তাহা অপর পক্ষেও সমান, (অর্থাৎ) উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধির বিষয়েরও অভাব হইলে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশের উপলভ্যমান কারণেরও বাস্তব সত্তা না থাকিলে সকল ব্যবহারের বিলোপ হয়। নিত্যপদার্থসমূহের অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত পঞ্চ ভূত, চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ এবং উৎপত্তি ও বিনাশের অবিষয়ত্ববশতঃ সেই এই "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্তবাক্য অহেতু অর্থাৎ উহা সাধক হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি অনেক দ্রব্যেরই যখন উৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধি হইতেছে, তখন সকল পদার্থই নিত্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রে বিশেষ যুক্তি ব্যক্ত করিতে সূত্রোক্ত "উৎপত্তি" শব্দের দ্বারা জন্য দ্রব্যে উপাদানকারণের সমান গুণের উৎপত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কারণের সমান গুণের উৎপত্তি ও কারণ উপলব্ধ হয়। উপলভ্যমান ঐ উৎপত্তি ও কারণ, এই উভয় নিত্যবিষয়ক নহে অর্থাৎ নিত্যপদার্থ উহার বিষয় (সম্বন্ধী) নহে। কারণ, নিত্যপদার্থের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও কারণ কোনমতেই সম্ভব নহে। ভাষ্যে এখানে "বিষয়" শব্দের দ্বারা সম্বন্ধী বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ উৎপত্তি ও তাহার কারণের যে উপলব্ধি হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ উহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ উপলব্ধির কোন বিষয় নাই, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিষয়শূন্য কোন উপলব্ধি নাই। উপলব্ধি মাত্রেরই বিষয় আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির সামর্থ্যবশতঃ কারণের সমানগুণবিশিষ্ট পৃথক্ দ্রব্যই যে, উৎপন্ন

হয়, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। পৃথক্ দ্রব্য উৎপন্ন না হইলে ঐরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, ঘটপটাদি যে সকল দ্রব্য উপলব্ধ হইতেছে, তাহা ঐ সকল দ্রব্যের কারণের বিশেষ গুণ রূপাদির সজাতীয়বিশেষগুণবিশিষ্ট, ইহাই দেখা যায়। রক্তসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। নীলসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হয় না। সুতরাং সর্ব্বত্রই উপাদানকারণের রূপাদি বিশেষ গুণই কার্য্যদ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণের উৎপাদক, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটপটাদি দ্রব্যের যে, উপাদান-কারণ আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ঐ সকল দ্রব্যে রূপাদি বিশেষগুণের উপলব্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এইরূপ হইলেও ভূতলক্ষণাক্রান্ততার উপপত্তি হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, ঘটপটাদিজন্য দ্রব্যকেও ভূতলক্ষণাক্রান্তত্ববশতঃ নিত্যভূতাত্মক বলিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। কারণ, ঘটপটাদি দ্রব্য নিত্যভূত হইতে উৎপন্ন পৃথক্ দ্রব্য হইলেও ভূতলক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। ভূতলক্ষণাক্রান্ত হইলেই যে, তাহা নিত্যভূত হইতে অভিন্ন হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। ভূতজন্য বা ভৌতিক পদার্থ সমস্তও ভূত, তাহাতেও ভূতত্ব বা ভূতলক্ষণ আছে। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা ভূতভৌতিক সমস্ত পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু ঘটপটাদি জন্য দ্রব্যের উৎপত্তি ও উহার কারণের উপলব্ধি হওয়ায় ঐ সমস্ত দ্রব্য যে অনিত্য, ইহাই সিদ্ধ হয়।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া শেষে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনিত্যত্ব মত খণ্ডন করিতে নিজে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ দ্বারা প্রেরিত আত্মার তদ্বিষয়ে প্রযত্ন দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ বাস্তব পদার্থ, উহার কারণও বাস্তব পদার্থ। নচেৎ ঘটাদি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিনাশ করিবার জন্য উহার কারণকে আশ্রয় করিবে কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও যখন ঘটাদি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিনাশ করিতে উহার কারণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন ঐ সকল দ্রব্যের বাস্তব উৎপত্তি ও বাস্তব বিনাশ অবশ্য আছে। তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের অনিত্যত্বই অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অবয়বী সিদ্ধ পদার্থ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বিপ্রকরণে যুক্তির দ্বারা উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ঘটাদি দ্রব্য যে, পরমাণুসমষ্টি নহে, উহা পৃথক্ অবয়বী, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় ঐ সকল দ্রব্যের নিত্যত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে চরম দোষ বলিয়াছেন যে, "পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ" এবং "তল্লক্ষণাবরোধাৎ" এই দুই হেতুবাক্যের দ্বারা সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বলাও যাইতে পারে না। কারণ, শব্দ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, এই সমস্ত গুণ-পদার্থে এবং ঐরূপ আরও অনেক অভৌতিক পদার্থে ভূতত্ব বা ভূতলক্ষণ নাই; কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থ ভূতই নহে। সুতরাং পঞ্চ ভূতের নিত্যত্ব ও ভূতলক্ষণাক্রান্তত্ববশতঃ ঐ সমস্ত পদার্থকে নিত্য বলা যায় না। পঞ্চভূতাত্মকত্ব বা ভূতলক্ষণাক্রান্তত্ব ঐ সমস্ত পদার্থে না থাকায় ঐ হেতু অনেকান্ত অর্থাৎ অব্যাপক। ভাষ্যে "অনেকান্ত" বলিতে এখানে ব্যভিচারী নহে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু তাঁহার কথিত সমস্ত পক্ষে না থাকায় উহা অনেকান্ত অর্থাৎ সমস্ত পক্ষব্যাপক নহে। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে,

ঐ হেতুর অন্তদ্বয়ে অর্থাৎ সত্তা ও অসত্তায় পক্ষের অবস্থানবশতঃ ঐ হেতু অনেকান্ত। তাৎপর্য্য এই যে, "সর্ব্বং নিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় সমস্ত পদার্থই পক্ষ। কিন্তু সমস্ত পদার্থেই পঞ্চভূতাত্মকত্ব বা ভূতলক্ষণান্তত্বরূপ হেতু নাই। যেখানে (ঘটাদিদ্রব্যে) আছে, তাহাও পক্ষের অন্তর্গত, যেখানে (শব্দ, বুদ্ধি, কর্ম্ম প্রভৃতিতে) নাই, তাহাও পক্ষের অন্তর্গত। সুতরাং ঐ হেতু সমস্ত পক্ষ-ব্যাপক না হওয়ায় উহা "অনেকান্ত"। ভাষ্যে "প্রবত্নাশ্চ" এই স্থলে "চ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ অন্যান্য অভৌতিক পদার্থেরও সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে। এবং "শব্দ-কর্ম্ম-বুদ্ধ্যাদীনাং" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি সর্ব্বনিত্যত্ববাদ খণ্ডন করিতে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের যে উপলব্ধি বলিয়াছেন, উহা যথার্থ উপলব্ধি হইলে উৎপত্তি ও বিনাশকে বাস্তব পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট ঘটপটাদি পদার্থ যে অনিত্য, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের যে উপলব্ধি হয়, উহা মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রমাত্মক উপলব্ধি। বস্তুতঃ উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, সুতরাং তাহার কারণও নাই। স্বপ্নে যেমন অনেক বিষয়ের উপলব্ধি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সেই সমস্ত বিষয় নাই, এ জন্য ঐ উপলব্ধিকে ভ্রমই বলা হয়, তদ্রূপ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বস্তুতঃ না থাকিলেও উহার ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের বাস্তব সত্তা না থাকায় ঘটপটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও উল্লেখপূর্ব্বক ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, এইরূপ বলিলে ইহা ভূতের উপলব্ধিতেও তুল্য। অর্থাৎ ঐরূপ বলিলে পৃথিব্যাদি মূল ভূতের যে উপলব্ধি হইতেছে, উহাও স্বপ্নে বিষয়োপলব্ধির ন্যায় ভ্রম বলা যাইতে পারে। নিষ্প্রমাণে যদি ঘটপটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণবিষয়ক সার্ব্বজনীন উপলব্ধিকে ভ্রম বলা যায়, তাহা হইলে ঘটপটাদি দ্রব্যের যে প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হইতেছে, উহাও ভ্রম বলিতে পারি। তাহা হইলে ঐ ঘটপটাদি দ্রব্যের সত্তাই অসিদ্ধ হওয়ায় উহাতে নিত্যত্ব সাধন হইতে পারে না। যদি বল, পৃথিব্যাদি ভূতের সত্তা না থাকিলে সকল-লোকব্যবহার বিলুপ্ত হয়; এ জন্য উহার সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং উহার উপলব্ধিকে ভ্রম বলা যায় না। কিন্তু ইহা অপর পক্ষেও সমান। অর্থাৎ ঘটপটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের যে উপলব্ধি হইতেছে, ঐ উপলব্ধি ভ্রম হইলে ঐ ভ্রমাত্মক উপলব্ধির বিষয় যে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, তাহারও অভাব হওয়ায় অর্থাৎ তাহারও বাস্তব সত্তা না থাকায় সকল-লোকব্যবহারের লোপ হয়। ঘটপটাদি পদার্থের উৎপাদন ও বিনাশের কারণ অবলম্বন করিয়া জগতে যে ব্যবহার চলিতেছে, তাহার উচ্ছেদ হয়। কারণ, ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কোন বাস্তব কারণ নাই। সুতরাং লোকব্যবহারের উচ্ছেদ যখন পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতেও তুল্য, তখন তিনি ঐ দোষ বলিতে পারেন না। তিনি নিষ্প্রমাণে ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণবিষয়ক উপলব্ধিকে ভ্রম বলিলে ঘটপটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধিকেও ভ্রম বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত সমাধানে চরম দোষ বলিয়াছেন যে, "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্ত-বাক্যের দ্বারা উৎপত্তি ও

বিনাশের কারণের উপলব্ধিকে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। ঐ বাক্য বা ঐ দৃষ্টান্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে তাঁহার সাধ্যসাধকই হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে ঘটপটাদি দ্রব্য পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের সমষ্টিরূপ নিত্য। সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। পরমাণুর ও আকাশের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ তৎস্বরূপ ঐ সকল পদার্থও অতীন্দ্রিয় হইবে। এবং তাঁহার মতে ঐ সকল পদার্থের নিত্যত্ববশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। তিনি কোন পদার্থেরই বাস্তব উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার মতে কুত্রাপি উৎপত্তি ও বিনাশবিষয়ক যথার্থ বুদ্ধি জন্মে না। তাহা হইলে কোন স্থলে উৎপত্তি ও বিনাশবিষয়ক ভ্রম-বুদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, যে বিষয়ে কোন স্থলে যথার্থ-বুদ্ধি জন্মে না, সে বিষয়ে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি হইতেই পারে না। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২য় আঃ, ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যে) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু যে বিষয়ের সত্তাই নাই, তদ্বিষয়ে ভ্রমবুদ্ধিও হইতে পারে না। স্বপ্নে যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সেই সকল বিষয় একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। অন্যত্র তাহার সত্তা আছে। সুতরাং স্বপ্নে তাহার ভ্রম উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ একেবারেই অসৎ অর্থাৎ অলীক। সুতরাং উহার ভ্রম উপলব্ধিও হইতে পারে না। এবং তাঁহার মতে ঘটপটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষও অসম্ভব। কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চ ভূতমাত্র। ঘটপটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশের ভ্রম প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। সুতরাং "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্তবাক্য বা ঐ দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনিত্যত্ববাদের সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতে উদ্দ্যোতকর ইহাও বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থ ই নিত্য হইলে "সর্ব্বং নিত্যং" এই বাক্য-প্রয়োগই ব্যাহত হয়। কারণ, ঐ বাক্যের দ্বারা যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী অপরের সকল পদার্থের নিত্যত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে ঐ বাক্যজন্য সেই জ্ঞানকেই ত তিনি অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহা হইলে আর "সকল পদার্থ ই নিত্য," ইহা বলিতে পারেন না। আর যদি তাঁহার ঐ বাক্যকে তিনি সাধ্যের সাধক না বলিয়া সিদ্ধের নিবর্ত্তক বলেন, তাহা হইলে সেই সিদ্ধ পদার্থের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে সেই সিদ্ধ পদার্থও নিত্য। নিত্য পদার্থের নিবৃত্তি হয় না। তিরোভাব হয় বলিলেও অপূর্ব্ব বস্তুর উৎপত্তি ও পূর্ব্ববস্তুর বিনাশ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। অবস্থিতস্যোপাদানস্য ধর্ম্মমাত্রং নিবর্ত্ততে, ধর্ম্মমাত্রমুপজায়তে স খলূৎপত্তিবিনাশয়োর্ব্বিষয়ঃ। যচ্চোপজায়তে, তৎ প্রাগপ্যুপজননাদস্তি, যচ্চ নিবর্ত্ততে, তন্নিবৃত্তমপ্যস্তীতি। এবঞ্চ সর্ব্বস্য নিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান উপাদানের ধর্ম্মমাত্র নিবৃত্ত হয়, ধর্ম্মমাত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্থাৎ সেই ধর্ম্মদ্বয়ই (যথাক্রমে) উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয়। কিন্তু যাহা অর্থাৎ যে ধর্ম্ম মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও

(ধর্ম্মিরূপে) থাকে, এবং যে ধর্ম্ম মাত্র নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইয়াও (ধর্ম্মিরূপে) থাকে। এইরূপ হইলেই সকল পদার্থের নিত্যত্ব হয়।

সূত্র। ন ব্যবস্থানুপপত্তেঃ ॥৩৩॥৩৭৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ কোনরূপেই সকল পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ, (ঐ মতে) ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। অয়মুপজন ইয়ং নিবৃত্তিরিতি ব্যবস্থা নোপপদ্যতে, উপজাতনিবৃত্তয়োর্ব্বিদ্যমানত্বাৎ। অয়ং ধর্ম্ম উপজাতোঽয়ং নিবৃত্ত ইতি সদ্ভাবাবিশেষাদব্যবস্থা। ইদানীমুপজননিবৃত্তী, নেদানীমিতি কালব্যবস্থা নোপপদ্যতে, সর্ব্বদা বিদ্যমানত্বাৎ। অস্য ধর্ম্মস্যোপজননিবৃত্তী, নাস্যেতি ব্যবস্থানুপপত্তিঃ, উভয়োরবিশেষাৎ। অনাগতোঽতীত ইতি চ কাল-ব্যবস্থানুপপত্তিঃ, বর্ত্তমানস্য সদ্ভাবলক্ষণত্বাৎ। অবিদ্যমানস্যাত্মলাভ উপজনো বিদ্যমানস্যাত্মহানং নিবৃত্তিরিত্যেতস্মিন্ সতি নৈতে দোষাঃ। তস্মাদ্যদুক্তং প্রাগুপজননাদস্তি,—নিবৃত্তঞ্চাস্তি তদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। "ইহা উৎপত্তি","ইহা নিবৃত্তি" (বিনাশ), এই ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। কারণ, (পূর্ব্বোক্ত মতে) উৎপন্ন ও বিনষ্টের বিদ্যমানত্ব আছে। এই ধর্ম্ম উৎপন্ন, এই ধর্ম্ম বিনষ্ট, ইহা হইলে অর্থাৎ কোন ধর্ম্মমাত্রই উৎপন্ন হয়, এবং কোন ধর্ম্ম-মাত্রই বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মী সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, ইহা বলিলে সত্তার বিশেষ না থাকায় ব্যবস্থা হয় না। পরন্তু ইদানীং উৎপত্তি ও বিনাশ, ইদানীং নহে, এই কালব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। কারণ, (ধর্ম্মী) সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এবং এই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ, এই ধর্ম্মের নহে, এইরূপ ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না ; কারণ, উভয় ধর্ম্মের বিশেষ নাই (অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ট, উভয় ধর্ম্মই যখন সর্ব্বদা বিদ্যমান, তখন পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে না)। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ এবং অতীত, এইরূপে কালব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। কারণ, বর্ত্তমান সদ্ভাবলক্ষণ, [অর্থাৎ সদ্ভাব বা সত্তাই বর্ত্তমানের লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত মতে সকল পদার্থেরই সর্ব্বদা সত্তাবশতঃ সকল পদার্থই বর্ত্তমান, সুতরাং কোন পদার্থেই অতীতত্ব ও ভবিষ্যত্ব না থাকায় ইহা অতীত, ইহা ভবিষ্যৎ, এইরূপে যে, কালব্যবস্থা, তাহা

হইতে পারে না] কিন্তু অবিদ্যমান পদার্থের আত্মলাভ অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার স্বরূপলাভ উৎপত্তি, বিদ্যমান পদার্থের আত্মহান (স্বরূপত্যাগ) নিবৃত্তি অর্থাৎ বিনাশ, ইহা হইলে অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিলে এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত) দোষ হয় না। অতএব যে বলা হইয়াছে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও আছে এবং বিনষ্ট হইয়াও আছে, তাহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই প্রকরণে শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা কোনরূপেই যে, সর্ব্বনিত্যত্ববাদ সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা পাতঞ্জল সিদ্ধান্তানুসারেও সর্ব্বনিত্যত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে যেরূপে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে পূর্ব্বে যে, সাংখ্যমতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকার যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পাতঞ্জল সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। পাতঞ্জল-মতে সমস্ত ধর্ম্মীরই পরিণাম ত্রিবিধ—(১) ধর্ম্মপরিণাম, (২) লক্ষণ-পরিণাম, (৩) অবস্থা-পরিণাম। (পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ১৩শ সূত্র ও ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুবর্ণের পরিণাম বা বিকার কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, উহা মূল সুবর্ণ হইতে বস্তুতঃ কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। কুণ্ডলাদি ঐ সুবর্ণেরই ধর্ম্মবিশেষ, সুতরাং সুবর্ণের ঐ কুণ্ডলাদি পরিণাম "ধর্ম্মপরিণাম"। ঐ সুবর্ণের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ভাব অথবা উহাতে ঐরূপ এক লক্ষণের তিরোভাবের পরে অন্য লক্ষণের আবির্ভাব হইলে উহা তাহার "লক্ষণ-পরিণাম"। এবং ঐ সুবর্ণের নূতন অবস্থা, পুরাতন অবস্থা প্রভৃতি উহার "অবস্থাপরিণাম"। তাৎপর্য্যটীকাকার পাতঞ্জল সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মীর এই ত্রিবিধ পরিণাম। কিন্তু ঐ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, মূল ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। ধর্ম্মী সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকায় নিত্য, সুতরাং ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন ঐ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাও ধর্ম্মিরূপে নিত্য। কিন্তু ধর্ম্মী হইতে সেই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থার কথঞ্চিৎ ভেদও থাকায় উহাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশও উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই মতের সংক্ষেপে বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মী পূর্ব্বাপরকালে অবস্থিতই থাকে, উহাই কার্য্যের উপাদান, উহার উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না। কিন্তু উহার কোন ধর্ম্মমাত্রেরই বিনাশ হয় এবং ধর্ম্মমাত্রেরই উৎপত্তি হয়। তাহা হইলেও ত সেই ধর্ম্মের অনিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে, যাহার উৎপত্তি এবং যাহার বিনাশ হইবে, তাহাকে ত নিত্য বলা যাইবে না। সুতরাং এই মতেও সর্ব্ব-নিত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এই মতে যে ধর্ম্মমাত্রের উৎপত্তি হয়, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও ধর্ম্মিরূপে থাকে এবং যে ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তাহা নিবৃত্ত হইয়াও ধর্ম্মিরূপে থাকে। কারণ, সেই ধর্ম্মী হইতে সেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট ধর্ম্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। সেই ধর্ম্মীর সর্ব্বদা বিদ্যমানত্ববশতঃ তদ্রূপে তাহার ধর্ম্মও সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যমানত্বই নিত্যত্ব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে সকল পদার্থেরই নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন মতেই সর্ব্বনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ব্যবস্থার

উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি ও বিদ্যমান পদার্থের অত্যন্ত বিনাশ স্বীকার না করিলে উৎপত্তি ও বিনাশের যে সমস্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহার কোন ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জল সিদ্ধান্তানুসারে মহর্ষিসূত্রোক্ত ব্যবস্থার অনুপপত্তি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ইহা উৎপত্তি, ইহা বিনাশ, এইরূপ যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে যাহা উৎপন্ন হয়, এবং যাহা বিনষ্ট হয়, এই উভয়ই ধর্ম্মিরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই ধর্ম্ম উৎপন্ন, এই ধর্ম্ম বিনষ্ট, এইরূপে ধর্ম্মবিশেষের উৎপত্তি ও বিনাশের স্বরূপতঃ যে ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উৎপত্তিই হইয়াছে, বিনাশ হয় নাই, তাহার তখন অস্তিত্ব আছে এবং যে ধর্ম্মটি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার বিনাশই হইয়াছে, তাহার তখন অস্তিত্ব নাই, এইরূপ যে ব্যবস্থা বা নিয়ম সর্ব্বজনসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট ধর্ম্মের সদ্ভাব অর্থাৎ সত্তার কোন বিশেষ নাই। উৎপন্ন ধর্ম্মটিও যেমন পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, বিনষ্ট ধর্ম্মটিও তদ্রূপ বিদ্যমান থাকে, উহার অত্যন্তবিনাশ হয় না। বিনাশের পরেও উহা ধর্ম্মিরূপে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ইহা আছে এবং ইহা নাই, এইরূপ কথাই পূর্ব্বোক্ত মতে যখন বলা যায় না, তখন ইহা উৎপন্ন ও ইহা বিনষ্ট, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা ঐ মতে উপপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু ইদানীং উৎপত্তি হইয়াছে, ইদানীং বিনাশ হইয়াছে, ইদানীং উৎপত্তি ও বিনাশ হয় নাই, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যে কালব্যবস্থা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিবে, তাহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বোক্ত মতে যখন সকল পদার্থই সর্ব্বদাই বিদ্যমান, তখন ইদানীং আছে, ইদানীং নাই, এইরূপ কথাই ঐ মতে বলা যায় না। সুতরাং ঐ মতে উৎপত্তি ও বিনাশের কালিক ব্যবস্থাও কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। পরন্তু এই ধর্ম্মের উৎপত্তি, এই ধর্ম্মের বিনাশ, এই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নহে, এইরূপ যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও যে ধর্ম্মের বিনাশ হয়, এই উভয় ধর্ম্মের কোন বিশেষ নাই। পূর্ব্বোক্ত মতে ঐ উভয় ধর্ম্মই সর্ব্বদা বিদ্যমান। পরন্তু এই ধর্ম্ম অনাগত (ভাবী), এই ধর্ম্ম অতীত, এইরূপ যে, কালব্যবস্থা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে সকল ধর্ম্মই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায় সকল ধর্ম্মই বর্ত্তমান। যাহা বর্ত্তমান, তাহাকে ভাবী ও অতীত বলা যায় না। ফল কথা, উৎপত্তি ও বিনাশের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতানুসারেও সর্ব্বনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মতে সূত্রোক্ত "ব্যবস্থার" অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে পদার্থ থাকে না, তাহার কারণজন্য আত্মলাভই উৎপত্তি, এবং পরে সেই পদার্থের আত্মত্যাগ অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশই নিবৃত্তি, এই মতে অর্থাৎ আমাদিগের অভিমত অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষই হয় না, পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যবস্থারই অনুপপত্তি হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই পদার্থ থাকে এবং বিনষ্ট হইয়াও সেই পদার্থ থাকে, এই মত

অযুক্ত। কারণ, ঐ মতে পূর্ব্বোক্ত সর্বজনসিদ্ধ কোন ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না। পরবর্ত্তী ৪৯শ সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনীতে ন্যায়দর্শনসম্মত অসৎকার্য্যবাদ-সমর্থনে পূর্ব্বোক্ত মতের বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে সূত্রোক্ত "ব্যবস্থার" অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া গূঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ধর্ম্মীর ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, ঐ ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। একাধারে ঐরূপে ভেদ ও অভেদ থাকিতেই পারে না। তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের কোনরূপ ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। সুতরাং ঐ ব্যবস্থার উপপত্তির জন্য ধর্ম্মী হইতে তাহার "ধর্ম্ম", "লক্ষণ" ও "অবস্থার" ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে উহাদিগের অনিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এ বিষয়ে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির অন্যান্য কথা পরে কথিত হইবে ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বানিত্যত্ব নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

———০———

ভাষ্য। অয়মন্য একান্তঃ—

অনুবাদ। ইহা অপর একান্তবাদ—

সূত্র। সর্ব্বং পৃথক্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥৩৪॥৩৭৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সমস্ত পদার্থই পৃথক্ অর্থাৎ নানা; কারণ, ভাবের লক্ষণের অর্থাৎ পদার্থের সংজ্ঞাশব্দের পৃথক্ত্ব (সমূহবাচকত্ব) আছে।

ভাষ্য। সর্ব্বং নানা, ন কশ্চিদেকো ভাবো বিদ্যতে, কস্মাৎ? **ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ**, ভাবস্য লক্ষণমভিধানং, যেন লক্ষ্যতে ভাবঃ, স সমাখ্যাশব্দঃ, তস্য পৃথগ্বিষয়ত্বাৎ। সর্ব্বো ভাবসমাখ্যাশব্দঃ সমূহবাচী। "কুম্ভ" ইতি সংজ্ঞাশব্দো গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শসমূহে বুধ্নপার্শ্বগ্রীবাদি-সমূহে চ বর্ত্ততে, নিদর্শনমাত্রঞ্চেদমিতি।

অনুবাদ। সমস্ত পদার্থই নানা, এক কোন ভাব (পদার্থ) নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভাবের লক্ষণের পৃথক্ত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, ভাবের (পদার্থের) লক্ষণ বলিতে অভিধান, (শব্দ), যদ্দ্বারা ভাব লক্ষিত হয়, তাহা সংজ্ঞা-শব্দ, সেই সংজ্ঞাশব্দের পৃথগ্বিষয়ত্ব আছে। তাৎপর্য্য এই যে, ভাবের (পদার্থের) সমস্ত সংজ্ঞাশব্দ, সমূহবাচক। "কুম্ভ" এই সংজ্ঞাশব্দটি গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ-সমূহে এবং বুধ্ন অর্থাৎ কুম্ভের নিম্নভাগ এবং পার্শ্ব ও গ্রীবাদি (অগ্রভাগ প্রভৃতি) সমূহের অর্থাৎ গন্ধাদি গুণের সমষ্টি এবং নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়বের সমষ্টি অর্থে

বর্ত্তমান আছে, ইহা কিন্তু দৃষ্টান্ত মাত্র। [অর্থাৎ কুম্ভ শব্দের ন্যায় গো, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত সংজ্ঞাশব্দই নানা গুণ ও নানা অবয়বসমূহের বাচক। সমস্ত সংজ্ঞাশব্দেরই বাচ্য অর্থ, গুণাদির সমূহ বা সমষ্টিরূপ নানা পদার্থ। সুতরাং জগতে এক কোন পদার্থ নাই, সকল পদার্থই গুণাদির সমষ্টিরূপ নানা।]

টিপ্পনী। সকল পদার্থই নানা, এক কিছুই নাই, ঘটপটাদি যে সকল পদার্থকে এক বলিয়া বুঝা হয়, তাহা বস্তুতঃ এক নহে; কারণ, তাহা নানা অবয়ব ও নানা গুণের সমষ্টি। ঐ সমষ্টিই ঘটপটাদি শব্দের বাচ্য। এই মতও অপর একটি "একান্তবাদ"। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পূর্ব্বোক্তরূপ সর্ব্বনানাত্ব মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার নবীন বিশ্বনাথও প্রথমে ঐরূপই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল পদার্থই নানা, ইহার হেতু কি? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে—"ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ"। "ভাব" শব্দের অর্থ পদার্থ মাত্র। যাহার দ্বারা ঐ ভাব লক্ষিত অর্থাৎ বোধিত হয়, এই অর্থে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ এখানে সংজ্ঞা-শব্দ। "পৃথক্ত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে পৃথগ্‌বিষয়ত্ব অর্থাৎ নানার্থবাচকত্ব। সকল পদার্থেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে। সেই সমস্ত শব্দের বিষয় অর্থাৎ বাচ্য পৃথক্ অর্থাৎ নানা। কারণ, সমস্ত শব্দেরই বাচ্য অর্থ কতিপয় অবয়ব ও গুণের সমষ্টি। সুতরাং সমস্ত সংজ্ঞাশব্দই সমূহ-বাচক। সমূহ বা সমষ্টি এক পদার্থ নহে। সুতরাং সকল পদার্থই সমূহাত্মক হইলে সকল পদার্থই নানা হইবে, কোন পদার্থই এক হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "কুম্ভ" এই সংজ্ঞাশব্দটি গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শসমূহ এবং নিম্নভাগ, পার্শ্বভাগ ও অগ্রভাগ প্রভৃতি অবয়বসমূহের বাচক। কারণ, "কুম্ভ" শব্দ শ্রবণ করিলে ঐ গন্ধাদিসমূহই বুঝা যায়। সুতরাং ঐ গন্ধাদিসমূহই কুম্ভ পদার্থ। তাহা হইলে কুম্ভ পদার্থ নানা, উহা এক নহে, ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপ গো, মনুষ্য প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ সমূহ অর্থের বাচক হওয়ায় গো, মনুষ্য প্রভৃতি পদার্থও নানা, ইহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারোক্ত "কুম্ভ" শব্দ দৃষ্টান্তমাত্র। উদ্দ্যোতকর এই মতের যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] "কুম্ভ" শব্দ অনেকার্থবোধক; কারণ, উহা একটি পদ। পদ বা সংজ্ঞাশব্দ মাত্রই অনেকার্থবোধক, যেমন "সেনা" শব্দ। "সেনা" বলিলে কোন একটিমাত্র পদার্থই বুঝা যায় না। চতুরঙ্গ সেনাই "সেনা" শব্দের অর্থ (২য় খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ "কুম্ভ" শব্দ শ্রবণ করিলেও যখন অনেক অর্থেরই বোধ হয়, তখন "কুম্ভ" শব্দও "সেনা" শব্দের ন্যায় অনেকার্থবোধক অর্থাৎ সমূহবাচক। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত শব্দই পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সমূহবাচক বলিয়া সিদ্ধ হইলে সকল পদার্থই নানা, এক কোন পদার্থ নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন কোন দ্রব্য নাই, অবয়ব হইতে ভিন্ন কোন অবয়বীও নাই, ইহা বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক ও

১। "কুম্ভশব্দোঽনেকবিষয়ঃ, একপদত্বাৎ, সেনাশব্দবদিতি। পদশ্রবণাদনেকার্থাবগতেঃ, যস্মাৎ পদশ্রুতেরনেকোঽর্থোঽবগম্যতে যথা সেনেতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক।

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মত। পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মতে যে, সকল পদার্থই সমষ্টিরূপ, একমাত্র পদার্থ কেহই নহে, ইহা তাৎপর্য্য-টীকাকার পূর্ব্বেও এক স্থানে বলিয়াছেন। (২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মহর্ষি গোতম "সর্ব্বং পৃথক্," এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনানাত্ব মতই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিলে ঐ মত যে, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ ঐ মতের সমর্থনপূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্তরূপে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন বাধকনিশ্চয় নাই। পরন্তু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যদি জগতে নানা অর্থাৎ সমষ্টিরূপ কোন পদার্থ নাই, ইহাই কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদবিরোধী কোন সম্প্রদায়বিশেষ, সুপ্রাচীন কালেও বৈদিক সিদ্ধান্ত খণ্ডনের আগ্রহবশতঃ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনানাত্ব মতেরও সমর্থন করিতে পারেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এখানে যে ভাবে সর্ব্বনানাত্ব মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই মতে "আত্মন্" শব্দও সমূহবাচক। সুতরাং আত্মাও গুণাদির সমষ্টিরূপ নানা পদার্থ। তাহা হইলে মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার যে স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা আর বলা যায় না—আত্মার নিত্যত্বও ব্যাহত হয়। পূর্ব্বোক্ত "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং" ইত্যাদি (১১শ) সূত্রের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত সূচিত হইয়াছে, তাহাও ব্যাহত হয়। সুতরাং মহর্ষির সম্মত "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধি হইতে পারে না। তাই মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষাপ্রসঙ্গে ঐ পরীক্ষা পরিশোধনের জন্য এখানে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনানাত্ব মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

সূত্র। নানেকলক্ষণৈরেকভাবনিষ্পত্তেঃ ॥৩৫॥৩৭৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই নানা নহে। কারণ, অনেক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট একটি ভাবের (কুম্ভাদি এক একটি পদার্থের) উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। "অনেকলক্ষণৈ"[১]রিতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। গন্ধাদিভিশ্চ গুণৈর্ব্বুধ্নাদিভিশ্চাবয়বৈঃ সম্বদ্ধ একো ভাবো নিষ্পদ্যতে। গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমবয়বাতিরিক্তশ্চাবয়বীতি। বিভক্তন্যায়ঞ্চৈতদুভয়মিতি।

অনুবাদ। "অনেকলক্ষণৈঃ" এই বাক্যে মধ্যপদলোপী সমাস (অর্থাৎ সূত্রে "অনেকলক্ষণ" এই বাক্য অনেকবিধ লক্ষণ এই অর্থে "বিধা" শব্দের লোপ হওয়ায় মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস)। গন্ধ প্রভৃতি গুণের দ্বারা এবং বুধ্ন প্রভৃতি

১। এখানে "অনেকবিধলক্ষণৈঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, সূত্রে "অনেক-লক্ষণৈঃ" এইরূপ পাঠই আছে। উহার ব্যাখ্যা "অনেকবিধলক্ষণৈঃ"। উদ্দ্যোতকরও লিখিয়াছেন, "অনেকলক্ষণৈ-রিতি মধ্যপদলোপী সমাসোহনেকবিধলক্ষণৈ"রিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

অবয়বের দ্বারা সম্বদ্ধ একটি ভাব অর্থাৎ কুম্ভ প্রভৃতি এক একটি অবয়বী উৎপন্ন হয়। গুণ হইতে ভিন্ন দ্রব্য এবং অবয়ব হইতে ভিন্ন অবয়বী, এই উভয়, বিভক্তন্যায়ই অর্থাৎ দ্রব্য যে গুণ হইতে ভিন্ন এবং অবয়বী যে, অবয়ব হইতে ভিন্ন, এই উভয় বিষয়ে ন্যায় (যুক্তি) পূর্ব্বেই বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কুম্ভ প্রভৃতি নানা নহে। কারণ, অনেক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট কুম্ভ প্রভৃতি এক একটি অবয়বী দ্রব্যেরই উৎপত্তি হয়। সূত্রে "অনেকলক্ষণৈঃ" এই বাক্যে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তিই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এই সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা কুম্ভ প্রভৃতি দ্রব্যের গন্ধ প্রভৃতি গুণ এবং বুধ্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়বকে গ্রহণ করিয়া সূত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গুণ হইতে গুণী দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন, এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন। তাৎপর্য্য এই যে, কুম্ভের গন্ধ প্রভৃতি গুণ এবং নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়ব হইতে কুম্ভ একেবারেই ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং কুম্ভ কখনও ঐ গন্ধাদি গুণ ও নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়বের সমষ্টি হইতে পারে না। ঐ গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট ও নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট কুম্ভ নামে একটি পৃথক্ দ্রব্যই উৎপন্ন হওয়ায় উহা নানা পদার্থ হইতে পারে না। গুণ হইতে গুণী দ্রব্য যে, ভিন্ন পদার্থ এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য যে, ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি পূর্ব্বেই বিভক্ত (ব্যাখ্যাত) হইয়াছে। সুতরাং কুম্ভাদি পদার্থকে গন্ধাদি গুণ ও বুধ্ন প্রভৃতি অবয়ব হইতে অভিন্ন বলিয়া ঐ সমস্ত পদার্থই নানা, এইরূপ সিদ্ধান্ত বলা যায় না। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৩৬শ সূত্রের ভাষ্যে বিস্তৃত বিচার করিয়া অবয়ব হইতে অবয়বী ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা গন্ধাদি গুণ হইতে কুম্ভাদি দ্রব্য যে, অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। গন্ধ, রস ও স্পর্শ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। কুম্ভাদি দ্রব্য গন্ধাদিস্বরূপ হইলে চক্ষুর্গ্রাহ্য হইতে পারে না। গন্ধাদি গুণের আশ্রয় পৃথক্ না থাকিলে আশ্রয়ের ভেদবশতঃ ঐ সমস্ত গুণের ভেদ ও উৎকর্ষাপকর্ষও হইতে পারে না। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে মহর্ষির "অর্থ"পরীক্ষার দ্বারাও গুণ হইতে গুণের আশ্রয় দ্রব্য ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রথম আহ্নিকের ১৪শ সূত্রের "পৃথিব্যাদিগুণাঃ" এই বাক্যের "পৃথিব্যাদীনাং···গুণাঃ" এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকার ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। লক্ষণব্যবস্থানাদেবাপ্রতিষেধঃ ॥৩৬॥৩৭৯॥

অনুবাদ। পরন্তু লক্ষণের অর্থাৎ সংজ্ঞাশব্দের ব্যবস্থাবশতঃই প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ এক কোন পদার্থ নাই, এই প্রতিষেধ অযুক্ত।

ভাষ্য। ন কশ্চিদেকো ভাব ইত্যযুক্তঃ প্রতিষেধঃ। কস্মাৎ ?

লক্ষণব্যবস্থানাদেব। যদিহ লক্ষণং ভাবস্য সংজ্ঞাশব্দভূতং তদেকস্মিন্ ব্যবস্থিতং, 'যং কুম্ভমদ্রাক্ষং তং স্পৃশামি, যমেবাস্পার্ক্ষং তং পশ্যামী'তি। নাণুসমূহো গৃহ্যত ইতি। অণুসমূহে চাগৃহ্যমাণে যদ্‌গৃহ্যতে তদেকমেবেতি।

অনুবাদ। এক কোন ভাব (পদার্থ) নাই, এই প্রতিষেধ অযুক্ত। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) লক্ষণের ব্যবস্থাবশতঃই। বিশদার্থ এই যে, এই জগতে ভাবের অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের সংজ্ঞাশব্দভূত যে লক্ষণ, তাহা এক পদার্থে ব্যবস্থিত। 'যে কুম্ভকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিতেছি, যাহাকেই স্পার্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিতেছি।' পরমাণুসমূহ গৃহীত হয় না। পরমাণুসমূহ গৃহ্যমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিষয় না হওয়ায় যাহা গৃহীত হয়, তাহা একই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা পদার্থের একত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না, অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থই এক নহে, সকল পদার্থই নানা, ইহা বলিতে পারেন না। কারণ, পদার্থের সংজ্ঞাশব্দরূপ যে "লক্ষণ"কে তিনি সমূহবাচক বলিয়াছেন, ঐ "লক্ষণে"র ব্যবস্থাই আছে, অর্থাৎ উহার একপদার্থবাচকত্বের নিয়মই আছে। সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ এখানে সংজ্ঞাশব্দ। "ব্যবস্থান" শব্দের অর্থ একপদার্থবাচকত্বের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পদার্থের সংজ্ঞাশব্দরূপ যে লক্ষণ, তাহা এক পদার্থেই ব্যবস্থিত অর্থাৎ এক পদার্থেরই বাচক। সমূহ বা সমষ্টিরূপ নানা পদার্থের বাচক নহে। কারণ, "যে কুম্ভকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিতেছি", "যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকেই দেখিতেছি", এইরূপ যে বোধ হইয়া থাকে, উহার দ্বারা কুম্ভ পদার্থ যে এক, "কুম্ভ" শব্দ যে এক অর্থেরই বাচক, ইহা বুঝা যায়। কুম্ভ পদার্থ নানা হইলে "যে সমস্ত পদার্থ দেখিয়াছিলাম, সেই সমস্ত পদার্থকে স্পর্শ করিতেছি", ইত্যাদি প্রকারই বোধ হইত। পরন্তু কুম্ভগত রস ও স্পর্শাদিও কুম্ভ পদার্থ হইলে তাহার দর্শন হইতে পারে না, এবং কুম্ভগত রূপ, রস ও গন্ধও কুম্ভ পদার্থ হইলে তাহার স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, রসাদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, রূপাদিও ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি রূপাদিসমষ্টিকেই কুম্ভপদার্থ বলেন, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ বোধের অপলাপ করিতে হয়। সুতরাং চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কুম্ভ পদার্থ যে, রূপাদিসমষ্টি নহে, উহা রূপাদি হইতে পৃথক্ একটি দ্রব্য, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "কুম্ভ" শব্দ যে এক পদার্থেরই বাচক, উহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত সমূহ বা সমষ্টিরূপ নানা পদার্থের বাচক নহে, ইহাও স্বীকার্য্য। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদী যে হেতুর দ্বারা সকল পদার্থের নানাত্ব সিদ্ধ করিতে চাহেন, ঐ হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি হইতেই পারে না। পরন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী কুম্ভাদি সকল পদার্থকেই পরমাণুসমষ্টি বলিয়াছেন, তাঁহার

মতে রূপাদিও পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহা হইলে কুম্ভাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক পরমাণু যখন অতীন্দ্রিয়, তখন উহার সমষ্টিও অতীন্দ্রিয়ই হইবে, প্রত্যেক পরমাণু হইতে উহার সমষ্টি কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বিপ্রকরণে ভাষ্যকার বিশদ বিচারপূর্ব্বক পরমাণুসমষ্টির যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন যদি পরমাণুসমষ্টি প্রত্যক্ষের বিষয়ই না হয়, তাহা হইলে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা যে, পরমাণুসমষ্টি নহে, কিন্তু তদ্ভিন্ন একটি পদার্থ, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। "কুম্ভ" নামক পদার্থের প্রত্যক্ষ, যাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বীকার করেন, তাহার উপপাদন করিতে হইলে কুম্ভকে একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সূত্রোক্ত "লক্ষণব্যবস্থা" বুঝাইতে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "কুম্ভ" এইরূপ প্রয়োগে সর্ব্বত্রই উহার দ্বারা বহু পদার্থ বুঝা গেলে অর্থাৎ "কুম্ভ" শব্দ বহু অর্থেরই বাচক হইলে কুত্রাপি "কুম্ভ" শব্দের উত্তর একবচনের প্রয়োগ হইতে পারে না, সর্ব্বত্রই "কুম্ভাঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে সর্ব্বত্রই "কুম্ভ" শব্দের দ্বারা নানা পদার্থের সমষ্টি বুঝা যায়। পরন্তু "কুম্ভমানয়" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া একটি কুম্ভ আনয়নের জন্যও লোক প্রেরণ করা হয় এবং ঐ স্থলে ঐ বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তিও ঐ "কুম্ভ" শব্দের দ্বারা "কুম্ভ" নামক একটি পদার্থ ই বুঝিয়া থাকে। ঐ কুম্ভ যে, একটি পদার্থ নহে, উহা নানা পদার্থের সমষ্টি, সুতরাং নানা, ইহা বুঝে না। তাহা বুঝিলে এক কুম্ভ, এইরূপ বোধ হইত না। যাহা বস্তুতঃ এক নহে, তাহাকে এক বলিয়া বুঝিলে ভ্রমাত্মক বোধ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু "এক কুম্ভ" এইরূপ সার্ব্বজনীন প্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া এবং "এক কুম্ভ" এইরূপ প্রয়োগকে গৌণ প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষবিষয়তাবশতঃ কুম্ভ যে নানা পদার্থের সমষ্টি নহে, উহা পৃথক্ একটি অবয়বী, এই বিষয়েই প্রমাণ আছে।

মহর্ষি এই প্রকরণে তিন সূত্রেই একই অর্থে "লক্ষণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয় এবং "লক্ষণ" শব্দের একই অর্থ গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় প্রথম সূত্র ও তৃতীয় সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ সংজ্ঞাশব্দ। যাহার দ্বারা পদার্থ লক্ষিত অর্থাৎ বোধিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা সংজ্ঞাশব্দ অর্থাৎ নাম বুঝা যাইতে পারে। এবং যাহা পদার্থকে লক্ষিত অর্থাৎ বিশেষিত করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা পদার্থের গুণ এবং অবয়বও বুঝা যাইতে পারে। দ্বিতীয় সূত্রে এই অর্থেই "লক্ষণ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, দ্বিতীয় সূত্রে "অনেকলক্ষণৈঃ" এই বাক্যে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞাশব্দ বুঝিলে অনেকবিধ সংজ্ঞাশব্দবিশিষ্ট একটি পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু ঐরূপ অর্থ কোনরূপেই সংগত হয় না। পরন্তু সর্ব্বনানাত্ববাদী সমস্ত পদার্থের সমস্ত সংজ্ঞাশব্দই সমূহবাচক বলিয়া প্রথমে ঐ হেতুর দ্বারাই নিজমত সমর্থন করায় ভাষ্যকার প্রথম সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা সংজ্ঞাশব্দরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়া "ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং তৃতীয় সূত্রের দ্বারা উক্ত

হেতুরই অসিদ্ধতার ব্যাখ্যা করিতে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত "ভাবলক্ষণ"ই অর্থাৎ পদার্থের সংজ্ঞাশব্দরূপ অর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্য। অথাপ্যেতদনুক্তং,[1] নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমুদায়ঃ। একানুপপত্তের্নাস্ত্যেব সমূহঃ। নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমূহে ভাবশব্দ-প্রয়োগঃ, একস্য চানুপপত্তেঃ সমূহো নোপপদ্যতে, একসমুচ্চয়ো হি সমূহ ইতি ব্যাহতত্বাদনুপপন্নং—নাস্ত্যেকো ভাব ইতি। যস্য প্রতিষেধঃ প্রতিজ্ঞায়তে 'সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগা'দিতি হেতুং ব্রুবতা স এবাভ্যনু-জ্ঞায়তে, একসমুচ্চয়ো হি সমূহ ইতি। 'সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগা'দিতি চ সমূহমাশ্রিত্য প্রত্যেকং সমূহিপ্রতিষেধো নাস্ত্যেকো ভাব ইতি। সোঽয়মুভয়তো ব্যাঘাতাদ্‌যৎকিঞ্চনবাদ ইতি।

অনুবাদ। পরন্তু ইহা (বৌদ্ধ কর্ত্তৃক) পশ্চাৎ উক্ত হইয়াছে, "এক পদার্থ নাই, যেহেতু সমুদায়" অর্থাৎ পদার্থমাত্রই সমুদায় বা সমষ্টিরূপ, অতএব কোন পদার্থ ই এক নহে। (খণ্ডন) একের উপপত্তি অর্থাৎ সত্তা না থাকায় সমূহ নাই। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) এক পদার্থ নাই, যেহেতু সমূহে অর্থাৎ গুণাদির সমষ্টি বুঝাইতে ভাববোধক শব্দের প্রয়োগ হয়। (খণ্ডন) কিন্তু (পূর্ব্বোক্ত মতে) এক পদার্থের সত্তা না থাকায় সমূহ (সমষ্টি) উপপন্ন হয় না; কারণ, এক পদার্থের সমষ্টিই সমূহ, অতএব ব্যাঘাতবশতঃ "এক পদার্থ নাই" ইহা উপপন্ন হয় না। (ব্যাঘাত বুঝাইতেছেন) যে এক পদার্থের প্রতিষেধ (অভাব) প্রতিজ্ঞাত হইতেছে, "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ" এই হেতুবাক্য বলিয়া সেই এক পদার্থই স্বীকৃত হইতেছে; কারণ, একের সমষ্টিই সমূহ। পরন্তু "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ"—এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমূহকে আশ্রয় করিয়া "নাস্ত্যেকো ভাবঃ"—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রত্যেক সমূহীর অর্থাৎ ব্যষ্টির প্রতিষেধ করা হইতেছে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মত উভয়তঃ ব্যাঘাত (বিরোধ)বশতঃ অর্থাৎ যেমন প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ, তদ্রূপ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধবশতঃ যৎকিঞ্চিদ্‌বাদ, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ মত।

১। অথাপ্যেতদনুক্তমিতি। অপিচ "ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বা"দিতি হেতুমুক্ত্বা বৌদ্ধেন পশ্চাদেতদুক্তং, কিং তদুক্তমিত্যত আহ "নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমুদায় ইতি। এতদনুক্তং দূষয়তি "একানুপপত্তের্নাস্ত্যেব সমূহ" ইতি। অনুক্তং বিবৃণোতি "নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগ" ইতি। অস্য দূষণং বিবৃণোতি "একস্যানুপ-পত্তে"রিতি। এতৎ প্রপঞ্চয়তি "একসমূহো হীতি"।—তাৎপর্য্যটীকা।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মত যে, সর্ব্বথা অনুপপন্ন, উহা অতি তুচ্ছ মত, ইহা বুঝাইতে নিজে স্বতন্ত্রভাবে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মতবাদী বৌদ্ধবিশেষ "ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ"—এই হেতুবাক্য বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমুদায়ঃ"। অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত পদার্থই সমষ্টিরূপ, অতএব এক কোন পদার্থ নাই। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সমূহ বা সমষ্টি বুঝাইতেই ভাববোধক কুম্ভাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ কুম্ভাদি শব্দ, রূপাদিগুণবিশেষ ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশেষের সমূহ বা সমষ্টিই বুঝায়। উহা বুঝাইতেই কুম্ভাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। সুতরাং কুম্ভাদি পদার্থ নানা পদার্থের সমষ্টিরূপ হওয়ায়, একটি পদার্থ নহে। কারণ, যাহা সমষ্টিরূপ, তাহা বহু, তাহা কিছুতেই এক হইতে পারে না। ভাষ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে চরম কথা বলিয়াছেন যে, এক না থাকিলে সমূহও থাকে না। কারণ, একের সমষ্টিই সমূহ। অতএব ব্যাঘাতবশতঃ "এক পদার্থ নাই" এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার শেষে তাঁহার কথিত ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, এক পদার্থের অভাবকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি উহা সমর্থন করিতে "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ"—এই হেতুবাক্য বলিয়া সেই এক পদার্থই আবার স্বীকার করিতেছেন। কারণ, এক পদার্থের সমষ্টিই সমূহ। এক না থাকিলে সমূহ থাকিতে পারে না। এক একটি পদার্থ গণনা করিয়া, সেই বহু এক পদার্থের সমষ্টিকেই সমূহ বলে। উহার অন্তর্গত এক একটি পদার্থকে সমূহী অথবা ব্যষ্টি বলে। কিন্তু ব্যষ্টি না থাকিলে সমষ্টি থাকে না। সুতরাং যিনি সমূহ বা সমষ্টি মানিবেন, তিনি সমূহী অর্থাৎ ব্যষ্টিও মানিতে বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর এক পদার্থ নাই অর্থাৎ ব্যষ্টি নাই, সমস্ত পদার্থই সমষ্টিরূপ, এই কথা বলিতেই পারেন না। কারণ, তিনি "এক পদার্থ নাই" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া উহা সমর্থন করিতে যে হেতুবাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে সমূহ স্বীকার করায় এক পদার্থও স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাঁহার ঐ হেতু-বাক্যের বিরোধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারেন না। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতু যে, উভয়তঃ বিরুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাঁহার হেতুবাক্যের যেমন বিরোধ, তদ্রূপ হেতুবাক্যের সহিতও প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমূহকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সকল পদার্থকেই সমূহ বলিয়া স্বীকার করিয়া "নাস্ত্যেকো ভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রত্যেক সমূহীর অর্থাৎ ঐ সমূহনির্ব্বাহক প্রত্যেক ব্যষ্টির প্রতিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি হেতুবাক্যে সমূহ অর্থাৎ সমষ্টি স্বীকার করিয়া, উহার নির্ব্বাহক এক একটি পদার্থরূপ ব্যষ্টিও স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার ঐ হেতুবাক্যের সহিতও তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের উভয়তঃ বিরোধবশতঃ তিনি উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার ঐ মত তাঁহার নিজের কথার দ্বারাই খণ্ডিত হওয়ায় উহা অতি তুচ্ছ মত। বস্তুতঃ কুম্ভাদি পদার্থের একত্ব কাল্পনিক, নানাত্বই বাস্তব, এই মতে কোন পদার্থেই একত্বের যথার্থ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় একত্বের ভ্রম জ্ঞানও সম্ভব হয় না। পরন্তু যে

বৌদ্ধসম্প্রদায় কুম্ভাদি পদার্থকে পরমাণুসমষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে পরমাণুর একত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, পরমাণুও রূপাদির সমষ্টি, ইহা বলিলে ঐ পরমাণুতে যে রূপ আছে, তাহা কিসের সমষ্টি, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু পরমাণুর রূপ বা পরমাণুকে সমষ্টি বলা যায় না। কারণ, ঘটাদি পদার্থকে বিভাগ করিতে গেলে কোন এক স্থানে উহার বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, বৃহৎ বৃহত্তর প্রভৃতি নানাবিধ ঘটের ভেদবুদ্ধি হইতে পারে না। সমস্ত ঘটই যদি সমষ্টিরূপ হয় এবং উহার মূল পরমাণুও যদি সমষ্টিরূপ হয়, তাহা হইলে সমস্ত ঘটই অনন্ত পদার্থের সমষ্টি হওয়ায় ঘটের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে না। সুতরাং ঘটের অবয়ব বিভাগ করিতে যাইয়া যে পরমাণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে, ঐ পরমাণু যে, সমষ্টিরূপ নহে, উহার প্রত্যেক পরমাণুতে বাস্তব একত্বই আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং সকল পদার্থই সমষ্টিরূপ নানা, এই মত কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বপৃথক্ত্বনিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

———o———

ভাষ্য। অয়মপর একান্তঃ—

অনুবাদ। ইহা অপর একান্তবাদ—

সূত্র। সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ॥৩৭॥৩৮০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সকল পদার্থই অভাব অর্থাৎ অসৎ বা অলীক, কারণ, ভাবসমূহে (গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থে) পরস্পরাভাবের সিদ্ধি (জ্ঞান) হয়।

ভাষ্য। যাবদ্ভাবজাতং তৎ সর্ব্বমভাবঃ, কস্মাৎ? ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ। 'অসন্ গৌরশ্বাত্মনা', 'অনশ্বো গৌঃ', 'অসন্নশ্বো গবাত্মনা', 'অগৌরশ্ব' ইত্যসৎপ্রত্যয়স্য প্রতিষেধস্য চ ভাবশব্দেন সামানাধিকরণ্যাৎ সর্ব্বমভাব ইতি।

অনুবাদ। যে সমস্ত ভাবসমূহ অর্থাৎ "প্রমাণ" "প্রমেয়" প্রভৃতি নামে সৎ-পদার্থ বলিয়া যে সমস্ত কথিত হয়, সেই সমস্তই অভাব অর্থাৎ অসৎ বা অলীক, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভাবসমূহে অর্থাৎ ভাব বলিয়া কথিত পদার্থ-সমূহে পরস্পরাভাবের জ্ঞান হয়। (তাৎপর্য্য) 'গো অশ্বস্বরূপে অসৎ', 'গো অশ্ব নহে', 'অশ্ব গোস্বরূপে অসৎ', 'অশ্ব গো নহে', এই প্রকারে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির এবং "প্রতিষেধে"র অর্থাৎ "অসৎ" এই প্রতিষেধক শব্দের—ভাববোধক

শব্দের ("গো" "অশ্ব" প্রভৃতি শব্দের) সহিত সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত সমস্তই অর্থাৎ ভাব বলিয়া কথিত সমস্ত পদার্থই অভাব।

টিপ্পনী। সমস্ত পদার্থই অসৎ অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, এই মতবিশেষও অপর একটি "একান্তবাদ"। এই মত সিদ্ধ হইলে আত্মাও অসৎ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আত্মার "প্রেত্যভাব"ও কোন বাস্তব পদার্থ হয় না, পরন্তু উক্ত মতে "প্রেত্যভাব"ও অসৎ বা অলীক। তাই মহর্ষি প্রেত্যভাবের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে এখানে অত্যাবশ্যকবোধে পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন, "সর্ব্বমভাবঃ"। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে এখানে "অভাব" বলিতে অসৎ অর্থাৎ অলীক। যাহার সত্তা নাই, তাহাকেই অলীক বলে। "প্রমাণ", "প্রমেয়" প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ সৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহা সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অলীক। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত মতকে শূন্যতাবাদীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই মতে সকল পদার্থের শূন্যতাই বাস্তব—সত্তা বাস্তব নহে, অবাস্তব কল্পনাবশতঃই সকল পদার্থ সতের ন্যায় প্রতীত হয়, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সকল পদার্থই অলীক বলিয়াছেন, যাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থই বাস্তব নহে, তাঁহারা শূন্যতাকে কিরূপে বাস্তব বলিবেন, এবং কোন পদার্থই সৎ না থাকিলে সতের ন্যায় প্রতীতি কিরূপে বলিবেন, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩১শ সূত্রের ভাষ্যভামতীতে শূন্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে, এবং সৎ ও অসৎ, এই উভয় প্রকারও নহে এবং সৎ ও অসৎ এই উভয় ভিন্ন অন্য প্রকারও নহে। অর্থাৎ কোন বস্তুই পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারেই বিচারসহ নহে। অতএব সর্ব্বথা বিচারাসহত্বই বস্তুর তত্ত্ব। "মাধ্যমিককারিকাতে"ও আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, এইরূপ কথা পাওয়া যায়। (তৃতীয় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বপ্রকরণে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতের বিচার করিয়া, এই প্রকরণে সর্ব্বনাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতেরই বিচার করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বশূন্যতাবাদই তিনি এই প্রকরণে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। এই সর্ব্বশূন্যতাবাদের অপর নাম অসদ্‌বাদ। পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদ ও অসদ্‌বাদ একই মত নহে। কারণ, অসদ্‌বাদে সকল পদার্থই অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদে কোন বস্তুই (১) সৎ, (২) অসৎ, (৩) সদসৎ, (৪) এবং সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহার কোন পক্ষেই ব্যবস্থিত নহে। উক্তরূপ শূন্যবাদের বিশেষ বিচার বাৎস্যায়নভাষ্যে পাওয়া যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত অসদ্‌বাদ সমর্থন করিতেন। তাহার অনেক পরে কোন সম্প্রদায় সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার শূন্যবাদই সমর্থন করেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সময়ে পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদের প্রচার থাকিলে তিনি বৌদ্ধ মতের আলোচনায় অবশ্যই বিশেষরূপে ঐ মতেরও উল্লেখ ও খণ্ডন করিতেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ২৬শ সূত্র হইতে বৌদ্ধ মতের যে বিচার করিয়াছেন, সেখানে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব। এখানে ন্যায়সূত্রে যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদ বা অসদ্‌বাদের উল্লেখ হইয়াছে, ইহা কোন বৌদ্ধসম্প্রদায় পরে সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিলেও

উহা তাঁহাদিগেরই প্রথম উদ্‌ভাবিত মত নহে। সুপ্রাচীন কালে অন্য নাস্তিকসম্প্রদায়ই পূর্ব্বোক্ত অসদ্‌বাদের সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়েও অন্যান্য বক্তব্য দ্বিতীয় আহ্নিকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে বলিব।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি গোতম প্রথমে "সর্ব্বমভাবঃ" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মত প্রকাশ করিয়া, উহার সাধক হেতুবাক্য বলিয়াছেন, "ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ"। গো অশ্ব প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ভাব অর্থাৎ সৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহাই এখানে "ভাব" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। "ইতরেতরাভাব" শব্দের অর্থ পরস্পরের অভাব। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, "গো অশ্ব নহে" এইরূপে যেমন গোকে অশ্বের অভাব বলিয়া বুঝা যায়, তদ্রূপ "অশ্ব গো নহে" এইরূপে অশ্বকেও গোর অভাব বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং গো অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই পরস্পরের অভাবরূপ হওয়ায় অসৎ। এই মতে অভাব বলিতে তুচ্ছ অর্থাৎ অলীক। অভাব বলিয়া সিদ্ধ হইলেই তাহা অলীক হইবে। কারণ, অভাবের সত্তা নাই; যাহার সত্তা নাই, তাহাই "অভাব" শব্দের অর্থ। এই মতে অভাব বা অসতের জ্ঞান হয়। কিন্তু ঐ জ্ঞানও অসৎ। সমস্ত বস্তুই অসৎ, এবং তাহার জ্ঞানও অসৎ, এবং তন্মূলক ব্যবহারও অসৎ, জগতে সৎ কিছুই নাই, সমস্তই অভাব বা অসৎ।

ভাষ্যকার মহর্ষির হেতুবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে গো পদার্থ সৎ বলিয়া কথিত হয়, উহা অশ্বস্বরূপে অসৎ এবং গো অশ্ব নহে। এইরূপ যে অশ্ব পদার্থ সৎ বলিয়া কথিত হয়, উহাও গোস্বরূপে অসৎ, এবং অশ্ব গো নহে। এইরূপে ভাব-বোধক "গো" "অশ্ব" প্রভৃতি শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির এবং "অসৎ" ও "অনশ্ব" "অগো" ইত্যাদি প্রতিষেধক শব্দের সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত ঐ সমস্ত পদার্থই "অসৎ", ইহা প্রতিপন্ন হয়। বিভিন্নার্থক শব্দের একই অর্থে প্রবৃত্তিকে প্রাচীনগণ শব্দদ্বয় বা পদদ্বয়ের "সামানাধিকরণ্য" নামে উল্লেখ করিয়াছেন[১]। যেখানে পদার্থদ্বয়ের অভেদদ্যোতক অভিন্নার্থক বিভক্তির প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে ঐ একার্থক বিভক্তিমত্ত্বও "সামানাধিকরণ্য" নামে কথিত হইয়াছে। যেমন "নীলো ঘটঃ" এই বাক্যে "নীল" শব্দ ও "ঘট" শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় "ঘট" শব্দের সহিত "নীল" শব্দের "সামানাধিকরণ্য" কথিত হইয়াছে। ঐ "সামানাধিকরণ্য" প্রযুক্ত ঐ স্থলে নীল পদার্থ ও ঘট পদার্থের অভেদ বুঝা যায়। কারণ, উক্ত বাক্যে "নীল" শব্দ ও "ঘট" শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগবশতঃ ঘট—নীলরূপবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। এইরূপ "অসন্ গৌঃ" ইত্যাদি বাক্যে "অসৎ" শব্দ ও "গো" প্রভৃতি শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় "গো" প্রভৃতি শব্দের সহিত "অসৎ" শব্দের যে "সামানাধিকরণ্য" আছে, তৎপ্রযুক্ত "অসৎ" ও গো প্রভৃতি পদার্থ যে অভিন্ন পদার্থ, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সকল পদার্থই অসৎ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, গো অশ্বরূপে এবং অশ্ব গোরূপে, ঘট, পটরূপে, পট ঘটরূপে, ইত্যাদি প্রকারে অন্যরূপে সকল পদার্থই অসৎ, এইরূপ প্রতীতির বিষয়

১। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে প্রবৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং।—বেদান্তসারের টীকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হইলে সকল পদার্থকেই অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে ভাব-বোধক "গো" প্রভৃতি শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য বলিয়া তৎপ্রযুক্ত গো প্রভৃতি পদার্থকে "অসৎ" বলিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার এখানে "সামানাধিকরণ্য" বলিয়াছেন, অভিন্নবিভক্তিমত্ত্ব। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিন্নার্থক বিভক্তিমত্ত্ব। এবং তিনি গো প্রভৃতি ভাববোধক শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি ও "অসৎ" শব্দ, এই উভয়েরই "সামানাধিকরণ্য" বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, "অসন্ গৌঃ" এইরূপ প্রয়োগে "গো" শব্দ ও "অসৎ" শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগবশতঃই যখন "গো অসৎ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন ঐ জন্যই ঐরূপ স্থলে "গো" শব্দের সহিত "অসৎ" শব্দের ন্যায় "অসৎ" এইরূপ প্রতীতিরও "সামানাধিকরণ্য" কথিত হয়। এবং ঐ জন্য "নীলো ঘটঃ" এইরূপ প্রয়োগেও "ঘট" শব্দের সহিত "নীল" শব্দের ন্যায় "নীল" এইরূপ প্রতীতিরও "সামানাধিকরণ্য" কথিত হয়। ভাষ্যকার "অসন্ গৌরশ্বাত্মনা" এই বাক্যের দ্বারা "গো" শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির "সামানাধিকরণ্য" প্রদর্শন করিয়া, পরে "অনশ্বো গৌঃ" এই বাক্যের দ্বারা "গো" শব্দের সহিত "অনশ্ব" এই প্রতিষেধের সামানাধিকরণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "অসন্নশ্বো গবাত্মনা" এই বাক্যের দ্বারা "অশ্ব" শব্দের সহিত "অসৎ" এই প্রতীতির সামানাধিকরণ্য প্রদর্শন করিয়া, পরে "অগৌরশ্বঃ" এই বাক্যের দ্বারা "অশ্ব" শব্দের সহিত "অগো" এই প্রতিষেধের "সামানাধিকরণ্য" প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা প্রতিষেধক অর্থাৎ অভাবপ্রতিপাদক শব্দই বিবক্ষিত। "অনশ্ব" এবং "অগো" এই দুইটি শব্দ পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অশ্ব নহে" এবং "গো নহে" এইরূপে অশ্ব ও গোর অভাবপ্রতিপাদক হওয়ায় ঐ শব্দদ্বয়কে "প্রতিষেধ" বলা যায়। "গো" শব্দের সহিত "অনশ্ব" শব্দের এবং "অশ্ব" শব্দের সহিত "অগো" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত "অনশ্বো গৌঃ" এই বাক্যের দ্বারা গো অশ্বের অভাবাত্মক, এবং "অগৌরশ্বঃ" এই বাক্যের দ্বারা অশ্ব গোর অভাবা-ত্মক, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত শব্দের সহিতই পূর্ব্বোক্তরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য এবং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিষেধের সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত সমস্ত শব্দই অভাব-বোধক, ইহা বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে "ঘটো নাস্তি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়। সেইখানে ঘট শব্দ "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি এবং "নাস্তি" এই প্রতিষেধের সমানাধিকরণ হওয়ায় যেমন ঘটের অত্যন্ত অসত্তার প্রতিপাদক হয়, তদ্রূপ অন্যান্য সমস্ত শব্দই "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি এবং "অনশ্ব" "অগো" ইত্যাদি প্রতিষেধের সমানাধিকরণ হওয়ায় অভাবের প্রতিপাদক হয়, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই অভাবের বোধক, সমস্ত শব্দের অর্থই অভাব, সুতরাং সমস্ত পদার্থই অভাব অর্থাৎ অসৎ বা অলীক। তাৎপর্য্যটীকাকার অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বার্ত্তিককারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন[১]। পরন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত মতের বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থ স্বীকার করিতে হইলে ঐ

১। প্রয়োগশ্চ—সর্ব্বে ভাবশব্দা অসদ্বিষয়াঃ, অসৎপ্রত্যয়প্রতিষেধাভ্যাং সামানাধিকরণ্যাৎ, অনুৎপন্নপ্রধ্বস্তপট-শব্দবৎ।—তাৎপর্য্যটীকা।

সকল পদার্থ নিত্য, কি অনিত্য, ইহা বলিতে হইবে। নিত্য বলিলে সত্তা থাকিতে পারে না। কারণ, কার্য্যকারিত্বই সত্তা। যে পদার্থ কোন কার্য্যকারী হয় না, তাহাকে "সৎ" বলা যায় না। কিন্তু যাহা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহার সর্ব্বদা বিদ্যমানতাবশতঃ ক্রমিকত্ব সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য কার্য্যের ক্রমিকত্ব সম্ভব হয় না অর্থাৎ নিত্য পদার্থ কার্য্যকারী বা কার্য্যের জনক বলিলে সর্ব্বদাই কার্য্য জন্মিতে পারে। সুতরাং নিত্য পদার্থের কার্য্যকারিত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহাকে সৎ বলা যায় না। আর যদি সৎপদার্থ স্বীকার করিয়া সকল পদার্থকে অনিত্যই বলা হয়, তাহা হইলে বিনাশ উহার স্বভাব বলিতে হইবে, নচেৎ কোন দিনই উহার বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, যাহা পদার্থের স্বভাব নহে, তাহা কেহ করিতে পারে না। নীলকে সহস্র কারণের দ্বারাও কেহ পীত করিতে পারে না। কারণ, পীত, নীলের স্বভাব নহে। সুতরাং অনিত্য পদার্থকে বিনাশ-স্বভাব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ অনিত্য পদার্থের উৎপত্তিক্ষণেও উহার বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ বিনাশকে উহার স্বভাব বলা যায় না। কারণ, যাহা স্বভাব, তাহা উহার আধারের অস্তিত্বকালে প্রতিক্ষণেই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং যদি অনিত্য পদার্থের উৎপত্তিক্ষণ হইতে প্রতিক্ষণেই উহার বিনাশরূপ স্বভাব স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা উহার অসত্তাই স্বীকৃত হইবে; কোন পদার্থকেই কোন কালেই সৎ বলা যাইবে না। অতএব শূন্যতা বা অভাবই সকল পদার্থের বাস্তব তত্ত্ব, সকল পদার্থই পরমার্থতঃ অসৎ, কিন্তু অবাস্তব কল্পনাবশতঃ সতের ন্যায় প্রতীত হয়। এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারা "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ব্যাখ্যাত শূন্যবাদ হইতে উক্ত সর্ব্বশূন্যতাবাদ যে, তাঁহার মতেও পৃথক্ মত, ইহা বুঝা যায়। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রভাষ্যে বিতণ্ডাপরীক্ষায় ভাষ্যকার শেষে উক্ত সর্ব্বশূন্যতাবাদীর মতই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে তাঁহার ব্যাখ্যাত শূন্যবাদীর মতানুসারেই ভাষ্যতাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥৩৭॥

ভাষ্য। **প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদয়োঃ প্রতিজ্ঞাহেত্বোশ্চ ব্যাঘাতাদযুক্তং।**

অনেকস্যাশেষতা সর্ব্বশব্দস্যার্থো ভাবপ্রতিষেধশ্চাভাবশব্দার্থঃ। পূর্ব্বং সোপাখ্যমুত্তরং নিরুপাখ্যং, তত্র সমুপাখ্যায়মানং কথং নিরুপাখ্যমভাবঃ স্যাদিতি, ন জাত্বভাবো নিরুপাখ্যোঽনেকতয়াঽশেষতয়া শক্যঃ প্রতিজ্ঞাতুমিতি। সর্ব্বমেতদভাব ইতি চেৎ? যদিদং সর্ব্বমিতি মন্যসে তদভাব ইতি, এবঞ্চেদনিবৃত্তো ব্যাঘাতঃ, অনেকমশেষঞ্চেতি নাভাবে প্রত্যয়েন শক্যং ভবিতুং, অস্তি চায়ং প্রত্যয়ঃ সর্ব্বমিতি, তস্মান্নাভাব ইতি।

প্রতিজ্ঞাহেত্বোশ্চ ব্যাঘাতঃ "সর্ব্বমভাবঃ" ইতি ভাবপ্রতিষেধঃ প্রতিজ্ঞা, "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধে"রিতি হেতুঃ। ভাবেম্বিতরেতরাভাব-

মনুজ্ঞায়াশ্রিত্য চেতরেতরাভাবসিদ্ধ্যা "সর্ব্বমভাব" ইত্যুচ্যতে,—যদি "সর্ব্বমভাবঃ", "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধে"রিতি নোপপদ্যতে,—অথ "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধিঃ', 'সর্ব্বমভাব' ইতি নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। (উত্তর) প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের এবং প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের বিরোধবশতঃ (পূর্বোক্ত মত) অযুক্ত। (প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের বিরোধ বুঝাইতেছেন) অনেক পদার্থের অশেষত্ব "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ। ভাবের প্রতিষেধ "অভাব" শব্দের অর্থ। পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথমোক্ত "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ—সোপাখ্য অর্থাৎ সস্বরূপ সৎ, উত্তর অর্থাৎ শেষোক্ত "অভাব" শব্দের অর্থ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ অলীক। তাহা হইলে সমুপাখ্যায়মান অর্থাৎ সস্বরূপ পদার্থ কিরূপে নিঃস্বরূপ অভাব হইবে? কখনও নিঃস্বরূপ অভাবকে অনেকত্ব ও অশেষত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারা যায় না। (পূর্ব্বপক্ষ) এই সমস্ত অভাব, ইহা যদি বল? (বিশদার্থ) এই যাহাকে সর্ব্ব বলিয়া মনে কর,—অর্থাৎ সর্ব্ব বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা অভাব, (উত্তর) এইরূপ যদি বল, (তাহা হইলেও) বিরোধ নিবৃত্ত হয় না। (কারণ) অভাবে অর্থাৎ অসৎ বিষয়ে "অনেক" এবং "অশেষ",—এইরূপ বোধ হইতে পারে না। কিন্তু "সর্ব্ব" এইরূপ বোধ আছে, অর্থাৎ ঐরূপ বোধ সর্ব্বসম্মত,—অতএব (সর্ব্বপদার্থই) অভাব নহে।

প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যেরও বিরোধ। (এই বিরোধ বুঝাইতেছেন) "সর্ব্বমভাবঃ" এই ভাব-প্রতিষেধ-বাক্য প্রতিজ্ঞা, "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ" এই বাক্য হেতু। ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাব স্বীকার করিয়া এবং আশ্রয় করিয়া পরস্পরাভাবের সিদ্ধিপ্রযুক্ত "সকল পদার্থই অভাব" ইহা কথিত হইতেছে—(কিন্তু) যদি সকল পদার্থই অভাব হয়, তাহা হইলে ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধি হয়, ইহা অর্থাৎ এই হেতু উপপন্ন হয় না,—আর যদি ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই অভাব, ইহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষিসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে এখানেই ঐ পূর্ব্বপক্ষের সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রদর্শনের জন্য নিজে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব" পদ এই দুইটি পদের ব্যাঘাত এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যেরও ব্যাঘাতবশতঃ তাঁহার ঐ মত অযুক্ত। প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব"

পদের ব্যাঘাত বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনেক পদার্থের অশেষত্ব "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ[১] এবং ভাবের প্রতিষেধ "অভাব" শব্দের অর্থ। সুতরাং সর্ব্বপদার্থ সোপাখ্য, অভাব পদার্থ নিরুপাখ্য। কারণ, যে ধর্ম্মের দ্বারা পদার্থ উপাখ্যাত (লক্ষিত) হয়, অর্থাৎ পদার্থের যাহা স্বরূপলক্ষণ, তাহাকে ঐ পদার্থের উপাখ্যা বলা যায়। অনেকত্ব ও অশেষত্বরূপ ধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বপদার্থ উপাখ্যাত হইয়া থাকে। কারণ, "সর্ব্বে ঘটাঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা অশেষ ঘটই বুঝা যায়। কতিপয় ঘট বুঝাইতে "সর্ব্বে ঘটাঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয় না। সুতরাং সর্ব্বপদার্থে অনেকত্ব ও অশেষত্বরূপ ধর্ম্ম বস্তুতঃ না থাকিলে সর্ব্বপদার্থ নিরূপণ করাই যায় না। অতএব অনেকত্ব ও অশেষত্বরূপ ধর্ম্ম সর্ব্বপদার্থের উপাখ্যা হওয়ায় উহা সোপাখ্য পদার্থ। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে অভাবের বাস্তব সত্তা না থাকায় অভাব নিঃস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার মতে অভাবের কোন উপাখ্যা বা লক্ষণ না থাকায় অভাব নিরুপাখ্য। তাহা হইলে সর্ব্বপদার্থ যাহা সোপাখ্য, তাহাকে অভাব অর্থাৎ নিরুপাখ্য বলা যায় না। সস্বরূপ পদার্থ কখনই নিঃস্বরূপ হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব" পদ পরস্পর বিরুদ্ধার্থক। কারণ, সর্ব্বপদার্থ সস্বরূপ বলিয়া সৎ, অভাবপদার্থ নিঃস্বরূপ বলিয়া অসৎ। সুতরাং "সর্ব্ব" বলিলেই সৎপদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় "সর্ব্ব পদার্থ অভাব," ইহা আর বলা যায় না। তাহা বলিলে "সৎ পদার্থ সৎ নহে" এইরূপ কথাই বলা হয়। সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব" পদের বিরুদ্ধার্থকতারূপ ব্যাঘাত বা বিরোধবশতঃ ঐরূপ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিঃস্বরূপ অভাবকে অনেকত্ব ও অশেষত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, অনেকত্ব ও অশেষত্ব সর্ব্ব পদার্থের ধর্ম্ম, উহা অভাবের ধর্ম্ম নহে। কারণ, অভাবের কোন স্বরূপই নাই। সুতরাং অনেকত্ব ও অশেষত্ব যাহা সর্ব্ব পদার্থের সর্ব্বত্ব, তাহা অভাবে না থাকায় সর্ব্ব পদার্থের সহিত অভিন্নরূপে অভাব বুঝাইয়া "সর্ব্বমভাবঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, আমি ঐরূপ সর্ব্ব পদার্থ স্বীকার করি না। সুতরাং আমার নিজের মতে সর্ব্ব পদার্থ সোপাখ্য বা সস্বরূপ না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত বিরোধ নাই। আমার "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ এই যে, তোমরা যাহাকে সর্ব্ব বলিয়া বুঝিয়া থাক, অর্থাৎ তোমাদিগের মতে যাহা সস্বরূপ বা সৎ, তাহা বস্তুতঃ অভাব অর্থাৎ অসৎ। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এইরূপ বলিলেও বিরোধ নিবৃত্ত হয় না। কারণ, "সর্ব্বং" এইরূপ বোধ সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ বোধের বিষয় অনেক ও অশেষ। কিন্তু অনেক ও অশেষ বলিয়া যে বোধ জন্মে, ঐ বোধ অভাববিষয়ক নহে। অভাব বা অসৎ বিষয়ে ঐরূপ বোধ হইতেই পারে না।

১। "সর্ব্বে ঘটাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা অশেষত্ববিশিষ্ট অর্থের বোধ হওয়ায় বিশেষণভাবে অশেষত্ব ও সর্ব্ব শব্দের অর্থ, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে অশেষত্বকে "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। "শক্তিবাদ" গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যও সর্ব্ব পদার্থ বিচারের প্রারম্ভে অশেষত্বকে সর্ব্ব পদার্থ বলিয়া বিচারপূর্ব্বক শেষে বিশিষ্ট যাবত্ত্বকে সর্ব্ব পদার্থ বলিয়াছেন এবং "সর্ব্বং গগনং" এইরূপ প্রয়োগ না হওয়ায় যাবত্ত্বের ন্যায় অনেকত্বও সর্ব্ব পদার্থ, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অনেকত্বাশেষতা সর্ব্বশব্দার্থঃ" এই বাক্যেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

কারণ, অভাবে অনেকত্ব ও অশেষত্ব ধর্ম্ম নাই। অভাব নিঃস্বরূপ। সুতরাং "সর্ব্বং" এইরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ বোধের বিষয় সৎ পদার্থ, উহা অভাব বা অসৎ হইতেই পারে না। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব"পদ ও "অভাব" পদের বিরোধ অনিবার্য্য। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যেরও যে বিরোধ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, উহার উল্লেখ করিয়া, ঐ বিরোধ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমভাবঃ" এই ভাবপ্রতিষেধক বাক্যটি প্রতিজ্ঞা। "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ" এই বাক্যটি হেতু। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ভাব পদার্থ একেবারেই অস্বীকার করিলে তাঁহার ঐ হেতুবাক্য বলিতেই পারেন না। তিনি ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাব স্বীকার করিয়া এবং উহা আশ্রয় করিয়াই ভাবসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধিপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার কথিত হেতুপ্রযুক্ত সকল পদার্থ অভাব, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সকল পদার্থই যদি অভাব হয়, তাহা হইলে ভাবপদার্থ একেবারেই না থাকায় তিনি যে, ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধিকে হেতু বলিয়াছেন, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, ভাব পদার্থ অস্বীকার করিলে ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধি, এই কথাই বলা যায় না। আর যদি ভাব পদার্থ স্বীকার করিয়া ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধিকে হেতু বলা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থই অভাব, এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থক। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সকল পদার্থই অভাব, ইহা বুঝা যায়। হেতুবাক্যের দ্বারা ভাব পদার্থও আছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সকল পদার্থই অভাব, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে যে হেতুবাক্য বলা হইয়াছে, তাহাতে ভাবপদার্থ স্বীকৃত ও আশ্রিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের ব্যাঘাত (বিরোধ) অনিবার্য্য। বার্ত্তিককার এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যস্থ "অভাব" শব্দেও ব্যাঘাত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভাব অর্থাৎ সৎপদার্থ না থাকিলে অভাব শব্দেরই প্রয়োগ হইতে পারে না। যাহা ভাব নহে, এই অর্থে "নঞ্" শব্দের সহিত "ভাব" শব্দের সমাসে "অভাব" শব্দ নিষ্পন্ন হইলে ভাব পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, ভাব পদার্থ একেবারেই না থাকিলে "ভাব" শব্দের পূর্ব্বে "নঞ্" শব্দের যোগই হইতে পারে না। যেমন এক না মানিলে "অনেক" বলা যায় না, নিত্য না মানিলে "অনিত্য" বলা যায় না, তদ্রূপ ভাব না মানিলে "অভাব" বলা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজ মতে "অভাব" শব্দও ব্যাহত।

ভাষ্য। সূত্রেণ চাভিসম্বন্ধঃ।

অনুবাদ। সূত্রের সহিতও অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত দোষের সহিতও (পূর্ব্বোক্ত দোষের) সম্বন্ধ (বুঝিবে)।

সূত্র। ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাং ॥৩৮॥৩৮১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অভাব নহে, কারণ, ভাবসমূহের স্বভাবসিদ্ধি অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সত্তা আছে।

ভাষ্য। ন সর্ব্বমভাবঃ, কস্মাৎ? স্বেন ভাবেন সদ্‌ভাবাদ্‌ভাবানাং, স্বেন ধর্ম্মেণ ভাবা ভবন্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। কশ্চ স্বো ধর্ম্মো ভাবানাং? দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং সদাদিসামান্যং, দ্রব্যাণাং ক্রিয়াবদিত্যেবমাদির্ব্বিশেষঃ, "স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যা" ইতিচ, প্রত্যেকঞ্চানন্তো ভেদঃ, সামান্যবিশেষসমবায়ানাঞ্চ বিশিষ্টা ধর্ম্মা গৃহ্যন্তে। সোঽয়মভাবস্য নিরুপাখ্যত্বাৎ সংপ্রত্যায়কোঽর্থভেদো ন স্যাৎ, অস্তি ত্বয়ং, তস্মান্ন সর্ব্বমভাব ইতি।

অথবা "**ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানা**"মিতি স্বরূপসিদ্ধেরিতি। "গৌ"রিতি প্রযুজ্যমানে শব্দে জাতিবিশিষ্টং দ্রব্যং গৃহ্যতে নাভাবমাত্রং। যদি চ সর্ব্বমভাবঃ, গৌরিত্যভাবঃ প্রতীয়েত, "গো"শব্দেন চাভাব উচ্যেত। যস্মাত্তু "গো"শব্দপ্রয়োগে দ্রব্যবিশেষঃ প্রতীয়তে নাভাবস্তস্মাদযুক্তমিতি।

অথবা "**ন স্বভাবসিদ্ধে**"রিতি 'অসন্ গৌরশ্বাত্মনা' ইতি, গবাত্মনা কস্মান্নোচ্যতে? অবচনাদ্‌গবাত্মনা গৌরস্তীতি স্বভাবসিদ্ধিঃ। "অনশ্বোঽশ্ব" ইতি বা "গৌরগৌ"রিতি বা কস্মান্নোচ্যতে? অবচনাৎ স্বেন রূপেণ বিদ্যমানতা দ্রব্যস্যেতি বিজ্ঞায়তে।

অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ ভাবেনাসৎপ্রত্যয়সামানাধিকরণ্যং।* সংযোগাদিসম্বন্ধো ব্যতিরেকঃ, অত্রাব্যতিরেকোঽভেদাখ্যসম্বন্ধঃ, তৎপ্রতিষেধে চাসৎপ্রত্যয়সামানাধিকরণ্যং, যথা 'ন সন্তি কুণ্ডে বদরাণী'তি। অসন্ গৌরশ্বাত্মনা, অনশ্বো গৌরিতি চ গবাশ্বয়োরব্যতিরেকঃ প্রতিষিধ্যতে গবাশ্বয়োরেকত্বং নাস্তীতি, তস্মিন্ প্রতিষিধ্যমানে ভাবে ন গবা সামানাধিকরণ্যমসৎপ্রত্যয়স্য 'অসন্ গৌরশ্বাত্মনে'তি যথা

* এখানে পূর্ব্বপ্রচলিত অনেক পুস্তকে "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ ভাবানামসংযোগাদিসম্বন্ধো ব্যতিরেকঃ" ইত্যাদি এবং কোন কোন পুস্তকে "ভাবানাং সংযোগাদিসম্বন্ধো ব্যতিরেকঃ" ইত্যাদি পাঠ আছে। কোন পুস্তকে অন্যরূপ পাঠও আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। উদ্ধৃত ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হওয়ায় গৃহীত হইল। পরে কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও "ভাবানাং" এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পরে ভাষ্যকারের "ভাবেন গবা" ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা এবং বার্ত্তিককারের "ভাবেন" এইরূপ তৃতীয়ান্ত পাঠের দ্বারা এখানে ভাষ্যে "ভাবেন" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হওয়ায় গৃহীত হইল। সুধীগণ এখানে প্রচলিত ভাষ্যপাঠের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিবেন।

"ন সন্তি কুণ্ডে বদরাণী"তি কুণ্ডে বদরসংযোগে প্রতিষিধ্যমানে সদ্‌ভিরসৎ-প্রত্যয়স্য সামানাধিকরণ্যমিতি।

অনুবাদ। সকল পদার্থ অভাব নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু স্বকীয় ধর্ম্মরূপে ভাবসমূহের সত্তা আছে, স্বকীয় ধর্ম্মরূপে ভাবসমূহ আছে, ইহা প্রতিজ্ঞাত হয় [অর্থাৎ আমরা স্বকীয় ধর্ম্মরূপে ভাবসমূহের সত্তা প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করায় সকল পদার্থ অভাব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না]। (প্রশ্ন) ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্ম কি? (উত্তর) দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম, দ্রব্যের ক্রিয়াবত্তা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম, এবং পৃথিবীর স্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ, এই চারিটি বিশেষ গুণ ইত্যাদি, এবং প্রত্যেকের অর্থাৎ দ্রব্যাদি ভাব পদার্থের এবং গন্ধাদি গুণের প্রত্যেকের অসংখ্য ভেদ। সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়েরও অর্থাৎ বৈশেষিকশাস্ত্র-বর্ণিত সামান্যাদি পদার্থত্রয়েরও বিশিষ্ট ধর্ম্ম (নিত্যত্ব ও সামান্যত্বাদি) গৃহীত হয়। অভাবের নিরুপাখ্যত্ব-(নিঃস্বরূপত্ব)বশতঃ সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সত্তা, অনিত্যত্ব, ক্রিয়াবত্ত্ব, গুণবত্ত্ব প্রভৃতি সংপ্রত্যায়ক (পরিচায়ক) অর্থভেদ অর্থাৎ দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ স্বভাবভেদ থাকে না, কিন্তু ইহা অর্থাৎ দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থভেদ বা স্বভাবভেদ আছে, অতএব সকল পদার্থ অভাব নহে।

অথবা "ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাং" এই সূত্রে ("স্বভাবসিদ্ধেঃ" এই বাক্যের অর্থ) স্বরূপসিদ্ধিপ্রযুক্ত। (তাৎপর্য্য) "গৌঃ" এই শব্দ প্রযুজ্যমান হইলে জাতিবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়, অভাবমাত্র গৃহীত হয় না। কিন্তু যদি সকল পদার্থই অভাব হয়, তাহা হইলে "গৌঃ" এইরূপে অভাব প্রতীত হউক? এবং "গো"শব্দের দ্বারা অভাব কথিত হউক? কিন্তু যেহেতু "গো"শব্দের প্রয়োগ হইলে দ্রব্যবিশেষই প্রতীত হয়, অভাব প্রতীত হয় না, অতএব (পূর্ব্বোক্ত মত) অযুক্ত।

অথবা "ন স্বভাবসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি সূত্রের (অন্যরূপ তাৎপর্য্য)। "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এই বাক্যে "গোস্বরূপে" কেন কথিত হয় না? অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী "গো গোস্বরূপে অসৎ" ইহা কেন বলেন না? অবচনপ্রযুক্ত অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বপক্ষবাদীও এইরূপ বলেন না, অতএব গোস্বরূপে গো আছে, এইরূপে স্বভাবসিদ্ধি (স্বস্বরূপে গোর অস্তিত্ব সিদ্ধি) হয়। এবং "অশ্ব অশ্ব নহে," "গো গো নহে" ইহাই বা কেন কথিত হয় না? অবচনপ্রযুক্ত অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বপক্ষ-

বাদীও ঐরূপ বলেন না, অতএব স্বকীয় রূপে (অশ্বত্বাদিরূপে) দ্রব্যের (অশ্বাদির) অস্তিত্ব আছে, ইহা বুঝা যায়।

"অব্যতিরেকে"র (অভেদসম্বন্ধের) প্রতিষেধ হইলেও অর্থাৎ তন্নিমিত্তও ভাবের (গবাদি সৎপদার্থের) সহিত, "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির "সামানাধিকরণ্য" হয়। (বিশদার্থ) সংযোগাদিসম্বন্ধকে "ব্যতিরেক" বলে। এখানে "অব্যতিরেক" বলিতে অভেদ নামক সম্বন্ধ। সেই অভেদ সম্বন্ধের প্রতিষেধ হইলেও "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির "সামানাধিকরণ্য" হয়, যেমন "কুণ্ডে বদর নাই"। (তাৎপর্য্য) "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এবং "গো অশ্ব নহে" এই বাক্যের দ্বারা গো এবং অশ্বের একত্ব (অভেদ) নাই, এইরূপে গো এবং অশ্বের "অব্যতিরেক" (অভেদ) প্রতিষিদ্ধ হয়। সেই "অব্যতিরেক" প্রতিষিধ্যমান হইলে ভাব অর্থাৎ সৎ গোপদার্থের সহিত "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এইরূপে "অসৎ" প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, যেমন "কুণ্ডে বদর নাই", এই বাক্যের দ্বারা কুণ্ডে বদরের সংযোগ প্রতিষিধ্যমান হইলে সৎ বদরের সহিত "অসৎ" প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যার পরে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মতে দোষ প্রদর্শন করিয়া, শেষে এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন, "সূত্রেণ চাভিসম্বন্ধঃ"। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিতও আমার কথিত দোষের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমার কথিত দোষবশতঃ এবং মহর্ষির এই সূত্রোক্ত দোষবশতঃ "সকল পদার্থই অভাব" এই মত উপপন্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থ অভাব নহে অর্থাৎ সকল পদার্থের অভাবত্ব বা অসত্ত্ব বাধিত ; কারণ, ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সত্তা আছে। ভাষ্যকার মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ভাবসমূহ স্বকীয় ধর্ম্মরূপে আছে, ইহা প্রতিজ্ঞাত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, স্বকীয় ধর্ম্মরূপে দ্রব্যাদি ভাব পদার্থ আছে অর্থাৎ "সৎ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতুর দ্বারা সকল পদার্থের সত্তা সিদ্ধ করায় পূর্ব্বপক্ষবাদীর "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞার্থ বাধিত। সুতরাং তিনি উহা সিদ্ধ করিতে পারেন না। অবশ্য ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সত্তা সিদ্ধ হইলে উহাদিগের অভাবত্ব অর্থাৎ অসত্তা বা অলীকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্ম কি? তাহা না বুঝিলে ভাষ্যকারের ঐ কথা বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার নিজেই ঐ প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা অনিত্যত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম, স্বকীয় ধর্ম্ম, এবং দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম স্বকীয় ধর্ম্ম, এবং দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবীর স্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ নামক বিশেষ গুণ স্বকীয় ধর্ম্ম, ইত্যাদি।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামে ষট্‌ প্রকার

ভাব পদার্থের উল্লেখ করিয়া "সদনিত্যং"[১] ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে তাঁহার পূর্ব্বকথিত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মনামক পদার্থত্রয়ের সামান্য ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এবং "ক্রিয়া-গুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণং" (১।১।১৫) এই সূত্রের দ্বারা ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়া দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এইরূপ পরে গুণ ও কর্ম্মেরও লক্ষণ বলিয়া বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রানুসারেই কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মকে স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদের "সদনিত্যং" ইত্যাদি সূত্রে "সৎ" ও "অনিত্য" প্রভৃতি শব্দেরই প্রয়োগ থাকায় তদনুসারে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"সদাদি-সামান্যং"। এবং কণাদের "ক্রিয়াগুণবৎ" ইত্যাদি সূত্রানুসারেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ক্রিয়াব-দিত্যেবমাদির্ব্বিশেষঃ"। সুতরাং কণাদসূত্রের ন্যায় ভাষ্যকারের "সদাদি" শব্দের দ্বারাও সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই বুঝিতে হইবে এবং কণাদের "ক্রিয়াগুণবৎ" এই বাক্যের দ্বারা দ্রব্য ক্রিয়া-বিশিষ্ট ও গুণবিশিষ্ট, এই অর্থের বোধ হওয়ায় ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই দ্রব্যের লক্ষণ বুঝা যায়। সুতরাং কণাদের ঐ বাক্যানুসারে ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের দ্বারাও ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। এবং ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের "গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ" (৬২ম) এই সূত্রানুসারেই "স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ" এই বাক্যের প্রয়োগপূর্ব্বক আদি অর্থে "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া "ইতি চ" এই বাক্যের দ্বারা গুণ ও কর্ম্মের কণাদোক্ত লক্ষণরূপ বিশেষ ধর্ম্মকে এবং জল, তেজ ও বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যের বিশেষ গুণকেও স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। নচেৎ ভাষ্যকারের বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। "ইতি চ" এই বাক্যের দ্বারা "ইত্যাদি" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিলে ভাষ্যকারের বক্তব্যের ন্যূনতা থাকে না। "ইতি" শব্দের আদি অর্থও কোষে কথিত হইয়াছে[২]। ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও গন্ধাদি গুণের প্রত্যেকের অনন্ত ভেদ, অর্থাৎ তত্তদ্‌ব্যক্তিভেদে ঐ সকল পদার্থ অসংখ্য, এবং কণাদোক্ত "সামান্য," "বিশেষ" ও "সমবায়" নামক পদার্থত্রয়েরও নিত্যত্ব ও সামান্যত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্ম্ম গৃহীত হয় অর্থাৎ ঐ পদার্থত্রয়েরও নিত্যত্বাদি স্বকীয় ধর্ম্ম আছে। ভাষ্যকার এই সমস্ত কথার দ্বারা দ্রব্যাদি ভাব পদার্থসমূহের সূত্রোক্ত "স্বভাব" অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের সূত্রকারোক্ত খণ্ডন বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দ্রব্যাদি পদার্থ অভাব অর্থাৎ অসৎ হইলে ঐ সকল পদার্থের পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ সম্প্রত্যায়ক যে অর্থভেদ, তাহা থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ। যাহা অসৎ, তাহার কোন স্বকীয় ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সংপ্রতীতি অর্থাৎ যথার্থ বোধ জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ স্বভাব না বুঝিলে দ্রব্যাদি পদার্থের সম্প্রতীতি জন্মিতেই পারে না। এই জন্যই মহর্ষি কণাদ ঐ সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উহাদিগের পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ স্বভাব বা স্বকীয় ধর্ম্ম

১। "সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিতিদ্রব্য-গুণ-কর্ম্মণামবিশেষঃ"।—বৈশেষিক দর্শন, ১।১।৮।

২। "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু"।—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ। ২০।

বলিয়াছেন। দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ স্বকীয় ধর্ম্মরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থই উহাদিগের সম্প্রত্যায়ক (পরিচায়ক) অর্থভেদ। ঐ অর্থভেদ বা স্বভাবভেদ, অসৎ পদার্থের সম্ভবই হয় না। কারণ, যাহা অসৎ, যাহার বাস্তব কোন সত্তাই নাই, তাহাতে সত্তা, অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম এবং গন্ধ প্রভৃতি গুণ কোনরূপেই থাকিতে পারে না এবং তাহার অসংখ্য ভেদও থাকিতে পারে না। কারণ, যাহা অলীক, তাহা নানাপ্রকার ও নানাসংখ্যক হইতে পারে না। যাহাতে স্বভাবভেদ নাই, তাহাতে প্রকারভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে বোধ সর্ব্বজনসিদ্ধ, নচেৎ ঐ সমস্ত পদার্থের সম্প্রতীতি হইতেই পারে না ; সর্ব্বজনসিদ্ধ বোধের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ অর্থভেদ বা স্বভাবভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর দ্রব্যাদি পদার্থকে অভাব বলা যায় না। অতএব দ্রব্যাদি পদার্থ অভাব নহে। ভাষ্যকারের এই প্রথম ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত "স্বভাব" শব্দের অর্থ স্বকীয় ধর্ম্ম।

সর্ব্বশূন্যতাবাদী পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং তাহার স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম কিছুই বাস্তব বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ঐ সমস্তই অসৎ, সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা তিনি নিরস্ত হইবেন না। ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া এই সূত্রের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা এই সূত্রে "স্বভাব" শব্দের অর্থ স্বরূপ। "গো" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা গোত্বাদিবিশিষ্ট গো প্রভৃতি স্বরূপের সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ায় সকল পদার্থ অভাব নহে, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "গো" শব্দ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট গো নামক দ্রব্যবিশেষই বুঝা যায়, অভাবমাত্র বুঝা যায় না। সমস্ত পদার্থই অভাব হইলে "গো" শব্দের দ্বারা অভাবই কথিত হইত এবং অভাবেরই প্রতীতি হইত। কিন্তু "গো" শব্দের দ্বারা কেহ অভাব বুঝে না, গোত্ববিশিষ্ট দ্রব্যই বুঝিয়া থাকে। গো পদার্থের স্বরূপ গোত্ব জাতি, অভাবে থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব নিঃস্বরূপ। সুতরাং যখন "গো" শব্দ প্রয়োগ করিলে গোত্ব জাতিবিশিষ্ট গো নামক দ্রব্যবিশেষই বুঝা যায়, তখন গো পদার্থকে অভাব বলা যায় না। এইরূপ অন্যান্য শব্দের দ্বারাও ভাব পদার্থের স্বরূপেরই জ্ঞান হওয়ায় সকল পদার্থই অভাব, এই মত অযুক্ত। সর্ব্বশূন্যতাবাদী ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিও স্বীকার করিবেন না। কারণ, তাঁহার মতে গোত্বাদি জাতিও অসৎ, সুতরাং "গো" শব্দের দ্বারা তিনি গোত্ববিশিষ্ট কোন বাস্তব দ্রব্য বুঝেন না, তাঁহার মতে গো নামক পদার্থও নিঃস্বরূপ বলিয়া "গো" শব্দের দ্বারা গোত্বজাতিবিশিষ্ট সৎদ্রব্য বুঝা যায় না। ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া শেষে তৃতীয় কল্পে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনে চরম যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদীর নিজের কথার দ্বারাই গো প্রভৃতি ভাব পদার্থের স্বভাবসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি হয়—গো প্রভৃতি ভাব পদার্থ কোনরূপেই সৎ নহে, ইহা সর্ব্বশূন্যতাবাদীও বলিতে পারেন না। কারণ, তিনি নিজ মতের যুক্তি প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ"। কিন্তু "গো গোস্বরূপে অসৎ", ইহা কেন বলেন না ? আর বলিয়াছেন—"গো অশ্ব নহে", "অশ্ব গো নহে", কিন্তু তিনি "অশ্ব অশ্ব

নহে," "গো গো নহে" ইহা কেন বলেন না ? তিনি যখন উহা বলেন না, বলিতেই পারেন না, তখন গো, গোস্বরূপে সৎ এবং অশ্ব, অশ্বস্বরূপে সৎ, ইহা তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, গো অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্য যে, স্বস্বরূপে সৎ, ইহা তাঁহার নিজের কথার দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং সকল পদার্থই সর্ব্বথা "অসৎ", এই মতের কোন সাধক নাই। ভাষ্যকারের এই তৃতীয় পক্ষে মহর্ষির সূত্রের অর্থ এই যে, গো প্রভৃতি ভাবসমূহের স্বভাবতঃ অর্থাৎ স্বস্বরূপে সিদ্ধি হওয়ায় অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের কথার দ্বারাও উহা প্রতিপন্ন হওয়ায় সকল পদার্থই অভাব, এই মত অযুক্ত। সর্ব্বশূন্যতাবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি গো অশ্ব প্রভৃতি সৎপদার্থই হয়, তাহা হইলে "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ", "অশ্ব গোস্বরূপে অসৎ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ ও প্রতীতি হয় কেন ? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "অব্যতিরেকে"র নিষেধ স্থলেও ভাবের সহিত অর্থাৎ গো প্রভৃতি সৎ পদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। অর্থাৎ গো প্রভৃতি সৎপদার্থ বিষয়েও অন্যরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি জন্মে। গো পদার্থে অশ্বের "অব্যতিরেকে"র অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধের অভাব বুঝাইতে "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে গো পদার্থের সহিত "অসৎ" এই প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ও প্রতীতির দ্বারা গো-পদার্থের স্বরূপ-সত্তার অভাব প্রতিপন্ন হয় না ; গো এবং অশ্বের একত্ব অর্থাৎ অভেদ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ" এই বাক্যে "চ" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তরূপে ব্যতিরেক-প্রতিষেধকেও প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই প্রথমে ব্যতিরেক শব্দার্থের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সংযোগাদি সম্বন্ধকে "ব্যতিরেক" বলে। সংযোগ প্রভৃতি ভেদসম্বন্ধকে "ব্যতিরেক" বলিলে অভেদ সম্বন্ধকে "অব্যতিরেক" বলা যায়। তাই বলিয়াছেন যে, এখানে "অব্যতিরেক" বলিতে অভেদ নামক সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে "অব্যতিরেকে"র প্রতিষেধ বলিয়াছি, উহা "ব্যতিরেকে"র অর্থাৎ সংযোগাদি ভেদ-সম্বন্ধের বিপরীত অভেদ সম্বন্ধ। "ব্যতিরেকে"র প্রতিষেধ স্থলে যেমন সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, তদ্রূপ "অব্যতিরেকে"র প্রতিষেধ স্থলেও সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। ব্যতিরেকের প্রতিষেধ স্থলে কোথায় সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, ইহা উদাহরণ দ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন যে, যেমন "কুণ্ডে বদর নাই" এই বাক্যের দ্বারা "কুণ্ড" নামক আধারে বদরফলের সংযোগের নিষেধ করিলে অর্থাৎ বদরফলের সংযোগ-সম্বন্ধের সত্তার অভাব বুঝাইলে তখন সৎপদার্থ বদরফলের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। কিন্তু ঐ স্থলে কুণ্ডে বদরের সত্তার নিষেধ হয় না। "কুণ্ডে বদর অসৎ" এই বাক্যের দ্বারা কুণ্ডে বদরের অসত্তা প্রতিপন্ন হয় না, কুণ্ডে বদরের সংযোগ-সম্বন্ধরূপ ব্যতিরেকেরই নিষেধ হয়। অর্থাৎ বদর সৎপদার্থ হইলেও কুণ্ডে উহার সংযোগ-সম্বন্ধ নাই, ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা কথিত ও প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে "কুণ্ডে বদরাণি ন সন্তি" এইরূপে সৎপদার্থ বদরের সহিত "ন সন্তি" অর্থাৎ "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। উদ্দ্যোতকর "ব্যতিরেকপ্রতিষেধে ভাবেনাসৎপ্রত্যয়স্য সামানাধিকরণ্যমিতি"

ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা এখানে কেবল ভাষ্যকারোক্ত দৃষ্টান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রচলিত "বার্ত্তিক" গ্রন্থে "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ" ইত্যাদি কোন পাঠ দেখা যায় না। উদ্দ্যোতকরের "ব্যতিরেকপ্রতিষেধে" ইত্যাদি পাঠ দেখিয়া ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও যে, এখানে ব্যতিরেকপ্রতিষেধকেও প্রকাশ করিয়া উহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতেই "যথা ন সন্তি কুণ্ডে বদরাণি" এই বাক্য বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু প্রচলিত কোন ভাষ্যপুস্তকেই এখানে "ব্যতিরেকপ্রতিষেধে"র উল্লেখ দেখা যায় না। তাই ভাষ্যকারের "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ" এই বাক্যে "চ" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তরূপে ব্যতিরেক প্রতিষেধও প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে "কুণ্ডে বদরাণি ন সন্তি," "ভূতলে ঘটো নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতিতে কুণ্ডে বদরফলের সংযোগসম্বন্ধ এবং ভূতলে ঘটের সংযোগসম্বন্ধ প্রভৃতি "ব্যতিরেকে"র অভাবই বিষয় হয়। সুতরাং ঐ প্রতিষেধের নাম "ব্যতিরেক-প্রতিষেধ"। "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মত স্পষ্টই বুঝা যায়[১]। সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাচীন মত সমর্থন করিয়াছেন। অভেদ সম্বন্ধের নিষেধের নাম "অব্যতিরেক-প্রতিষেধ"। "গো অশ্ব-স্বরূপে অসৎ," "গো অশ্ব নহে," "অশ্ব গোস্বরূপে অসৎ," "অশ্ব গো নহে" এইরূপ প্রয়োগ ও প্রতীতিতে গো পদার্থে অশ্বের অভেদ সম্বন্ধ ও অশ্বপদার্থে গোর অভেদ সম্বন্ধরূপ "অব্যতি-রেকে"র প্রতিষেধই (অভাবই) বিষয় হয়। তজ্জন্যই গো প্রভৃতি সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এই প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। কিন্তু উহার দ্বারা গো প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপসত্তার নিষেধ হয় না। অর্থাৎ গো প্রভৃতি পদার্থ স্বরূপতঃই অসৎ, কোনরূপেই উহার সত্তা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাহা হইলে "গো গোস্বরূপে অসৎ", "গো গো নহে", ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ ও প্রতীতিও হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশূন্যতাবাদীও যখন "গো গোস্বরূপে অসৎ", "গো গো নহে" এই-রূপ প্রয়োগ করেন না, তখন গো পদার্থের স্বস্বরূপে সত্তা তাঁহারও স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার পূর্ব্ব-সূত্র-ভাষ্যে ভাববোধক শব্দের সহিত অসৎপ্রত্যয়সামানাধিকরণ্য বলিয়াছেন। সুতরাং এখানেও "ভাব" শব্দের দ্বারা ভাববোধক শব্দই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝিয়া কেহ ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকরও এখানে "ভাবেনাসৎপ্রত্যয়স্য সামানাধিকরণ্যং" এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারও এখানে পরে "ভাবেন গবা সামানাধিকরণ্যমসৎপ্রত্যয়স্য" এবং "সদ্ভিরসৎপ্রত্যয়স্য সামানাধি-করণ্যং" এইরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এখানে সৎপদার্থের সহিতই অসৎ প্রত্যয়ের সামানাধি-করণ্য ভাষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। ভাববোধক শব্দের সহিত সমানার্থক বিভক্তিযুক্ত "অসৎ" শব্দের প্রয়োগ করিলে যেমন ঐ স্থলে ভাববোধক শব্দের সহিত "অসৎ" এই-রূপ প্রতীতি ও ঐ শব্দের সামানাধিকরণ্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ যে পদার্থে ঐ ভাববোধক শব্দের বাচ্যতা আছে, সেই পদার্থেই কোনরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি হইলে ঐ তাৎপর্য্যে এখানে ভাষ্য-

---

১। "অন্যথা ইহ ভূতলে ঘটো নাস্তীত্যেষাপি প্রতীতিঃ প্রত্যক্ষা ন স্যাৎ ? সংযোগো হ্যত্র নিষিধ্যতে" ইত্যাদি (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবকের ১ম শ্লোকের উদয়নকৃত গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কার সেই ভাব পদার্থের সহিতও "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য বলিতে পারেন। এই ভাবে ভাববোধক সমস্ত শব্দের ন্যায় সমস্ত ভাব পদার্থও অন্যরূপে "অসৎ" এই প্রতীতির সমানাধিকরণ হইতে পারে। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে গো প্রভৃতি ভাব পদার্থের অন্যরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি কেন জন্মে, ইহা বুঝাইতে ভাব পদার্থের সহিতই "অসৎ" প্রতীতির সামানাধিকরণ্য বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করিয়াছেন ॥৩৮॥

সূত্র। ন স্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ ॥৩৯॥৩৮২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আপেক্ষিকত্ববশতঃ (পদার্থসমূহের) "স্বভাবসিদ্ধি" অর্থাৎ স্বকীয় স্বরূপে সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থই বাস্তব হইতে পারে না।

ভাষ্য। অপেক্ষাকৃতমাপেক্ষিকং। হ্রস্বাপেক্ষাকৃতং দীর্ঘং, দীর্ঘাপেক্ষাকৃতং হ্রস্বং, ন স্বেনাত্মনাবস্থিতং কিঞ্চিৎ। কস্মাৎ? অপেক্ষাসামর্থ্যাৎ, তস্মান্ন স্বভাবসিদ্ধির্ভাবানামিতি।

অনুবাদ। "আপেক্ষিক" বলিতে অপেক্ষাকৃত। হ্রস্বের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, দীর্ঘের অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, কোন বস্তু স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) অপেক্ষার সামর্থ্যবশতঃ,—অতএব পদার্থসমূহের স্বভাবের সিদ্ধি হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি ভাবসমূহের যে "স্বভাবসিদ্ধি" বলিয়াছেন, সর্ব্বশূন্যতাবাদী তাহা স্বীকার করেন না। তিনি অন্য যুক্তির দ্বারা উহা খণ্ডন করেন। তাই মহর্ষি আবার এই সূত্রের দ্বারা সর্ব্বশূন্যতাবাদীর সেই যুক্তির উল্লেখ করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, ভাবসমূহের অর্থাৎ কোন পদার্থেরই স্বভাবসিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ কোন পদার্থই স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত নহে, সকল পদার্থই অবাস্তব। কারণ, সকল পদার্থই আপেক্ষিক। আপেক্ষিক বলিতে অপেক্ষাকৃত অর্থাৎ অন্যাপেক্ষ। ভাষ্যকার ইহার দৃষ্টান্তরূপে বলিয়াছেন যে, হ্রস্বের আপেক্ষিক দীর্ঘ, দীর্ঘের আপেক্ষিক হ্রস্ব। অর্থাৎ যে দ্রব্যকে হ্রস্ব বা খর্ব্ব বলা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব নহে, তাহা উহা হইতে দীর্ঘ দ্রব্য অপেক্ষায় হ্রস্ব, এবং যে দ্রব্যকে দীর্ঘ বলা হয়, তাহাও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নহে, তাহাও উহা হইতে হ্রস্ব দ্রব্য অপেক্ষায় দীর্ঘ। এক হস্তপরিমিত দণ্ড হইতে দুই হস্তপরিমিত দণ্ড দীর্ঘ এবং উহা হইতে এক হস্তপরিমিত সেই দণ্ড হ্রস্ব। এইরূপে সমস্ত পদার্থই পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া কোন পদার্থের স্বভাবসিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থই বাস্তব নহে, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জগতে সমস্ত পদার্থই ভিন্ন-স্বভাব, কিন্তু সমস্ত পদার্থের ভিন্নত্বও অন্যাপেক্ষ। যেমন যাহা নীল বলিয়া কথিত হয়, তাহা পীতাদি অপেক্ষায় ভিন্ন, স্বভাবতঃ ভিন্ন নহে। তাহা হইলে নীলকে নীল হইতেও ভিন্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কেহই বলেন না। সুতরাং নীল স্বভাবতঃই ভিন্ন নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এইরূপ হ্রস্বত্ব,

দীর্ঘত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মই পরস্পর সাপেক্ষ। "পরত্ব" বলিতে জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব, "অপরত্ব" বলিতে কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব। সুতরাং উহাও কোন পদার্থের স্বাভাবিক হইতে পারে না ; কারণ, উহা আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ। যে পদার্থে কাহারও অপেক্ষায় "পরত্ব" আছে, সেই পদার্থের অপেক্ষায় সেই অন্য পদার্থে অপরত্ব আছে। এইরূপ পিতৃত্ব, পুত্রত্ব প্রভৃতিও কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না ; কারণ, ঐ সমস্তই সাপেক্ষ। যিনি পিতা, তিনি তাঁহার পুত্রেরই পিতা, যিনি পুত্র, তিনি তাঁহার ঐ পিতারই পুত্র, সকলেই সকলের পিতা ও পুত্র নহে। সুতরাং জগতে যখন সকল পদার্থই সাপেক্ষ, তখন সকল পদার্থই অবাস্তব অসৎ ; কারণ, যাহা সাপেক্ষ, তাহা বাস্তব নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যেমন শুভ্র স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবাপুষ্প রাখিলে ঐ স্ফটিককে তখন রক্তবর্ণ দেখা যায়। ঐ স্ফটিকে বস্তুতঃ রক্ত রূপ নাই, কিন্তু ঐ জবাপুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃই উহাতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়। সেখানে আরোপিত রক্ত রূপ বাস্তব পদার্থ নহে, উহা ঐ জবাপুষ্পসাপেক্ষ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, সে স্থান হইতে ঐ জবাপুষ্পকে লইয়া গেলে তখন আর ঐ স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখা যায় না। তাহা হইলে যাহা সাপেক্ষ, তাহা স্বাভাবিক নহে—তাহা অবাস্তব অসৎ ; যেমন রক্তজবাপুষ্প-সাপেক্ষ স্ফটিকের রক্ততা। এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় সাপেক্ষত্ব হেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অসত্তা সিদ্ধ হয়, ইহাই এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বপক্ষবাদীর গূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ৩৯

সূত্র। ব্যাহতত্বাদযুক্তং ॥৪০॥৩৮৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাহতত্ব অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত আপেক্ষিকত্ব) অযুক্ত অর্থাৎ উহা উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। যদি হ্রস্বাপেক্ষাকৃতং দীর্ঘং, হ্রস্বমনাপেক্ষিকং, কিমিদানীমপেক্ষ্য "হ্রস্ব"মিতি গৃহ্যতে ? অথ দীর্ঘাপেক্ষাকৃতং হ্রস্বং, দীর্ঘমনাপেক্ষিকং, কিমিদানীমপেক্ষ্য "দীর্ঘ"মিতি গৃহ্যতে ? এবমিতরেতরাশ্রয়য়োরেকাভাবেঽন্যতরাভাবাদুভয়াভাব ইত্যপেক্ষাব্যবস্থাঽনুপপন্না।

স্বভাবসিদ্ধাবসত্যাং সময়োঃ পরিমণ্ডলয়োর্ব্বা দ্রব্যয়োরাপেক্ষিকে দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে কস্মান্ন ভবতঃ ? অপেক্ষায়ামনপেক্ষায়াঞ্চ দ্রব্যয়োরভেদঃ, যাবতী দ্রব্যে অপেক্ষমাণে তাবতী এবানপেক্ষমাণে, নান্যতরত্র ভেদঃ। আপেক্ষিকত্বে সত্যন্যতরত্র বিশেষোপজনঃ স্যাদিতি।

কিমপেক্ষাসামর্থ্যমিতি চেৎ ? দ্বয়োর্গ্রহণেঽতিশয়গ্রহণোপপত্তিঃ। দ্বে দ্রব্যে পশ্যন্নেকত্র বিদ্যমানমতিশয়ং গৃহ্লাতি, তদ্দীর্ঘমিতি ব্যবস্যতি, যচ্চ হীনং গৃহ্লাতি তদ্‌হ্রস্বমিতি ব্যবস্যতীতি। এতচ্চাপেক্ষাসামর্থ্যমিতি।

অনুবাদ। যদি দীর্ঘ, হ্রস্বের অপেক্ষাকৃত অর্থাৎ আপেক্ষিক হয়, হ্রস্ব অনাপেক্ষিক হয়, তাহা হইলে কাহাকে অপেক্ষা করিয়া "হ্রস্ব" এইরূপ জ্ঞান হয়? আর যদি হ্রস্ব দীর্ঘের অপেক্ষাকৃত অর্থাৎ আপেক্ষিক হয়, দীর্ঘ অনাপেক্ষিক হয়, তাহা হইলে কাহাকে অপেক্ষা করিয়া "দীর্ঘ" এইরূপ জ্ঞান হয়? এবং পরস্পরাশ্রিত হ্রস্ব ও দীর্ঘের অর্থাৎ যদি হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরস্পর সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার একের অভাবে অন্যতরের অর্থাৎ অপরেরও অভাবপ্রযুক্ত উভয়েরই অভাব হয়, এ জন্য অপেক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষামূলক হ্রস্বদীর্ঘব্যবস্থা উপপন্ন হয় না।

পরন্তু "স্বভাবসিদ্ধি" অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থের বাস্তব স্বকীয় স্বরূপে সিদ্ধি না হইলে তুল্য অথবা "পরিমণ্ডল" অর্থাৎ অণুপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের আপেক্ষিক দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব কেন হয় না? পরন্তু অপেক্ষা ও অনপেক্ষা অর্থাৎ হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব থাকিলেও দ্রব্যদ্বয়ের অভেদ অর্থাৎ সাম্য আছে। (তাৎপর্য্য) যে পরিমাণ যে দুইটি দ্রব্যই অপেক্ষমাণ অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা করে, সেই পরিমাণ সেই দুইটি দ্রব্যই অনপেক্ষমাণ অর্থাৎ পরস্পরকে অপেক্ষা করে না, (কিন্তু) অন্যতর দ্রব্যে অর্থাৎ ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে কোন দ্রব্যেই ভেদ (বৈষম্য) নাই। আপেক্ষিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ দ্রব্যদ্বয়েরও অন্যাপেক্ষত্ব থাকায় তৎপ্রযুক্ত একতর দ্রব্যে বিশেষের (পরিমাণভেদের) উৎপত্তি হউক?

(প্রশ্ন) অপেক্ষার সামর্থ্য অর্থাৎ সাফল্য কি? (উত্তর) দুইটি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইলে "অতিশয়ে"র অর্থাৎ পরিমাণের উৎকর্ষের প্রত্যক্ষের উপপত্তি। বিশদার্থ এই যে, দুইটি দ্রব্য দর্শন করতঃ একটি দ্রব্যে "অতিশয়" অর্থাৎ পরিমাণের উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করে, সেই দ্রব্যকে "দীর্ঘ" বলিয়া নিশ্চয় করে, এবং যে দ্রব্যকে হীন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য অপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করে, সেই দ্রব্যকেই "হ্রস্ব" বলিয়া নিশ্চয় করে। ইহাই অপেক্ষার সামর্থ্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থের যে আপেক্ষিকত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। কারণ, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত আপেক্ষিকত্ব বা সাপেক্ষত্ব ব্যাহত। অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বোক্তরূপ আপেক্ষিকত্ব থাকিতেই পারে না, উহা স্বীকার করাই যায় না। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "ব্যাহতত্ব" বা ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি দীর্ঘ পদার্থকে হ্রস্বসাপেক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে হ্রস্ব পদার্থকে ঐ দীর্ঘনিরপেক্ষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে হ্রস্বের জ্ঞান কিরূপে হইবে? হ্রস্ব যদি দীর্ঘকে অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে আর কাহাকে অপেক্ষা করিয়া হ্রস্বের জ্ঞান হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে হ্রস্বের জ্ঞান হইতেই পারে না। আর

যদি বল, হ্রস্ব পদার্থ দীর্ঘ পদার্থকে অপেক্ষা করে, উহা দীর্ঘসাপেক্ষ, দীর্ঘ পদার্থকে অপেক্ষা করিয়াই উহার জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐ দীর্ঘ পদার্থকে হ্রস্বনিরপেক্ষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ দীর্ঘের জ্ঞান কিরূপে হইবে? দীর্ঘ যদি হ্রস্বকে অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে আর কাহাকে অপেক্ষা করিয়া ঐ দীর্ঘের জ্ঞান হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে দীর্ঘের জ্ঞান হইতেই পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে পদার্থ নিজের উৎপত্তি ও জ্ঞানে অপর পদার্থকে অপেক্ষা করে, ঐ অপর পদার্থ সেই পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বেই সিদ্ধ থাকা আবশ্যক। সুতরাং দীর্ঘ পদার্থ, হ্রস্ব পদার্থকে অপেক্ষা করিলে ঐ হ্রস্ব পদার্থ সেই দীর্ঘ পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই হ্রস্ব পদার্থ নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় সকল পদার্থই সাপেক্ষ, ইহা আর বলা যায় না। হ্রস্ব পদার্থের নিরপেক্ষত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে উহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সাপেক্ষত্ব ব্যাহত হয়। আর যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত দোষভয়ে হ্রস্ব পদার্থকে দীর্ঘসাপেক্ষই বলেন, তাহা হইলে ঐ দীর্ঘ পদার্থকে নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ঐ দীর্ঘ পদার্থ পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকিলে তাহাকে অপেক্ষা করিয়া হ্রস্বের জ্ঞান হইতে পারে না। যাহা পূর্ব্বে নিজেই অসিদ্ধ, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষে দীর্ঘ পদার্থকে হ্রস্বের পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে ঐ দীর্ঘ পদার্থের নিরপেক্ষত্বই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সাপেক্ষত্ব ব্যাহত হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, আমরা ত হ্রস্ব ও দীর্ঘকে পরস্পর সাপেক্ষই বলিয়াছি। আমাদিগের মতে হ্রস্বের আপেক্ষিক দীর্ঘ, দীর্ঘের আপেক্ষিক হ্রস্ব। এইরূপ সমস্ত পদার্থই সাপেক্ষ, সুতরাং অসৎ। ভাষ্যকার এই তৃতীয় পক্ষে দোষ বলিয়াছেন যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরস্পর সাপেক্ষ হইলে পরস্পরাশ্রিত হওয়ায় হ্রস্বের পূর্ব্বে দীর্ঘ নাই এবং দীর্ঘের পূর্ব্বেও হ্রস্ব নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, হ্রস্ব পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকিলে হ্রস্বসাপেক্ষ দীর্ঘ থাকিতে পারে না। আবার দীর্ঘ পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকিলে দীর্ঘসাপেক্ষ হ্রস্বও থাকিতে পারে না। সুতরাং এই পক্ষে পরস্পরাশ্রয়-দোষবশতঃ হ্রস্বও নাই, দীর্ঘও নাই, সুতরাং হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই উভয়ই নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, হ্রস্ব ও দীর্ঘের মধ্যে হ্রস্বের অভাবে অন্যতরের অর্থাৎ দীর্ঘেরও অভাব হওয়ায় এবং দীর্ঘের অভাবে হ্রস্বেরও অভাব হওয়ায় ঐ উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং হ্রস্ব ও দীর্ঘকে পরস্পর সাপেক্ষ বলিলে ঐ উভয়ের সিদ্ধিই হইতে পারে না। সর্ব্বশূন্যতাবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি উক্ত ক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই উভয়ের অভাবই হয়, তাহা হইলে ত আমাদিগের ইষ্ট-সিদ্ধিই হইল, আমরা ত কোন পদার্থেরই সত্তা স্বীকার করি না। যে কোনরূপে সকল পদার্থের অসত্তা সিদ্ধ হইলেই আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধিই হয়। এ জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন যে, স্বভাব সিদ্ধ না হইলে অর্থাৎ হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব প্রভৃতি বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, উহা সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তে তুল্যপরিমাণ দুইটি দ্রব্য অথবা দুইটি পরিমণ্ডল অর্থাৎ দুইটি পরমাণুর আপেক্ষিক দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব কেন হয় না? তাৎপর্য্য এই যে, তুল্যপরিমাণ যে কোন দুইটি দ্রব্য অথবা দুইটি পরমাণুর মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষায় দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে,

ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বীকার করেন। কিন্তু যদি দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হয়, উহা কল্পিত অবাস্তব পদার্থই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তুল্যপরিমাণ দুইটি দ্রব্য অথবা পরমাণুদ্বয়েরও আপেক্ষিক দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে যখন সমস্ত পদার্থই আপেক্ষিক অর্থাৎ সাপেক্ষ, তখন তিনি তুল্যপরিমাণ দ্রব্য ও পরমাণুকেও নিরপেক্ষ বলিতে পারিবেন না। সুতরাং সাপেক্ষত্ববশতঃ বিষমপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের ন্যায় সমপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যেও একটির হ্রস্বত্ব ও অপরটির দীর্ঘত্ব কেন হয় না? ইহা বলা আবশ্যক। হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, তুল্যপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের একটির হ্রস্বত্ব ও অপরটির দীর্ঘত্ব স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মই নহে, এবং পরমাণুর হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব স্বভাবই নহে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, তুল্যপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ও উহা হইতে হ্রস্বপরিমাণ দ্রব্যের অপেক্ষায় দীর্ঘ এবং উহা হইতে দীর্ঘপরিমাণ দ্রব্যের অপেক্ষায় হ্রস্ব, সুতরাং ঐ দ্রব্যদ্বয়েও অপরের অপেক্ষা অর্থাৎ সাপেক্ষত্ব আছে। কিন্তু ঐ দ্রব্যদ্বয় তুল্যপরিমাণ বলিয়া পরস্পর নিরপেক্ষ, সুতরাং উহাতে পরস্পর অনপেক্ষা অর্থাৎ নিরপেক্ষত্বও আছে। তাই ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে একের হ্রস্বত্ব ও অপরের দীর্ঘত্ব হইতে পারে না। এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অপেক্ষা ও অনপেক্ষা থাকিলেও দ্রব্যদ্বয়ের বৈষম্য নাই। পরে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে পরিমাণ অর্থাৎ তুল্যপরিমাণ যে দুইটি দ্রব্য অপর দ্রব্যকে অপেক্ষা করে, সেই দুইটি দ্রব্যই পরস্পরকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু উহার কোন দ্রব্যেই ভেদ অর্থাৎ পরিমাণ-বৈষম্য নাই। তাৎপর্য্য এই যে, তুল্যপরিমাণ যে দুইটি দ্রব্যকে পরস্পর নিরপেক্ষ বলিতেছ, সেই দুইটি দ্রব্যকেই সাপেক্ষ বলিয়াও স্বীকার করিতেছ। কারণ, ঐ দ্রব্যদ্বয়কে সাপেক্ষ না বলিলে সকল পদার্থে সাপেক্ষত্ব ব্যাহত হয়। কিন্তু তুল্যপরিমাণ ঐ দ্রব্যদ্বয় পরস্পর নিরপেক্ষ হইলেও উহাতে যখন সাপেক্ষত্বও আছে, তখন তৎপ্রযুক্ত ঐ দ্রব্যদ্বয়ের পরিমাণ-ভেদ অর্থাৎ হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব অবশ্য হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, আপেক্ষিকত্ব অর্থাৎ সাপেক্ষত্ব থাকিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে কোন এক দ্রব্যে বিশেষের অর্থাৎ হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্বের উৎপত্তি হউক? পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অপেক্ষাকে হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের নিমিত্ত বলিয়াছেন, উহা যখন তুল্যপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়েও আছে, তখন ঐ দ্রব্যদ্বয়ের একের হ্রস্বত্ব ও অপরের দীর্ঘত্ব কেন হইবে না? কিন্তু ঐ দ্রব্যদ্বয়ের যে পরিমাণ-বৈষম্যরূপ ভেদ নাই, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই প্রশ্ন করিবেন যে, যদি হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে অপেক্ষার সামর্থ্য অর্থাৎ সাফল্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, কোন দ্রব্য কোন দ্রব্য অপেক্ষায় হ্রস্ব এবং কোন দ্রব্য অপেক্ষায় দীর্ঘ, সকল দ্রব্যই সকল দ্রব্য অপেক্ষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ, ইহা কেহই বলেন না। সুতরাং হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব যে অপেক্ষাকৃত, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু যদি হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে আর অপেক্ষার প্রয়োজন কি? যাহা স্বাভাবিক, তাহা ত কাহারও আপেক্ষিক হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষা ব্যর্থ। ভাষ্যকার শেষে নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, দুইটি দ্রব্য দেখিলে তন্মধ্যে যে দ্রব্যে অতিশয় অর্থাৎ পরিমাণের আধিক্য দেখে, ঐ দ্রব্যকে দীর্ঘ বলিয়া নিশ্চয়

করে। যে দ্রব্যে তদপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণ দেখে, ঐ দ্রব্যকে হ্রস্ব বলিয়া নিশ্চয় করে, ইহাই অপেক্ষার সাফল্য। তাৎপর্য্য এই যে, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বকীয় বাস্তব ধর্ম্ম হইলেও উহার জ্ঞানে পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষা-বুদ্ধি আবশ্যক। কারণ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুইটি দ্রব্য দেখিলে তন্মধ্যে একটিকে দীর্ঘ বলিয়া ও অপরটিকে হ্রস্ব বলিয়া যে নিশ্চয় জন্মে, তাহাতে ঐ দ্রব্যদ্বয়ের পরিমাণের আধিক্য ও ন্যূনতার জ্ঞান আবশ্যক। আধিক্য ও ন্যূনতার জ্ঞানে অপেক্ষার জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, যাহার অপেক্ষায় অধিক ও যাহার অপেক্ষায় ন্যূন, তাহা না বুঝিলে আধিক্য ও ন্যূনতা বুঝা যায় না। সুতরাং হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব বুঝিতে অপেক্ষার জ্ঞান আবশ্যক হওয়ায় অপেক্ষা ব্যর্থ নহে। কিন্তু ঐ হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বরূপ পদার্থ অপেক্ষাকৃত নহে, উহা বাস্তব কারণজন্য বাস্তব ধর্ম্ম। তাৎপর্য্যটীকাকারও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব পরিমাণবিশেষ, উহা সৎ দ্রব্যের স্বাভাবিক অর্থাৎ বাস্তব ধর্ম্ম। উহার উৎপত্তিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দ্রব্যদ্বয়ের জ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই। কিন্তু উহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞান-সাপেক্ষ। ইক্ষুযষ্টি হইতে বংশযষ্টির দীর্ঘত্ব বুঝিতে এবং বংশযষ্টি হইতে ইক্ষুযষ্টির হ্রস্বত্ব বুঝিতে ইক্ষুযষ্টি ও বংশযষ্টির জ্ঞান আবশ্যক এবং বস্তুর পরস্পর ভেদও অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না, উহা অন্য বস্তুসাপেক্ষ নহে, কিন্তু উহার জ্ঞান অন্য বস্তুর জ্ঞানসাপেক্ষ। কারণ, ভেদ বুঝিতে যে বস্তু হইতে ভেদ, তাহা বুঝা আবশ্যক হয়। এইরূপ পিতৃত্ব পুত্রত্ব প্রভৃতিও পিত্রাদির স্বকীয় ধর্ম্ম, উহার উৎপত্তি পুত্রাদিসাপেক্ষ নহে। কিন্তু পিতৃত্বাদিধর্ম্মের জ্ঞানই পুত্রাদির জ্ঞানসাপেক্ষ। কারণ, যাহার পিতা, তাহাকে না বুঝিলে পিতৃত্ব বুঝা যায় না এবং যাহার পুত্র, তাহাকে না বুঝিলে পুত্রত্ব বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও পরত্ব ও অপরত্ব প্রভৃতি গুণ, নিজের উৎপত্তিতেই অপেক্ষা-বুদ্ধি-সাপেক্ষ, ইহা ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, তথাপি ঐ সকল পদার্থ লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক হওয়ায় অসৎ বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত অলীক হইলে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব, দূরত্ব ও নিকটত্ব প্রভৃতি পদার্থ লোকযাত্রার নির্ব্বাহক। পরন্তু ঐ সকল পদার্থ অপেক্ষা-বুদ্ধিসাপেক্ষ হইলেও উহার আধার-দ্রব্য, সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সর্ব্বশূন্যতাবাদী সকল পদার্থই সাপেক্ষ বলিয়া যে অসৎ বলিয়াছেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, সকল পদার্থই সাপেক্ষ নহে। উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন যে, হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব, পরত্ব অপরত্ব প্রভৃতি কতিপয় পদার্থকে সাপেক্ষ বলিয়া সমর্থন করিয়া, সকল পদার্থ সাপেক্ষ, সুতরাং অসৎ, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না। কারণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ ও তাহার জ্ঞানে পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং সকল পদার্থই সাপেক্ষ নহে। তাৎপর্য্য-টীকাকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ যুক্তির খণ্ডন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, নিত্য ও অনিত্য, এই দ্বিবিধ ভাব পদার্থই আছে। নিত্য পদার্থও যে "অর্থক্রিয়াকারী" অর্থাৎ কার্য্যজনক হইতে পারে, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ক্ষণিকত্ববাদ নিরাস করিতে উপপাদন করিয়াছি। অনিত্য পদার্থও স্বকীয় কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে; বিনাশ উহার স্বভাব নহে। বিনাশ উহার স্বভাব না হইলে কেহ বিনাশ করিতে পারে না, ইহা

নির্যুক্তিক। যদি বল, নীলকে কেহ পীত করিতে পারে না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নীল বস্ত্রকে পীত করিতে অবশ্যই পারা যায়। যেমন শ্যাম ঘট বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগবশতঃ রক্তবর্ণ হইতেছে, তদ্রূপ নীলবস্ত্রও পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষের বিলক্ষণ-সংযোগবশতঃ পীতবর্ণ হয়। যদি বল, নীলত্বকে কেহ পীতত্ব করিতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য, তাহা হইলে বলিব, ইহা সত্য। কিন্তু ভাবকেও কেহ অভাব করিতে পারে না, ইহাও আমরা বলিব। যদি নীলত্ব পীতত্ব বস্তু স্বীকার করিয়া নীলত্বকে পীতত্ব করা যায় না, এই কথা বল, তাহা হইলে ভাবপদার্থও আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ভাবকে অভাব করা যায় না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, যেমন কুম্ভে ক্রমশঃ শ্যাম রূপ ও রক্ত রূপ জন্মে, তদ্রূপ প্রথমে ঐ কুম্ভের অবয়বে কুম্ভ নামক দ্রব্য জন্মে এবং পরে তাহাতে বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে ঐ কুম্ভের বিনাশরূপ অভাব জন্মে। কিন্তু ঐ কুম্ভই অভাব নহে—যাহা ভাব, তাহা কখনই অভাব হইতে পারে না।

উদ্দ্যোতকর সর্ব্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বশূন্যতাবাদ সর্ব্বথা ব্যাহত ; সুতরাং অযুক্ত। প্রথম ব্যাঘাত এই যে, যিনি বলিবেন, "সকল পদার্থই অভাব", তাঁহাকে ঐ বিষয়ে প্রমাণ প্রশ্ন করিলে যদি তিনি কোন প্রমাণ বলেন, তাহা হইলে প্রমাণের সত্তা স্বীকার করায় তাঁহার কথিত সকল পদার্থের অসত্তা ব্যাহত হয়। কারণ, প্রমাণকে সৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর যদি উক্ত বিষয়ে কোন প্রমাণ না বলেন, তাহা হইলে প্রমাণের অভাবে তাঁহার ঐ মত সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণ ব্যতীতও যদি কোন মত সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "সকল পদার্থই সৎ" ইহাও বলিতে পারি। ইহাতেও কোন প্রমাণের অপেক্ষা না থাকায় প্রমাণ প্রশ্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয় ব্যাঘাত এই যে, যদি সর্ব্বশূন্যতাবাদী তাঁহার "সকল পদার্থই অভাব" এই বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই প্রতিপাদ্য পদার্থের সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সকল পদার্থেরই অসত্তা বলিতে পারেন না। আর যদি তিনি ঐ বাক্যের কোন প্রতিপাদ্য পদার্থও স্বীকার না করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার নিরর্থক বর্ণোচ্চারণ মাত্র। কারণ, প্রতিপাদ্য না থাকিলে তাহা বাক্যই হয় না। তৃতীয় ব্যাঘাত এই যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদী যদি তাঁহার "সর্ব্বমভাবঃ" এই বাক্যের বোদ্ধা ও বোধয়িতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ উভয় ব্যক্তির সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় সকল পদার্থেরই অসত্তা বলিতে পারেন না। বোদ্ধা ও বোধয়িতা ব্যক্তির সত্তা স্বীকার না করিলেও বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না। চতুর্থ ব্যাঘাত এই যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদী যদি "সর্ব্বমভাবঃ" এবং "সর্ব্বং ভাবঃ" এই বাক্যদ্বয়ের অর্থভেদ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই অর্থ-ভেদের সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সকল পদার্থের অসত্তা বলিতে পারেন না। ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থভেদ স্বীকার না করিলে তিনি ঐ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া "সর্ব্বমভাবঃ" এই বাক্যই বলেন কেন? তিনি "সর্ব্বং ভাবঃ" এই বাক্যই বলেন না কেন? সুতরাং তিনি যে, ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থভেদের সত্তা স্বীকার করেন, ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে তিনি আর সকল পদার্থেরই অসত্তা বলিতে পারেন না। উদ্দ্যোতকর এই সকল কথা বলিয়া

সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, এই সর্ব্বশূন্যতাবাদ যে যেরূপেই বিচার করা যায়, সেই সেইরূপেই অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারেই উপপত্তিসহ হয় না। সুতরাং উহা সর্ব্বথাই অযুক্ত। মহর্ষির "ব্যাহতত্বা-দযুক্তং" এই সূত্রের দ্বারা ও উদ্দ্যোতকরের কথিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাঘাতপ্রযুক্ত উক্ত মত সর্ব্বথা অযুক্ত, ইহাও সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়॥ ৪০ ॥

সর্ব্বশূন্যতা-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

—— ০ ——

ভাষ্য। অথেমে সংখ্যৈকান্তবাদাঃ—

সর্ব্বমেকং সদবিশেষাৎ। সর্ব্বং দ্বে-ধা নিত্যানিত্যভেদাৎ। সর্ব্বং ত্রে-ধা জ্ঞাতা, জ্ঞানং, জ্ঞেয়মিতি। সর্ব্বং চতুর্দ্ধা—প্রমাতা, প্রমাণং, প্রমেয়ং, প্রমিতিরিতি। এবং যথাসম্ভবমন্যেঽপীতি। তত্র পরীক্ষা।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সর্ব্বশূন্যতাবাদের পরে এই সমস্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" (বলিতেছি)—(১) সমস্ত পদার্থ এক, যেহেতু সৎ হইতে বিশেষ (ভেদ) নাই, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেই নির্ব্বিশেষে "সৎ" এইরূপ প্রতীতি হওয়ায় ঐ "সৎ" হইতে অভিন্ন বলিয়া সমস্ত পদার্থ একই। (২) সমস্ত পদার্থ দুই প্রকার, যেহেতু নিত্য ও অনিত্য, এই দুই ভেদ আছে, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য ভিন্ন আর কোন প্রকার ভেদ না থাকায় সমস্ত পদার্থ দুই প্রকারই। (৩) সমস্ত পদার্থ তিন প্রকার, (যথা) জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়। (৪) সমস্ত পদার্থ চারি প্রকার, (যথা) প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমিতি। এইরূপ যথাসম্ভব অন্যও অনেক "সংখ্যৈকান্তবাদ" (জানিবে)। সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" বিষয়ে পরীক্ষা (করিতেছেন)।

সূত্র। সংখ্যৈকান্তাসিদ্ধিঃ কারণানুপপত্ত্যুপ-পত্তিভ্যাং ॥৪১॥৩৮৪॥

অনুবাদ। "কারণে"র অর্থাৎ সাধনের উপপত্তি ও অনুপপত্তিপ্রযুক্ত "সংখ্যৈ-কান্তবাদ"সমূহের সিদ্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদি সাধ্যসাধনয়োর্নানাত্বং ? একান্তো ন সিধ্যতি, ব্যতি-রেকাৎ। অথ সাধ্যসাধনয়োরভেদঃ ? এবমপ্যেকান্তো ন সিধ্যতি, সাধনাভাবাৎ। নহি সাধনমন্তরেণ কস্যচিৎ সিদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। যদি সাধ্য ও সাধনের নানাত্ব (ভেদ) থাকে, তাহা হইলে "ব্যতি-রেকবশতঃ" অর্থাৎ সাধ্য হইতে সেই সাধনের অতিরিক্ত পদার্থত্ববশতঃ একান্ত

(পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদ) সিদ্ধ হয় না, আর যদি সাধ্য ও সাধনের অভেদ হয়, অর্থাৎ সাধ্য হইতে অতিরিক্ত সাধন না থাকে, এইরূপ হইলেও সাধনের অভাববশতঃ "একান্ত" (পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদ) সিদ্ধ হয় না। কারণ, হেতু ব্যতীত কোন পদার্থেরই সিদ্ধি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা-প্রসঙ্গে ঐ পরীক্ষা পরিশোধনের জন্যই "সর্ব্বশূন্যতা-বাদ" পর্য্যন্ত কতিপয় "একান্তবাদে"র খণ্ডন করিয়া, শেষে এই সূত্রের দ্বারা "সংখ্যৈকান্তবাদে"রও খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রে "সংখ্যৈকান্তাসিদ্ধিঃ" এই বাক্যের দ্বারা "সংখ্যৈকান্তবাদ"ই যে এখানে তাঁহার খণ্ডনীয়, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ঐ "সংখ্যৈকান্তবাদ" কাহাকে বলে, তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে চারি প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"র বর্ণন করিয়া, শেষে "এবং যথাসম্ভবমন্যেঽপীতি" এই সন্দর্ভের দ্বারা আরও যে অনেক প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" আছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার কোন এক পক্ষেই "অন্ত" অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে,[1] তাহাকে "একান্ত" বলা যায়। সুতরাং যে সকল বাদে (মতে) সংখ্যা একান্ত, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "সংখ্যৈকান্তবাদ" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত মতগুলি বুঝা যাইতে পারে। "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাষ্যকারের পাঠের উল্লেখ করিতে "অথেমে সংখ্যৈকান্ত-বাদাঃ" এইরূপ পাঠেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকায় "অথৈতে সংখ্যৈকান্তবাদাঃ" এইরূপ পাঠ উল্লিখিত দেখা যায়। সে যাহাই হউক, তাৎপর্য্যটীকাকারও "সংখ্যা একান্তা যেষু বাদেষু তে তথোক্তাঃ" এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) সকল পদার্থ এক। (২) সকল পদার্থ দুই প্রকার। (৩) সকল পদার্থ তিন প্রকার। (৪) সকল পদার্থ চারি প্রকার। এই চারিটি মতে যথাক্রমে একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ও চতুষ্ট সংখ্যা একান্ত অর্থাৎ ঐকান্তিক বা নিয়ত ; এ জন্য ঐ চারিটি মতই "সংখ্যৈকান্তবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মত—"সর্ব্বমেকং"।

তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে এই মতকে অদ্বৈতবাদ বা বিবর্ত্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব পদার্থ, তদ্‌ভিন্ন বাস্তব দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই। এই জগৎ সেই একমাত্র সৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে সর্পের ন্যায়

১। "তার্কিকরক্ষা"কার মহানৈয়ায়িক বরদরাজ হেত্বাভাস প্রকরণে "অনেকান্ত" শব্দের অর্থব্যাখ্যায় "অন্ত" শব্দের নিশ্চয় অর্থ বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ার্থবাচক "অন্ত" শব্দের দ্বারা নিয়তত্ব বা নিয়মের সাদৃশ্যবশতঃ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম অর্থই লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে কোন এক পক্ষে নিশ্চয় আছে, সেখানে সেই পক্ষেই নিয়ম স্বীকৃত হওয়ায় নিশ্চয় ও নিয়ম তুল্য পদার্থ। সুতরাং এখানে নিশ্চয়বাচক "অন্ত" শব্দের লক্ষণার দ্বারা নিয়ম অর্থ বুঝা যাইতে পারে। এখানে গ্রন্থকার বরদরাজের উহাই তাৎপর্য্য। মল্লিনাথের কথা-নুসারে "অন্ত"শব্দের দ্বারা নিয়ম অর্থ বুঝিলে এখানে "একান্ত" শব্দের দ্বারা একনিয়ত বা কোন এক পক্ষে নিয়মবদ্ধ, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু "অন্ত"শব্দের ধর্ম্ম অর্থেও প্রয়োগ আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি অন্যত্র ধর্ম্ম অর্থেও "অন্ত"শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মেই আরোপিত, সুতরাং গগন-কুসুমের ন্যায় একেবারে অসৎ বা অলীক না হইলেও মিথ্যা অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য, ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ বা বিবর্ত্তবাদ। এই মতে কোন পদার্থেরই এক ব্রহ্মের সত্তা হইতে অতিরিক্ত বাস্তব সত্তা না থাকায় সকল পদার্থ বস্তুতঃ এক, ইহা বলা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে ভাষ্যকার "সদবিশেষাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তিরই সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই "সৎ" শব্দের বাচ্য, সেই সৎ ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থেরই যখন বিশেষ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ নাই, তখন সকল পদার্থই বস্তুতঃ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং এক। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমতের বর্ণন ও সমর্থনপূর্ব্বক পরে এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা কিরূপে যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত খণ্ডিত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাৎপর্য্যটীকাকারও তাহা বিশদ করিয়া বুঝান নাই। "ন্যায়মঞ্জরী"কার মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কথা এই যে, অদ্বৈতবাদি-সম্মত "অবিদ্যা" নামে পদার্থ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত কোনরূপেই সমর্থিত হইতে পারে না। জগতে সর্ব্ব-সম্মত ভেদব্যবহার কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ঐ "অবিদ্যা" থাকিলেও ঐ "অবি-দ্যা"ই ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত সিদ্ধ হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি কোন পদার্থ স্বীকৃত হইলে এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্মরূপই ছিল, তখন ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন পদার্থ ছিল না, এই সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কথা সমর্থন করিতে জয়ন্তভট্টও শেষে মহর্ষি গোতমের এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত সূত্রপাঠে সূত্রে "কারণ" শব্দ স্থলে "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। জয়ন্তভট্ট সেখানে এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদি অদ্বৈত-সিদ্ধিতে কোন প্রমাণ থাকে, সেই প্রমাণই দ্বিতীয় পদার্থ হওয়ায় অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। আর যদি উহাতে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেও প্রমাণাভাবে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। (ন্যায়মঞ্জরী, ৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখানে ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদসমর্থক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রমাণাদি পদার্থকে একেবারে অসৎ বলেন নাই। যে পর্য্যন্ত প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার আছে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত প্রমাণেরও ব্যবহারিক সত্তা আছে। তাঁহারা প্রধানতঃ যে শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা অদ্বৈত মত সমর্থন করিয়াছেন, ঐ শ্রুতিও তাঁহাদিগের মতে পারমার্থিক বস্তু না হইলেও উহার ব্যবহারিক সত্তা আছে। এবং ঐ অবাস্তব প্রমাণের দ্বারাও যে, বাস্তব তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে, ইহা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদের চতুর্দ্দশ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে "ভামতী" টীকায় উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য পদার্থই স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু অবিদ্যা প্রভৃতি মিথ্যা বা অনির্ব্বাচ্য পদার্থ সমস্তই স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে অদ্বৈতবাদীদিগের অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-ভঙ্গ হয় না। কারণ, সত্য পদার্থ এক, ইহাই ঐ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সিদ্ধান্তের

"কারণ" অর্থাৎ সাধন বা প্রমাণ থাকিলে উহাই দ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয় না, এই এক কথায় অদ্বৈতবাদ বিচূর্ণ করিতে পারিলে উহার সংহার সম্পাদনের জন্য এতকাল হইতে নানা দেশে নানা সম্প্রদায়ে নানারূপে সংগ্রাম চলিত না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইতঃপূর্ব্বে "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি (১৯শ) সূত্রের দ্বারাও পূর্ব্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মহর্ষির সূত্র এবং ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দ্বারা পূর্ব্বে এবং এখানে যে, অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারি নাই। ভাষ্য ও বার্ত্তিকে শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদের কোন স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী কালে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র এবং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত খণ্ডনে মহর্ষির এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়।

ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রথমে ভাষ্যকারের "অথেমে সংখ্যৈকান্ত-বাদাঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে পদার্থের দ্বৈধ অর্থাৎ দ্বিপ্রকারতা, তদ্রূপ সত্ত্বরূপে পদার্থের একত্ব, ইহা স্পষ্ট অর্থ। বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন যে, অপর সম্প্রদায় "সর্ব্বমেকং" এই মতকে অদ্বৈতবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বৃত্তিকার অপর সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা বলিয়া এখানে যে, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি-সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। বৃত্তিকার পরে কল্পান্তরে "সর্ব্বমেকং" এই প্রথম মতের নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অথবা সমস্ত পদার্থ এক, অর্থাৎ দ্বৈতশূন্য। কারণ, "ঘটঃ সন্, পটঃ সন্" ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হওয়ায় ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই সৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া এক, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত পদার্থই সৎ হইলে সৎ হইতে সমস্ত পদার্থই অভিন্ন, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘট হইতে অভিন্ন যে সৎ, সেই সৎ হইতে পটও অভিন্ন হওয়ায় ঘট ও পট অভিন্ন, ইহাও সিদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত পদার্থই অভিন্ন হইলে সকল পদার্থই এক অর্থাৎ পদার্থের বাস্তব ভেদ বা দ্বিত্বাদি সংখ্যা নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। বৃত্তিকার শেষে এই মতের সাধকরূপে "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে আবার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যায় তাঁহার অরুচি প্রকাশ করিয়া, শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ খণ্ডন তাৎপর্য্যেই এই প্রকরণ সঙ্গত হয়। বৃত্তিকারের এই শেষ মন্তব্যের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, সূত্রে যে "সংখ্যৈকান্ত" শব্দ আছে, তাহার অর্থ কেবল অদ্বৈতবাদ, এবং ঐ অদ্বৈতবাদই এই প্রকরণে মহর্ষির খণ্ডনীয়। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বাস্তব কোন সাধন বা প্রমাণ নাই। অবাস্তব প্রমাণের দ্বারা বাস্তব তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং বাস্তব প্রমাণের অভাবে অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বাস্তব প্রমাণপদার্থ স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় সত্য পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয় না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টেরও এইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যায়। নচেৎ অন্য কোন ভাবে জয়ন্তভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথার উপপত্তি হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ একমাত্র যুক্তির দ্বারাই অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হইতে পারে কি না, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু এই

প্রকরণের দ্বারা একমাত্র পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদই মহর্ষির খণ্ডনীয় হইলে মহর্ষি এই সূত্রে স্বল্লাক্ষর ও প্রসিদ্ধ "অদ্বৈত" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সংখ্যৈকান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন ? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ বুঝাইতে "সংখ্যৈকান্ত" শব্দের প্রয়োগ আর কোথায় আছে, ইহাও দেখা আবশ্যক। আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ বুঝাইতে আর কোথায়ও "সংখ্যৈকান্ত" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই নাই। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন "সংখ্যৈকান্তবাদ" বলিয়া এখানে যে সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত মতই সুপ্রাচীন কালে "সংখ্যৈকান্তবাদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাই ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকারোক্ত "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি মতগুলি যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং মহর্ষি "সংখ্যৈকান্তা-সিদ্ধিঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যে, কেবল অদ্বৈতবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব ? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা উহা কোনরূপেই বুঝা যায় না।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার মহর্ষির এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সাধ্য ও সাধনের ভেদ থাকিলে সাধ্য হইতে অতিরিক্ত সাধন স্বীকৃত হওয়ায় "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হয় না। সাধ্য ও সাধনের ভেদ না থাকিলেও অর্থাৎ সাধ্য হইতে অতিরিক্ত সাধন না থাকিলেও সাধনের অভাবে পূর্ব্বোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হয় না। আমরা উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "সর্ব্বমেকং" এই "সংখ্যৈকান্তবাদে"র তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, সকল পদার্থই এক অর্থাৎ পদার্থের ভেদ বা দ্বিত্বাদি সংখ্যা কাল্পনিক। দ্রব্য গুণ প্রভৃতি পদার্থভেদ এবং ঐ সকল পদার্থের যে আরও অনেক প্রকার ভেদ কথিত হয়, তাহা বস্তুতঃ নাই। কারণ, "সৎ" হইতে কোন পদার্থেরই বিশেষ নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রকরণে সকল পদার্থই "অসৎ" এই মত খণ্ডিত হওয়ায় জ্ঞেয় সকল পদার্থই "সৎ" ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সকল পদার্থই সৎস্বরূপে এক, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ স্বীকার অনাবশ্যক। উক্ত মতের খণ্ডনে মহর্ষির যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষই আমরা বুঝিতে পারি এবং পরবর্ত্তী ৪৩শ সূত্র ও উহার ভাষ্যের দ্বারাও আমরা তাহা বুঝিতে পারি, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। এখানে উক্ত মত খণ্ডনে ভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, প্রথমে "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা যে সাধ্যের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, উহা হইতে ভিন্ন সাধন না থাকিলে ঐ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্য, তাহা নিজেই নিজের সাধন হয় না। সাধ্য ও সাধনের ভেদ থাকা আবশ্যক। কিন্তু যাঁহার মতে পদার্থের কোন বাস্তব ভেদই নাই, তাঁহার মতে সাধ্য ভিন্ন সাধন থাকা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বমেকং" এই প্রতিজ্ঞার্থ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তিনি যদি তাঁহার সাধ্য হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া, সেই পদার্থকেই তাঁহার সাধ্যের সাধন বলেন, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হয় না। কারণ, সাধ্য হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিলেই দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় "সর্ব্বমেকং" এই মত বাধিত হইয়া যায়। এইরূপ (২) নিত্য ও অনিত্য-ভেদে সকল পদার্থ দ্বিবিধ, এই দ্বিতীয় প্রকার

"সংখ্যৈকান্তবাদে"র তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভিন্ন পদার্থ-বিভাজক আর কোন ধর্ম্ম নাই। অর্থাৎ পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ নাই,—নিত্য ও অনিত্য, এই দুই প্রকারই পদার্থ। এইরূপ (৩) জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারই পদার্থ, এই তৃতীয় প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"র তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞানত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব ভিন্ন পদার্থ-বিভাজক আর কোন ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ নাই। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারই পদার্থ। এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞপ্তিও জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথার দ্বারা তিনি এই মতে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা জ্ঞানের সাধন বুঝিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কারণ, জ্ঞপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানকেও জ্ঞেয়মধ্যে গ্রহণ করিলে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা অন্য অর্থই বুঝিতে হয়। এইরূপ (৪) প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতি, এই চারি প্রকারই পদার্থ, এই চতুর্থ প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"রও তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব ও প্রমিতিত্ব ভিন্ন পদার্থ-বিভাজক আর কোন ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারই পদার্থ। মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ"ও খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, দ্বিতীয় মতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে সমস্ত পদার্থের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সিদ্ধ করিতে অন্যরূপে কোন পদার্থকে হেতু বলিতে হইবে। কারণ, সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থই সাধন হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়মতবাদী নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভিন্ন অন্য কোনরূপে পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার না করায় তিনি তাঁহার সাধ্যের সাধন বলিতে পারেন না। অন্য রূপে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, সেই পদার্থকে সাধন বলিলে তৃতীয় প্রকার পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে পদার্থ দ্বিবিধ, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। এইরূপ তৃতীয় মতে জ্ঞাতৃত্বাদিরূপে এবং চতুর্থ মতে প্রমাতৃত্বাদিরূপে পদার্থের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে উহা হইতে ভিন্নরূপে কোন ভিন্ন পদার্থকেই হেতু বলিতে হইবে। কারণ, সাধ্য বা প্রতিজ্ঞার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থই ভিন্নরূপে সাধন হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদী অন্য আর কোনরূপেই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করায় তাঁহাদিগের সাধ্যের সাধন বলিতে পারেন না। সুতরাং সাধনের অভাবে তাঁহাদিগের সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্যরূপে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, সেই পদার্থকে সাধন বলিলে তৃতীয় মতে চতুর্থ প্রকার ও চতুর্থ মতে পঞ্চম প্রকার পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় ঐ মতদ্বয় ব্যাহত হয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ "সংখ্যৈকান্তবাদ" সুপ্রাচীন কালে সম্প্রদায়ভেদে পরিগৃহীত হইয়াছিল, ইহা মনে হয়। তাই সুপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে ঐ চতুর্ব্বিধ মতের উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ "সংখ্যৈকান্তবাদে"র স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, শেষে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক "সংখ্যৈকান্তবাদ" বুঝিতে বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের "যথাসম্ভবং" এই বাক্যের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সকল পদার্থ পাঁচ প্রকার এবং সকল পদার্থ ছয় প্রকার এবং সকল পদার্থ সাত প্রকার, ইত্যাদিরূপে যে পর্য্যন্ত পদার্থের সংখ্যাবিশেষের নিয়ম সম্ভব হয়, সেই পর্য্যন্ত

পদার্থের সংখ্যাবিশেষের ঐকান্তিকত্ব বা নিয়তত্ব গ্রহণ করিয়া, যে সকল মতে পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল মতও পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মতের ন্যায় "সংখ্যৈকান্তবাদ"। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত অন্য "সংখ্যৈকান্তবাদে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ, অথবা রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ, অথবা পশু, পাশ, উচ্ছেদ ও ঈশ্বর ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত মত এবং এইরূপ আরও অনেক মতও "সংখ্যৈকান্তবাদ"বিশেষ। মাহেশ্বর-সম্প্রদায়বিশেষের মতে যে, (১) কার্য্য, (২) কারণ, (৩) যোগ, (৪) বিধি ও (৫) দুঃখান্ত, এই পঞ্চবিধ পদার্থ পশুপতি ঈশ্বর কর্তৃক পশুসমূহ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহের পাশ বিমোক্ষণ অর্থাৎ দুঃখান্ত বা মুক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ পঞ্চবিধ পদার্থবাদও এখানে বাচস্পতি মিশ্র "সংখ্যৈকান্তবাদে"র মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি বেদান্তদর্শনের ২য় অঃ, ২য় পাদের ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যভামতীতে চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বরসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সম্মত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনি কোন্ মতানুসারে পশু, পাশ, উচ্ছেদ ও ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া, কিরূপে ঐ মতকে "সংখ্যৈকান্তবাদ" বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। সাংখ্যসূত্রে (১ম অঃ, ৬১ম সূত্রে) "পঞ্চবিংশতির্গণঃ" এই বাক্যের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রেও পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্বই অভিপ্রেত, ইহা বুঝিলে পদার্থ বিষয়ে সাংখ্যমতকেও "সংখ্যৈকান্তবাদে"র অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। নব্য সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যসম্প্রদায় অনিয়ত পদার্থবাদী, এই প্রাচীন মতবিশেষের প্রতিবাদ করিয়া, প্রমাণসিদ্ধ সমস্ত পদার্থ ই সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে অন্তর্ভূত, ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত আর কোন পদার্থ ই নাই, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের "প্রকৃতিপুরুষাবিতি বা" এই বাক্যের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই প্রকারই পদার্থ, এই মতকেই তিনি এখানে এক প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই প্রকারে সকল পদার্থের বিভাগ করিলেও আবার প্রকৃতির নানাপ্রকার ভেদও অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই প্রকারই পদার্থ, ইহা বলিয়া ঐ মতকে "সংখ্যৈকান্তবাদে"র মধ্যে কিরূপে গ্রহণ করা যাইবে, তাহা চিন্তনীয়। সাংখ্যসম্প্রদায় গর্ভোপনিষদের "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ", "ষোড়শ বিকারাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া যে চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, উহার আন্তর্গণিক নানাপ্রকার ভেদও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। পরন্তু যে মতে পদার্থ অথবা পদার্থবিভাজক ধর্ম্মের সংখ্যাবিশেষ ঐকান্তিক বা নিয়ত, সেই মতকেই সংখ্যৈকান্তবাদের মধ্যে গ্রহণ করিলে আরও বহু মতই সংখ্যৈকান্তবাদের অন্তর্গত হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধবাদকেও সংখ্যৈকান্তবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাষ্যকারের "অন্যেঽপি" এই বাক্যের দ্বারা (১) রূপ স্কন্ধ, (২) সংজ্ঞাস্কন্ধ, (৩) সংস্কার স্কন্ধ, (৪) বেদনা স্কন্ধ ও (৫) বিজ্ঞান স্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধবাদ প্রভৃতির সমুচ্চয় বলিয়াছেন এবং তিনি ঐ মতকে সৌত্রান্তিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য যদি উক্ত মতে ঐ রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ ভিন্ন আর কোনপ্রকার পদার্থ না থাকে, অর্থাৎ যদি উক্ত মতে পদার্থের পঞ্চত্ব সংখ্যাই ঐকান্তিক বা নিয়ত হয়, তাহা হইলে উক্ত মতকেও পূর্ব্বোক্তরূপে সংখ্যৈকান্তবাদ-

বিশেষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু শারীরকভাষ্যে (২।২।১৮ সূত্রভাষ্যে) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য উক্ত মতের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন[১], তদ্দ্বারা জানা যায়, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে পরমাণুসমূহের সমষ্টি বলিয়া বাহ্য সংঘাত বলিয়াছেন এবং রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ-সমুদায়কে আধ্যাত্মিক সংঘাত বলিয়া উহাকেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে উহা হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, ঈশ্বরও নাই, কিন্তু বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আছে। ফলকথা, তাঁহারা যে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্কন্ধমাত্রকেই পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া "সর্ব্বং পঞ্চধা" এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও বলেন নাই। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় এখানে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতকেও কিরূপে সংখ্যৈকান্তবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। পূর্ব্বোক্ত রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের ব্যাখ্যা তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥৪১॥

সূত্র। ন কারণাবয়বভাবাৎ ॥৪২॥৩৮৫॥

অনুবাদ। (**পূর্ব্বপক্ষ**) না, অর্থাৎ **সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের** অসিদ্ধি হয় না, যেহেতু কারণের (সাধনের) অবয়বভাব **অর্থাৎ** সাধ্যের অবয়বত্ব বা অংশত্ব আছে।

ভাষ্য। ন সংখ্যৈকান্তানামসিদ্ধিঃ, কস্মাৎ ? কারণস্যাবয়বভাবাৎ। অবয়বঃ কশ্চিৎ সাধনভূত ইত্যব্যতিরেকঃ। এবং দ্বৈতাদীনামপীতি।

অনুবাদ। সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের অসিদ্ধি হয় না, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু কারণের (সাধনের) অবয়বত্ব আছে। (তাৎপর্য্য) কোন অবয়ব **অর্থাৎ** সাধ্য বা প্রতিজ্ঞাত পদার্থের কোন অংশই সাধনভূত, এ জন্য "অব্যতিরেক" অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের অভেদ আছে। এইরূপ দ্বৈত প্রভৃতির সম্বন্ধেও (বুঝিবে) [অর্থাৎ "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকল পদার্থের যে দ্বৈতাদির প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতেও প্রতিজ্ঞাত পদার্থের কোন অংশই সাধন হওয়ায় সাধ্য ও সাধনের অভেদ আছে]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা সংখ্যৈকান্তবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, সংখ্যৈকান্তবাদের অসিদ্ধি হয় না। কারণ, সাধনের "অবয়বভাব" অর্থাৎ

১। সংঘাতঃ পরমাণূনাং মহস্ত্বগ্নিসমীরণাঃ ॥
মনুষ্যাদিশরীরাণি স্কন্ধপঞ্চকসংহতিঃ।
স্কন্ধাশ্চ রূপ-বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-সংস্কার-বেদনাঃ ॥
পঞ্চভ্য এব স্কন্ধেভ্যো নান্য আত্মাস্তি কশ্চন।
ন কশ্চিদীশ্বরঃ কর্ত্তা স্বগতাভিশয়ং জগৎ ॥
—মানসোল্লাস, ষষ্ঠ উল্লাস ।২।৩,৪।

সাধ্যাবয়বত্ব বা সাধ্যের একদেশত্ব আছে। সূত্রে "কারণ" শব্দের অর্থ সাধন। "অবয়বভাব" শব্দের দ্বারা সাধ্য পদার্থের অংশত্ব বা একদেশত্বই বিবক্ষিত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদীর সাধ্যের যাহা "কারণ" বা সাধন, উহা ঐ সাধ্য পদার্থেরই অবয়ব অর্থাৎ অংশ, উহা ঐ সাধ্য হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। সুতরাং স্বীকৃত পদার্থ হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ সাধনরূপে স্বীকৃত না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মতের বাধ হইতে পারে না। সাধনের অভাবেও উক্ত মতের অসিদ্ধি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থই একত্বরূপে প্রতিজ্ঞাত হইলেও উহার অন্তর্গত কোন পদার্থই ঐ সাধ্যের সাধন হইবে; যাহা সাধন হইবে, তাহা ঐ সাধ্যেরই অবয়ব অর্থাৎ অংশবিশেষ। সুতরাং ঐ সাধ্য হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, ঐ সাধ্যের সাধনের অভাবও নাই। এইরূপ "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থই দ্বিত্বাদিরূপে প্রতিজ্ঞাত হইলেও উহার অন্তর্গত কোন পদার্থই ঐ সমস্ত সাধ্যের সাধন হইবে। যাহা সাধন হইবে, তাহা ঐ সমস্ত সাধ্যেরই অবয়ব অর্থাৎ অংশবিশেষ। সুতরাং উহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। ঐ সমস্ত সাধ্যের সাধনের অভাবও নাই। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"র সাধক হেতু আছে এবং ঐ হেতু সংখ্যৈকান্তবাদীর স্বীকৃত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থও নহে; সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা উক্ত মতের অসিদ্ধি হইতে পারে না॥ ৪২॥

সূত্র। নিরবয়বত্বাদহেতুঃ ॥৪৩॥৩৮৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) "নিরবয়বত্ব"প্রযুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় উহা হইতে পৃথক্ কোন অবয়ব বা অংশ না থাকায় (পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু।

ভাষ্য। কারণস্যাবয়বভাবাদিত্যয়মহেতুঃ, কস্মাৎ? সর্ব্বমেকমিত্যনপবর্গেণ প্রতিজ্ঞায় কস্যচিদেকত্বমুচ্যতে, তত্র ব্যপবৃক্তোঽবয়বঃ সাধনভূতো নোপপদ্যতে। এবং দ্বৈতাদিষ্বপীতি।

তে খল্বিমে সংখ্যৈকান্তা যদি বিশেষকারিতস্যার্থভেদবিস্তারস্য প্রত্যাখ্যানেন বর্ত্তন্তে? প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধান্মিথ্যাবাদা ভবন্তি। অথাভ্যনুজ্ঞানেন বর্ত্তন্তে সমানধর্ম্মকারিতোঽর্থসংগ্রহো বিশেষকারিতশ্চার্থভেদ ইতি? এবমেকান্তত্বং জহতীতি। তে খল্বেতে তত্ত্বজ্ঞানপ্রবিবেকার্থমেকান্তাঃ পরীক্ষিতা ইতি।

অনুবাদ। "কারণে"র (সাধনের) "অবয়বভাব"প্রযুক্ত ইহা অহেতু, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হয় না। (প্রশ্ন) কেন?

(উত্তর) "সকল পদার্থ এক" এই বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থের অপরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ কোন পদার্থেরই অপবর্গ বা পরিত্যাগ না করিয়া, সকল পদার্থকেই পক্ষরূপে গ্রহণপূর্ব্বক "সর্ব্বমেকং" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া (সকল পদার্থের) একত্ব উক্ত হইতেছে, তাহা হইলে "ব্যপবৃক্ত" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-কারীর পক্ষ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন সাধনভূত অবয়ব উপপন্ন হয় না। এইরূপ "দ্বৈত" প্রভৃতি মতেও (বুঝিবে) [অর্থাৎ "সর্ব্বমেকং" "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাবাক্যে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হইয়াছে, কোন পদার্থই পরিত্যক্ত হয় নাই ; সুতরাং ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞার্থের সাধন হইতে পারে, এমন কোন পৃথক্ অবয়ব উহার নাই। কারণ, যাহা উহার অবয়ব বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাও ঐ পক্ষ বা সাধ্য হইতে অভিন্ন ; সুতরাং উহা সাধন হইতে না পারায় উহার সাধন-ভূত অবয়ব নাই। সুতরাং নিরবয়বত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হইতে পারে না]।

পরন্তু সেই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত এই সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ, যদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত পদার্থভেদসমূহের অর্থাৎ নানা বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট নানাবিধ পদার্থের প্রত্যাখ্যানের (অস্বীকারের) নিমিত্তই বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-বিরোধবশতঃ মিথ্যাবাদ হয়। আর যদি (পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ) সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত পদার্থের সংগ্রহ অর্থাৎ সত্তা, নিত্যত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্মপ্রযুক্ত বহু পদার্থের একত্বাদিরূপে সংগ্রহ এবং বিশেষ ধর্ম্ম (ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি) প্রযুক্ত পদার্থের ভেদ, ইহা স্বীকারপূর্ব্বক বর্ত্তমান হয়, এইরূপ হইলে একান্তত্ব অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্বপ্রযুক্ত একান্তবাদত্ব ত্যাগ করে।

সেই এই সমস্ত একান্তবাদ তত্ত্বজ্ঞানের প্রবিবেকের নিমিত্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য (এখানে) পরীক্ষিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদ সমর্থন করিতে পূর্ব্বসূত্রে যে, সাধনের অবয়বভাব অর্থাৎ সাধনের সাধ্যাবয়বত্বকে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অহেতু অর্থাৎ হেতুই হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদীর যাহা প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য, তাহা নিরবয়ব, অর্থাৎ ঐ প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব নাই, যাহা ঐ প্রতিজ্ঞার্থের সাধন হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতু হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থেরই অপবর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকেই পক্ষরূপে গ্রহণপূর্ব্বক "সর্ব্বমেকং" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পূর্ব্বপক্ষবাদী সকল পদার্থে একত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষ হইতে ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ ভিন্ন কোন অবয়ব বা অংশ নাই। কারণ, তিনি যে পদার্থকে

সাধন বলিবেন, সেই পদার্থও তাঁহার পক্ষ বা সাধ্যেরই অন্তর্গত, উহা ঐ সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ; সুতরাং তাহা সাধন হইতে পারে না। কারণ, সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থই সাধন হইয়া থাকে। সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রতিপাদ্য বা প্রতিজ্ঞার্থ। ভাষ্যকার ঐ প্রতিজ্ঞার্থকেও এক প্রকার সাধ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধ্য বলিলে ঐ প্রতিজ্ঞার্থকেও বুঝা যায় (প্রথম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞার্থরূপ সাধ্যও অনুমানের পূর্ব্বে অসিদ্ধ থাকায় ঐ সাধ্যের অন্তর্গত কোন পদার্থও ঐ সাধ্য হইতে অভিন্ন বলিয়া ঐ সাধ্যের সাধন হইতে পারে না। তাই এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য হইতে ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ ভিন্ন সাধনভূত কোন অবয়ব নাই অর্থাৎ যাহা ঐ সাধ্যের অবয়ব বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা ঐ সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ না হওয়ায় সাধন হইতে পারে, এমন অবয়ব নাই। এখানে উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "সর্ব্বমেকমিত্যেতস্মিন্ প্রতিজ্ঞার্থে ন কিঞ্চিদপবৃজ্যতে অনপবর্গেন সর্ব্বং পক্ষীকৃতমিতি"। সুতরাং ভাষ্যেও "কস্যচিৎ অনপবর্গেণ প্রতিজ্ঞায়" এইরূপ যোজনা বুঝা যায়। বর্জ্জনার্থ "বৃজ্" ধাতুনিষ্পন্ন "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা বর্জ্জন বা পরিত্যাগ বুঝা গেলে "অনপবর্গ" শব্দের দ্বারা অপরিত্যাগ বুঝা যাইতে পারে। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, তাহাকে অনুমানের "পক্ষ" বলে। এখানে "সর্ব্বমেকং," "সর্ব্বং দ্বেধা" ও "সর্ব্বং ত্রেধা" ইত্যাদি প্রকার অনুমানে বাদী কোন পদার্থকেই পরিত্যাগ না করিয়া সর্ব্ব পদার্থকেই পক্ষ করিয়াছেন। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"অনপবর্গেণ সর্ব্বং পক্ষীকৃতং"। ভাষ্যে বি ও অপপূর্ব্বক "বৃজ্" ধাতুনিষ্পন্ন "ব্যপবৃক্ত" শব্দের দ্বারা পরিত্যক্ত অর্থ বুঝিলে বাদীর পরিত্যক্ত অর্থাৎ বাদী যাহাকে পক্ষ বা সাধ্যমধ্যে গ্রহণ করেন নাই, এইরূপ অর্থ উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বৃজ্ ধাতুর ভেদ অর্থ গ্রহণ করিলে "ব্যপবৃক্ত" শব্দের দ্বারা সহজেই ভিন্ন অর্থ বুঝা যায়। বৃজ্ ধাতুর ভেদ অর্থেও প্রাচীন প্রয়োগ আছে[১]। তাহা হইলে বাদীর সাধ্য বা প্রতিজ্ঞার্থ হইতে "ব্যপবৃক্ত" অর্থাৎ ভিন্ন সাধনভূত অবয়ব নাই, ইহা ভাষ্যার্থ বুঝা যাইতে পারে। যাহা সাধ্য, তাহা সাধন হইবে না কেন ? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থেরই নিজের স্বরূপে নিজের ক্রিয়া হয় না, সুতরাং যাহা প্রতিপাদ্য বা বোধনীয়, তাহাই প্রতিপাদক অর্থাৎ বোধক হইতে পারে না, যাহা কর্ম্ম, তাহা করণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতে নিজে বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহ বিশেষ ধর্ম্ম-প্রযুক্ত নানা পদার্থভেদের প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অস্বীকারের নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় মিথ্যাবাদ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটত্ব পটত্বাদি নানা বিশেষধর্ম্মপ্রযুক্ত ঘটপটাদি নানা পদার্থভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ, সুতরাং উহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বমেকং", "সর্ব্বং দ্বেধা", "সর্ব্বং ত্রেধা" ও "সর্ব্বং চতুর্দ্ধা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাদী, যদি ঐ ঘটত্ব পটত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ঘটপটাদি নানা পদার্থ-ভেদ প্রত্যাখ্যান করেন অর্থাৎ পদার্থের প্রমাণ-সিদ্ধ ব্যক্তিভেদ ও নানাপ্রকারভেদ একেবারে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে

১। যথা "রেফবর্জ্জযপে পরে রেফবর্জ্জনম্ বা স্যাৎ"। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, হসন্ধিপ্রকরণ।

ঐ সমস্ত বাদই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় অসত্যবাদ হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত বাদ একেবারেই অগ্রাহ্য। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের স্বরূপ বুঝা যায় যে, সংখ্যৈকান্তবাদীরা পদার্থের সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ভেদ স্বীকার করেন না। তন্মধ্যে "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি মতবাদীরা তাঁহাদিগের কথিত প্রকার-ভেদ ভিন্ন পদার্থের আর কোন প্রকারভেদও মানেন না। কারণ, তাহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত মত একান্তবাদ হয় না। তাঁহাদিগের কথিত প্রকারভেদও অন্য সম্প্রদায়ের অসম্মত না হওয়ায় উহা সাধন করাও ব্যর্থ হয়। সত্তারূপ সামান্য ধর্ম্মরূপে সকল পদার্থের একত্ব এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপে সকল পদার্থের দ্বিত্বাদি অন্য সম্প্রদায়েরও সম্মত ; উহা স্বীকারে কোন সম্প্রদায়েরই কিছু হানি নাই। বহু পদার্থের কোন সামান্য ধর্ম্মপ্রযুক্ত একরূপে যে সেই পদার্থের সংগ্রহ, (যেমন প্রমেয়ত্বরূপে সকল পদার্থই এক এবং দ্রব্যত্বরূপে সকল দ্রব্য এক ইত্যাদি), ইহা নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। কিন্তু ঘটত্ব পটত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত যে পদার্থভেদ, তাহাও প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ স্থাণুর বক্র কোটরাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষ হইতে ভেদ এবং পুরুষের হস্তাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত স্থাণু হইতে ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য। স্থাণু ও পুরুষের এবং ঐরূপ অসংখ্য পদার্থের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং স্থাণু ও পুরুষ প্রভৃতি পদার্থভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত পদার্থেরও অপলাপ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা পদার্থের সংগ্রহ এবং বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা পদার্থভেদ, যাহা আমরাও স্বীকার করি, তাহা স্বীকার করিয়াই যদি পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহ কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বাদে পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব বা নিয়তত্ব না থাকায় উহার "সংখ্যৈকান্তবাদ"ত্ব থাকে না। অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের অভিমত সংখ্যৈকান্তবাদ সিদ্ধ হয় না। যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা সিদ্ধই আছে ; কারণ, আমরাও তাহা স্বীকার করি ; কিন্তু আমরা পদার্থের সংখ্যামাত্র স্বীকার করিলেও ঐ সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব বা নিয়তত্ব স্বীকার করি না। মহর্ষি গোতমের সর্ব্বপ্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ থাকিলেও সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক উল্লেখ নাই। সুতরাং মহর্ষি গোতমের নিজের সিদ্ধান্তেও পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব বুঝা যাইতে পারে না। মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থকেই সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন আর যে, কোন পদার্থই নাই, ইহা নহে। তাঁহার কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্ন আরও যে অসংখ্য সামান্য প্রমেয় আছে, ইহা ভাষ্যকারও স্পষ্ট বলিয়াছেন। (প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা "সর্ব্বমেকং সদবিশেষাৎ" এই বাক্যের দ্বারা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সত্তাসামান্যই পদার্থের তত্ত্ব, পদার্থের ভেদসমূহ কাল্পনিক, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভেদ ব্যতীত সামান্য থাকিতেই পারে না। অর্থাৎ সামান্য স্বীকার করিলে বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে। নির্ব্বিশেষ সামান্য শশশৃঙ্গাদির ন্যায় থাকিতেই পারে না। পদার্থের বাস্তব ভেদই বিশেষ। উহা স্বীকার না করিলে সত্তাসামান্যই তত্ত্ব, ইহা বলা যায় না। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার সংখ্যৈকান্তবাদই সর্ব্বথা অসিদ্ধ।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা-প্রসঙ্গে এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ সংখ্যৈকান্ত-বাদসমূহের পরীক্ষা কেন করিয়াছেন ? তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রবিবেকের নিমিত্ত এখানে এই সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ পরীক্ষিত হইয়াছে। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ইহাই বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অদ্বৈত প্রভৃতি একান্তবাদে প্রেত্যভাব বাস্তব পদার্থ হয় না ; কেবল প্রেত্যভাব নহে, গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই বাস্তব তত্ত্ব হয় না, ঐ সমস্ত পদার্থ ই কাল্পনিক হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের প্রবিবেকের জন্য এখানে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" খণ্ডনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সমস্ত পদার্থের তাত্ত্বিকত্ব বা বাস্তবত্ব সমর্থন করিয়া, ষোড়শ পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের বাস্তব-বিষয়কত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ("সর্ব্বমেকং") সংখ্যৈকান্তবাদকে তাৎপর্য্য-টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও শেষোক্ত ("সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি) সংখ্যৈকান্তবাদসমূহ যে, অদ্বৈতবাদ নহে, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত মতে যে, "প্রেত্যভাব" কাল্পনিক পদার্থ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু ভাষ্যকারের "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ না বুঝিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে ঐ প্রথমোক্ত মতেও "প্রেত্যভাব" কাল্পনিক পদার্থ না হওয়ায় এখানে ঐ মতের খণ্ডনের দ্বারাও প্রেত্যভাবের বাস্তবত্ব সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু ইহা বলা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার সংখ্যৈকান্তবাদেই পদার্থের অতিরিক্ত কোন প্রকার-ভেদ না থাকায় প্রেত্যভাবত্বরূপে প্রেত্যভাব পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। (১) সত্তা, (২) অনিত্যত্ব, (৩) জ্ঞেয়ত্ব ও (৪) প্রমেয়ত্বরূপে প্রেত্যভাব পদার্থ স্বীকার করিলেও ঐ সত্তাদিরূপে প্রেত্যভাবের জ্ঞান মোক্ষের অনুকূল তত্ত্বজ্ঞান নহে। মহর্ষি গোতম-সম্মত দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, যাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ-ধর্ম্মপ্রকারেই হওয়া আবশ্যক। ঐ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত প্রেত্যভাবের বিশেষধর্ম্ম যে প্রেত্যভাবত্ব, তদ্রূপে উহার জ্ঞানই প্রেত্যভাবের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং মহর্ষি এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রেত্যভাবের প্রেত্যভাবত্বরূপে যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার উপপাদনের জন্য প্রেত্যভাবের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে শেষে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার সংখ্যৈকান্তবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত বাদের খণ্ডনের দ্বারা প্রেত্যভাবত্ব-রূপ বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ঐ বিশেষ ধর্ম্মরূপেও "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধি হওয়ায়, ঐ বিশেষ ধর্ম্মরূপেও প্রেত্যভাবের তত্ত্বজ্ঞান উপপন্ন হইয়াছে। সামান্য ধর্ম্মরূপে তত্ত্বজ্ঞানের পরে বিশেষ ধর্ম্মরূপে যে পৃথক্ তত্ত্বজ্ঞান, যাহা মোক্ষের অনুকূল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই এখানে "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবিবেক" বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। সুধীগণ তাৎপর্য্যটীকাকারের পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া এখানে ভাষ্যকারের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন ॥ ৪৩ ॥

সংখ্যৈকান্তবাদ-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

—o—

ভাষ্য। প্রেত্যভাবানন্তরং ফলং, তস্মিন্—

সূত্র। সদ্যঃ কালান্তরে চ ফলনিষ্পত্তেঃ সংশয়ঃ ॥ ॥৪৪॥৩৮৭॥

অনুবাদ। প্রেত্যভাবের অনন্তর "ফল" (পরীক্ষণীয়)। সেই "ফল"-বিষয়ে সংশয় জন্মে, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফল কি সদ্যঃই হয় ? অথবা কালান্তরে হয় ? এইরূপ সংশয় জন্মে ; কারণ, সদ্যঃ এবং কালান্তরে ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভাষ্য। পচতি দোগ্ধীতি সদ্যঃ ফলমোদনপয়সী, কর্ষতি বপতীতি কালান্তরে ফলং শস্যাধিগম ইতি। অস্তি চেয়ং ক্রিয়া, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ইতি, এতস্যাঃ ফলে সংশয়ঃ।

ন সদ্যঃ কালান্তরোপভোগ্যত্বাৎ, * স্বর্গঃ ফলং শ্রূয়তে, তচ্চ ভিন্নেঽস্মিন্ দেহভেদাদুৎপদ্যত ইতি ন সদ্যঃ, গ্রামাদিকামানামারম্ভ-ফলমপীতি।

অনুবাদ। "পাক করিতেছে", "দোহন করিতেছে", এই স্থলে অন্ন ও দুগ্ধরূপ ফল সদ্যঃই হয় অর্থাৎ পাকক্রিয়া ও দোহনক্রিয়ার অনন্তরই উহার ফল অন্ন ও দুগ্ধের লাভ হয়। "কর্ষণ করিতেছে," "বপন করিতেছে", এই স্থলে শস্যপ্রাপ্তি-রূপ ফল কালান্তরে হয়। "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" এই ক্রিয়াও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেদবিধি-বোধিত অগ্নিহোত্র নামক ক্রিয়াও আছে। এই ক্রিয়ার ফল বিষয়ে সংশয় হয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র নামক বৈদিক ক্রিয়ার ফল কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয় ? এইরূপ সংশয় জন্মে।

(উত্তর) কালান্তরে উপভোগ্যত্ববশতঃ (অগ্নিহোত্রের ফল) সদ্যঃ হয় না। বিশদার্থ এই যে, (অগ্নিহোত্রের) স্বর্গ ফল শ্রুত হয়। সেই ফল কিন্তু এই দেহ ভিন্ন (বিনষ্ট) হইলে দেহভেদের অনন্তর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বর্গলোকে তৈজস দেবদেহ উৎপন্ন হইলেই তখন স্বর্গফল জন্মে, এ জন্য সদ্যঃ হয় না। গ্রামাদিকামী ব্যক্তিদিগের আরম্ভের অর্থাৎ "সাংগ্রহণী" প্রভৃতি ইষ্টিকর্ম্মের ফলও সদ্যঃ হয় না।

---

* "ন সদ্যঃ" ইত্যাদি বাক্য মহর্ষি গোতমের সূত্র বলিয়াই বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উহা সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও উহার সূত্রত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐ বাক্যকে সূত্ররূপে গ্রহণ না করায় তদনুসারে উহা ভাষ্য বলিয়াই গৃহীত হইল। এই মতে ভাষ্যকার নিজেই এখানে ঐ বাক্যের দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংশয় নিরাস করিয়াছেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি নানা বিচারের দ্বারা তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত নবম প্রমেয় "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া, এখন অবসরসংগতিবশতঃ তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত দশম প্রমেয় "ফলে"র পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা "ফল" বিষয়ে পরীক্ষাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ফল কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয়? কারণ, সদ্যঃ এবং কালান্তরেও ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পাকক্রিয়ার ফল অন্ন এবং দোহনক্রিয়ার ফল দুগ্ধ সদ্যঃই হইয়া থাকে এবং কৃষি ও বীজবপনক্রিয়ার ফল শস্য-প্রাপ্তি কালান্তরেই হয়। অর্থাৎ অনেক ক্রিয়ার ফল যে সদ্যঃ এবং অনেক ক্রিয়ার ফল যে কালান্তরে হয়, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই বেদবিধি-বোধিত অগ্নিহোত্র-ক্রিয়ার ফল বিষয়ে সংশয় হয় যে, উহা কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয়? উক্ত সংশয়ের সমর্থন পক্ষে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদি ইহকালে লোকসমাজে প্রশংসাদি লাভই অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল হয়, তাহা হইলে ঐ ফল সদ্যঃই হয়, ইহা বলা যায়। কারণ, ঐ ফল অগ্নিহোত্র-ক্রিয়ার অনন্তরই হইয়া থাকে। অবশ্য অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল স্বর্গ, ইহা উক্ত বেদবিধিবাক্যে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সুখজনক পদার্থেও "স্বর্গ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং ঐ "স্বর্গ" শব্দের দ্বারা অগ্নিহোত্রীর ঐহিক সুখজনক প্রশংসাদি লাভও বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু পারলৌকিক কোন সুখবিশেষকে স্বর্গ বলিয়া গ্রহণ করিলে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াজন্য নানা অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা করিতে হয়। উক্ত বেদবিধিবাক্যে "স্বর্গ" শব্দের দ্বারা ঐহিক সুখজনক প্রশংসাদি লাভই বুঝিলে অদৃষ্ট কল্পনা-গৌরব হয় না। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার ফল পরলোকে হইয়া থাকে, ইহাই আস্তিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারের ফলে মধ্যস্থগণের সংশয় হইতে পারে যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয়? ভাষ্যকার এখানে উক্ত সংশয় খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল সদ্যঃ হইতে পারে না। কারণ, উহা কালান্তরে উপভোগ্য। উক্ত বেদবিধিবাক্যে স্বর্গই অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ স্বর্গ-ফল অগ্নিহোত্রকারীর বর্ত্তমান দেহ বিনষ্ট হইলে দেহ-ভেদের অনন্তর অর্থাৎ স্বর্গলোকে তৈজস দেবদেহ লাভ হইলে সেই দেহেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উহা কালান্তরীণ ফল হওয়ায় সদ্যঃ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল-বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় করিতে হইলে অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার কর্ত্তব্যতা ও তাহার কোন ফল আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই বেদবিধি ভিন্ন তদ্বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং উক্ত বিধিবাক্যানুসারে স্বর্গই যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অগ্নিহোত্রক্রিয়ার ফল সদ্যঃই হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সুখবিশেষই "স্বর্গ" শব্দের মুখ্য অর্থ[১]। উহা ইহলোকে হইতেই পারে না। উক্ত

১। "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং"॥

বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থকার উদ্ধৃত বচনকে স্মৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু "পরিমল" প্রভৃতি অনেক

বিধিবাক্যে "স্বর্গ" শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া কোন গৌণ অর্থ (সুখজনক প্রশংসাদি) গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বিধিবাক্যে "স্বর্গ" শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য হইলে প্রমাণ-সিদ্ধ অদৃষ্ট কল্পনাও করিতে হইবে। প্রামাণিক গৌরব দোষ নহে। যে সুখ ইহকালে ইহলোকে সম্ভবই হয় না, এমন নিরবচ্ছিন্ন সুখবিশেষই স্বর্গ শব্দের মুখ্য অর্থ, স্বর্গ শব্দ নানার্থ নহে, ইহা এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার জৈমিনিসূত্রাদির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল যখন পূর্ব্বোক্তরূপ স্বর্গ, তখন তাহা সদ্যঃ হইতে পারে না, তাহা কালান্তরীণ, এইরূপ নিশ্চয় হওয়ায় উক্ত ফল বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার এখানে শেষে "গ্রামাদি-কামানামারম্ভ-ফলমিতি" এই বাক্য কেন বলিয়াছেন, উহার তাৎপর্য্য কি? এ বিষয়ে বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে কোন কথাই পাওয়া যায় না। গ্রামাদি দৃষ্ট ফল লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের রাজসেবাদি কর্ম্মের ফল (গ্রামাদি লাভ) যেমন সদ্যঃ হয় না, উহা বিলম্বে কালান্তরেই হয়, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রক্রিয়ার অদৃষ্ট ফল স্বর্গ কালান্তরেই হয়, ইহা এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। অথবা বেদে যে, গ্রামকাম ব্যক্তি "সাংগ্রহণী" নামক যাগ করিবে, পশুকাম ব্যক্তি "চিত্রা" নামক যাগ করিবে, বৃষ্টিকাম ব্যক্তি "কারীরী" নামক যাগ করিবে, পুত্রকাম ব্যক্তি "পুত্রেষ্টি" নামক যাগ করিবে, ইত্যাদি বিধি আছে, তদনুসারে ভাষ্যকার এখানে পরে বলিয়াছেন যে, গ্রামাদিকামী ব্যক্তিদিগের কর্ম্মের ফলও সদ্যঃ হয় না। অর্থাৎ ভাষ্যকারের বক্তব্য এই যে, যেমন অগ্নিহোত্র ক্রিয়াজন্য পারলৌকিক স্বর্গফল সদ্যঃ হয় না, তদ্রূপ গ্রাম, পশু ও পুত্র প্রভৃতি ঐহিক ফলকামী ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠিত "সাংগ্রহণী" প্রভৃতি ইষ্টির ফল ঐ গ্রামাদি লাভও সদ্যঃ হয় না, সুতরাং উহাও সদ্যঃফল নহে। এই মতে কর্ম্ম সমাপ্তির পরেই যে ফল আর কোন দৃষ্ট কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহাই সদ্যঃফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন পাকক্রিয়ার ফল অন্ন এবং দোহনক্রিয়ার ফল দুগ্ধ। ভাষ্যকার নিজেও প্রথমে সদ্যঃফলের উহাই উদাহরণ বলিয়াছেন। এইরূপ লোকসমাজে প্রশংসাদি লাভই অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল হইলে উহাও সদ্যঃফল হইতে পারে। কারণ, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার পরে ঐ ফল আর কোন দৃষ্ট কারণকে অপেক্ষা করে না। ঐ ক্রিয়া করিলেই তজ্জন্য লোকসমাজে প্রশংসাদি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার স্বর্গ-ফল কালান্তরে উপভোগ্য, সুতরাং উহা সদ্যঃ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইরূপ গ্রাম, পশু, বৃষ্টি ও পুত্র প্রভৃতি দৃষ্ট ফল ইহকালে সেই শরীরে উপভোগ্য হইলেও ভাষ্যকারের মতে উহাও কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া সদ্যঃফল নহে। ভাষ্যে "গ্রামাদিকামানামারম্ভফলমপীতি" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়।

অবশ্য "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৈদিক যাগজন্য পশু প্রভৃতি ফল কাহারও সদ্যঃও হইয়া থাকে। তিনি ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, আমার পিতামহই (কল্যাণ স্বামী) গ্রাম কামনায় "সাংগ্রহণী" নামক ইষ্টি করিয়া উহার অনন্তরই "গৌরমূলক" নামক গ্রাম লাভ

প্রামাণিক গ্রন্থে উদ্ধৃত বচন শ্রুতি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। "স্বর্গকামো যজেত" এই বিধিবাক্যের শেষ অর্থবাদরূপ শ্রুতি বলিয়াই উহা কথিত হইয়া থাকে।

করিয়াছিলেন (ন্যায়মঞ্জরী, ২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উক্ত গ্রাম লাভে "সাংগ্রহণী" যাগ কারণ হইলেও উহার পরে ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ গ্রামের প্রতিগ্রহও উহার দৃষ্ট কারণ। কারণ, সেখানে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ গ্রাম দান না করিলে ঐ যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁহার ঐ গ্রাম লাভ হইতে পারে না। ঐ যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁহার নিকটে গৌরমূলক নামক গ্রাম উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা জয়ন্তভট্টও দেখেন নাই ও তাহা বলেন নাই। সুতরাং উক্ত গ্রামলাভও যে সদ্যঃফল নহে, ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ "কারীরী" যাগের অনন্তরই যেখানে বৃষ্টি হইয়াছে, সেখানেও উহা সদ্যঃফল নহে, ইহা বলা যায়। কারণ, "কারীরী" যাগের দ্বারা বৃষ্টির প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিই হইয়া থাকে। তাহার পরে বৃষ্টির যাহা দৃষ্ট কারণ, তাহা হইতেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং উহাও দৃষ্ট কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া সদ্যঃফল নহে। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র টীকার প্রথমে মঙ্গলের কারণত্ব বিচার-প্রসঙ্গে মহাদেব ভট্টও বৃষ্টির প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিই "কারীরী" যাগের ফল বলিয়াছেন। এইরূপ পুত্রেষ্টি যাগের ফল পুত্রও ঐ যাগ-সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই জন্মে না। উহাও পুত্রোৎপত্তির কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া সদ্যঃফল নহে। উহা ইহকালে উপভোগ্য ফল হইলেও সদ্যঃফল হইতে পারে না। কর্ষণ ও বপনক্রিয়ার ফল শস্যপ্রাপ্তি ঐহিক ফল হইলেও ভাষ্যকার উহাকে সদ্যঃফল বলেন নাই। কারণ, উহাও কাল-বিশেষরূপ কারণান্তরসাপেক্ষ। এইভাবে ভাষ্যকারের মতে বেদোক্ত গ্রামাদি ফলও সদ্যঃফল নহে ॥৪৪॥

সূত্র। কালান্তরেণানিষ্পত্তির্হেতুবিনাশাৎ ॥৪৫॥৩৮৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) হেতুর অর্থাৎ যাগাদি কারণের বিনাশ হওয়ায় কালান্তরে (স্বর্গাদি ফলের) উৎপত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্য। ধ্বস্তায়াং প্রবৃত্তৌ প্রবৃত্তেঃ ফলং ন কারণমন্তরেণোৎপত্তুমর্হতি। ন খলু বৈ বিনষ্টাৎ কারণাৎ কিঞ্চিদুৎপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। "প্রবৃত্তি" অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম (যাগাদি) বিনষ্ট হইলে কারণ ব্যতীত ঐ কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু বিনষ্ট কারণ হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। যাগাদি শুভ কর্ম্মের ফল স্বর্গ এবং ব্রহ্মহত্যাদি অশুভ কর্ম্মের ফল নরক, কাহারও সদ্যঃ হইতে পারে না। কারণ, ঐ ফল কালান্তরে ভিন্ন দেহে উপভোগ্য, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ফল যে, কালান্তরেই হয়, এই পক্ষই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই মহর্ষি ঐ পক্ষই গ্রহণ করিয়া, উহাতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, কালান্তরেও স্বর্গ নরকাদি ফলের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, উহার কারণ বলিয়া যে যাগাদি কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা ঐ স্বর্গ নরকাদি ফলের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিনষ্ট কারণ হইতে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা কারণ, তাহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে

থাকা আবশ্যক। কিন্তু যাগাদি কর্ম্ম যখন স্বর্গাদি ফলের বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়, তখন তাহা হইতে স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি কোনরূপেই হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে, যাগাদি ক্রিয়ার স্বর্গাদি ফল নাই, উহা অলীক। কারণ, যাহা সদ্যঃও হইতে পারে না, কালান্তরেও হইতে পারে না, তাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা অলীক বলিয়াই বুঝা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষির ইহাই এখানে চরম তাৎপর্য্য ॥৪৫॥

সূত্র। প্রাঙ্ নিষ্পত্তের্বৃক্ষফলবৎ তৎ স্যাৎ ॥৪৬॥৩৮৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলোৎপত্তির পূর্ব্বে বৃক্ষের ফলে যেমন, তদ্রূপ সেই কর্ম্ম থাকে।

ভাষ্য। যথা ফলার্থিনা বৃক্ষমূলে সেকাদিপরিকর্ম্ম ক্রিয়তে, তস্মিংশ্চ প্রধ্বস্তে পৃথিবীধাতুরব্ধাতুনা সংগৃহীত আন্তরেণ তেজসা পচ্যমানো রসদ্রব্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি,—স দ্রব্যভূতো রসো বৃক্ষানুগতঃ পাকবিশিষ্টো ব্যূহবিশেষেণ সন্নিবিশমানঃ পর্ণাদিফলং নির্ব্বর্ত্তয়তি, এবং পরিষেকাদি কর্ম্ম চার্থবৎ। নচ বিনষ্টাৎ ফলনিষ্পত্তিঃ। তথা প্রবৃত্ত্যা সংস্কারো ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণো জন্যতে, স জাতো নিমিত্তান্তরানুগৃহীতঃ কালান্তরে ফলং নিষ্পাদয়তীতি। উক্তঞ্চৈতৎ "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তি"রিতি।

অনুবাদ। যেমন ফলার্থী ব্যক্তি বৃক্ষের মূলে সেকাদি পরিকর্ম্ম করে, সেই সেকাদি পরিকর্ম্ম বিনষ্ট হইলে জলধাতু কর্ত্তৃক সংগৃহীত পৃথিবী ধাতু আভ্যন্তরীণ তেজঃকর্ত্তৃক পচ্যমান হইয়া রসরূপ দ্রব্য উৎপন্ন করে। বৃক্ষানুগত পাকবিশিষ্ট সেই দ্রব্যভূত রস, আকৃতিবিশেষরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া (বৃক্ষে) পত্রাদি ফল উৎপন্ন করে, এইরূপ হইলে পরিষেকাদি অর্থাৎ বৃক্ষমূলে জলসেকাদি কর্ম্মও সার্থক হয়; কিন্তু বিনষ্ট পদার্থ হইতে অর্থাৎ বিনষ্ট জলসেকাদি কর্ম্ম হইতেই ফলের (বৃক্ষের পত্রাদির) উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ "প্রবৃত্তি" অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কার উৎপাদিত হয়,—উৎপন্ন সেই সংস্কার নিমিত্তান্তর

১। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভৌতিক দ্রব্যের ধারক, এজন্য উহা প্রাচীন কালে "ধাতু" বলিয়া কথিত হইত। "চরক-সংহিতা"র শারীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে "ষড়্ ধাতবঃ সমুদিতাঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি ষট্ পদার্থ ধাতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঐ "ধাতু" শব্দটি পারিভাষিক, ইহা কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত এবং বিজ্ঞান, এই ষট্ পদার্থকে ধাতু বলিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৯শ সূত্রের ভাষ্যভামতীতে "যথা ষণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াদ্বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে। তত্র পৃথিবীধাতুর্বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোতি" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ দেশবিশেষ, কালবিশেষ ও অভিনব দেহবিশেষাদি নিমিত্ত-কারণান্তরসহকৃত হইয়া কালান্তরে ফল (স্বর্গাদি) উৎপন্ন করে। ইহা (মহর্ষি গোতম কর্ত্তৃক) উক্তও হইয়াছে—(যথা) "পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হয়"।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও স্বর্গাদিফলোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যাপার থাকায় ঐ ব্যাপারবত্তা সম্বন্ধে সেই কর্ম্মও থাকে। অর্থাৎ বিনষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বর্গাদি ফলের কারণ নহে। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্মজন্য আত্মাতে ধর্ম্ম নামে যে সংস্কার জন্মে এবং হিংসাদি অশুভ কর্ম্মজন্য আত্মাতে যে অধর্ম্ম নামে সংস্কার জন্মে, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বর্গ ও নরকের কারণ হয়। শাস্ত্রে এই তাৎপর্য্যেই অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্ম এবং হিংসাদি অশুভ কর্ম্ম যথাক্রমে স্বর্গ ও নরকরূপ কালান্তরীণ ফলের জনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিনষ্ট কর্ম্মই যে, ঐ স্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, যাহা ফলোৎপত্তির বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট, তাহা উহার সাক্ষাৎ কারণ হইতেই পারে না। কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হইলেও উহাও অন্যান্য নিমিত্ত-কারণ-সহকৃত হইয়াই স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। সুতরাং কর্ম্মের অব্যবহিত পরেই কাহারও স্বর্গাদি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "নিমিত্তান্তরানুগৃহীতঃ কালান্তরে ফলং নিষ্পাদয়তি"। অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলভোগের অনুকূল দেশবিশেষ, কালবিশেষ এবং অভিনব শরীরবিশেষও উহার নিমিত্তান্তর। সুতরাং ঐ সমস্ত নিমিত্ত-কারণান্তর উপস্থিত হইলেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তকারণ আত্মাতে স্বর্গ ও নরকরূপ ফল উৎপন্ন করে। পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তান্তরগুলি কালান্তরেই উপস্থিত হয়, সুতরাং কালান্তরেই স্বর্গাদি ফল জন্মে, উহা সদ্যঃ হইতে পারে না। স্বর্গ ও নরকরূপ ফল যে, পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিবার জন্য ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" (৬০ম) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বেও ইহা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা শরীরের উৎপত্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় স্বর্গ ও নরকভোগের অনুকূল শরীরবিশেষও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-জন্য, ইহাও কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্বর্গ ও নরকরূপ ফলও যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য, ইহাও উহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, "বৃক্ষফলবৎ"। অর্থাৎ বৃক্ষের ফল যেমন জলসেকাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও কর্ম্মকারী আত্মার স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার মহর্ষির দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বৃক্ষের পত্রাদি ফলোৎপত্তির জন্য বৃক্ষের মূলে জলসেকাদি পরিকর্ম্ম করে। সংশোধক কর্ম্মবিশেষকেই "পরিকর্ম্ম" বলে। কিন্তু জলসেকাদি পরিকর্ম্ম বৃক্ষের পত্রাদি ফলোৎপত্তি-কাল পর্য্যন্ত থাকে না, উহা বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা বিনষ্ট হইলেও

উহারই ফলে সেই অঙ্কুরিত বৃক্ষের আধার পৃথিবী পূর্ব্বসিক্ত জলকর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থাৎ "সংগ্রহ" নামক বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট হইলে তখন উহার আভ্যন্তরীণ তেজঃকর্তৃক ঐ পৃথিবীতে পাক জন্মে। জল ও তেজের সংযোগে পার্থিব দ্রব্যের পাক হইয়া থাকে। তখন পচ্যমান সেই পৃথিবীধাতু অর্থাৎ সেই অঙ্কুরিত বৃক্ষের ধারক বা আধার পার্থিব দ্রব্য, রসরূপ দ্রব্য উৎপন্ন করে। সেই রসরূপ দ্রব্যও পার্থিব, সুতরাং উহাও ক্রমশঃ পাকবিশিষ্ট হইয়া, বিশেষ বিশেষ ব্যূহ বা আকৃতি লাভ করিয়া ঐ বৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি ফল উৎপন্ন করে। বৃক্ষমূলে জলসেকাদি পরিকর্ম্ম করিলে পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে কালান্তরে ঐ বৃক্ষে যে সমস্ত পত্রপুষ্পাদি জন্মে, ঐ সমস্তই এখানে বৃক্ষের ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূত্রে "ফল"শব্দের অর্থ এখানে জলসেকাদি কার্য্যের উদ্দেশ্য পত্রপুষ্পাদি ফল। পূর্ব্বোক্তরূপে বৃক্ষমূলে জলসেকাদি কর্ম্মদ্বারা বৃক্ষের যে পত্রপুষ্পাদি ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাতে পূর্ব্ববিনষ্ট জলসেকাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ কারণ নহে—পূর্ব্বোক্ত রসদ্রব্যই উহাতে সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বকৃত জলসেকাদি কর্ম্ম আবশ্যক, উহা ব্যর্থ নহে। কারণ, ঐ জলসেকাদি কর্ম্ম না করিলে পূর্ব্বোক্তক্রমে পূর্ব্বোক্ত রসদ্রব্য জন্মিতেই পারে না। সুতরাং সেই বৃক্ষের পত্রাদি ফলও জন্মিতেই পারে না। এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও যদিও পূর্ব্বে বিনষ্ট হওয়ায় স্বর্গাদি ফলের সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি উহা না করিলে যখন স্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎকারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে না, তখন স্বর্গাদিফলভোগে ঐ কর্ম্মও আবশ্যক। ঐ কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যাপারের সাক্ষাৎ কারণ হওয়ায় ঐ ব্যাপার দ্বারা ঐ কর্ম্মও স্বর্গাদির কারণ হইতে পারে। শাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। বিনষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই স্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে ॥৪৬॥

ভাষ্য। তদিদং প্রাঙ্‌নিষ্পত্তের্নিষ্পদ্যমানং—

সূত্র। নাসন্ন সন্ন সদসৎ, সদসতোর্ব্বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ॥৪৭॥৩৯০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) নিষ্পদ্যমান অর্থাৎ জায়মান সেই এই ফল উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ নহে, সৎ নহে, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ উক্ত উভয়রূপও নহে; কারণ, সৎ ও অসতের বৈধর্ম্ম্য (বিরুদ্ধ ধর্ম্মবত্তা) আছে, অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহা অসৎ হইতে পারে না, যাহা অসৎ, তাহা সৎ হইতে পারে না, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

ভাষ্য। **প্রাঙ্‌নিষ্পত্তের্নিষ্পত্তিধর্ম্মকং নাসৎ, উপাদাননিয়মাৎ, কস্যচিদুৎপত্তয়ে কিঞ্চিদুপাদেয়ং, ন সর্ব্বং সর্ব্বস্যেতি, অসদ্ভাবে নিয়মো নোপপদ্যত ইতি। ন সৎ, প্রাগুৎপত্তের্ব্বিদ্যমানস্যোৎপত্তিরনুপ-পন্নেতি। ন সদসৎ, সদসতোর্ব্বৈধর্ম্ম্যাৎ, সদিত্যর্থাভ্যনুজ্ঞা, অসদিত্যর্থ-**

প্রতিষেধঃ, এতয়োর্ব্যাঘাতো বৈধর্ম্ম্যং, ব্যাঘাতাদব্যতিরেকানুপপত্তি-রিতি।

অনুবাদ। উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে (১) "অসৎ" নহে; কারণ, উপাদান-কারণের নিয়ম আছে (অর্থাৎ) কোন বস্তুর উৎপত্তির নিমিত্ত কোন বস্তুবিশেষই উপাদেয় (গ্রাহ্য), সকল বস্তুর উৎপত্তির নিমিত্ত সকল বস্তু উপাদেয় নহে। "অসদ্ভাব" অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্ব হইলে (পূর্ব্বোক্তরূপ) নিয়ম উপপন্ন হয় না। (২) "সৎ" নহে, অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান নহে; কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। (৩) "সদসৎ"ও নহে, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ ও অসৎ, এই উভয়াত্মকও নহে। কারণ, সৎ ও অসতের বৈধর্ম্ম্য আছে। বিশদার্থ এই যে, "সৎ" ইহা পদার্থের স্বীকার, "অসৎ" ইহা পদার্থের নিষেধ, এই উভয়ের অর্থাৎ "সৎ" ও "অসতে"র ব্যাঘাতরূপ বৈধর্ম্ম্য আছে, ব্যাঘাতবশতঃ "অব্যতিরেকে"র অর্থাৎ "সৎ" ও "অসতে"র অভেদের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দশম প্রমেয় "ফলে"র পরীক্ষা করিতে প্রথমে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল যে, কালান্তরীণ এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পূর্ব্বে বিনষ্ট হইলেও (তজ্জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যাপারের দ্বারা) উহার ফল স্বর্গাদি যে কালান্তরেও হইতে পারে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুখ ও দুঃখের উপভোগ মুখ্য ফল হইলেও সুখ ও দুঃখ এবং উহার উপভোগের সাধন দেহাদিও ফল, ইহা প্রথম অধ্যায়ে "প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলং" (১।২০) এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলের পরীক্ষাও এখানে মহর্ষির পূর্ব্বকথিত ফল-পরীক্ষা। বস্তুতঃ জন্য পদার্থমাত্রই "ফল"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও মহর্ষিকথিত ফলের লক্ষণ-ব্যাখ্যায় উপসংহারে উহাই বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, ঐ ফল বা জন্যপদার্থমাত্র কি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, অথবা সৎ, অথবা সদসৎ? যদি উহার কোন পক্ষই সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ফলের অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং কার্য্যকারণভাবই অলীক হয়। তাহা হইলে মহর্ষির পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার ও সিদ্ধান্তও অসম্ভব। কারণ, যদি "ফলে"র অস্তিত্বই না থাকে, তবে আর তাহার কারণের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিবে? তাহার উৎপত্তির কাল ও কারণ বিষয়ে বিচারই বা কিরূপে হইবে? মহর্ষি এই জন্যই এখানে তাঁহার মতানুসারে ফল বা জন্য পদার্থমাত্রই যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, এই পক্ষই সমর্থন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, জায়মান যে ফল অর্থাৎ জন্য পদার্থ, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে "অসৎ", ইহা বলা যায় না এবং "সৎ", ইহাও বলা যায় না এবং "সদসৎ" অর্থাৎ "সৎ"ও বটে এবং "অসৎ"ও বটে, ইহাও বলা যায় না। তৃতীয় পক্ষ কেন বলা যায় না? তাই মহর্ষি সূত্রশেষে বলিয়াছেন,—"সদসতোর্ব্বৈধর্ম্ম্যাৎ" অর্থাৎ সৎ ও অসতের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা আছে। সতের ধর্ম্ম সত্ত্ব, অসতের ধর্ম্ম অসত্ত্ব—এই উভয়

পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা একাধারে থাকে না। সুতরাং জন্যপদার্থ সৎও বটে এবং অসৎও বটে, অর্থাৎ উহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এই উভয় ধর্ম্মই আছে, ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "সৎ" ইহা পদার্থের স্বীকার এবং "অসৎ" ইহা পদার্থের প্রতিষেধ, অর্থাৎ সৎ বলিলে পদার্থ আছে, ইহাই বলা হয় এবং অসৎ বলিলে পদার্থ নাই, ইহাই বলা হয়। সুতরাং একই পদার্থকে সৎ ও অসৎ উভয় বলা যায় না। যে পদার্থ সৎ, তাহাই আবার অসৎ হইতে পারে না। একই পদার্থে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ব্যাহত বা বিরুদ্ধ। সুতরাং ঐ ব্যাঘাতরূপ বৈধর্ম্ম্যবশতঃ সৎ ও অসতের যে "অব্যতিরেক" অর্থাৎ অভেদ, তাহা উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহাই অসৎ, ঐ উভয় অভিন্ন, ইহা কোনরূপে সম্ভব নহে। পূর্ব্বোক্ত ফল বা জন্যপদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, এই প্রথম পক্ষ কেন বলা যায় না? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"উপাদাননিয়মাৎ"। অর্থাৎ ভাবকার্য্যমাত্রেরই উপাদান-কারণের নিয়ম আছে। সকল পদার্থই সকল কার্য্যের উপাদান-কারণরূপে গৃহীত হয় না। পার্থিব ঘটের উৎপত্তির জন্য উপাদানরূপে মৃত্তিকাবিশেষই গৃহীত হয়। বস্ত্রের উৎপত্তির জন্য সূত্রই গৃহীত হয়। এইরূপ সমস্ত ভাবকার্য্যেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যবিশেষই যে, উপাদান-কারণ, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু ঐ ভাবকার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ বা সর্ব্বথা অবিদ্যমানই হয়, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ উপাদান-কারণনিয়মের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল কার্য্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে। কারণ, এই মতে ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট যেমন অসৎ, বস্ত্রাদি অন্যান্য কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও বস্ত্রাদিও ঐরূপ অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল কার্য্যেরই অসত্ত্ব সমান। তাহা হইলে মৃত্তিকাও বস্ত্রের উপাদান-কারণ হইতে পারে। সূত্রও ঘটের উপাদান-কারণ হইতে পারে। যদি মৃত্তিকা হইতে সর্ব্বথা অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে উহা হইতে সর্ব্বথা অবিদ্যমান বস্ত্রেরও উৎপত্তি হইতে পারিবে না কেন? উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন ঘটপটাদি সকল কার্য্যই অসৎ বা সর্ব্বথা অবিদ্যমান, তখন সকল পদার্থ হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি হউক? সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায় উৎপত্তির পূর্ব্বে ভাবকার্য্যকে সৎই বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে উৎপত্তি বলিতে বিদ্যমান কার্য্যেরই অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব। ঐ উৎপত্তির পূর্ব্বে ভাবকার্য্য তাহার উপাদান-কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমানই থাকে। যে পদার্থে যে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেই পদার্থই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ। বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রসমূহে পূর্ব্ব হইতেই সেই বস্ত্র সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই এই সূত্রসমূহ হইতেই সেই বস্ত্রের উৎপত্তি হয়— মৃত্তিকা হইতে উহার উৎপত্তি হয় না। ফলকথা, উক্ত মতে ভাবকার্য্যের উপাদান-কারণের নিয়মের উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষি গোতম এই সূত্রে "ন সৎ" এই বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জন্য পদার্থ যে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ, ইহাও বলা যায় না। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা বিদ্যমান, তাহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমানই আছে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? যাহা পূর্ব্বেই বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। সুতরাং তাহার আবার

উৎপত্তি হয় বলিলে উৎপন্নের পুনরুৎপত্তিই বলা হয়। কিন্তু তাহা কোনরূপেই সম্ভব হয় না। মূল কথা, জন্য পদার্থ বা কার্য্যমাত্রই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ নহে, সৎ নহে, সদসৎও নহে, উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। জন্য পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎও নহে, অসৎও নহে, ঐ উভয় হইতে বিপরীত চতুর্থ প্রকার, ইহাও একটি পক্ষ হইতে পারে। মহর্ষি ও ভাষ্যকার এখানে ঐ পক্ষের কোন উল্লেখ না করিলেও বার্ত্তিককার ঐ পক্ষেরও উল্লেখপূর্ব্বক উহার প্রতিষেধ করিতে বলিয়াছেন যে, সৎও নহে, অসৎও নহে, এমন কোন কার্য্য হইতেই পারে না। ঐরূপ কোন কার্য্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। সুতরাং তাদৃশ কার্য্য অলীক। যাহার স্বরূপ নির্দ্দেশই করা যায় না, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥৪৭॥

ভাষ্য। প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা, কস্মাৎ ?

অনুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহা তত্ত্ব, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রথম পক্ষই সত্য বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। উৎপাদ-ব্যয়দর্শনাৎ ॥৪৮॥৩৯১॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু উৎপত্তি ও বিনাশের দর্শন হয়।

টিপ্পনী। উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ জন্য পদার্থমাত্রই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সর্ব্বথা অবিদ্যমান, ইহাই আরম্ভবাদী মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, যখন ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন ঐ ঘটাদি কার্য্য যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ঘটাদি কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমানই থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা বিদ্যমানই আছে, তাহার আবার উৎপত্তি বলা যায় কিরূপে ? আত্মা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে এবং আত্মার কখনও বিনাশ হয় না, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় যেমন আত্মার উৎপত্তি বলা যায় না, তদ্রূপ সমস্ত ভাবকার্য্যই যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমানই থাকে, এবং উহার বিনাশ না হয়, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্য বা সকল পদার্থেরই নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার ন্যায় কোন পদার্থেরই উৎপত্তি বলা যায় না। কিন্তু ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ঘটাদিকার্য্যের নিয়ত কারণগুলি উপস্থিত হইলে উহার উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেরই পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং উহার দ্বারা ঘটাদিকার্য্য যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কারণ, বিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। অনেক জন্য পদার্থের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। মহর্ষি এই জন্যই সূত্রে বিনাশার্থক "ব্যয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, জন্য ভাবপদার্থ-মাত্রেরই যখন কোন সময়ে বিনাশ হয়, অন্ততঃ প্রলয়কালেও উহাদিগের বিনাশ স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঐ সমস্ত পদার্থের উৎপত্তিও স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, অনুৎপন্ন ভাব পদা-র্থের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা বিনাশী ভাব পদার্থ, তাহা উৎপত্তিমান, এইরূপ

ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ বিনাশিভাবত্ব হেতুর দ্বারা সমস্ত জন্য ভাবপদার্থের উৎপত্তিমত্ত্ব অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় সেই উৎপত্তিমত্ত্ব হেতুর দ্বারা ঐ সকল পদার্থেরই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসত্ত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্ত্ব বা বিদ্যমানতা থাকিলে উৎপত্তি হইতে পারে না। বিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি বলা যায় না।

ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বেই "প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা",—এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে উহার সাধকরূপে মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পঞ্চানন এবং "ন্যায়-সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদিগের মতে এখানে "প্রাগুৎ-পত্তেঃ" ইত্যাদি বাক্য সূত্রেরই প্রথম অংশ, উহা ভাষ্য নহে, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে ভাষ্যকার এই সূত্রের ভাষ্য করেন নাই, ইহা বলিতে হয়। কারণ, এই সূত্রের অবতারণা করিয়া ভাষ্যকার ইহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। আমাদিগের মনে হয়, ভাষ্যকার "প্রাগুৎপত্তেঃ" ইত্যাদি "কস্মাৎ?" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বেই এই সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিয়া, পরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়েও কোন স্থলে পূর্ব্বেই ভাষ্য প্রকাশ করিয়া, পরে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারও উহাই লিখিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ২২২—২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে ভাষ্যকারের "কস্মাৎ" এই প্রশ্নবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত "প্রাগুৎ-পত্তেঃ" ইত্যাদি বাক্য যে, তাঁহার নিজেরই বাক্য, ইহাও বুঝা যায়। ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহাই বুঝা যায়। "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" এবং "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থেও "উৎপাদব্যয়-দর্শনাৎ" এইরূপ সূত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে এখানে ঐরূপ সূত্রপাঠই গৃহীত হইল। ভাষ্যে "অদ্ধা" এই অব্যয় শব্দের অর্থ সত্য বা তত্ত্ব[১] ॥৪৮॥

ভাষ্য। যৎ পুনরুক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যং নাসদুপাদাননিয়মাদিতি—

অনুবাদ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ নহে, যেহেতু উপাদান-কারণের নিয়ম আছে, এই যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্র বলিয়াছেন)—

সূত্র। বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ ॥৪৯॥৩৯২॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই "অসৎ" অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যমান ভবিষ্যৎ কার্য্য (এই কারণের দ্বারাই জন্মে, অন্য কারণের দ্বারা জন্মে না, ইহা অনুমান-প্রমাণ-জন্য) বুদ্ধি-সিদ্ধই।

ভাষ্য। ইদমস্যোৎপত্তয়ে সমর্থং, ন সর্ব্বমিতি প্রাগুৎপত্তের্নিয়ত-কারণং কার্য্যং বুদ্ধ্যা সিদ্ধমুৎপত্তি-নিয়মদর্শনাৎ। তস্মাদুপাদাননিয়ম-স্যোপপত্তিঃ। সতি তু কার্য্যে প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিরেব নাস্তীতি।

১। তত্ত্বে ত্বদ্ধা হঞ্জসা দ্বয়ং।—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ।

অনুবাদ। এই কার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত এই পদার্থ সমর্থ, সকল পদার্থই সমর্থ নহে, এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে নিয়ত কারণবিশিষ্ট কার্য্য বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ অনুমান-রূপ বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ, যেহেতু উৎপত্তির নিয়ম দেখা যায়। অতএব উপাদান-কারণের নিয়মের উপপত্তি হয়। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য "সৎ" অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে উৎপত্তিই থাকে না, অর্থাৎ তাহা হইলে উৎপত্তি পদার্থই অলীক বলিতে হয়।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে মহর্ষির বক্তব্য বুঝা যায় যে, সেই ফল বা কার্য্যমাত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধ। কারণ, ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ ঘটাদি কার্য্য আছে, ইহা কেহই বুঝে না ; পরন্তু উহা নাই, ইহাই সকলে বুঝিয়া থাকে। সার্ব্বলৌকিক ঐ অনুভবের অপলাপ করিয়া কোনরূপেই ঘটাদি কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ বলা যায় না। কিন্তু কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইলে উপাদানের নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল কার্য্যের উপাদানকারণ হইতে পারে এবং লোকে সকল কার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত সকল পদার্থকেই উপাদান (গ্রহণ) করিতে পারে। অতএব কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ নহে, এই যে পূর্ব্বপক্ষ সর্ব্বপ্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ব্যতীত মহর্ষির নিজ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বব্যাখ্যাত ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তাহার উত্তরসূত্ররূপেই এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বার্ত্তিককার প্রভৃতিও এখানে ঐ ভাবেই সূত্রতাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই কার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত এই পদার্থই সমর্থ, সকল পদার্থ সমর্থ নহে, এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বেই কার্য্য যে নিয়তকারণবিশিষ্ট, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ। তাৎপর্য্য-টীকাকার ইহা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন যে,[1] সেই অসৎ অর্থাৎ ভাবি কার্য্য এই কারণের দ্বারাই জন্মে, অন্যের দ্বারা জন্মে না, ইহা অনুমান-প্রমাণ-জন্য বুদ্ধিসিদ্ধই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কোন দ্রব্য হইতে কোন কার্য্যের উৎপত্তি দেখিলে অথবা কোন প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করিলে তখন এই জাতীয় কার্য্যের প্রতি এই জাতীয় দ্রব্যই উপাদান-কারণ, এইরূপ সামান্যতঃ অনুমানপ্রমাণের দ্বারাই নিশ্চয় জন্মে। তদনুসারেই লোকে তজ্জাতীয় কার্য্যের উৎপাদন করিতে তজ্জাতীয় দ্রব্যকেই উপাদান-কারণরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও পূর্ব্বোক্তরূপে সামান্য কার্য্য-কারণ-ভাবজ্ঞানবশতঃ সেই কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উহাতে বিশেষ কার্য্য-কারণ-ভাব-জ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই। উদ্দ্যোতকরও এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত যে উপাদান নিয়ম উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের সত্তার সাধক বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা ঐ সত্তাপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু কারণের সামর্থ্যপ্রযুক্ত। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা না থাকিলেও পূর্ব্বোক্তরূপ উপাদান-নিয়মের উপপত্তি হয়।

১। তদসদ্ভাবিকার্য্যমনেনৈব কারণেন জন্যতে নান্যেন ইত্যনুমানাদ্বুদ্ধিসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ ।—তাৎপর্য্যটীকা।

কারণ, সকল পদার্থ হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না—পদার্থবিশেষ হইতেই কার্য্য-বিশেষের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই পদার্থই এই কার্য্যের উৎপাদনে সমর্থ, এইরূপ বুদ্ধি-বশতঃই যে কার্য্যের উৎপাদনে যে পদার্থ সমর্থ, সেই পদার্থকেই সেই কার্য্যের উৎপাদন করিতে গ্রহণ করে। ফলকথা, পদার্থবিশেষেই যে কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে সামর্থ্য আছে, ইহা উৎপত্তির নিয়ম দর্শনবশতঃই নিশ্চয় করা যায়। মৃত্তিকা হইতেই পার্থিব ঘট জন্মে, সূত্র হইতে জন্মে না, সূত্র হইতেই বস্ত্র জন্মে, মৃত্তিকা হইতে জন্মে না, এইরূপ নিয়ম পরিদৃষ্ট। সুতরাং মৃত্তিকায় পার্থিব ঘটোৎপাদনের সামর্থ্য আছে, সূত্রে উহা নাই; সূত্রে বস্ত্রোৎপাদনের সামর্থ্য আছে, মৃত্তিকায় উহা নাই, এইরূপে সর্ব্বত্রই কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে নিয়ত পদার্থবিশেষেরই সামর্থ্য অবধারিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্য যে নিয়তকারণ-বিশিষ্ট, ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও অবধারিত হয়। তাহা হইলে কার্য্যের উপাদান-কারণের নিয়মেরও উপপত্তি হয়। ভাষ্যকার প্রভৃতি যে "সামর্থ্য" বলিয়াছেন, উহার দ্বারা কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে পদার্থবিশেষেরই সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি আছে, সেই শক্তিবশতঃই পদার্থবিশেষই কার্য্যবিশেষ উৎপন্ন করে, উক্ত শক্তি না থাকায় সকল পদার্থই সকল কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে না, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে কারণত্বই কারণগত শক্তি। কারণত্ব ভিন্ন কারণের পৃথক্ কোন শক্তি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কারণত্ব ভিন্ন কারণগত আর যে কোন শক্তি নাই, ইহা বহু বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মৃত্তিকা হইতে পার্থিব ঘটের উৎপত্তি দেখিলে মৃত্তিকায় পার্থিব ঘটের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব আছে, ইহাই অবধারিত হয়। এইরূপ সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি দেখিলে সূত্রে বস্ত্রের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব আছে, ইহা অবধারিত হয়। মৃত্তিকা হইতে কখনও বস্ত্রের উৎপত্তি দেখা যায় না, সূত্র হইতে কখনও ঘটের উৎপত্তি দেখা যায় না, তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না, এ জন্য মৃত্তিকায় বস্ত্রকারণত্ব এবং সূত্রে ঘটকারণত্ব নাই, ইহাও অবধারিত হয়।

সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও অসৎ হয়, তাহা হইলে উহার উৎপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, যাহা অসৎ, তাহা উৎপন্ন করা যায় না। অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না—সহস্র শিল্পীও নীলকে পীত করিতে পারে না। এতদুত্তরে অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, যাহা সর্ব্বকালেই অসৎ, তাহাকেই কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, কোন কালেই তাহার সত্তা সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু কার্য্য ত গগনকুসুমাদির ন্যায় সর্ব্বকালেই অসৎ নহে। কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইলেও পরে সৎ। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই উভয়ই কার্য্যের ধর্ম্ম। তন্মধ্যে কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে তাহাতে "অসত্ত্ব" ধর্ম্ম থাকে এবং উৎপত্তিকাল হইতে কার্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহাতে "সত্ত্ব" ধর্ম্ম থাকে। কার্য্য যখন একেবারে অসৎ বা অলীক নহে, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ ধর্ম্মী না থাকিলেও তাহাতে তৎকালে অসত্ত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কারণ, কার্য্যরূপ ধর্ম্মী অসিদ্ধ নহে। ঐ ধর্ম্মী যখন পরে সৎ হইবে, তখন কালবিশেষে উহাতে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়ই থাকিতে পারে। ইহা স্বীকার

না করিলে সাংখ্যমতেরও উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, গাভীর স্তনমধ্যে দুগ্ধ থাকে, তদ্রূপই মৃত্তিকার মধ্যে ঘট থাকে, সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে। তিল প্রভৃতি হইতে তৈল প্রভৃতির আবির্ভাবের ন্যায় মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে ঘটাদি কার্য্যের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, যেমন তিল প্রভৃতির মধ্যে তৈলাদি থাকে, তদ্রূপই কি মৃত্তিকার মধ্যে ঘট থাকে? এবং সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে? সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি কি প্রকৃত স্থলে ঠিকই হইয়াছে? ঘট ও বস্ত্রাদি পদার্থ সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঠিক যেরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা জলাহরণাদি কার্য্য করিতেছেন, ঐ ঘটাদি পদার্থ কি বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক সেইরূপেই মৃত্তিকাদির মধ্যে ছিল? তাহা হইলে আর ঐ ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, "ঘট হয় নাই", "ঘট হইবে," "বস্ত্র হয় নাই", "বস্ত্র হইবে," ইত্যাদি কথা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু সাংখ্যসম্প্রদায়ও ত তখন ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যের দ্বারা ঘটত্বাদিরূপে ঘটাদি পদার্থের অসত্তা প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহাদিগেরও স্বীকার্য্য। ফল কথা, ধান্যের মধ্যে যেমন পূর্ব্ব হইতেই তণ্ডুলত্বরূপে তণ্ডুলের সত্তা আছে, গাভীর স্তনের মধ্যে যেমন পূর্ব্ব হইতেই দুগ্ধত্বরূপে দুগ্ধের সত্তা আছে, তদ্রূপ পূর্ব্ব হইতেই মৃত্তিকার মধ্যে ঘটত্বরূপে ঘটের সত্তা এবং সূত্রের মধ্যে বস্ত্রত্বরূপে বস্ত্রের সত্তা আছে, ইহা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণে পূর্ব্বে ঘটত্বাদিরূপে ঘটাদি পদার্থ যে অসৎ, ইহা সাংখ্যসম্প্রদায়ও স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে ঘটত্বাদিরূপে অসৎ ঘটাদি ধর্ম্মীতে অসত্ত্বরূপ ধর্ম্ম তাঁহাদিগেরও স্বীকার্য্য।

সৎকার্য্যবাদ সমর্থনে সাংখ্যসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ, তাহাই ঐ কার্য্যের জনক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। অন্যথা মৃত্তিকা হইতেও বস্ত্রের উৎপত্তি এবং সূত্র হইতেও ঘটের উৎপত্তি কেন হয় না? কার্য্যের সহিত কারণের চিরন্তন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উক্তরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে কার্য্যের সহিত যে পদার্থ সম্বন্ধযুক্ত, সেই পদার্থই সেই কার্য্যের উৎপাদক হইয়া থাকে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায়। ঘটের সহিতই মৃত্তিকার সেই সম্বন্ধ আছে, বস্ত্রের সহিত উহা নাই, অতএব মৃত্তিকা হইতে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, বস্ত্রের উৎপত্তি হয় না। এখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-বশতঃ যদি ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বেও উহার সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, পূর্ব্বে ঘট অসৎ হইলে তাহার সহিত বিদ্যমান মৃত্তিকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। "সৎ" ও "অসতে" সম্বন্ধ অসম্ভব। সম্বন্ধের যে দুইটি আশ্রয়, যাহা দার্শনিক ভাষায় সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয়, তাহার একটি না থাকিলেও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যেমন ঘট বা ভূতল, ইহার কোন একটি পদার্থ না থাকিলেও ঐ উভয়ের সংযোগ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত। সুতরাং কারণের সহিত কার্য্যের যে সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহা কারণ ও কার্য্য উভয়ই বিদ্যমান না থাকিলে থাকিতে পারে না। অতএব

উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য্য আছে—কার্য্য, তখনও সৎ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কার্য্য ও কারণের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কারণের এমন শক্তি আছে, তৎপ্রযুক্তই সেই সেই কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যই উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলেও সেই কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, কারণগত সেই শক্তির সহিত কার্য্যের কোনই সম্বন্ধ না থাকিলে মৃত্তিকা হইতেও বস্ত্রের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, মৃত্তিকায় যে শক্তি স্বীকৃত হইতেছে, তাহার সহিত বস্ত্রকার্য্যের যেমন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ ঘটকার্য্যেরও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হইবে, বস্ত্রের উৎপত্তি হইবে না, ইহার নিয়ামক কিছুই নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত মতেও মৃত্তিকাদি কারণগত শক্তির সহিত ঘটাদি কার্য্যবিশেষেরই সম্বন্ধ আছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও তাহার সত্তা স্বীকার্য্য। কারণ, উহা তখন অসৎ হইলে উহার সহিত কারণগত শক্তির সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সৎ ও অসতের সম্বন্ধ অসম্ভব, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথার উত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, কার্য্য যদি একেবারেই অসৎ বা অলীক হইত, তাহা হইলেই উহার সহিত কাহারই কোন সম্বন্ধ সম্ভব হইত না। কিন্তু আমাদিগের মতে কার্য্য যখন উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই অসৎ, উৎপত্তিক্ষণ হইতেই সৎ, তখন তাহার সহিত তাহার কারণবিশেষের যে-কোন সম্বন্ধ অসম্ভব হইতে পারে না। আমাদিগের মতে ভাবকার্য্যের উৎপত্তিক্ষণ হইতেই তাহার উপাদান-কারণের সহিত ঐ কার্য্যের "সমবায়" নামক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। ঐ সম্বন্ধ আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক, সুতরাং উহা আধার উপাদানকারণ ও আধেয় ঘটাদি কার্য্যের সত্তাকে অপেক্ষা করায় কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কার্য্য ও কারণের কার্য্যকারণ-ভাবসম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। সামান্যতঃ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে যে জাতীয় কার্য্যের প্রতি যে জাতীয় পদার্থের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব পূর্ব্বে বুঝা যায়, তজ্জাতীয় কার্য্য ও সেই পদার্থের কার্য্যকারণ-ভাবসম্বন্ধও পূর্ব্বেই বুঝা যায় এবং সেই কারণগত শক্তি—যাহা আমাদিগের মতে কারণত্বরূপ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহার সহিতও কার্য্যবিশেষের কোন সম্বন্ধও অবশ্য পূর্ব্বেও বুঝা যায়। কার্য্যবিশেষে তাহার কারণগত-কারণত্ব-নিরূপিত কার্য্যত্ব সম্বন্ধ আছে, এবং সেই কারণেও সেই কার্য্যত্ব-নিরূপিত-কারণত্ব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ ও তদ্গত কারণত্বের (শক্তির) সহিত সেই কার্য্যের সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। ঐ সম্বন্ধ সংযোগ ও সমবায়াদি সম্বন্ধের ন্যায় আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক নহে, সুতরাং উহা ভবিষ্যৎ পদার্থেও থাকিতে পারে। ভবিষ্যৎ পদার্থের সহিত কাহারই কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহা বলা যায় না। আমাদিগের ভবিষ্যৎ মৃত্যু বিষয়ে আমাদিগের যে অবশ্যম্ভাবিত্বজ্ঞান জন্মে, তাহার সহিত সেই ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কি কোনই সম্বন্ধ নাই ? জ্ঞান ও বিষয়ের কোন সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে সকল জ্ঞানকেই সকলবিষয়ক বলা যায়। তাহা হইলে অমুক বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে, অমুক বিষয়ে জ্ঞান হয় নাই, এইরূপ কথাও বলা যায় না। সুতরাং যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তাহার সহিতই ঐ জ্ঞানের সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ

মৃত্যু বিষয়ে এখন যে জ্ঞান জন্মে, তাহার সহিত সেই মৃত্যুরও সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে। সেই সম্বন্ধের অনুরোধে সেই মৃত্যুও পূর্ব্ব হইতেই আছে, ইহা বলিলে জীবিত জীবমাত্রই মৃত, ইহাই বলা হয়। কারণ, জীবের মৃত্যুনামক জন্য পদার্থও ত মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই সৎ, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা সাংখ্যসম্প্রদায় সৎকার্য্যবাদের সমর্থন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মতে জীবের মৃত্যুপদার্থও উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ, নচেৎ তাহার কারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় উহা জন্মিতে পারে না, ইহাও তাঁহারা অবশ্য বলিতে বাধ্য। মৃত্যু ভাবপদার্থ না হইলেও উহার কারণের সহিত উহার সম্বন্ধ যে আবশ্যক, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সৎকার্য্যবাদ সমর্থনে সাংখ্যসম্প্রদায়ের চরম যুক্তি এই যে, উপাদান-কারণ ও কার্য্য বস্তুতঃ অভিন্ন। যে মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, উহা ঐ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সুবর্ণ-নির্ম্মিত বলয়াদি অলঙ্কার তাহার উপাদান সুবর্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। তন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র উহার উপাদান তন্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। এইরূপ ভাবকার্য্যমাত্রই তাহার উপাদান-কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণ হইতে ঘটাদিকার্য্য অভিন্ন পদার্থ হইলে ঐ ঘটাদিকার্য্যও উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাদিরূপে সৎ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণ যখন ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ, তখন উহা হইতে অভিন্ন ঐ ঘটাদিকার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে একেবারে অসৎ হইতে পারে না। সাংখ্যসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ সৎকার্য্যবাদ সমর্থনের জন্য উপাদান-কারণ ও তাহার কার্য্যের অভেদ সাধন করিতে নানা অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ঐ সকল অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, উপাদান-কারণ ও তাহার কার্য্যের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ঘটাদিকার্য্যের উপাদান মৃত্তিকাদি হইতে বিলক্ষণ আকৃতিবিশিষ্ট ঘটাদি কার্য্য যে, স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বুঝা যায়। মৃত্তিকা ও ঘটের যে অভেদ বুঝা যায়, তাহা মৃত্তিকার সহিত ঐ ঘটের সমবায় সম্বন্ধ-প্রযুক্ত। অর্থাৎ ঘটাদিকার্য্য মৃত্তিকাদি উপাদানকারণের সহিত অন্বিত অর্থাৎ সমবায় নামক বিলক্ষণ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়াই ঘটাদিকার্য্যকে মৃত্তিকাদি হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু ঘটাদি কার্য্য ও উহার উপাদান-কারণ যে, বস্তুতঃই স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ, তাহা নহে। পরন্তু পার্থিব ঘটেও মৃত্তিকাত্বজাতি আছে বলিয়া, ঐ ঘট ও মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্বরূপে যে অভেদ, তাহা ঐ উভয়ের স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত ভেদের বাধক নহে। কারণ, ঐরূপ অভেদ সকল পদার্থেই আছে। প্রমেয়ত্বরূপে বস্তুমাত্রের অভেদ আছে, দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্যমাত্রের অভেদ আছে। কিন্তু ঐরূপ অভেদ পদার্থের স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত ভেদের বাধক হইলে ঘটপটাদি বিভিন্ন পদার্থসমূহেরও স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত ভেদ থাকিতে পারে না। পরন্তু পার্থিব ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ও তজ্জন্য ঘটপদার্থ যে ভিন্ন, ইহা অনুমান প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ ঘটের দ্বারা যে জলাহরণাদিকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা উহার উপাদান-কারণ মৃত্তিকার দ্বারা হয় না, এবং ঐ মৃত্তিকাকে কেহ ঘট বলিয়া ব্যবহার করে না। এইরূপ আরও অনেক হেতুর দ্বারা মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণ হইতে

ঘটাদি কার্য্য যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী" গ্রন্থে (নবম কারিকার টীকায়) সাংখ্যসম্মত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথিত কার্য্য ও কারণের ভেদসাধক অনেকগুলি হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত হেতু উপাদান-কারণ ও কার্য্যের ঐকান্তিক ভেদ সিদ্ধ করিতে পারে না। বাচস্পতিমিশ্রের এই কথার দ্বারা তিনি যে, সাংখ্যমতেও উপাদান-কারণ ও কার্য্যের আত্যন্তিক ভেদই নাই, কিন্তু কোনরূপে ভেদও আছে, ইহাই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে মৃত্তিকায় যেরূপে ঘটের ভেদ আছে, সেইরূপে মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদ কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সেইরূপে মৃত্তিকায় ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ ঘট যে অসৎ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট কোনরূপে সৎ এবং কোনরূপে অসৎ, এই মতেরই সিদ্ধি হইবে। তাহা হইলে সদসদ্বাদ বা জৈনসম্মত "স্যাদ্বাদ" স্বীকারে বাধা কি? তাহা বলা আবশ্যক।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্র পূর্ব্বোক্ত স্থলে শেষে বলিয়াছেন যে, সূত্রদ্বারা আবরণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, বস্ত্রের দ্বারা উহা নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ কার্য্যভেদ বা প্রয়োজনভেদবশতঃ সূত্র ও বস্ত্র যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, কার্য্যভেদ থাকিলেই বস্তুর ভেদ থাকিবে, এইরূপ নিয়ম নাই। অবস্থাভেদে একই বস্তুর দ্বারাও বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। যেমন একজন শিবিকাবাহক শিবিকা-বহন করিতে পারে না, পথপ্রদর্শনরূপ কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু অপর শিবিকাবাহকদিগের সহিত মিলিত হইলে তখন শিবিকা বহন করিতে পারে। কিন্তু ঐ এক ব্যক্তি পূর্ব্বে ও পরে বিভিন্ন ব্যক্তি নহে। এইরূপ বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রগুলি প্রত্যেকে আবরণকার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলেও সকলে মিলিত হইয়া বস্ত্রভাব প্রাপ্ত হইলে, তখন উহারাই আবরণকার্য্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালীন সেই সূত্রসমূহ হইতে সেই বস্ত্রের ভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, শিবিকাবাহকগণ প্রত্যেকে অসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও মিলিত হইয়া শিবিকা বহন করে। কিন্তু বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রসমূহ প্রত্যেকে বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট না হইলে আবরণ-কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং ঐ সূত্রসমূহের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগজন্য সেখানে যে, বস্ত্রনামক একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, সেই দ্রব্যই আবরণ-কার্য্য সম্পাদন করে, ইহাই বুঝা যায়। নচেৎ পিণ্ডাকার সূত্রসমূহের দ্বারা বস্ত্রের কার্য্য কেন নিষ্পন্ন হয় না? ফলকথা, নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে ভগবদ্‌গীতার "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (২।১৬) এই শ্লোকার্দ্ধও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উহার দ্বারা সাংখ্য-সম্মত পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদই যে কথিত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতিও উহার দ্বারা সাংখ্যসম্মত সৎকার্য্যবাদেরই ব্যাখ্যা করেন নাই। উহার দ্বারা আত্মার নিত্যত্বই সমর্থিত হইয়াছে, ইহাই অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা। কারণ, ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে আত্মার নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; কার্য্যমাত্রের সর্ব্বদা সত্তা সেখানে বিবক্ষিত নহে। মীমাংসাচার্য্য মহামনীষী পার্থসারথি মিশ্রও

"শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে মীমাংসক মতানুসারে সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্‌গীতাবচনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "অসৎ" অর্থাৎ অবিদ্যমান আত্মার উৎপত্তি হয় না, "সৎ" অর্থাৎ চিরবিদ্যমান আত্মার বিনাশও হয় না, অর্থাৎ সমস্ত আত্মাই উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য, ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য। সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বদা সৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না এবং সৎ অর্থাৎ সদা বিদ্যমান সমস্ত কার্য্যেরই কখনও একেবারে বিনাশ হয় না, ইহা উক্ত বচনের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, উক্ত বচনের পূর্ব্বে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সমস্ত আত্মাই অনাদিকাল হইতে আছে এবং চিরদিনই থাকিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং পরে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই বচনের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই অর্থাৎ আত্মার চিরবিদ্যমানতা বা নিত্যত্বই সমর্থিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ফলকথা, ভগবদ্‌গীতার উক্ত বচনের নানারূপ তাৎপর্য্য বুঝা গেলেও উহার দ্বারা সাংখ্যসম্মত পূর্ব্বোক্ত সৎ-কার্য্যবাদই যে কথিত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় না। সেখানে প্রকরণানুসারে ঐরূপ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যায় না। প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারগণও সেখানে ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদখণ্ডনে নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসকসম্প্রদায়ের চরম কথা এই যে, যে যুক্তির দ্বারা সাংখ্যাদি সম্প্রদায় ঘটাদি কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই যুক্তির দ্বারা ঐ ঘটাদি কার্য্যের আবির্ভাবকেও তাঁহারা সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা হইলে ঐ আবির্ভাবের জন্য কারণ-ব্যাপার নিরর্থক। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকাদিতে ঘটাদি কার্য্য পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও তাহার আবির্ভাবের জন্যই কারণ-ব্যাপার আবশ্যক। কিন্তু ঐ আবির্ভাবও যদি পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তবে উহার জন্য কারণ-ব্যাপারের প্রয়োজন কি ? সূত্রে বস্ত্রও আছে, বস্ত্রের আবির্ভাবও আছে, তবে আর দেশে সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া উহার দ্বারা আবার বস্ত্র নির্ম্মাণের এত আয়োজন কেন ? যদি বল, সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবের জন্যই কারণ-ব্যাপার আবশ্যক, তাহা হইলে সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব, তাহার আবির্ভাব, ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত আবির্ভাবের স্বীকারে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে কোন আবি-র্ভাবই অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং সমস্ত আবির্ভাবকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রত্যেকেরই আবির্ভাব স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে শেষে উক্ত কথারও উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িক প্রভৃতি অসৎকার্য্যবাদীদিগের মতে ঘটাদি কার্য্যের যে উৎপত্তি, তাহাও তাঁহারা ঐ ঘটাদিকার্য্যের ন্যায় উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং সেই উৎপত্তিরও উৎপত্তি হয় এবং সেই দ্বিতীয় উৎপত্তিও পূর্ব্বে অসৎ পদার্থ, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে সেই উৎপত্তির উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত উৎপত্তি স্বীকারে অনবস্থাদোষ তাঁহাদিগের মতেও অপরিহার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, অনবস্থা প্রামাণিক হইলে উহা দোষই হয় না। কারণ, উহাতে অনবস্থা-দোষের লক্ষণ থাকে না (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি যদি তাঁহা

দিগের মতে প্রদর্শিত অনবস্থাকে প্রামাণিক বলিয়া দোষ না বলেন, তাহা হইলে সৎকার্য্যবাদী সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতেও প্রদর্শিত অনবস্থা প্রামাণিক বলিয়া দোষ হইবে না। কারণ, তাঁহাদিগের মতে ঘটাদি কার্য্য এবং তাহার আবির্ভাবও সৎ বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাবও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ফলকথা, অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি যেরূপে তাঁহাদিগের মতে প্রদর্শিত অনবস্থাদোষের পরিহার করিবেন, সাংখ্যসম্প্রদায়ও সেইরূপেই তাঁহাদিগের মতে প্রদর্শিত অনবস্থা-দোষের পরিহার করিবেন। নৈয়ায়িক প্রভৃতি যদি বলেন যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থের যে উৎপত্তি, উহা ঘটাদি পদার্থ হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, উহা ঘটাদিস্বরূপই, সুতরাং আমাদিগের মতে উৎপত্তির উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত উৎপত্তি স্বীকারের আপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনবস্থা-দোষের কোন আশঙ্কাই নাই। এতদুত্তরে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, বস্ত্র ও তাহার উৎপত্তি অভিন্ন পদার্থ হইলে "বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে" এই বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ হয়। কারণ, উক্ত মতে বস্ত্র ও তাহার উৎপত্তি একই পদার্থ হওয়ায় বস্ত্র বলিলেই উৎপত্তি বলা হয়, এবং উৎপত্তি বলিলেই বস্ত্র বলা হয়। সুতরাং কেবল বস্ত্র বলিলেই উৎপত্তির বোধ হওয়ায় উৎপত্তি-বোধক শব্দান্তর প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। অতএব অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় বস্ত্রের উৎপত্তিকে বস্ত্র হইতে ভিন্ন পদার্থই বলিতে বাধ্য। তাঁহারা বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রের সহিত বস্ত্রের সমবায় নামক সম্বন্ধ অথবা বস্ত্রে উহার সত্তা জাতির সমবায় নামক সম্বন্ধকেই উৎপত্তি পদার্থ বলিবেন। তাঁহারা নিজমতে উহা ভিন্ন উৎপত্তি পদার্থ আর কিছুই বলিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগের মতে সমবায় নামক সম্বন্ধ নিত্য পদার্থ বলিয়া সমবায়-সম্বন্ধরূপ উৎপত্তি পদার্থ নিত্যই হয়। কিন্তু তথাপি তাঁহা-দিগের মতে ঐ উৎপত্তির জন্যও কারণ-ব্যাপার যেরূপে সার্থক হয়, তদ্রূপ সাংখ্যমতেও পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ঘটাদি পদার্থেরই আবির্ভাবের জন্য কারণ-ব্যাপার সার্থক হইবে। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থের উৎপত্তিকে সমবায় নামক নিত্যসম্বন্ধরূপ স্বীকার করিলেও ঘটাদি পদার্থ যখন অনিত্য, উহা কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ, তখন ঐ ঘটাদি পদার্থের জন্যই কারণ-ব্যাপার সার্থক হয়। কেন না, কারণ-ব্যাপার ব্যতীত ঐ ঘটাদি পদার্থের সত্তাই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে ঘটাদি পদার্থ ও উহার আবির্ভাব, এই উভয়ই যখন সৎ, ঐ উভয়েরই সত্তা যখন পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ, তখন উক্ত মতে কারণ-ব্যাপার সার্থক হইতেই পারে না। তাঁহাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাব হইলে তখন যেমন আর কারণব্যাপার আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বেও কারণ-ব্যাপার অনাবশ্যক। কারণ, যাহা তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহার জন্য কারণব্যাপার আবশ্যক হইবে কেন? তাঁহারা যদি বলেন যে, ঘটাদি কার্য্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদির পরিণামই ঘটাদি কার্য্য। উহা পরিণামি-(মৃত্তিকাদি) রূপে পূর্ব্বে থাকিলেও পরিণামরূপে ঐ ঘটাদিকার্য্যের আবির্ভাবের জন্যই কারণব্যাপার আবশ্যক হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে পূর্ব্বে পরিণামরূপে ঘটাদিকার্য্যের অসত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু পরিণামরূপে ঘটাদিকার্য্যের আবির্ভাবও পূর্ব্বে সৎ না হইলে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইতে

পারে না। সুতরাং পরিণামরূপে ঘটাদিকার্য্যের আবির্ভাবও পূর্ব্ব হইতেই সৎ হইলে তাহার জন্য কারণ-ব্যাপার অনাবশ্যক। পরন্তু উৎপত্তি বলিতে আদ্যক্ষণ-সম্বন্ধ অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের সহিত তাহার প্রথম ক্ষণের সহিত যে কালিক সম্বন্ধ, তাহাই উৎপত্তিপদার্থ বলিলে উহা সমবায়-সম্বন্ধরূপ নিত্য পদার্থ হয় না। ঐ কালিক সম্বন্ধবিশেষও বস্তুতঃ ঘটাদিকার্য্যস্বরূপ, উহাও কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ উৎপত্তির জন্যও কারণ-ব্যাপার সার্থক হইতে পারে। কিন্তু ঘটাদিকার্য্য ও তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হইলেও উৎপত্তিমাত্রই বস্ত্রস্বরূপ না হওয়ায় বস্ত্রত্ব ও উৎপত্তিত্ব ধর্ম্মের ভেদ আছে। কারণ, বস্ত্রত্ব—বস্ত্রমাত্রগত ধর্ম্ম, উৎপত্তিত্ব—সমস্ত কার্য্যস্বরূপ উৎপত্তির সমষ্টিগত ধর্ম্ম। সুতরাং যেমন "ঘটঃ প্রমেয়ঃ" এইরূপ বাক্য বলিলে ঘটত্ব ও প্রমেয়ত্ব-ধর্ম্মের ভেদ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হয় না, তদ্রূপ "বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে" এইরূপ বলিলে বস্ত্রত্ব ও উৎপত্তিত্ব-ধর্ম্মের ভেদ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হইতে পারে না। ধর্ম্মী অভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের ভেদ থাকিলে যে, পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নচেৎ "ঘটঃ কম্বুগ্রীবাদিমান্" ইত্যাদি বহু বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ অনিবার্য্য হয়। সুতরাং কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট এবং ঘট, একই পদার্থ হইলেও ঘটত্ব ও কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ভেদ থাকাতেই "ঘটঃ কম্বুগ্রীবাদিমান্" এই বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। পরন্তু সাংখ্যসম্প্রদায় ঘটাদি কার্য্যের যে অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব বলিয়াছেন, উহাও তাঁহাদিগের মতে ঘটাদিকার্য্য হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে। নচেৎ ঐ আবির্ভাবের আবির্ভাব, তাহার আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকারে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য হয়। কিন্তু কার্য্যের উৎপত্তি পদার্থকে ঐ কার্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিলে উৎপত্তি পক্ষে যেমন অনবস্থা-দোষ হয় না, ইহা শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও স্বীকার করিয়াছেন, তদ্রূপ কার্য্যের আবির্ভাবকেও ঐ কার্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিলে আবির্ভাব পক্ষেও অনবস্থাদোষ হয় না। সুতরাং সাংখ্যমতেও কার্য্যের আবির্ভাব ঐ কার্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সাংখ্যমতেও "বস্ত্র আবির্ভূত হইতেছে" এই বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ কেন হয় না, ইহা অবশ্য বক্তব্য। যদি বস্ত্রত্ব ও আবির্ভাবত্বরূপ ধর্ম্মের ভেদবশতঃই পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহাই বলিতে হয়, তাহা হইলে "বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে" এই বাক্যেও পূর্ব্বোক্ত কারণে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহাও অবশ্যই বলা যাইবে।

ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর, গৌতম মত সমর্থন করিতে গর্দ্দভের শৃঙ্গ কেন জন্মে না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ বলিয়াই যে, উহার উৎপত্তি হয় না, ইহা নহে। কিন্তু গর্দ্দভে শৃঙ্গের উৎপত্তির কারণ না থাকাতেই উহার উৎপত্তি হয় না। গর্দ্দভে শৃঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায় না, এ জন্য গর্দ্দভ উহার কারণ নহে এবং সেখানে উহার অন্য কোন কারণও নাই, ইহাই অবধারণ করা যায়। কিন্তু সৎকার্য্যবাদী যে, গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ বলিয়াই গর্দ্দভে শৃঙ্গের উৎপত্তি হয় না বলিতেছেন, ইহাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে সকল কার্য্যই আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সৎ বলিয়া গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে উদ্দ্যোতকরের গূঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যবাদিসাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই সমগ্র জগতের মূল উপাদান এবং সমগ্র জগৎ বা সমস্ত জন্য পদার্থই সেই মূল প্রকৃতি হইতে অভিন্ন

ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং উক্ত মতে বস্তুতঃ সকল জন্য পদার্থই সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া সকল জন্য পদার্থেই সকল জন্য পদার্থের অভেদ আছে। কারণ, গো মহিষ প্রভৃতি শৃঙ্গবিশিষ্ট দ্রব্যের যাহা মূল উপাদান, তাহাই যখন গর্দ্দভেরও মূল উপাদান এবং সেই মূল প্রকৃতি হইতে গো, মহিষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই অভিন্ন, তখন গর্দ্দভেও গো মহিষাদির অভেদ আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে গো মহিষাদি দ্রব্যে শৃঙ্গ আছে, গর্দ্দভে শৃঙ্গ নাই, ইহা আর বলা যায় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে গর্দ্দভেও শৃঙ্গ আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ বলিয়াই তাহার উৎপত্তি হয় না, ইহা সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায় বলিতে পারেন না। ফল কথা, সৎকার্য্যবাদী উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তা পক্ষে যে উপাদান-কারণের নিয়মের অনুপপত্তিরূপ দোষ বলিয়াছেন, ঐ দোষ তাঁহার নিজমতেই হয়। কারণ, তাঁহার নিজমতে সকল জন্য পদার্থই সর্ব্বাত্মক বলিয়া সকল পদার্থেই সকল পদার্থ আছে। মৃত্তিকায় বস্ত্র নাই, সূত্রে ঘট নাই, বালুকায় তৈল নাই, ইত্যাদি কথা তিনি বলিতেই পারেন না। সুতরাং তাঁহার নিজমতে সকল পদার্থ হইতেই সকল পদার্থের আবির্ভাবের আপত্তি হয়। মৃত্তিকা হইতে বস্ত্রের আবির্ভাব, সূত্র হইতে ঘটের আবির্ভাব, বালুকা হইতে তৈলের আবির্ভাব কেন হয় না, ইহা সৎকার্য্যবাদী বলিতে পারেন না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বিচারপূর্ব্বক সৎ-কার্য্যবাদের মূল যুক্তি খণ্ডন করিয়া, শেষে পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তির সমর্থন করিয়াও সৎকার্য্য-বাদের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন ("ন্যায়মঞ্জরী", ৪৯৩—৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর সৎকার্য্যবাদীদিগের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন যে, সৎকার্য্যবাদীদিগের মধ্যে কেহ বলেন, সূত্রমাত্রই বস্ত্র, অর্থাৎ সূত্র হইতে বস্ত্র কোনরূপেই পৃথক্ দ্রব্য নহে। কেহ বলেন, আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট সূত্রসমূহই বস্ত্র। কেহ বলেন, সূত্রসমূহই বস্ত্ররূপে অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ সূত্রসমূহ সূত্ররূপে বস্ত্র হইতে ভিন্ন হইলেও বস্ত্ররূপে অভিন্ন। কেহ বলেন, সূত্র-সমূহ হইতে বস্ত্র নামে কোন দ্রব্যের আবির্ভাব হয় না, কিন্তু ঐ সূত্রেরই ধর্ম্মান্তরের আবির্ভাব ও ধর্ম্মান্তরের তিরোভাব মাত্র হয়। কেহ বলেন, শক্তিবিশেষবিশিষ্ট সূত্রসমূহই বস্ত্র। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত সকল পক্ষেরই সমালোচনা করিয়া অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে (নবম কারিকার টীকায়) অসৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ সমালোচনা "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "তাৎপর্য্যটীকা"র পাওয়া যায় না। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধরভট্ট "ন্যায়কন্দলী" গ্রন্থে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রোক্ত অনেক কথার উল্লেখ করিয়া সৎকার্য্যবাদ সমর্থনপূর্ব্বক বিস্তৃত বিচার দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ("ন্যায়কন্দলী", ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় মীমাংসকসম্প্রদায়ও সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করেন নাই। পরিণামবাদী সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈদান্তিকসম্প্রদায় সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়াই নিজসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদি দ্রব্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ ঘটাদির জনক কুম্ভকারাদির ব্যাপারের পূর্ব্বেও ঘটাদি দ্রব্য থাকে, কারণের ব্যাপার দ্বারা মৃত্তিকাদি হইতে বিদ্যমান ঘটাদি দ্রব্যেরই আবির্ভাব হয়, তজ্জন্যই কারণ-ব্যাপার আবশ্যক,

এই মতই প্রধানতঃ "সৎকার্য্যবাদ" নামে কথিত হয়। এই মতে উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদি দ্রব্য ও তাহার কার্য্য ঘটাদি দ্রব্য বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ, মৃত্তিকাদি দ্রব্যই ঘটাদি দ্রব্যরূপে পরিণত হয়। ফল কথা, উক্ত সৎকার্য্যবাদই পরিণামবাদের মূল। তাই পরিণামবাদী সকল সম্প্রদায়ই সৎকার্য্য-বাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং সৎকার্য্যবাদই তাঁহাদিগের মতে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তদনুসারে তাঁহারা পরিণামবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কার্য্যকে তাহার উপাদান-কারণের পরিণামই বলিতে হইবে। কিন্তু নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসকসম্প্রদায় উক্ত সৎকার্য্যবাদকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ না করায় তাঁহারা পরিণামবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ। কারণের ব্যাপারের দ্বারা পূর্ব্বে অবিদ্যমান কার্য্যেরই উৎপত্তি হয়। এই মতের নাম "অসৎ-কার্য্যবাদ"। এই মতে মৃত্তিকাদি দ্রব্যে পূর্ব্বে ঘটাদি দ্রব্য থাকে না, মৃত্তিকাদি দ্রব্য হইতে তাহার কার্য্য ঘটাদি দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং এই মতে প্রথমে বিভিন্ন পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উহা হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বোক্তরূপেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত জন্য দ্রব্যের আরম্ভ বা সৃষ্টি হয়—এই মত "আরম্ভবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। "অসৎকার্য্যবাদ"ই উক্ত "আরম্ভবাদে"র মূল। অসৎকার্য্যবাদই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য হইলে উক্ত আরম্ভবাদই স্বীকার করিতে হইবে, পরিণামবাদ কোনরূপেই সম্ভব হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদ, এই উভয় মতই সুপ্রাচীন কাল হইতে সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং তন্মূলক পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদও সুপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুভবভেদেও ঐরূপ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনুভবমূলক প্রধান কথা এই যে, যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, গাভীর স্তনের মধ্যে দুগ্ধ থাকে, তদ্রূপই মৃত্তি-কার মধ্যে ঘটত্বরূপে ঘট থাকে, সূত্রের মধ্যে বস্ত্রত্বরূপে বস্ত্র থাকে, ইহা কোনরূপেই অনুভবসিদ্ধ হয় না। এই মৃত্তিকায় ঘট আছে, ইহা বুঝিয়াই কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু এই মৃত্তিকায় ঘট হইবে, ইহা বুঝিয়াই ঘট নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ এই সমস্ত সূত্রে বস্ত্র আছে, ইহা বুঝিয়াই তন্তুবায় বস্ত্রনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু এই সমস্ত সূত্রে বস্ত্র হইবে, ইহা বুঝিয়াই বস্ত্র-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং মৃত্তিকায় ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে এবং সূত্রসমূহে বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট ও বস্ত্র যে অসৎ, ইহাই বুদ্ধিসিদ্ধ বা অনুভবসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমের "বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ" এই সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে ঐ কথাই বুঝা যায়। পরন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি মৃত্তিকায় ঘট এবং তাহার আবির্ভাব, এই উভয়ই থাকে, তাহা হইলে আর কিসের জন্য কারণব্যাপার আবশ্যক হইবে? যদি কোনরূপেও পূর্ব্বে মৃত্তিকায় ঘটের অসত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সৎকার্য্যবাদ হইবে না। কারণ, মৃত্তিকায় ঘট কোনরূপে সৎ এবং কোনরূপে অসৎ, ইহাই সিদ্ধান্ত হইলে সদসদ্বাদ বা জৈনসম্প্রদায়-সম্মত "স্যাদ্বাদ"ই কেন স্বীকৃত হয় না? ফলকথা, সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে গেলে যদি সদসদ্বাদই আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া অসৎকার্য্যবাদই স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি আরম্ভবাদী সম্প্রদায়ের মতে উহাই বুদ্ধিসিদ্ধ ॥ ৪৯ ॥

সূত্র। আশ্রয়-ব্যতিরেকাদ্বৃক্ষফলোৎপত্তিবদিত্য-হেতুঃ ॥৫০॥৩৯৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আশ্রয়ের ভেদবশতঃ "বৃক্ষের ফলোৎপত্তির ন্যায়" ইহা অহেতু ; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হেতু বা সাধক হয় না।

ভাষ্য। মূলসেকাদিপরিকর্ম্ম ফলঞ্চোভয়ং বৃক্ষাশ্রয়ং, কর্ম্ম চেহ শরীরে, ফলঞ্চামুত্রেত্যাশ্রয়ব্যতিরেকাদহেতুরিতি।

অনুবাদ। মূলসেকাদি পরিকর্ম্ম এবং ফল (পত্রাদি) উভয়ই বৃক্ষাশ্রিত, কিন্তু কর্ম্ম (অগ্নিহোত্র) এই শরীরে,—ফল (স্বর্গ) কিন্তু পরলোকে অর্থাৎ ভিন্ন দেহে জন্মে ; অতএব আশ্রয়ের অর্থাৎ কর্ম্ম ও তাহার ফল স্বর্গের আশ্রয় শরীরের ভেদবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত) অহেতু অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তের সাধক হয় না।

টিপ্পনী। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল কালান্তরীণ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বে "প্রাঙ্‌নিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি (৪৬শ) সূত্রে বৃক্ষের ফলকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন বৃক্ষের মূলসেকাদি কর্ম্ম কালান্তরে ঐ বৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি ফল উৎপন্ন করে, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও তজ্জন্য অদৃষ্টবিশেষের দ্বারা কালান্তরে স্বর্গফল উৎপন্ন করে। মহর্ষি পরে তাঁহার কথিত "ফল"নামক প্রমেয় অর্থাৎ জন্য পদার্থমাত্রই যে, তাঁহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এখন এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে দেহাত্মবাদী নাস্তিক মতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলোৎপত্তি কালান্তরে হয়, এই সিদ্ধান্তে বৃক্ষের ফলোৎপত্তি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং উহা ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক হেতু বা সাধক হয় না। কেন হয় না ? তাই বলিয়াছেন,—"আশ্রয়ব্যতিরেকাৎ"। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আশ্রয় শরীর এবং তাহার ফল স্বর্গের আশ্রয় শরীরের ব্যতিরেক(ভেদ)বশতঃ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের সাধক হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের মূলসেকাদি পরিকর্ম্ম ও উহার ফল পত্রপুষ্পাদি সেই বৃক্ষেই জন্মে, সেই বৃক্ষই ঐ কর্ম্ম ও ফল, এই উভয়েরই আশ্রয়। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যে শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই শরীরেই উহার ফল স্বর্গ জন্মে না, কালান্তরে ও ভিন্ন শরীরেই উহা জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও উহার ফলের আশ্রয় শরীরের ভেদবশতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও বৃক্ষের মূলসেকাদি কর্ম্ম তুল্য পদার্থ নহে। সুতরাং বৃক্ষের ফলোৎপত্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলোৎপত্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং উহা হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত "প্রাঙ্‌নিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি (৪৬শ) সূত্রে "বৃক্ষফলবৎ" এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে আছে। বার্ত্তিকাদি গ্রন্থের দ্বারাও সেখানে ঐ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং তদনুসারে এই সূত্রেও "বৃক্ষফলবৎ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা, তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ও ন্যায়সূচী-

নিবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে "বৃক্ষফলোৎপত্তিবৎ" এইরূপ পাঠই গৃহীত হওয়ায় ঐ পাঠই গৃহীত হইল। ভাষ্যে "অমুত্র" এই শব্দটি পরলোক বা জন্মান্তর অর্থের বোধক অব্যয়। ("প্রেত্যামুত্র ভবান্তরে"— অমরকোষ, অব্যয়বর্গ)॥ ৫০ ॥

সূত্র। প্রীতেরাত্মাশ্রয়ত্বাদপ্রতিষেধঃ ॥৫১॥৩৭৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রীতির আত্মাশ্রিতত্ববশতঃ অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্মের ফল প্রীতি বা সুখ আত্মাশ্রিত, এ জন্য প্রতিষেধ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

ভাষ্য। প্রীতিরাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মাশ্রয়া, তদাশ্রয়মেব কর্ম্ম ধর্ম্মসঙ্গিতং, ধর্ম্মস্যাত্মগুণত্বাৎ, তস্মাদাশ্রয়ব্যতিরেকানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ প্রীতি (সুখ) আত্মাশ্রিত, ধর্ম্মনামক কর্ম্মও সেই আত্মাশ্রিত; কারণ, ধর্ম্ম আত্মার গুণ। অতএব আশ্রয়ভেদের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অহেতু বলিয়া, উহার হেতুত্ব বা সাধ্যসাধকত্বের যে প্রতিষেধ বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, প্রীতি আত্মাশ্রিত। আত্মা যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে সূত্রে "আত্মাশ্রয়" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মগত বা আত্মাতে স্থিত। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল যে স্বর্গ, তাহা প্রীতি অর্থাৎ সুখপদার্থ। "আমি সুখী" এইরূপে আত্মাতে সুখের মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় সুখ আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং যে আত্মা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করে, পরলোকপ্রাপ্ত সেই আত্মাতেই স্বর্গ নামক ফল জন্মে। ঐ আত্মার অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্মজন্য যে ধর্ম্ম জন্মে, উহাও কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ঐ ধর্ম্ম নামক কর্ম্ম আত্মারই গুণ বলিয়া উহাও আত্মাশ্রিত। সুতরাং যে আত্মাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম জন্মে, পরলোকে সেই আত্মাতেই ঐ ধর্ম্মের ফল স্বর্গনামক সুখবিশেষ জন্মে। অতএব স্বর্গফল ও উহার কারণ ধর্ম্ম একই আশ্রয়ে থাকায় ঐ উভয়ের আশ্রয়ের ভেদ নাই। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী শরীরকেই স্বর্গ ও উহার কারণ কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া, ইহকালে ও পরকালে শরীরের ভেদবশতঃ স্বর্গ ও কর্ম্মের আশ্রয়ভেদ বলিয়াছেন। কিন্তু শরীরাদি ভিন্ন যে নিত্য আত্মা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই ধর্ম্ম ও তজ্জন্য স্বর্গফল জন্মে। সুতরাং আশ্রয়ের ভেদ না থাকায় পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের অনুপপত্তি নাই। এইরূপ যে আত্মাতে হিংসাদি পাপকর্ম্মজন্য যে অধর্ম্ম জন্মে, তাহাও পরলোকে সেই আত্মাতেই নরক নামক অপ্রীতি বা দুঃখবিশেষ

উৎপন্ন করে। প্রীতির ন্যায় অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখও আত্মগত গুণবিশেষ। সুতরাং উহার কারণ অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ ও উহার ফল দুঃখ একই আশ্রয়ে থাকায় আশ্রয়ের ভেদ নাই॥৫১॥

সূত্র। ন পুত্র-স্ত্রী-পশু-পরিচ্ছদ-হিরণ্যান্নাদিফল-নির্দ্দেশাৎ ॥৫২॥৩৯৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ প্রীতিকেই ফল বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা যায় না, যেহেতু (শাস্ত্রে) পুত্র, স্ত্রী, পশু, পরিচ্ছদ (আচ্ছাদন), স্বর্ণ ও অন্ন প্রভৃতি ফলের নির্দ্দেশ আছে।

ভাষ্য। পুত্রাদি ফলং নির্দ্দিশ্যতে, ন প্রীতিঃ, 'গ্রামকামো যজেত', 'পুত্রকামো যজেতে'তি। তত্র যদুক্তং প্রীতিঃ ফলমিত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। পুত্র প্রভৃতি ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রীতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (যথা)—"গ্রামকাম ব্যক্তি যাগ করিবে," "পুত্রকাম ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি। তাহা হইলে প্রীতিই ফল, এই যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রীতি আত্মাশ্রিত, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা যায় না। কারণ, সর্ব্বত্র প্রীতি বা সুখবিশেষই যজ্ঞাদি সকল সৎকর্ম্মের ফল নহে। পুত্র, স্ত্রী, পশু, পরিচ্ছদ, স্বর্ণ, অন্ন ও গ্রাম প্রভৃতিও শাস্ত্রে যাগবিশেষের ফলরূপে কথিত হইয়াছে। "পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যাগ করিবে", "পশুকাম ব্যক্তি 'চিত্রা' যাগ করিবে", "গ্রামকাম ব্যক্তি 'সাংগ্রহণী' যাগ করিবে", ইত্যাদি বহু বৈদিক বিধিবাক্যের দ্বারা পুত্র, পশু ও গ্রাম প্রভৃতিই সেই সমস্ত যাগের ফল বলিয়া বুঝা যায়; প্রীতি বা সুখবিশেষই ঐ সমস্ত যাগের ফলরূপে ঐ সমস্ত বিধিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট বা কথিত হয় নাই। কিন্তু পুত্র, পশু ও গ্রাম প্রভৃতি ঐ সমস্ত ফল আত্মাশ্রিত নহে। যেখানে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল পরজন্মেই উৎপন্ন হয়, সেখানে ঐ সমস্ত যাগের কর্ত্তা আত্মা পরজন্মে বিদ্যমান থাকিলেও সেই আত্মাতেই ঐ সমস্ত ফল উৎপন্ন হয় না। কারণ, ঐ পুত্রাদি ফল প্রীতির ন্যায় আত্মগত গুণপদার্থ নহে। কিন্তু ঐ পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগজন্য যে ধর্ম্ম নামক অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয় (যাহার দ্বারা জন্মান্তরেও ঐ পুত্রাদি ফল জন্মে), তাহা কিন্তু ঐ সমস্ত যাগের অনুষ্ঠাতা সেই আত্মাতেই জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগজন্য ধর্ম্ম ও উহার ফল পুত্রাদির আশ্রয়ের ভেদ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সংগত হয় না। একই আধারে কর্ম্ম ও তাহার ফল উৎপন্ন হইলে কারণ ও কার্য্যের একাশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় এবং ঐরূপ স্থলেই কার্য্যকারণ ভাব কল্পনা করা যায় এবং বৃক্ষের ফলকে কর্ম্মফলের দৃষ্টান্তরূপেও উল্লেখ করা যায়। কারণ, যে বৃক্ষে মূলসেকাদি কর্ম্মজন্য পত্র-পুষ্পাদিজনক রসাদির উৎপত্তি হয়, সেই বৃক্ষেই

উহার ফল পত্রপুষ্পাদির উৎপত্তি হয়। কিন্তু পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগজন্য ধর্ম্মবিশেষ যে আত্মাতে জন্মে, পুত্রাদি ফল সেই আত্মাতে জন্মে না, উহা প্রীতির ন্যায় আত্মধর্ম্ম নহে। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মফলের কালান্তরীণত্ব পক্ষ সমর্থনের জন্য বৃক্ষের ফলকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যেরূপ কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতে পারে না ॥৫২॥

সূত্র। তৎসম্বন্ধাৎ ফলনিষ্পত্তেস্তেষু ফলবদুপ-চারঃ ॥৫৩॥৩৯৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই পুত্রাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত ফলের (প্রীতির) উৎপত্তি হয়, এ জন্য সেই পুত্রাদিতে ফলের ন্যায় উপচার হইয়াছে, অর্থাৎ পুত্রাদি ফল না হইলেও ফলের সাধন বলিয়া ফলের ন্যায় কথিত হইয়াছে।

ভাষ্য। পুত্রাদিসম্বন্ধাৎ ফলং প্রীতিলক্ষণমুৎপদ্যত ইতি পুত্রাদিষু ফলবদুপচারঃ। যথাঽন্নে প্রাণশব্দো "অন্নং বৈ প্রাণা" ইতি।

অনুবাদ। পুত্রাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রীতিরূপ ফল উৎপন্ন হয় ; এ জন্য পুত্রাদিতে ফলের ন্যায় উপচার (প্রয়োগ) হইয়াছে, যেমন "অন্নং বৈ প্রাণাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে অন্নে "প্রাণ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে মহর্ষি, এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, পুত্রাদিই পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল নহে। পুত্রাদিজন্য প্রীতি বা সুখবিশেষই উহার ফল। কিন্তু পুত্রাদির সম্বন্ধপ্রযুক্তই ঐ ফলের উৎপত্তি হয়, নচেৎ উহা জন্মিতেই পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে পুত্রাদিতে ফলের ন্যায় উপচার হইয়াছে। অর্থাৎ ফলের সাধন বলিয়াই শাস্ত্রে পুত্রাদিও ফলের ন্যায় কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গ যেমন ভোগ্যরূপেই কাম্য, স্বরূপতঃ কাম্য নহে, তদ্রূপ পুত্রাদিও ভোগ্যরূপেই কাম্য, স্বরূপতঃ কাম্য নহে। কারণ, পুত্রাদিজন্য কোনই সুখভোগ না হইলে পুত্রাদি ব্যর্থ। কিন্তু পুত্রাদিজন্য সুখই ভোগ্য, পুত্রাদিস্বরূপ ভোগ্য নহে। অতএব পুত্রাদিজন্য সুখবিশেষই কাম্য হওয়ায় উহাই পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের মুখ্য ফল। পুত্রাদি পদার্থ উহার মুখ্য ফল হইতে পারে না। কিন্তু পুত্রাদি পদার্থ ঐ ফলের সাধন বলিয়া শাস্ত্রে পুত্রাদি পদার্থও ফলের ন্যায় কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, যেমন "অন্নং বৈ প্রাণাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে অন্নে "প্রাণ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন অন্ন পদার্থ বস্তুতঃ প্রাণ না হইলেও প্রাণের সাধন ; কারণ, অন্ন ব্যতীত প্রাণরক্ষা হয় না ; এ জন্য উক্ত শ্রুতি অন্নকে "প্রাণ" শব্দের দ্বারা প্রাণই বলিয়াছেন, তদ্রূপ পুত্রাদি-জন্য প্রীতিবিশেষ যাহা পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল, তাহার সাধন পুত্রাদি পদার্থও বৈদিক বিধি-বাক্য-সমূহে ফলরূপে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণের সাধনকে যেমন প্রাণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ফলের সাধনকে ফল বলা হইয়াছে। ইহাকে বলে ঔপচারিক প্রয়োগ। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,

"ফলবদুপচারঃ"। নানাবিধ নিমিত্তবশতঃ যে উপচার হয়, ইহা মহর্ষি নিজেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধনরূপ নিমিত্তবশতঃ অন্নে "প্রাণ" শব্দের উপচারও বলা হইয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষি যে প্রয়োগ অর্থেও "উপচার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও অন্যত্র ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা জানা যায়। মূল কথা এই যে, পুত্রাদিজন্য প্রীতি বা সুখবিশেষই পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল, সুতরাং উহাও স্বর্গফলের ন্যায় আত্মাশ্রিত, অতএব পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মজন্য ধর্ম্ম-বিশেষ যে আত্মাতে জন্মে, সেই আত্মাতেই উহার ফল সুখবিশেষ জন্মে। উভয়ের আশ্রয়-ভেদ নাই॥৫৩॥

ফল-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১২॥

ভাষ্য। ফলানন্তরং দুঃখমুদ্দিষ্টমুক্তঞ্চ "বাধনালক্ষণং দুঃখ"মিতি। তৎ কিমিদং প্রত্যাত্মবেদনীয়স্য সর্ব্বজন্তুপ্রত্যক্ষস্য সুখস্য প্রত্যাখ্যানমাহো স্বিদন্যঃ কল্প ইতি। অন্য ইত্যাহ, কথং? ন বৈ সর্ব্বলোকসাক্ষিকং সুখং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুং, অয়ন্তু জন্মমরণপ্রবন্ধানুভবনিমিত্তাদ্দুঃখান্নির্ব্বিণ্ণস্য দুঃখং জিহাসতো দুঃখসংজ্ঞাভাবনোপদেশো দুঃখহানার্থ ইতি। কয়া যুক্ত্যা? সর্ব্বে খলু সত্ত্বনিকায়াঃ[1] সর্ব্বাণ্যুৎপত্তিস্থানানি সর্ব্বঃ পুনর্ভবো বাধনানুষক্তো দুঃখসাহচর্য্যাদ্বাধনালক্ষণং দুঃখমিত্যুক্তমৃষিভিঃ।

১। এখানে "সত্ত্ব" শব্দের অর্থ জীব। (তৃতীয় খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠার পাদটিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। "নিকায়" শব্দের দ্বারা সমানধর্ম্মী বা একজাতীয় জীবসমূহ বুঝা যায়। কিন্তু ঐ অর্থে "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিলে তৎপূর্ব্বে জীববোধক "সত্ত্ব" শব্দ প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। তথাপি ভাষ্যকার "সত্ত্বনিকায়াঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের ১৯শ সূত্রের ভাষ্যেও বলিয়াছেন—"প্রাণভৃন্নিকায়ে," এবং এই আহ্নিকের সর্ব্বশেষ সূত্রের ভাষ্যেও "সত্ত্বনিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "নিকায়" শব্দের দ্বারা জাতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তদনুসারে এখানেও "সত্ত্বনিকায়" শব্দের দ্বারা জীবজাতি বা একজাতীয় জীবকুল, এইরূপ অর্থই বুঝা যায়। ভাষ্যকার "নিকায়" শব্দের উক্তরূপ অর্থে তাৎপর্য্য গ্রহণের জন্যই তৎপূর্ব্বে জীববোধক "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। (পরবর্ত্তী ৬৭ম সূত্রের ভাষ্য ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে জন্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ"। সেখানে "নিকায়" শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার পরবর্ত্তী (৫৪শ) সূত্রের ভাষ্যে "সংস্থান" শব্দের প্রয়োগ করায় জন্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় তিনি সংস্থান বা আকৃতিবিশেষ অর্থেই "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। কিন্তু অভিধানে "নিকায়" শব্দের ঐ অর্থ পাওয়া যায় না। অন্যান্য অনেক দার্শনিক গ্রন্থকারও জন্মের লক্ষণ বলিতে "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থলে "নিকায়" শব্দের যে অর্থ সংগত হয়, তাহা বিচার করিবেন। "নিকায়স্তু পুমান্ লক্ষ্যে সধর্ম্মিপ্রাণিসংহতৌ। সমুচ্চয়ে সংহতানাং নিলয়ে পরমাত্মনি" ।—"মেদিনী," দ্বিতীয় কাণ্ডে মনুষ্য কাণ্ড ॥

অনুবাদ। ফলের অনন্তর দুঃখ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং "বাধনালক্ষণ দুঃখ," ইহা অর্থাৎ দুঃখের ঐ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে[১]।

(পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রশ্ন) সেই ইহা কি প্রত্যাত্মবেদনীয় (অর্থাৎ) সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষের বিষয় সুখের প্রত্যাখ্যান, অথবা অন্য কল্প, অর্থাৎ সুখের প্রত্যাখ্যান নহে? (উত্তর) অন্য কল্প, ইহা (সূত্রকার মহর্ষি) বলিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, ইহাই বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু সর্ব্বলোকসাক্ষিক অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষ যাহার প্রমাণ, এমন সুখকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ শরীরাদি ফলমাত্রকেই দুঃখ বলিয়া উল্লেখ, জন্মমরণপ্রবাহের প্রাপ্তিজন্য দুঃখ হইতে নির্ব্বিণ্ণ (অতএব) দুঃখপরিহারেচ্ছুর অর্থাৎ মুমুক্ষু মানবের দুঃখনিবৃত্ত্যর্থ (শরীরাদি পদার্থে) দুঃখ-সংজ্ঞারূপ ভাবনার উপদেশ। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ? (উত্তর) যেহেতু সমস্ত জীবনিকায় সমস্ত উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সত্যলোক হইতে অবীচি পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন এবং সমস্ত জন্ম দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট, দুঃখের সাহচর্য্যবশতঃ বাধনালক্ষণ দুঃখ অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্তই দুঃখ, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার কথিত দশম প্রমেয় "ফলে"র পরীক্ষা করিয়া, ক্রমানুসারে এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রমেয় "দুঃখে"র পরীক্ষা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, ফলের অনন্তর দুঃখ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে প্রমেয়বিভাগসূত্রে (নবম সূত্রে) মহর্ষি ফলের পরে দুঃখের উদ্দেশ করায় ফলের পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে এখন দুঃখের পরীক্ষাই তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না। তাই ভাষ্যকার এখানে দুঃখের পরীক্ষাঙ্গ সংশয় সূচনা করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে ফলের পরে দুঃখের উদ্দেশ করিয়া, পরে দুঃখের লক্ষণ বলিতে "বাধনালক্ষণং দুঃখং" এই সূত্রটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সূত্রের দ্বারা শরীরাদি সমস্তই দুঃখ, ইহা বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি কি সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুখ পদার্থকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন অথবা সুখ পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার সম্মত? ভাষ্যকার এখানে

১। প্রথম অধ্যায়ে "বাধনালক্ষণং দুঃখং (১।২১) এই সূত্রে "বাধনা" অর্থাৎ পীড়া যাহার লক্ষণ অর্থাৎ পীড়ার দ্বারা যাহার স্বরূপ লক্ষিত হয়, এই অর্থে "বাধনালক্ষণ" শব্দের দ্বারা মুখ্য দুঃখের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। এবং যাহা "বাধনালক্ষণ" অর্থাৎ যাহা বাধনার (দুঃখের) সহিত অনুষক্ত, এই অর্থে উহার দ্বারা গৌণদুঃখের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। শরীরাদি দুঃখানুষক্ত সমস্ত পদার্থই গৌণ দুঃখ। জয়ন্তভট্ট উক্ত সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী", ৫০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়ই সূচনা করিয়াছেন। পরে নিজেই এখানে মহর্ষির অভিমত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি অন্য কল্পই বলিয়াছেন। অর্থাৎ সুখের অস্তিত্বই নাই, এই পক্ষ তাঁহার অভিমত নহে; সুখের অস্তিত্ব আছে, এই পক্ষই তাঁহার অভিমত। কারণ, সুখ সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুখের উৎপত্তি হইলে সকল জীবই মনের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করে, সুতরাং উহার প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ সুখের অস্তিত্বই নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। তবে মহর্ষি "বাধনালক্ষণং দুঃখং" এই সূত্রের দ্বারা শরীরাদি সমস্ত জন্য পদার্থকেই দুঃখ বলিয়াছেন কেন? তিনি সুখকেও যখন দুঃখ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে যে সুখের অস্তিত্ব আছে, ইহা আর কিরূপে বুঝিব? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। উহা তাঁহার মুমুক্ষুর প্রতি শরীরাদি সকল পদার্থে দুঃখ ভাবনার উপদেশ। যিনি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপরম্পরার অনুভব অর্থাৎ প্রাপ্তিনিমিত্তক দুঃখ হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া একেবারে চিরকালের জন্য সর্ব্বদুঃখ পরিহারে ইচ্ছুক, সেই মুমুক্ষু ব্যক্তির আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভের জন্যই মহর্ষি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। মুমুক্ষু, শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে তাঁহার নির্ব্বেদ জন্মিবে, পরে উহারই ফলে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিবে, তাহার ফলে মোক্ষ জন্মিবে, ইহাই মহর্ষির চরম উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ শরীরাদি সকল পদার্থই যে, মহর্ষির মতে মুখ্য দুঃখ পদার্থ, সুখ বলিয়া কোন মুখ্য পদার্থই যে, তাঁহার মতে নাই, ইহা নহে। শরীরাদি পদার্থ যদি বস্তুতঃ দুঃখই না হয়, তবে মহর্ষি কেন ঐ সমস্ত পদার্থকে দুঃখ বলিয়াছেন? মহর্ষি কোন্ যুক্তিবশতঃ শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া উহাতে মুমুক্ষুর দুঃখ ভাবনার উপদেশ করিয়াছেন? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সমস্ত জীবকুল এবং সমস্ত ভুবন এবং জীবের সমস্ত জন্মই দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত, একেবারে দুঃখশূন্য কোন জন্মাদি নাই। সুতরাং দুঃখের সাহচর্য্য (দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ)বশতঃ "বাধনালক্ষণ দুঃখ" অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত বলিয়া শরীরাদি সমস্তই দুঃখ, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরাদি সমস্ত পদার্থ বস্তুতঃ মুখ্য দুঃখপদার্থ না হইলেও দুঃখানুষক্ত, এই জন্যই ঋষিগণ ঐ সমস্ত পদার্থকে দুঃখ বলিয়াছেন। শরীরাদি সমস্ত পদার্থে মুমুক্ষুর দুঃখসংজ্ঞা ভাবনাই ঐ উক্তির উদ্দেশ্য এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই উহার চরম উদ্দেশ্য। শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া ভাবনার নামই দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা। বস্তুতঃ শরীর দুঃখের আয়তন, এবং ইন্দ্রিয়াদি দুঃখের সাধন এবং সুখ দুঃখানুষক্ত, এই জন্যই শরীরাদি পদার্থ দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায়বার্ত্তিকের প্রারম্ভে উদ্দ্যোতকর গৌণ ও মুখ্যভেদে একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়া ঐ সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা "আমি দুঃখী" এইরূপে সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যাহা "প্রতিকূলবেদনীয়" বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই স্বরূপতঃ দুঃখ অর্থাৎ মুখ্য দুঃখ। শরীরাদি বিংশতি প্রকার পদার্থ গৌণদুঃখ। তন্মধ্যে শরীর দুঃখের আয়তন, শরীর ব্যতীত কাহারই দুঃখ জন্মিতে পারে না, শরীরাবচ্ছেদেই জীবের দুঃখ ও তাহার ভোগ জন্মে, এই জন্যই শরীরকে দুঃখ বলা হইয়াছে। এইরূপ ঘ্রাণাদি ষড়িন্দ্রিয় ও তজ্জন্য ষড়্বিধ বুদ্ধি

এবং ঐ বুদ্ধির ষড়্‌বিধ বিষয়, এই অষ্টাদশ পদার্থ দুঃখের সাধন বলিয়াই দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সুখ, দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধশূন্য সুখ নাই, সুখমাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ, এই জন্য সুখকেও দুঃখ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরোক্ত ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যায় মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া ষড়্‌বিধ বিষয়ের ব্যাখ্যায় ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন নামক আত্মগুণত্রয়কে মনের বিষয় বলিয়াছেন। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধাদি পঞ্চবিধ বিষয় এবং মনোগ্রাহ্য ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, এই গুণত্রয়কে মনোগ্রাহ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া উদ্দ্যোতকর ষড়্‌বিধ বিষয় বলিয়াছেন। বুদ্ধিও মনোগ্রাহ্য বিষয় হইলেও ষড়্‌বিধ বুদ্ধি বলিয়া উহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, বুদ্ধি না বলিয়া বুদ্ধির বিষয় বলা যায় না। সুখও মনোগ্রাহ্য বিষয় হইলেও উহা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দুঃখের সাধন বলিয়া দুঃখ নহে, কিন্তু দুঃখানুষক্ত বলিয়াই উহা দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই সুখের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর বিশেষ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিলেও এখানে তিনিও ভাষ্যকারের ন্যায় সমস্ত ভুবনকেই দুঃখানুষক্ত বলিয়া দুঃখ বলিয়াছেন। মূলকথা, মহর্ষি শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিলেও তিনি সুখের অস্তিত্বের অপলাপ করেন নাই। সুখ আছে, কিন্তু উহা দুঃখানুষক্ত বলিয়া বিবেকীর পক্ষে দুঃখ, বিবেকী মুমুক্ষু উহাকে দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন, এইরূপ উপদেশ করিতেই মহর্ষি সুখকেও দুঃখ বলিয়াছেন। সুখ দুঃখানুষক্ত, অর্থাৎ সুখে দুঃখের অনুষঙ্গ আছে। সুখে দুঃখের অনুষঙ্গ কি, তাহা উদ্দ্যোতকর চারি প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে তাহা লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। দুঃখসংজ্ঞাভাবনমুপদিশ্যতে, অত্র চ হেতুরুপাদীয়তে।

অনুবাদ। দুঃখসংজ্ঞা-ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে—এই বিষয়ে (মহর্ষি কর্ত্তৃক) হেতুও গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ মহর্ষি নিজেই পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা উক্ত বিষয়ে হেতু বলিয়াছেন।

সূত্র। বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ॥ ॥৫৪॥৩৯৭॥

অনুবাদ। নানাপ্রকার দুঃখের সম্বন্ধপ্রযুক্ত জন্মের অর্থাৎ শরীরাদির উৎপত্তি দুঃখই।

ভাষ্য। জন্ম জায়ত ইতি শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ। শরীরাদীনাং সংস্থান-বিশিষ্টানাং প্রাদুর্ভাব উৎপত্তিঃ। বিবিধা চ বাধনা—হীনা মধ্যমা উৎকৃষ্টা চেতি। উৎকৃষ্টা নারকিণাং, তিরশ্চান্তু মধ্যমা, মনুষ্যাণাং হীনা, দেবানাং হীনতরা বীতরাগাণাঞ্চ। এবং সর্ব্বমুৎপত্তিস্থানং বিবিধবাধনানুষক্তং পশ্যতঃ সুখে তৎসাধনেষু চ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিষু দুঃখসংজ্ঞা ব্যবতিষ্ঠতে।

দুঃখসংজ্ঞাব্যবস্থানাৎ সর্ব্বলোকেম্বনভিরতিসংজ্ঞা ভবতি। অনভিরতি-সংজ্ঞামুপাসীনস্য সর্ব্বলোকবিষয়া তৃষ্ণা বিচ্ছিদ্যতে, তৃষ্ণাপ্রহাণাৎ সর্ব্ব-দুঃখাদ্বিমুচ্যত ইতি। যথা বিষযোগাৎ পয়ো বিষমিতি বুধ্যমানো নোপা-দত্তে, অনুপাদদানো মরণদুঃখং নাপ্নোতি।

অনুবাদ। জন্মে অর্থাৎ উৎপন্ন হয়—এ জন্য জন্ম বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট শরীরাদির প্রাদুর্ভাব উৎপত্তি, এবং বিবিধ বাধনা,—হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। নারকীদিগের উৎকৃষ্ট, পশ্বাদির কিন্তু মধ্যম, মনুষ্যদিগের হীন, দেবগণের এবং বীতরাগ ব্যক্তিদিগের হীনতর। এইরূপে সমস্ত উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সমস্ত ভুবনকেই[১] বিবিধ দুঃখানুষক্ত বুঝিলে তখন তাহার সুখে এবং সেই সুখের সাধন শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবিষয়ে দুঃখসংজ্ঞা ব্যবস্থিত হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত দুঃখই, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। দুঃখসংজ্ঞার ব্যবস্থাপ্রযুক্ত সর্ব্বলোকে অর্থাৎ সত্যলোক প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানেই অনভিরতিসংজ্ঞা (নির্ব্বেদ) জন্মে। অনভিরতি-সংজ্ঞা অর্থাৎ নির্ব্বেদকে উপাসনা করিলে তাহার সর্ব্বলোকবিষয়ক তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষ্ণার নিবৃত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৈরাগ্যপ্রযুক্ত সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন বিষযোগবশতঃ দুগ্ধ বিষ, ইহা বোধ করতঃ তজ্জন্য (ঐ বিষযুক্ত দুগ্ধকে) গ্রহণ করে না, গ্রহণ না করায় মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার, মহর্ষির সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার সমর্থন করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, শরীরাদি পদার্থে যে হেতুবশতঃ ঋষিগণ দুঃখ-ভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা মহর্ষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে মহর্ষি গোতমের যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা তাঁহার এই সূত্রের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন সংশয় হইতে পারে না। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "জন্মন্" শব্দের দ্বারা "জায়তে" অর্থাৎ যাহা জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকেই প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঐ শরীরাদির যে প্রাদুর্ভাব, তাহাই উহার উৎপত্তি। অর্থাৎ সূত্রে "জন্মোৎপত্তি" শব্দের দ্বারা এখানে বুঝিতে হইবে—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি। জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি হইলেই তাহার "জন্মোৎপত্তি" বলা যায় এবং তখন হইতেই জীবের নানাবিধ দুঃখযোগ হয়। সুতরাং জীবের জন্মোৎপত্তি বিবিধ দুঃখানুষক্ত বলিয়া দুঃখই, ইহা মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। সূত্রোক্ত বিবিধ বাধনার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সংক্ষেপে হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট, এই তিন প্রকার বাধনা বলিয়াছেন। উহার দ্বারা হীনতর

১। ভুবনের বিস্তার সপ্তলোক। যোগদর্শনের বিভূতিপাদের "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" এই (২৬শ) সূত্রের ব্যাসভাষ্যে সপ্তলোকের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি আরও বহুপ্রকার বাধনা বুঝিতে হইবে। "বাধনা" শব্দের অর্থ দুঃখ। "বাধনা", "পীড়া", "তাপ" ইত্যাদি দুঃখবোধক পর্য্যায় শব্দ। জীব মাত্রেরই কোন প্রকার দুঃখ অবশ্যই আছে। তন্মধ্যে যাহারা নরক ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের দুঃখ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে উৎকর্ষবিশিষ্ট বা অধিক। কারণ, নরকের অধিক আর কোন দুঃখ নাই। পশ্বাদির দুঃখ মধ্যম। মনুষ্যদিগের দুঃখ হীন অর্থাৎ নারকী ও পশ্বাদির দুঃখ হইতে অল্প। দেবগণ ও বীতরাগ ব্যক্তি-দিগের দুঃখ হীনতর, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নারকী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের দুঃখ হইতে অল্প। ফলকথা, সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবেরই কোন না কোন প্রকার দুঃখ আছে। যে জীবের জন্ম অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সত্যলোক প্রভৃতি উর্দ্ধলোকেও ঐ জীবের দুঃখভোগ করিতে হয়। কারণ, দুঃখের নিদান উচ্ছিন্ন না হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোন স্থানে কোন জীবেরই হইতে পারে না। এইরূপে জীবের সমস্ত উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সমস্ত ভুবনকেই যিনি বিবিধ দুঃখানুষক্ত বলিয়া বুঝেন, তখন তাঁহার সুখ ও সুখসাধন শরীরাদিতে এই সমস্ত দুঃখই, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। তাহার ফলে সত্যলোকাদি সর্ব্বলোকেই অনভিরতি-সংজ্ঞা অর্থাৎ নির্ব্বেদ জন্মে। ঐ নির্ব্বেদকে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে উহার ফলে সত্যলোকাদি সর্ব্বলোক বিষয়েই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ বৈরাগ্য জন্মে[১]। ঐ বৈরাগ্যপ্রযুক্ত সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তি হয়। বিষমিশ্রিত দুগ্ধকে বিষ বলিয়া বুঝিলে যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ না করায় তখন তিনি মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হন না, তদ্রূপ দুঃখানুষক্ত সর্ব্ববিধ সুখকেই দুঃখ বলিয়া বুঝিলে সুখে বৈরাগ্যবশতঃ মুমুক্ষু—সুখকেও পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ তিনি আর সুখের সাধন কিছুই গ্রহণ করেন না, তাই তিনি সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই কাহারও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সুখভোগে অভিলাষ জন্মিলে ঐ সুখের সাধন শরীরাদি সকল বিষয়েই অভিলাষ জন্মিবে। কিন্তু যে কোন সুখভোগ করিতে হইলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি কোন প্রকার সুখভোগ করা যায় না। সুতরাং সুখ ও তাহার সাধন সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইতে পারে। শরীরাদি পদার্থে দুঃখসংজ্ঞা অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধিরূপ ভাবনা—ঐ বৈরাগ্যলাভের উপায়। কারণ, যাহা দুঃখ বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে বাসনার নিবৃত্তি হয়। সুতরাং মহর্ষি মুমুক্ষুর প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশের জন্যই শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়াছেন, তিনি উহার দ্বারা সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, ইহা তাঁহার এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় ॥৫৪॥

ভাষ্য। **দুঃখোদ্দেশস্তু ন সুখস্য প্রত্যাখ্যানং, কস্মাৎ ?**

১। সুখসাধন বিষয়ে—ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিই এখানে নির্ব্বেদ। উহার অপর নাম অনভিরতিসংজ্ঞা। ভোগ্য বিষয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহাতে যে উপেক্ষা-বুদ্ধি, তাহাই এখানে বৈরাগ্য। প্রথমে নির্ব্বেদ, তাহার পরে বৈরাগ্য। প্রথম অধ্যায়ে "বাধনালক্ষণং দুঃখং" এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার এইরূপই বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

অনুবাদ। দুঃখের উদ্দেশ কিন্তু সুখের প্রত্যাখ্যান নহে, (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। ন সুখস্যাপ্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ ॥৫৫॥৩৯৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে প্রমেয়-মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া দুঃখের যে উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সুখের প্রত্যাখ্যান নহে। কারণ, অন্তরালে অর্থাৎ দুঃখের মধ্যে সুখেরও উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। ন খল্বয়ং দুঃখোদ্দেশঃ সুখস্য প্রত্যাখ্যানং, কস্মাৎ ? সুখস্যাপ্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ। নিষ্পদ্যতে খলু বাধনান্তরালেষু সুখং প্রত্যাত্মবেদনীয়ং শরীরিণাং, তদশক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি।

অনুবাদ। এই দুঃখোদ্দেশ অর্থাৎ প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে দুঃখের উদ্দেশ, সুখের প্রত্যাখ্যান নহে, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অন্তরালে সুখেরও উৎপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, দুঃখের মধ্যে মধ্যে সমস্ত দেহীর প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য সুখও উৎপন্ন হয়, সেই সুখ প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যদি শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া ভাবনাই কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত পদার্থকে স্বরূপতঃ দুঃখই কেন বলা যায় না ? সুখ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রমাণ কি আছে ? পরন্তু মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের নবম সূত্রে যে, আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের উদ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি সুখের উদ্দেশ না করিয়া দুঃখের উদ্দেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উহা যে তাঁহার সুখপদার্থের প্রত্যাখ্যান, অর্থাৎ তিনি যে সুখপদার্থের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তিনি সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে প্রমেয় পদার্থের মধ্যে দুঃখের ন্যায় সুখেরও উল্লেখ করিতেন। মহর্ষি এই জন্যই শেষে এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে সুখের উল্লেখ না করিয়া যে দুঃখের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সুখের প্রত্যাখ্যান বা নিষেধ নহে। কারণ, সর্ব্বজীবেরই দুঃখের মধ্যে সুখেরও উৎপত্তি হয়। সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য ঐ সুখপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের মধ্যে মধ্যে যে সর্ব্বজীবের সুখও জন্মে, ইহা সকলেরই মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। ঐ সত্যের অপলাপ কোনরূপেই করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সুখের পূর্ব্বে ও পরে অবশ্যই দুঃখ আছে, দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন সুখই নাই। এই জন্যই যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন। তাই মুমুক্ষুর অত্যাবশ্যক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ করিতে তন্মধ্যে মহর্ষি সুখের উল্লেখ করেন নাই। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য প্রথম অধ্যায়েও ব্যক্ত করা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৫৫॥

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। বাধনাঽনিবৃত্তের্ব্বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষা-দপ্রতিষেধঃ ॥৫৩॥৩৯৯॥

অনুবাদ। পরন্তু বেদন বা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের সুখসাধনত্ব-বোদ্ধা সর্ব্বজীবেরই প্রার্থনার দোষবশতঃ দুঃখের নিবৃত্তি না হওয়ায় (পূর্ব্বোক্ত দুঃখভাবনার উপদেশ হইয়াছে), সুখের প্রতিষেধ হয় নাই অর্থাৎ দুঃখমাত্রের উদ্দেশের দ্বারা সুখের প্রতিষেধ করা হয় নাই।

ভাষ্য। সুখস্য, দুঃখোদ্দেশেনেতি প্রকরণাৎ। পর্য্যেষণং প্রার্থনা, বিষয়ার্জ্জনতৃষ্ণা। পর্য্যেষণস্য দোষো যদয়ং বেদয়মানঃ প্রার্থয়তে, তস্য প্রার্থিতং ন সম্পদ্যতে, সম্পদ্য বা বিপদ্যতে, ন্যূনং বা সম্পদ্যতে, বহু প্রত্যনীকং বা সম্পদ্যত ইতি। এতস্মাৎ পর্য্যেষণদোষান্নানাবিধো মানসঃ সন্তাপো ভবতি। এবং বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাদ্বাধনায়া অনিবৃত্তিঃ। বাধনাঽনিবৃত্তের্দুঃখসংজ্ঞাভাবনমুপদিশ্যতে। অনেন কারণেন দুঃখং জন্ম, ন সুখস্যাভাবাদিতি। অথাপ্যেতদনূক্তং—

"কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতি।
অথৈনমপরঃ কামঃ ক্ষিপ্রমেব প্রবাধতে[১] ॥"

"অপি চেদুদনেমি সমন্তাদ্ভূমিং লভতে সগবাশ্বাং
ন স তেন ধনেন ধনৈষী তৃপ্যতি কিন্নু সুখং ধনকামে"[২] ইতি।

১। "কামং" কাময়মানস্য যদা কামঃ "সমৃধ্যতি" সম্পন্নো ভবতি, "অথ" অনন্তরং এনং পুরুষমপরঃ কাম ইচ্ছা ক্ষিপ্রং বাধতে। স্বর্গাদিপ্রাপ্তাবপি স্বারাজ্যাদি কাময়তে, এবং তৎপ্রাপ্তৌ প্রাজাপত্যাদীতি অস্যেচ্ছা-তদুপায়প্রার্থনাদিনা দুঃখেন প্রবাধত ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা। "কাম্যতে" অর্থাৎ যাহা কামনার বিষয় হয়, এই অর্থে "কাম" শব্দের দ্বারা কাম্য বস্তুও বুঝা যায়। ইচ্ছামাত্র অর্থেও "কাম" শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ" ইত্যাদি (উপনিষৎ)। "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্" ইত্যাদি (গীতা)। "ন জাতু কামঃ কামানাং" ইত্যাদি (মনুসংহিতা) দ্রষ্টব্য। কিন্তু "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট লিখিয়াছেন যে, কেবল "কাম" শব্দ মৈথুনেচ্ছারই বাচক। (ন্যায়কন্দলী, ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীধর ভট্টের ঐ কথা স্বীকার করা যায় না।

২। "অপি চেদুদনেমি" ইত্যাদি বাক্যটি কোন প্রাচীন বাক্য বলিয়াই বুঝা যায়। "উদনেমিং" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ঐ পাঠে "উদনেমিং সমুদ্রপর্য্যন্তাং ভূমিং লভতে" এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে লিখিয়াছেন, "সমন্তাদুদনেমি যথা ভবতি তথা ভূমিং লভতে ইতি যোজনা"। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে "উদনেমি" এই পদটি ক্রিয়াবিশেষণ পদ বুঝা যায়। "উদকং নেমির্যত্র" এইরূপ বিগ্রহ করিলে উহার দ্বারা সমুদ্র পর্য্যন্ত, এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত বুঝা যায়। "উদক" শব্দের দ্বারা সমুদ্রই বিবক্ষিত। "নেমি" শব্দের প্রান্ত বা পরিধি অর্থও কোষে কথিত আছে। "চক্রং রথাঙ্গং তস্যান্তে নেমিঃ স্ত্রী স্যাৎ প্রধিঃ পুমান্।"—অমরকোষ। "রঘুবংশে"র ১ম সর্গের ১৭শ শ্লোকের মল্লিনাথ টীকা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। সুখের (প্রতিষেধ হয় নাই)। 'দুঃখের উদ্দেশের দ্বারা' ইহা প্রকরণ-বশতঃ বুঝা যায়। "পর্য্যেষণ" বলিতে প্রার্থনা (অর্থাৎ) বিষয়ার্জ্জনে আকাঙ্ক্ষা। প্রার্থনার দোষ যে, এই জীব "বেদয়মান" হইয়া অর্থাৎ কোন বিষয়কে সুখসাধন বলিয়া বোধ করতঃ প্রার্থনা করে, (কিন্তু) তাহার প্রার্থিত বস্তু সম্পন্ন হয় না। অথবা সম্পন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, অথবা ন্যূন সম্পন্ন হয়, অথবা বহু বিঘ্নযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রার্থনা-দোষবশতঃ নানাবিধ মানস দুঃখ জন্মে। এইরূপে বিষয়ের সুখসাধনত্ববোদ্ধা জীবের প্রার্থনা-দোষবশতঃ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের নিবৃত্তি না হওয়ায় দুঃখসংজ্ঞারূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কারণ-বশতঃই জন্ম (শরীরাদি) দুঃখ, সুখের অভাববশতঃ নহে। পরন্তু ইহা (ঋষি কর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছে—"কাম্যবিষয়ক কামনাকারী জীবের যে সময়ে কাম অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, অনন্তর অপর কাম অর্থাৎ অন্যবিষয়ক কামনা, এই জীবকে শীঘ্রই পীড়িত করে"। "যদি গো এবং অশ্ব সহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকেও সর্ব্বতোভাবে লাভ করে, তাহা হইলেও সেই ধনের দ্বারা ধনৈষী ব্যক্তি তৃপ্ত হয় না, ধন কামনায় সুখ কি আছে ?"

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে দুঃখের উদ্দেশ করিয়া জন্ম অর্থাৎ শরীরাদিতে যে দুঃখ-ভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অন্য হেতুর দ্বারাও সমর্থন করিতে আবার এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, জীব সুখের জন্য সতত প্রার্থনা ও চেষ্টা করিলেও তাহার দুঃখনিবৃত্তি হয় না। পরন্তু উহাতে তাহার আরও নানাবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। কারণ, জীব কোন বিষয়কে সুখসাধন বলিয়া বুঝিলেই তদ্বিষয়ে পর্য্যেষণ অর্থাৎ প্রার্থনা করে। কিন্তু সেই প্রার্থনার দোষবশতঃ তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, প্রার্থনার দোষ এই যে, জীব প্রার্থনা করিলেও প্রায়ই তাহার প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হয় না। কোন স্থলে সম্পন্ন হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না, বিনষ্ট হইয়া যায়। অথবা ন্যূন সম্পন্ন হয়, অথবা বহু বিঘ্নযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তাহা পাইলেও তাহার প্রাপ্তিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বিষয়ের পর্য্যেষণ বা প্রার্থনার এইরূপ আরও বহু দোষ আছে। প্রার্থনার পূর্ব্বোক্তরূপ নানা দোষবশতঃ প্রার্থী জীবের নানাবিধ মানস দুঃখ জন্মে ; জীব কিছুতেই শান্তি পায় না। প্রার্থিত বিষয় না পাইলে যেমন অশান্তি, উহা সম্পন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলেও তখন আরও অশান্তি, উহা সম্পূর্ণ না পাইলেও অশান্তি, আবার পাইলেও উহার প্রাপ্তিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তখন আবার অশান্তি ; সুতরাং প্রার্থীর সর্ব্বদাই অশান্তি, "অশান্তস্য কুতঃ সুখং"। যে সুখের জন্য জীবের সতত প্রার্থনা, সতত চেষ্টা, সে সুখের পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে সর্ব্বদাই দুঃখ। সুখের প্রার্থী কখনই ঐ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তাহার "পর্য্যেষণ" অর্থাৎ প্রার্থনার পূর্ব্বোক্তরূপ নানা দোষবশতঃ তাহার "বাধনা"র অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, এই জন্যই জন্মে

অর্থাৎ শরীরাদিতে দুঃখবুদ্ধিরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ জন্যই জন্ম অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শরীরাদিকে দুঃখ বলা হইয়াছে। সুখের অভাববশতঃ অর্থাৎ সুখ পদার্থকে একেবারে অস্বীকার করিয়া শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলা হয় নাই। পূর্ব্বসূত্র হইতে "সুখস্য" এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া "সুখস্য অপ্রতিষেধঃ" অর্থাৎ সুখের প্রতিষেধ হয় নাই, ইহাই সূত্রকারের বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার সূত্রের অবতারণা করিয়াই প্রথমে "সুখস্য" এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে সুখের উদ্দেশ না করিয়া যে দুঃখের উদ্দেশ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সুখের প্রতিষেধ করা যায় না, ইহা মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রে প্রকরণবশতঃ "দুঃখোদ্দেশেন" এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার পরেই আবার বলিয়াছেন, "দুঃখোদ্দেশেনেতি প্রকরণাৎ"। ফলকথা, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে দুঃখের উদ্দেশের দ্বারা সুখের প্রতিষেধ হয় নাই, কিন্তু শরীরাদি পদার্থে দুঃখ ভাবনারই উপদেশ করা হইয়াছে, ইহাই এই সূত্রে মহর্ষির শেষ বক্তব্য। দুঃখ ভাবনার উপদেশ কেন করা হইয়াছে? উহার আর বিশেষ হেতু কি? তাই মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন, "বাধনাঽনিবৃত্তের্ব্বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাৎ"। সূত্রে "বেদয়ৎ" শব্দ এবং ভাষ্যে "বেদয়মান" শব্দ চুরাদিগণীয় জ্ঞানার্থক বিদ্‌ধাতুর উত্তর "শতৃ" ও "শানচ" প্রত্যয়নিষ্পন্ন। উহার অর্থ জ্ঞান-বিশিষ্ট। কোন বিষয়কে ইহা আমার সুখসাধন বা যে কোন ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিলেই জীব তদ্বিষয়ে পর্য্যেষণ অর্থাৎ প্রার্থনা করে। সুতরাং ঐ প্রার্থনার কারণ জ্ঞানবিশেষই এখানে "বিদ্" ধাতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য "কামং কাময়মানস্য" ইত্যাদি মুনিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকরও এখানে "অয়মেব চার্থো মুনিনা শ্লোকেন বর্ণিতঃ"—এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ গ্রন্থে কোন্ মুনি উক্ত শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা তিনিও বলেন নাই। অনুসন্ধান করিয়া আমরাও উহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে[১] "ন জাতু কামঃ কামানাং" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কাম্য বিষয়ের উপভোগের দ্বারা কামের অর্থাৎ উপভোগ-বাসনার শান্তি হয় না। পরন্তু যেমন ঘৃতের দ্বারা অগ্নির বৃদ্ধিই হয়, তদ্রূপ উপভোগের দ্বারা পুনর্ব্বার কামের বৃদ্ধিই হয়। ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বারাও উহাই বুঝা যায় যে, কোন বিষয় কামনা করিলে যখন সেই কামনা সফল হয়, তখনই আবার অন্য কামনা উপস্থিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে পীড়িত করে। অর্থাৎ কামের সিদ্ধির দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু আরও বৃদ্ধি হয়। ভাষ্যকারের শেষোক্ত বাক্যেরও তাৎপর্য্য এই যে, ধনৈষী ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে সসাগরা পৃথিবীকেও লাভ করে, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তাহার তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ তাহার আরও ধনাকাঙ্ক্ষা জন্মে। সুতরাং ধন কামনায় সুখ কি আছে? তাৎপর্য্য এই যে, সুখ

১। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥—মনুসংহিতা, ২। ৯৪। ভাগবত, ৯।১৯।১৪ ॥

বা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সতত কামনা ও চেষ্টা করিলেও লৌকিক উপায়ের দ্বারাও কাহারও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, উহাতে আরও কামনার বৃদ্ধি ও উহার অপূর্ণতাবশতঃ নানাবিধ দুঃখেরই সৃষ্টি হয়। এক কামনা পূর্ণ হইলে তখনই আবার অপর কামনা আসিয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনে। সুতরাং কামনা দুঃখের নিদান। কামনা ত্যাগ বা বৈরাগ্যই শান্তি লাভের উপায়। উহাই মুক্তি-মণ্ডপের একমাত্র দ্বার। তাই মহর্ষি গোতম বৈরাগ্য লাভের জন্যই শরীরাদি পদার্থে দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে প্রমেয়মধ্যে সুখের উদ্দেশ না করিয়া দুঃখের উদ্দেশ করিয়াছেন ॥৫৬॥

সূত্র। দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ ॥৫৭॥৪০০॥

অনুবাদ। এবং যেহেতু দুঃখবিকল্পে অর্থাৎ বিবিধ দুঃখে (অবিবেকীদিগের) সুখ-ভ্রম হয়, (অতএব দুঃখ ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে)।

ভাষ্য। দুঃখসংজ্ঞাভাবনোপদেশঃ ক্রিয়তে। অয়ং খলু সুখসংবেদনে ব্যবস্থিতঃ সুখং পরমপুরুষার্থং মন্যতে, ন সুখাদন্যন্নিঃশ্রেয়সমস্তি, সুখে প্রাপ্তে চরিতার্থঃ কৃতকরণীয়ো ভবতি। মিথ্যাসংকল্পাৎ সুখে তৎসাধনেষু চ বিষয়েষু সংরজ্যতে, সংরক্তঃ সুখায় ঘটতে, ঘটমানস্যাস্য জন্ম-জরা-ব্যাধি-প্রায়ণানিষ্ট-সংযোগেষ্টবিয়োগ-প্রার্থিতানুপপত্তিনিমিত্তমনেকবিধং যাবদ্দুঃখ-মুৎপদ্যতে, তং দুঃখবিকল্পং সুখমিত্যভিমন্যতে। সুখাঙ্গভূতং দুঃখং, ন দুঃখমনাসাদ্য শক্যং সুখমবাপ্তুং, তাদর্থ্যাৎ সুখমেবেদমিতি সুখসংজ্ঞোপ-হতপ্রজ্ঞো জায়স্ব ম্রিয়স্ব চেতি সংধাবতীতি[1] সংসারং নাতিবর্ত্ততে। তদস্যাঃ সুখসংজ্ঞায়াঃ প্রতিপক্ষো দুঃখসংজ্ঞাভাবনমুপদিশ্যতে, দুঃখানুষঙ্গাদ্দুঃখং জন্মেতি, ন সুখস্যাভাবাৎ।

১। "জায়স্ব ম্রিয়স্ব চেতি সংধাবতীতি"। পুনর্জায়তে পুনর্ম্রিয়তে জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা জায়তে, তদিদং সংধাবন-ব্যাপারপ্রস্য ইত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যটীকা।—এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের উদ্ধৃত ভাষ্যপাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, জন্মের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে জন্ম, এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণই ভাষ্যকারোক্ত সংধাবনক্রিয়া। ভাষ্যকার "জায়স্ব ম্রিয়স্ব চেতি" এই বাক্যের দ্বারা প্রথমে ঐ সংধাবনক্রিয়ারই প্রকাশ করিয়া, পরে "সংধাবতি" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে "সংসারং নাতিবর্ত্ততে" এই বাক্যের দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। এখানে তাৎপর্য্য-টীকানুসারে "সংধাবতীতি" এইরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইল। ভাষ্যে "জায়স্ব" ও "ম্রিয়স্ব" এই দুই ক্রিয়াপদে জনন ও মরণ-ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য অর্থের বিবক্ষাবশতঃ লোট্ বিভক্তির "স্ব" বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। "ক্রিয়াসমভি-হারে লোড়্লোটৌ হিস্বৌ বাচ তধ্বমোঃ।" (পাণিনিসূত্র ৩,৪।২)। প্রয়োগ যথা—"পুরীমবস্কন্দ লুনীহি নন্দনং" ইত্যাদি (শিশুপালবধ, ১ম সর্গ, ৫১শ শ্লোক)।

যদ্যেবং, কস্মাদ্দুঃখং জন্মেতি নোচ্যতে ? সোঽয়মেবং বাচ্যে যদেবমাহ দুঃখমেব জন্মেতি, তেন সুখাভাবং জ্ঞাপয়তীতি।

জন্মবিনিগ্রহার্থীয়ো বৈ খল্বয়মেবশব্দঃ, কথং ? ন দুঃখং জন্ম-স্বরূপতঃ, কিন্তু দুঃখোপচারাৎ, এবং সুখমপীতি। এতদনেনৈব নির্ব্বর্ত্ত্যতে, নতু দুঃখমেব জন্মেতি।

অনুবাদ। দুঃখসংজ্ঞারূপ ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে। যেহেতু এই জীব সুখভোগে ব্যবস্থিত, (অর্থাৎ) সুখকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সুখ হইতে অন্য নিঃশ্রেয়স নাই, সুখ প্রাপ্ত হইলেই চরিতার্থ (অর্থাৎ) কৃত-কর্ত্তব্য হয়। মিথ্যা সংকল্পবশতঃ সুখে এবং তাহার সাধন বিষয়সমূহে সংরক্ত অর্থাৎ অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, সংরক্ত হইয়া সুখের জন্য চেষ্টা করে, চেষ্টমান এই জীবের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অনিষ্টসংযোগ, ইষ্টবিয়োগ এবং প্রার্থিত বিষয়ের অনুপপত্তিনিমিত্তক অনেক-প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখবিকল্পকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ দুঃখকে সুখ বলিয়া অভিমান (ভ্রম) করে। দুঃখ সুখের অঙ্গভূত, (অর্থাৎ) দুঃখ না পাইয়া সুখ লাভ করিতে পারা যায় না। "তাদর্থ্য"বশতঃ অর্থাৎ দুঃখের সুখার্থতা-বশতঃ 'ইহা (দুঃখ) সুখই,' এইরূপ সুখসংজ্ঞার দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া (জীব) পুনঃ পুনঃ জন্মে এবং পুনঃ পুনঃ মরে, এইরূপ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণরূপ সংধাবন করে (অর্থাৎ) সংসারকে অতিক্রম করে না। তজ্জন্যই এই সুখসংজ্ঞার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিবিধ দুঃখে সুখ-বুদ্ধির প্রতিপক্ষ (বিরোধী) দুঃখবুদ্ধিরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। দুঃখানুষঙ্গবশতঃই জন্ম দুঃখ, সুখের অভাববশতঃ নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) যদি এইরূপ হয়, অর্থাৎ জন্ম যদি দুঃখানুষঙ্গবশতঃই দুঃখ হয় (স্বরূপতঃ দুঃখ না হয়), তাহা হইলে 'জন্ম দুঃখ' ইহা কেন কথিত হইতেছে না ? সেই এই সূত্রকার (মহর্ষি গোতম) এইরূপ বক্তব্যে অর্থাৎ "জন্ম দুঃখ" এইরূপ বক্তব্যস্থলে যে, "জন্ম দুঃখই" এইরূপ বলিতেছেন,— তদ্দ্বারা সুখের অভাব জ্ঞাপন করিতেছেন।

(উত্তর) এই "এব" শব্দ জন্মনিবৃত্ত্যর্থ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত ; কারণ, মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব" এই বাক্যে যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ "এব" শব্দ জন্মনিবৃত্তি বা মুক্তিরূপ চরম উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা সুখপদার্থের ব্যবচ্ছেদার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) জন্ম, স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু দুঃখের উপচারবশতঃই দুঃখ, এইরূপ সুখও স্বরূপতঃ দুঃখ নহে,

কিন্তু দুঃখের উপচারবশতঃই দুঃখ। ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্ম এই জীব কর্ত্তৃকই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ দুঃখে সুখাভিমানী জীবকর্ত্তৃকই উৎপাদিত হইতেছে, কিন্তু জন্ম দুঃখই, ইহা নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হইতে পারে যে, বিবেকী ব্যক্তিরা সাংসারিক সুখ ও উহার সমস্ত সাধনকেই দুঃখানুষক্ত বলিয়া বুঝিয়া উপদেশ ব্যতীতও কালে স্বয়ংই তাঁহারা ঐ সুখের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশের কোনই প্রয়োজন নাই। এতদুত্তরে মহর্ষি শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, বিবিধ দুঃখে সুখের অভিমানপ্রযুক্তও পূর্ব্বোক্ত দুঃখভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে। সূত্রের শেষে "দুঃখভাবনোপদেশঃ ক্রিয়তে" এই বাক্য মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝিয়া ভাষ্যকার সূত্রপাঠের পরেই ভাষ্যারম্ভে ঐ বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বাক্যের সহিত সূত্রের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, কোন কোন বিবেকী ব্যক্তিবিশেষের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশের প্রয়োজন না থাকিলেও অসংখ্য অবিবেকী ব্যক্তির জন্য ঐরূপ উপদেশের প্রয়োজন আছে। কারণ, তাহারা সুখভোগের জন্য অপরিহার্য্য বিবিধ দুঃখকে সুখ বলিয়া ভ্রম করে। তজ্জন্য তাহারা নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া আরও বিবিধ দুঃখভোগ করে। সুতরাং তাহারা যে সুখ ও উহার সাধন জন্মকে সুখ বলিয়াই বুঝে, উহাকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে তাহার ফলে তাহাদিগের ঐ সুখবুদ্ধি বিনষ্ট হইবে, ক্রমে জন্মাদিতে দুঃখবুদ্ধি বা তজ্জন্য সংস্কার সুদৃঢ় হইয়া বৈরাগ্য উৎপন্ন করিবে, তাহার ফলে চিরদিনের জন্য তাহারা দুঃখমুক্ত হইবে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিই এই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহার সাহায্যের জন্যই পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও "অয়ং খলু" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা অবিবেকী জীবেরই বুদ্ধি ও কার্য্যের বর্ণন করিয়া, তাহাদিগের জন্যই যে মহর্ষি দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই জীব অর্থাৎ বিবেকশূন্য সাধারণ জীব সুখভোগে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ তাহারা একমাত্র সুখকেই পরমপুরুষার্থ মনে করে, সুখ ভিন্ন কোন নিঃশ্রেয়স নাই, সুখ পাইলেই তাহারা চরিতার্থ বা কৃতকর্ত্তব্য হয়। তাহারা মিথ্যা সঙ্কল্পবশতঃ সুখ ও উহার উপায়সমূহে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া, সুখের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করে। তাহার ফলে জন্মলাভ করিয়া জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং যাহা অনিষ্ট, তাহার সহিত সম্বন্ধ এবং যাহা ইষ্ট, তাহার সহিত বিয়োগ এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণজন্য নানাবিধ দুঃখলাভ করে। কিন্তু তাহারা সেই নানাবিধ দুঃখকে সুখ বলিয়াই বুঝে। কারণ, দুঃখভোগ না করিয়া কিছুতেই সুখভোগ করা যায় না, দুঃখ সুখের অঙ্গ, অর্থাৎ সুখের অপরিহার্য্য নির্ব্বাহক। সুতরাং দুঃখের সুখার্থতাবশতঃ সুখাভিলাষী অবিবেকী ব্যক্তিরা দুঃখকে সুখ বলিয়াই বুঝে। দুঃখে তাহাদিগের যে সুখসংজ্ঞা অর্থাৎ সুখবুদ্ধি, তদ্দ্বারা তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া সুখের জন্য নানা কার্য্য করে, তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ লাভ করে, তাহারা সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা সুখকে পরমপুরুষার্থ

মনে করিয়া সুখের জন্য যে সকল কার্য্য করে, উহা তাহাদিগের নানাবিধ দুঃখের কারণ হইয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং তাহাদিগের [illegible] বা সুখবুদ্ধি, যাহা তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ[illegible] প্রবৃত্ত করিতেছে। উহা বিনষ্ট করা আবশ্যক; প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা [illegible] তাই পূর্ব্বোক্তরূপ সুখসংজ্ঞার প্রতিপক্ষ যে দুঃখসংজ্ঞারূপ ভাবনা, তাহাই [illegible] সুখের সাধন এবং সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে তাহার ফলে সুখে বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন আর সুখের অঙ্গ নানাবিধ দুঃখে সুখবুদ্ধি জন্মিবে না, তখন দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ বোধ হওয়ায় চিরকালের জন্য দুঃখমুক্ত হইতেই অভিলাষ ও চেষ্টা জন্মিবে। তাই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত অবিবেকীদিগের সুখে বৈরাগ্যলাভের জন্য জন্মাদিতে দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, তজ্জন্যই তিনি জন্মকে দুঃখ বলিয়াছেন এবং প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে সুখের উদ্দেশ না করিয়া, দুঃখের উদ্দেশ করিয়াছেন। মূল কথা, দুঃখানুষঙ্গবশতঃই জন্ম দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুখের অভাব-বশতঃ অর্থাৎ সুখের অস্তিত্বই নাই বলিয়া মহর্ষি জন্মকে দুঃখ বলেন নাই।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, মহর্ষির মতে জন্ম যদি দুঃখানুষঙ্গবশতঃই দুঃখ হয় অর্থাৎ স্বরূপতঃ দুঃখপদার্থ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখং জন্মোৎপত্তিঃ" এইরূপ বাক্যই তাঁহার বক্তব্য। কিন্তু তিনি যখন "দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ "দুঃখ" শব্দের পরে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা তিনি যে, সুখের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। নচেৎ ঐ বাক্যে তাঁহার "এব" শব্দ প্রয়োগের সার্থক্য কি? "দুঃখমেব" এইরূপ বাক্য বলিলে "এব" শব্দের দ্বারা সুখ নহে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং যাহাকে সুখের সাধন বলিয়া সুখও বলা যায়, তাহাকে মহর্ষি দুঃখই অর্থাৎ সুখ নহে, ইহা বলিলে তিনি যে, সুখপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। ভাষ্যকার শেষে নিজেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রে মহর্ষির প্রযুক্ত "এব" শব্দ "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়"। অর্থাৎ উহা সুখের নিষেধার্থ নহে, কিন্তু জন্মের বিনিগ্রহ বা নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্যই উহা প্রযুক্ত। অতএব উক্ত পূর্ব্বপক্ষ যুক্ত নহে। ভাষ্যে "বৈ" শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততাদ্যোতক। "খলু" শব্দটি হেত্বর্থ। জন্মের বিনিগ্রহ বা নিবৃত্তিরূপ "অর্থ" (প্রয়োজন) বশতঃই প্রযুক্ত, এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন "মতু" প্রত্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যয়কে প্রাচীনগণ "মত্বর্থীয়" বলিয়াছেন, তদ্রূপ ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে "এব" শব্দকে "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়" বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে,[১] মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা 'জন্ম

১। পরিহরতি "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়" ইতি। জন্মনো বিনিগ্রহে বিনিবৃত্তিঃ স এবার্থোঽত্র বর্ত্তত ইতি জন্মবিনিগ্রহার্থীয়ঃ, যথা মত্বর্থীয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি, জন্ম দুঃখমেবেতি ভাবয়িতব্যং, নাত্র মনাগপি সুখবুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা। অনেকানর্থপরম্পরাপাতেনাপবর্গপ্রত্যূহপ্রসঙ্গাদিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

দুঃখই' এইরূপ ভাবনার কর্ত্তব্যতাই সূচনা করিয়াছেন। জন্মে অল্পমাত্রও সুখবুদ্ধি করিবে না, কেবল দুঃখবুদ্ধিই করিবে, ইহাই মহর্ষির উপদেশ। কারণ, জন্মে সুখবুদ্ধি করিলে সুখের সাধন নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও আবার সুখ ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। সুতরাং উহা তাঁহাদিগের মুক্তির প্রতিবন্ধকই হইবে। অতএব মহর্ষি জন্মে সুখবুদ্ধির অকর্ত্তব্যতা সূচনা করিয়া কেবল দুঃখবুদ্ধির কর্ত্তব্যতা সূচনা করিতেই "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জন্মের নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিই উহার চরম উদ্দেশ্য। জন্মে সুখবুদ্ধি করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, সুতরাং জন্মের নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হইতে পারে না। মূলকথা, মহর্ষি পূর্ব্বে "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা সুখের নিষেধ করেন নাই। তিনি জন্মকে স্বরূপতঃই দুঃখপদার্থ বলেন নাই। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, জন্ম স্বরূপতঃই দুঃখপদার্থ, ইহা হইতেই পারে না, এবং সুখও যে স্বরূপতঃই দুঃখপদার্থ, ইহাও হইতে পারে না, কিন্তু দুঃখের উপচারবশতঃই জন্ম ও সুখকে দুঃখ বলা হয়। দুঃখের আয়তন শরীর এবং দুঃখের সাধন ইন্দ্রিয়াদি এবং স্বয়ং সুখপদার্থ, এই সমস্তই দুঃখানুষক্ত ; তাই ঐ সমস্তকে শাস্ত্রে গৌণদুঃখ বলা হইয়াছে। মহর্ষি গোতমও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি ঐ সমস্তকে মুখ্য দুঃখ বলেন নাই, তাহা বলিতেই পারেন না। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত জন্ম এই জীবকর্তৃকই উৎপাদিত হয়, কিন্তু জন্ম স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। ভাষ্যকার প্রথমেই "অয়ং খলু" ইত্যাদি ভাষ্যে "ইদম্" শব্দের দ্বারা যে জীবকে গ্রহণ করিয়া তাহার বিবিধ দুঃখে সুখাভিমানের বর্ণন করিয়াছেন, শেষে "অনেনৈব" এই বাক্যে "ইদম্" শব্দের দ্বারাও বিবিধ দুঃখের সুখাভিমানী ঐ জীবকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীবই বিবিধ দুঃখে সুখাভিমানবশতঃ সুখভোগের জন্য নানা কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে জন্ম পরিগ্রহ করে। সুতরাং ঐ জীবই কর্ম্মদ্বারা নিজের জন্মের উৎপাদক। কারণ, জীব কর্ম্ম না করিলে ঈশ্বর তাহার কর্ম্মানুসারে জন্মসৃষ্টি কিরূপে করিবেন? কিন্তু ঐ জন্ম যে স্বরূপতঃ দুঃখই, তাহা নহে ; উহা দুঃখানুষক্ত বলিয়া গৌণ দুঃখ। উহাতে সুখবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল দুঃখভাবনার উপদেশ করিবার জন্যই মহর্ষি বলিয়াছেন—"দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ"।

বস্তুতঃ মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের দ্বারা জন্মকে যে, স্বরূপতঃ দুঃখই বলেন নাই, বিবিধ দুঃখানুষক্ত বলিয়াই গৌণ দুঃখ বলিয়াছেন, ইহা ঐ সূত্রের প্রথমে "বিবিধবাধনাযোগাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে এবং উহার পরেই "ন সুখস্যাপ্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ" এই (৫৫শ) সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সুখের অস্তিত্ব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে (১৮শ সূত্রে) আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করিতে নবজাত শিশুর হর্ষের উল্লেখ করিয়াও সুখপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে (৪১শ সূত্রে) অন্য উদ্দেশ্যে সুখ ও দুঃখ, এই উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া তিনি সুখের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই বুঝা যাইতে পারে না। অতএব জন্মাদিতে সুখবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল দুঃখভাবনার উপদেশ করিবার জন্যই মহর্ষি "দুঃখমেব" এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন,

ইহাই বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি মহর্ষির ঐরূপই তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বিবেকীর পক্ষে সমস্ত দুঃখই, অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তি জন্মাদি সমস্তকে দুঃখ বলিয়াই বুঝেন, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে সুখেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন[১]। ফলকথা, ভারতের মুক্তিমার্গের উপদেশক ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সকলকেই সুখের জন্য কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন নাই। তাঁহারা সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি, এই উভয়কেই প্রয়োজন বলিয়াছেন, এবং সুখার্থী অধিকারিবিশেষের জন্য সুখসাধন নানা কর্ম্মেরও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরিগৃহীত মূল বেদেও সুখসাধন নানাবিধ কর্ম্মের উপদেশ আছে, আবার মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগেরও উপদেশ আছে। কারণ, সুখসাধন কর্ম্ম করিলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মুক্তি হইতে পারে না। তাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি লাভ করিতে হইলে জন্মাদিকে দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষিগণের উপদেশ। মহর্ষি গোতম এই জন্যই প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগসূত্রে মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের উল্লেখ করিতে সুখের উল্লেখ না করিয়া, দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখের অস্তিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ সুখ সামান্যতঃ প্রমেয় পদার্থ হইলেও আত্মাদির ন্যায় বিশেষ প্রমেয় নহে। কারণ, সুখের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে। মুমুক্ষু যে সুখকে দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন, সেই সুখের তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার পক্ষে মোক্ষের প্রতিকূলই হয়, পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি।

জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি "ষড়্দর্শনসমুচ্চয়"গ্রন্থে ন্যায়দর্শনসম্মত "প্রমেয়" পদার্থের উল্লেখ করিতে "প্রমেয়ন্ত্বাত্মদেহাদ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদি চ" এই বচনের দ্বারা প্রমেয়মধ্যে সুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের টীকাকার জৈন পণ্ডিত গুণরত্ন সেখানে বলিয়াছেন যে, সুখও দুঃখানুষক্ত বলিয়া সুখে দুঃখত্ব ভাবনার জন্য প্রমেয়মধ্যে সুখেরও উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা পাওয়া যায় না। সুতরাং মহর্ষি গোতম প্রমেয়মধ্যে সুখের উদ্দেশ করেন নাই, ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার মতে যে, মহর্ষি গোতম প্রমেয়ের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা উহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এখানে দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। হরিভদ্রসূরির সময় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। কেহ কেহ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীও বলিয়াছেন। (হরগোবিন্দ দাসকৃত "হরিভদ্রসূরিচরিত্রং" দ্রষ্টব্য)। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী গ্রহণ করিলেও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নের কথা অগ্রাহ্য করিয়া হরিভদ্রসূরির কথা গ্রহণ করা যায় না। তবে হরিভদ্রসূরি ন্যায়দর্শনসম্মত প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ করিতে সুখের

১। "তে হ্লাদ-পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ"।
"পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"।—যোগদর্শন। সাধনপাদ। ১৪।১৫

উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? তাঁহার ঐরূপ উক্তির মূল কি ? ইহা অবশ্য বিশেষ চিন্তনীয়। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে (১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায়) কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু ইহাও মনে হয় যে, হরিভদ্রস্থরি ন্যায়দর্শনোক্ত চরম প্রমেয় অপবর্গকেই "সুখ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংক্ষেপে অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা ন্যায়দর্শনোক্ত দ্বাদশ প্রমেয় প্রকাশ করিতে "আদ্য" ও "আদি" শব্দের দ্বারাই সপ্ত প্রমেয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্লোকের ছন্দোরক্ষার্থ ন্যায়সূত্রোক্ত প্রমেয়-বিভাগের ক্রমও পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি অপবর্গের উল্লেখ করিতে "সুখ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারি। কারণ, আত্যন্তিক দুঃখাভাবই অপবর্গ। বেদে কোন স্থলে যে, আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থেই "সুখ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে হরিভদ্র সূরিও উক্ত শ্লোকে আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ অপবর্গ বুঝাইতে "সুখ" শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। তিনি অতি সংক্ষেপে ন্যায়দর্শনসম্মত দ্বাদশ প্রমেয়ের প্রকাশ করিতে প্রত্যেকের নামের উল্লেখ করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।

হরিভদ্র সূরির উক্ত বচনে "সুখ" শব্দ দেখিয়া কোন প্রবীণ ঐতিহাসিক কল্পনা করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে ন্যায়দর্শনের প্রমেয়বিভাগ-সূত্রে (১।১।৯) "সুখ" শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না। পরে "সুখ" শব্দের স্থলে "দুঃখ" শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তখন হইতেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও সর্ব্বাশুভবাদ বা সর্ব্বদুঃখবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সর্ব্বাশুভবাদী ছিলেন না ; তাঁহারা তখন জন্মাদিকে এবং সুখকে দুঃখ বলিয়া ভাবনার উপদেশ করেন নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, হরিভদ্র সূরি ন্যায়দর্শন-সম্মত প্রমেয়বর্গের প্রকাশ করিতে সুখের উল্লেখ করিলেও তিনি "আদ্য" বা "আদি" শব্দের দ্বারা যে দুঃখেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। টীকাকার গুণরত্নও ঐ স্থলে তাহা বলিয়াছেন এবং তিনি ন্যায়দর্শনের "দুঃখ"শব্দ-যুক্ত প্রমেয়বিভাগ-সূত্রটিও ঐ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া হরিভদ্র সূরির "আদ্য" ও "আদি" শব্দের প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তিনি হরিভদ্র সূরির প্রযুক্ত "সুখ"শব্দের অন্য কোন অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু যদি হরিভদ্র সূরির উক্ত বচনের দ্বারা তাঁহার মতে দুঃখকেও ন্যায়-দর্শনোক্ত প্রমেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত বচনে "সুখ"শব্দ আছে বলিয়া পূর্ব্বকালে ন্যায়দর্শনের প্রমেয়বিভাগ-সূত্রে "সুখ"শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না, এইরূপ কল্পনা করা যায় না। পরন্তু "দুঃখ"শব্দের ন্যায় "সুখ"শব্দও ছিল, এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা না থাকায় ঐরূপ কল্পনাও করা যায় না। ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাঁহার সময়ে ন্যায়দর্শনের প্রমেয়বিভাগসূত্রে যে সুখ শব্দ ছিল না, দুঃখ শব্দই ছিল, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং হরিভদ্র সূরি কোন মতান্তর গ্রহণ করিয়া ন্যায়মত বর্ণন করিতে প্রমেয়মধ্যে সুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি ত্রয়োদশ প্রমেয় বলিয়াছেন, অথবা তিনি আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ অপবর্গ প্রকাশ করিতেই "সুখ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই

বুঝিতে হইতে (প্রথম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি গোতম দুঃখের ন্যায় সুখেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান-বিষয় আত্মাদি প্রমেয়ের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহার কারণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুখের অভাবই দুঃখ, দুঃখের অভাবই সুখ ; সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোন ভাব পদার্থ নাই, এইরূপ মতও এখন শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাও কোন আধুনিক নূতন মত নহে। "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে (দ্বাদশ কারিকার টীকায়) শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখের ভাবরূপতা অনুভবসিদ্ধ, উহাকে অভাবপদার্থ বলিয়া অনুভব করা যায় না। সুখের অভাব দুঃখ এবং দুঃখের অভাব সুখ, ইহা বলিলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষও অনিবার্য্য হয়। কারণ, ঐ মতে সুখ বুঝিতে গেলে দুঃখ বুঝা আবশ্যক, এবং দুঃখ বুঝিতে গেলে সুখ বুঝা আবশ্যক। সুতরাং সুখের অসিদ্ধিবশতঃ দুঃখের অসিদ্ধি এবং দুঃখের অসিদ্ধিবশতঃ সুখের অসিদ্ধি হওয়ায় সুখ ও দুঃখ, এই উভয় পদার্থই অসিদ্ধ হয়। কিন্তু যেরূপেই হউক, সুখ ও দুঃখ, এই উভয় পদার্থ উভয় পক্ষেরই সম্মত। শ্রীধরভট্টও উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ("ন্যায়কন্দলী", ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৫৭॥

দুঃখ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৩॥

ভাষ্য। দুঃখোদ্দেশানন্তরমপবর্গঃ, স প্রত্যাখ্যায়তে—

অনুবাদ। দুঃখের উদ্দেশের অনন্তর অপবর্গ (উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হইয়াছে), তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, অর্থাৎ মহর্ষি অপবর্গের পরীক্ষার জন্য প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এই সূত্রের দ্বারা অপবর্গের অস্তিত্ব খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্র। ঋণ-ক্লেশ-প্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ ॥৫৮॥৪০১॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ঋণানুবন্ধ, ক্লেশানুবন্ধ এবং প্রবৃত্ত্যনুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব, অর্থাৎ অপবর্গ অসম্ভব, সুতরাং উহা অলীক।

ভাষ্য। **ঋণানুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ**,—"জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋ´ণৈঋ´ণবা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য"[1] ইতি **ঋণানি**, তেষামনুবন্ধঃ,—স্বকর্ম্মভিঃ সম্বন্ধঃ, কর্ম্ম-

---

১। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় "তৈত্তিরীয়সংহিতা"র ষষ্ঠ কাণ্ডের তৃতীয় প্রপাঠকের দশম অনুবাকে "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণ-স্ত্রিভির্ঋণবা জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারীবাসী তদবদানৈরেবাবদয়তে তদবদানানামবদানত্বং"—এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যও "তৈত্তিরীয়-সংহিতা"র প্রথম কাণ্ডের ভাষ্যে ঐরূপ শ্রুতিপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন। (তৈত্তিরীয়সংহিতা, পুণা, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণবা জায়তে" ইত্যাদি শ্রুতিপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিপাঠে যে, "ঋণৈঃ" এই পদটি আছে, ইহা

সম্বন্ধবচনাৎ। "জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং যদগ্নিহোত্রং, দর্শপূর্ণমাসৌ চে"তি, "জরয়া হ বা এষ তস্মাৎ সত্রাদ্বিমুচ্যতে মৃত্যুনা হ বে"তি¹। ঋণানুবন্ধাদপবর্গানুষ্ঠানকালো নাস্তীত্যপবর্গাভাবঃ। **ক্লেশানুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ,**—ক্লেশানুবদ্ধ এবায়ং ম্রিয়তে, ক্লেশানুবদ্ধশ্চ জায়তে, নাস্য ক্লেশানুবন্ধবিচ্ছেদো গৃহ্যতে। **প্রবৃত্ত্যনুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ,**—জন্ম প্রভৃত্যয়ং যাবৎপ্রায়ণং বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভেণাবিমুক্তো গৃহ্যতে। তত্র যদুক্তং, "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি, তদনুপপন্নমিতি।

অনুবাদ। (১) "ঋণানুবন্ধ" প্রযুক্ত অপবর্গ নাই অর্থাৎ উহা অলীক। (বিশদার্থ) "জায়মান ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে, পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে (মুক্ত হন")—এই সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মচর্য্যাদি "ঋণ", সেই ঋণত্রয়ের "অনুবন্ধ" বলিতে স্বকীয় কর্ম্মসমূহের সহিত সম্বন্ধ, যেহেতু (শ্রুতিতে) কর্ম্মসম্বন্ধের কথন আছে। যথা—"এই সত্র জরামর্য্য, যাহা অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস। জরার দ্বারা এই গৃহস্থ দ্বিজ সেই সত্র হইতে বিমুক্ত হয়, অথবা মৃত্যুর দ্বারা বিমুক্ত হয়"। "ঋণানুবন্ধ" প্রযুক্ত অপবর্গানুষ্ঠানের (অপবর্গার্থ শ্রবণমননাদি কার্য্যের) সময় নাই, অতএব অপবর্গ নাই।

(২) "ক্লেশানুবন্ধ" প্রযুক্ত অপবর্গ নাই। বিশদার্থ এই যে, (জীবমাত্রই) ক্লেশানুবদ্ধ (রাগদ্বেষাদিযুক্ত) হইয়াই মরে, ক্লেশানুবদ্ধ হইয়াই জন্মে,—এই জীবের ক্লেশানুবন্ধ হইতে বিচ্ছেদ অর্থাৎ কখনই রাগদ্বেষাদি-দোষশূন্যতা বুঝা যায় না।

পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার উক্তির দ্বারা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বেদের অন্যত্র ঐরূপ শ্রুতিপাঠও থাকিতে পারে। "মনুসংহিতা"র ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকের টীকায় মহামনীষী কুল্লুক ভট্ট "জায়মানো ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋ্ণৈর্ঋণবান্ জায়তে যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ" এইরূপ শ্রুতিপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদে কোন স্থলে ঐরূপ শ্রুতিপাঠও থাকিতে পারে। কিন্তু "ঋণবান্ জায়তে" এই স্থলে "ঋণবা জায়তে" ইহাই প্রকৃত পাঠ। মূলসংহিতায় ঐরূপ পাঠই আছে। বৈদিকপ্রয়োগবশতঃ "ঋণবান্" এই স্থলে "ঋণবা জায়তে" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত কোন ভাষ্যপুস্তকেও "ঋণবা জায়তে" এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। মুদ্রিত কোন কোন ভাষ্যপুস্তকের নিম্নে উহা পাঠান্তররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকে উক্তরূপ শ্রুতিপাঠই উদ্ধৃত দেখা যায়। তদনুসারে এখানে উক্তরূপ পাঠই গৃহীত হইল। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে দেখা যায়—"অপিচ শ্রূয়তে—"জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌচ, জরয়া হ বা এতাভ্যাং নির্ম্মুচ্যতে মৃত্যুনা চে"তি।

(৩) "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"বশতঃ অপবর্গ নাই। বিশদার্থ এই যে, এই জীব জন্ম প্রভৃতি মৃত্যু পর্য্যন্ত বাগারম্ভ, বুদ্ধ্যারম্ভ ও শরীরারম্ভ কর্ত্তৃক অর্থাৎ বাচিক, মানসিক ও শারীরিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্মকর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত বুঝা যায় অর্থাৎ জীব সর্ব্বদাই কোন প্রকার কর্ম্ম অবশ্যই করিতেছে।

তাহা হইলে এই যে বলা হইয়াছে, "দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তরের বিনাশ হইলে তদনন্তরের বিনাশপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়", তাহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়মধ্যে "দুঃখে"র পরেই "অপবর্গে"র উপদেশ করিয়া, তদনুসারে দুঃখের লক্ষণ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রকরণে দুঃখের পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং এখন ক্রমানুসারে অপবর্গের পরীক্ষার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। তাই মহর্ষি অবসরসংগতিবশতঃ এখানে অপবর্গের পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ এই যে, অপবর্গ নাই অর্থাৎ উহা অলীক। পূর্ব্বপক্ষের সমর্থক হেতু বলিয়াছেন—ঋণানুবন্ধ, ক্লেশানুবন্ধ ও প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ। সূত্রোক্ত "অনুবন্ধ" শব্দের "ঋণ", "ক্লেশ" ও "প্রবৃত্তি" শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পূর্ব্বোক্ত হেতুত্রয় বুঝা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য এই যে, ঋণানুবন্ধ, ক্লেশানুবন্ধ ও প্রবৃত্ত্যনুবন্ধবশতঃ অপবর্গ হইতেই পারে না, উহা অসম্ভব। যাহা অসম্ভব, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না; যাহা অসম্ভাবিত, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই কিছুতেই সিদ্ধ করা যায় না, ইহা নৈয়ায়িকগণও বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"ঋণানুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ"। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে হইলে "ঋণ" কি এবং উহার "অনুবন্ধ" কি, এবং কেনই বা তৎপ্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব, ইহা বুঝা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরেই "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, ঐ শ্রুতিবাক্যোক্ত ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয়কে সূত্রোক্ত "ঋণ" বলিয়া, ঐ ঋণত্রয় মোচনের জন্য যে সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে বলিয়াছেন "ঋণানুবন্ধ"। "অনুবন্ধ" শব্দের অর্থ এখানে অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। "ঋণানুবন্ধ" এই স্থলে সেই সম্বন্ধ—কর্ম্মসম্বন্ধ। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—"কর্ম্মসম্বন্ধবচনাৎ"। অর্থাৎ শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত ঋণ মোচনের জন্য কর্ম্মবিশেষের অবশ্যকর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঋণ মোচনের জন্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য। "ঋণানুবন্ধ" হইতে কখনও মুক্তি নাই। উদ্দ্যোতকর এই তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন, "অনুবন্ধঃ সদাকরণীয়তা"। অর্থাৎ ঋণ মোচনের জন্য যাবজ্জীবন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাই এখানে "ঋণানুবন্ধ" শব্দের ফলিতার্থ। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সম্বন্ধের প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য পরে "জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ—"জরামর্য্য" অর্থাৎ

জরা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত উহা কর্ত্তব্য। জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যবশতঃ অত্যন্ত অশক্ত হইলে উহা ত্যাগ করা যায়। নচেৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত উহা করিতেই হইবে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, জরা ও মৃত্যুর দ্বারা যজমান উক্ত যজ্ঞ কর্তৃক নির্ম্মুক্ত হয়। "জরা" শব্দের অর্থ এখানে জরানিমিত্তক অত্যন্ত অশক্ততা, "মর" শব্দের অর্থ মৃত্যু। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরামরাভ্যাং নির্ম্মুচ্যতে" এইরূপ অর্থে "জরামর" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন "জরামর্য্য" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "জরামর্য্য" শব্দের দ্বারা অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগের যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ যে, যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে বেদের অন্তর্গত "বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এবং "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই দুইটি বিধিবাক্যও আছে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী উক্ত বিধিবাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন প্রকৃত কথা এই যে, প্রথমে ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য এবং দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উক্ত ঋণত্রয়-মুক্ত হইতেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত হওয়ায় মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠান করার সময়ই থাকে না, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব, উহা অলীক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর প্রথম কথার তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় নিরাকরণ করিয়াই মোক্ষে মনোনিবেশ কর্ত্তব্য। পরন্তু উহা না করিয়া মোক্ষার্থ অনুষ্ঠান করিলে অধোগতি হয়, ইহা ভগবান্ মনুও স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন[১]। ব্যক্তিবিশেষের ব্রহ্মচর্য্য ও পুত্রোৎপাদনের পরে জীবনের অনেক সময় থাকিলেও যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবশতঃ তাঁহারও মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের সময় নাই। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ যে, দ্বিজাতির মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের চরম ও প্রধান প্রতিবন্ধক, ইহা স্বীকার্য্য। তাই ভাষ্যকার এখানে "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকেই মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের চরম প্রতিবন্ধকরূপে প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু যদিও "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রাহ্মণেরই পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় কথিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রুতিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ব্রহ্মচর্য্যাদির বিধান থাকায় দ্বিজাতিমাত্রেরই পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় নিরাকরণ করা আবশ্যক। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ও ৩৭শ শ্লোকে "দ্বিজ" শব্দের দ্বারা দ্বিজাতিমাত্রই গৃহীত হইয়াছে, শাস্ত্রান্তরেও উহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্বিজেতর অধিকারীদিগেরও যাবজ্জীবন-

---

১। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥৩৫॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥৩৬॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥৩৭॥—মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অঃ ॥

কর্ত্তব্য শাস্ত্রবিহিত অনেক কর্ম্ম আছে। সুতরাং তাঁহাদিগেরও মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় মোক্ষ অসম্ভব। সুতরাং মোক্ষ কাহারই হইতে পারে না, উহা অলীক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় কথা এই যে, "ক্লেশানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবমাত্রই ক্লেশানুবন্ধ হইয়াই মরে এবং ক্লেশানুবন্ধ হইয়াই জন্মে, ক্লেশানুবন্ধ হইতে কখনও জীবের বিচ্ছেদ বুঝা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই দোষত্রয়রূপ যে "ক্লেশ", উহাই জীবের সংসারের নিদান; উহার উচ্ছেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু উহার যে, উচ্ছেদ হইতে পারে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। জীবের ঐ ক্লেশের সহিত তাহার যে অনুবন্ধ অর্থাৎ অপরিহার্য্য সম্বন্ধ, তাহার কখনও বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদ হয়, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু জন্মকালেও জীবের ক্লেশানুবন্ধ, মরণকালেও ক্লেশানুবন্ধ এবং ইহার পূর্ব্বেও সকল সময়েই জীবের ক্লেশানুবন্ধ বুঝা যায়। সুতরাং উহার উচ্ছেদ অসম্ভব বলিয়া মুক্তিও অসম্ভব। কারণ, সংসারের নিদানের উচ্ছেদ না হইলে কখনই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের সাধনপাদের তৃতীয় সূত্রে অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ "ক্লেশ" বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম সংক্ষেপে রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই ত্রিবিধ দোষ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ দোষত্রয়েরই নাম "ক্লেশ"। পরবর্ত্তী ৬৩ম সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ যোগদর্শনোক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশও রাগ, দ্বেষ ও মোহেরই অন্তর্গত। সুতরাং সংক্ষেপে রাগ, দ্বেষ ও মোহকেও "ক্লেশ" বলা যায়।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর তৃতীয় কথা এই যে, "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব। মহর্ষি গোতম "প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" (১।১।১৭) এই সূত্রের দ্বারা বাচিক, মানসিক ও শারীরিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্মকে "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন এবং ঐ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকেও "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন। মনুষ্যমাত্রই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যথাসম্ভব ঐ কর্ম্ম করিতেছে। কাহারও একেবারে কর্ম্মশূন্যতা দেখা যায় না, উহা হইতেই পারে না। পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তির" সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধই "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"। তৎপ্রযুক্ত কাহারই অপবর্গ হইতেই পারে না। কারণ, কর্ম্ম করিলেই তজ্জন্য ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হইবেই। সুতরাং উহার ফলভোগের জন্য পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহও করিতে হইবে। অতএব মোক্ষ অসম্ভব। কারণ, দোষজন্য প্রবৃত্তি সংসারের নিদান। সুতরাং উহার উচ্ছেদ ব্যতীত সংসারের উচ্ছেদ হইতেই পারে না। কিন্তু ঐ প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া সংসারের উচ্ছেদও অসম্ভব, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর তৃতীয় কথার তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যার উপসংহারে ন্যায়দর্শনের "দুঃখ-জন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার করিয়াছেন যে, "দুঃখ-জন্ম" ইত্যাদি সূত্রে যে ক্রমে কারণ সূচনা করিয়া অপবর্গের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ ঋণত্রয় মোচনের জন্য যাবজ্জীবন কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবশতঃ সময়াভাবে শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভই হইতে পারে না, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ অসম্ভব। মিথ্যাজ্ঞান-

প্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষরূপ দোষও অবশ্যম্ভাবী, উহার উচ্ছেদেরও সম্ভাবনা নাই এবং দোষ-প্রযুক্ত কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির অনুৎপত্তিরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মের অপায়প্রযুক্ত যে দুঃখাপায়রূপ অপবর্গ কথিত হইয়াছে, তাহা কোনরূপেই সম্ভব নহে। জন্মের সাক্ষাৎ কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তির" কারণ কর্ম্ম যখন সর্ব্বদাই করিতে হয়, যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাও উহা করেন, সুতরাং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" সকলেরই পুনর্জ্জন্ম সম্পাদন করিবে, অতএব মোক্ষ কাহারই সম্ভব নহে; সুতরাং মোক্ষ নাই অর্থাৎ মোক্ষ অলীক ॥৫৮॥

ভাষ্য। অত্রাভিধীয়তে, যত্তাবদৃণানুবন্ধাদিতি ঋণৈরিব ঋণৈরিতি।

অনুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষে (উত্তর) কথিত হইতেছে অর্থাৎ মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্র হইতে কতিপয় সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। "ঋণানুবন্ধাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [যে পূর্ব্বপক্ষ কথিত হইয়াছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রুতিতে] "ঋণৈঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা "ঋণৈরিব" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "ঋণ" শব্দ গৌণশব্দ, উহার অর্থ ঋণসদৃশ।

সূত্র। প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদো নিন্দা-প্রশংসোপপত্তেঃ ॥৫৯॥৪০২॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রধান শব্দের অনুপপত্তিবশতঃ অপ্রধান শব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে; কারণ, নিন্দা ও প্রশংসার উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। "ঋণৈ"রিতি নায়ং প্রধানশব্দঃ, যত্র খল্বেকঃ প্রত্যাদেয়ং দদাতি, দ্বিতীয়শ্চ প্রতিদেয়ং গৃহ্ণাতি, তত্রাস্য দৃষ্টত্বাৎ প্রধানমৃণশব্দঃ, ন চৈতদিহোপপদ্যতে, **প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদঃ** ঋণৈরিব ঋণৈরিতি। **অপ্রযুক্তোপমঞ্চৈতদ্যথাঽগ্নির্ম্মাণবক ইতি।** অন্যত্র দৃষ্টশ্চায়মৃণশব্দ ইহ প্রযুজ্যতে যথাঽগ্নিশব্দো মাণবকে। কথং গুণশব্দে-নানুবাদঃ? **নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ।** কর্ম্মলোপে ঋণীব ঋণাদানা-ন্নিন্দ্যতে, কর্ম্মানুষ্ঠানে চ ঋণীব ঋণদানাৎ প্রশস্যতে, স এবোপমার্থ ইতি।

জায়মান ইতি চ গুণশব্দো বিপর্য্যয়েনাধিকারাৎ। "জায়-মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ" ইতি চ গুণশব্দো গৃহস্থঃ সম্পদ্যমানো "জায়মান" ইতি। যদাঽয়ং গৃহস্থো জায়তে তদা কর্ম্মভিরধিক্রিয়তে **মাতৃতো জায়মানস্যানধিকারাৎ।** যদা তু মাতৃতো জায়তে কুমারো ন তদা

কর্ম্মভিরধিক্রিয়তে, **অর্থিনঃ শক্তস্য চাধিকারাৎ।** অর্থিনঃ কর্ম্মভিরধিকারঃ, কর্ম্মবিধৌ কামসংযোগশ্রুতেঃ, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ইত্যেবমাদি। **শক্তস্য চ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ,** শক্তস্য কর্ম্মভিরধিকারঃ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, শক্তঃ খলু বিহিতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে, নেতর ইতি। **উভয়াভাবস্তু প্রধানশব্দার্থে,** মাতৃতো জায়মানে কুমারে উভয়মর্থিতা শক্তিশ্চ ন ভবতীতি। **ন ভিদ্যতে চ লৌকিকাদ্বাক্যাদ্বৈদিকং বাক্যং প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিপুরুষ-প্রণীতত্বেন।** তত্র লৌকিকস্তাবদপরীক্ষকোঽপি ন জাতমাত্রং কুমারকমেবং ব্রূয়াদধীষ্ব যজস্ব ব্রহ্মচর্য্যং চরেতি, কুত এবমৃষিরুপপন্নানবদ্যবাদী উপদেশার্থেন প্রযুক্ত উপদিশতি? ন খলু বৈ নর্ত্তকোঽন্ধেষু প্রবর্ত্ততে ন গায়নো বধিরেষ্বিতি। **উপদিষ্টার্থবিজ্ঞাতা চোপদেশবিষয়ঃ।** যশ্চোপদিষ্টমর্থং বিজানাতি তং প্রত্যুপদেশঃ ক্রিয়তে, ন চৈতদস্তি জায়মানকুমারকে ইতি। **গার্হস্থ্যলিঙ্গঞ্চ মন্ত্রব্রাহ্মণং কর্ম্মাভিবদতি,** যচ্চ মন্ত্রব্রাহ্মণং কর্ম্মাভিবদতি, তৎ পত্নীসম্বন্ধাদিনা গার্হস্থ্যলিঙ্গেনোপপন্নং, তস্মাদ্গৃহস্থোঽয়ং জায়মানোঽভিধীয়ত ইতি।

অনুবাদ। "ঋণৈঃ" এই পদে ইহা অর্থাৎ "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে "ঋণৈঃ" এই পদের অন্তর্গত ঋণ শব্দটী প্রধান শব্দ (মুখ্য শব্দ) নহে। কারণ, যে স্থলে এক ব্যক্তি প্রত্যাদেয় দ্রব্য দান করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদেয় দ্রব্য গ্রহণ করে, সেই স্থলে এই "ঋণ" শব্দের দৃষ্টতাবশতঃ অর্থাৎ ঐরূপ স্থলেই সেই প্রতিদেয় দ্রব্যে "ঋণ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; এ জন্য (ঐ অর্থেই) "ঋণ" শব্দ প্রধান অর্থাৎ মুখ্য। কিন্তু এই "ঋণ" শব্দে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রযুক্ত "ঋণ" শব্দে ইহা (প্রধানশব্দত্ব) উপপন্ন হয় না। প্রধান শব্দের উপপত্তি না হওয়ায় গুণ শব্দ অর্থাৎ অপ্রধান বা গৌণ শব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে। (অর্থাৎ) "ঋণৈরিব" এই অর্থে "ঋণৈঃ" এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদ "অপ্রযুক্তোপম", যেমন "মাণবক অগ্নি" এই বাক্যে। বিশদার্থ এই যে, অন্য অর্থে দৃষ্ট এই "ঋণ" শব্দ এই অর্থে অর্থাৎ ঋণসদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন মাণবকে অগ্নিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে [অর্থাৎ "অগ্নির্মাণবকঃ" এই বাক্যে যেমন মাণবক (নবব্রহ্মচারী) অগ্নির ন্যায় তেজস্বী

বলিয়া তাহাকে অগ্নি বলা হইয়াছে, ঐ স্থলে অগ্নিসদৃশ অর্থেই "অগ্নি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেও ঋণসদৃশ অর্থেই "ঋণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "ঋণবৎ" শব্দেরও তৎসদৃশ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে—উক্ত স্থলে উপমা অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, কিন্তু সাদৃশ্যই বিবক্ষিত]। (প্রশ্ন) গুণ শব্দের দ্বারা অনুবাদ কেন হইয়াছে ? (উত্তর) যেহেতু নিন্দা ও প্রশংসার উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যেমন ঋণী ব্যক্তি ঋণদান না করায় নিন্দিত হন, তদ্রূপ (ব্রাহ্মণ) কর্ম্মলোপে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, পুত্রোৎপাদন ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ না করিলে নিন্দিত হন, এবং যেমন ঋণী ব্যক্তি ঋণ দান করায় প্রশংসিত হন, তদ্রূপ (ব্রাহ্মণ) কর্ম্মের (পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাদির) অনুষ্ঠান করিলে প্রশংসিত হন, তাহাই উপমার্থ।

"জায়মান" এই শব্দটীও গুণশব্দ অর্থাৎ অপ্রধান বা গৌণ শব্দ, যেহেতু বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ বৈপরীত্য হইলে (মুখ্যার্থবোধক প্রধান শব্দ হইলে) অধিকার নাই। বিশদার্থ এই যে, "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণঃ" ইহাও অপ্রধান শব্দ, গৃহস্থ সম্পদ্যমান অর্থাৎ যিনি গৃহস্থ হইয়াছেন, তিনি "জায়মান" [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণার্থ গৃহস্থ, গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, জায়মান ব্রাহ্মণ] যে সময়ে এই ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হন, সেই সময়ে কর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকৃত হন, যেহেতু মাতা হইতে জায়মানের অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুর অধিকার নাই। (বিশদার্থ) যে সময়ে কিন্তু মাতা হইতে শিশু জন্মে, সেই সময়ে কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকৃত হয় না, অর্থাৎ তখন তাহার কর্ম্মাধিকার হয় না। কারণ, অর্থী অর্থাৎ কামনাবিশিষ্ট এবং সমর্থ ব্যক্তিরই অধিকার হয়, (বিশদার্থ) অর্থী ব্যক্তির কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকার হয়, কারণ, কর্ম্মবিধিতে কামসংযোগের অর্থাৎ ফল-সম্বন্ধের শ্রুতি আছে, (যথা) "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি। এবং যেহেতু সমর্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তির সম্ভব হয় ; (বিশদার্থ) সমর্থ ব্যক্তির কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকার হয়, যেহেতু প্রবৃত্তির সম্ভব হয়, (অর্থাৎ) সমর্থ ব্যক্তিই বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ইতর অর্থাৎ অসমর্থ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু প্রধান শব্দার্থে অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের মুখ্য অর্থে উভয়েরই অভাব। (বিশদার্থ) মাতা হইতে জায়মান কুমারে অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুতে অর্থিতা (স্বর্গাদি কামনা) এবং শক্তি অর্থাৎ কর্ম্মসামর্থ্য, উভয়ই নাই। পরন্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী অর্থাৎ যথার্থ বুদ্ধিপূর্ব্বক বাক্যরচনাকারী পুরুষের প্রণীতত্ববশতঃ লৌকিক বাক্য হইতে বৈদিক বাক্য

ভিন্ন অর্থাৎ বিজাতীয় নহে। তাহা হইলে লৌকিক ব্যক্তি অপরীক্ষক হইয়াও অর্থাৎ শাস্ত্রপরিশীলনাদিজন্য বুদ্ধিপ্রকর্ষ প্রাপ্ত না হইয়াও জাতমাত্র শিশুকে "অধ্যয়ন কর", "যজ্ঞ কর," "ব্রহ্মচর্য্য কর," এইরূপ বলে না, যুক্তিযুক্ত ও নির্দোষবাদী ঋষি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বক্তা ঋষি উপদেশার্থ প্রযুক্ত (কৃতযত্ন) হইয়া কেন এইরূপ উপদেশ করিবেন? নর্ত্তক, অন্ধ ব্যক্তি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, গায়ক, বধির ব্যক্তি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নর্ত্তক অন্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া নৃত্য করে না, গায়কও বধিরকে উদ্দেশ্য করিয়া গান করে না। উপদিষ্টার্থের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ বোদ্ধা ব্যক্তিই উপদেশের বিষয়, (বিশদার্থ) যে ব্যক্তি উপদিষ্ট পদার্থ বুঝে, তাহার প্রতিই উপদেশ করা হয়, কিন্তু জায়মান কুমারে অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুতে ইহা (পূর্ব্বোক্ত উপদেশবিষয়ত্ব) নাই। পরন্তু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ (বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক অংশবিশেষ) গার্হস্থ্যলিঙ্গ কর্ম্ম অর্থাৎ গার্হস্থ্যের লিঙ্গ বা লক্ষণ পত্নীর সম্বন্ধ যে কর্ম্মে আছে, এমন কর্ম্ম উপদেশ করিতেছে। বিশদার্থ এই যে, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" যে কর্ম্ম উপদেশ করিতেছে, তাহা পত্নীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গার্হস্থ্য-লিঙ্গের দ্বারা উপপন্ন (যুক্ত), অতএব এই জায়মান, গৃহস্থ অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের অর্থ গৃহস্থ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই "জায়মান ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব, এই প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রধান শব্দের অনুপপত্তিবশতঃ গৌণ শব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য এই যে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্যানুসারে উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে, ঐ শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দটি প্রধান শব্দ বলা যায় না। কারণ, মুখ্যার্থবোধক শব্দকেই প্রধান শব্দ বলে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দটি মুখ্যার্থবোধক হইলে "জায়মান ব্রাহ্মণ" বলিতে সদ্যোজাত শিশু ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। কিন্তু তাহার ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মাধিকার নাই। সুতরাং তাহার প্রতি ব্রহ্মচর্য্যাদির উপদেশও করা যায় না। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দ যে, প্রধান শব্দ অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে; উহা যে গৌণ শব্দ, অর্থাৎ উহার কোন গৌণ অর্থই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। সেই গৌণ অর্থ গৃহস্থ। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা যিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি সমাপনান্তে গৃহস্থ জায়মান, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ "জায়মান" শব্দটি গৌণ অর্থের বোধক হওয়ায় গুণ শব্দ বা গৌণ শব্দ। কারণ, গৌণ অর্থের বোধক শব্দকেই "গুণ" শব্দ ও "গৌণ" শব্দ বলে। ফলকথা, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহস্থ দ্বিজাতিই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবেন এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবেন, ইহাই "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি

শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং বৈরাগ্যবশতঃ যথাকালে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অথবা তৎপূর্ব্বেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তখন আর তাঁহার অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য নহে। তখন তিনি মোক্ষার্থ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। অতএব মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় কাহারই মোক্ষ হইতে পারে না ; মোক্ষ অসম্ভব বা অলীক, এই যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত।

ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে "যত্তাবদৃণানুবন্ধাদিতি" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ স্মরণ করাইয়া, এই সূত্রের দ্বারা যে, ঐ পূর্ব্বপক্ষই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে "ঋণৈরিব ঋণৈরিতি" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণৈঃ" এই পদের ব্যাখ্যা "ঋণৈরিব", ইহা প্রকাশ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অন্য উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ"শব্দ যে প্রধান শব্দ নহে, উহাও গৌণার্থবোধক গৌণ শব্দ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই প্রথমে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ"শব্দ যেমন প্রধান শব্দ অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে, কিন্তু গৌণশব্দ, তদ্রূপ "জায়মান" শব্দও প্রধান শব্দ নহে, উহাও গৌণশব্দ, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দ যে প্রধান শব্দ অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে, ইহা বলিয়া, উহার হেতু বলিয়াছেন যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি প্রত্যাদেয় ধন দান করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই প্রতিদেয় ধন গ্রহণ করে, অর্থাৎ উত্তমর্ণ ব্যক্তি অধমর্ণ ব্যক্তিকে যে ধন দান করে, অধমর্ণ ব্যক্তি যে ধনকে যথাকালে প্রত্যর্পণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকে, সেই ধনেই "ঋণ" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় ঐরূপ ধনই "ঋণ" শব্দের মুখ্য অর্থ। সুতরাং ঐরূপ ধন বুঝাইলেই "ঋণ" শব্দটি প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে যে, ঋষিঋণ প্রভৃতি ঋণত্রয় কথিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ধন নহে। সুতরাং উহা "ঋণ" শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেই পারে না। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ"শব্দটি প্রধান শব্দ বা মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে, প্রধান শব্দের উপপত্তি না হওয়ায় গুণশব্দ বা গৌণশব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। গুণশব্দের দ্বারা কেন অনুবাদ হইয়াছে? এতদুত্তরে সূত্রকার মহর্ষি শেষে উহার হেতু বলিয়াছেন,—"নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ"। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন ঋণী অধমর্ণ উত্তমর্ণ ব্যক্তিকে গৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ না করিলে তাহার নিন্দা হয় এবং উহা প্রত্যর্পণ করিলে তাহার প্রশংসা হয়, তদ্রূপ গৃহস্থ দ্বিজাতি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম না করিলে তাহার নিন্দা হয়, এবং উহা করিলে তাহার প্রশংসা হয়, তাহাই উপমার্থ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ নিন্দা ও প্রশংসা প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে ঋণ বলিয়া শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তির নাম "অনুবাদ"। পূর্ব্বোক্তরূপ নিন্দা ও প্রশংসা প্রকাশ করাই উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিহিতানুবাদ, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে

"ঋণ"শব্দের অর্থ ঋণসদৃশ, তাই উহা গুণ শব্দ বা গৌণ শব্দ। সদৃশ অর্থে লাক্ষণিক শব্দকেই নৈয়ায়িকগণ গুণ শব্দ ও গৌণ শব্দ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "অগ্নির্মাণবকঃ" এই প্রসিদ্ধ বাক্যে "অগ্নি" শব্দকে ইহার উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মাণবক (নবব্রহ্মচারী) অগ্নি নহে, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বলিয়া তাহাতে অগ্নিসদৃশ অর্থে "অগ্নি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ বাক্যে অগ্নিশব্দ যেমন প্রধান শব্দ নহে—গৌণশব্দ, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে ঋণশব্দ প্রধান শব্দ নহে, গৌণশব্দ, উহার অর্থ ঋণসদৃশ। ভাষ্যকার ইহার পূর্ব্বে "অপ্রযুক্তোপমঞ্চেদং" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঋণশব্দই যে, পূর্ব্বোক্ত অগ্নি শব্দের ন্যায় "অপ্রযুক্তোপম", ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "ঋণবান্ জায়তে" এই বাক্যকেই পরে "অপ্রযুক্তোপম" বলিয়াছেন[1]। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে উপমা অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক "ইব" শব্দ লুপ্ত, উহার প্রয়োগ হয় নাই—"ঋণবানিব জায়তে" ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে। উক্ত বাক্যে অপ্রযুক্ত বা লুপ্ত "ইব" শব্দের অর্থ অস্বাতন্ত্র্য। ঋণবান্ ব্যক্তির যেমন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই, তদ্রূপ জায়মান অর্থাৎ গৃহস্থ দ্বিজাতির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য নাই, উহা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। গৃহস্থ দ্বিজাতি ঋণবান্ ব্যক্তির ন্যায় পরতন্ত্র হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, এই কথা ভাষ্যকারও পরে বলিয়াছেন। এখানে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের পাঠানুসারে "অপ্রযুক্তোপমঞ্চেদং" এইরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে ঋণশব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিয়া, উহার ন্যায় "জায়মান" শব্দও যে গৌণশব্দ, ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "জায়মান"শব্দ যদি গুণশব্দ না হইয়া প্রধান শব্দ হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা মাতা হইতে জায়মান অর্থাৎ সদ্যোজাত বুঝা যায়। কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার নাই। কারণ, অর্থিত্ব (কামনা) এবং সামর্থ্য না থাকিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাধিকার হইতেই পারে না। কারণ, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বৈদিক বিধিবাক্যে স্বর্গরূপ ফলসম্বন্ধের শ্রুতি আছে। সুতরাং স্বর্গকাম ব্যক্তিই ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকারী। সমর্থ ব্যক্তিই বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অসমর্থ ব্যক্তির কর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় তাহার কর্ম্মাধিকার হইতে পারে না। সদ্যোজাত শিশুর স্বর্গকামনা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসামর্থ্য, এই উভয়ই না থাকায় তাহার ঐ কর্ম্মে অধিকার নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সদ্যোজাত শিশুকে ব্রহ্মচর্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতে উপদেশ করা হয় নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কেহ যদি বলেন যে, বেদে ঐরূপ অনেক উপদেশ আছে। লৌকিক যুক্তির দ্বারা বৈদিক উপদেশের বিচার হইতে পারে না। বেদে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, লৌকিক প্রমাণবাক্য হইতে বৈদিক বাক্য বিজাতীয় নহে। কারণ, ঐ উভয় বাক্যই প্রেক্ষা-

---

১। অপ্রযুক্তোপমঞ্চেদং বাক্যং "ঋণবান্ জায়তে" ইতি। উপমাত্র লুপ্তা দ্রষ্টব্যা, ঋণবানিব জায়ত ইতি। ক উপমানার্থঃ? অস্বাতন্ত্র্যং, ঋণবান্ যথা অস্বতন্ত্রঃ, এবমযং জায়মানঃ কর্ম্মসু অস্বতন্ত্রো বর্ত্তত ইতি।—ন্যায়-বার্ত্তিক।

পূর্ব্বকারী পুরুষের প্রণীত। প্রকৃত বিষয়ের যথার্থবোধই এখানে "প্রেক্ষা"। লৌকিক প্রমাণ-বাক্যের বক্তা পুরুষ যেমন ঐ প্রেক্ষাপূর্ব্বক অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি যথার্থরূপে বুঝিয়া বাক্য রচনা করেন, তদ্রূপ বেদবক্তা পুরুষও প্রেক্ষাপূর্ব্বক বাক্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং লৌকিক প্রমাণবাক্যে যেমন কোন অসম্ভব উপদেশ থাকে না, তদ্রূপ বৈদিক বাক্যেও ঐরূপ কোন অসম্ভব উপদেশ থাকিতে পারে না। পরন্তু লৌকিক ব্যক্তি শাস্ত্রপরিশীলনাদি করিয়া বুদ্ধিপ্রকর্ষ প্রাপ্ত না হইলেও অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও সদ্যোজাত শিশুর অনধিকার বুঝিয়া তাহাকে "তুমি অধ্যয়ন কর, যজ্ঞ কর, ব্রহ্মচর্য্য কর," এইরূপ উপদেশ করে না,—যুক্তবাদী ও নির্দোষবাদী ঋষি কেন ঐরূপ উপদেশ করিবেন? অর্থাৎ লৌকিক ব্যক্তিও যাহা করে না, ঋষি তাহা কিছুতেই করিতে পারেন না। সুতরাং সদ্যোজাত শিশুকে তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ করেন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, নর্ত্তক অন্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না, গায়ক বধিরকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ অন্ধের নৃত্যদর্শন-সামর্থ্য নাই জানিয়া, নর্ত্তক তাহাকে নৃত্য দেখাইবার জন্য নৃত্য করে না এবং বধিরের গান শ্রবণের সামর্থ্য নাই জানিয়া, তাহাকে গান শুনাইবার জন্য গায়ক গান করে না। এইরূপ সদ্যোজাত শিশুর ব্রহ্মচর্য্যাদি সামর্থ্য না থাকায় তাহাকে উহা করিতে উপদেশ করা কোন বুদ্ধিমানেরই কার্য্য হইতে পারে না। পরন্তু উপদিষ্ট পদার্থের বোদ্ধা ব্যক্তিই উপদেশের বিষয়, অর্থাৎ প্রকৃত উপদেষ্টা তাদৃশ ব্যক্তিকেই উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সদ্যোজাত শিশু উপদিষ্টার্থ বুঝিতেই পারে না, তাহাতে উপদেশবিষয়ত্বই নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বক্তা ঋষি সদ্যোজাত শিশুকে ঐরূপ উপদেশ করেন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তাঁহার মতে কোন ঋষিই যে উক্ত শ্রুতিবাক্যের বক্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের অন্য কথা ও তাহার আলোচনা পরে পাওয়া যাইবে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দ যে, প্রধান শব্দ নহে, উহা গৌণার্থক গৌণশব্দ, উহার অর্থ গৃহস্থ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে আরও বলিয়াছেন যে, বেদের "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" নামক অংশবিশেষ যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ-কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা গার্হস্থ্য-লিঙ্গযুক্ত। গার্হস্থ্যের লিঙ্গ বা লক্ষণ পত্নী[১]। কারণ, পত্নী ব্যতীত গার্হস্থ্য নিষ্পন্ন হয় না। গৃহস্থ শব্দের অন্তর্গত গৃহ শব্দের অর্থ গৃহিণী। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মে গৃহিণীর অনেক কর্ত্তব্য বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। গৃহিণী বা পত্নী ব্যতীত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম হইতে পারে না। পতির যজ্ঞকর্ম্মের সহিত তাঁহার শাস্ত্রবিহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার নাম পত্নী[২]। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মে আরও অনেক কর্ত্তব্যের উপদেশ আছে, যাহা গৃহস্থ দ্বিজাতির

১। গার্হস্থ্যস্য লিঙ্গং পত্নী যস্মিন্ কর্ম্মণি তত্তথোক্তং। "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি। পত্ন্য উদ্গায়ন্তি। "ক্ষৌমে বসানা বাধীয়তা"মিত্যেবমাদি। তাৎপর্য্যটীকা।

২। "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে"।—পাণিনিসূত্র ।৪।১।৩৩। পতিশব্দস্য নকারাদেশঃ স্যাৎ, যজ্ঞেন সম্বন্ধে। বশিষ্ঠস্য পত্নী, তৎকর্ত্তৃকযজ্ঞস্য ফলভোক্ত্রীত্যর্থঃ। দম্পত্যোঃ সহাধিকারাৎ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পক্ষেই বিহিত, সুতরাং তাহাও গার্হস্থ্যের লিঙ্গ। সুতরাং বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক অংশে গার্হস্থ্যের লিঙ্গ পত্নীসম্বন্ধাদিযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মের উপদেশ থাকায় "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা গৃহস্থেরই যজ্ঞকর্ম্মের অনুবাদ হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ গৃহস্থ, ইহাই বুঝা যায়। এখানে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের অর্থ গৃহস্থ, ইহা সমর্থন করিলেও যিনি ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলবাস সমাপ্ত করিয়া ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই গৃহস্থের সম্বন্ধে তখন পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়ের উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে না, গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যায় না, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের অর্থ উপনীত। কারণ, উপনীত বা উপনয়নসংস্কার-বিশিষ্ট হইলেই ব্রহ্মচর্য্যাদিতে অধিকার হয়। পরে গৃহস্থ হইলে তাহার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার হয়। বস্তুতঃ উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্ম নিষ্পন্ন হওয়ায় ঐ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দটি উপনীত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে এবং উপনীত ব্রাহ্মণ, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে গৃহস্থ হইয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ কালভেদেই উপনীত দ্বিজাতির উক্ত ঋণত্রয়বত্তা বিবক্ষিত বুঝা যায়। কিন্তু কালভেদে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেও উক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যাইতে পারে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া গৃহস্থ হওয়া যায় না। যিনি গৃহস্থ হইবেন, পূর্ব্বে তিনি উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া গৃহস্থ হন, তিনি প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে দারপরিগ্রহ করিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাও উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যখন পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন তাঁহাকেও কালভেদে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যাইতে পারে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতেও কালভেদেই উপনীত ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বত্তা বিবক্ষিত, ইহা বলিতে হইবে। পরন্তু উপনীত ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া দার-পরিগ্রহ না করিলে তাহার পক্ষে দেবঋণ ও পিতৃঋণ নাই। সুতরাং উপনীত ব্রাহ্মণমাত্রকেই ঋণত্রয়বান্ বলা যায় না। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞবিশেষ এবং পুত্রোৎপাদন করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়াই "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণার্থ বলিয়াছেন গৃহস্থ, ইহাই মনে হয়। যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতাবশতঃ উহা অপবর্গের প্রতিবন্ধক হওয়ায় অপবর্গ অসম্ভব, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন, সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যে, গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, অন্যের উহাতে অধিকার নাই, ইহাও ভাষ্যকার শেষে

সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা যে, গৃহস্থ অর্থ ই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইয়াছেন। ফলকথা, উৎকট বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ দ্বিজাতি যে, নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং পুত্রোৎপাদন করিতে বাধ্য এবং দার-পরিগ্রহের পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মচর্য্য করিতেও বাধ্য, এই সিদ্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের বহু পরবর্ত্তী "ন্যায়-সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কিন্তু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাধিকারী উপনীত এবং অগ্নিহোত্রাধিকারী গৃহস্থ, এই উভয়ই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ "জায়মান" শব্দের একই স্থলে লক্ষণার দ্বারা উপনীত এবং গৃহস্থ, এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিলেও উক্ত শ্রুতিবাক্যে জায়মান ব্রাহ্মণকে কিরূপে ঋণত্রয়বান্ বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের মতে যিনি উপনীত, তিনিও ঋণত্রয়বান্ নহেন—যিনি গৃহস্থ, তিনিও ঋণত্রয়বান্ নহেন। কালভেদে ঋণত্রয়বান্, ইহা বলিলে আর ঐ "জায়মান" শব্দের উপনীত ও গৃহস্থ, এই দ্বিবিধ অর্থে লক্ষণা স্বীকার অনাবশ্যক। ঐরূপ লক্ষণা সমীচীনও মনে হয় না। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সকল কথার বিচার করিবেন। অন্যান্য কথা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। **অর্থিত্বস্য চাবিপরিণামে জরামর্য্যবাদোপপত্তিঃ**[1]। যাবচ্চাস্য ফলেনার্থিত্বং ন বিপরিণমতে ন নিবর্ত্ততে, তাবদনেন কর্ম্মানুষ্ঠেয়-মিত্যুপপদ্যতে জরামর্য্যবাদস্তং প্রতীতি। "জরয়া হ বে"ত্যায়ুষস্তুরী-য়স্য চতুর্থস্য প্রব্রজ্যাযুক্তস্য বচনং। "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বি-মুচ্যতে" ইতি, আয়ুষস্তুরীয়ং চতুর্থং প্রব্রজ্যাযুক্তং জরেত্যুচ্যতে, তত্র হি প্রব্রজ্যা বিধীয়তে। অত্যন্তসংযোগে "জরয়া হ বে"ত্যনর্থকং। অশক্তো বিমুচ্যতে ইত্যেতদপি নোপপদ্যতে, স্বয়মশক্তস্য বাহ্যাং শক্তিমাহ। "অন্তেবাসী বা জুহুয়াদ্ব্রহ্মণা স পরিক্রীতঃ," "ক্ষীরহোতা বা জুহুয়াদ্ধনেন স পরিক্রীত" ইতি। অথাপি বিহিতং বাঽনূদ্যেত কামাদ্বাঽর্থঃ পরিকল্প্যেত? বিহিতানুবচনং ন্যায্যমিতি। ঋণবানিবাস্বতন্ত্রো গৃহস্থঃ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তত ইত্যুপপন্নং বাক্যস্য সামর্থ্যং। ফলস্য সাধনানি প্রযত্ন-বিষয়ো ন ফলং, তানি সম্পন্নানি ফলায় কল্পন্তে। বিহিতঞ্চ জায়মানং, বিধীয়তে চ জায়মানং, তেন যঃ সম্বধ্যতে সোঽয়ং জায়মান ইতি।

অনুবাদ। এবং অর্থিত্বের (কামনার) বিপরিণাম (নিবৃত্তি) না হইলে "জরা-

১। তদনেন গার্হস্থ্যাৎ পূর্ব্বাবস্থা তাবদৃণানুশক্তা ন ভবতীত্যুক্তং, সম্প্রত্যুত্তরাবস্থাপি ন ঋণানুবন্ধেত্যাহ—যদা চার্থিনোঽধিকারস্তদাঽর্থিত্বস্যাবিপরিণামে জরামর্য্যবাদোপপত্তিঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

মর্ষ্যবাদে"র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ দ্বিজাতির ফলার্থিত্ব (স্বর্গাদি ফলকামনা) বিপরিণত না হয়, (অর্থাৎ) নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই গৃহস্থ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) অনুষ্ঠেয়, এ জন্য তাঁহার সম্বন্ধে জরামর্য্যবাদ উপপন্ন হয়। "জরয়া হ বা" এই বাক্যের দ্বারা আয়ুর প্রব্রজ্যা-যুক্ত তুরীয় (অর্থাৎ) চতুর্থ ভাগের কথন হইয়াছে। বিশদার্থ এই যে, "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে" এই শ্রুতিবাক্যে আয়ুর প্রব্রজ্যাযুক্ত তুরীয় (অর্থাৎ) চতুর্থ খণ্ড "জরা" এই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, যেহেতু সেই সময়ে প্রব্রজ্যা বিহিত হইয়াছে। অত্যন্ত-সংযোগ হইলে অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই গৃহস্থ দ্বিজাতির অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য হইলে "জরয়া হ বা" এই বাক্য ব্যর্থ হয়। অশক্ত অর্থাৎ অত্যন্ত জরাবশতঃ অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে অসমর্থ গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিযুক্ত হয়, ইহাও উপপন্ন হয় না। (কারণ) স্বয়ং অশক্ত গৃহস্থের পক্ষে (শ্রুতি) বাহ্যশক্তি বলিয়াছেন (যথা)—"অন্তেবাসী হোম করিবে সেই অন্তেবাসী বেদদ্বারা পরিক্রীত," "অথবা ক্ষীরহোতা (অধ্বর্য্যু) হোম করিবে, সেই ক্ষীরহোতা ধনের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণার দ্বারা পরিক্রীত"।

পরন্তু (প্রশ্ন) বিহিত অনূদিত হইয়াছে? অথবা স্বেচ্ছামাত্রপ্রযুক্ত অর্থ অর্থাৎ কোন অপ্রাপ্ত পদার্থ কল্পিত হইয়াছে? অর্থাৎ "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কি শ্রুত্যন্তরের দ্বারা বিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুবাদ? অথবা উহা জায়মান বালকেরই ব্রহ্মচর্য্যাদির বিধি? (উত্তর) বিহিতানুবাদই ন্যায্য অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। ঋণবান্ ব্যক্তির ন্যায় অস্বতন্ত্র গৃহস্থ কর্ম্মসমূহে (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হন, এ জন্য বাক্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্য (যোগ্যতা) উপপন্ন হয়। ফলের সাধনসমূহই প্রযত্নের বিষয়, ফল প্রযত্নের বিষয় নহে; সেই সাধনসমূহ সম্পন্ন হইয়া ফলের নিমিত্ত সমর্থ হয় অর্থাৎ ফলজনক হয় [অর্থাৎ বালকের আত্মা স্বর্গাদি-ফললাভে যোগ্য হইলেও ফলের সাধন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যাহা প্রযত্নের বিষয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বালকের যোগ্যতা না থাকায় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বালকের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি বিধি বুঝা যায় না, সুতরাং উহা বিহিতানুবাদ] জায়মান বিহিত হইয়াছে এবং জায়মানই বিহিত হইতেছে[1] অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে অন্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা গৃহস্থেরই জায়মান যজ্ঞাদি কর্ম্ম

১। বিহিতঞ্চ জায়মানমিতি ঋণবাক্যাৎ প্রাক্, বিধীয়তে চ ঋণবাক্যাদূর্দ্ধমিত্যর্থঃ। —তাৎপর্য্যটীকা।

বিহিত হইয়াছে এবং উহার পরেও অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে গৃহস্থেরই জায়মান যজ্ঞাদি বিহিত হইতেছে ; সেই জায়মানের সহিত যিনি সম্বন্ধ, সেই এই "জায়মান"। (অর্থাৎ জায়মান বিহিত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ গৃহস্থ, ইহা বুঝা যায়)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাতি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ গৃহস্থ, ইহা বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া, গৃহস্থ দ্বিজাতিরই যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকারবশতঃ গৃহস্থ হইবার পূর্ব্বে ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা না থাকায় তখন অপবর্গার্থ অনুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং তখন অধিকারিবিশেষের পক্ষে অপবর্গ অসম্ভব নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন গৃহস্থ হইয়াও যে অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগ করিয়া অপবর্গার্থ অনুষ্ঠান করিতে পারে, ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত স্বর্গাদি কামনার নিবৃত্তি না হয়, সেই কাল পর্য্যন্তই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। তাদৃশ গৃহস্থের সম্বন্ধেই "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বর্গই যাঁহার কাম্য, যাঁহার স্বর্গকামনার নিবৃত্তি হয় নাই, তাদৃশ গৃহস্থই মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গার্থ অগ্নিহোত্রাদি করিবেন। কিন্তু যাঁহার স্বর্গকামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি মুমুক্ষু, তিনি অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি তখন স্বর্গফলক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অধিকারীই নহেন। কারণ, তিনি তখন "স্বর্গকাম" নহেন। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" [মৈত্রী উপনিষৎ, ৬।৩৬] ইত্যাদি বৈদিক বিধিবাক্যকে গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মবিধিতে যে ফলসম্বন্ধ শ্রুতি আছে, ইহা প্রদর্শন করিয়া স্বর্গরূপ ফলার্থী গৃহস্থ দ্বিজাতিই যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অধিকারী, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। বার্ত্তিক-কারও এখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সমস্ত কর্ম্মবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধশ্রুতি আছে। কিন্তু কাম্য অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞের বিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধশ্রুতি থাকিলেও যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিধিবাক্যে ফল-সম্বন্ধশ্রুতি নাই। মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রারম্ভে "যাবজ্জীবিকোঽভ্যাসঃ কর্ম্মধর্ম্মঃ প্রকরণাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কাম্য অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকার শবর-স্বামী বেদের অন্তর্গত বহ্বৃচব্রাহ্মণের "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এবং "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই বিধিবাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা যে নিত্য অগ্নিহোত্র এবং নিত্য দর্শযাগ ও পূর্ণমাস যাগেরই বিধান হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করিয়া, পরে "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পূর্ণমাস-যাগের যাবজ্জীবনকর্ত্তব্যতা বা নিত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। "শাস্ত্রদীপিকা"কার পার্থসারথিমিশ্রও সেখানে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যবায় পরিহারের জন্য যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র ও দর্শ এবং পূর্ণমাস যাগ কর্ত্তব্য। সুতরাং গৃহস্থ দ্বিজাতির স্বর্গকামনা নিবৃত্তি হইলে কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য না হইলেও প্রত্যবায় পরিহারের জন্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যাবজ্জীবনই কর্ত্তব্য, উহা তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না। মনে হয়, ভাষ্যকার

এই জন্যই শেষে বলিয়াছেন যে, "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শেষে "জরয়া হ বা" এই বাক্যের দ্বারা আয়ুর চতুর্থ ভাগই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে" এই বাক্যে যে জরাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ আয়ুর প্রব্রজ্যাযুক্ত চতুর্থ ভাগ। কারণ, আয়ুর চতুর্থ ভাগেই প্রব্রজ্যা বিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আয়ুর তৃতীয় ভাগে বনবাস বা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া, চতুর্থ ভাগেই যে, প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, ইহা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন[১]। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে" এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, গৃহস্থ দ্বিজাতি "জরা" অর্থাৎ আয়ুর চতুর্থ ভাগ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হন। অর্থাৎ আয়ুর চতুর্থ ভাগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তখন আর তাঁহার নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও করিতে হয় না। কারণ, তখন তিনি ঐ সমস্ত বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানের জন্যই শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরা"শব্দের যে উক্ত লাক্ষণিক অর্থই বিবক্ষিত, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সহিত সমগ্র জীবনের অত্যন্ত-সংযোগ বা ব্যাপ্তিই বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাই যদি উক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে "মৃত্যুনা হ বা" এই বাক্যের দ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হওয়ায় "জরয়া হ বা" এই বাক্য ব্যর্থ হয়। সুতরাং "জরয়া হ বা" এই বাক্যে "জরা" শব্দের দ্বারা যে, কোন কালবিশেষই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। আয়ুর চতুর্থ ভাগই সেই কালবিশেষ। তৎকালে প্রব্রজ্যার বিধান থাকায় যিনি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবেন এবং যিনি অধিকারাভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহস্থই থাকিবেন অথবা বানপ্রস্থ থাকিবেন, তিনি মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে মৃত্যুনা হ বা" এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, জরাগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত অশক্ত হইলে তখন গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হন, অর্থাৎ তখন তিনি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন। আর অত্যন্ত অশক্ত না হইলে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত উহা কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং "জরয়া হ বা" এই বাক্য ব্যর্থ নহে, "জরা" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ-গ্রহণও অনাবশ্যক ও অযুক্ত। ভাষ্যকার শেষে ইহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অশক্ত গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হন, এইরূপ তাৎপর্য্যও উপপন্ন হয় না। কারণ, স্বয়ং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অশক্ত গৃহস্থের পক্ষে শ্রুতিতে বাহ্য শক্তি কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্য হোম করিবেন, তিনি বেদদ্বারা পরিক্রীত।" অর্থাৎ গুরু তাঁহাকে বেদ প্রদান করায় তদ্দ্বারা তিনি ক্রীত অর্থাৎ গুরুর অধীন হইয়াছেন, তিনি গুরুর আদেশানুসারে প্রতিনিধিরূপে গুরুর কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি করিবেন ; তাহাতেই গুরুর কর্ত্তব্য সিদ্ধ হইবে। যাঁহার শিষ্য উপস্থিত নাই, অথবা যে কোন কারণে তাঁহার

১। বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥—মনুসংহিতা।৬।৩৩

দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন ঐরূপ ব্রাহ্মণের এবং অশক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে অধ্বর্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিত দক্ষিণা লাভের জন্য অগ্নিহোত্রাদি করিবেন। তিনি ধনদ্বারা ক্রীত অর্থাৎ দক্ষিণারূপ ধনের দ্বারা যজমানের অধীন হওয়ায় অশক্ত যজমানের নিজকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি করিবেন। এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রে ঋত্বিক্ ও পুত্রপ্রভৃতি অনেক প্রতিনিধির উল্লেখ হইয়াছে[১]। সুতরাং অত্যন্ত অশক্ত হইলে প্রতিনিধির দ্বারাও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের বিধান থাকায়, অত্যন্ত অশক্ত গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হইবেন অর্থাৎ তখন উহা করিতেই হইবে না, ইহা উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। সুতরাং "জরা" শব্দের দ্বারা অত্যন্ত অশক্ততাই উপলক্ষিত হইয়াছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। অতএব উক্ত "জরা" শব্দের দ্বারা আয়ুর চতুর্থ ভাগই লক্ষিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে "জরয়া হ বা" এই বাক্যের সার্থক্যও হয়। "ক্ষীরহোতা বা জুহুয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের দ্বারা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার কর্কাচার্য্য কোন সূত্রে "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,[২] "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের অবয়বার্থ বা যোগার্থ পরিত্যাগ করিলে উহার দ্বারা অধ্বর্য্যু বুঝা যায়। তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেও "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের দ্বারা আমরা অধ্বর্য্যু বুঝিতে পারি। যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতের নাম অধ্বর্য্যু।

কেহ যদি বলেন যে, শ্রুতিতে গৃহস্থের পক্ষে যদিও যজ্ঞাদির অন্যান্য বিধিবাক্য আছে, তাহা হইলেও "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বালকেরও পৃথক্ যজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে, ইহাই বুঝিব; "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ স্বীকার করিয়া, উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বিহিতানুবাদ বলিয়া বুঝিব কেন? ভাষ্যকার এই আশঙ্কার খণ্ডন করিতে পরে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কি বিহিতেরই অনুবাদ হইয়াছে, অথবা উহার দ্বারা স্বেচ্ছামাত্রপ্রযুক্ত কোন অপ্রাপ্ত পদার্থেরই কল্পনা করিবে? অর্থাৎ বালকের পক্ষে কোন শ্রুতির দ্বারাই যে যজ্ঞাদি পদার্থ প্রাপ্ত বা বিহিত হয় নাই, উক্ত শ্রুতিবাক্য সেই যজ্ঞাদির বিধায়ক, ইহাই বুঝিবে? ভাষ্যকার উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, বিহিতানুবাদই ন্যায্য অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ অন্যান্য শ্রুতির দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যে যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহারই অর্থানুবাদ, উহা "জায়মান" অর্থাৎ বালক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া যজ্ঞাদির বিধায়ক বা বিধিবাক্য নহে। মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে বেদের ব্রাহ্মণভাগরূপ বাক্যকে বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্য, এই ত্রিবিধ বলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে অনুবাদ-বাক্যকে বিধ্যনুবাদ ও বিহিতানুবাদ, এই দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শব্দানু-

---

১। ঋত্বিক্ পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেবহি ॥—দক্ষসংহিতা, ২ অঃ, ২১ শ্লোক।

২। "বাগ্যতো দোহপ্রভৃত্যাহোমাৎ ক্ষীরহোতা চেৎ"। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র [চতুর্থ অঃ, ৩৪৫ সূত্র]।
"ক্ষীরহোতা" প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থবৃত্তি রধ্বর্য্যুরুচ্যতে।—কর্কভাষ্য।

বাদের নাম "বিধ্যনুবাদ" এবং অর্থানুবাদের নাম "বিহিতানুবাদ" (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য যে সকল শ্রুতির দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐ সকল শ্রুতির অর্থেরই অনুবাদ হওয়ায় উহা "বিহিতানুবাদ"। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিধিবোধক (বিধিলিঙ্ প্রভৃতি) কোন বিভক্তি নাই। সুতরাং উহা যে প্রমাণান্তরসিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ—বিধিবাক্য নহে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অবশ্য যদি উক্ত শ্রুতিবাক্যে কথিত ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধায়ক আর কোন শ্রুতিবাক্য বা প্রমাণান্তর না থাকিত, তাহা হইলে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকেই বিধিবাক্য বলিয়া কল্পনা বা স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে কথিত ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধায়ক বহু শ্রুতিবাক্য আছে, তাহাতে বিধিবোধক বিভক্তিও প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে অন্যান্য অনেক বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিতই হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে "বিহিতানুবাদ" বলিয়া, "জায়মান" শব্দকে গুণশব্দ অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই সমুচিত। "জায়মান" শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বালক ব্রাহ্মণেরও স্বর্গাদিসাধক যজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করা সমুচিত নহে। কারণ, ঐরূপ কল্পনা কামপ্রযুক্ত অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রপ্রযুক্ত, উহাতে কোন প্রমাণ নাই। ফলকথা, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গৃহস্থ। ঋণী ব্যক্তির ন্যায় অস্বতন্ত্র গৃহস্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে বাধ্য, উহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দের ন্যায় "জায়মান" শব্দকে লাক্ষণিক না বলিলে উহা "বহ্নিনা সিঞ্চতি" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অযোগ্য বাক্য হয়। কারণ, সদ্যোজাত বা বালক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদিকর্তৃত্ব অসম্ভব হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে যজ্ঞাদির বিধান সম্ভবই হইতে পারে না। সুতরাং "জায়মান" শব্দের পূর্ব্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলেই উক্ত বাক্যের যোগ্যতা উপপন্ন হইতে পারে।

বিরুদ্ধবাদী যদি বলেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে ঋণ শব্দ যে গৌণ শব্দ, ইহা অবশ্য বুঝা যায় এবং ঐ ঋণ শব্দের অর্থ যে, ঋণসদৃশ, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। ঐরূপ গৌণ শব্দের প্রয়োগ শ্রুতিতেও অন্যত্র বহু স্থলে দেখাও যায়। কিন্তু জায়মান শব্দের অর্থ যে গৃহস্থ, ইহা বুঝা যায় না। জায়মান শব্দের ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ আর কোথায় দেখাও যায় না। সুতরাং ঐ জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বালক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধায়ক বাক্য বলাই উচিত। উহাকে বিহিতানুবাদ বলিলে উক্ত শ্রুতিবাক্যে জায়মান শব্দে অপ্রসিদ্ধ লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তদপেক্ষায় উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বিধি বা বিধায়ক বাক্য বলাই উচিত। অবশ্য বালক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের যোগ্যতা নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহার ফললাভে যোগ্যতা অবশ্যই আছে। কারণ, তাহার আত্মাও স্বর্গাদি ফলের

সমবায়ি কারণ। ফলই মুখ্য প্রয়োজন, ফলের সাধন ঐরূপ প্রয়োজন নহে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিতে শেষে আবারও বলিয়াছেন যে, ফলের সাধনসমূহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযত্নের বিষয়, ফল প্রযত্নের বিষয় নহে। ফলের সাধনসমূহ সম্পন্ন হইয়া ফলের জনক হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার, ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বিধিবাক্য পুরুষকে স্বকীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বরূপে নিযুক্ত করে। প্রযত্নই পুরুষের স্বকীয় ব্যাপার, সুতরাং উহা উহার সাক্ষাৎ বিষয়কে অপেক্ষা করে। সাক্ষাৎ বিষয় লাভ ব্যতীত প্রযত্ন হইতেই পারে না। কিন্তু স্বর্গাদি ফল ঐ প্রযত্নের উদ্দেশ্যরূপ বিষয় হইলেও উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযত্নের বিষয় নহে। ফলের সাধন বা উপায় কর্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযত্নের বিষয়। কারণ, বিধিবাক্যার্থবোদ্ধা পুরুষ স্বর্গাদি ফলের জন্য কর্ম্মই করে, স্বর্গাদি করে না ; স্বর্গাদির সাধন কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে উহাই স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। কিন্তু ফলের সাধন কর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ সদ্যোজাত বালক ঐ কর্ম্ম করিতে অসমর্থ ; সুতরাং তাহার ঐ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বই সম্ভব না হওয়ায় ঐ কর্ম্ম তাহার প্রযত্নের বিষয় হইতেই পারে না। সুতরাং তাহার ঐ কর্ম্মে অধিকারই না থাকায় "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বিহিতানুবাদ বলিয়া, জায়মান শব্দ যে লাক্ষণিক,—উহার অর্থ গৃহস্থ, ইহাই বলিতে হইবে। তবে জায়মান শব্দ গৃহস্থ অর্থে লাক্ষণিক হইলে জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ কি এবং তাহার সহিত গৃহস্থের যে সম্বন্ধ আছে, ইহা বলা আবশ্যক। নচেৎ জায়মান শব্দের দ্বারা যে লক্ষণার সাহায্যে গৃহস্থ অর্থ বুঝা যায়, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, জায়মান বিহিত হইয়াছে এবং জায়মান বিহিত হইতেছে, সেই জায়মানের সহিত যিনি সম্বদ্ধ, তিনি জায়মান। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই জায়মান শব্দের মুখ্য অর্থ ; সুতরাং যাহা গৃহস্থের প্রযত্নের দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মও জায়মান শব্দের দ্বারা বুঝা যায় অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মও জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ। তাহা হইলে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং উহার পরে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইতেছে, ঐ সমস্ত কর্ম্মও জায়মান অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্ম্মও জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে জায়মান ঐ সমস্ত কর্ম্মের সহিত যখন গৃহস্থেরই সম্বন্ধ—কারণ, গৃহস্থের কর্ত্তব্য-রূপেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিহিত, তখন জায়মান শব্দের দ্বারা লক্ষণার সাহায্যে গৃহস্থ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কারণ, গৃহস্থের সম্বন্ধেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিহিত হওয়ায় গৃহস্থে উহার কর্ত্তৃত্ব বা অধিকারিত্ব-সম্বন্ধ আছে। সুতরাং জায়মান কর্ম্মের অধিকারী গৃহস্থই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। উহা ঋণশব্দের ন্যায় সদৃশার্থে লাক্ষণিক না হইলেও লাক্ষণিক শব্দ বলিয়া উহাকেও গুণশব্দ অর্থাৎ অপ্রধান শব্দ বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। **প্রত্যক্ষবিধানাভাবাদিতি চেৎ ? ন, প্রতিষেধস্যাপি প্রত্যক্ষবিধানাভাবাদিতি। প্রত্যক্ষতো বিধীয়তে গার্হস্থ্যং**

ব্রাহ্মণেন, যদি চাশ্রমান্তরমভবিষ্যৎ, তদপি ব্যধাস্যত প্রত্যক্ষতঃ, প্রত্যক্ষবিধানাভাবান্নাস্ত্যাশ্রমান্তরমিতি। **ন, প্রতিষেধস্যাপি প্রত্যক্ষতো বিধানাভাবাৎ,** ন, প্রতিষেধোঽপি বৈ ব্রাহ্মণেন প্রত্যক্ষতো বিধীয়তে, ন সন্ত্যাশ্রমান্তরাণি, এক এব গৃহস্থাশ্রম ইতি, প্রতিষেধস্য প্রত্যক্ষতোঽশ্রবণাদযুক্তমেতদিতি। **অধিকারাচ্চ বিধানং বিদ্যান্তরবৎ।** যথা শাস্ত্রান্তরাণি স্বে স্বেঽধিকারে প্রত্যক্ষতো বিধায়কানি, নার্থান্তরাভাবাৎ, এবমিদং ব্রাহ্মণং গৃহস্থশাস্ত্রং স্বেঽধিকারে প্রত্যক্ষতো বিধায়কং নাশ্রমান্তরাণামভাবাদিতি।

ঋগ্ ব্রাহ্মণঞ্চাপবর্গাভিধায্যভিধীয়তে, ঋচশ্চ ব্রাহ্মণানি চাপবর্গাভিবাদীনি ভবন্তি। ঋচশ্চ তাবৎ—

"কর্ম্মভির্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ" (১)॥

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি" (২)॥

[বাজসনেয়িসংহিতা (৩১।১৮)। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩।১২।৭)। কৈবল্যোপনিষৎ—১ম খণ্ড, ২।৩। নারায়ণোপনিষৎ]

১। অনেক গ্রন্থকার এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া, কর্ম্ম দ্বারা যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাৎপর্য্যটীকায় লিখিয়াছেন—"মৃত্যুমিতি প্রেত্যভাবমিত্যর্থঃ। "পরং কর্ম্মভ্য" ইতি কর্ম্মত্যাগমপবর্গসাধনং সূচয়তি। "অমৃতত্ব"-মিতি চাপবর্গো দর্শিতঃ।

২। সূচিতং কর্ম্মত্যাগমপবর্গসাধনং শ্রুত্যন্তরেণ বিশদয়তি "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়ে"তি। "পরেণ নাক"মিতি। "নাক"মিতি অবিদ্যামুপলক্ষয়তি, অবিদ্যাতঃ পরমিত্যর্থঃ। "নিহিতং গুহায়া"মিতি লৌকিকপ্রমাণাগোচরত্বং দর্শয়তি।—তাৎপর্য্যটীকা।

"ত্যাগেন নিখিল-শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগেন পরমহংসাশ্রমরূপেণ। "একে" মহাত্মানঃ সম্প্রদায়বিদঃ। অমৃতত্ত্বমবিদ্যাদিমরণভাবরাহিত্যং। "আনশু"রানশিরে প্রাপ্তাঃ।—কৈবল্যোপনিষদের শঙ্করানন্দকৃত "দীপিকা"। "একে" মুখ্যাঃ। নারায়ণকৃত "দীপিকা"।

"পরেণ" পরস্তাৎ। ("নাকং পরেণ") স্বর্গস্যোপরি ইত্যর্থঃ। অথবা "পরেণ" পরং, "নাকং" আনন্দাত্মানং। "নিহিতং" ক্ষিপ্তং স্বয়মেব স্থিতং। "গুহায়াং" বুদ্ধৌ। বিভ্রাজতে বিশেষেণ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন দীপ্যতে। "যৎ" প্রসিদ্ধং বিশ্বব্যাপি স্বরূপং। "যতয়ঃ" কৃতসন্ন্যাসাঃ প্রযত্নবন্তো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং সম্প্রতিপন্নাঃ। "বিশন্তি" প্রবিশন্তি। ইদং বয়ং স্ম ইতি সাক্ষাৎকারেণ তদেব ভবন্তীত্যর্থঃ।—শঙ্করানন্দকৃত "দীপিকা"। "গুহায়াং" অজ্ঞানগহ্বরে।—নারায়ণকৃত দীপিকা।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (১) ॥
(শ্বেতাশ্বতর, তৃতীয় অঃ, ৮ম)।

অথ ব্রাহ্মণানি—

"ত্রয়ো ধর্ম্ম-স্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব, দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী, তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এবৈতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি (২)।"
(ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, দ্বিতীয় অঃ, ২৩শ খণ্ড)

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী"তি (৩)।
(বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, চতুর্থ ব্রাঃ—২২শ)

"অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে (৪)।"—[বৃহদারণ্যক।৪।৪।৫] ইতি কর্ম্মভিঃ সংসরণমুক্ত্বা প্রকৃতমন্যদুপদিশন্তি—

১। "বেদ" জানে। তমেতং পরমাত্মানং অদ্বৈতং প্রত্যগাত্মানং সাক্ষিণং "পুরুষং",—"মহান্তং" সর্ব্বাত্মত্বাৎ। "আদিত্যবর্ণং" প্রকাশরূপং। "তমসো"ঽজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ। তমেব "বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" মৃত্যুমত্যেতি কস্মাদস্মান্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে"ঽয়নায়" পরমপদপ্রাপ্তয়ে।—শঙ্করভাষ্য। "তমসঃ পরস্তা"দিতি অবিদ্যা তমঃ, তস্য পরস্তাৎ। "আদিত্যবর্ণ"মিতি নিত্যপ্রকাশমিত্যর্থঃ। তদনেন ঈশ্বরপ্রণিধানস্যাপবর্গোপায়ত্বমুক্তং —তাৎপর্য্যটীকা।

২। ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকা ধর্ম্মস্য স্কন্ধা ধর্ম্মস্কন্ধা ধর্ম্মপ্রবিভাগা ইত্যর্থঃ। কে তে ইত্যাহ যজ্ঞোঽগ্নিহোত্রাদিঃ। অধ্যয়নং সনিয়মস্য ঋগাদেরভ্যাসঃ। দানং বহির্ব্বেদি যথাশক্তি দ্রব্য-সংবিভাগো ভিক্ষমাণেভ্যঃ। ইত্যেষ প্রথমো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ, "তপ" ইতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, তদ্বাংস্তাপসঃ পরিব্রাড়্‌বা, ন ব্রহ্মসংস্থ আশ্রমধর্ম্মমাত্রসংস্থঃ, ব্রহ্মসংস্থস্য ত্বমৃতত্বশ্রবণাৎ, দ্বিতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলে বস্তুং শীলমস্যেতি আচার্য্যকুলবাসী। অত্যন্তং যাবজ্জীবমাত্মানং নিয়মৈরাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ ক্ষপয়ন্ দেহং তৃতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। "অত্যন্ত"মিত্যাদি বিশেষণান্নৈষ্ঠিক ইত্যবগম্যতে। "সর্ব্ব এতে ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো যথোক্তৈর্ধর্ম্মৈঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি। পুণ্যো লোকো যেষাং ত ইমে পুণ্যলোকা আশ্রমিণো ভবন্তি। অবশিষ্টস্ত্বনুক্তঃ পরিব্রাড়্‌ ব্রহ্মসংস্থো ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ সোঽমৃতত্বং পুণ্যলোকবিলক্ষণমমরণভাবমাত্যন্তিকমেতি, নাপেক্ষিকং দেবাদ্যমৃতত্ববৎ, পুণ্যলোকাৎ পৃথগমৃতত্বস্য বিভাগকরণাৎ।—শাঙ্করভাষ্য।

"যজ্ঞ" ইত্যাদিনা গৃহস্থাশ্রমো দর্শিতঃ। "তপ" এবেতি বানপ্রস্থাশ্রমঃ, "ব্রহ্মচারী"তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমঃ। এষামভ্যুদয়লক্ষণং ফলমাহ "সর্ব্ব এবৈত" ইতি। চতুর্থাশ্রমমাহ "ব্রহ্মসংস্থ" ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

৩। এতমেবাত্মানং স্বং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজনশীলাঃ প্রব্রজন্তি প্রকর্ষেণ ব্রজন্তি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যসন্তীত্যর্থঃ।—শাঙ্করভাষ্য।

৪। "অথো" অপান্যে বন্ধমোক্ষকুশলাঃ খল্বাহুঃ......তস্মাৎ কামময় এবায়ং পুরুষঃ......যস্মাৎ সচ কামময়ঃ সন্ যাদৃশেন কামেন যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি স কাম ঈষদভিলাষমাত্রেণাভিব্যক্তো যস্মিন্ বিষয়ে ভবতি সোঽবিহন্য-

"ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতী"তি (১)।
(বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, চতুর্থ ব্রাঃ—৬)

তত্র যদুক্তমৃণানুবন্ধাদপবর্গাভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি।
"যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানাঃ"—(তৈত্তিরীয় সংহিতা,—৫।৭।২।৩)
ইতি চ চাতুরাশ্রম্যশ্রুতেরৈকাশ্রম্যানুপপত্তিঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ। প্রত্যক্ষতঃ বিধান না থাকায় (আশ্রমান্তর নাই) ইহা যদি বল ? না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, যেহেতু প্রতিষেধেরও প্রত্যক্ষতঃ বিধান নাই। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) "ব্রাহ্মণ"কর্ত্তৃক অর্থাৎ বেদের "ব্রাহ্মণ" নামক অংশ-বিশেষকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষতঃ গার্হস্থ্য (গৃহস্থাশ্রম) বিহিত হইয়াছে, যদি আশ্রমান্তর থাকিত, তাহাও প্রত্যক্ষতঃ বিহিত হইত, প্রত্যক্ষতঃ (আশ্রমান্তরের) বিধান না থাকায় আশ্রমান্তর অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রম নাই। (উত্তর) না, যেহেতু প্রতিষেধেরও প্রত্যক্ষতঃ বিধান নাই। বিশদার্থ এই যে, আশ্রমান্তর নাই, একই গৃহস্থাশ্রম, এইরূপে প্রতিষেধও অর্থাৎ আশ্রমান্তরের অভাবও "ব্রাহ্মণ" কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষতঃ বিহিত হয় নাই; প্রত্যক্ষতঃ প্রতিষেধের অশ্রবণবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোন শ্রুতির দ্বারাই আশ্রমান্তর নাই, একই গৃহস্থাশ্রম, এই সিদ্ধান্তের শ্রবণ না হওয়ায় ইহা অর্থাৎ আশ্রমান্তর নাই, এই মত অযুক্ত। পরন্তু শাস্ত্রান্তরের ন্যায় অধিকারপ্রযুক্ত বিধান হইয়াছে। বিশদার্থ এই যে, যেমন শাস্ত্রান্তরসমূহ স্ব স্ব অধিকারে প্রত্যক্ষতঃ বিধায়ক, পদার্থান্তরের অভাববশতঃ নহে, এইরূপ গৃহস্থশাস্ত্র

মানঃ স্ফুটীভবন্ ক্রতুত্বমাপদ্যতে। ক্রতুর্নামাধ্যবসায়ো নিশ্চয়ো যদনন্তরা ক্রিয়া প্রবর্ত্ততে। যৎক্রতুর্ভবতি যাদৃক্-কামকার্য্যেণ ক্রতুনা যথারূপক্রতুরস্য, সোঽয়ং যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যদ্বিষয়ঃ ক্রতুস্তৎফলনির্ব্বৃত্তয়ে যদ্যোগ্যং কর্ম্ম তৎ কুরুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি। যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে, তদীয়ং ফলমভিসম্পদ্যতে।—শাঙ্করভাষ্য।

১। "ইতিনু" এবংনু কাময়মানঃ সংসরতি, যস্মাৎ কাময়মান এবৈবং সংসরতি অথ তস্মাদকাময়মানো ন ক্বচিৎ সংসরতি।......কথং পুনরকাময়মানো ভবতি? "যোঽকামো" ভবত্যসাবকাময়মানঃ। কথমকামতেত্যুচ্যতে "যো নিষ্কামঃ", যস্মান্নির্গতাঃ কামাঃ সোঽয়ং নিষ্কামঃ। কথং কামা নির্গচ্ছন্তি? য "আপ্তকামো" ভবতি আপ্তাঃ কামা যেন স আপ্তকামঃ। কথমাপ্যন্তে কামাঃ? "আত্মকাম"ত্বেন,—যস্যাত্মৈব নান্যঃ কাময়িতব্যো বস্ত্বন্তরভূতঃ পদার্থো ভবতি।...... "তস্যৈব অকাময়মানস্য কর্ম্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ প্রাণা বাগাদয়ো নোৎক্রামন্তি, কিন্তু বিদ্বান্ স ইহৈব ব্রহ্ম যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে, স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"।—শাঙ্কর ভাষ্য। "কাময়মানো য আসীৎ স এবাথাকাময়মানো ভবতি। অকাময়মানঃ কামং পরিহরন্ তৎপরিহারসিদ্ধৌ সোঽকাময়ন্, তস্য ব্যাখ্যানং "নিষ্কাম" ইতি। "আত্মকাম"ইতি কৈবল্যোপেতাত্মকামঃ, তৎপ্রাপ্ত্যা আপ্তকামো ভবতি। "ন তস্য প্রাণা" ইতি শাশ্বতো ভবতীত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্যবোধক শাস্ত্র এই "ব্রাহ্মণ" ("ব্রাহ্মণ"নামক বেদাংশ) স্বকীয় অধিকারে অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিষয়েই প্রত্যক্ষতঃ বিধায়ক, আশ্রমান্তরের অভাব-বশতঃ নহে।

অপবর্গপ্রতিপাদক "ঋক্" ও "ব্রাহ্মণ"ও কথিত হইতেছে, অপবর্গপ্রতিপাদক অনেক ঋক্ (মন্ত্র) এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ"নামক শ্রুতিও আছে। ঋক্ বলিতেছি,—

"পুত্রবান্ ও ধনেচ্ছু ঋষিগণ অর্থাৎ গৃহস্থ ঋষিগণ কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু (পুনর্জ্জন্ম) লাভ করিয়াছেন। এবং অপর মনীষী ঋষিগণ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানী ঋষিগণ কর্ম্ম হইতে পর অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগজনিত অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়াছেন।"

"কর্ম্মদ্বারা নহে, পুত্রের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, এক (মুখ্য) অর্থাৎ সন্ন্যাসী জ্ঞানিগণ কর্ম্মত্যাগের দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। 'নাক' অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে পর গুহানিহিত (লৌকিক প্রমাণের অগোচর) যে বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হন, যতিগণ (সন্ন্যাসী জ্ঞানিগণ) যাঁহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করেন।"

"আমি আদিত্যবর্ণ (নিত্যপ্রকাশ) তমঃপর অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে পর (অবিদ্যাশূন্য) এই মহান্ পুরুষকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানি, তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে, "অয়নে"র নিমিত্ত অর্থাৎ পরম-পদপ্রাপ্তি বা মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত অন্য পন্থা নাই।"

অনন্তর "ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত কতিপয় শ্রুতিবাক্য (বলিতেছি),—

"ধর্ম্মের স্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ তিনটি—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান; ইহা প্রথম বিভাগ। তপস্যাই দ্বিতীয় বিভাগ। আচার্য্যকুলে অত্যন্ত (যাবজ্জীবন) আত্মাকে অবসন্ন করতঃ অর্থাৎ দেহযাপন করতঃ আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী, তৃতীয় বিভাগ। ইঁহারা সকলেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদিকারী গৃহস্থ, তপস্যাকারী, বানপ্রস্থ এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, এই ত্রিবিধ আশ্রমীই পুণ্যলোক (পুণ্যলোক প্রাপ্ত) হন, "ব্রহ্মসংস্থ" অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন"।

"এই লোককেই অর্থাৎ আত্মলোককেই ইচ্ছা করতঃ প্রব্রজনশীল ব্যক্তিগণ প্রব্রজ্যা করেন অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন"।

"এবং (বন্ধ-মোক্ষ-কুশল অন্য ব্যক্তিগণও) বলিয়াছেন,—এই পুরুষ (জীব)

কামময়ই, সেই পুরুষ "যথাকাম" (যেরূপ কামনাবিশিষ্ট) হয়, "তৎক্রতু" অর্থাৎ সেই কামজনিত অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, "যৎক্রতু" হয়, অর্থাৎ যেরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, সেই কর্ম্ম করে, অর্থাৎ যে বিষয়ে অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তাহার ফল সম্পাদনের জন্য যোগ্য কর্ম্ম করে; যে কর্ম্ম করে, তাহা অভিসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ সেই কর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হয়।"—এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা কর্ম্মদ্বারা সংসার বলিয়া অর্থাৎ কামই কর্ম্মের মূল এবং ঐ কর্ম্মদ্বারা জীবের পুনঃ পুনঃ সংসারই হয়, মোক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, (পরে) অপর প্রকৃত বিষয় উপদেশ করিতেছেন—

"এইরূপ কামনাবিশিষ্ট পুরুষ (সংসার করে); অতএব কামনাশূন্য পুরুষ (সংসার করে না)। যিনি "অকাম" "নিষ্কাম" "আপ্তকাম" "আত্মকাম" অর্থাৎ যিনি কৈবল্যবিশিষ্ট আত্মাকে কামনা করিয়া কৈবল্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় আপ্তকাম হইয়া সর্ব্ববিষয়ে নিষ্কাম হন, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণের ঊর্দ্ধগতি হয় না অথবা মৃত্যু হয় না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন"।

তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চতুর্থাশ্রম প্রতিপন্ন হইলে "ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব" এই যে (পূর্ব্বপক্ষ) উক্ত হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

"দেবযান (দেবলোকপ্রাপক) যে চারিটি পথ অর্থাৎ যে চারিটি আশ্রম," এই শ্রুতিবাক্যেও চতুরাশ্রমের শ্রবণবশতঃ এক আশ্রমের অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম, এই সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আয়ুর চতুর্থ ভাগে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) বিহিত হওয়ায় ঐ সময়ে মোক্ষের জন্য শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠানের কোন বাধক নাই। কারণ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম যাহা মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকরূপে কথিত হইয়াছে, তাহা গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর ঐ সমস্ত পরিত্যাজ্য। ভাষ্যকার এখন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অন্য আশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান না থাকায় উহা বেদবিহিত নহে, সুতরাং উহা নাই। অর্থাৎ শ্রুতিতে সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমের বিধান পাওয়া যায় না, অন্য আশ্রম থাকিলে অবশ্য তাহারও ঐরূপ বিধান পাওয়া যাইত; সুতরাং অন্য আশ্রম নাই, গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম। তাহা হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠান করিবার সময় না থাকায় মোক্ষের অভাব অর্থাৎ মোক্ষ অসম্ভব, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হইতে পারে না। বস্তুতঃ গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর যে, কোন আশ্রম নাই, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বেদবিহিত, ইহাও

একটি সুপ্রাচীন মত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, সংহিতাকার মহর্ষি গৌতম প্রথমে চতুরাশ্রমবাদের উল্লেখ করিয়া, শেষে গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম, এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন[১] এবং তিনিও গার্হস্থ্যের প্রত্যক্ষ বিধানকেই ঐ মতের সাধক হেতু বলিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও যে, উহাই মত, ইহাও তাঁহার ঐ চরম উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু মহর্ষি জৈমিনিও যে, বেদে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমের বিধি স্বীকার করেন নাই, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাদিবোধক শ্রুতিসমূহের অন্যরূপ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের অষ্টাদশ সূত্রে কথিত হইয়াছে এবং উহার পরে মহর্ষি বাদরায়ণের মতে যে, আশ্রমান্তরও অনুষ্ঠেয়, ইহা কথিত ও সমর্থিত হইয়াছে। শারীরকভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেখানে প্রথম সূত্রের ভাষ্যে জৈমিনির মতের যুক্তি প্রকাশ করিয়া, পরে বাদরায়ণের মতের ব্যাখ্যা করিতে একাশ্রমবাদ খণ্ডন করিয়া, চতুরাশ্রমবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর প্রথম কথা এই যে, শ্রুতিতে প্রত্যক্ষতঃ কেবল গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান পাওয়া যায়। এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পঞ্চাশীতি (৮৫) সূক্তের বিবাহ-প্রকরণীয় অনেক শ্রুতির দ্বারা গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান বুঝা যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মবোধক বেদের "ব্রাহ্মণ"-ভাগের দ্বারাও গৃহস্থা-শ্রমেরই বৈধত্ব বুঝা যায়। সুতরাং স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে যে চতুরাশ্রমের বিধি আছে, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ, ইহা মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন[২]। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ একাশ্রমবাদের সমর্থন পক্ষে শেষ কথা বলিয়াছেন যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আশ্রমান্তরের বিধান থাকিলেও তাহা অনধিকারীর সম্বন্ধেই গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি গৃহস্থোচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনধিকারী, তাহাদিগের সম্বন্ধেই আশ্রমান্তর বিহিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থোচিত কর্ম্মসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বিহিত,—তাঁহার পক্ষে কখনও অন্য আশ্রম নাই। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া, শেষে উক্ত মতভেদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি সেখানে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিতে সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, পরে উহার খণ্ডন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের আবশ্যকত্ব ও বৈধত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু তাহা দেখিলে এখানে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রম নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে আশ্রমান্তরের প্রত্যক্ষতঃ বিধান না থাকিলেও আশ্রমান্তরের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবেরও প্রত্যক্ষতঃ বিধান নাই। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রম গ্রহণ করিবে না, এইরূপ নিষেধও কোন

১। "তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানস ইতি"।
"ঐকাশ্রম্যন্ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাদ্গার্হস্থ্যস্য"।—গৌতমসংহিতা, তৃতীয় অঃ।

২। "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং"।—জৈমিনিসূত্র (পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১৩৩)

প্রত্যক্ষ শ্রুতির দ্বারা শ্রুত হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা আশ্রমান্তর নাই, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই আশ্রম, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কোন শ্রুতির সহিত চতুরাশ্রমবিধায়ক স্মৃতির বিরোধ হইলে মহর্ষি জৈমিনির "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" এই বাক্যানুসারে ঐ সমস্ত স্মৃতির অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোন শ্রুতির সহিত ঐ সমস্ত স্মৃতির বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। কারণ, কোন শ্রুতির দ্বারাই আশ্রমান্তরের নিষেধ বিহিত হয় নাই। পরন্তু কোন শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ না থাকিলে ঐ স্মৃতির দ্বারা উহার মূল শ্রুতির অনুমানই করিতে হইবে, ইহাও শেষে মহর্ষি জৈমিনি "অসতি হ্যনুমানং" এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতির দ্বারা উহার মূল যে শ্রুতির অনুমান করিতে হয়, তাহার নাম অনুমেয়শ্রুতি। উহা উচ্ছন্ন বা প্রচ্ছন্ন হইলেও প্রত্যক্ষ শ্রুতির ন্যায় প্রমাণ। সুতরাং চতুরাশ্রমবিধায়ক বহু স্মৃতির দ্বারা উহার মূল যে শ্রুতির অনুমান করা যায়, তদ্দ্বারা চতুরাশ্রমই যে শ্রুতিবিহিত, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি চতুরাশ্রমই বেদবিহিত হয়, তাহা হইলে বেদের "ব্রাহ্মণ"-ভাগে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান হইয়াছে কেন? অন্য আশ্রমের বিধান না হওয়ায় উহার প্রতিষেধও অনুমান করা যাইতে পারে, অর্থাৎ অন্য আশ্রম নাই, ইহাও বেদের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এই জন্য পরে বলিয়াছেন যে, বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগে অধিকারপ্রযুক্তই কেবল গৃহস্থাশ্রমের বিধান হইয়াছে, আশ্রমান্তরের অভাবপ্রযুক্ত নহে। যেমন "বিদ্যান্তরে" অর্থাৎ ব্যাকরণাদিশাস্ত্রান্তরে স্বীয় অধিকারপ্রযুক্তই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিধান হইয়াছে। তাহাতে যে, অন্য পদার্থের বিধান হয় নাই, তাহা অন্য পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ—যাহা গৃহস্থশাস্ত্র অর্থাৎ গৃহস্থেরই কর্ত্তব্যপ্রতিপাদক শাস্ত্র, গৃহস্থের কর্ত্তব্যবিষয়েই তাহার অধিকার। তদনুসারে তাহাতে গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান ও গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান হইয়াছে; অন্য আশ্রমের বিধান হয় নাই। কারণ, তাহার বিধানে উহার অধিকার নাই। যেমন শব্দব্যুৎপাদক ব্যাকরণ-শাস্ত্রে স্বীয় অধিকারানুসারেই প্রতিপাদ্য পদার্থের বিধান হইয়াছে; শাস্ত্রান্তরের প্রতিপাদ্য অন্যান্য পদার্থের বিধান হয় নাই। কিন্তু তাহাতে যে অন্য পদার্থ ই নাই, অন্য পদার্থের অভাবপ্রযুক্তই ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহার বিধান হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তদ্রূপ বেদের ব্রাহ্মণভাগে আশ্রমান্তরের বিধান নাই বলিয়া উহার অভাবই বেদের সিদ্ধান্ত, উহার অভাবপ্রযুক্তই বিধান হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ফলকথা, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রান্তরের ন্যায় গৃহস্থশাস্ত্র বেদের ব্রাহ্মণভাগও স্বকীয় অধিকারানুসারে প্রত্যক্ষতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমেরই বিধায়ক। এই জন্যই তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ অন্য আশ্রমের বিধান হয় নাই, অন্য আশ্রমের অভাবপ্রযুক্তই যে বিধান হয় নাই, তাহা নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগে যেমন সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান নাই, তদ্রূপ বেদের আর কোন স্থানেও ত উহার বিধান নাই, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও যে বেদবিহিত, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? তদ্বিষয়ে বেদপ্রমাণ ব্যতীত কেবল পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা উহা স্বীকার করা যায় না। ভাষ্যকার এই জন্য শেষে বলিয়াছেন যে, অপবর্গপ্রতিপাদক "ঋক্" এবং "ব্রাহ্মণ"ও

বলিতেছি। অর্থাৎ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত অপবর্গপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমও যে, অধিকারিবিশেষের পক্ষে বেদবিহিত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, বেদে প্রত্যক্ষতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান না থাকিলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ডে অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দ্বারা সন্ন্যাসের বিধি কল্পনা করা যায়। সাক্ষাৎ বিধিবাক্য না থাকিলেও অর্থবাদবাক্যের দ্বারা উহার কল্পনা বা বোধ হইয়া থাকে, ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে ; মীমাংসকগণ তাহা প্রদর্শন করিয়া বিচারদ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "ঋক্" বলিয়া যে তিনটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উপনিষদের মধ্যে কথিত হইলেও মন্ত্র। উপনিষদে অনেক মন্ত্রও কথিত হইয়াছে। "বৃহদারণ্যক" প্রভৃতি উপনিষদে "ঋক্" বলিয়াও অনেক শ্রুতির উল্লেখ দেখা যায়। শ্বেতাশ্বতর ও নারায়ণ উপনিষদে অনেক মন্ত্র কথিত হইয়াছে—যাহা এখনও কর্ম্মবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে।

ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "কর্ম্মভিঃ" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, যে সকল ঋষি পুত্রবান্ ও ধনেচ্ছু, অর্থাৎ যাঁহাদিগের পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা ছিল, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে মৃত্যু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়াছেন। কিন্তু অপর মনীষী ঋষিগণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-বিপরীত কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানার্থী ঋষিগণ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষ হয় না, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারা মুমুক্ষুর পক্ষে সন্ন্যাসের বিধিও বুঝা যায়। "ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্যেও কর্ম্মাদির দ্বারা মোক্ষ হয় না, ত্যাগের দ্বারা মোক্ষ হয়, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে এবং "ত্যাগ" শব্দের দ্বারা সন্ন্যাসই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারাও সন্ন্যাসের বিধি বুঝা যায়। কারণ, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত উক্ত শ্রুতি-কথিত ত্যাগের উপপত্তি হইতে পারে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যের পরার্দ্ধে "নাক" শব্দের দ্বারা অবিদ্যাই উপলক্ষিত হইয়াছে। কৈবল্যোপনিষদের "দীপিকা"কার শঙ্করানন্দ ও নারায়ণ প্রসিদ্ধার্থ রক্ষা করিতে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "নাক" শব্দের দ্বারা অবিদ্যা অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ঐ ব্যাখ্যাই সম্প্রদায়সিদ্ধ মনে হয়। "বেদাহমেতং" ইত্যাদি তৃতীয় শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইতে পারে না, এই তত্ত্ব কথিত হওয়ায় উহার দ্বারাও সন্ন্যাসের বিধি বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধান যে, মোক্ষের উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ন্যায়মতে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষে আবশ্যক, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। মূলকথা, ভাষ্যকারের উদ্ধৃত মন্ত্রত্রয় অপবর্গের প্রতিপাদক। উহার দ্বারা অপবর্গের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় অপবর্গের অনুষ্ঠান ও তাহার কাল এবং তৎকালে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ, যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত অপবর্গার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অপবর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধত্বও স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ নারায়ণ উপনিষদে "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন"

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পরেই "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপেই সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধত্ব বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে ঐ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত না করিলেও উহাও তাঁহার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সাধকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যকার সন্ন্যাসাশ্রমের বেদবিহিতত্ব সমর্থন করিতে প্রথমে অপবর্গপ্রতিপাদক বেদের মন্ত্রত্রয় উদ্ধৃত করিয়া, পরে "ব্রাহ্মণ" উদ্ধৃত করিতে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে কতিপয় শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদীয় তাণ্ড্যশাখার অন্তর্গত ; সুতরাং উহা বেদের ব্রাহ্মণভাগেরই অংশবিশেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ভাষ্যকারের উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধর্ম্মের প্রথম বিভাগ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই কথার দ্বারা গৃহস্থাশ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহস্থ দ্বিজাতিই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং তজ্জন্য বেদপাঠ ও দান করিবেন। তপস্যাই ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিভাগ, এই কথার দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহস্থ দ্বিজাতি কালবিশেষে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া তপস্যাদি বিহিত কর্ম্ম করিবেন। মন্বাদি মহর্ষিগণ ইহার স্পষ্টবিধি বলিয়াছেন[১]। উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর উল্লেখ করিয়া, তাহার পরে উক্ত ব্রহ্মচর্য্যকেই ধর্ম্মের তৃতীয় বিভাগ বলা হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ত্রিবিধ আশ্রমী সকলেই যথাশাস্ত্র স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, তাহার ফলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন—"ব্রহ্মসংস্থ" ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ আশ্রমী হইতে ভিন্ন ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি আছেন, তিনি কর্ম্মলভ্য পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জ্ঞানলভ্য মোক্ষই প্রাপ্ত হন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আশ্রমত্রয় হইতে অতিরিক্ত চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম যে অধিকারিবিশেষের পক্ষে বেদবিহিত, ইহাও অবশ্যই বুঝা যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মসংস্থ" শব্দের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমীই মোক্ষ লাভ করেন, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, এই মতই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত নহে। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে। মূলকথা, ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চতুরাশ্রমই যে বেদবিহিত—একমাত্র গৃহস্থাশ্রম বেদবিহিত নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদের "এতমেব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তদ্দ্বারাও প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম যে, অধিকারিবিশেষের পক্ষে বেদবিহিত, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোকাদি-পুণ্যলোকার্থী ব্যক্তিগণের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। যাঁহারা কেবল আত্মলোকার্থী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারা মুক্তিলাভই ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রব্রজ্যা (সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস) করেন। সুতরাং মুমুক্ষু অধিকারীর পক্ষে আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস যে কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে

১। মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায় এবং বিষ্ণুসংহিতা, ৯৪ম অধ্যায় এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, বানপ্রস্থ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অথো খল্বাহুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্মজন্য সংসার হয় অর্থাৎ কামনাবশতঃই কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, ইহা বলিয়া, পরে "ইতিনু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অপর প্রকৃত অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে জীবকে "কামময়" বলিয়া, জীব যেরূপ কামনাবিশিষ্ট হয়, "তৎক্রতু" অর্থাৎ সেইরূপ অধ্যবসায়বিশিষ্ট হইয়া, সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ কামনাই কর্ম্মের মূল এবং কর্ম্মই সংসারের মূল। কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ হয়। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কামনা জন্মে, পরে তদ্বিষয়ে ক্রতু জন্মে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এখানে "ক্রতু" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়। যে কর্ত্তব্য নিশ্চয়ের অনন্তরই কর্ম্ম করে, তাঁহার মতে ঐ নিশ্চয়ই এখানে "ক্রতু" এবং পূর্ব্বোক্ত কামই পরিস্ফুট হইয়া ক্রতুত্ব লাভ করে। তাৎপর্য্যটীকাকার উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ক্রতু" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সংকল্প। "ইতিনু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সংসার হয়। কারণ, কামনা থাকিলেই সংসারজনক কর্ম্ম করে। অতএব কামনাশূন্য ব্যক্তির সংসার হয় না। কারণ, কামনা না থাকিলে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সংসারজনক কর্ম্ম করে না। কামনাশূন্য কিরূপে হইবে, ইহা বুঝাইতে পরে বলা হইয়াছে "অকাম"। অর্থাৎ "অকাম" ব্যক্তিকেই কামশূন্য বলা যায়। অকামতা কিরূপে হইবে? এ জন্য পরে বলা হইয়াছে "নিষ্কাম"। অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমস্ত কাম নির্গত হইয়াছে, তিনি নিষ্কাম, তাঁহার কামনা থাকে না। সমস্ত কাম নির্গত হইবে কিরূপে? এ জন্য পরে বলা হইয়াছে "আপ্তকাম"। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকাম-প্রাপ্ত, তাঁহার আর কোন বিষয়েই কামনা থাকিতে পারে না। সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবেন কিরূপে? তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এ জন্য শেষে বলা হইয়াছে "আত্মকাম"। অর্থাৎ আত্মাই যাঁহার একমাত্র কাম্য হয়, তিনি আত্মাকে লাভ করিলে আর অন্য বিষয়ে তাঁহার কামনা হইতেই পারে না। অর্থাৎ মুক্তি লাভ হইলে তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই নিষ্কামতা হয়। তাঁহার প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ন্যায়মতানুসারে "আত্মকাম" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কৈবল্যযুক্ত আত্মকাম। আত্মার কৈবল্য কামনাই কৈবল্যযুক্ত আত্মকামনা। কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ হইলে কাম্যলাভ হওয়ায় মুক্ত ব্যক্তি আপ্তকাম হন। তাঁহার প্রাণের উৎক্রান্তি (ঊর্দ্ধগতি) হয় না অর্থাৎ তিনি শাশ্বত হন। ন্যায়মতে মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মের সদৃশ হন, তিনি ব্রহ্ম হইতে পরমার্থতঃ অভিন্ন নহেন। তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য এবং উহাকেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মভাব। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবনীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার বৃহদারণ্যক উপনিষদের "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতিনু কাময়মানো" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের "ইতিনু" ইত্যাদি অংশই এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ইহৈব সমবনীয়ন্তে" এই পাঠ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে (৩।২।১১) ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রান্ত হয়

না, মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণ অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। সেখানে "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" এইরূপ পাঠ আছে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্রের শারীরকভাষ্যেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সেখানে "ন তস্য প্রাণাঃ" এবং "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ" এইরূপ পাঠভেদেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং নৃসিংহোত্তরতাপনী উপনিষদের পঞ্চম খণ্ডে "য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যই এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতির মধ্যে "ইহৈব সমবনীয়ন্তে" অথবা "সমবলীয়ন্তে" এইরূপ পাঠ লেখকের প্রমাদ-কল্পিত, সন্দেহ নাই। মূলকথা, ভাষ্যকারের শেষোক্ত বৃহদারণ্যক-শ্রুতির দ্বারাও মুমুক্ষু অধিকারীর সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, উহার দ্বারা কামনামূলক কর্ম্মজন্য সংসার, এবং নিষ্কামতামূলক কর্ম্মত্যাগে মুক্তি, ইহাই কথিত হইয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত কর্ম্মত্যাগের উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার অপবর্গপ্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের বেদবিহিতত্ব প্রতিপাদন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অতএব ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গ নাই, এই যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। অর্থাৎ গৃহস্থ দ্বিজাতির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ঋণানুবন্ধ অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক থাকিলেও কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসাশ্রমী মুমুক্ষুর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত "ঋণানুবন্ধ" নাই। কারণ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে বিহিত নহে; পরন্তু উহা তাঁহার ত্যাজ্য। সুতরাং তিনি তখন মোক্ষার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। অতএব ঋণানুবন্ধবশতঃ কাহারই অপবর্গার্থ সময়ই নাই, সুতরাং কাহারই অপবর্গ হইতেই পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে তৈত্তিরীয়সংহিতার "যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানাঃ" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যখন চতুরাশ্রমই বেদের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন একাশ্রমবাদই যে বেদের সিদ্ধান্ত, ইহা উপপন্ন হয় না। সুতরাং বেদে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান নাই বলিয়া যে, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বেদবিহিত, ইহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না।

এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার বেদে আশ্রমান্তরের প্রত্যক্ষ বিধান নাই, ইহা স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারপূর্ব্বক চতুরাশ্রমই যে, বেদবিহিত সিদ্ধান্ত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ জাবালোপনিষদে চতুরাশ্রমেরই প্রত্যক্ষ বিধান অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা বিধান আছে[১]। তাহাতে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে,

১। "অথহ জনকো হ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্ সন্ন্যাসং ব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। জাবালোপনিষৎ—চতুর্থ খণ্ড ॥

গৃহী হইয়া বনী (বানপ্রস্থ) হইবে, বনী হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে," অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের পরে বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া শেষে সন্ন্যাসাশ্রমী হইবে। পরন্তু শেষে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, "যে দিনেই বিরক্ত হইবে অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে বিতৃষ্ণ হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবে।" সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে যেমন যথাক্রমে চতুরাশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান আছে, তদ্রূপ বৈরাগ্য জন্মিলে উক্ত ক্রম লঙ্ঘন করিয়াও সন্ন্যাসের প্রত্যক্ষ বিধান আছে। উক্ত উপনিষদে বিদেহাধিপতি জনক রাজার প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাস সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ যে ভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা প্রণিধান করিলে সন্ন্যাসাশ্রম যে, কর্ম্মানধিকারী অন্ধ-বধিরাদি ব্যক্তির সম্বন্ধেই বিহিত হইয়াছে, ইহাও কোনরূপেই বুঝা যায় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একাশ্রমবাদ খণ্ডন করিতে উক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। একাশ্রমবাদিগণ "বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাদি কতিপয় শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আশ্রমান্তরের অবৈধতা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসে অনধিকারী অগ্নিহোত্রাদিরত গৃহস্থেরই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের নিন্দা হইয়াছে। বৈরাগ্যবান্ প্রকৃত অধিকারীর সম্বন্ধে সন্ন্যাসের নিন্দা হয় নাই। কারণ, উক্ত জাবালোপনিষদে বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে সন্ন্যাসের স্পষ্ট বিধান আছে। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রম নাই, অথবা কর্ম্মানধিকারী অন্ধ-বধিরাদি ব্যক্তির সম্বন্ধেই শাস্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইয়াছে, এই মতে উক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্যের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় অপবর্গ অসম্ভব, গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমও বেদবিহিত নহে, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বোক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই নির্ব্বিবাদে নিরস্ত হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে উক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্য কেন উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে পাওয়া যাইবে ॥৫৯॥

ভাষ্য। ফলার্থিনশ্চেদং ব্রাহ্মণং,—"জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং, যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চে"তি। কথং ?

অনুবাদ। "এই সত্র জরামর্য্যই, যাহা অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস" এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত উক্ত শ্রুতিবাক্য ফলার্থীর সম্বন্ধেই কথিত বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্বর্গাদি ফলার্থীর পক্ষেই যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের যাবজ্জীবন-কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ?

সূত্র। সমারোপণাদাত্মন্যপ্রতিষেধঃ ॥৬০॥৪০৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) আত্মাতে (অগ্নির) সমারোপণপ্রযুক্ত অর্থাৎ বেদে

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যজ্ঞবিশেষে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া আত্মাতে অগ্নিসমূহের সমারোপের বিধান থাকায় (ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। "প্রাজাপত্যামিষ্টিং নিরূপ্য তস্যাং সর্ব্ববেদসং হুত্বা আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজে"দিতি শ্রূয়তে—তেন বিজানীমঃ প্রজাবিত্ত-লোকৈষণাভ্যো ব্যুত্থিতস্য নিবৃত্তে ফলার্থিত্বে সমারোপণং বিধীয়ত ইতি। এবঞ্চ ব্রাহ্মণানি*—"অন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্॥ মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণী"তি।

অথাপি—"ইত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্ত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহারে"তি। [—বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অং, পঞ্চম ব্রাঃ]।

অনুবাদ। "প্রাজাপত্যা" ইষ্টি (যজ্ঞবিশেষ) অনুষ্ঠান করিয়া, তাহাতে সর্ব্বস্ব হোম করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া, আত্মাতে অগ্নিসমূহ আরোপ করিয়া প্রব্রজ্যা করিবেন" ইহা শ্রুত হয়, তদ্দ্বারা বুঝিতেছি, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ এষণা বা কামনা হইতে মুক্ত ব্যক্তিরই ফলকামনা নিবৃত্ত হওয়ায় সমারোপণ (আত্মাতে অগ্নির আরোপ) বিহিত হইয়াছে।

এইরূপই "ব্রাহ্মণ" আছে অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক বেদের "ব্রাহ্মণ-" ভাগের অন্তর্গত শ্রুতিও আছে, (যথা)—"অন্যবৃত্ত অর্থাৎ গার্হস্থ্যরূপ বৃত্ত হইতে ভিন্ন সন্ন্যাসরূপ বৃত্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিয়াছিলেন, অরে মৈত্রেয়ি! আমি এই 'স্থান' অর্থাৎ গার্হস্থ্য হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, (যদি ইচ্ছা কর)—এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার 'অন্ত' অর্থাৎ 'বিভাগ' করি" এবং "তুমি এইরূপ উক্তানুশাসনা হইলে, অর্থাৎ আমি আত্মতত্ত্ব

---

* প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে এখানে "সোঽন্যব্রতমুপাকরিষ্যমাণো যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীমিতি হোবাচ প্রব্রজিষ্যন্ বা" ইত্যাদি এবং পরে "অথাপ্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি-এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ" এইরূপ শ্রুতিপাঠ পাছে। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে "অথহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ, তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভুব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্॥১॥" এবং পরে "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা" ইত্যাদি শ্রুতিপাঠ আছে। পরে উক্ত পঞ্চম ব্রাহ্মণের সর্ব্বশেষে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি, মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে। সুতরাং তদনুসারে এখানে উক্ত শ্রুতির মূল পাঠের উক্ত অংশই ভাষ্যকারের উদ্ধৃত বলিয়া গৃহীত হইল। ভাষ্য-পুস্তকে প্রচলিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপাঠ বিকৃত, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুশাসন (উপদেশ) বলিলাম, অরে মৈত্রেয়ি! অমৃতত্ব (মোক্ষ) এতাবন্মাত্র, অর্থাৎ তোমার প্রশ্নানুসারে আমার পূর্ব্ববর্ণিত আত্মদর্শনই মোক্ষের সাধন জানিবে,—ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিলেন"।

টিপ্পনী। "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ নাই, অপবর্গ অসম্ভব, এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "জরামর্য্যং বা" ইত্যাপি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যাঁহার স্বর্গাদি ফলকামনার নিবৃত্তি হয় নাই, তাঁহার সম্বন্ধেই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের যাবজ্জীবন-কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার স্বর্গাদি ফলকামনা নাই, যিনি বৈরাগ্যবশতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়াছেন, তাঁহার আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য না হওয়ায় তিনি তখন মোক্ষার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। ভাষ্যকার এখন তাঁহার ঐ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পুনর্ব্বার বলিয়াছেন যে, "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্বর্গাদি ফলার্থীর সম্বন্ধেই যে কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাও উহা প্রতিপন্ন হয়। কিরূপে উহা বুঝা যায়? কোন্ প্রমাণের দ্বারা উহা প্রতিপন্ন হয়? এই প্রশ্নোত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে পরে আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মাতে অগ্নির আরোপপ্রযুক্ত অর্থাৎ বেদে সন্ন্যাসেচ্ছু ব্রাহ্মণের আত্মাতে সমস্ত অগ্নিকে আরোপ করিয়া সন্ন্যাসের বিধান থাকায় "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতিষেধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে "প্রাজাপত্যামিষ্টিং নিরূপ্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুত্থিত অর্থাৎ সর্ব্বথা নিষ্কাম ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই আত্মাতে অগ্নির আরোপ বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রসঙ্গে শেষে ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বেদে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান আছে। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে "প্রব্রজেৎ" এইরূপ বিধিবাক্যের দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রাজাপত্যা ইষ্টি (যজ্ঞবিশেষ) সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বাঙ্গ। সন্ন্যাসেচ্ছু ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ঐ ইষ্টি করিয়া, তাহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবেন, পরে তাঁহার পূর্ব্বগৃহীত সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে আরোপ করিয়া অর্থাৎ নিজের আত্মাকেই ঐ সমস্ত অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া সন্ন্যাস করিবেন। সংহিতাকার মন্বাদি মহর্ষিগণও উক্ত শ্রুতি অনুসারেই পূর্ব্বোক্তরূপে সন্ন্যাসের স্পষ্ট বিধি বলিয়াছেন[১]। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সন্ন্যাসের পূর্ব্বকর্ত্তব্য প্রাজা-

১। "প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাং।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ ॥ মনুসংহিতা। ৬। ৩৮ ॥
"অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্বকষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা
সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ"। "আত্মন্যগ্নীন্
আরোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ" ॥ বিষ্ণুসংহিতা ॥ ৯৫ অধ্যায় ॥
"বনাদ্গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাং।
প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি ॥—ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৃতীয় অঃ, যতিপ্রকরণ।

পত্যা ইষ্টিতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদানের বিধান থাকায় যাঁহার পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা নাই, অর্থাৎ পুত্রবিষয়ে কামনা এবং বিত্তবিষয়ে কামনা ও লোকসংগ্রহ বা লোকসমাজে খ্যাতির কামনা নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির সম্বন্ধেই আত্মাতে অগ্নির আরোপপূর্ব্বক সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যাঁহার কোনরূপ এষণা বা কামনা আছে, তাঁহার পক্ষে কথনই সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ এষণামুক্ত ব্যক্তির তখন স্বর্গাদি ফলকামনা না থাকায় তিনি তখন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবেন না, তখন তিনি তাঁহার অগ্নিহোত্রাদি-সাধন সমস্ত দ্রব্যও দক্ষিণারূপে দান করায় অগ্নিহোত্রাদি করিতেও পারেন না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত অধিকারিবিশেষের পক্ষে তখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কোন কর্ম্মে অধিকার নাই। ঐরূপ ব্যক্তির যে কোন কর্ম্ম নাই, ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে[১]। অতএব পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ফলার্থীর পক্ষেই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যিনি স্বর্গাদি ফলার্থী, যিনি পূর্ব্বোক্ত এষণাত্রয় হইতে মুক্ত নহেন, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রাজাপত্যা ইষ্টি করিয়া তাহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করেন নাই, তাদৃশ ব্যক্তিই উক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকারী।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগবিশেষও যে, এষণাত্রয়মুক্ত ব্যক্তিরই সন্ন্যাসপ্রতিপাদক, ইহা প্রদর্শন করিতে বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা পত্নী কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় বিষয়জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অভিলাষী হইয়া, জ্যেষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমি এই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করি। অর্থাৎ তাঁহার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা উভয় পত্নীকে বিভাগ করিয়া দিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, ভগবন্! যদি এই পৃথিবী ধনপূর্ণা হয়, তাহা হইলে আমি কি মুক্তিলাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না, তাহা পারিবে না, "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—ধনের দ্বারা মুক্তিলাভের আশাই নাই। মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহার দ্বারা আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব না, তাহার দ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা মুক্তির সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমার নিকটে বলুন। তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিলেন। তিনি নানা দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা বিশদরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি! তোমাকে এইরূপে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিলাম, ইহাই মুক্তিলাভের উপায়। ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ভাষ্যকার এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষ-

১। "যস্ত্বাত্ম-রতিরেব স্যাদাত্ম-তৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ॥—গীতা, । ৩ । ১৭ ॥

দের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণের প্রথম শ্রুতি "অন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্" এই শেষ অংশ এবং "মৈত্রেয়ীতি" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রুতি এবং সর্ব্বশেষ পঞ্চদশ শ্রুতির "ইত্যুক্তানুশাসনাসি" ইত্যাদি শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া, উহার দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় এষণাত্রয়মুক্ত ব্যক্তিই যে, সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকারী, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কথিত হইয়াছে, তাহা যে ফলার্থী গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, এষণাত্রয়মুক্ত সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ সমস্ত কর্ম্ম মোক্ষসাধনের প্রতিবন্ধক হয় না, ইহাও উহার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিত্তৈষণা ছিল না, সুতরাং তখন অন্য এষণাও ছিল না, ইহা ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে এবং তিনি যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও বেদবিহিত, ইহা শেষোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে ॥৬০॥

সূত্র। পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ ॥৬১॥৪০৪॥

অনুবাদ। পরন্তু পাত্রচয়ান্ত কর্ম্মের উপপত্তি না হওয়ায় ফলের অভাব হয়।

ভাষ্য। জরামর্য্যে চ কর্ম্মণ্যবিশেষেণ কল্প্যমানে সর্ব্বস্য পাত্রচয়ান্তানি কর্ম্মাণীতি প্রসজ্যতে,তত্রৈষণাব্যুত্থানং ন শ্রূয়েত, "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মা-ঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তী"তি।—[বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, চতুর্থ ব্রাঃ।] এষণাভ্যশ্চ ব্যুত্থিতস্য পাত্রচয়ান্তানি কর্ম্মাণি নোপপদ্যন্ত ইতি নাবিশেষেণ কর্ত্তুঃ প্রযোজকং ফলং ভবতীতি।

চাতুরাশ্রম্যবিধানাচ্চেতিহাস-পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বৈকাশ্রম্যানুপপত্তিঃ। তদপ্রমাণমিতি চেৎ? ন, প্রমাণেন প্রামাণ্যাভ্যনুজ্ঞানাৎ। প্রমাণেন খলু ব্রাহ্মণেনেতিহাস-পুরাণস্য প্রামাণ্যমভ্যনুজ্ঞায়তে,—"তে বা খল্বেতে অথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যবদন্নিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদ" ইতি। তস্মাদযুক্তমেতদপ্রামাণ্যমিতি। অপ্রামাণ্যে চ ধর্ম্ম-শাস্ত্রস্য প্রাণভৃতাং ব্যবহারলোপাল্লোকোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ।

দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃসামান্যাচ্চাপ্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। য এব মন্ত্র-ব্রাহ্মণস্য দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ তে খল্বিতিহাসপুরাণস্য ধর্ম্মশাস্ত্রস্য চেতি।

বিষয়ব্যবস্থানাচ্চ যথাবিষয়ং প্রামাণ্যং। অন্যো মন্ত্র-ব্রাহ্মণস্য

বিষয়োঽন্যশ্চেতিহাসপুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাণামিতি। যজ্ঞো মন্ত্র-ব্রাহ্মণস্য, লোকবৃত্তমিতিহাসপুরাণস্য, লোকব্যবহারব্যবস্থানং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য বিষয়ঃ। তত্রৈকেন ন সর্ব্বং ব্যবস্থাপ্যত ইতি যথাবিষয়মেতানি প্রমাণানীন্দ্রিয়াদিবদিতি।

অনুবাদ। পরন্তু জরামর্য্যকর্ম্ম (পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম) অবিশেষে কল্প্যমান হইলে অর্থাৎ ফলার্থী ও ফলকামনাশূন্য, এই উভয়েরই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে সকলেরই[1] "পাত্রচয়ান্ত" কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ মরণকাল পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম, ইহা প্রসক্ত হয়। তাহা হইলে অর্থাৎ সকলেরই অবিশেষে মরণকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ কর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করিলে "এষণা" হইতে ব্যুত্থান শ্রুত না হউক? অর্থাৎ তাহা হইলে উপনিষদে পূর্ব্বতম জ্ঞানিগণের "এষণা"ত্রয় হইতে ব্যুত্থান বা মুক্তির যে শ্রুতি আছে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। যথা—"ইহা সেই, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ এই যে—পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ "প্রজা" কামনা করিতেন না, (তাঁহারা মনে করিতেন) প্রজার দ্বারা আমরা কি করিব, যে আমাদের আত্মাই এই লোক অর্থাৎ অভিপ্রেত ফল, (এইরূপ চিন্তা করিয়া) তাঁহারা পুত্রৈষণা এবং বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত (মুক্ত) হইয়া অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য করিয়াছেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।" কিন্তু এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত ব্যক্তির (সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর) "পাত্রচয়ান্ত" কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ মরণান্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপপন্ন হয় না, অতএব ফল অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, নির্ব্বিশেষে কর্ত্তার প্রয়োজক হয় না।

পরন্তু ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুরাশ্রমের বিধান থাকায় একাশ্রমের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই শাস্ত্রবিহিত, আর কোন আশ্রম নাই, এই সিদ্ধান্ত ইতিহাস আদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া উহা স্বীকার করা যায় না। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই ইতিহাসাদি অপ্রমাণ, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, যেহেতু প্রমাণ-কর্ত্তৃক প্রামাণ্যের স্বীকার হইয়াছে। বিশদার্থ এই যে,—"ব্রাহ্মণ"রূপ প্রমাণ-কর্ত্তৃকই ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—"সেই এই অথর্ব্ব ও

১। "সর্ব্বস্য পাত্রচয়ান্তানি কর্ম্মাণীতি প্রসজ্যেত, মরণপর্য্যন্তানি কর্ম্মাণীতি প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। নন্বিষ্যত এব পাত্রচয়ান্তং কর্ম্মণামিত্যত আহ "তত্রৈষণা-ব্যুত্থান"মিতি। তস্মান্নাবিশেষেণ কর্ত্তুঃ প্রয়োজকং ফলং ভবতীতি। "ফলাভাব" ইত্যস্য সূত্রাবয়বস্য বিশেষেণ ফলস্য কর্ত্তৃপ্রয়োজকত্বাভাব ইত্যর্থঃ। তদনেন এষণাব্যুত্থান-শ্রুতিবিরোধো দর্শিতঃ"।—তাৎপর্য্যটীকা।

অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ এই ইতিহাস ও পুরাণকে বলিয়াছিলেন, এই ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং বেদসমূহের বেদ” অর্থাৎ সকল বেদার্থের বোধক। অতএব এই ইতিহাস ও পুরাণের অপ্রামাণ্য অযুক্ত। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইলে প্রাণিগণের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের ব্যবহার-লোপপ্রযুক্ত লোকোচ্ছেদের আপত্তি হয়।

দ্রষ্টা ও বক্তার সমানতাপ্রযুক্তও (ইতিহাসাদির) অপ্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, যাঁহারাই “মন্ত্র” ও ‘‘ব্রাহ্মণে”র দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই ইতিহাস ও পুরাণের এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও বক্তা।

বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্তও (বেদাদি শাস্ত্রের) যথাবিষয় প্রামাণ্য (স্বীকার্য্য)। বিশদার্থ এই যে, “মন্ত্র” ও “ব্রাহ্মণে”র বিষয় অন্য এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় অন্য। যজ্ঞ,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিষয়, লোকবৃত্ত—ইতিহাস ও পুরাণের বিষয়, লোকব্যবহারের ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। তন্মধ্যে এক শাস্ত্র কর্ত্তৃক সকল বিষয় ব্যবস্থাপিত হয় না, এ জন্য ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ন্যায় এই সমস্ত শাস্ত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত “মন্ত্র,” “ব্রাহ্মণ” এবং ইতিহাস পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই যথাবিষয় প্রমাণ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ, উহার মধ্যে একের দ্বারা অপরের গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ উক্ত কারণে বেদাদি সকল শাস্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য।]

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই কর্ত্তব্য হইলে সকলেরই “পাত্রচয়ান্ত” কর্ম্ম অর্থাৎ মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু সকলেরই “পাত্রচয়ান্ত” কর্ম্মের উপপত্তি হয় না। কারণ, এষণাত্রয়মুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ফলকামনা না থাকায় তাঁহার পক্ষে মরণকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। অতএব ঐ সকল কর্ম্মের ফল নির্ব্বিশেষে কর্ত্তার প্রয়োজক হয় না। অর্থাৎ যে ফলের কামনাপ্রযুক্ত কর্ত্তা ঐ সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসীর ঐ ফলের কামনা না থাকায় উহা তাঁহার ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজক হয় না। সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত কর্ম্ম করেন না—তাঁহার তখন ঐ সমস্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যও নহে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত-রূপেই এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে পূর্ব্বোক্তরূপেই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় সূত্রে “ফলাভাব” শব্দের দ্বারা ফলের কর্তৃপ্রযোজকত্বের অভাবই বিবক্ষিত এবং “পাত্রচয়ান্ত” শব্দের দ্বারা মরণান্তকর্ম্মসমূহ বিবক্ষিত। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকারী সাগ্নিক দ্বিজাতির মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত যজ্ঞপাত্র যথাক্রমে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়া অন্ত্যেষ্টি করিতে হয়। কোন্ অঙ্গে কোন্ পাত্র বিন্যস্ত করিতে হয়,

ইহার ক্রম ও বিধিপদ্ধতি "লাট্যায়নসূত্র" এবং "কর্ম্মপ্রদীপ" গ্রন্থে কথিত হইয়াছে[১]। "অন্ত্যেষ্টি-দীপিকা" গ্রন্থে সেই সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ("অন্ত্যেষ্টি-দীপিকা," কাশী সংস্করণ, ৫৬—৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সাগ্নিক দ্বিজাতির অন্ত্যেষ্টিকালে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে যে যজ্ঞপাত্রের স্থাপন, তাহাই সূত্রে "পাত্রচয়" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যিনি মরণদিন পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে বৈরাগ্যবশতঃ যজ্ঞপাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পক্ষেই অন্ত্যেষ্টিকালে উক্ত যজ্ঞপাত্র স্থাপন সম্ভব হওয়ায় সূত্রে "পাত্রচয়ান্ত" শব্দের দ্বারাই মরণান্ত কর্ম্মসমূহই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, মরণদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞকর্ম্ম করিলেই তাহার অন্তে দাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত "পাত্রচয়" হইয়া থাকে। সুতরাং "পাত্রচয়ান্ত" শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্য-বশতঃ মরণান্তকর্ম্মসমূহ বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যানুসারে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সকলেরই মরণান্তকর্ম্মসমূহ কর্ত্তব্য, উহা আমরা স্বীকারই করি—এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থানের যে শ্রুতি আছে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ঐ শ্রুতি প্রদর্শনের জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের "এতদ্ধ স্ম বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে পূর্ব্বতন আত্মজ্ঞগণ যে, প্রজা কামনা করেন নাই, আত্মাই তাঁহা-দিগের একমাত্র "লোক" অর্থাৎ কাম্য, তাঁহারা এ জন্য পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এষণাত্রয়মুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম নাই, উহা তাঁহাদিগের পরিত্যাজ্য, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। উক্ত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "প্রজা" শব্দের দ্বারা কর্ম্ম ও অপরা ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বতন আত্মজ্ঞগণ কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যাকে কামনা করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহারা পুত্রাদি লোকত্রয়ের সাধন কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং উক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে "প্রব্রজন্তি" এই বাক্যকে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিবাক্য বলিয়া শেষোক্ত "এতদ্ধ স্ম বৈ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যকে উহার "অর্থবাদ" বলিয়াছেন। সে যাহাই হউক, মূলকথা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যখন এষণাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তখন তাদৃশ নিষ্কাম সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে পাত্রচয়ান্ত কর্ম্ম অর্থাৎ মরণদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মের ফল নির্ব্বিশেষে কর্ত্তার প্রযোজক হয় না, ইহাই ভাষ্যকার শেষে সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা হইতে পারে যে, মুমুক্ষু সন্ন্যাসী অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করায় উহা তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক না

১। "শিরসি কপালানি ইড়াং দক্ষিণাগ্রাঞ্চ" ইত্যাদি লাট্যায়নসূত্র। "আজ্যপূর্ণাং দক্ষিণাগ্রাং স্রুচং মুখে স্থাপয়েৎ। তথাগ্রমাজ্যপূর্ণং স্রুবং নাসিকায়াং। পাদয়োঃ প্রাগগ্রামধরারণিং। তথাগ্রামুত্তরারণিমুরসি। সব্যপার্শ্বে দক্ষিণাগ্রং শূর্পং। দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণাগ্রং চমসং, উরুদ্বয়মধ্যে উলূখলং মুষলমধোমুখং, তত্রৈব চ ক্রমোবিলীকঞ্চ স্থাপয়েৎ"।—কর্ম্মপ্রদীপ।

হইলেও তিনি পূর্ব্বে যে অগ্নিহোত্র করিয়াছেন, উহার ফল স্বর্গ তাঁহার অবশ্যই হইবে। সুতরাং ঐ স্বর্গই তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইবে। কারণ, স্বর্গভোগ করিতে হইলে মুক্তি হইতে পারে না। উক্ত আশঙ্কা নিরাসের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রের ফলাভাব, অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে উহার ফল যে স্বর্গ, তাহা হয় না। কারণ, অগ্নিহোত্র "পাত্রচয়ান্ত"। অগ্নিহোত্রকারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকালে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে অগ্নিহোত্র-সাধন পাত্রসমূহের বিন্যাসই "পাত্রচয়"। কিন্তু সন্ন্যাসী পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত পাত্র পরিত্যাগ করায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকালে উক্ত "পাত্রচয়" সম্ভবই নহে। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্র পাত্রচয়ান্ত না হওয়ায় অসম্পূর্ণ, তাই তাঁহার সম্বন্ধে উহার ফল (স্বর্গ) হয় না। তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভই করেন। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, মুমুক্ষু সন্ন্যাসী পূর্ব্বে অন্যান্য যে সমস্ত স্বর্গ-জনক ও নরকজনক পুণ্যকর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফল স্বর্গ ও নরকই তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইবে। এ জন্য মহর্ষি এই সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা অন্য হেতুরও সূচনা করিয়াছেন। সেই হেতু কর্ম্মক্ষয়। তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় করায় তৎপ্রযুক্ত তাঁহার আর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগও হইতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলও তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা বলিয়া ভাষ্যকারোক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য তাহাও করেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রে "ফলাভাব" শব্দের দ্বারা সরলভাবে ফলের অভাব অর্থাৎ ফল হয় না, এই অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাত অর্থই যে, সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় প্রথম বক্তব্য এই যে, যদি অগ্নিহোত্রকারীর অন্ত্যেষ্টিকালে যে কোন কারণে উক্ত "পাত্রচয়" (অঙ্গে যজ্ঞপাত্র বিন্যাস) না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্র যে, একেবারেই নিষ্ফল হইবে, এ বিষয়ে প্রমাণ আবশ্যক। বৃত্তিকার এ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। যদি উক্তরূপ স্থলে পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রের পূর্ণ ফল না হইলেও কিঞ্চিৎ ফলও হয়, তাহা হইলেও আর "ফলাভাব" বলা যায় না, সুতরাং বৃত্তিকারের প্রথমোক্ত আশঙ্কারও খণ্ডন হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বৃত্তিকার সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীর ফলাভাবে তত্ত্বজ্ঞানজন্য কর্ম্মক্ষয়কে হেত্বন্তররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতু ব্যর্থ হয়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্যই পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রজন্য অদৃষ্টেরও ক্ষয় হওয়ায় উহার ফল স্বর্গ হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত শাস্ত্রসিদ্ধান্তই আছে। সুতরাং মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফলের অভাব সমর্থন করিলে উহাতে আর কোন হেতু বলা নিষ্প্রয়োজন এবং তাহা এখানে মহর্ষির বক্তব্যও নহে। কারণ, "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ হইতে পারে না, যজ্ঞাদি কর্ম্মানুরোধে অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময়ই নাই, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতেই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন। উহার দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমে যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা

না থাকায় অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময় আছে,—সন্ন্যাসাশ্রমও বেদবিহিত, সন্ন্যাসীর মরণান্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, উহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও নহে, এই সমস্ত তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে এবং উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শাস্ত্রানুসারে ঐ সমস্ত তত্ত্বই মহর্ষির এখানে বক্তব্য। তাই ভাষ্যকারও এখানে প্রথম হইতেই বিচারপূর্ব্বক ঐ সমস্ত তত্ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। মুমুক্ষু অধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মননাদি সাধনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল স্বর্গনরকাদি যে তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না ; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানজন্য তাঁহার ঐ কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় উহার ফল হইতেই পারে না, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তই আছে, "জ্ঞানাগ্নিঃ কর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" (গীতা, ।৪।৩৭) সুতরাং মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে এখানে ঐ সমস্ত কথা বলা অনাবশ্যক। পরন্তু যদি বৃত্তিকারের কথিত আশঙ্কার সমাধানও মহর্ষির কর্ত্তব্য হয় এবং এই সূত্রের দ্বারা তিনি তাহাই করিয়াছেন, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রের ফলাভাবে মহর্ষি "পাত্রচয়ান্তানুপপত্তি"কে হেতু বলিবেন কেন ? ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই এই সূত্রের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সুধীগণ বৃত্তিকারোক্ত ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যগুলি চিন্তা করিয়া এই সূত্রের প্রকৃতার্থ বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের বেদবিহিতত্ব ও চতুরাশ্রমবাদ সমর্থন করিয়া একাশ্রমবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। পরিশেষে আবার এখানে উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেও চতুরাশ্রমের বিধান থাকায় একাশ্রমবাদের উপপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ ঋষিপ্রণীত ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেও যখন চতুরাশ্রম বিহিত হইয়াছে, তখন উহা যে মূল বেদবিহিত সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, আর্ষ ইতিহাসাদিতে বেদার্থেরই উপদেশ হইয়াছে। নচেৎ ঐ ইতিহাসাদির প্রামাণ্যই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং চতুরাশ্রম-বাদ যে সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার্য্য হইলে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রম নাই, এই মতের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং উহা অগ্রাহ্য। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যই নাই ; এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগ—যাহা প্রমাণ বলিয়া উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত, তাহাতেই যখন ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত, তখন উহার অপ্রামাণ্য বলা যায় না। ভাষ্যকার ইহা বলিয়া বেদের "ব্রাহ্মণ"-ভাগ হইতে ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্যবোধক "তে বা খল্বেতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়াও উক্তরূপ শ্রুতিবাক্যের মূলস্থান জানিতে পারি নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে নারদের উক্তির মধ্যে "ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেখানে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য "বেদানাং বেদং" এই বাক্যের দ্বারা ব্যাকরণশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্র সকল বেদের বেদ অর্থাৎ বোধক। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে "সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে।

কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "অভ্যবদন্" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায় উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা মুনিগণ ইতিহাস ও পুরাণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং সমস্ত বেদের বেদ (বোধক), অর্থাৎ সকল বেদার্থের নির্ণায়ক। বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা যে বেদার্থের নির্ণয় করিতে হইবে, ইহা মহাভারতাদি গ্রন্থে ঋষিগণই বলিয়া গিয়াছেন[১]।

ফলকথা, এখানে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য এবং পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য যে বেদসম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য বেদের অন্তর্গত ইতিহাস ও পুরাণও আছে। বেদব্যাখ্যাকার শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভাষ্যকার যে বেদভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চতুর্ব্বেদ ভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণেরই প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যথা "ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ" এইরূপ উক্তির উপপত্তি হয় না। বস্তুতঃ বেদ হইতে ভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র যে সুপ্রাচীন কালেও ছিল, ইহা বেদের দ্বারাই বুঝা যায়। বেদের ন্যায় পুরাণও যে সেই এক ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত, ইহা অথর্ব্ববেদসংহিতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে এবং উহাতে বেদ ভিন্ন ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে[২]। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে "স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানচতুষ্টয়ং" এই শ্রুতিবাক্যে "ঐতিহ্য" শব্দের দ্বারা ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র কথিত হইয়াছে, ইহা মাধবাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়াছেন। পরন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে "স্মৃতি" শব্দের দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্রও অবশ্যই বুঝা যায়। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যও যে শ্রুতিসম্মত এবং সুপ্রাচীন কালেও উহার অস্তিত্ব ছিল, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। শতপথব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দ্দশ কাণ্ডেও বেদভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভের প্রারম্ভে পুরাণের প্রামাণ্যাদি বিষয়ে নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মূলকথা, বেদমূলক ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রও বেদের সমানকালীন এবং বেদবৎ প্রমাণ, ইহা বেদের দ্বারাই সমর্থিত হয়। পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, নানা গ্রন্থের দ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব নানাপ্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত গ্রন্থও ইতিহাস ও পুরাণাদি নামে কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকিলে সর্ব্বপ্রাণীর ব্যবহার লোপ হয়; সুতরাং লোকোচ্ছেদ হয়। ভাষ্যকার এখানে "প্রাণভৃৎ" শব্দের দ্বারা মনুষ্য-

---

১। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি" —মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১ম অঃ, ২৬৭।

২। ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ অথর্ব্ববেদসংহিতা—১১।৭।২৪।
"স বৃহতীং দিশমনুব্যচলৎ। তমিতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্"।—ঐ, ১৫,৬।১১।

মাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যমাত্রেরই ব্যবহারপ্রতিপাদক। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা মন্বাদি ঋষিগণ দস্যু ও পাষণ্ড মনুষ্যগণেরও ধর্ম্ম বলিয়াছেন[১]। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৩৩শ অধ্যায়ে দস্যুধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। এবং ১৩৫শ অধ্যায়ে দস্যুগণের প্রতি কর্ত্তব্যের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা, ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্ববিধ মানবেরই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, উহা অগ্রাহ্য করিয়া সকল মানবই উচ্ছৃঙ্খল হইলে সমাজস্থিতি থাকে না, সুতরাং লোকোচ্ছেদ হয়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বজনেরই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের প্রতিপাদক বলিয়া সর্ব্বজনপরিগৃহীত, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। বুদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বজনপরিগৃহীত নহে, বেদবিশ্বাসী আস্তিক আর্য্যগণ উহা গ্রহণ করেন নাই, এ জন্য সে সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকার ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে শেষে আবার বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, “মন্ত্র” ও “ব্রাহ্মণ” নামক বেদের প্রামাণ্য যখন স্বীকৃত, তখন ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যও স্বীকার্য্য, উহার অপ্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। কারণ, যে সমস্ত ঋষি “মন্ত্র” ও “ব্রাহ্মণ” নামক বেদের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা, তাঁহারাই ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা। সুতরাং তাঁহাদিগের দৃষ্ট ও কথিত ইতিহাসাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে বেদেরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের বেদবৎ প্রামাণ্য সমর্থন করিতে একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনেক বৈদিক কর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতা অপেক্ষা করে এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মও বৈদিক মন্ত্রাদিকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে যেমন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তদ্রূপ অনেক বৈদিক কর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হয়। বেদে ঐ সকল কর্ম্মের বিধি থাকিলেও কিরূপে উহা করিতে হইবে, তাহার পদ্ধতি পাওয়া যায় না। সুতরাং বেদের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের ঐরূপ সম্বন্ধ থাকায় স্মৃতিশাস্ত্রের (ধর্ম্মশাস্ত্রের) বেদবৎ প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের ঐরূপ সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার শেষে বেদ এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বিষয়ে প্রামাণ্য সমর্থন করিতে দ্বিতীয় যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, “মন্ত্র” ও “ব্রাহ্মণ”রূপ বেদের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যজ্ঞ ; ইতিহাস ও পুরাণের বিষয় লোকচরিত ; লোকব্যবহারের অর্থাৎ সকল মানবের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা বা নিয়ম ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। উক্ত সমস্ত বিষয়েরই প্রতিপাদক প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু উহার মধ্যে কোন একটি শাস্ত্রই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ের প্রতিপাদক নহে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েরই প্রতিপাদক। সুতরাং যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অনুমানাদি প্রমাণগুলি সকল বিষয়েরই প্রতিপাদক নহে, কিন্তু স্ব স্ব বিষয়েরই প্রতিপাদক হওয়ায় ঐ সমস্ত স্ব স্ব বিষয়ে প্রমাণ, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বেদাদি শাস্ত্রও প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিষয়ে প্রমাণ, ইহা স্বীকার্য্য।

১। দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ॥—মনুসংহিতা, ১ম অঃ, ১১৮।

এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে "দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃসামান্যাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও বক্তা ঋষিগণই বেদেরও দ্রষ্টা ও বক্তা, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিবিশেষই বেদবক্তা এবং তাঁহাদিগের প্রামাণ্য-বশতঃই বেদের প্রামাণ্য, ইহা বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত "প্রধানশব্দানুপপত্তেঃ" ইত্যাদি (৫৯ম) সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার অন্য প্রসঙ্গে "ঋষি" শব্দের প্রয়োগ করায় তাঁহার মতে ঋষিই যে বেদের বক্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সপ্তম, অষ্টম ও উনচত্বারিংশ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের উক্তিবিশেষের দ্বারাও তাঁহার মতে বেদবাক্য যে ঋষিবাক্য, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সর্ব্বশেষ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "যাঁহারাই বেদার্থসমূহের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা।" ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারাও তাঁহার মতে যে, কোন এক আপ্ত ব্যক্তিই সকল বেদের বক্তা নহেন, বহু আপ্ত ব্যক্তিই সকল বেদের বক্তা, ইহাই বুঝা যায় "তেন প্রোক্তং" এই পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্যের দ্বারাও ঋষিগণই যে, বেদবাক্যের রচয়িতা, এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়[১]। "সুশ্রুতসংহিতা"য় "ঋষিবচনং বেদঃ" এই উক্তির দ্বারাও বেদ যে ঋষিবাক্য, এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়[২]। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও আর্ষজ্ঞানের লক্ষণ বলিতে ঋষিদিগকে বেদের বিধাতা বলিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্টও প্রশস্তপাদের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিতে ঋষিদিগকে বেদের কর্ত্তাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, আর কেহই বেদকর্ত্তা হইতেই পারেন না, ইহাও অনেক পূর্ব্বাচার্য্য শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, এই সিদ্ধান্তই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন ; ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের মতের ব্যাখ্যা করিতেও শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঋষিদিগকে বেদকর্ত্তা বলেন নাই, তিনি ঈশ্বরকেই বেদকর্ত্তা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বর হইতেই যে বেদের উদ্ভব, বেদাদি সকল শাস্ত্রই পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ; উপনিষদে ইহা কথিত হইয়াছে। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বর প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে মনের দ্বারা বেদের উপদেশ করেন এবং প্রথম উৎপন্ন ব্রহ্মা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন, ইহাও উপনিষদে কথিত হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৮শ শ্রুতিবাক্য এবং মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম শ্রুতিবাক্য দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বর প্রথমে যে, আদিকবি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে মনের দ্বারা বেদের উপদেশ করেন, ইহা শ্রুতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও কথিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বর হইতে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, পরে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-

---

১। "যদ্যপ্যর্থো নিত্যঃ, যাত্বসৌ বর্ণানুপূর্ব্বী সাঽনিত্যা" ইত্যাদি।—মহাভাষ্য। "মহাপ্রলয়াদিষু বর্ণানুপূর্ব্বী-বিনাশে পুনরুৎপদ্য ঋষয়ঃ সংস্কারাতিশয়াদ্বেদার্থং স্মৃত্বা শব্দরচনাং বিদধতীত্যর্থঃ"। "ততশ্চ কঠাদয়ো বেদানুপূর্ব্ব্যাঃ কর্ত্তার এব" ইত্যাদি।—কৈয়ট।

২। "ঋষিবচনাচ্চ, ঋষিবচনং বেদো যথা কিঞ্চিদিজ্যার্থং মধুরমাহরেদিতি।"—সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান, ৪০শ অঃ।।৮

বিশেষ কিরূপে বেদলাভ করিয়া, উহার প্রচার করিয়াছেন এবং পরে পরমেশ্বরের অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া পরাশরনন্দন (বেদব্যাস) কিরূপে বেদের বিভাগ করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ফল কথা, পুরাণ-বর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কোন কোন পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণকে বেদের বক্তা বলিলেও তাহাতে ঋষিগণই যে বেদের স্রষ্টা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকার ঋষিগণকে বেদের বক্তা বলিলেও স্রষ্টা বলেন নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে বেদের দ্রষ্টাও বলিয়াছেন, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। বেদের দ্রষ্টা বলিলে বেদ যে তাঁহাদিগেরই সৃষ্ট নহে, কিন্তু তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কাল-বিশেষে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় বেদ প্রতিভাত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। যাঁহারা বেদের দ্রষ্টা অর্থাৎ পরমেশ্বর যাঁহাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কালবিশেষে বেদ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা বেদের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "ঋষি" বলা হইয়াছে। "ঋষ" ধাতুর অর্থ দর্শন। সুতরাং "ঋষ" ধাতুনিষ্পন্ন "ঋষি" শব্দের দ্বারা দ্রষ্টা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে বেদের প্রথম দ্রষ্টা হিরণ্যগর্ভকেও ঋষি বলা যায়। এবং তাঁহার পরে যাঁহারা বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা হইয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে তাঁহারা বেদের ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও দ্রষ্টা ও বক্তা অর্থাৎ তাঁহার মতে বেদভিন্ন যে ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সংবাদ বেদ হইতেই পাওয়া যায়, বেদবক্তা ঋষিগণই ঐ ইতিহাসাদিরও দ্রষ্টা ও বক্তা। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রামাণ্য-বশতঃ যেমন বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত, তদ্রূপ ঐ সমস্ত ইতিহাসাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যও স্বীকার্য্য। কারণ, ঐ ইতিহাসাদির দ্রষ্টা ও বক্তা ঋষিগণকে যথার্থদ্রষ্টা ও যথার্থবক্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগের দৃষ্ট ও কথিত বেদেরও প্রামাণ্য হইতে পারে না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। মূল কথা, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বেদের স্রষ্টা বা শাস্ত্রযোনি পরমেশ্বরের প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য না বলিয়া, বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির প্রামাণ্যবশতঃই বেদের প্রামাণ্য বলিয়াছেন। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বেদের কর্ত্তা হইলেও ঐ বেদের দ্রষ্টা ও বক্তাদিগের প্রামাণ্য ব্যতীত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা বেদের যথার্থ দ্রষ্টা ও যথার্থ বক্তা না হইলে তাঁহাদিগের কথিত বেদের অপ্রামাণ্য অনিবার্য্য। তাই ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষ সূত্রে "আপ্ত" শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরকেই গ্রহণ না করিয়া, বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকেই গ্রহণ করিয়া-ছেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার সেখানে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তাদিগকে আয়ুর্ব্বেদাদিরও দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া, আয়ুর্ব্বেদাদির প্রামাণ্যের ন্যায় বেদেরও প্রামাণ্য, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র পঞ্চম স্তবকের শেষে বেদের পৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিতে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বেদের "কাঠক," "কালাপক" প্রভৃতি বহু নামে যে বহু শাখা আছে, ঐ সকল নামের দ্বারাও বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরই প্রথমে "কঠ" ও "কলাপ" প্রভৃতি নামক বহু ব্যক্তির শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ সমস্ত শাখা বলিয়াছেন। নচেৎ বেদের শাখার ঐ সমস্ত নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার মতে এক পরমেশ্বরই সকল বেদের কর্ত্তা হইলেও তিনি বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল বেদের সৃষ্টি করায় সেই সেই শরীরের ভেদ গ্রহণ করিয়া বহু আপ্ত ব্যক্তিকে বেদের কর্ত্তা বলা যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত মতানুসারে উক্ত তাৎপর্য্যেও বহু ব্যক্তিকে বেদের বক্তা বলিতে পারেন। তাহা হইলেও পরমেশ্বরই যে বেদের স্রষ্টা, এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকে। এ বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বোক্ত উভয় মতের আলোচনা করিয়া সামঞ্জস্য-প্রদর্শন করিতে যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৭-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী মীমাংসকসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, "কঠ," "কলাপ" ও "কুথুম" প্রভৃতি নামক অনেক ব্যক্তি বেদের শাখাবিশেষের প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহাদিগের নামানুসারেই ঐ সমস্ত শাখার "কাঠক," "কালাপক" ও "কৌথুম" প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়-মঞ্জরী"কার মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট একমাত্র ঈশ্বরই বেদের সর্ব্বশাখার কর্ত্তা, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা জয়ন্ত ভট্ট যে,উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ তিনি দেখিতে পান নাই, ইহা মনে হয়। কারণ, তিনি উক্ত বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের যুক্তির খণ্ডন বা আলোচনা করেন নাই। উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজ মত-সমর্থনে উদয়নাচার্য্যের যুক্তির খণ্ডন বা সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক হইলেও তিনি পূর্ণ বিচারক হইয়াও কেন তাহা করেন নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। জয়ন্ত ভট্ট বেদ সম্বন্ধে আরও অনেক বিচার করিয়া নিজ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার নিজ মতে অথর্ব্ববেদই সকল বেদের প্রথম। তিনি অথর্ব্ববেদের বেদত্ব সমর্থন করিতে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদ বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত নহে, উহা বেদ হইতে পৃথক্ শাস্ত্র, কিন্তু উহাও ঈশ্বর-প্রণীত, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "বৌদ্ধাধিকারে"র শেষ ভাগে আয়ুর্ব্বেদও ঈশ্বরকৃত, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, তদ্দৃষ্টান্তে বেদও ঈশ্বরকৃত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও সেখানে "বেদায়ুর্ব্বেদাদিঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ যে, বেদ হইতে পৃথক্ শাস্ত্র, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও অষ্টাদশ বিদ্যার পরিগণনায় বেদচতুষ্টয় হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতির পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য অনেক তত্ত্বের উপদেশ থাকিলেও প্রচলিত "চরকসংহিতা" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে মূল বেদ নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ সকল গ্রন্থের মূল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস যাহা ঐ সকল গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সেই আয়ুর্ব্বেদ নামক মূল শাস্ত্রও যে, বেদচতুষ্টয় হইতে পৃথক্ শাস্ত্র, কিন্তু উহাও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই উপদিষ্ট, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায়) কিছু আলোচনা করিয়াছি। বেদ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও যুক্তি-বিচারাদি "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট এবং "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থের শেষ ভাগে উদয়নাচার্য্য এবং "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থের শেষভাগে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের সকল কথা জানিতে পারিবেন।

মূলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঋষিগণকে বেদের বক্তা বলিলেও ঋষিগণই নিজ বুদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিশ্বাসী কোন পূর্ব্বাচার্য্যই ঐরূপ সিদ্ধান্ত বলিতে পারেন না। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ ও

শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতিরও ঐরূপ সিদ্ধান্ত অভিমত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারাও ঋষিগণকে বেদের বক্তা, এই তাৎপর্য্যেই বেদের কর্ত্তা বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বেদের উচ্চারণ-কর্ত্তৃত্বই ঋষিগণের বেদকর্ত্তৃত্ব, ইহাই তাঁহাদিগের অভিমত বুঝিতে হইবে। পরন্তু পরবর্ত্তী ঋষিগণ বেদানুসারে কর্ম্ম করিয়াই ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পূর্ব্বেও বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারা বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করায় বেদের প্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, এবং তাঁহারা বেদানুসারে কর্ম্ম করিয়া, ঐ সমস্ত কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলও লাভ করায় বেদ যে সত্যার্থ, ইহাও তখন হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরন্তু বেদে এমন বহু বহু অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণন আছে, যাহা প্রথমে সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানগোচর হইতেই পারে না। সুতরাং বেদ যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই প্রথমে সমুদ্ভূত, সুতরাং তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক যে, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের ন্যায় বেদও ঋষি-প্রণীত হইলে বেদকর্ত্তা ঋষিগণ, বেদ রচনার পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ, অনধীতশাস্ত্র ও বৈদিক তত্ত্বে সর্ব্বথা অজ্ঞ কোন ব্যক্তিই নিজ বুদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিতে পারেন না। ঋষিগণ তপস্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা বলিলেও তাঁহাদিগের ঐ তপস্যাও কোন শাস্ত্রোপদেশসাপেক্ষ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, প্রথমে কোনরূপ শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই শাস্ত্রমাত্র-গম্য তত্ত্বের জ্ঞানলাভ ও তজ্জন্য তপস্যাদি করিতে পারেন না। কিন্তু বেদের পূর্ব্বে আর যে কোন শাস্ত্র ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বেদই সর্ব্ববিদ্যার আদি, ইহা এখনও সকলেই স্বীকার করেন। পাশ্চাত্যগণের নানারূপ কল্পনায় সুদৃঢ় কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বেদ, স্মৃতি পুরাণাদির ন্যায় ঋষিপ্রণীত নহে, বেদ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতেই প্রথমে সমুদ্ভূত, তিনিই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, প্রথমে তাঁহাকে মনের দ্বারা বেদের উপদেশ করেন, পরে তাঁহা হইতে উপদেশপরম্পরাক্রমে ঋষিসমাজে বেদের প্রচার হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তই সম্ভব ও সমীচীন এবং উহাই আমাদিগের শাস্ত্র-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদ লাভ করিয়া, ক্রমে ঋষিপরম্পরায় বেদের মৌখিক উপদেশের আরম্ভ হয়। সুপ্রাচীন কালে ঐরূপেই বেদের রক্ষা ও সেবা হইয়াছিল। বেদ লিখিয়া উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি তখন ছিল না। বেদগ্রন্থ লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার প্রাচীন কালে ঋষিগণের মতে বেদবিদ্যার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরন্তু উহা বেদবিদ্যার ধ্বংসের কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। তাই মহাভারতে বেদবিক্রেতা ও বেদলেখকগণের বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে[১]। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে লিখিত বেদগ্রন্থ ও উহার ভাষ্যাদির সাহায্যে নিজে নিজে বেদের যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, ইহা প্রকৃত বেদবিদ্যালাভের উপায় নহে। ঐরূপ চর্চ্চার দ্বারা বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা যাইতে পারে না। যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলবাস ব্যতীত বেদবিদ্যালাভ হইতে পারে না। প্রাচীন ঋষিগণ ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত উপায়েই বেদবিদ্যালাভ করিয়া

১। বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাঞ্চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥—অনুশাসন পর্ব্ব। ২৩ অঃ, ৭২শ্লোক।

পরে ঐ বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক সকল মানবের মঙ্গলের জন্য স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রণীত ঐ সমস্ত শাস্ত্র বেদমূলক, সুতরাং বেদের প্রামাণ্যবশতঃই ঐ সমস্ত শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ঋষিপ্রণীত ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও মন্বাদি ঋষিগণ স্বয়ং অনুভব করিয়াও উপদেশ করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা অলৌকিক যোগশক্তির প্রভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াই সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ তত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন, ইহা সম্ভব; তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রণীত স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের বেদমূলকত্বই যুক্ত। বাচস্পতিমিশ্র মনুসংহিতার বচন[1] উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঋষি-প্রণীত স্মৃত্যাদি শাস্ত্র যে বেদমূলকত্ববশতঃই প্রমাণ, উহার স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই, ইহা ঋষিগণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে স্মৃতিপ্রামাণ্য বিচারে "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং" (১।৩।৩) এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য এবং শ্রুতির অবিরুদ্ধ স্মৃতির শ্রুতিমূলকত্ববশতঃই প্রামাণ্য, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামী শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন উহা স্বীকার করেন নাই। তিনি শবরস্বামীর উদ্ধৃত স্মৃতির সহিত শ্রুতির বিরোধ পরিহার করিয়া, শবরস্বামীর মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি যখন "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" এই বাক্যের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অবশ্যই আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শবরস্বামী শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির আরও অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেগুলিও বিচার করিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও জৈমিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া, উহার দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য যে, আর্ষ সিদ্ধান্ত, উহা তাঁহার নিজের কল্পিত নহে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, ঋষিপ্রণীত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের যে, বেদমূলকত্ববশতঃই প্রামাণ্য, ইহাই আর্ষ সিদ্ধান্ত। সুতরাং "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি কোন কোন পূর্ব্বাচার্য্য মন্বাদি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য সমর্থন করিলেও উক্ত সিদ্ধান্ত ঋষিমত-বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। জয়ন্তভট্টও শেষে উক্ত নবীন সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের বেদমূলকত্ববশতঃই প্রামাণ্য, এই প্রাচীন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং শৈবশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকেও ঈশ্বরবাক্য ও বেদের অবিরুদ্ধ বলিয়া, ঐ উভয়েরও প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য তিনিও স্বীকার করেন নাই।

১। "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ ॥"
"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥"—মনুসংহিতা, ২য় অঃ, ৬।৭।

জয়ন্ত ভট্ট শেষে পূর্ব্বকালে বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাসী আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে যে, বৌদ্ধাদি শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য সমর্থন করিতেন, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বুদ্ধ ও অর্হৎ প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুই বুদ্ধাদিরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি ভগবদ্গীতাবাক্যের দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বুদ্ধপ্রভৃতির বাক্যও ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া বেদবৎ প্রমাণ। তাঁহারা অধিকারিবিশেষের জন্যই বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন। বেদেও অধিকারিবিশেষের জন্য পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ উপদেশ আছে। সুতরাং একই ঈশ্বরের পরস্পর বিরুদ্ধার্থ নানাবিধ বাক্য থাকিলেও উহার অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যসমর্থক অপর এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বৌদ্ধাদি শাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য নহে, কিন্তু উহাও স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের ন্যায় বেদমূলক। সুতরাং উহারও প্রামাণ্য আছে। মনুসংহিতার "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ" ইত্যাদি বচনে যেমন "মনু" শব্দের দ্বারা স্মৃতিকার অত্রি, বিষ্ণু, হারীত ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিকেও গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধপ্রভৃতিকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহারাও অধিকারিবিশেষের জন্য বেদার্থেরই উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত উপদেশও বেদমূলক স্মৃতিবিশেষ। সুতরাং মন্বাদি স্মৃতির ন্যায় উহারও প্রামাণ্য আছে। জয়ন্ত ভট্ট বিচারপূর্ব্বক উক্ত উভয় পক্ষেরই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার নিজমতের সংস্থাপন করায় অনাবশ্যক বোধে ও গ্রন্থগৌরবভয়ে শেষে আর উক্ত মতের খণ্ডন করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শেষে যে, বেদবাহ্য বৌদ্ধাদি শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া স্বাধীন চিন্তা ও উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়া বেদবাহ্য বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিচারের উপসংহারে "তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তানামেব প্রামাণ্যমাগমানাং ন তু বেদবাহ্যানামিতি স্থিতং" এই বাক্যের দ্বারা যে নিজ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহার নিজমতে যে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। পরন্তু তিনি পূর্ব্বে তাঁহার নিজমত সমর্থন করিতে "তথা চৈতে বৌদ্ধাদয়োঽপি দুরাত্মানঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়কে কিরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা আবশ্যক ("ন্যায়মঞ্জরী", ২৬৬—৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরন্তু জয়ন্ত ভট্ট "ন্যায়মঞ্জরী"র প্রারম্ভে (চতুর্থ পৃষ্ঠায়) বৌদ্ধদর্শন বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের অন্তর্গত হইতেই পারে না, ইহাও অসংকোচে স্পষ্ট বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই বুঝা যায় না। পরন্তু বৌদ্ধাদি শাস্ত্রও বেদমূলক, এই পূর্ব্বোক্ত মত স্বীকার করিলে তুল্যভাবে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্রকেই বেদমূলক বলা যায়। অর্থাৎ অধিকারিবিশেষের জন্যই বেদ হইতেই ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, বেদবাহ্য কোন ধর্ম্ম বা শাস্ত্র নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়। জয়ন্ত ভট্টও এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া, তদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন সম্প্রদায়ই স্বীকার

করেন না। কারণ, পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়ই নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঐ শাস্ত্রকর্ত্তার লোভ-মোহ-মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অন্য কেহ তাহা বলিলে অপরেও তদ্রূপ, অন্য শাস্ত্রকে কর্ত্তার লোভ-মোহ-মূলক বলিতে পারেন। সুতরাং এ বিবাদের মীমাংসা কিরূপে হইবে? জয়ন্ত ভট্টই বা পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে উহার সর্ব্বসম্মত উত্তর আর কি বলিবেন? ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ বৈদিক-ধর্ম্মরক্ষক পরম আস্তিক জয়ন্ত ভট্টের মতেও বৌদ্ধাদি শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ নহে। কারণ, বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্রের প্রামাণ্য ঋষিগণ স্বীকার করেন নাই। বেদবাহ্য সমস্ত স্মৃতি ও দর্শন নিষ্ফল, অর্থাৎ উহার প্রামাণ্য নাই, ইহা ভগবান্ মনুও স্পষ্ট বলিয়াছেন[১]। সুতরাং মনুর সময়েও যে বেদবাহ্য শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, এবং উহা তখন আস্তিক সমাজে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। সুতরাং জয়ন্ত ভট্টও মনুমত-বিরুদ্ধ কোন মতের গ্রহণ করিতে পারেন না।

এখন প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, এই "অপবর্গ-পরীক্ষাপ্রকরণে" মহর্ষি গোতম প্রথম পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় অপবর্গ অসম্ভব। ভাষ্যকার ঐ প্রথম পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষির তাৎপর্য্যানুসারে বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষেই শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় মোচনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং প্রকৃত বৈরাগ্য-বশতঃ শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে তখন আর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "ঋণানুবন্ধ" না থাকায় অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময় ও অধিকার আছে; অতএব অপবর্গ অসম্ভব নহে। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম যদি বেদবিহিত না হয়, যদি একমাত্র গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমই নাই, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সমাধান কোনরূপে সম্ভব হয় না। তাই ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সমাধান সমর্থন করিতে নিজেই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম যে বেদ-বিহিত, ইহা নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও চতুরাশ্রমেরই বিধান আছে বলিয়া তদ্দ্বারাও নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন এবং উহা সমর্থন করিতে ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও যে প্রামাণ্য আছে, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন।

এখানে ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত "প্রধানশব্দানুপপত্তেঃ" ইত্যাদি (৫৯ম) সূত্রের ভাষ্যে প্রথমে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষেই "ঋণানুবন্ধ" সমর্থন করায় বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াও কোন অধিকারিবিশেষ মোক্ষার্থ শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তখন তাঁহার পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা না থাকায় মোক্ষার্থ অনুষ্ঠান অসম্ভব নহে। চিরকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সুসম্ভবই হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে

১। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥—মনুসংহিতা, ১২শ অ, ৯৫॥

থাকিয়াও অধিকারিবিশেষের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ হইতে পারে। প্রকৃত অধিকারী হইলে যে কোন আশ্রমে থাকিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষ-লাভে সন্ন্যাসাশ্রম নিয়ত কারণ নহে, ইহাও সুপ্রাচীন মত আছে। শারীরকভাষ্য ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উক্ত সুপ্রাচীন মতের বিশদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত যে, মুক্তি হইতে পারে না, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের প্রারম্ভে "ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" এই শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মসংস্থ" শব্দের অর্থ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী এবং ঐ অর্থেই ঐ শব্দটি রূঢ়, ইহা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সন্ন্যাসাশ্রমীই অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন, অন্যান্য আশ্রমিগণ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, এই সিদ্ধান্তই উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অবশ্য বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্য শঙ্করের ঐ মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, যখন তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে শ্রুতির দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, তখন মোক্ষলাভে সন্ন্যাসাশ্রম যে, নিয়ত কারণ, ইহা কখনই শ্রুতির সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, অধিকারিবিশেষের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীতও মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত যে, কাহারই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেই পারে না, ইহা স্বীকার করা যায় না। গৃহস্থাশ্রমী রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইহা উপনিষদের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। নচেৎ তাঁহারা অপরকে তত্ত্বজ্ঞানের চরম উপদেশ করিতে পারেন না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ গৃহস্থাশ্রমীও যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, ইহা সংহিতাকার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই বলিয়াছেন[১]। "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষে উক্ত মত সমর্থন করিতে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরও অনেক আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়া গৃহস্থেরও মুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু মনুসংহিতার শেষে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে, যে কোন আশ্রমে বাস করিয়াও ইহলোকেই মুক্তি (জীবন্মুক্তি) লাভ করেন, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে[২]। উক্ত বচনে "ব্রহ্মভূয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়া চরম মুক্তিই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত যে মুক্তি হইতে পারে না, এই মত সকলে স্বীকার করেন নাই।

সে যাহাই হউক, মূলকথা সন্ন্যাসাশ্রমও বেদবিহিত। জাবাল উপনিষদে উহার স্পষ্ট বিধিবাক্য আছে। নারদপরিব্রাজক উপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ ও কঠরুদ্রোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে সন্ন্যাসীর প্রকারভেদ ও কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতি সমস্তই কথিত হইয়াছে। মন্বাদিসংহিতাতেও উহা

১। ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, অধ্যাত্মপ্রকরণ, ১০৫ শ্লোক।

২। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥—মনুসংহিতা, ১২শ অঃ, ১০২ শ্লোক॥

কথিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার অপরার্ক উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের বিংশ স্ত্রের ভাষ্যভামতীর টীকা "বেদান্তকল্পতরু" ও উহার "কল্পতরুপরিমল" টীকায় নানা প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক ঐ সমস্ত বিষয়ের সবিস্তর বর্ণন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার আছে। কমলাকর ভট্টকৃত "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থের শেষভাগে সন্ন্যাসীর প্রকার-ভেদ ও সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি-পদ্ধতি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। কাশীধাম হইতে মুদ্রিত "যতিধর্ম্মনির্ণয়" নামক সংগ্রহগ্রন্থে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য নানা শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত লিখিত হইয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে সকল কথা জানিতে পারিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ও লক্ষণাদি "বৃহৎশঙ্করবিজয়" ও "মঠাম্নায়" প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত আছে[১]। "মঠাম্নায়" পুস্তকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সংস্থাপিত জ্যোতির্ম্মঠ (জোশীমঠ), শারদামঠ, শৃঙ্গেরী মঠ ও গোবর্দ্ধন মঠের পরিচয়াদি এবং শঙ্করাচার্য্যের "মহানুশাসন"ও আছে। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণই ভারতে সন্ন্যাসীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্তের প্রচার ও রক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাই অপর অধিকারী শিষ্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর পুরী ও কেশবভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ইহা কোন কোন পুস্তকে লিখিত হইলেও পুরী ও ভারতী, এই নামদ্বয় যে, শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট দশ নামেরই অন্তর্গত, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। এবং শ্রীচৈতন্যদেব যে রামানন্দ রায়ের নিকটে "আমি হই মায়াবাদী সন্ন্যাসী" এই কথা কেন বলিয়াছিলেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা বুঝিয়াছি যে, দশনামী সন্ন্যাসী-দিগের মধ্যেই পরে অনেকে নিজের অনধিকার বুঝিতে পারিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বহু বক্তব্য আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিলাম না ॥ ৬১ ॥

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ক্লেশানুবন্ধস্যাবিচ্ছেদাদিতি—

অনুবাদ। আর এই যে, "ক্লেশানুবন্ধে"র অবিচ্ছেদবশতঃ (অপবর্গের অভাব), ইহা বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন),—

সূত্র। সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশাভাবাদপবর্গঃ ॥৬২॥ ॥৪০৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন না হওয়ায় ক্লেশের অভাব-প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তপ্রযুক্ত অপবর্গ (সিদ্ধ হয়)।

১। তীর্থাশ্রম-বনারণ্য-গিরি-পর্ব্বত-সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতীচ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ ॥—"বৃহৎশঙ্করবিজয়" ও "মঠাম্নায়" প্রভৃতি।

ভাষ্য। যথা সুষুপ্তস্য খলু স্বপ্নাদর্শনে রাগানুবন্ধঃ সুখদুঃখানুবন্ধশ্চ বিচ্ছিদ্যতে তথাঽপবর্গেঽপীতি। এতচ্চ ব্রহ্মবিদো মুক্তস্যাত্মনো রূপমুদাহরন্তীতি।

অনুবাদ। যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন না হওয়ায় (তৎকালে) রাগানুবন্ধ ও সুখদুঃখের অনুবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ মুক্তি হইলেও বিচ্ছিন্ন হয়। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইহাই মুক্ত আত্মার স্বরূপ উদাহরণ করেন অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থাকেই মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর "ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব" এই প্রথম কথার খণ্ডন করিয়া, ক্রমানুসারে "ক্লেশানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব", এই দ্বিতীয় কথার খণ্ডন করিতে এই সূত্রটি বলিয়াছেন। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশের যে কখনই উচ্ছেদ হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। কারণ, সুষুপ্তিকালে স্বপ্নদর্শন না হওয়ায় তখন যে, রাগ-দ্বেষাদি ও সুখদুঃখাদি কিছুই থাকে না, তখন রাগাদির বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নাবস্থাতেও রাগাদি ক্লেশ ও সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু নিদ্রিত হইলে যে অবস্থায় স্বপ্নদর্শনও হয় না, সেই 'সুষুপ্তি' নামক অবস্থাবিশেষে কোনরূপ জ্ঞান বা রাগাদির উৎপত্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সেই অবস্থাতেও স্বপ্নদর্শনাদি হইত। সুতরাং সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনও না হওয়ায় তখন তাহার যে, জ্ঞান ও রাগ-দ্বেষাদি কিছুই জন্মে না, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে মুক্তিকালেও সেই মুক্ত পুরুষের রাগাদি ক্লেশানুবন্ধের বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ তখন তাঁহার রাগাদি কিছুই থাকে না ও জন্মে না, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। মহর্ষি এই সূত্রে সুষুপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও শেষে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সুষুপ্ত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত স্বরূপকেই মুক্ত আত্মার স্বরূপের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মুক্ত আত্মার স্বরূপ কি ? মুক্তি হইলে তখন মুক্ত ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হয় ? এইরূপ প্রশ্ন করিলে লৌকিক ব্যক্তিদিগকে উহা আর কোনরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ লোকসিদ্ধ সুষুপ্তি অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন রাগাদি কোন ক্লেশ থাকে না, তদ্রূপ মুক্তি হইলেও তখন মুক্ত পুরুষের রাগাদি ক্লেশ থাকে না। কিন্তু দৃষ্টান্ত কখনই সর্ব্বাংশে সমান হয় না, সুষুপ্তি অবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার যে বিশেষ আছে, তাহাও বুঝা আবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মুক্তাবস্থায় পূর্ব্বোৎপন্ন রাগাদি ক্লেশের সংস্কারও থাকে না। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা ও প্রলয়াবস্থাতে রাগাদি ক্লেশের বিচ্ছেদ হইলেও উহার সংস্কার থাকে। তাই ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার ঐ ক্লেশের উদ্ভব হয় ; কিন্তু মুক্তি হইলে আর কখনও রাগাদি ক্লেশের উদ্ভব হয় না, ইহাই বিশেষ। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় রাগাদি ক্লেশের যে উচ্ছেদ হয়, এই অংশেই মুক্তাবস্থার সহিত উহার সাদৃশ্য

থাকায় উহা মুক্তাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য প্রলয়াবস্থাতেও রাগাদি ক্লেশের উচ্ছেদ হয়, কিন্তু উহা লোকসিদ্ধ নহে, লৌকিক ব্যক্তিগণ উহা অবগত নহে। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা লোকসিদ্ধ, তাই উহাই দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদাদিশাস্ত্রে অন্যত্রও সুষুপ্তি অবস্থা মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। "সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"—(৫।১১৬) এই সাংখ্যসূত্রেও সমাধি অবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রথমে মোক্ষাবস্থার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই উপনিষদেও সুষুপ্তির বর্ণন হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে যে স্বপ্নদর্শনও হয় না, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে "তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্বরূপ ও ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উনবিংশ শ্রুতি-বাক্যের শেষে "অতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীত" এই বাক্যের দ্বারা বৈদান্তিক সম্প্রদায় সুষুপ্তিকালে দুঃখশূন্য আনন্দাবস্থারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দের অতিঘ্নী অবস্থা বলিতে সর্ব্বপ্রকার আনন্দনাশিনী অর্থাৎ-সুখদুঃখশূন্য অবস্থাও বুঝা যায়। তদনুসারে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সুষুপ্তিকালে আত্মার ঐরূপ অবস্থাই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সুষুপ্তিকালে কোনরূপ জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি জন্মে না। সুতরাং ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি সকলেই (মহর্ষি গোতমের এই সূত্রে সুষুপ্তি অবস্থা মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে কথিত হওয়ায়) সুষুপ্তির ন্যায় মোক্ষেও আত্মার কোন জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি জন্মে না, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মুক্ত ব্যক্তির যে সুখদুঃখানুবন্ধেরও উচ্ছেদ হয়, ইহা এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারও স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে বিশেষ বিচার করিয়া, মোক্ষাবস্থায় নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়দর্শনকার গোতমের মতে যে, মোক্ষাবস্থায় আনন্দানুভূতিও হয়, এইরূপ মতও পাওয়া যায়। এই প্রকরণের ব্যাখ্যার শেষে উক্ত মতের আলোচনা করিব ॥৬২॥

ভাষ্য। যদপি "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধা'দিতি—

অনুবাদ। আর যে প্রবৃত্তির অনুবন্ধবশতঃ (অপবর্গের অভাব), ইহা বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন),—

সূত্র। ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্য ॥৬৩॥ ॥৪০৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) 'হীনক্লেশ' অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহশূন্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি (কর্ম্ম) প্রতিসন্ধানের নিমিত্ত অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত হয় না।

ভাষ্য। **প্রক্ষীণেষু রাগদ্বেষমোহেষু প্রবৃত্তির্ন প্রতিসন্ধানায়।**

প্রতিসন্ধিস্তু পূর্ব্বজন্মনিবৃত্তৌ পুনর্জ্জন্ম, তচ্চ তৃষ্ণাকারিতং, তস্যাং প্রহীণায়াং পূর্ব্বজন্মাভাবে জন্মান্তরাভাবোঽপ্রতিসন্ধানমপবর্গঃ। কর্ম্মবৈফল্য-প্রসঙ্গ ইতি চেন্ন, কর্ম্ম-বিপাকপ্রতিসংবেদনস্যাপ্রত্যাখ্যানাৎ পূর্ব্বজন্ম-নিবৃত্তৌ পুনর্জ্জন্ম ন ভবতীত্যুচ্যতে, নতু কর্ম্মবিপাকপ্রতিসংবেদনং প্রত্যাখ্যায়তে, সর্ব্বাণি পূর্ব্বকর্ম্মাণি হ্যন্তে জন্মনি বিপচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। রাগ, দ্বেষ ও মোহ (ক্লেশ) বিনষ্ট হইলে "প্রবৃত্তি" (কর্ম্ম) "প্রতিসন্ধানে"র নিমিত্ত অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত হয় না। (তাৎপর্য্য) "প্রতিসন্ধি" অর্থাৎ সূত্রোক্ত প্রতিসন্ধান কিন্তু পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম, তাহা তৃষ্ণা-জনিত, সেই তৃষ্ণা বিনষ্ট হইলে পূর্ব্বজন্মের অভাবে জন্মান্তরের অভাবরূপ অপ্রতি-সন্ধান (অর্থাৎ) অপবর্গ হয়।

(পূর্ব্বপক্ষ) কর্ম্মের বৈফল্য-প্রসঙ্গ হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) না অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্মবিপাকপ্রতিসংবেদনের অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগের প্রত্যাখ্যান (নিষেধ) হয় নাই। বিশদার্থ এই যে, পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মফলের ভোগ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, যে হেতু সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্ম শেষ জন্মে বিপক্ব (সফল) হয়, অর্থাৎ যে জন্মে মুক্তি হয়, যে জন্মের পরে আর জন্ম হয় না, সেই চরম জন্মেই সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্মের ফলভোগ হওয়ায় কর্ম্মের বৈফল্যের আপত্তি হইতে পারে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর তৃতীয় কথা এই যে, "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"বশতঃ কাহারই মুক্তি হইতে পারে না। প্রবৃত্তি বলিতে এখানে শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিই বিবক্ষিত। তাৎপর্য্য এই যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল মানবই যথাসম্ভব বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা শুভ ও অশুভ কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছে, সুতরাং উহার ফল ভোগের জন্য সকলেরই পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী; অতএব মুক্তি কাহারই হইতে পারে না, মুক্তির আশাই নাই। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম সম্পাদন করে না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কাহারই মুক্তি হয় না, সুতরাং যাঁহার মুক্তি হইবে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য জন্মিবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন মিথ্যাজ্ঞান বা মোহ বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন তাঁহার আর রাগ ও দ্বেষও জন্মিবে না। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশ না থাকিলে তখন সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্ম তাঁহার পুনর্জ্জন্মের কারণ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে যে পুনর্জ্জন্ম, তাহা তৃষ্ণাজনিত অর্থাৎ রাগ বা বিষয়তৃষ্ণা উহার নিমিত্ত।

সুতরাং যাঁহার ঐ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ঐ নিমিত্তের অভাবে আর উহার কার্য্য যে পুনর্জ্জন্ম, তাহা কথনই হইতে পারে না ; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বজন্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান সেই জন্মের পরে আর যে জন্মান্তর না হওয়া, তাহাকে অপ্রতিসন্ধান বলা হয় এবং উহাকেই অপবর্গ বলে। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হওয়ায় বিষয়তৃষ্ণারূপ রাগের উৎপত্তি হইতেই পারে না, সুতরাং পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা সংসারের নিদান, উহার উচ্ছেদ হইলে মূলোচ্ছেদ হওয়ায় আর সংসার বা জন্মপরিগ্রহ কোনরূপেই সম্ভব নহে। অবিদ্যাদি ক্লেশ বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্তই যে কর্ম্মের ফল "জাতি", "আয়ু" ও "ভোগ"-লাভ হয়, ইহা মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন। যোগদর্শনভাষ্যকার ব্যাসদেব উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ অনেক স্থানে প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মরণাত্মক জ্ঞান অর্থেও "প্রতিসন্ধান" ও "প্রতিসন্ধি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সূত্রোক্ত "প্রতিসন্ধান" শব্দের ঐরূপ অর্থ সংগত হয় না। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, "প্রতিসন্ধি" কিন্তু পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম। অর্থাৎ সূত্রে "প্রতিসন্ধান" শব্দের অর্থ কিন্তু এখানে পুনর্জ্জন্ম ; উহাকে "প্রতিসন্ধি"ও বলা হয়। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই সূত্রোক্ত "প্রতিসন্ধান" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এখানে সমানার্থক "প্রতিসন্ধি" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়েও এক স্থলে পুনর্জ্জন্ম অর্থেই যে, "প্রতিসন্ধি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা এখানে তাঁহার "প্রতিসন্ধি" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় (তৃতীয় খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার অভিনব শরীরের সহিত আত্মার যে বিলক্ষণ সংযোগ, তাহাকে পুনঃ সংযোগ বলিয়া "প্রতিসন্ধান" বলা যায়। ফলতঃ উহাই পুনর্জ্জন্ম, সুতরাং ঐ "প্রতিসন্ধান" না হইলে উহার অভাব অর্থাৎ অপ্রতিসন্ধানকে অপবর্গ বলা যায়। কারণ, পুনর্জ্জন্ম না হইলেই অপবর্গ সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যদি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির রাগাদির উচ্ছেদ হওয়ায় আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বৈফল্যের আপত্তি হয়। কারণ, তিনি যে সকল কর্ম্মের ফলভোগ করেন নাই, তাহার ফলভোগের আর সম্ভাবনা না থাকায় উহা ব্যর্থই হইবে। তবে কি তাঁহার পক্ষে ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ হইবেই না, ইহাই বলিবে ? ভাষ্যকার শেষে এই কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, না। কর্ম্মের যে "বিপাক" অর্থাৎ ফল, তাহার "প্রতিসংবেদন" অর্থাৎ ভোগের প্রত্যাখ্যান বা নিষেধ করা হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে কোন্ সময়ে তাঁহার ঐ কর্ম্মফল ভোগ হইবে ? পুনর্জ্জন্ম না হইলে উহা কিরূপে সম্ভব হয় ? এ জন্য ভষ্যকার শেষে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চরম জন্মেই ঐ সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ ফলভোগ হয়।

১। "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ"। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" (যোগদর্শন, সাধনপাদ, ১২শ ও ১৩শ সূত্র) এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাসভাষ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার সেই চরম জন্মেই তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন, এবং সেই কর্ম্মফলভোগের জন্যই তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও জীবিত থাকেন, এবং তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও নানা দুঃখ ভোগ করেন। অনেকে শীঘ্র নির্ব্বাণ লাভের ইচ্ছায় যোগবলে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অবশ্য-ভোগ্য সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করেন ; তৃতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও ইহা বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ২৩১-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, যে জন্মে তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়, সেই জন্মেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। কর্ম্মের বৈফল্যও হয় না। ভাষ্যকার এখানে তত্ত্বজ্ঞানীর অভুক্ত সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মকেই গ্রহণ করিয়া চরম জন্মে উহার ফলভোগ হয়, ইহা বলিয়াছেন। কারণ, সঞ্চিত পূর্ব্বকর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই বিনাশ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের পরে তাহার ফলভোগের সম্ভাবনা নাই এবং তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য সেই সমস্ত কর্ম্মের বৈফল্য স্বীকৃত সিদ্ধান্তই হওয়ায় উহার বৈফল্যের আপত্তি অনিষ্টাপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও যে কর্ম্মের ফলভোগ ব্যতীত ক্ষয় নাই, ইহা কথিত হইয়াছে, উহা প্রারব্ধ কর্ম্ম নামে উক্ত হইয়াছে। উহা তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য নহে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি চরম জন্মেই তাঁহার অভুক্ত অবশিষ্ট ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ করেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্মের বিনাশ হওয়ায় উহার ফলভোগ করিতে হয় না, সুতরাং প্রারব্ধ ভোগান্তে তাঁহার অপবর্গ অবশ্যম্ভাবী ॥৬৩॥

সূত্র। ন ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ॥৬৪॥৪০৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতে পারে না ; কারণ, ক্লেশের সন্ততি (প্রবাহ) স্বাভাবিক, অর্থাৎ উহা জীবের স্বভাব-প্রবৃত্ত অনাদি।

ভাষ্য। নোপপদ্যতে ক্লেশানুবন্ধবিচ্ছেদঃ, কস্মাৎ ? ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ, অনাদিরিয়ং ক্লেশসন্ততিঃ ন চানাদিঃ শক্য উচ্ছেত্তুমিতি।

অনুবাদ। ক্লেশানুবন্ধের বিচ্ছেদ উপপন্ন হয় না। কেন ? (উত্তর) যে হেতু, ক্লেশের প্রবাহ স্বাভাবিক, (তাৎপর্য্য) এই ক্লেশপ্রবাহ অনাদি, কিন্তু অনাদি পদার্থকে উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়া, এখন আবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ক্লেশের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতেই পারে না। কারণ, ক্লেশের প্রবাহ স্বাভাবিক। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, সুষুপ্তি অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া মোক্ষাবস্থায় যে ক্লেশের উচ্ছেদ সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা কোনমতেই সম্ভব নহে। কারণ, জীবের রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ যে ক্লেশ,

উহার সাময়িক উচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত উচ্ছেদ অর্থাৎ চিরকালের জন্য একেবারে উচ্ছেদ অসম্ভব। কারণ, ঐ ক্লেশের প্রবাহ স্বাভাবিক। রাগের পরে রাগ, দ্বেষের পরে দ্বেষ, এবং মোহের পরে মোহ এবং মোহের পরে রাগ, রাগের পরে মোহ ইত্যাদি প্রকারে জায়মান যে রাগাদি ক্লেশের প্রবাহ, উহা সর্ব্বজীবেরই স্বভাবপ্রবৃত্ত অনাদি। অনাদি পদার্থকে বিনষ্ট করা যায় না। অনাদি কাল হইতে স্বভাবতঃই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে রাগাদি ক্লেশের প্রবাহ সর্ব্বজীবেরই উৎপন্ন হইতেছে, তাহার যে কোনকালে একেবারে উচ্ছেদ হইবে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। পরন্তু যাহা যে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে সেই বস্তুরও অত্যন্ত উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়। জলের শীতলত্ব, অগ্নির উষ্ণত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে জল ও অগ্নিরও সত্তা থাকিতে পারে না। কিন্তু মুক্তি হইলেও আত্মার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না। সুতরাং তখন তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম রাগাদি ক্লেশের অত্যন্ত উচ্ছেদ কিরূপে বলা যায়? ইহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "স্বাভাবিক" শব্দের দ্বারা অনাদি, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায় ॥৬৪॥

ভাষ্য। অত্র কশ্চিৎ পরীহারমাহ—

অনুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষে কেহ পরীহার (সমাধান) বলিয়াছেন,—

সূত্র। প্রাগুৎপত্তেরভাবানিত্যত্ববৎ স্বাভাবিকেঽপ্যনিত্যত্বং ॥৬৫॥৪০৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তির পূর্ব্বে অভাবের ("প্রাগভাব" নামক অভাব পদার্থের) অনিত্যত্বের ন্যায় স্বাভাবিক পদার্থেও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাগাদি ক্লেশ-প্রবাহেরও অনিত্যত্ব হয়।

ভাষ্য। যথাঽনাদিঃ প্রাগুৎপত্তেরভাব উৎপন্নেন ভাবেন নিবর্ত্ত্যতে এবং স্বাভাবিকী ক্লেশসন্ততিরনিত্যেতি।

অনুবাদ। যেমন উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অনাদি অভাব অর্থাৎ "প্রাগভাব", উৎপন্ন ভাব পদার্থ (ঘটাদি) কর্ত্তৃক বিনাশিত হয়, অর্থাৎ উহা অনাদি হইয়াও অনিত্য, এইরূপ স্বাভাবিক (অনাদি) হইয়াও ক্লেশপ্রবাহ অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, ইহা অপরের সমাধান বলিয়াই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন। মহর্ষির নিজের সমাধান শেষ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। এখানে উত্তরবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি পদার্থ হইলেই যে, তাহার কখনও বিনাশ হয় না, এইরূপ নিয়ম নাই। কারণ, প্রাগভাব পদার্থ অনাদি হইলেও তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ঘটাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, উহার নাম

প্রাগভাব, উহা অনাদি। কারণ, ঐ অভাবের উৎপত্তি না থাকায় উহা কখনই সাদি পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ প্রাগভাব উহার প্রতিযোগী ঘটাদি পদার্থ উৎপন্ন হইলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর উহা থাকে না। এইরূপ রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তখন উহার বিনাশ হয়, তখন কারণের অভাবে আর ঐ ক্লেশসন্ততির উৎপত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং অনাদি প্রাগভাবের অনিত্যত্বের ন্যায় অনাদি ক্লেশসন্ততিরও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত ॥৬৫॥

ভাষ্য। অপর আহ—

অনুবাদ। অপর কেহ বলেন—

সূত্র। অণুশ্যামতাঽনিত্যত্বদ্বা ॥৬৬॥৪০৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) অথবা পরমাণুর শ্যাম রূপের অনিত্যত্বের ন্যায় (ক্লেশসন্ততি অনিত্য)।

ভাষ্য। যথাঽনাদিরণুশ্যামতা, অথচাগ্নিসংযোগাদনিত্যা, তথা ক্লেশ-সন্ততিরপীতি।

সতঃ খলু ধর্ম্মো নিত্যত্বমনিত্যত্বঞ্চ, তত্ত্বং ভাবেঽভাবে ভাক্তমিতি। অনাদিরণুশ্যামতেতি হেত্বভাবাদযুক্তং। অনুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যমিতি নাত্র হেতুরস্তীতি।

অনুবাদ। যেমন পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি, অথচ অগ্নিসংযোগপ্রযুক্ত অনিত্য অর্থাৎ অগ্নিসংযোগজন্য উহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ ক্লেশসন্ততিও অনিত্য, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহারও বিনাশ হয়।

ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভাব পদার্থে তত্ত্ব অর্থাৎ মুখ্য, অভাব পদার্থে ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ। পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি, ইহা হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রমাণ না থাকায় অযুক্ত। অনুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ অনিত্য, ইহা বলিলেও এই বিষয়ে হেতু (প্রমাণ) নাই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে প্রাগভাব পদার্থকে দৃষ্টান্ত করিয়া মহর্ষি একপ্রকার সমাধান বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রাগভাব পদার্থে এবং উহার দৃষ্টান্তত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকায় মহর্ষি পরে এই সূত্রে ভাব পদার্থকেই দৃষ্টান্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাধানের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহাও অপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সমাধান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উত্তরবাদীর কথা এই যে, পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি হইলেও যেমন অগ্নিসংযোগজন্য উহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ ক্লেশসন্ততি অনাদি

হইলেও তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত উহারও বিনাশ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি ভাব পদার্থের কখনই বিনাশ হয় না—এইরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না। কারণ, পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের বিনাশ হইয়া থাকে। পরমাণু নিত্য পদার্থ, সুতরাং অনাদি। তাহা হইলে শ্যামবর্ণ পার্থিব পরমাণুর যে শ্যাম রূপ, তাহাও অনাদিই বলিতে হইবে। কারণ, পার্থিব পরমাণু কোন সময়েই রূপশূন্য থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে উত্তরবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "যদেতচ্ছ্যামং রূপং তদন্নস্য" এই শ্রুতিবাক্যে "অন্ন"শব্দের দ্বারা মৃত্তিকা বা পৃথিবীই বিবক্ষিত, সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি, ইহা বুঝা যায়।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে এখানে পূর্ব্বোক্ত অপরের সমাধানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম, সুতরাং উহা ভাব পদার্থেই মুখ্য, অভাব পদার্থে গৌণ। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম উত্তরবাদী যে, প্রাগভাবের অনিত্যত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রাগভাবে বস্তুতঃ অনিত্যত্ব ধর্ম্মই নাই। প্রাগভাবের উৎপত্তি না থাকায় উহাতে মুখ্য অনিত্যত্ব নাই। কিন্তু প্রাগভাবের বিনাশ থাকায় অনিত্য ঘট পটাদির সহিত উহার বিনাশিত্বরূপ সাদৃশ্য আছে, এই জন্য প্রাগভাবে অনিত্যত্বের ব্যবহার হয়। এইরূপ প্রাগভাবের উৎপত্তি বা কারণ না থাকায় কারণশূন্য নিত্য পদার্থের সহিতও উহার সাদৃশ্য আছে। এই জন্য উহাতে নিত্যত্বেরও ব্যবহার হয়। কিন্তু ঐ অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব উহাতে "তত্ত্ব" অর্থাৎ মুখ্য নহে, উহা পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত, এ জন্য উহা "ভাক্ত" অর্থাৎ গৌণ। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিত্যত্বসাধক অনুমানে ব্যভিচার নিরাস করিতে "তত্ত্বভাক্তয়োঃ" ইত্যাদি (১৫শ) সূত্রে "তত্ত্ব" ও "ভাক্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণ-নিত্যত্বের প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে "ধ্বংস"নামক অভাব পদার্থে মুখ্যনিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং "প্রাগভাব" নামক অভাব পদার্থেও তিনি মুখ্যনিত্যত্বের ন্যায় মুখ্য অনিত্যত্বও স্বীকার করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই আছে, তাহাতেই মুখ্য অনিত্যত্ব থাকায় প্রাগভাবে উহা নাই। সুতরাং প্রাগভাব অনাদি হইলেও উহার অনিত্যত্ব না থাকায় উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত উত্তরবাদী যদি প্রাগভাবের বিনাশকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেন, "অনিত্যত্ব" শব্দের দ্বারা বিনাশিত্বই যদি তাঁহার বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত দোষের অবকাশ হয় না এবং উক্ত উত্তরবাদীর যে তাহাই বক্তব্য, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং ভাষ্যকারের পক্ষে শেষে ইহাই বলিতে হইবে যে, প্রাগভাবের বিনাশ থাকিলেও উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশের ন্যায় প্রাগভাব উৎপন্ন হয় না; সুতরাং প্রাগভাব, রাগাদি ক্লেশরূপ জায়মান ভাবপদার্থের অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও প্রাগভাবের ন্যায় উৎপত্তিশূন্য অনাদি নহে। প্রাগভাবের প্রতিযোগী ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলে তখন প্রাগভাব থাকিতেই পারে না। কারণ, ভাব ও অভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু রাগাদি ক্লেশসন্ততি ঐরূপ প্রতিযোগি-নাশ্য পদার্থ নহে। অতএব অনাদি প্রাগভাবের

ন্যায় অনাদি রাগাদি ক্লেশসন্ততির বিনাশ হয়, ইহা বলা যায় না। পরন্তু হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারাও কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না, ইহাও এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার যে আরও অনেক স্থানে উহা বলিয়া অপরের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও এখানে স্মরণ করা আবশ্যক।

ভাষ্যকার পরে দ্বিতীয় উত্তরবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পরমাণুর শ্যাম রূপ যে অনাদি, এ বিষয়ে কোন হেতু না থাকায় উহা অযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি হইলেও যেমন উহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও উহার বিনাশ হয়,—এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুর শ্যাম রূপের অনাদিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের যে উৎপত্তিই হয় না, উহা স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য, সুতরাং অনাদি, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। পরন্তু উহা যে জন্য পদার্থ, রক্তাদি রূপের ন্যায় উহারও উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা অনাদি নহে, এ বিষয়েই প্রমাণ আছে। পার্থিব পরমাণুর রক্তাদি রূপ অগ্নিসংযোগ-জন্য, অগ্নিসংযোগ ব্যতীত শ্যাম রূপের বিনাশের পরে কুত্রাপি রূপান্তরের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ঐ রক্তাদি রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া "পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ জন্য পদার্থ, যেহেতু উহা পৃথিবীর রূপ, যেমন রক্তাদি রূপ," এইরূপে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের জন্যত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং উহা বস্তুতঃ অনাদি নহে। কিন্তু পার্থিব পরমাণুর সেই পূর্ব্বজাত শ্যাম রূপ, রক্তাদি রূপের ন্যায় কোন জীবের প্রযত্নজন্য নহে, এই জন্যই জীবের প্রযত্নজন্য রক্তাদি রূপ হইতে বৈলক্ষণ্যবশতঃ ঐ শ্যাম রূপকে অনাদি বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেরও উহাই তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ যে তত্ত্বতঃই অনাদি, তাহা নহে। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ সূত্রের পূর্ব্বে "অণুশ্যামতানিত্যত্ববদেতৎ স্যাৎ" এই সূত্রে যে পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্বকেই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজের মত নহে। তিনি সেখানে ঐ সূত্রের দ্বারা অপরের সমাধানের উল্লেখ করিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা উহার খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার সেখানেও ঐ সমাধানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "পার্থিব পরমাণুর যে শ্যাম রূপ, তাহা কারণশূন্য বা নিত্য নহে, যেহেতু উহা পার্থিব রূপ, যেমন রক্তাদি রূপ," এইরূপ অনুমানের দ্বারা পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপেরও অগ্নিসংযোগজন্যত্ব সিদ্ধ হয়। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি নৈয়ায়িক-গণের মতে পার্থিব পরমাণুর সর্ব্বপ্রথম রূপ যে শ্যাম রূপ, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ অগ্নিসংযোগ-জন্য, উহা স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য নহে, সুতরাং উহাও বস্তুতঃ অনাদি নহে। পূর্ব্বোক্ত বাদী বলিতে পারেন যে, পার্থিব পরমাণুর রক্তাদি রূপ অগ্নিসংযোগজন্য হইলেও উহার সর্ব্বপ্রথম রূপ যে শ্যাম রূপ, তাহা জন্য পদার্থ নহে। কারণ, তাহা হইলে ঐ শ্যাম রূপের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ পরমাণুর রূপশূন্যতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পার্থিব পরমাণু কখনও রূপশূন্য, ইহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পার্থিব পরমাণুর যেমন নিত্যত্ববশতঃ উৎপত্তি নাই, উহা যেমন

অনাদি, তদ্রূপ উহার শ্যাম রূপেরও উৎপত্তি নাই, উহাও স্বতঃসিদ্ধ অনাদি, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার এই জন্য সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু অনিত্য, ইহা বলিলে এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুর শ্যাম রূপের উৎপত্তি হয় না, ইহা বলিলে উহা আত্মাপ্রভৃতির ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্মক ভাবপদার্থ হয়। কিন্তু তাহা হইলে উহা অনিত্য হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ পদার্থও যে অনিত্য হয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু অনুৎপত্তিধর্ম্মক ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য, এই বিষয়েই অনুমানপ্রমাণ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাদী পরমাণুর শ্যাম রূপের অনিত্যত্বের ন্যায় রাগাদি ক্লেশসন্ততির অনিত্যত্ব বলিয়া পরমাণুর শ্যাম রূপের অনিত্যত্বই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পরমাণুর শ্যাম রূপের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। নচেৎ পরমাণুর শ্যাম রূপের বিনাশও হইতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না। পরন্তু পরমাণুর শ্যাম রূপ বিদ্যমান থাকিলে উহাতে অগ্নিসংযোগজন্য রক্ত রূপের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, পার্থিব পদার্থে অগ্নিসংযোগজন্য শ্যাম রূপের বিনাশ হইলেই তাহাতে রক্ত রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং পরমাণুর শ্যাম রূপের বিনাশ যখন উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য, তখন উহার উৎপত্তিও উভয় পক্ষেরই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহার অনিত্যত্বও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু উহা অনুৎপত্তিধর্ম্মক, অথচ অনিত্য, ইহা কখনও বলা যাইবে না। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু অনিত্য, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকারের ন্যায় বার্ত্তিককারও শেষে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের ঐ শেষ কথার কোন উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করেন নাই। সুধীগণ এখানে ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথার প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য বিচার করিবেন ॥৬৬॥

ভাষ্য। অয়ন্তু সমাধিঃ—

অনুবাদ। ইহাই সমাধান—

সূত্র। ন সংকল্প-নিমিত্তত্বাচ্চ রাগাদীনাং ॥ ॥৬৭॥৪১০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ উপপন্ন হয় না; কারণ, রাগাদি (ক্লেশ) সংকল্পনিমিত্তক এবং কর্ম্মনিমিত্তক ও পরস্পরনিমিত্তক।

ভাষ্য। কর্ম্মনিমিত্তত্বাদিতরেতর-নিমিত্তত্বাচ্চেতি সমুচ্চয়ঃ। মিথ্যা-সংকল্পেভ্যো রঞ্জনীয়-কোপনীয়-মোহনীয়েভ্যো রাগদ্বেষমোহা উৎপদ্যন্তে। কর্ম্ম চ সত্ত্বনিকায়নির্ব্বর্ত্তকং নৈয়মিকান্ রাগাদীন্ নির্ব্বর্ত্তয়তি নিয়মদর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি কশ্চিৎ সত্ত্বনিকায়ো রাগবহুলঃ কশ্চিদ্দ্বেষবহুলঃ কশ্চিন্মোহবহুল

ইতি। ইতরেতরনিমিত্তা চ রাগাদীনামুৎপত্তিঃ। মূঢ়ো রজ্যতি, মূঢ়ঃ কুপ্যতি, রক্তো মুহ্যতি কুপিতো মুহ্যতি।

সর্ব্বমিথ্যাসংকল্পানাং তত্ত্বজ্ঞানাদনুৎপত্তিঃ। কারণানুৎপত্তৌ চ কার্য্যানুৎপত্তেরিতি রাগাদীনামত্যন্তমনুৎপত্তিরিতি।

অনাদিশ্চ ক্লেশসন্ততিরিত্যযুক্তং, সর্ব্ব ইমে খল্বাধ্যাত্মিকা ভাবা অনাদিনা প্রবন্ধেন প্রবর্ত্তন্তে শরীরাদয়ঃ, ন জাত্বত্র কশ্চিদনুৎপন্নপূর্ব্বঃ প্রথমত উৎপদ্যতেঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানাৎ। ন চৈবং সত্যনুৎপত্তিধর্ম্মকং কিঞ্চিদ্ব্যয়ধর্ম্মকং প্রতিজ্ঞায়ত ইতি। কর্ম্ম চ সত্ত্বনিকায়নির্ব্বর্ত্তকং তত্ত্বজ্ঞানকৃতান্মিথ্যাসংকল্প-বিঘাতান্ন রাগাদ্যুৎপত্তিনিমিত্তং ভবতি, সুখদুঃখ-সংবিত্তিঃ ফলন্তু ভবতীতি।

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্যাদ্যমাহ্নিকং ॥

অনুবাদ। কর্ম্মনিমিত্তকত্ববশতঃ এবং পরস্পরনিমিত্তকত্ববশতঃ ইহার সমুচ্চয় বুঝিবে, অর্থাৎ সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা কর্ম্মনিমিত্তকত্ব ও পরস্পরনিমিত্তকত্ব, এই অনুক্ত হেতুদ্বয়ের সমুচ্চয় মহর্ষির অভিপ্রেত। (সূত্রার্থ)—রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয় (১) মিথ্যা সংকল্প হইতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। প্রাণিজাতির নির্ব্বাহক অর্থাৎ নানাজাতীয় জীব-জন্মের নিমিত্তকারণ (২) কর্ম্মও "নৈয়মিক" অর্থাৎ ব্যবস্থিত রাগ, দ্বেষ ও মোহকে উৎপন্ন করে; কারণ, নিয়ম দেখা যায়। (তাৎপর্য্য) যেহেতু কোন জীবজাতি রাগবহুল, কোন জীবজাতি দ্বেষবহুল, কোন জীবজাতি মোহবহুল অর্থাৎ জীবজাতিবিশেষে রাগ, দ্বেষ ও মোহের ঐরূপ নিয়মবশতঃ উহা জীবজাতিবিশেষের কর্ম্মবিশেষজন্য, ইহা বুঝা যায়। এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি (৩) পরস্পরনিমিত্তক। যথা—মোহবিশিষ্ট জীব রাগবিশিষ্ট হয়, মোহবিশিষ্ট জীব কোপবিশিষ্ট হয়, রাগবিশিষ্ট জীব মোহ-বিশিষ্ট হয়, কোপবিশিষ্ট জীব মোহবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ মোহজন্য রাগ জন্মে, রাগজন্যও মোহ জন্মে, এবং মোহজন্য কোপ বা দ্বেষ জন্মে, দ্বেষজন্যও মোহ জন্মে, সুতরাং উক্তরূপে রাগ, দ্বেষ ও মোহ যে, পরস্পরনিমিত্তক, ইহাও স্বীকার্য্য।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত মিথ্যা সংকল্পেরই অনুৎপত্তি হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন আর কোন মিথ্যা সংকল্পই জন্মে না, কারণের উৎপত্তি না হইলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এ জন্য (তৎকালে) রাগ, দ্বেষ ও মোহের অত্যন্ত অনুৎপত্তি হয়

অর্থাৎ তখন রাগ দ্বেষাদির কারণের একেবারে উচ্ছেদ হওয়ায় আর কখনই রাগ-দ্বেষাদি জন্মিতেই পারে না।

পরন্তু ক্লেশসন্ততি অনাদি, ইহা যুক্ত নহে (অর্থাৎ কেবল উহাই অনাদি নহে), যে হেতু এই শরীরাদি আধ্যাত্মিক সমস্ত ভাব পদার্থই অনাদি প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত (উৎপন্ন) হইতেছে, ইহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অনুৎপন্নপূর্ব্ব কোন পদার্থ কখনও প্রথমতঃ উৎপন্ন হয় না (অর্থাৎ শরীরাদি ঐ সমস্ত আধ্যাত্মিক পদার্থের অনাদি কাল হইতেই উৎপত্তি হইতেছে, উহাদিগের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি নাই, ঐ সমস্ত পদার্থই অনাদি) এইরূপ হইলেও অনুৎপত্তিধর্ম্মক কোন বস্তু বিনাশধর্ম্মক বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হয় না (অর্থাৎ অনাদি জন্য পদার্থের বিনাশ হইলেও তদ্দৃষ্টান্তে অনাদি অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক কোন ভাব পদার্থের বিনাশিত্ব সিদ্ধ করা যায় না), জীবজাতি-সম্পাদক কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানজাত-মিথ্যাসংকল্প-বিনাশপ্রযুক্ত রাগাদির উৎপত্তির নিমিত্ত (জনক) হয় না,—কিন্তু সুখ ও দুঃখের অনুভূতিরূপ ফল হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখনও জীবনকাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য সুখদুঃখ ভোগ হয়।

বাৎস্যায়নপ্রণীত ন্যায়ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বে "ন ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ-পূর্ব্বক পরে দুই সূত্রের দ্বারা অপর সিদ্ধান্তিদ্বয়ের সমাধান প্রকাশ করিয়া, শেষে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার নিজের সমাধান বা প্রকৃত সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রের প্রথমে "নঞ্" শব্দের প্রয়োগ করায় ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমাধানকে অপরের সমাধান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন,—"অয়ন্তু সমাধিঃ" অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত সমাধানই প্রকৃত সমাধান।

"সংকল্প" যাহার নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, এই অর্থে সূত্রে "সংকল্পনিমিত্ত" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সঙ্কল্পনিমিত্তক অর্থাৎ সঙ্কল্পজন্য। তাহা হইলে "সংকল্পনিমিত্তত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সংকল্পজন্যত্ব। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মনিমিত্তকত্ব ও পরস্পরনিমিত্তকত্ব, এই হেতুদ্বয়ের সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মজন্যত্ব ও পরস্পরজন্যত্ব, এই দুইটি অনুক্ত হেতুর সমুচ্চয় (সূত্রোক্ত হেতুর সহিত সম্বন্ধ) মহর্ষির অভিপ্রেত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, রাগাদির সংকল্পজন্যত্ববশতঃ এবং কর্ম্মজন্যত্ববশতঃ ও পরস্পরজন্যত্ববশতঃ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও উহার কারণ "সংকল্প" প্রভৃতি না থাকিলেও কারণাভাবে উহার আর উৎপত্তি হইতেই পারে না, সুতরাং উহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়। ভাষ্যকার পরে ক্রমশঃ উক্ত হেতুত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথমে বলিয়াছেন যে, "রঞ্জনীয়" অর্থাৎ রাগজনক এবং "কোপনীয়" অর্থাৎ দ্বেষজনক এবং "মোহনীয়" অর্থাৎ মোহজনক যে সমস্ত মিথ্যা সংকল্প, তাহা হইতে যথাক্রমে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। এখানে এই "সংকল্প" কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রেও রাগাদি সংকল্পজন্য, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেখানে ঐ "সংকল্প"কে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তনজন্য বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর সেখানে এবং এখানে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকেই "সংকল্প" বলিয়াছেন। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন বা অনুস্মরণজন্য তদ্বিষয়ে প্রথমে যে প্রার্থনারূপ সংকল্প জন্মে, উহা রাগ পদার্থ হইলেও পরে উহা আবার তদ্বিষয়ে রাগবিশেষ উৎপন্ন করে। বার্ত্তিককার ও তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে পূর্ব্বে এই ভাবে ভাষ্যকারেরও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (তৃতীয় খণ্ড, ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে রঞ্জনীয় সংকল্পকে রাগের কারণ এবং কোপনীয় সঙ্কল্পকে দ্বেষের কারণ বলিয়া, উক্ত দ্বিবিধ সংকল্প মোহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, অর্থাৎ উহাও মোহবিশেষ, এই কথা বলিয়াছেন। ইহার কারণ বুঝা যায় যে, মহর্ষি পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ সূত্রে "নামূঢ়স্যেতরোৎ-পত্তেঃ" এই বাক্যের দ্বারা রাগ ও দ্বেষকে মোহজন্য বলিয়াছেন। সুতরাং মহর্ষি অন্যত্র রাগাদিকে যে "সংকল্প"জন্য বলিয়াছেন, ঐ "সংকল্প" মোহবিশেষই তাঁহার অভিমত, অর্থাৎ উহা প্রার্থনারূপ রাগ পদার্থ নহে, উহা মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহ, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। মনে হয়, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে ইহা চিন্তা করিয়াই এখানে বলিয়াছেন যে,[১] যদিও পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাই সংকল্প, তথাপি উহার পূর্ব্বাংশ বা কারণ সেই পূর্ব্বানুভবই এখানে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রার্থনা রাগপদার্থ অর্থাৎ ইচ্ছাবিশেষ, উহা রাগের কারণ মিথ্যাজ্ঞান নহে। সুতরাং এখানে "সংকল্প" শব্দের ঐ প্রার্থনারূপ মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। অতএব মিথ্যানুভব অর্থাৎ ঐ সংকল্পের কারণ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহরূপ যে পূর্ব্বানুভব, তাহাই এখানে "সংকল্প" শব্দের অর্থ। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে সঙ্কল্প শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে মোহপ্রযুক্ত বিষয়ের সুখসাধনত্বের অনুস্মরণ ও দুঃখসাধনত্বের অনুস্মরণকে "সংকল্প" বলিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার ঐ কথাও লিখিত হইয়াছে (১২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখানে তাঁহার কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বার্ত্তিককারের কথানুসারে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাই "সংকল্প" শব্দের মুখ্য অর্থ, ইহা স্বীকার করিয়াই শেষে এখানে পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সূত্র ও উহার ভাষ্যানুসারে এই সূত্রোক্ত "সংকল্প" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া রঞ্জনীয় (রাগজনক) সংকল্প ও কোপনীয় (দ্বেষজনক) সংকল্পকে মিথ্যানুভবরূপ মোহবিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরে ঐ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহজন্য সংস্কারকেই মোহনীয় সংকল্প বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে বার্ত্তিককারের "মূঢ়ো মুহ্যতি" এই বাক্যে "মূঢ়" শব্দেরও অর্থ বলিয়াছেন—মোহজন্য

১। যদ্যপ্যনুভূতবিষয়প্রার্থনা সংকল্পঃ, তথাপি তস্য পূর্ব্বভাগোঽনুভবো গ্রাহ্যঃ, প্রার্থনায়া রাগত্বাৎ। তেন মিথ্যানুভবঃ সংকল্প ইত্যর্থঃ। ...... মোহনীয়ঃ সংকল্পো মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

সংস্কারবিশিষ্ট। অবশ্য মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার যে মোহের কারণ, ইহা সত্য; কারণ, অনাদিকাল হইতে ঐ সংস্কার আছে বলিয়াই জীবের নানারূপ মোহ জন্মিতেছে, উহার উচ্ছেদ হইলে তখন আর মোহ জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। কিন্তু স্থলবিশেষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোহও মোহবিশেষের কারণ হয়, এক মোহ অপর মোহ উৎপন্ন করে, ইহাও সত্য। সুতরাং মোহরূপ সংকল্পকে মোহেরও কারণ বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই পদার্থ-ত্রয়কে সংকল্পজন্য বলিয়াছেন[১]। মূলকথা, এখানে ভাষ্যকারের মতে "সংকল্প" যে, প্রার্থনা বা ইচ্ছাবিশেষ নহে, কিন্তু উহা মিথ্যাজ্ঞান বা মোহবিশেষ, ইহা ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা এবং তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত "সংকল্প"কে মিথ্যাসংকল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তদ্দ্বারাও ঐ "সংকল্প" যে মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার "মিথ্যা" শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি ও সার্থক্য কিরূপে হইবে, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। পরে দ্বিতীয় আহ্নিকের দ্বিতীয় সূত্রেও "সংকল্প" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেখানেও সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার "মিথ্যা" শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই সূত্রে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন। মোহেরই নামান্তর মিথ্যাজ্ঞান। ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের আকার প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভ হইতে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা ব্যক্ত হইবে। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত "সংকল্প" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রে ও চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সূত্রে ও এই সূত্রে তাৎপর্য্যটীকাকারের বিভিন্ন প্রকার উক্তির সমন্বয় ও তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার প্রথমে রাগাদির (১) সংকল্পনিমিত্তকত্ব বুঝাইয়া, ক্রমানুসারে (২) কর্ম্মনিমিত্তকত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, জীবজাতিসম্পাদক অর্থাৎ নানাজাতীয় জীবদেহজনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষও সেই সেই জাতিবিশেষের পক্ষে ব্যবস্থিত রাগ, দ্বেষ ও মোহ জন্মায়। কারণ, জাতিবিশেষের পক্ষে রাগ, দ্বেষ ও মোহের নিয়ম দেখা যায়। অর্থাৎ নানাজাতীয় জীবের মধ্যে কোন জাতির রাগ অধিক, কোন জাতির দ্বেষ অধিক, কোন জাতির মোহ অধিক, এইরূপ যে নিয়ম দেখা যায়,[২] তাহা সেই সেই জাতিবিশেষের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষজন্য, নচেৎ উহার উপপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সমান্যতঃ রাগ, দ্বেষ ও মোহ যেমন পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ সংকল্পজন্য, তদ্রূপ জীবজাতি-বিশেষের ব্যবস্থিত যে রাগাদিবিশেষ, তাহা কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষজন্য, অর্থাৎ সেই সেই জীবজাতি বা দেহবিশেষের উৎপাদক অদৃষ্টবিশেষ, ঐ রাগাদিবিশেষের উৎপাদক, ইহা স্বীকার্য্য। "নিকায়" শব্দের দ্বারা সজাতীয় জীবসমূহ বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে "নিকায়" শব্দের পূর্ব্বে জীববাচক "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করায় "নিকায়" শব্দের দ্বারা জাতিই এখানে তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাই তাৎ-পর্য্যটীকাকারও এখানে লিখিয়াছেন,—"নিকায়েন জাতিরুপলক্ষ্যতে"। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি

১। সংকল্প-প্রভবো রাগো দ্বেষো মোহশ্চ কথ্যতে।—মাধ্যমিক কারিকা।

২। দৃষ্টো হি কশ্চিৎ সত্ত্বনিকায়ো রাগবহুলো যথা পারাবতাদিঃ। কশ্চিৎ ক্রোধবহুলো যথা সর্পাদিঃ। কশ্চিন্মোহবহুলো যথা অজগরাদিঃ।—ন্যায়বার্ত্তিক।

কণাদও শেষে "জাতিবিশেষাচ্চ" (৬।২।১৩) এই সূত্রের দ্বারা জাতিবিশেষপ্রযুক্তও যে, রাগবিশেষ জন্মে, ইহা বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রের ভাষ্যে শেষে "জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষঃ" এই কথা বলিয়াছেন এবং পরে সেখানে ঐ "জাতিবিশেষ" শব্দের দ্বারা যে, জাতিবিশেষের জনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কার"কার শঙ্করমিশ্র পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে জাতিবিশেষপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষ উভয়ই জন্মে, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন এবং সেখানে তিনিও বলিয়াছেন যে, সেই সেই জাতির নিষ্পাদক অদৃষ্টবিশেষই সেই সেই জাতির বিষয়বিশেষে রাগ ও দ্বেষের অসাধারণ কারণ। জন্মরূপ জাতিবিশেষ উহার দ্বার বা সহকারিমাত্র। কিন্তু মহর্ষি কণাদ ঐ সূত্রের পূর্ব্বে "অদৃষ্টাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা পৃথক্ ভাবেই অদৃষ্টবিশেষকেও অনেক স্থলে রাগের অথবা রাগ ও দ্বেষ উভয়েরই অসাধারণ কারণ বলায় তিনি পর-সূত্রে "জাতিবিশেষ" শব্দের দ্বারা যে, অদৃষ্টভিন্ন জন্মবিশেষকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সে যাহাই হউক, মূল কথা পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ সংকল্প যেমন সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার রাগ, দ্বেষ ও মোহের সাধারণ কারণ, উহা ব্যতীত কোন জীবেরই কোন প্রকার রাগাদি জন্মে না, তদ্রূপ নানাজাতীয় জীবগণের সেই সেই বিজাতীয় শরীরাদিজনক যে কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ, তাহাও সেই সেই জীবজাতির রাগাদিবিশেষের অর্থাৎ কাহারও অধিক রাগের, কাহারও অধিক দ্বেষের এবং কাহারও অধিক মোহের অসাধারণ কারণ, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। এবং তিনি তৃতীয় অধ্যায়েও "জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষঃ" এই বাক্যের দ্বারাও উহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। সুতরাং মহর্ষি কণাদ প্রথমে "অদৃষ্টাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা অদৃষ্টবিশেষকে রাগবিশেষের অসাধারণ কারণরূপে প্রকাশ করিয়াও আবার "জাতিবিশেষাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা জাতি বা জন্মবিশেষের নিষ্পাদক অদৃষ্টবিশেষকেই যে বিশেষ করিয়া রাগবিশেষের অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন, ইহা শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতির ন্যায় সুপ্রাচীন বাৎস্যায়নেরও অভিমত বুঝা যায়। মহর্ষি কণাদ "অদৃষ্টাচ্চ" এই সূত্রের পূর্ব্বে "তন্ময়ত্বাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা "তন্ময়ত্ব"কেও রাগের কারণ বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তৃতীয় অধ্যায়ে তন্ময়ত্বকে রাগের কারণ বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার সেখানে সংস্কারজনক বিষয়াভ্যাসকেই "তন্ময়ত্ব" বলিয়াছেন। উহা অনাদিকাল হইতেই সেই সেই ভোগ্য বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন করিয়া রাগমাত্রেরই কারণ হয়। শঙ্করমিশ্র উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বিষয়ের অভ্যাসজনিত দৃঢ়তর সংস্কারকেই "তন্ময়ত্ব" বলিয়াছেন। ঐ সংস্কারও রাগমাত্রেরই সাধারণ কারণ, সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সংস্কারবশতঃই সেই সেই বিষয়ের অনুস্মরণ জন্মে, তাহার ফলে সংকল্পজন্য সেই সেই বিষয়ে রাগ জন্মে।

ভাষ্যকার পরে রাগাদির উৎপত্তি পরস্পরনিমিত্তক, ইহা বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে মূঢ় ব্যক্তি রক্ত ও কুপিত হয় এবং রক্ত ও কুপিত ব্যক্তি মূঢ় হয়, ইহা বলিয়া মোহ যে, রাগ ও কোপের (দ্বেষের) নিমিত্ত এবং রাগ ও দ্বেষবিশেষও মোহবিশেষের নিমিত্ত বা কারণ হয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ অনেক স্থলে রাগবিশেষও

দ্বেষবিশেষের কারণ হয় এবং দ্বেষবিশেষও রাগবিশেষের কারণ হয়, ইহাও বুঝিতে হইবে। ফলকথা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই পদার্থত্রয় পরস্পরই পরস্পরের উৎপাদক হয়। সুতরাং ঐ পদার্থত্রয়েরই অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে মোক্ষ হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, রাগাদির মূল কারণ যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদের কোন কারণ না থাকায় রাগাদির অত্যন্ত উচ্ছেদ অসম্ভব; সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব,—এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত মিথ্যা সংকল্পের অনুৎপত্তি হয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন আর কোন প্রকার মিথ্যাজ্ঞানই জন্মিতে পারে না। সুতরাং তখন রাগাদির মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে উহার কার্য্য রাগাদি ক্লেশসন্ততির উৎপত্তি হইতে পারে না, তখন চিরকালের জন্য উহার উচ্ছেদ হওয়ায় মোক্ষ সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী রাগাদি ক্লেশসন্ততিকে যে অনাদি বলিয়াছেন, ইহাও অযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল রাগাদি ক্লেশসন্ততিই যে অনাদি, তাহা নহে। শরীরাদি আরও অনেক পদার্থও অনাদি। সেই সমস্ত পদার্থেরও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার তাঁহার এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে পরেই বলিয়াছেন যে, শরীরাদি আধ্যাত্মিক সমস্ত ভাবপদার্থ ই অনাদি, ঐ সমস্ত পদার্থের মধ্যে এক তত্ত্বজ্ঞানই কেবল অনাদি নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বে আর কখনও জন্মে না। অর্থাৎ অনাদি মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ অনাদি কাল হইতেই জীবকুলের নানাবিধ শরীরাদি উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং কোন জীবেরই শরীরাদি পদার্থ "অনুৎপন্নপূর্ব্ব" নহে, অর্থাৎ পূর্ব্বে আর কখনও উহার উৎপত্তি হয় নাই, সময়বিশেষে সর্ব্বপ্রথমেই উহার উৎপত্তি হয়, ইহা নহে। যাহা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক পদার্থ বলে। জীবের শরীরাদির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানও আধ্যাত্মিক পদার্থ, কিন্তু উহা শরীরাদির ন্যায় অনাদি হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব হওয়ায় জন্ম বা শরীরাদি লাভ হইতেই পারে না। তাই ভাষ্যকার তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন শরীরাদি পদার্থেরই অনাদিত্ব বলিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মার নিত্যত্ব পরীক্ষায় উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূলকথা, অনাদি রাগাদি ক্লেশসন্ততির ন্যায় অনাদি শরীরাদি পদার্থেরও কালে অত্যন্ত- উচ্ছেদ হয়। মুক্ত আত্মার আর কখনও শরীরাদি জন্মে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অনাদি পদার্থেরও বিনাশ হইলে তদ্‌দৃষ্টান্তে যে পদার্থ "অনুৎপত্তিধর্ম্মক" অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি নাই, এমন ভাব পদার্থেরও কালে বিনাশ হয়, ইহাও বলিতে পারি। এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অনাদি পদার্থের বিনাশ হয় বলিয়া, অনুৎপত্তিধর্ম্মক কোন ভাব পদার্থেরই বিনাশিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, উৎপত্তিধর্ম্মক রাগাদি অনাদি পদার্থেরই বিনাশিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অনুৎপত্তিধর্ম্মক অনাদি ভাব পদার্থের অবিনাশিত্বই প্রমাণসিদ্ধ আছে; সুতরাং ঐরূপ পদার্থের বিনাশিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় তখন যে আর মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তক রাগাদি জন্মিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মনিমিত্তক যে রাগাদি, তাহার নিবৃত্তি

কিরূপে হইবে? মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও শরীরাদিরক্ষক প্রারব্ধ কর্ম্মের অস্তিত্ব ত তখনও থাকে, নচেৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরক্ষণেই জীবননাশ কেন হয় না? এতদুত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষও তখন আর রাগাদির উৎপাদক হয় না। কারণ, তখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার রাগাদির সামান্য কারণ। পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ, রাগাদিবিশেষের বিশেষ কারণ হইলেও সামান্য কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে উহা কার্য্যজনক হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে রাগাদির উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে তাঁহার ঐ কর্ম্মফল সুখদুঃখ ভোগেরও উৎপত্তি না হউক? এতদুত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "সুখদুঃখের উপভোগরূপ ফল কিন্তু হয়।" তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ের জন্যই জীবনধারণ করিয়া সুখ ও দুঃখভোগ করেন। উহাতে মিথ্যাজ্ঞান বা তজ্জন্য রাগাদির কোন আবশ্যকতা নাই। তিনি যে সুখ ও দুঃখভোগ করেন, উহাতে তাঁহার রাগ ও দ্বেষ থাকে না। তিনি সুখে আসক্তিশূন্য এবং দুঃখে দ্বেষশূন্য হইয়াই তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম্মফল ঐ সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। কারণ, উহা তাঁহার অবশ্য ভোগ্য। ভোগ ব্যতীত তাঁহার ঐ সুখদুঃখজনক প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য জীবন ধারণ করায় তাঁহারও সময়ে বিষয়বিশেষে রাগ ও দ্বেষ জন্মে, ইহা সত্য; কিন্তু মুক্তির প্রতিবন্ধক উৎকট রাগ ও দ্বেষ তাঁহার আর জন্মে না। অর্থাৎ তাঁহার তৎকালীন রাগ ও দ্বেষজনিত কোন কর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন না করায় উহা তাঁহার জন্মান্তরের নিষ্পাদক হইয়া মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞান চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানেই ভাষ্যটিপ্পনীতে উক্ত বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি সেখানে তত্ত্বজ্ঞানীর যে, উৎকট রাগাদিই জন্মে না, এইরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানেও সূত্রে ও ভাষ্যাদিতে "রাগাদি" শব্দের দ্বারা উৎকট অর্থাৎ মুক্তির প্রতিবন্ধক রাগাদিই বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে। মূলকথা, মুক্তির প্রতিবন্ধক বা পুনর্জ্জন্মের নিষ্পাদক উৎকট রাগাদি অনাদি হইলেও তত্ত্বজ্ঞানজন্য উহার মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অত্যন্ত উচ্ছেদবশতঃ আর উহা জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। সুতরাং মুক্তি সম্ভব হওয়ায় "ক্লেশানুবন্ধবশতঃ মুক্তি অসম্ভব", এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। আর কোনরূপেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করা যায় না।

মহর্ষি গোতম ক্রমানুসারে তাঁহার কথিত চরম প্রমেয় অপবর্গের পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বোক্ত "ঋণক্লেশ" ইত্যাদি-(৫৮ম)-সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়া, অপবর্গ যে সম্ভাবিত, অর্থাৎ উহা অসম্ভব নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যাহা অসম্ভব, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। মহর্ষি এই জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে

বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতেও প্রথমে বেদের প্রামাণ্য যে সম্ভাবিত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত প্রাচীন কারিকা ও উহার তাৎপর্য্যাদি দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৪৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরে (১ম আঃ, শেষ সূত্রে) যেমন বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ এখানে অপবর্গ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। অপবর্গ অসম্ভব না হইলেও উহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই জন্যই অপবর্গ বিষয়ে প্রথমে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, পরে শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেই অনুমান-প্রয়োগ "কিরণাবলী" গ্রন্থের প্রথমে ন্যায়াচার্য্য উদয়ন প্রকাশ করিয়াছেন[১]। মুক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, দুঃখের পরে দুঃখ, তাহার পরে দুঃখ, এইরূপে অনাদি কাল হইতে দুঃখের যে সন্ততি বা প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, উহার এক সময়ে অত্যন্ত উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, উহাতে সন্ততিত্ব আছে। যাহা সন্ততি, তাহার এক সময়ে অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত—প্রদীপ-সন্ততি। প্রদীপের এক শিখার পরে অন্য শিখার উৎপত্তি, তাহার পরে অন্য শিখার উৎপত্তি, এইরূপে ক্রমিক যে শিখা-সন্ততি জন্মে, তাহার এক সময়ে অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়। চরম শিখার ধ্বংস হইলেই ঐ প্রদীপের নির্ব্বাণ হয়; ঐ প্রদীপসন্ততির আর কখনই উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে "সন্ততিত্ব" হেতুর দ্বারা দুঃখসন্ততিরূপ ধর্ম্মীতে অত্যন্ত উচ্ছেদ সিদ্ধ হইলে মুক্তিই সিদ্ধ হয়। কারণ, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি; পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও "ন্যায়কন্দলী"র প্রথমে মুক্তির স্বরূপ বিচার করিতে মুক্তি বিষয়ে উক্ত অনুমান প্রদর্শন করিয়া, উহা যে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের অনুমান, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পার্থিব পরমাণুর রূপাদি-সন্ততিতে ব্যভিচারবশতঃ উক্ত অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই[২]। তাঁহার নিজ মতে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"

১। কিং পুনরত্র প্রমাণং ? দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে, সন্ততিত্বাৎ প্রদীপসন্ততিবদিত্যাচার্য্যাঃ"। কিরণাবলী।

২। পার্থিব পরমাণুর রূপাদিরও অনাদি কাল হইতে ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, সুতরাং ঐ রূপাদি সন্ততিতেও সন্ততিত্ব হেতু আছে। কিন্তু উহার কোন সময়েই অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। কারণ, তাহা হইলে তখন হইতে সৃষ্টি-লোপ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানের হেতু ব্যভিচারী হওয়ায় উহা মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই শ্রীধরভট্টের তাৎপর্য্য। কিন্তু উদয়নাচার্য্য উক্ত অনুমান প্রদর্শনের পরেই পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার-দোষের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্ততিও ফলতঃ উক্ত অনুমানের পক্ষে অন্তর্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত অনুমানের দ্বারা ঐ রূপাদি-সন্ততিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ সিদ্ধ করিব। পক্ষে ব্যভিচার দোষ হয় না। শ্রীধর ভট্ট এই কথার কোন প্রতিবাদ না করায় তিনি উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা অনেকে অনুমান করেন। বস্তুতঃ উদয়ন ও শ্রীধর সমকালীন ব্যক্তি। কিন্তু উদয়ন মৈথিল, শ্রীধর বঙ্গীয়। উদয়ন পূর্ব্বেই "কিরণাবলী" রচনা করিয়াছেন। পরে শ্রীধর "ন্যায়কন্দলী" রচনা করিয়াছেন। "ন্যায়কন্দলী"র রচনার কিছু পূর্ব্বে "কিরণাবলী" রচিত হওয়ায় তখন উহার সর্ব্বত্র প্রচার হয় নাই। সুতরাং শ্রীধর, উদয়নের ঐ গ্রন্থ দেখিতে না পাওয়ায় উদয়নের পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাও বুঝা যাইতে পারে।

ইত্যাদি শ্রুতিই মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ, অর্থাৎ তাঁহার মতে মুক্তি বিষয়ে শ্রুতি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নাই, ইহা তিনি সেখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন।

ইহাঁদিগের পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার "তত্ত্বচিন্তামণি"র অন্তর্গত "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" ও "মুক্তিবাদে" মুক্তি বিষয়ে নব্যভাবে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, পরে শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন[১]। কিন্তু তিনি পরে "আচার্য্যাস্তু 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি শ্রুতিস্তত্র প্রমাণং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উদয়নাচার্য্যের নিজ মতে যে, উক্ত শ্রুতিই মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বলিয়া, উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার করিয়াছেন। তিনি সেখানে উদয়নাচার্য্যের "কিরণাবলী" গ্রন্থোক্ত কথারই উল্লেখ করায় তিনি যে উহা উদয়নাচার্য্যের মত বলিয়াই বুঝিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, শ্রীধর ভট্টের ন্যায় উদয়নাচার্য্যও যে মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বোক্ত গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সন্দর্ভের দ্বারা বুঝিতে পারি। পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও তাঁহার "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে মুক্তি বিষয়ে প্রমাণাদি বলিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়েরই অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও শেষে মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ প্রভৃতির চরম মতেও যে, মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ বা একমাত্র প্রমাণ, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। সুপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত ৫৯ম সূত্রের ভাষ্যে শেষে মুক্তিপ্রতিপাদক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দারা তিনিও যে সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় মুক্তির অস্তিত্বও প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। বস্তুতঃ উপনিষদে মুক্তিপ্রতিপাদক আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে[২], যদ্দারা মুক্তি পদার্থ যে সুচির-প্রসিদ্ধ তত্ত্ব এবং উহাই পরমপুরুষার্থ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

পরন্তু বেদের মন্ত্রভাগেও পরমপুরুষার্থ মুক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদসংহিতা ও যজুর্ব্বেদসংহিতায় "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ[৩] মন্ত্রের শেষে "মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ"

১। "প্রমাণন্তু দুঃখত্বং দেবদত্তদুঃখত্বং বা স্বাশ্রয়াসমানকালীনধ্বংসপ্রতিযোগিবৃত্তি, কার্য্যমাত্রবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ সন্ততিত্বাদ্বা, এতৎ প্রদীপত্ববৎ। সন্ততিত্বঞ্চ নানাকালীনকার্য্যমাত্রবৃত্তিধর্ম্মত্বং"। 'আত্মা জ্ঞাতব্যো ন স পুনরাবর্ত্ততে ইতি শ্রুতিশ্চ প্রমাণং"।—ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

২। "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়"—ইত্যাদি। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি। মুণ্ডক (৩।১।৩) ২।২।৮) "নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"। কঠ। ৩।১৫। 'তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি। শ্বেতাশ্বতর। ৪।১৫। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ"। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"। ছান্দোগ্য (৭।১।৩) ৮।১২।১)। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি"। শ্বেতাশ্বতর। ৩।৮। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। বৃহদারণ্যক। ৪।৪।১৪। "দুঃখেনা-ত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" ইত্যাদি।

৩। "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ"॥ [ঋগ্বেদসংহিতা, ৭ম মণ্ডল, ৫ম অষ্টক, চতুর্থ অঃ, ৫৯ম সূক্ত, ১২শ মন্ত্র]

ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামম্বকং পিতরং যজামহে ইতি শিষ্যসমাহিতো বশিষ্ঠো ব্রবীতি। কিং বিশিষ্টমিত্যাত আহ "সুগন্ধিং" প্রসারিতপুণ্যকীর্ত্তিং। পুনঃ কিংবিশিষ্টং? "পুষ্টিবর্দ্ধনং" জগদ্বীজং উরুশক্তিমিত্যর্থঃ, উপাসকস্য

এই বাক্যের দ্বারা মুক্তি যে পরমপুরুষার্থ, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উক্ত বাক্যের দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্তির প্রার্থনা প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পরে উক্ত মন্ত্রের শেষোক্ত "অমৃত" শব্দের অন্যরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহার প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় "মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ" এই বাক্যের দ্বারা সাযুজ্য মুক্তিই যে উক্ত মন্ত্রে চরম প্রার্থ্য, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। "শতপথব্রাহ্মণে"র দ্বিতীয় অধ্যায়েও উক্ত মন্ত্র ও উহার ঐরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের শেষোক্ত "অমৃত" শব্দের মুক্তি অর্থই ঐ স্থলে গ্রহণ করিলে, ঐ বাক্যের দ্বারা "মৃত্যু হইতে মুক্ত হইব, অমৃত অর্থাৎ মুক্তি হইতে মুক্ত (পরিত্যক্ত) হইব না" এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। বেদাদি শাস্ত্রে ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত" শব্দ ও "অমৃতত্ব" শব্দ মুক্তি অর্থেও প্রযুক্ত আছে। মুক্ত অর্থে পুংলিঙ্গ "অমৃত" শব্দেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের শেষে "জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে" এই ভগবদ্গীতা(১৪।২০)বাক্যের ন্যায় মুক্তিবোধক ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত"শব্দেরই যে, প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য শাস্ত্রে পরমপুরুষার্থ মুক্তিকে যেমন "অমৃতত্ব" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মার একদিন (সহস্র চতুর্যুগ) পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে অবস্থানকেও "অমৃতত্ব" বলা হইয়াছে। উহা ঔপচারিক অমৃতত্ব, উহা মুখ্য অমৃতত্ব অর্থাৎ পরমপুরুষার্থরূপ মুক্তি নহে, বিষ্ণুপুরাণে ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে[১]। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার রত্নগর্ভ ভট্ট ও পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"আভূতসংপ্লবং ব্রহ্মাহঃস্থিতিপর্য্যন্তং যৎ স্থানং তদেবামৃতত্বমুপচারাদুচ্যতে"। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে (দ্বিতীয় কারিকার টীকায়) প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত ঐ অমৃতত্বরূপ মুক্তি যে, প্রকৃত মুক্তি নহে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, উহা হইলেও পরে কালবিশেষে পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, সুতরাং উহা মুক্তি নহে। "অপাম সোমমমৃতা অভূম" এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা যজ্ঞকর্ম্মের যে অমৃতত্বরূপ ফল বুঝা যায়, উহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত ঐ ঔপচারিক বা পারিভাষিক অমৃতত্ব। বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে সেখানে বিষ্ণুপুরাণের ঐ বচনেরই পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অমৃতত্ব লাভ হয় না ("ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ") ইহা শ্রুতিতে অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। সুতরাং "অপাম সোমমমৃতা অভূম" এই শ্রুতিবাক্যে সোমপায়ী ব্যক্তিকের যে অমৃতত্বপ্রাপ্তিরূপ ফল বলা হইয়াছে, ঐ অমৃতত্ব প্রকৃত মুক্তি নহে। উহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত গৌণ অমৃতত্ব, ইহাই সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের কথা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সর্ব্বশেষে ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত" শব্দ ("অমৃতত্ব" শব্দ নহে) প্রযুক্ত হওয়ায় এবং উহার পূর্ব্বে "বন্ধন" শব্দ, "মৃত্যু" শব্দ এবং "মুচ" ধাতু প্রযুক্ত হওয়ায় ঐ অমৃত

বর্দ্ধনং অণিমাদিশক্তিবর্দ্ধনং, অতস্তং প্রসাদাদেব মৃত্যোর্ম্মরণাৎ সংসারাদ্বা মুক্ষীয় মোচয়, যথা বন্ধনাদুর্ব্বারুকং কর্কটীফলং মুচ্যতে তদ্বন্মরণাৎ সংসারাদ্বা মোচয়, কিং মর্য্যাদীকৃত্য, আমৃতাৎ সাযুজ্যমোক্ষপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।—সায়ণভাষ্য।

১। "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে॥"

—বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, ৮ম অঃ, ৯৬শ শ্লোক॥

শব্দ যে প্রকৃত মুক্তি অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ হয় না। সায়নাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের শেষে "আহমৃতাৎ" এইরূপ বাক্য বুঝিয়া, উহার দ্বারা "অমৃত" অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি পর্য্যন্ত, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত ব্যাখ্যায় "মুক্ষীয়ং" এইরূপ ক্রিয়াপদই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। পূর্ব্বে তাঁহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত মুক্তি যে বেদসিদ্ধ তত্ত্ব, উহা যে পরে ক্রমশঃ ভারতীয় দার্শনিক ঋষিগণের চিন্তাপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত মুক্তি ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকগণেরই স্বীকৃত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সকাম অধিকারিবিশেষের জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে তদনুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্মজন্য যে স্বর্গফলের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তিনি মুক্তি বলিয়া উল্লেখ না করিলেও প্রাচীন মীমাংসক-সম্প্রদায় তাঁহার সূত্রানুসারে স্বর্গবিশেষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে উহাই মুক্তি। উহা হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে তাঁহারা প্রমাণ বলিয়াছিলেন। "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত প্রাচীন মীমাংসক মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বেদের কর্ম্মকাণ্ডেরই ব্যাখ্যা করায় জ্ঞানকাণ্ডোক্ত তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য মুক্তির কথা তাহাতে বলেন নাই। বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অপ্রমাণ বলিয়া অথবা উহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, উপনিষদুক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তির অপলাপ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা সম্ভবও নহে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বেদের মন্ত্রভাগ এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধায়ক ও ইতিকর্ত্তব্যতাদি-বোধক ব্রাহ্মণভাগকেই তিনি ক্রিয়ার্থক বলিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। কারণ, বেদের ঐ সমস্ত অংশই তাঁহার ব্যাখ্যেয়। সুতরাং তিনি ঐ সূত্রে "আম্নায়" শব্দের দ্বারা উপনিষৎকে গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তিনিও যে নিষ্কাম তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা মুমুক্ষু অধিকারিবিশেষের পক্ষে উপনিষদুক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি স্বীকার করিতেন, এই বিষয়ে সংশয় হয় না। কারণ, বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদের শ্রুতিবাক্যানুসারে মুক্ত পুরুষের অবস্থার বর্ণন করিতে কোন বিষয়ে জৈমিনির মতেরও সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়াছেন; পরে তাহা লিখিত হইবে। মহর্ষি জৈমিনি উপনিষদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া স্বর্গ ভিন্ন মুক্তি পদার্থ অস্বীকার করিলে বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণের ঐ সমস্ত সূত্রের উপপত্তি হয় না। তিনি যে সেখানে অপ্রসিদ্ধ অন্য কোন জৈমিনির মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের বার্ত্তিককার বিশ্ববিখ্যাত মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বর্গভিন্ন মুক্তির স্বরূপ ও কারণাদি বলিয়া গিয়াছেন (শ্লোক-বার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার প্রকরণ, ১০০—১১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরও স্বর্গভিন্ন মুক্তির স্বরূপাদি বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্র "শাস্ত্র-দীপিকা"র তর্কপাদে স্বর্গভিন্ন মুক্তির স্বরূপাদি বিচার করিয়াছেন। তাঁহার কথা পরে লিখিত হইবে। তাঁহার মতে মুক্তির ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রসম্মত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং ঈশ্বরও মীমাংসা-শাস্ত্রের সম্মত, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন মীমাংসকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও পরবর্ত্তী অনেক

মীমাংসাচার্য্য ঐরূপ ঈশ্বরও স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে উল্লিখিত মহর্ষি জৈমিনির কোন কোন মতের পর্য্যালোচনা করিলেও মহর্ষি জৈমিনিও যে, উহা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝা যায়। নব্য মীমাংসাচার্য্য আপোদেব তাঁহার "ন্যায়প্রকাশ" গ্রন্থে ধর্ম্মের স্বরূপাদি ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যদি শ্রীগোবিন্দে অর্পণ-বুদ্ধি-প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে মুক্তির প্রযোজক হয়। শ্রীগোবিন্দে অর্পণ-বুদ্ধিপ্রযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥" এই ভগবদ্গীতারূপ স্মৃতি আছে। ঐ স্মৃতির মূলভূত শ্রুতির অনুমান করিয়া, তাহার প্রামাণ্যবশতঃ উহারও প্রামাণ্য নিশ্চয় করা যায়। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে ঐরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং তদনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত আস্তিকমাত্রেরই স্বীকার্য্য। তাই নব্য মীমাংসকগণ পরে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "শ্লোকবার্ত্তিকে" ভট্ট কুমারিল জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্ব খণ্ডন করিলেও এখন কেহ কেহ তাঁহার মতেও ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, ইহা প্রবন্ধ লিখিয়া সমর্থন করিতেছেন। সে যাহাই হউক, মূলকথা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকেরই স্বীকৃত। যাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মজন্য স্বর্গবিশেষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতেও উহাই মুক্তি। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাকের মতেও মুক্তির অস্তিত্ব আছে। "সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে" চার্ব্বাক মতের বর্ণনায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"মোক্ষস্তু মরণং তচ্চ প্রাণবায়ুনিবর্ত্তনং"। কারণ, চার্ব্বাক মতে দেহ ভিন্ন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব না থাকায় জীবের মৃত্যু হইলে আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং মৃত্যুর পরে সকল জীবেরই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হওয়ায় সকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে। এইরূপ জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকসম্প্রদায়ও মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজ নিজ মতানুসারে উহার স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও কারণাদি বিচার করিয়াছেন। সকল মতেই মুক্তি হইলে আর জন্ম হয় না। সুতরাং মুক্ত আত্মার আর কখনও দুঃখ জন্মে না। সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তাঁহার "কিরণাবলী" টীকায় প্রথমে মুক্তি বিচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "নিঃশ্রেয়সং পুনর্দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী, অত্রচ বাদিনামবিবাদ এব।" মুক্তি হইলে আর কখনও দুঃখ জন্মে না, সুতরাং তখন আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, এ বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের বিবাদ না থাকিলেও ঐ দুঃখনিবৃত্তি কি দুঃখের প্রাগভাব অথবা দুঃখের ধ্বংস অথবা দুঃখের অত্যন্তাভাব, এ বিষয়ে বিবাদ আছে এবং ঐ দুঃখনিবৃত্তির সহিত তখন আত্যন্তিক সুখ বা নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় কি না, এ বিষয়েও বিবাদ বা মতভেদ আছে। এখন আমরা ক্রমশঃ উক্ত মতভেদের আলোচনা করিব। কোন কোন সম্প্রদায়ের মত এই যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাব; উহাই মুক্তি। কারণ, "আমার আর কখনও দুঃখ না হউক" এই উদ্দেশ্যেই মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষার্থ অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং পুনর্ব্বার দুঃখের অনুৎপত্তিই তাঁহার কাম্য। উহা ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব, সুতরাং প্রাগভাব। ভবিষ্যৎ দুঃখ উৎপন্ন না হইলে তাহার ধ্বংস

হইতে পারে না এবং উহার প্রাগভাব থাকিলে অত্যন্তাভাবও বলা যায় না। সুতরাং দুঃখের ঐ প্রাগভাবই মুক্তি। পরন্তু ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদির নিবৃত্তিবশতঃ দুঃখের অপায় বা নিবৃত্তি যাহা মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা যে দুঃখের প্রাগভাব, ইহাই উক্ত সূত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। অবশ্য প্রাগভাব অনাদি পদার্থ, সুতরাং উহার উৎপত্তি না থাকায় জন্য বা সাধ্য পদার্থ নহে। কিন্তু মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য পদার্থ, সুতরাং উহা প্রাগভাব বলা যায় না, ইহা অন্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতবাদিগণ বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের কারণের উচ্ছেদ হইলে আর কখনও দুঃখ জন্মিবে না। তখন হইতে চিরকালই দুঃখের প্রাগভাব থাকিয়া যাইবে, দুঃখের উৎপত্তি না হওয়ায় কখনও ঐ প্রাগভাব নষ্ট হইবে না, সুতরাং উহাতেও তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যতা আছে। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই যাহা রক্ষিত হইবে অর্থাৎ যাহার আর বিনাশ হইবে না, তাহাতেও ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যতা থাকায় তাহা পুরুষার্থও হইতে পারে। তাহার জন্য অনুষ্ঠানও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের উৎপত্তি হইবেই, তাহা হইলে সেই দুঃখের প্রাগভাবও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। দুঃখের প্রাগভাবকে চিরকালের জন্য রক্ষা করিতে হইলে দুঃখের উৎপত্তিকে রুদ্ধ করা আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে জন্মের নিরোধ করা আবশ্যক। উহা করিতে হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির ধ্বংস ও পুনর্ব্বার অনুৎপত্তি আবশ্যক। উহাতে মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ আবশ্যক। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুঃখপ্রাগভাবরূপ মুক্তিও পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। মীমাংসাচার্য্যগণ ঐরূপ সাধ্যতাকে "ক্ষৈমিক সাধ্যতা" বলিয়াছেন। "ক্ষেমস্তু স্থিতরক্ষণং"; যাহা আছে, তাহার রক্ষার নাম "ক্ষেম"। তত্ত্বজ্ঞানের পরে প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইলে তখন হইতে দুঃখের যে প্রাগভাব থাকিবে, তাহার রক্ষাই ক্ষেম, এবং ঐ প্রাগভাবই মুক্তি, উহাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষে মুক্তিবিচারপ্রসঙ্গে উক্ত মতকে মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর গুরুর মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত মত সমর্থন করিয়াও শেষে উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দুঃখের প্রাগভাব পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হইলেও প্রাগভাবের যখন প্রতিযোগিজনকত্ব নিয়ম আছে, তখন মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখ। কিন্তু কোন কালে ঐ দুঃখ না জন্মিলে, তাহার প্রাগভাব থাকিতে পারে না। প্রাগভাব তাহার প্রতিযোগীর জনক। প্রাগভাব থাকিলে অবশ্যই কোন কালে তাহার প্রতিযোগী জন্মিবে। সুতরাং মুক্ত পুরুষের দুঃখের প্রাগভাব থাকিলে তাঁহারও কোন কালে দুঃখ জন্মিবেই। নচেৎ তাঁহার সেই দুঃখের অভাবকে প্রাগভাবই বলা যায় না। কিন্তু মুক্ত পুরুষেরও আবার কখনও দুঃখ জন্মিলে তাঁহাকে কেহই মুক্ত বলিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে, দুঃখের কারণ অধর্ম্ম ও শরীরাদি না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর কখনও দুঃখ জন্মিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সেই দুঃখের অভাব যেমন অনাদি, তদ্রূপ নিরবধি বা অনন্ত হওয়ায় উহা অত্যন্তাভাবই হইয়া পড়ে, উহার প্রাগভাবত্ব থাকে না,

উহা নিত্য হওয়ায় অত্যন্তাভাবই হয়। সুতরাং উহাতে বিনশ্বরজাতীয়ত্ব না থাকায় উহার পূর্ব্বোক্তরূপে সাধ্যতাও সম্ভব হয় না। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও তাঁহার নব মুক্তিবাদ গ্রন্থে উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের যখন আর কখনও দুঃখ জন্মে না, তখন তাঁহার দুঃখপ্রাগভাব থাকিতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ অনাগত বা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে যাহার উৎপত্তি অবশ্যই হইবে, তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী অভাবকে প্রাগভাব বলে। যাহা পরে কখনও হইবে না, তাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না। "আমার দুঃখ না হউক", এইরূপ যে কামনা জন্মে, উহাও উত্তরোত্তর কালের সম্বন্ধবিশিষ্ট দুঃখাত্যন্তাভাববিষয়ক, উহা দুঃখের প্রাগভাববিষয়ক নহে। ঐ অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও উহারও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাগভাবের ন্যায় সাধ্যত্বের কোন বাধক নাই। ফলকথা, গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্ত পুরুষের দুঃখের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে দুঃখের ধ্বংস ও প্রাগভাব থাকিলেও দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে। তাঁহার মতে ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা নাই। এবং তিনি দুঃখের প্রাগভাবের অভাববিশিষ্ট যে দুঃখের অত্যন্তাভাব, তাহাকেই "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি" বলিয়া মুক্তির স্বরূপ বলিতেও কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভাকর মত স্বীকার করেন নাই। এবং নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মধ্যে আর কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারও যে উক্ত মত স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও জানা যায় না। কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য মহামনীষী শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকদর্শনের চতুর্থ সূত্রের উপস্কারে পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মার অশেষ বিশেষ-গুণের ধ্বংসাবধি দুঃখপ্রাগভাবই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, উহাই মুক্তি। মুক্তি হইলে তখন আত্মার অদৃষ্টাদি সমস্ত বিশেষ গুণেরই ধ্বংস হয় এবং আর কখনও দুঃখ জন্মে না। সুতরাং আত্মার তৎকালীন যে দুঃখপ্রাগভাব, তাহাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে এবং উহা পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হওয়ায় পুরুষার্থও হইতে পারে। মুক্ত পুরুষের যখন আর কখনও দুঃখ জন্মে না, তখন তাঁহার দুঃখপ্রাগভাব কিরূপে সম্ভব হইবে? এতদুত্তরে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রতিযোগীর জনক অভাবই প্রাগভাব। প্রতিযোগীর জনক বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে, প্রতিযোগীর স্বরূপযোগ্য। অর্থাৎ প্রতিযোগীর উৎপাদন না করিলেও যাহার উহাতে যোগ্যতা আছে। দুঃখপ্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখ। কিন্তু উহার উৎপাদনে উহার প্রাগভাব কারণ হইলেও চরম সামগ্রী নহে। অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাব থাকিলেই যে দুঃখ অবশ্য জন্মিবে, তাহা নহে। দুঃখের উৎপত্তিতে আরও অনেক কারণ আছে। সেই সমস্ত কারণ না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর দুঃখ জন্মে না। শঙ্করমিশ্র শেষে ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ঐ সূত্রের দ্বারাও দুঃখের প্রাগভাবই যে মুক্তি, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, ঐ সূত্রে জন্মের অপায়প্রযুক্ত যে দুঃখাপায়কে মুক্তি বলা হইয়াছে, তাহা অতীত দুঃখের ধ্বংস হইতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও দুঃখের উৎপত্তি না হওয়াই ঐ সূত্রোক্ত দুঃখাপায়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং ঐ দুঃখের অনুৎপত্তি যখন ফলতঃ ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব, তখন উহা যে প্রাগভাব, ইহা অবশ্য

স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত সূত্রানুসারে যে পদার্থ পরে জন্মিবে না, তাহার প্রাগভাবও যে মহর্ষি গোতমের স্বীকৃত, ইহাও স্বীকার্য্য। পরন্তু লোকে সর্প ও কণ্টকাদির যে নিবৃত্তি, তাহার ফলও দুঃখের অনুৎপত্তি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব। কারণ, পথে সর্প বা কণ্টকাদি থাকিলে, তজ্জন্য ভবিষ্যৎ দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই লোকে উহার নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং সেখানে যেমন দুঃখ না জন্মিলেও দুঃখের প্রাগভাব স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের ভবিষ্যতে কখনও দুঃখ না জন্মিলেও তাঁহার দুঃখপ্রাগভাব স্বীকার করা যায়। ফলকথা, শঙ্করমিশ্র মীমাংসাচার্য্য প্রভাকরের ন্যায় যে পদার্থ পরে উৎপন্ন হইবে না, তাহারও প্রাগভাব স্বীকার করিয়াছেন। ঐরূপ প্রাগভাব মীমাংসাশাস্ত্রে "পণ্ডপ্রাগভাব" নামে কথিত হইয়াছে। যে প্রাগভাব কখনও তাহার প্রতিযোগী জন্মাইতে পারিবে না, তাহাকে "পণ্ডপ্রাগভাব" বলা যায়। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ ঐরূপ প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করেন নাই।

কোন সম্প্রদায়ের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক অত্যন্তাভাব, উহাই মুক্তি। মুক্ত পুরুষের আর কখনও দুঃখ জন্মিবে না। কারণ, তাঁহার দুঃখের সাধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎকালে তাঁহার দুঃখপ্রাগভাবও নাই। সুতরাং তখন তাঁহার দুঃখের প্রাগভাবের অসমানকালীন যে দুঃখধ্বংস, তৎসম্বন্ধে দুঃখের অত্যন্তাভাবকে মুক্তি বলা যাইতে পারে। পরন্তু "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা দুঃখের অত্যন্তাভাবই যে মুক্তি, ইহাই বুঝা যায়। শঙ্করমিশ্র পরে উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব সর্ব্বথা নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা সাধ্য পদার্থ না হওয়ায় পুরুষার্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখধ্বংসও উহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাবই অত্যন্তাভাবের সমানরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও আরও নানা যুক্তির দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কোন সম্প্রদায় দুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীন যে দুঃখসাধনধ্বংস, উহাই মুক্তি বলিয়াছেন। "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপ উক্ত বিষয়ে আরও অনেক মত ও তাহার খণ্ডন-মণ্ডনাদি নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থের দ্বারা তাঁহাদিগের নিজের মত বুঝা যায় যে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস, উহাই মুক্তি। দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস বলিতে যে আত্মার মুক্তি হয়, তাহার দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস। মুক্তি হইলে আর যখন কখনও দুঃখ জন্মিবে না, তখন মুক্ত আত্মার দুঃখধ্বংস তাঁহার দুঃখের সহিত কখনও সমানকালবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, তাঁহার ঐ দুঃখধ্বংসের পরে আর কখনও দুঃখের উৎপত্তি না হওয়ায় কখনও দুঃখ ও দুঃখধ্বংস মিলিত হইয়া তাঁহাতে থাকিবে না। সুতরাং ঐরূপ দুঃখধ্বংস তাঁহার দুঃখের অসমানকালীন হওয়ায় উহাকে মুক্তি বলা যায়। সংসারী জীবেরও দুঃখের পরে

দুঃখধ্বংস হইতেছে, কিন্তু তাহার পরে আবার দুঃখও জন্মিতেছে, এবং মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্জ্জন্মপরিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অন্যান্য জন্মেও তাহার দুঃখ অবশ্য জন্মিবে। সুতরাং সংসারী জীবের যে দুঃখধ্বংস, তাহা তাহার দুঃখের সমানকালীন। কারণ, যে সময়ে তাহার আবার দুঃখ জন্মে, তখনও তাহার পূর্ব্বজাত দুঃখধ্বংস বিদ্যমান থাকায় উহা তাহার দুঃখের সহিত এক সময়ে মিলিত হয়। সুতরাং তাহার ঐরূপ দুঃখধ্বংস মুক্তি হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বজাত দুঃখসমূহের অসমানকালীন যে দুঃখধ্বংস, তাহা মুক্তি হইতে পারে। কারণ, উহা সেই আত্মগত-দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস, উহাই মুক্তির স্বরূপ। এক কথায় চরম দুঃখধ্বংসই মুক্তির স্বরূপ বলা যায়। যে দুঃখের পরে আর কখনও দুঃখ জন্মিবে না, সুতরাং সেই দুঃখধ্বংসের পরে আর দুঃখধ্বংসও জন্মিবে না,—সেই দুঃখধ্বংসই চরম দুঃখধ্বংস, উহারই নাম আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, উহাই মুক্তি। যে আত্মার মুক্তি হয়, তাঁহার ঐ দুঃখধ্বংসে যে তাঁহার দুঃখের অসমানকালীনত্ব, তাহাই ঐ দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব বা চরমত্ব। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং দুঃখও অবশ্যম্ভাবী, অতএব তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বোক্তরূপ চরম দুঃখধ্বংস হইতেই পারে না। সুতরাং উহা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অবশ্য মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বজাত দুঃখসমূহ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীতও পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কোন দুঃখ জন্মিলে এবং উহার পরে প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য দুঃখ জন্মিলে তাহাও ভোগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সমস্ত দুঃখের বিনাশেও তত্ত্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখধ্বংস তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য না হওয়ায় উহাকে মুক্তি বলা যায় না, এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী সম্প্রদায় উক্ত মতকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বব্যাখ্যাত চরম দুঃখধ্বংস সম্ভবই হয় না। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পুনর্জ্জন্মের অবশ্যম্ভাবিতাবশতঃ আবার দুঃখোৎপত্তি অবশ্যই হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বজাত দুঃখধ্বংসকে আর চরমধ্বংস বলা যাইবে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চরম দুঃখধ্বংসকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিতেই হইবে,—উহার চরমত্ব বা আত্যন্তিকত্বই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত। তাই উহা ঐরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া উহাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যেরূপ দুঃখাভাবই হউক, উহাই পরমপুরুষার্থ, সুতরাং উহাই মুক্তির স্বরূপ, ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের প্রচলিত সিদ্ধান্ত। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" এই সাংখ্যসূত্রের দ্বারা সাংখ্যমতেও প্রথমে উক্ত সিদ্ধান্তই প্রকটিত হইয়াছে। "হেয়ং দুঃখমনাগতং" এই যোগসূত্রের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়।

এখন বিচার্য্য এই যে, মুক্তি হইলে যদি তখন কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই হয়, তৎকালে কোন সুখবোধ ও ঐ দুঃখনিবৃত্তির বোধও না থাকে, তাহা হইলে তখন ঐ অবস্থা মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য হওয়ায় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং উহার জন্য কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখনিবৃত্তিমাত্র পুরুষার্থ হইবে কিরূপে? অনেক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখনিবৃত্তিমাত্রকে মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য বলিয়া পুরুষার্থ বলিয়া

স্বীকার করেন নাই[১]। নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত কথার অবতারণা করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল দুঃখনিবৃত্তিও স্বতঃ পুরুষার্থ। কারণ, সুখ উদ্দেশ্য না করিয়াও দুঃখভীরু ব্যক্তিদিগের কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যও প্রবৃত্তি দেখা যায়। দুঃখনিবৃত্তিকালে সুখও হইবে, এই উদ্দেশ্যে দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকলে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব মুক্তিকালে সুখ নাই বলিয়া যে, তৎকালীন দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে সুখের সময়ে ও পূর্ব্বে বা পরে দুঃখের অভাব না থাকায় ঐ সমস্ত সুখও পুরুষার্থ নহে, ইহাও বলিতে পারি। অতএব মুক্তিকালে সুখ না থাকিলেও উহা পুরুষার্থ বা পুরুষের কাম্য হইতে পারে। তৎকালে সুখ নাই, এইরূপ জ্ঞান ঐ দুঃখাভাবরূপ মুক্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকও হয় না। কারণ, কেবল দুঃখনিবৃত্তিও জীবের কাম্য, তাহার জন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। পরে ঐ দুঃখনিবৃত্তির জ্ঞান না হইলেও উহা পুরুষার্থ হইতে পারে। কারণ, উহার জ্ঞান কাহারও প্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে। দুঃখনিবৃত্তিই উদ্দেশ্য হইলে উহাই সেখানে প্রবৃত্তির প্রয়োজক হয়। পরন্তু বহুতর অসহ্য দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া অনেকে কেবল ঐ দুঃখনিবৃত্তির জন্যই আত্মহত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হয়। মরণের পরে তাহার তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞান বা কোন সুখ-বোধও হয় না। এইরূপ কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সুখভোগের জন্য প্রবৃত্ত হন না। যাহারা অবিবেকী, কেবল সুখভোগমাত্রেই ইচ্ছুক, তাহারা ঐ সুখভোগের জন্য নানা দুঃখ স্বীকার করিয়াও পরদারাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সুখ ত্যাগ করিয়া কখনও পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তি চায় না, ঐরূপ মুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মুক্তিতে অধিকারী নহে। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা এই সাংসারিক সুখকে কুপিত সর্পের ফণামণ্ডলের ছায়াসদৃশ মনে করিয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য একেবারে সমস্ত সুখকেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই মুক্তিতে অধিকারী[২]। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত মতে মুক্তি হইলে তখন মুক্ত পুরুষের কোন সুখবোধ হয় না, কোন বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে না শরীরাদির অভাবে তখন জ্ঞানাদি জন্মিতেই পারে না। নিত্য সুখের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, মুক্তিকালে তাহার অনুভূতিরও কোন কারণ নাই। সুতরাং মুক্তি হইলে তখন নিত্য সুখের অনুভূতিও জন্মে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে বিশদ বিচার-পূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন। (প্রথম খণ্ড, ১৯৫—২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গৌতম-ন্যায়ের ব্যাখ্যাকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি সমস্ত আচার্য্যই গৌতম-মতে মুক্তিকালে কোন সুখানুভূতি বা কোন

১। অথ "দুঃখাভাবোঽপি নাবেদ্যঃ পুরুষার্থতয়েষ্যতে। ন হি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ॥" ইত্যাদি। ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

২। তস্মাদবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিপ্সবো বহুতরদুঃখানুবিদ্ধমপি সুখমুদ্দিশ্য "শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাস্যতী"তি কৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানা "বরং বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ। যে চ বিবেকিনোঽস্মিন্ সংসারকান্তারে "কিয়ন্তি দুঃখদুর্দ্দিনানি কিয়তী সুখখদ্যোতিকেতি কুপিতফণিফণামণ্ডলচ্ছায়াপ্রতিমমিদমিতি মন্যমানাঃ সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি, তেঽত্রাধিকারিণঃ।—ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

জ্ঞানই জন্মে না, কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। "কিরণাবলী"র প্রারম্ভে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এবং "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রবক্তা গোতম মুনির মতে মুক্তি যে, প্রস্তরভাব অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় সুখদুঃখশূন্য জড়ভাবে আত্মার স্থিতি, ইহা মহামনীষী শ্রীহর্ষও নৈষধীয়চরিতকাব্যের সপ্তদশ সর্গে ৭৫ম শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ২৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থের শেষভাগে মহামনীষী মাধবাচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন স্থানে কোন নৈয়ায়িক তাঁহাকে গর্ব্বের সহিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তবে কণাদসম্মত মুক্তি হইতে গোতমসম্মত মুক্তির বিশেষ কি, তাহা বল। নচেৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার গুণসম্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশপ্রযুক্ত আকাশের ন্যায় স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু গোতমের মতে উক্ত অবস্থায় আনন্দানুভূতিও থাকে[১]। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের সত্যতা না থাকিলেও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মাধবাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তি ঐরূপ অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। সুতরাং উহার অবশ্যই কোন মূল ছিল, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃত "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ" গ্রন্থেও নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় পূর্ব্বোক্তরূপ মত বুঝিতে পারা যায়[২]। সুতরাং প্রাচীন কালে কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় যে গোতমসম্মত মুক্তিকালে আনন্দানুভূতিও স্বীকার করিতেন, ইহা স্বীকার্য্য। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডনের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। নচেৎ তাঁহার ঐ স্থলে ঐরূপ বিচারের কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায় না। মুক্তি বিষয়ে তিনি সেখানে আর কোন মতের বিচার করেন নাই। এখন দেখা আবশ্যক, পূর্ব্বকালে কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ন্যায়মতে মুক্ত আত্মার নিত্য সুখের অনুভূতিও হয়, এই মত সমর্থন করিয়াছেন কি না? আমরা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি গোতম-মতব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণের গ্রন্থে উক্ত মতের খণ্ডনই দেখিতে পাই, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সার" গ্রন্থে (আগম পরিচ্ছেদে) উক্ত মতেরই সমর্থন দেখিতে পাই এবং পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক মতের প্রতিবাদও দেখিতে পাই। ভাসর্ব্বজ্ঞ উক্ত মত সমর্থন করিতে "সুখমাত্যন্তিকং যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং। তং বৈ মোক্ষং

১। "তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্ব্বঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে।
মুক্তের্বিশেষং বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্ত্বে"॥
"অত্যন্তনাশে গুণসংগতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসংবিৎসহিতা বিমুক্তিঃ"॥—সংক্ষেপশঙ্করজয়। ১৬ অঃ, ৬৮।৬৯।

২। নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যান্মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে।
বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং॥
ন বৈশেষিকোক্তমোক্ষাত্ত সুখলেশবিবর্জ্জিতাৎ।" ইত্যাদি সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ষষ্ঠ প্রকরণ. নৈয়ায়িক পক্ষ।

বিজানীয়াদ্‌দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥" এই স্মৃতিবচনও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উপসংহারে "ন্যায়সারে"র শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখিয়াছেন,—"তৎসিদ্ধমেতন্নিত্যসংবেদ্যমানেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষঃ"। "ন্যায়সারে"র অন্যতম টীকাকার জয়তীর্থ ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,—"সুখেনেতি পদেন কণাদাদিমতে মোক্ষপ্রতিক্ষেপঃ।" অর্থাৎ কণাদ প্রভৃতির মতে মুক্ত আত্মার সুখানুভূতি থাকে না। ভাসর্ব্বজ্ঞ মুক্তির স্বরূপ বলিতে "সুখেন" এই পদের দ্বারা কণাদ প্রভৃতির সম্মত মুক্তির প্রতিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিত্য অনুভূয়মান সুখ-বিশেষবিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। কণাদাদির সম্মত কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মূর্চ্ছাদি অবস্থার তুল্য, উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না, সুতরাং উহাকে মুক্তি বলা যায় না। ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সার" গ্রন্থের অষ্টাদশ টীকার মধ্যে "ন্যায়ভূষণ" নামে টীকা মুখ্য, ইহা "ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়ে"র টীকাকার গুণরত্ন লিখিয়াছেন। ঐ টীকাকার ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ প্রমাণত্রয়বাদী ন্যায়ৈক-দেশী। তার্কিকরক্ষা গ্রন্থের টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—"ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ"। (১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "ন্যায়সারে"র ঐ মুখ্য টীকা "ন্যায়ভূষণ" এ পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট না হইলেও ঐ টীকাকার ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ যে, মুক্তিবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ভাসর্ব্বজ্ঞের মতকেই বিশেষরূপে সমর্থনপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা জানা যায়। রামানুজসম্প্রদায়ের অন্তর্গত মহামনীষী শ্রীবেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার "ন্যায়পরিশুদ্ধি"তে (কাশী চৌখাম্বা, সংস্কৃতসীরিজ ১ম খণ্ড, ১৭শ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখসংবেদনসিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা"। তিনিও মুক্তিবিষয়ে প্রচলিত ন্যায়মত উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ন্যায়দর্শনে দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তিকে মুক্তি বলা হইলেও উহাতে যে আনন্দের অনুভূতি হয় না, মুক্ত আত্মা জড়ভাবেই অবস্থান করেন, ইহা ত বলা হয় নাই। পরন্তু মুক্তি হইলে তখন যে নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। ন্যায়দর্শনে উহার বিরুদ্ধবাদ কিছু না থাকায় ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমেরও যে, উহাই মত ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায়।—"ন্যায়পরিশুদ্ধি"কার বেঙ্কটনাথ তাঁহার এই মত সমর্থন করিতেই পরে "অতএব হি ভূষণমতে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভূষণও যে, মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতমোক্ত উপমান-প্রমাণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়বিশেষ "নৈয়ায়িকৈকদেশী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মতে কেবল আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি নহে। কিন্তু মুক্তি হইলে তখন নিত্যসুখের আবির্ভাবও হয়, ইহা "সর্ব্বমত-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে[১]। "ন্যায়পরিশুদ্ধি"কার বেঙ্কটনাথের মতে ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমেরও উহাই মত। সে যাহাই হউক, ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞ ও তাঁহার সম্প্রদায় ভূষণ প্রভৃতি "ন্যায়ৈকদেশী" নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের যে, উহাই মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অনেকের

১। উক্তং হি প্রত্যক্ষানুমানাগমপ্রমাণবাদিনো নৈয়ায়িকৈকদেশিনঃ। অক্ষপাদবদেব প্রমাণাদিস্বরূপস্থিতিঃ। মোক্ষস্তু ন দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং, অপি তু নিত্যসুখস্যাবির্ভাবোহপি, তস্য জন্যত্বেহপি নিখিলদুঃখপ্রধ্বংসরূপত্বাদবিনাশিত্বঞ্চ উপপদ্যতে ইতি।—সর্ব্বমতসংগ্রহ।

মতে ভাসর্ব্বজ্ঞের সময় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী। ইহা সত্য হইলেও তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে, তাঁহার গুরুসম্প্রদায় মুক্তি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মতই প্রচার করিতেন, এ বিষয়েও সংশয় নাই। শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাসর্ব্বজ্ঞই যে প্রথমে উক্ত মতের প্রবর্ত্তক, ইহা বলা যায় না। পরন্তু যাঁহারা "ন্যায়ৈকদেশী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও বহু পূর্ব্ব হইতে নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার "মানসোল্লাস" গ্রন্থে ঐ "ন্যায়ৈকদেশী" সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ সুরেশ্বরাচার্য্যের "মানসোল্লাস" গ্রন্থের শ্লোকই[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। কারণ, সুরেশ্বরাচার্য্য বরদরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার "মানসোল্লাস" গ্রন্থের "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ" ইত্যাদি শ্লোকত্রয় বরদরাজের নিজকৃত বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং পরবর্ত্তী ভূষণ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদিগের বহু পূর্ব্বেও যে, "ন্যায়ৈক-দেশী" সম্প্রদায় ছিলেন এবং তাঁহারাও ভাসর্ব্বজ্ঞ ও ভূষণ প্রভৃতির ন্যায় মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি মত সমর্থন করিতেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরন্তু প্রথম অধ্যায়ে মুক্তির লক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখ করিতে "কেচিৎ" এই পদের দ্বারা যে, শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের প্রাচীন গুরুসম্প্রদায়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত শৈবসম্প্রদায় ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মত বলিয়াই উক্ত মত প্রচার করিতেন। মহর্ষি গোতমও শৈব ছিলেন, এবং তিনি শিবের অনুগ্রহ ও আদেশেই ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত শৈব মতেরই উপদেষ্টা, ইত্যাদি কথাও তাঁহারা বলিতেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। এই জন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পরে তাঁহার নিজ মতানু-সারে উক্ত বিষয়ে গোতম-ন্যায়মতের প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তির লক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত শৈব মতের খণ্ডন করিতে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ঐ স্থলে ঐরূপ বিচারের কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায় না। পরন্তু আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার "ন্যায়সার" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত শৈব মত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি যে স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "আত্যন্তিক সুখ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত মতের প্রতিপাদক শাস্ত্রের "সুখ" শব্দের দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে "আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনাৎ" এবং "যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্যান্মুক্তস্যাত্যন্তিকং সুখমিতি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, (প্রথম খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তিনি সেখানে শ্রুতিবাক্যস্থ "আনন্দ" শব্দকে গ্রহণ করেন নাই, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং তিনি যে সেখানে পূর্ব্বোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি স্মৃতিবচনকেই "আগম" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা অবশ্য বুঝিতে পারি। তাহা হইলে আমরা ইহা বলিতে পারি

১। "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ, তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন" ইত্যাদি।—মানসোল্লাস, ২য় উঃ, ১৭।১৮।১৯।

যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের গুরুসম্প্রদায় নিজমত সমর্থন করিতে শাস্ত্রপ্রমাণরূপে পূর্ব্বোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি বচন উল্লেখ করিতেন। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত বচনকেই "আগম" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, নিজ মতানুসারে উহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ভাসর্ব্বজ্ঞও পূর্ব্বোক্ত শৈব মত সমর্থন করিতে তাঁহার পূর্ব্বসম্প্রদায়-প্রাপ্ত উক্ত স্মৃতিবচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুধীগণ এই কথাটা প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন। ফলকথা, আমরা ইহা অবশ্য বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মত বলিয়াই মুক্তি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মত সমর্থন করিতেন। ন্যায়দর্শনের কোন সূত্রে উক্ত মতের বিরুদ্ধবাদ নাই, ইহা বলিয়া অথবা তৎকালে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে প্রচলিত কোন ন্যায়সূত্রের দ্বারাও তাঁহারা উক্ত মতের প্রচার করিতে পারেন। তাই 'সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থে মাধবাচার্য্য উক্ত প্রাচীন প্রবাদানুসারেই প্রশ্নকর্ত্তা নৈয়ায়িকবিশেষের নিকটে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উত্তরের বর্ণনায় পূর্ব্বোক্তরূপ কথা লিখিয়াছেন। তিনি নিজে কল্পনা করিয়া ঐরূপ অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। সেখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শঙ্করাচার্য্যের নিকটে প্রশ্নকর্ত্তা নৈয়ায়িক পূর্ব্বোক্ত মতবাদী শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন নৈয়ায়িকও হইতে পারেন। তাহা না হইলেও তিনি যে, কণাদ-সম্মত মুক্তি হইতে গোতম-সম্মত মুক্তির বিশেষই শুনিতে চাহেন, তাহা বলিতে না পারিলে তিনি শঙ্করাচার্য্যকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবেন না, ইহা সেখানে স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং "সর্ব্বজ্ঞ" শঙ্করাচার্য্য সেখানে শৈবসম্প্রদায়বিশেষের মতানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ বলিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই মাধবাচার্য্যও ঐরূপ লিখিয়াছেন। "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহে"ও নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় উক্ত প্রাচীন মতই কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত মতের খণ্ডন করায় সেই সময় হইতে তন্মতানুবর্ত্তী গোতম মতব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সকলেই মুক্তি বিষয়ে বাৎস্যায়নের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কণাদসম্মত মুক্তি হইতে গোতম-সম্মত মুক্তির পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "অক্ষপাদদর্শন" প্রবন্ধে মাধবাচার্য্যও মুক্তিবিষয়ে প্রচলিত ন্যায়মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই মতকে তিনি সেখানে ভট্ট ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতির মত বলিয়া বিচারপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

নিত্যসুখের অনুভূতি মুক্তি, এই মতকে মাধবাচার্য্যের ন্যায় আরও অনেক গ্রন্থকার ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত ভট্টমতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন এবং তিনি নিজেও তাঁহার "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মতকে ভট্টমত বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক উহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থকার উক্ত ভট্টমতের সমালোচনা করিয়াছেন। এখন তাঁহারা "ভট্ট" শব্দের দ্বারা কোন্ ভট্টকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি কোন্ গ্রন্থে কিরূপে উক্ত ভট্টমতের সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণ যে কুমারিল ভট্টকেই "ভট্ট" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল

ভট্টই যে, কেবল "ভট্ট" শব্দের দ্বারা বহুকাল হইতে নানা গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং কুমারিলের মতই যে, "ভট্টমত" বলিয়া কথিত হয়, ইহা বুঝিবার বহু কারণ আছে। সুতরাং যাঁহারা নিত্য সুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা ভট্টমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে উহা কুমারিল ভট্টের মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "কিরণাবলী" টীকার প্রথমে মুক্তির স্বরূপ বিচারে "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত মতকে "তৌতাতিত" সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য "তৌতাতিত" এই নামটি যদি কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর হয়, তাহা হইলে উদয়নাচার্য্যও উক্ত মতকে কুমারিলের মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। "তুতাত" ও "তৌতাতিত" কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর, ইহা বিশ্বকোষে (কুমারিল শব্দে) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ লিখিত হয় নাই। বস্তুতঃ তুতাত" ও "তৌতাতিত" এই নামদ্বয় যে, কুমারিল ভট্টের নামান্তর, ইহা প্রাচীন সংবাদের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কারণ, মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পাণিনিদর্শনে "তদুক্তং তৌতা তিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া "যাবন্তো যাদৃশা যেচ যদর্থপ্রতি-পাদনে" ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিল ভট্টের "শ্লোকবার্ত্তিকে" (স্ফোটবাদে ৬৯ম) দেখা যায়। পরন্তু বৈশেষিকদর্শনের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের বিংশ সূত্রের "উপস্কারে" মহামনীষী শঙ্করমিশ্র শব্দের শক্তি বিষয়ে কুমারিলের মতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইতি তৌতাতিকাঃ"। পরে তিনি উক্ত বিষয়ে মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরের মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকের প্রারম্ভে দেখা যায়—"নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং"। এখানে "তুতাত" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুরু প্রভাকরের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টই যে গৃহীত হইয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। "তুতাত" যদি কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনকে "তৌতাতিক" দর্শন বলা যায় এবং তাঁহার সম্প্রদায়কেও "তৌতাতিক" বলা যাইতে পারে। "কিরণাবলী" ও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র পাঠানুসারে যদি "তৌতাতিত" এই নামান্তরও গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শঙ্কর মিশ্রের উপস্কারে ইতি "তৌতাতিতাঃ" এইরূপ পাঠও প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শঙ্করমিশ্রের "তৌতাতিকাঃ" এই পাঠের ন্যায় উদয়নাচার্য্যের "তৌতাতিকাস্তু" এবং মাধবাচার্য্যের "তৌতাতিকৈঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝিলে "তৌতাতিত" এইটীও যে কুমারিল ভট্টের নামান্তর ছিল, ইহা বুঝিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। ঐরূপ নামান্তরেরও কোন কারণ বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, মূল কথা নিত্য সুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা যে ভট্ট কুমারিলের মত, ইহা বুঝিবার অনেক কারণ আছে। শঙ্করাচার্য্যবিরচিত "সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ" নামক গ্রন্থেও কুমারিল ভট্টের মতের বর্ণনায় মুক্তি বিষয়ে তাঁহার উক্তরূপ মতই বর্ণিত হইয়াছে[১]

১। পরানন্দানুভূতিঃ স্যান্মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে।
বিষয়েষু বিরক্তাঃ স্যুর্নিত্যানন্দানুভূতিতঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং মোক্ষমেব মুমুক্ষবঃ॥—সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ভট্টাচার্য্যপক্ষ।

এবং গুরু প্রভাকরের মতে সুখদুঃখশূন্য পাষাণের ন্যায় অবস্থিতিই মুক্তি, ইহাই কথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট তাঁহার "মানমেয়োদয়" নামক মীমাংসা-গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,[১] দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইলে তখন আত্মাতে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান নিত্যানন্দের যে অনুভূতি হয়, উহাই কুমারিল ভট্টের সম্মত মুক্তি। সুতরাং এই মতানুসারে "কিরণাবলী" গ্রন্থে "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উদয়নাচার্য্য যে, কুমারিল ভট্টের মতেরই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে এবং তিনি সেখানে উক্ত মতবাদী সম্প্রদায়কে অনেক উপহাস করার তজ্জন্যই প্রসিদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া, উপহাসব্যঞ্জক "তৌতাতিতা-(কা) স্তু" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে।

কিন্তু উক্ত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা যে ভট্ট কুমারিলের মত ছিল, ইহা সর্ব্বসম্মত নহে। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট ঐরূপ লিখিলেও কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা মহামীমাংসক পার্থসারথিমিশ্র তাঁহার "শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থের তর্কপাদে প্রথমে আনন্দ-মোক্ষবাদীদিগের মতের বর্ণন ও সমর্থনপূর্ব্বক পরে বিশেষ বিচারদ্বারা উক্ত মতের খণ্ডনপূর্ব্বক মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি হয় না, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে কতিপয় সরল শ্লোকের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন[২]। তবে উক্ত বিষয়ে ভট্ট কুমারিলের প্রকৃত মত কি ছিল, এই বিষয়ে পূর্ব্বকালেও যে বিচার ও মতভেদ হইয়াছিল, ইহাও পার্থসারথিমিশ্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে উক্ত বিষয়ে অপর সম্প্রদায়ের যে মতের যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,[৩] উহাই তাঁহার নিজমত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি শাস্ত্রদীপিকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—"কুমারিলমতেনাহং করিষ্যে শাস্ত্রদীপিকাং"। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত মতকে তাঁহার মতে কুমারিলের মত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরবর্ত্তী নারায়ণ ভট্টের মতের অপেক্ষায় তাঁহার মত যে সমধিক মান্য, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। পরবর্ত্তী মীমাংসক গাগাভট্টও "ভট্টচিন্তামণি"র তর্কপাদে সুখ ও

১। দুঃখাত্যন্তসমুচ্ছেদে সতি প্রাগাত্মবর্ত্তিনঃ।
নিত্যানন্দস্যানুভূতির্মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ ॥—মানমেয়োদয়, প্রমেয়পঃ, ২৬শ।

২। তেনাভাবাত্মকত্বেঽপি মুক্তের্নাপুরুষার্থতা।
সুখদুঃখোপভোগোহি সংসার ইতি শব্দ্যতে ॥ ৮ ॥
তয়োরনুপভোগস্তু মোক্ষং মোক্ষবিদো বিদুঃ।
শ্রুতিরপ্যেবমেবাহ ভেদং সংসারমোক্ষয়োঃ ॥ ৯ ॥
নহবৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়বিহীনতা।
অশরীরং বাব সন্তং স্পৃশতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে ॥—ইত্যাদি শাস্ত্রদীপিকা, তর্কপাদ।

৩। "অপরে ত্বাহুঃ—অভাবাত্মকত্ববচনমেব স্বমতং, উপপত্ত্যভিধানাৎ। আনন্দবচনন্তু উপন্যাসমাত্রত্বাৎ পরমতং। নহি মুক্তস্যানন্দানুভবঃ সম্ভবতি, কারণাভাবাৎ। মনঃ স্যাদিতি চেৎ? ন, অমনস্কত্বশ্রুতেঃ, "অমনোঽবাক্" ইতি—শাস্ত্রদীপিকা, তর্কপাদ।

দুঃখ, এই উভয়ের উপভোগাভাবকেই মুক্তি বলিয়াছেন[১]। বস্তুতঃ কুমারিলভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে "সুখোপভোগরূপশ্চ" ইত্যাদি[২] শ্লোকের দ্বারা মুক্তি যদি সুখের উপভোগরূপ হয়, তাহা হইলে উহা স্বর্গবিশেষই হয়, তাহা হইলে কোন কালে উহার অবশ্যই বিনাশ হইবে, উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এইরূপ অনেক যুক্তি প্রকাশ করিয়া, কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই যে, তাঁহার মতে মুক্তি, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। মুক্তি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অভাবাত্মক না হইলে তাহার নিত্যত্ব সম্ভব হয় না, ইহাও তিনি সেখানে বলিয়াছেন। সুতরাং কুমারিলের সযুক্তিক সিদ্ধান্তবোধক ঐ সমস্ত শ্লোকের দ্বারা তিনি যে, নিত্যসুখের অনুভূতিকে মুক্তি বলিতেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি যে জীবাত্মাতে নিত্য আনন্দ এবং মুক্তিকালে উহার অভিব্যক্তি স্বীকার করিতেন, ইহা তাঁহার কোন শ্লোকেই আমি পাই নাই। পার্থসারথিমিশ্র প্রথমে আনন্দমোক্ষবাদীদিগের মতের সমর্থন করিতে উপসংহারে যে শ্লোকটি (নিজং যত্ত্বাত্মচৈতন্যং" ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকে নাই। পার্থসারথিমিশ্র উক্ত বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করিতে যে, "আনন্দবচনন্ত" এই কথা লিখিয়াছেন, উহারও মূল ও ব্যাখ্যা বুঝিতে পারি নাই। পরন্ত "কিরণাবলী" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য "তৌতাতিতাস্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভে কুমারিল ভট্টকেই যে "তৌতাতিত" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ সমর্থন করা যায়। কারণ, মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে "আর্হতদর্শনে" "তথা চোক্তং তৌতাতিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া যে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের শ্লোক নহে। কুমারিলের ঐ ভাবের কতিপয় শ্লোক, যাহা শ্লোকবার্ত্তিকে দেখা যায়, তাহার পাঠ অন্যরূপ[৩]। সুতরাং কুমারিলের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত অনেক অংশে একমতাবলম্বী "তৌতাতিত" বা "তুতাত" নামে কোন মীমাংসাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার শ্লোকই মাধবাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও আমরা অবশ্য মনে করিতে পারি। কালে কুমারিলের

১। তস্মাৎ প্রপঞ্চস্য সর্ব্বথাবিলয়ো মুক্তিঃ। স চ দুঃখাভাবরূপত্বাৎ পুরুষার্থঃ। তেন সুখদুঃখোপভোগাভাবো মোক্ষ ইতি ফলিতং। ভট্টচিন্তামণি—তর্কপাদ।

২। সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গ এব ভবেদেষ পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ॥ নহি কারণবৎ কিঞ্চিদক্ষয়িত্বেন গম্যতে। তস্মাৎ কর্ম্মক্ষয়াদেব হেত্বভাবেন মুচ্যতে॥ ন হ্যভাবাত্মকং মুক্ত্বা মোক্ষনিত্যত্বকারণং॥ ইত্যাদি শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার-প্রকরণ, ১০৫—১০॥

৩। "তথাচোক্তং তৌতাতিতৈঃ—

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ॥
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞবোধকঃ॥ ইত্যাদি—"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" আর্হত দর্শন।
সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
নিরাকরণবচ্ছক্যা ন চাসীদিতি কল্পনা॥
ন চাগমেন সর্ব্বজ্ঞস্তদীয়েঽন্যোন্যসংশ্রয়াৎ।
নরান্তরপ্রণীতস্য প্রামাণ্যং গম্যতে কথং॥—শ্লোকবার্ত্তিক (দ্বিতীয়সূত্রবার্ত্তিকে) ১১৭।১১৮॥

প্রভাবে ও তাঁহার গ্রন্থের প্রচারে তুতাত ভট্টের গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি। অবশ্য মাধবাচার্য্য পরে পাণিনিদর্শনে "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া "যাবন্তো যাদৃশা যেচ" ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের স্ফোটবাদে দেখা যায়। কিন্তু উহার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য "শ্লোকবার্ত্তিকের" স্ফোটবাদের "যস্যানবয়বঃ স্ফোটো ব্যজ্যতে বর্ণবুদ্ধিভিঃ" ইত্যাদি (৯১ম) শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে উহার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈর্ম্মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকে"। মাধবাচার্য্য একই স্থানে কুমারিলের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতে দ্বিতীয় স্থলে "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" এইরূপ লিখিবেন কেন? এবং তিনি আর্হতদর্শনে "তথা চোক্তং তৌতাতিতৈঃ" লিখিয়া কোন্ গ্রন্থকারের কোন্ গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও ত চিন্তা করা আবশ্যক। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের আধুনিক টীকাকার "আর্হতদর্শনে" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তৌতাতিতৈর্বৌদ্ধৈঃ"। তাঁহার এই ব্যাখ্যা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। তিনি পাণিনিদর্শনে মাধবাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথার কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই কেন, তাহাও বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, মাধবাচার্য্য যে "আর্হতদর্শনে" কুমারিলের "শ্লোকবার্ত্তিকে"র শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং সেখানে তাঁহার উক্তির দ্বারা তিনি যে "তৌতাতিত" নামক অন্য কোন গ্রন্থকারের শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে তিনি পাণিনিদর্শনেও "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" বলিয়া তাঁহারই ("যাবন্তো যাদৃশা যেচ" ইত্যাদি) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও আমরা বলিতে পারি, এবং কুমারিল ভট্টও তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে তৌতাতিত ভট্টেরই উক্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি নিজমতের সমর্থকরূপে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিতে পারি। কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকে অন্যের শ্লোকও দেখা যায়। তাঁহার গ্রন্থারম্ভে "বিশুদ্ধ-জ্ঞানদেহায়" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটিও তাঁহার নিজ রচিত নহে। উহা "কীলক" স্তবের প্রথম শ্লোক। মূলকথা, "তুতাত" এবং "তৌতাতিত" নামে অপর কোন মীমাংসাচার্য্যের সংবাদ পাওয়া না গেলেও পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু বৈশেষিক দর্শনের বিবৃতিকার বহুদর্শী মনীষী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার বিবৃতির শেষ ভাগে (২১৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"তুতাতভট্টমতানুযায়িনস্তু দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্যরূপাশ্চত্বার এব পদার্থা ইতি বদন্তি"। তিনি সেখানে তুতাত ভট্ট বলিতে কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত ঐ সিদ্ধান্তের মূল কি, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ভট্ট কুমারিল কিন্তু "শ্লোকবার্ত্তিকে" "অভাব পরিচ্ছেদে" অভাব পদার্থও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য, এই পদার্থচতুষ্টয়মাত্রবাদী বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে এবং কুমারিলের শ্লোক-বার্ত্তিকের "সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার" প্রকরণে "সুখোপভোগরূপশ্চ" ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকের দ্বারা এবং "শাস্ত্রদীপিকা"য় পার্থসারথি মিশ্রের সিদ্ধান্ত-সমর্থনের দ্বারা কুমারিলের মতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি নহে, ইহা বুঝিয়া উদয়নের "কিরণাবলী"র "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভানুসারে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা তুতাত ভট্টের মত, ইহাই আমি প্রথম খণ্ডে (১৯৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকায়) লিখিয়াছিলাম। কিন্তু "তুতাত" ও "তৌতাতিত" ইহা কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর

হইলে উদয়নাচার্য্য যে কুমারিলেরই উক্তরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মুক্তি বিষয়ে কুমারিলের মতবিষয়ে যে পূর্ব্বকালেও মতভেদ হইয়াছিল, ইহাও আমরা পার্থসারথি-মিশ্রের উক্তির দ্বারা বুঝিয়াছি। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া বিচার্য্য বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা অনেক গ্রন্থকার ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করিলেও এবং ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি উক্ত মতের সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত মতের বিস্তৃত সমালোচনাপূর্ব্বক খণ্ডন করায় তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই যে, উক্ত মতের প্রচার হইয়াছিল এবং অনেকে উহা গোতম মত বলিয়াও সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন, —"নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তে নাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে"। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা অদ্বৈত-বাদী বৈদান্তিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা সরলভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবাত্মার মহত্ত্ব বা বিভুত্ব যেমন অনাদিকাল হইতে তাহাতে বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ তাহাতে নিত্যসুখও বিদ্যমান আছে। সংসারকালে প্রতিবন্ধকবশতঃ উহার অনুভূতি হয় না। কিন্তু মুক্তিকালে মহত্ত্বের ন্যায় সেই নিত্যসুখের অনুভূতি হয়। সেখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত বিচারের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ মতই যে তাঁহার বিবক্ষিত ও বিচার্য্য, ইহাই বুঝা যায়। প্রথম খণ্ডে যথাস্থানে (১৯৫ – ৯৬ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বোদ্ধৃত নারায়ণভট্টের শ্লোকেও উক্ত-রূপ মতই কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুক্তি হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ আর কোন কালেই তাহার দুঃখ জন্মে না, কারণের অভাবে দুঃখ জন্মিতেই পারে না, এই বিষয়ে মুক্তিবাদী কোন দার্শনিক সম্প্রদায়েরই বিবাদ নাই। কিন্তু মুক্তি হইলে তখন যে, নিত্যসুখেরও অনুভূতি হয়, এই বিষয়ে বিবাদ আছে। অনেক সম্প্রদায় বহু বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। আবার অনেক সম্প্রদায় বহু বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত মত স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা শ্রুতি বিচার করিয়াও উক্ত মত যে, শ্রুতিসম্মত নহে, ইহাও বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষে অষ্টম প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের প্রথমে "নহ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত জীবাত্মার শরীরসম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের উচ্ছেদ হইতে পারে না। জীবাত্মা "অশরীর" হইলে তখনই তাহার সুখ ও দুঃখ, এই উভয়ই থাকে না। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মার শরীরসম্বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবই নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "সশরীর" শব্দের দ্বারা বদ্ধ এবং "অশরীর" শব্দের দ্বারা মুক্ত এই অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন যে মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ উভয়ই থাকে না, ইহাই শ্রুতির চরমসিদ্ধান্ত বুঝা যায়। যাঁহারা মুক্তিতে নিত্য সুখের অনুভূতি সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "প্রিয়" শব্দের অর্থ বৈষয়িক সুখ অর্থাৎ জন্য সুখ। "অপ্রিয়" শব্দের অর্থ দুঃখ। দুঃখ মাত্রই জন্য পদার্থ, সুতরাং "অপ্রিয়" শব্দের সাহচর্য্যবশতঃ ঐ শ্রুতিবাক্যে "প্রিয়" শব্দের দ্বারা জন্য সুখই বুঝা যায়। সুতরাং মুক্তি হইলে তখন বৈষয়িক সুখ বা জন্য সুখ থাকে না,—শরীরাদির অভাবে তখন কোন সুখের উৎপত্তি হয় না, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। তখন যে কোন সুখেরই অনুভূতি হয় না, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কথিত হয় নাই। পরন্তু "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এবং "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈত্তিরীয় উপ, ২য় বল্লী, ৭ম অনু)—ইত্যাদি অনেক শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা মুক্তিতে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে মুক্তিতে জন্য সুখের অভাবই কথিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, ইহাই শ্রুতির চরম সিদ্ধান্ত।

"আত্মতত্ত্ববিবেকে"র শেষভাগে মহানৈয়ায়িক উদয়নচার্য্য যেখানে তাঁহার নিজমতানুসারে মুক্তির স্বরূপ বলিয়া, মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, সেখানে টীকাকার নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথশিরোমণি পরে "অপরে তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সংসারকালেও তাহাতে নিত্যসুখ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তখন উহার অনুভব হয় না। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন হইতেই উহার অনুভব হয়। তত্ত্বজ্ঞানই নিত্যসুখের অনুভবের কারণ। জীবাত্মাতে যে অনাদিকাল হইতেই নিত্যসুখ বিদ্যমান আছে, এই বিষয়ে "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এই শ্রুতিই প্রমাণ। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরমাত্মার বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই। সুতরাং পরমাত্মার সম্বন্ধে ঐ কথার উপপত্তি হয় না। বৃহৎ বা বিভু, এই অর্থ-বোধক "ব্রহ্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মাও বুঝা যায়। "আনন্দং" এই স্থলে বৈদিক প্রয়োগবশতঃই ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা ঐ স্থলে অস্ত্যর্থ "অচ্" প্রত্যয়নিষ্পন্ন "আনন্দ" শব্দের দ্বারা আনন্দবিশিষ্ট এই অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবাত্মার আনন্দযুক্ত যে "রূপ" অর্থাৎ স্বরূপ, তাহা মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন হইতেই জীবাত্মার অনাদিসিদ্ধ নিত্য আনন্দের অনুভূতি হয়। তাহা হইলে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি শেষে বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা শরীরশূন্য মুক্ত আত্মার সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ কারণাভাবে তখন তাহাতে সুখ ও দুঃখ জন্মিতে পারে না; সুতরাং তখন তাহাতে জন্য-সুখসম্বন্ধ থাকে না, ইহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত আত্মার নিত্যসুখসম্বন্ধেরও অভাব প্রতিপন্ন করা যায় না। রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়া উহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। পরন্তু "প্রাহুঃ" এই বাক্যে "প্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত মতের প্রশংসাই করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই "অনুমানচিন্তামণি"র "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণশ্লোকে রঘুনাথ শিরোমণির "অখণ্ডানন্দবোধায়" এই বাক্যের ব্যাখ্যায়

টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা রঘুনাথ শিরোমণি নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই ভট্টমতের পরিষ্কার (সমর্থন) করায় সেই মতাবলম্বনেই তিনি বলিয়াছেন—"অখণ্ডানন্দ-বোধায়"। যাহা হইতে অর্থাৎ যাহার উপাসনার ফলে অখণ্ড (নিত্য) আনন্দের বোধ হয় অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তিরূপ মোক্ষ জন্মে, ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ। গদাধর ভট্টাচার্য্য নিজেও তাঁহার "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে ভট্টমত বলিয়াই উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক উহার সমর্থন করিতে অনেক বিচার করিয়াছেন। তিনি রঘুনাথশিরোমণির পূর্ব্বোক্ত কথাও সেখানে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রচলিত ন্যায়মতেরই সমর্থন করিবার জন্য উক্ত মতের খণ্ডন করিতে সেখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মতেও যখন মুক্তিকালে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অবশ্য হইবে, উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কারণত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় ঐ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ, ইহাই স্বীকার করা উচিত। মুক্তিকালে অতিরিক্ত নিত্যসুখসাক্ষাৎকারাদিকল্পনায় গৌরব, সুতরাং ঐ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ, ইহাই যখন যুক্তিসিদ্ধ, তখন "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দুঃখাভাব অর্থেই লাক্ষণিক "আনন্দ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে এবং পরে "মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এই বাক্যের দ্বারাও ঐ দুঃখাভাব যাহা ব্রহ্মের "রূপ" অর্থাৎ নিত্যধর্ম্ম, তাহা জীবাত্মার মুক্তি হইলে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উত্তরকালে নিরবধি হইয়া বিদ্যমান থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। দুঃখাভাব যে মুক্তিকালে অনুভূত হয়, ইহা ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, মুক্তিকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। তখন জীবাত্মা ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বথা দুঃখশূন্য হইয়া বিদ্যমান থাকেন, আর কখনও তাঁহার কোনরূপ দুঃখ জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। সুতরাং তখন তিনি ব্রহ্মসদৃশ হন। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত অনেক শ্রুতিতে যে "আনন্দ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ সুখ নহে, উহার অর্থ দুঃখাভাব। দুঃখাভাব অর্থেও "আনন্দ" ও "সুখ" প্রভৃতি শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ লৌকিক বাক্যেও অনেক স্থলে দেখা যায়। শ্রুতিতেও সেইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অনুভূতি হয় অর্থাৎ নিত্যসুখের অনুভূতি মুক্তি, ইহা সিদ্ধ করা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্থ "আনন্দ" শব্দের লক্ষণার দ্বারা দুঃখাভাব অর্থই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারে তন্মতানুবর্ত্তী অন্যান্য নৈয়ায়িকগণও ঐ কথাই বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন ও মণ্ডনের জন্য প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বহু বিচার হইয়াছে। জৈন দার্শনিকগণও উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। জৈনদর্শনের "প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার" নামক গ্রন্থের "রত্নাবতারিকা" টীকাকার মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষ সূত্রের টীকায় বিশেষ বিচারপূর্ব্বক মুক্তি যে পরমসুখানুভবরূপ, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও ভাসর্ব্বজ্ঞোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত বচনকে স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে,

উক্ত বচনে "সুখ"শব্দ যে দুঃখাভাব অর্থে লাক্ষণিক, ইহা বলা যায় না। কারণ, উক্ত বচনে মুখ্য সুখই যে উহার অর্থ, ইহাতে কোন বাধক নাই। পরন্তু কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্র—যাহা পাষাণতুল্যাবস্থা, তাহা পুরুষার্থও হইতে পারে না। কারণ, কোন জীবই কোন কালে নিজের ঐরূপ অবস্থা চায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৯৫—২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার চরম কথা এই যে, নিত্যসুখের কামনা থাকিলে মুক্তি হইতে পারে না। কারণ, কামনা বা রাগ বন্ধন, উহা মুক্তির বিরোধী। বন্ধন থাকিলে কিছুতেই তাহাকে মুক্ত বলা যায় না। যদি বল, মুমুক্ষুর প্রথমে নিত্যসুখে কামনা থাকিলেও পরে তাঁহার উহাতেও উৎকট বৈরাগ্য জন্মে। মুক্তি হইলে তখন তাঁহার ঐ নিত্যসুখে কামনা না থাকায় তাঁহাকে অবশ্য মুক্ত বলা যায়। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি সর্ব্ববিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষে প্রবর্ত্তক হয়, মুমুক্ষুর শেষে যদি নিত্যসুখভোগেও কামনা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যসুখ সম্ভোগ না হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা যায়। কারণ, তাঁহার পক্ষে নিত্যসুখসম্ভোগ হওয়া না হওয়া উভয়ই তুল্য। উভয় পক্ষেই তাঁহার মুক্তিলাভে কোন সন্দেহ করা যায় না। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি না হইলে কোনমতেই মুক্তি হয় না। যাঁহার উহা হইয়া গিয়াছে এবং নিত্যসুখসম্ভোগে কিছুমাত্র কামনা নাই, তাঁহার নিত্যসুখসম্ভোগ না হইলেও তাঁহাকে যখন মুক্ত বলিতেই হইবে, তখন মুক্তির স্বরূপ বর্ণনায় নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই কথা বলা যায় না। জৈন মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ঐ কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, সুখজনক শব্দাদি বিষয়ে যে আসক্তি, উহাই বন্ধন। কারণ, উহাই বিষয়ের অর্জ্জন ও রক্ষণাদির প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া সংসারের কারণ হয়। কিন্তু সেই নিত্যসুখে যে কামনা, তাহা "রাগ" হইলেও সকল বিষয়ের অর্জ্জন ও রক্ষণাদি বিষয়ে নিবৃত্তি ও মুক্তির উপায় বিষয়ে প্রবৃত্তিরই কারণ হয়। নচেৎ সেই নিত্যসুখের প্রাপ্তি হইতে পারে না। পরন্তু সেই নিত্যসুখ বিষয়জনিত নহে। সুতরাং বৈষয়িক সমস্ত সুখের ন্যায় উহার বিনাশ হয় না। সুতরাং কোনকালে উহার বিনাশবশতঃ আবার উহা লাভ করিবার জন্য নানাবিধ হিংসাদিকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং তৎপ্রযুক্ত পুনর্জ্জন্মাদিরও আশঙ্কা নাই। অতএব মুমুক্ষুর নিত্যসুখে যে কামনা, তাহা বন্ধনের হেতু না হওয়ায় উহা "বন্ধ" নহে। সুতরাং উহা তাঁহার মুক্তির বিরোধী নহে; পরন্তু উহা মুক্তির অনুকূল। কারণ, ঐ নিত্যসুখে কামনা মুমুক্ষুকে নানাবিধ অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ইহা স্বীকার না করিলে যাঁহারা কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতেও মুমুক্ষুর দুঃখে বিদ্বেষ স্বীকার্য্য হওয়ায় মুক্তি হইতে পারে না। কারণ, রাগের ন্যায় দ্বেষও যে বন্ধন, ইহাও সর্ব্বসম্মত। দ্বেষ থাকিলেও মুক্ত বলা যায় না। মুমুক্ষুর দুঃখে উৎকট দ্বেষ না থাকিলে তিনি উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য অতি দুঃসাধ্য নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? যদি বল যে, মুমুক্ষুর দুঃখেও দ্বেষ থাকে না। রাগ ও দ্বেষও সংসারের কারণ, এই জন্য মুমুক্ষু ঐ উভয়ই ত্যাগ করেন। দুঃখে উৎকট দ্বেষই তাঁহার মোক্ষার্থ নানা দুঃসাধ্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে। সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছাই তাঁহার ঐ সমস্ত

কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মুমুক্ষু দুঃখকে বিদ্বেষ করেন না। দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা ও দুঃখে বিদ্বেষ এক পদার্থ নহে। বৈরাগ্য ও বিদ্বেষও এক পদার্থ নহে। এতদুত্তরে রত্নপ্রভাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত পক্ষেও তুল্যভাবে ঐরূপ কথা বলা যায়। অর্থাৎ মুমুক্ষুর যেমন দুঃখে দ্বেষ নাই, দ্বেষ না থাকিলেও তিনি উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য প্রযত্ন করেন, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যসুখেও রাগ নাই। নিত্যসুখভোগে তাঁহার ইচ্ছা হইলেও উহা আসক্তিরূপ নহে। সুতরাং উহা তাঁহার বন্ধনের হেতু হয় না। ইচ্ছামাত্রই বন্ধন নহে। অন্যথা সকল মতেই মুক্তিবিষয়ে ইচ্ছাও (মুমুক্ষুত্বও) বন্ধন হইতে পারে।

বস্তুতঃ ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত চরম কথার উত্তরে ইহা বলা যায় যে, মুমুক্ষুর নিত্যসুখসম্ভোগে কামনা বিনষ্ট হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ন্যায় তাঁহার নিত্যসুখসম্ভোগও হয়। কারণ, বেদাদি শাস্ত্রে নানা স্থানে যখন মুক্ত পুরুষের সুখসম্ভোগের কথাও আছে, তখন উহা স্বীকার্য্য। সুতরাং মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞানই যে ঐ সুখসম্ভোগের কারণ, ইহাও স্বীকার্য্য। মুক্তির স্বরূপ বর্ণনায় বেদাদি শাস্ত্রে যে "আনন্দ" ও "সুখ"শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার মুখ্য অর্থে কোন বাধক না থাকায় দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণের কোন কারণ নাই। অবশ্য "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের "প্রিয়" অর্থাৎ সুখেরও অভাব কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে "অপ্রিয়"শব্দের সাহচর্য্যবশতঃ "প্রিয়" শব্দের দ্বারা জন্য সুখই বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারা মুক্ত পুরুষের যে নিত্যসুখসম্ভোগও হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু "আনন্দ" ও "সুখ"শব্দের লক্ষণার দ্বারা দুঃখাভাব অর্থ গ্রহণ করিলে উহার মুখ্য অর্থ একেবারেই ত্যাগ করিতে হয়। তদপেক্ষায় উক্ত শ্রুতিবাক্যে "প্রিয়"শব্দের দ্বারা জন্য সুখরূপ বিশেষ অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। তাহা হইলে "ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এবং "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখই কথিত হইয়াছে। নিত্যসুখের অস্তিত্ব বিষয়েও ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ। সুতরাং উহাতে কোন প্রমাণ নাই, ইহাও বলা যায় না। এবং মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখসম্ভোগ তত্ত্বজ্ঞানজন্য হইলে কোন কালে অবশ্যই উহার বিনাশ হইবে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, উহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ন্যায় উহাও অবিনাশী, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমানের দ্বারা উহার বিনাশিত্ব সিদ্ধ করা যাইবে না। পরন্তু ধ্বংস যেমন জন্য পদার্থ হইলেও অবিনাশী, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের নিত্য-সুখসম্ভোগও অবিনাশী, ইহাও স্বীকার করা যাইবে। পুণ্যসাধ্য স্বর্গের কারণ পুণ্যের বিনাশে স্বর্গ থাকে না, এ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রপ্রমাণ ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ইত্যাদি) আছে। কিন্তু নিত্যসুখসম্ভোগের বিনাশ বিষয়ে সর্ব্বসম্মত কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখসম্ভোগে কামনা না থাকায় উহা না হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, ইহা সত্য, কিন্তু উহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে এবং উহার শাস্ত্রসিদ্ধ কারণ উপস্থিত হইলে উহা যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা

স্বীকার্য্য। যেমন দুঃখভোগের কামনা না থাকিলেও উহার কারণ উপস্থিত হইলে সকলেরই দুঃখভোগ জন্মে, তদ্রূপ সুখভোগের কামনা না থাকিলেও উহার কারণ উপস্থিত হইলে অবশ্যই সুখভোগ জন্মে, ইহাও স্বীকার্য্য। ব্রজগোপীদিগের আত্মসুখের কিছুমাত্র কামনা না থাকিলেও প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণের সুখাপেক্ষায় কোটিগুণ সুখ হইত,[১] ইহা সত্য, উহা কবিকল্পিত নহে। প্রেমের স্বরূপ বুঝিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, যদি অনাদি কাল হইতেই আত্মাতে নিত্যসুখ বিদ্যমান থাকে এবং উহার অনুভূতিও নিত্য হয়, তাহা হইলে সংসারকালেও আত্মাতে নিত্যসুখের অনুভূতি বিদ্যমান থাকায় তখনও আত্মাকে মুক্ত বলিতে হয়। তাহা হইলে মুক্ত আত্মা ও সংসারী আত্মার কোন বিশেষ থাকে না। এতদুত্তরে ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার "ন্যায়সার" গ্রন্থে (আগমপরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন যে, যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিলেও ভিত্তি প্রভৃতি ব্যবধান থাকিলে সেই প্রতিবন্ধকবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয় না, তদ্রূপ আত্মার সংসারাবস্থায় তাহাতে অধর্ম্ম ও দুঃখাদি বিদ্যমান থাকায় তখন তাহাতে বিদ্যমান নিত্যসুখ ও উহার নিত্য অনুভূতির বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং নিত্যসুখের অনুভূতিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আত্মার মুক্তাবস্থায় অধর্ম্ম ও দুঃখাদি না থাকায় তখন প্রতিবন্ধকের অভাববশতঃ তাহাতে নিত্যসুখ ও উহার অনুভূতির বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে। ঐ সম্বন্ধ জন্য পদার্থ হইলেও ধ্বংস পদার্থের ন্যায় উহার ধ্বংসের কোন কারণ না থাকায় উহার অবিনাশিত্বই সিদ্ধ হয়। ভাসর্ব্বজ্ঞ এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার নিজ মতের সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র টীকার শেষ ভাগে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নোক্ত আপত্তির খণ্ডনপূর্ব্বক শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে উক্ত মতের সমালোচনা করিয়া, শেষে কেবল কল্পনাগৌরবই উক্ত মতে দোষ বলিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে যাহা হউক, মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অনুভূতি যদি শ্রুতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত কোন যুক্তির দ্বারাই উহার খণ্ডন হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য।

এখানে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্রূপ উহার পূর্ব্বে অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত পুরুষের অনেক ঐশ্বর্য্যও কথিত হইয়াছে। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে" (ছান্দোগ্য, ৮।২।১) ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রেই কামনাবিশেষের সিদ্ধি কথিত হইয়াছে। আবার "অশরীরং বাব সন্তং"

১। গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পঃ॥

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পরেও "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদি[১] শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, এই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হন। তিনি উত্তম পুরুষ, তিনি সেখানে স্ত্রীসমূহ অথবা যানসমূহ অথবা জ্ঞাতিসমূহের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্য করিয়া বিচরণ করেন। তিনি পূর্ব্বে যে শরীর লাভ করিয়াছিলেন, সেই শরীরকে স্মরণ করেন না। তাহার পরে অন্য শ্রুতি-বাক্যের[২] দ্বারা ইহাও কথিত হইয়াছে যে, মন তাঁহার দৈব চক্ষুঃ, সেই দৈব চক্ষুঃ মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম দর্শন করতঃ প্রীত হন। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণ ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য এবং আরও অনেক শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া মুক্ত পুরুষেরই ঐরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বা সুখের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" এবং "আত্মা প্রকরণাৎ" (৪।৪।২।৩) এই দুই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে যে, মুক্ত পুরুষের অবস্থাই কথিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীব যে স্বস্বরূপে অবস্থিত হন, ইহা কথিত হইয়াছে। ঐ স্বরূপ কি প্রকার? ইহা বলিতে পরে বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণ "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫) এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, জৈমিনির মতে উহা ব্রাহ্ম রূপ। অর্থাৎ আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হন, ব্রহ্ম নিষ্পাপ, সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর। মুক্ত জীবও তদ্রূপ হন। কারণ, "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদি "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যন্ত (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত জীবের ঐরূপই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। বাদরায়ণ পরে "চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদি-ত্যৌড়ুলোমিঃ" (৪।৪।৬) এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঔড়ুলোমি নামক আচার্য্যের মতে মুক্ত জীবের বাস্তব সত্যসংকল্পত্বাদি কিছু থাকে না। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, অতএব মুক্ত জীব কেবল চৈতন্যরূপেই অবস্থিত থাকেন। মুক্ত জীবের স্বরূপ চৈতন্যমাত্রই যুক্তিযুক্ত। মহর্ষি বাদরায়ণ পরে উক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া নিজমত বলিয়াছেন,—"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪।৪।৭)। অর্থাৎ আত্মা চিন্মাত্র বা চৈতন্যস্বরূপ, ইহা স্বীকার করিলেও তাঁহার নিজমতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মরূপতার কোন বিরোধ নাই। আত্মা চিন্মাত্র হইলেও মুক্তাবস্থায় তাঁহার সত্যসংকল্পত্বাদি অবশ্যই হয়। কারণ, শ্রুতিতে নানা স্থানে মুক্ত পুরুষের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য কথিত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আপ্নোতি স্বারাজ্যং" (তৈত্তি, ১।৬।২) "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দোগ্য), "সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছান্দোগ্য), "সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি" (তৈত্তি ১।৫।৩) অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ

১। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি, জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং"—ছান্দোগ্য ।৮।১২।৩ ।

২। "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" ।—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৫।

স্বারাজ্য লাভ করেন। সমস্ত লোকেই তাঁহার স্বেচ্ছাগতি হয়। তাঁহার সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে বলি (পূজোপহার) আহরণ করেন। বাদরায়ণ পরে "সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ" এবং "অতএব চানন্যাধিপতিঃ" (৪।৪।৮।৯) এই দুই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মুক্তাবস্থায় শরীর থাকে কি না, এই বিষয়ে পরে "অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং" এবং "ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ"—(৪।৪।১০।১১) এই দুই সূত্রের দ্বারা বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, বাদরি মুনির মতে মুক্তাবস্থায় শরীর থাকে না। জৈমিনি মুনির মতে শরীর থাকে। পরে "দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ", "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ" এবং "ভাবে জাগ্রদ্বৎ"—(৪।৪।১২।১৩।১৪) এই তিন সূত্রের দ্বারা বাদরায়ণ তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের শরীরবত্তা ও শরীরশূন্যতা তাঁহার সংকল্পানুসারেই হইয়া থাকে। তিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার সংকল্পও বিচিত্র। তিনি যখন শরীরী হইবেন বলিয়া সংকল্প করেন, তখন তিনি শরীরী হন। আবার যখন শরীরশূন্য হইবেন বলিয়া সংকল্প করেন, তখন তিনি শরীর-শূন্য হন। "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে"—(ছান্দোগ্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যেমন মুক্ত পুরুষের শরীরশূন্যতা বুঝা যায়, তদ্রূপ "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা নবধা" —(ছান্দোগ্য ৭।২৬।২) ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত পুরুষের মনের ন্যায় ইন্দ্রিয় সহিত শরীরসৃষ্টিও বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উভয়বোধক শ্রুতি থাকায় মুক্ত পুরুষের স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার শরীরবত্তা ও শরীরশূন্যতা, এই উভয়ই সিদ্ধান্ত। কিন্তু মুক্ত পুরুষের শরীর থাকাকালে তাঁহার জাগ্রদ্বৎ ভোগ হয়। শরীরশূন্যতাকালে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়। বাদরায়ণ পরে "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে "প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি" (৪।৪।১৫) এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষ নিজের ইচ্ছানুসারে কায়ব্যূহ রচনা অর্থাৎ নানা শরীর নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে অনুপ্রবেশ করেন। বাদরায়ণ পরে "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" (৪।৪।১৭) এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন হইয়া স্বরাট্ হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে তাঁহার কোনই সামর্থ্য বা কর্ত্তৃত্ব হয় না। অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারেন না। বাদরায়ণ ইহা সমর্থন করিতে পরে "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪।৪।২১) এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগমাত্রে সাম্য হয় অর্থাৎ তাঁহার ভোগই কেবল পরমেশ্বরের তুল্য হয়, শক্তি তাঁহার তুল্য হয় না। এ জন্যই মুক্ত পুরুষ পরমেশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন না। শ্রুতিতে অনাদিসিদ্ধ পরমেশ্বরই সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অবশ্যই আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের ন্যায় নিরতিশয় না হওয়ায় উহা লৌকিক ঐশ্বর্য্যের ন্যায় কোন কালে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, উহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং কোন কালে মুক্ত পুরুষেরও পুনরাবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যায় না। এতদুত্তরে বেদান্তদর্শনের সর্ব্বশেষে বাদরায়ণ সূত্র বলিয়াছেন,—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষোক্ত "নচ

পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে" এই শব্দপ্রমাণবশতঃ ব্রহ্মলোকগত সেই মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহা সিদ্ধ আছে। সুতরাং ঐরূপ মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, উপনিষদে নানা স্থানে যখন মুক্ত পুরুষের নানারূপ ঐশ্বর্য্য ও সংকল্পমাত্রেই সুখসম্ভোগের বর্ণন আছে এবং বেদান্তদর্শনের শেষ পাদে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে, তখন মুক্ত পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, তখন তাঁহার কোন বিষয়ে জ্ঞানই থাকে না, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্বীকার করা যায়? শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী সমস্ত দর্শনকারই যখন শ্রুতি অনুসারে মুক্ত পুরুষের সুখসম্ভোগাদি স্বীকার করিতে বাধ্য, তখন উক্ত সিদ্ধান্তে তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদই বা কিরূপে হইয়াছে? ইহাও বলা আবশ্যক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উপনিষদে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্তরূপ ঐশ্বর্য্যাদি কথিত হইয়াছে। "ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি" (বৃহদারণ্যক—৬।২।১৫) ইত্যাদি শ্রুতি এবং ছান্দোগ্যো-পনিষদের সর্ব্বশেষে "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, নচ পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উপনিষদের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের শেষ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণও উক্ত শ্রুতি অনুসারেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যাদি সমর্থন করিয়াছেন। এবং যাঁহারা উপাসনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, সেখান হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার ফলে মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহ-কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন, তাঁহাদিগের কখনই পুনরাবৃত্তি হইবে না, ইহাই ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষ বাক্যের তাৎপর্য্য। "নারায়ণ" প্রভৃতি উপনিষদে "তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। তদনুসারে বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও পূর্ব্বে 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ" (৪।৩।১০) এই সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার পরে "স্মৃতেশ্চ" এই সূত্রের দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রেও যে উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং—"এই স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়া বাদরায়ণের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাদরায়ণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত সিদ্ধান্তানুসারেই বেদান্তদর্শনের সর্ব্বশেষে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মলোক হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের সহিত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষেরই আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই বলিয়াছেন। এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষবিশেষের কালে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী, এই জন্যই তাঁহাদিগকেই প্রথমেও মুক্ত বলিয়া শ্রুতি অনুসারে প্রথমে তাঁহাদিগের নানাবিধ ঐশ্বর্য্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই যে চরম পুরুষার্থ বা প্রকৃত মুক্তি, ইহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য সূত্রের পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে, ব্রহ্মলোক-

প্রাপ্ত সমস্ত পুরুষেরই যে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাঁহারা সকলেই যে সেখান হইতে অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে। কারণ, "আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীতা ৮।১৬)—এই ভগবদ্বাক্যে ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি কথিত হইয়াছে। উপনিষৎ ও উক্ত ভগবদ্‌বাক্য প্রভৃতির সমন্বয় করিয়া উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন ও যজ্ঞাদি নানাবিধ কর্ম্মের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মলোকেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, সুতরাং প্রলয়ের পরে তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম অবশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ক্রমমুক্তিফলক উপাসনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের আর পুনর্জন্ম হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্‌গীতা-শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[১]।

এখন বুঝা গেল যে, ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও নানা সুখসম্ভোগ শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মলোক হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বিদেহ কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিলে তখন সেই পুরুষের কিরূপ অবস্থা হয়, তখন তাঁহার কোনরূপ সুখসম্ভোগ হয় কি না? এই বিষয়েই দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে ও নানা কারণে তাহা হইতে পারে। উপনিষদে নানা স্থানে নানা ভাবে মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাভেদেও মুক্তির স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু সকল মতেই মুক্তি হইলে যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় আর কখনও কোনরূপ দুঃখের সম্ভাবনাই থাকে না, ইহা স্বীকৃত সত্য। এ জন্য মহর্ষি গোতম "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১।১।২) এই সূত্রের দ্বারা মুক্তির ঐ সর্ব্বসম্মত স্বরূপই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতের ব্যাখ্যাতা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ মুক্তি হইলে তখন আত্মার কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে না, তখন তাহার কোন সুখসম্ভোগাদিও হয় না, হইতেই পারে না, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তির স্বরূপ, এই মতই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মূলকথা এই যে, জীবাত্মাতে অনাদি কাল হইতে যে নিত্য সুখ বিদ্যমান আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। জীবাত্মার সুখসম্ভোগ হইলে উহা শরীরাদি কারণজন্যই হইবে। কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন শরীরাদি কারণ না থাকায় কোন সুখসম্ভোগ বা কোনরূপ জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। পরন্তু যদি তখন কোন সুখের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বে বা পরে কোন দুঃখের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সুখমাত্রই দুঃখানুষক্ত। যে সুখের পূর্ব্বে বা পরে কোন দুঃখের উৎপত্তি হয় না, এমন সুখ জগতে নাই। সুখভোগ করিতে হইলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ

১। ব্রহ্মলোকস্থাঽপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাং। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেব।—স্বামিটীকা।

অসম্ভব। স্বর্গভোগী দেবগণও অনেক দুঃখ ভোগ করেন। এ জন্যও মুমুক্ষু ব্যক্তিরা স্বর্গকামনা করেন না। তাঁহারা স্বর্গেও হেয়ত্ববুদ্ধিবশতঃ কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই চাহেন। মুক্তিকালে কোনরূপ দুঃখভোগ হইলে ঐ অবস্থাকে কেহই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না ও করেন না। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে মুক্ত পুরুষের অনেক সুখভোগের বর্ণন থাকিলেও শেষে যখন "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই বাক্যের দ্বারা মুক্ত পুরুষের শরীর এবং সুখ ও দুঃখ থাকে না, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, তখন উহাই তাঁহার নির্ব্বাণাবস্থার বর্ণন বুঝা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে শরীর ও বহুবিধ সুখ থাকিলেও ব্রহ্মলোক হইতে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইলে তখন আর তাঁহার শরীর ও সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তি-প্রাপ্ত পুরুষের কোনরূপ সুখসম্ভোগই আর কোন প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু মুক্ত-পুরুষের নিত্যসুখসম্ভোগ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যশরীরও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, শরীর ব্যতীত কোন সুখসম্ভোগ যুক্তিযুক্ত নহে। উহার সর্ব্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু নিত্যশরীরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। যে শরীর মুক্তির পূর্ব্বে থাকে না, তাহার নিত্যত্ব সম্ভবই নহে। নিত্যশরীরের অস্তিত্ব না থাকিলে নিত্যসুখের অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিতে মুক্ত পুরুষের আনন্দবোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহাতে "আনন্দ" ও "সুখ" শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাবই লাক্ষণিক অর্থ, ইহাই স্বীকার্য্য। ঐ আত্যন্তিক দুঃখাভাবই পরমপুরুষার্থ। মূর্চ্ছাদি অবস্থায় দুঃখাভাব থাকিলেও পরে চৈতন্যলাভ হইলে পুনর্ব্বার নানাবিধ দুঃখভোগ হওয়ায় উহা আত্যন্তিক দুঃখাভাব নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ মোক্ষাবস্থাকে মূর্চ্ছাদি অবস্থার তুল্য বলা যায় না। সুতরাং মূর্চ্ছাদি অবস্থার ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তিলাভে কাহারই প্রবৃত্তি হইতে পারে না, উহা পুরুষার্থই হয় না, এই কথাও বলা যায় না। সুখের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তিও যখন একতর প্রয়োজন, তখন কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সুতরাং দুখঃনিবৃত্তিমাত্রও পুরুষার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। দুঃখনিবৃত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়াও অনেকে সময়বিশেষে মূর্চ্ছাদি অবস্থা, এমন কি, অপার দুঃখজনক আত্মহত্যাকার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাও সত্য। পরন্তু সুখদুঃখাদিশূন্যাবস্থা যে, সকলেরই অপ্রিয় বা বিদ্বিষ্ট, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যোগিগণের নির্ব্বিকল্পক সমাধির অবস্থাও সুখদুঃখাদিশূন্যাবস্থা। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের নিতান্ত প্রিয় ও কাম্য। তাঁহারা উহার জন্য বহু সাধনা করিয়া থাকেন, এবং মুমুক্ষুর পক্ষে উহার প্রয়োজনও শাস্ত্রসম্মত। ফলকথা, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যখন মুমুক্ষু মাত্রেরই কাম্য এবং মুক্তি হইলে যাহা সর্ব্বমতেই স্বীকৃত সত্য, তখন উহা লাভ করিতে হইলে যদি আত্মার সুখদুঃখাদিশূন্য জড়াবস্থাই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাই স্বীকার্য্য। বৈশেষিকসম্প্রদায় এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত-রূপ মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসাচার্য্যগণের মধ্যেও অনেকে উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ সুখবিহীন মুক্তি চাহেন না, পরন্তু উহাকে উপহাস

করিয়া "বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং। ন চ বৈশিষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সুখভোগে অবশ্যই কামনা আছে। তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তিকে পুরুষার্থ বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতেও তাঁহাদিগের কামনানুসারে বহু সুখসম্ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ হইতে পারে। কারণ, নির্ব্বাণমুক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ হইলেও উহার পূর্ব্বে সাধনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোকে যাইয়া মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বহু সুখ ভোগ করা যায়, ইহা পূর্ব্বোক্ত মতেও স্বীকৃত। কারণ, উহা শাস্ত্রসম্মত সত্য। ব্রহ্মলোকে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিয়াও যাঁহাদিগের তৃপ্তি হইবে না, আরও সুখ-সম্ভোগে কামনা থাকিবে, তাঁহারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া, আবার সাধনাবিশেষের দ্বারা পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মলোকে যাইয়া, আবার মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিবেন। সুখ-সম্ভোগের কামনা থাকিলে সাধনাবিশেষের সাহায্যে শ্রীভগবান্ সেই অধিকারীকে নানাবিধ সুখ প্রদান করেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সাধনা-বিশেষের ফলে বৈকুণ্ঠাদি লোকে যাইয়াও নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করা যায়, ইহাও শাস্ত্রসম্মত সত্য। কারণ, "সালোক্য" প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পঞ্চম মুক্তি "সাযুজ্য"ই নির্ব্বাণ মুক্তি, উহাই চরম মুক্তি বা মুখ্যমুক্তি। প্রাচীন মুক্তিবাদ গ্রন্থে উক্ত পঞ্চবিধ মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে[১]। শ্রীভগবানের সহিত সমান লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থানকে (১) "সালোক্য" মুক্তি বলে। শ্রীভগবানের সহিত সমানরূপতা অর্থাৎ শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও চতুর্ভুজ শরীরবত্তাকে (২) "সারূপ্য" মুক্তি বলে। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যই (৩) "সার্ষ্টি" মুক্তি। ঐরূপ ঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের অতিসমীপে নিয়ত অবস্থানই (৪) "সামীপ্য" মুক্তি। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কোনকালে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এ জন্য উহা মুখ্যমুক্তি নহে, উহাতে চিরকালের জন্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাঁহাদিগের সুখভোগে কামনা আছে এবং নিজের অধিকার ও রুচি অনুসারে যাঁহারা ঐরূপ সুখসাধন সাধনা-বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনা-বিশেষের ফলে ব্রহ্মলোকে অথবা বৈকুণ্ঠাদি স্থানে যাইয়া অবশ্যই নানা সুখ-সম্ভোগ করিবেন। ঐরূপে পুনঃ পুনঃ মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ করিয়া যাঁহাদিগের কোন কালে

১। সালোক্যমথ সারূপ্যং সার্ষ্টিঃ সামীপ্যমেব চ।
সাযুজ্যঞ্চেতি মুনয়ো মুক্তিং পঞ্চবিধাং বিদুঃ॥

তত্র ভগবতা সমমেকস্মিন্ লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যেঽবস্থানং "সালোক্যং"। "সারূপ্য"ঞ্চ ভগবতা সহ সমানরূপতা, শ্রীবৎস-বনমালা-লক্ষ্মী-সরস্বতীযুক্ত-চতুর্ভুজশরীরাবচ্ছিন্নত্বমিতি যাবৎ। "সালোক্যে"ঽপি চতুর্ভুজাবচ্ছিন্নত্বমস্ত্যেব, বৈকুণ্ঠবাসিনাং সর্ব্বেষামেব চতুর্ভুজত্বাৎ, পরন্তু শ্রীবৎসাদিরূপাশেষবিশেষণবিশিষ্টত্বং ন তত্রেতি তদপেক্ষয়া তস্যাধিক্যং। "সার্ষ্টি"র্ভগবদৈশ্বর্য্যসমানমৈশ্বর্য্যং, কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থত্বাৎ। "সামীপ্য"ঞ্চ তথাবিধৈশ্বর্য্যবিশেষণাদি-যুক্তত্বে সতি ভগবতোঽতিসমীপে নিয়তমবস্থানং। "সাযুজ্য"ঞ্চ নির্ব্বাণং। তচ্চ ন্যায়বৈশেষিকমতে অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্তিঃ। সালোক্যাদিদশায়াং দুঃখনিবৃত্তিসত্ত্বেঽপি নাসাবাত্যন্তিকী, তস্য ক্ষয়িতয়া তদনন্তরমনন্তশ্চরম-দুঃখস্যৈবোৎপাদাদিতি ন তদ্দশায়ামতিপ্রসঙ্গঃ। অতঃ সালোক্যাদেঃ স্বতঃ পুরুষার্থত্বাভাবাৎ তদুত্তরং শরীর-পরিগ্রহেণ বন্ধসম্ভবাচ্চ তেষাং তুচ্ছতয়া নির্ব্বাণমেবোদ্দেশ্যং। তত্ত্বজ্ঞানে তান্ত্রিকাণাং প্রবৃত্তে নির্ব্বাণমেব অপবর্গ-পদশক্যং। অন্যেষান্তু গৌণমুক্তিপদপ্রয়োগবিষয়তেতি।—প্রাচীন মুক্তিবাদ।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, তাঁহারা তখন নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। তখন তাঁহাদিগের সুখভোগে কিছুমাত্র কামনা না থাকায় সুখভোগ বা কোন বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিলেও কোন ক্ষতি বুঝা যায় না এবং সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের মুক্তিবিষয়েও কোন সন্দেহ করা যায় না। কারণ, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়া গেলে আর কখনও পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই না থাকিলে তখন তাঁহাকে মুক্ত বলিয়া অস্বীকার করা যায় না। ঐরূপ ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ে সংশয়ের কোনই কারণ দেখা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত নিজ মত সমর্থন করিতে সর্ব্বশেষে ঐরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে যাহা বলা যায়, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে মহর্ষি গোতমের প্রকৃত মত কি ছিল, এ বিষয়েও মতভেদের সমর্থন ও সমালোচনা করা হইয়াছে। সুধী পাঠকগণ ঐ সমস্ত কথায় প্রণিধান করিয়া প্রকৃত রহস্য নির্ণয় করিবেন।

পূর্ব্বে যে নির্ব্বাণ মুক্তির কথা বলিয়াছি, উহাই তত্ত্বজ্ঞানের চরম ফল। মুমুক্ষু অধিকারীর পক্ষে উহাই পরম পুরুষার্থ। মহর্ষি গোতম মুমুক্ষু অধিকারীদিগের জন্যই ন্যায়দর্শনে ঐ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভেরই উপায় বর্ণন করিয়াছেন। নির্ব্বাণ মুক্তিই ন্যায়দর্শনের মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎপ্রেমার্থী ভক্ত, তাঁহারা ঐ নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না। তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাই চাহেন। ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীহনুমান্‌ও শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে,[১] "যে মুক্তি হইলে আপনি প্রভু ও আমি দাস, এই ভাব বিলুপ্ত হয়, সেই মুক্তি আমি চাই না"। ভক্তগণ যে শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত "সালোক্য" প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তিই দান করিলেও গ্রহণ করেন না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে[২]। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, যদি কোন প্রকার মুক্তি হইলেও শ্রীভগবানের সেবা অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মুক্তি ভক্তগণও গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবাশূন্য কোন প্রকার মুক্তিই দান করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ভগবৎপ্রেমের ফলে বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের পার্ষদ হইয়া ভক্তগণের যে অনন্তকাল অবস্থান হয়, তাহাকেও "সালোক্য" বা "সামীপ্য" মুক্তিও বলা যাইতে পারে। তবে ঐ অবস্থায় ভক্তগণ সতত শ্রীভগবানের সেবা করেন, ইহাই বিশেষ। মুক্ত পুরুষগণও যে লীলার দ্বারা দেহ ধারণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবা করেন, ইহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, এখন তাঁহাদিগের মতে নির্ব্বাণ মুক্তির স্বরূপ কি? নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত জীবের কিরূপ অবস্থা হয়, ইহা দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নানা গ্রন্থে নানারূপ কথা আছে। ঐ সমস্ত কথার সামঞ্জস্য বিধান করাও আবশ্যক। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১। ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

২। সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২৯।১৩।

মহাশয় লিখিয়াছেন,—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥" (আদিলীলা, ৫ম পঃ)। উহার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"সাযুজ্য না চায় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য" (ঐ, ৩ পঃ)। ইহার দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং সাযুজ্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত জীবের ঐ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের গুরুলব্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নাই। ইহাঁদিগের পূর্ব্বে প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃত" গ্রন্থে বহু বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন যে,[১] মুক্তি হইলেও তখনও প্রায় সমস্ত মুক্ত পুরুষেরই ব্রহ্মের সহিত নিত্যসিদ্ধ ভেদ থাকিবেই। তিনি সেখানে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য টীকায় বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত ভেদ থাকে বলিয়াই "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং বিরাজন্তি" এই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদের বাক্য এবং অন্যান্য অনেক মহাপুরাণাদিবাক্য সংগত হয়। অন্যথা যদি মুক্তি হইলে তখন পরব্রহ্মে লয়বশতঃ তাঁহার সহিত ঐক্য বা অভেদই হয়, তাহা হইলে লীলার দ্বারা দেহ ধারণ করিবে কে? উহা অসম্ভব এবং তখন আবার ভক্তিবশতঃ নারায়ণপরায়ণ হওয়াও অসম্ভব। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শঙ্করাচার্য্যের বচনে ও পুরাণাদির বচনে যখন মুক্ত পুরুষেরও আবার দেহ ধারণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের কথা আছে, তখন মুক্তি হইলে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ও তাঁহার সহিত যে অভেদ হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আমরা কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা" ইত্যাদি বাক্য কোথায় বলিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। উহা বলিলেও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও যে তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন সাধক নাই। পরন্তু বাধকই আছে। সনাতন গোস্বামী মহাশয় সেখানে পরে আরও বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইলেও নৃদেহ মহামুনির পুনর্ব্বার নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইহা পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। এবং পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইলেও বেশ্যা সহিত ব্রাহ্মণের পুনর্ব্বার ভার্য্যা সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাও বৃহন্নারসিংহ পুরাণে নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। এইরূপ আরও অনেক উপাখ্যান প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে প্রমাণ জানিবে। সনাতন গোস্বামী মহাশয়ের শেষোক্ত এই সকল কথার সহিত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার কিরূপে সামঞ্জস্য হয়, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। পরন্তু তিনি ঐ স্থলে সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন যে, "প্রায় ইতি কদাচিৎ কস্যাপি ভগবদিচ্ছয়া সাযুজ্যাখ্যনির্ব্বাণাভিপ্রায়েণ।" অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়ঃ" এই তৃতীয় চরণে যে "প্রায়স্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কদাচিৎ কোন ব্যক্তির ভগবদিচ্ছায় যে সাযুজ্যনামক নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, ঐ মুক্তি হইলে তখন তাঁহার ব্রহ্মের সহিত ভেদ থাকে না। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদই হয়, ইহা সনাতন গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন।

১। অতস্তস্মাদভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ।
মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়ো ভেদস্তিষ্ঠেদতোহি সঃ॥—বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় অঃ, ১৮৬॥

তবে তাঁহার মতে তখন ঐ অভেদ কিরূপ, ইহা বিচার্য্য। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন যে, সেই জীবের ব্রহ্মের সহিত একত্ব বা অভেদ হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেরও সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত"—ইত্যাদি শ্লোকে পঞ্চম মুক্তি নির্ব্বাণকে "একত্ব"ই বলা হইয়াছে। এবং উহার পূর্ব্বেও "নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে নির্ব্বাণ মুক্তিকেই "একাত্মতা" বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে পুরাণের দশ লক্ষণের বর্ণনায় "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—এই শ্লোকে নবম লক্ষণ মুক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদিসম্মত মুক্তিই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও যে, সেখানে অদ্বৈত মতেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সেখানে একটু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহার পিতৃব্য ও শিক্ষাগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকোক্ত মুক্তিকে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মত বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃত" গ্রন্থে মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে যে মতত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত মত যে বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মুখ্য মত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেও ঐ মতই কথিত হইয়াছে, ইহা তিনি সেখানে টীকায় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[১]। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে পূর্ব্বলিখিত "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য" ইত্যাদি শ্লোকের পরশ্লোকেই[২] আত্যন্তিক ভক্তি-যোগের দ্বারা যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, ইহাও "মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" এই বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে বুঝা যায়। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও সেখানে সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিকে আত্যন্তিক ভক্তিযোগের আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু আত্যন্তিক ভক্তি-যোগের ফলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে তখন সেই ভক্তের চিরবাঞ্ছিত ভগবৎসেবা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহা তিনি সেখানে কিছু বলেন নাই। আত্যন্তিক ভক্তিযোগের ফলে যে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও কথিত হইয়াছে[৩]। "লঘু-

---

১। সোঽশেষদুঃখধ্বংসো বাঽবিদ্যাকর্ম্মক্ষয়োঽথবা। মায়াকৃতান্যথারূপত্যাগাৎ স্বানুভবোঽপি বা॥ বৃহদ্ভাগ। ২য় অঃ, ১৭৫॥ মায়াকৃতস্য অন্যথারূপস্য সংসারিত্বস্য ভেদস্য বা ত্যাগাৎ স্বস্য আত্মরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবরূপ এব। এতচ্চ বিবর্ত্তবাদিনাং বেদান্তিনাং মুখ্যং মতং। যথোক্তং দ্বিতীয়স্কন্ধে "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি"রিতি। সনাতন গোস্বামিকৃত টীকা॥

২। স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ৩য় স্কন্ধ—২৯শ অঃ, ১৪শ শ্লোক। ননু ত্রৈগুণ্যং হিত্বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিঃ পরমফলং প্রসিদ্ধং, সত্যং, তত্তু ভক্তাবানুষঙ্গিক-মিত্যাহ। "যেন" ভক্তিযোগেন। "মদ্ভাবায়" ব্রহ্মত্বায়।—স্বামিটীকা॥

৩। যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥—গীতা। ১৪।২৬। "লঘুভাগবতামৃত" ১১২—১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য॥

ভাগবতামৃত” গ্রন্থে প্রভুপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামী মহাশয়ও ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে টীকাকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় “ব্রহ্ম ভূয়” শব্দের যথাশ্রুতার্থ বা মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সাদৃশ্য অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতি ও “পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ” ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের (২।১৪।২৭) বচনের দ্বারা তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। এবং তিনি যুক্তিও বলিয়াছেন যে, অণু দ্রব্য বিভু হইতে পারে না। অর্থাৎ জীব অণু, ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, সুতরাং জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, উহা অসম্ভব। সুতরাং মুক্ত জীবের যে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, উহার অর্থ ব্রহ্মের সাদৃশ্যপ্রাপ্তি। অর্থাৎ মুক্ত জীব ব্রহ্ম হন না, ব্রহ্মের সদৃশ হন। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ঐকান্তিক ভেদ চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ‘তত্ত্বসন্দর্ভে’র টীকা ও “সিদ্ধান্তরত্ন” প্রভৃতি গ্রন্থেও মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১১১—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) পরন্তু তাঁহার “প্রমেয়রত্নাবলী” গ্রন্থ দেখিলে তিনি যে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়কেও মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদী বলিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উক্ত মতেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত গ্রন্থ অবশ্য পাঠ করিবেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের সমস্ত মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি মধ্বাচার্য্যের কোন কোন মতের প্রতিবাদও করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদে) বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি যে, মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, মধ্বাচার্য্যই যে তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য,—ইহা বুঝিবার অনেক কারণ আছে। উক্ত বিষয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উক্তিই বলবৎ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার “প্রমেয়রত্নাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থকে গোপন করা যাইবে না। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়াও অস্বীকার করা যাইবে না।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশাবতংস সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহামনীষী রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামিপাদের “তত্ত্বসন্দর্ভে”র যে অপূর্ব্ব টীকা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কোন স্থলে তিনি নিজমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায় দ্বিবিধ—ভাগবত এবং স্মার্ত্ত। তন্মধ্যে শ্রীধর স্বামী ভাগবতসম্প্রদায়ের অন্তর্গত, অর্থাৎ তিনি প্রথমোক্ত “ভাগবত” অদ্বৈতবাদী। শ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতির মতসমূহের মধ্যে যে যে মত যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা নির্ণীত, সেই সমস্ত মতই সংকলন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নিজমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতি কাহারও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন। তিনি তাঁহার নিজসম্মত ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যে ভাগবত মত নিগূঢ়ভাবে হৃদ্গত ছিল, ইহা তাঁহার গোপীবস্ত্রহরণ বর্ণনাদির দ্বারা নির্ণয় করিয়া, পরে তাঁহার শিষ্যপরম্পরার মধ্যে ভক্তিপ্রধান মত আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। এই জন্যই অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীধর

স্বামী ভাগবতসম্প্রদায়ভুক্ত "ভাগবত" অদ্বৈতবাদী। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার "ভাগবত-সন্দর্ভে" বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের সকল মত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার মতানুসারে মায়াবাদ নিরাস এবং জীব ও জগতের সত্যত্বাদি অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিজের ব্যাখ্যার পুষ্টি বা সমর্থন করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী হইলেও তিনি তাঁহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের সম্মত শ্রীভগবানের গুণত্ব, নিত্য প্রকৃতি এবং তাহার পরিণাম জগৎ সত্য ও ব্রহ্মের তটস্থ অংশ জীবসমূহ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইত্যাদি মত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে মধ্বাচার্য্য প্রকৃতিকে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলিয়া স্বীকার না করায় তাঁহার মত হইতে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মত বিশিষ্ট। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, জগৎ ব্রহ্মের সেই স্বরূপশক্তির পরিণাম, উক্ত মতই শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অনুমত বুঝা যায়। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়া, শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত মতই সাধু, কোন মতই অগ্রাহ্য নহে। কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ত-মুপাসতে"। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মত সকল মতের সারসংগ্রহরূপ বলিয়া সকল মত হইতে মহৎ। পরন্তু যেমন শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় হইয়াও পরে ব্রহ্মসম্প্রদায় আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার হইয়াও কোন গুরুর আশ্রয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া, মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ততা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার নিজ স্বরূপ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির দ্বারা নিজমতেরই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব পৃথক্ ভাবে নিজ-মতেরই প্রবর্ত্তক, তিনি অন্য কোন সম্প্রদায়ের মতপ্রচারক আচার্য্যবিশেষ নহেন। তবে তিনি গুর্ব্বাশ্রয়ের আবশ্যকতা বোধে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কোন সম্প্রদায় গ্রহণের আবশ্যকতাবশতঃ নিজেকে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

এখানে বক্তব্য এই যে, গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকার ব্যাখ্যা করিয়া "তত্ত্বসন্দর্ভে"র অনুবাদ পুস্তকে অন্যরূপ মন্তব্য লিখিত হইলেও (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি সম্পাদিত তত্ত্বসন্দর্ভ, ১১৪-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক যে, গোস্বামিভট্টাচার্য্যও শ্রীচৈতন্যদেবকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও শ্রীচৈতন্যদেবকে পঞ্চম বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলেন নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিজেকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াই তাঁহার নিজমতের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই তিনি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পদ্মপুরাণে কলিযুগে চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই উল্লেখ আছে। পঞ্চম কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। পরন্তু কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে গুরুবিহীন সাধনা হইতে পারে না। সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র ফলপ্রদও হয় না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে ঐ সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ঈশ্বর পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাধন) ও নিজমতের প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত তাঁহার মতের কোন কোন অংশে ভেদ থাকিলেও অনেক অংশে ঐক্য থাকায় তিনি মধ্ব-

সম্প্রদায়েরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামানুজ বা নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই কেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়রক্ষক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের মতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া "প্রমেয়রত্নাবলী" গ্রন্থে মধ্বমতানুসারেই প্রমেয়বিভাগ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি তাঁহার অন্য গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যদেবের মতের ব্যাখ্যা করিতে মধ্বাচার্য্যের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি প্রকাশ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকার দ্বারাও শ্রীচৈতন্যদেব যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াই নিজমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মত বুঝা যায়। তাঁহার পর হইতেও এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে কোন পৃথক্ সম্প্রদায় বা পঞ্চম বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলেন নাই। পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়রক্ষক বঙ্গের নিত্যানন্দ প্রভৃতি বংশজাত গোস্বামিপাদগণ যে, "মাধ্বানুযায়ী" অর্থাৎ মূলে মাধ্বসম্প্রদায়েরই অন্তর্গত, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণেরও পরম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টখণ্ডের প্রারম্ভে লিখিত ঊনবিংশতি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের মধ্যে কোন শ্লোকের[১] দ্বারাও ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ "তত্ত্বসন্দর্ভে" মধ্বাচার্য্যের সমস্ত মত গ্রহণ না করিলেও অনেক মতের ন্যায় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের তটস্থ অংশ বা শক্তিরূপ জীবসমূহ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এই মত স্বীকার করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন। পরে তিনি সেখানে ইহাও লিখিয়াছেন যে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। জগৎ সেই স্বরূপশক্তির পরিণাম। উক্ত মত শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অনুমত বুঝা যায়। গোস্বামিভট্টাচার্য্যের ঐ কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাস্করাচার্য্যের সম্মত ব্রহ্ম ও জগতের যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ, উহাই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ নামে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে এক স্থানে যে লিখিয়াছেন,—"স্বমতে ত্বচিন্ত্য-ভেদাভেদাবেব", তাহা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধে। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির পরিণাম জগতে ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই স্বীকার্য্য। ঐ উভয়ই অচিন্ত্য, অর্থাৎ উভয় পক্ষেই নানা তর্কের নিবৃত্তি না হওয়ায় উহা চিন্তা করিতে পারা যায় না; তথাপি উহা তর্কের অগোচর বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিময়, সুতরাং তাঁহাতে ঐরূপ ভেদ ও অভেদ অসম্ভব হয় না। সেখানে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "অভেদং সাধয়ন্তঃ",……"ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি"—এই সন্দর্ভের দ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ যে, পূর্ব্বোক্ত ভেদ ও অভেদ, এই উভয়কেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং ভেদও নাই, অভেদও নাই, ইহাই "অচিন্ত্য-

১। শ্রীমন্মাধ্বানুযায়িশ্রীনিত্যানন্দাদিবংশজাঃ।
গোস্বামিনো নন্দসূনুং শ্রীকৃষ্ণং প্রবদন্তি যং॥

ভেদাভেদবাদে"র অর্থ বলিয়া এখন কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত অমূলক। ঐরূপ মত হইলে উহার নাম বলিতে হয়—অচিন্ত্যভেদাভেদাভাববাদ,—ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রভৃতিও কোন স্থানে উক্ত মতের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থের সন্দর্ভ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং তিনি যে সেখানে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদাভেদ প্রভৃতি নানা মতের উল্লেখ করিতেই ঐ সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তিনি সেখানে ব্রহ্ম ও জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বলেন নাই। পরন্তু উক্ত গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়া "তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানি" এবং "সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ"—ইত্যাদি অনেক সন্দর্ভের দ্বারা মাধ্বমতানুসারে জীব ও ব্রহ্মের ঐকান্তিক ভেদবাদই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে "ভিন্নান্যেব" এবং "ভেদ এব" এই দুই স্থলে তিনি "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া স্বরূপতঃ অভেদেরই ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। ফলকথা, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ যাহা মধ্বাচার্য্যের সম্মত, তাহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে সমর্থনপূর্ব্বক নিজসিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং ভাস্করাচার্য্যের সম্মত ব্রহ্ম ও জগতের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদই তিনি "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ" নামে নিজ সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকার দ্বারাও[1] ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত বিষয়ে এখন আর আধুনিক অন্য কাহারও ব্যাখ্যা বা মত গ্রহণ করা যায় না।

অবশ্য আমরা দেখিয়াছি, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে কোন কোন স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদও বলিয়াছেন। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন,—"অতস্তস্মাদভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ" (২য় অঃ, ১৮৬)। কিন্তু তিনি নিজেই সেখানে টীকায় লিখিয়াছেন,—"তস্মাৎ পরব্রহ্মণোঽভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্ম্য-বত্ত্বাৎ"। অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাধর্ম্ম্যবিশেষ বা সাদৃশ্যবিশেষপ্রযুক্তই জীবসমূহকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ গ্রহণ করিয়া ঐ কথা বলেন নাই। সুতরাং তিনি পরে যে, "অস্মিন্ হি ভেদাভেদাখ্যে সিদ্ধান্তেঽস্মৎ-সুসম্মতে" (২য় অঃ, ১৯৬) এই বাক্যের দ্বারা ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তাহাতেও জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত বাস্তব অভেদ গ্রহণ করেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সনাতন গোস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার নিজমতে যে জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ অভেদ নহে, কেবল ভেদই সিদ্ধান্ত, ইহাই বুঝা যায়।

১। পরন্তু তন্মতসিদ্ধং ভগবতঃ সগুণত্বং, নিত্যা প্রকৃতিস্তৎপরিণামো জগৎ সত্যং, ব্রহ্মতটস্থাংশা জীবাস্ততো ভিন্নাঃ, ইত্যাদিকং মতং গৃহীতং। প্রকৃতের্ব্রহ্মস্বরূপতা তেন নাঙ্গীকৃতা ইতি স্বমতাদ্‌বিশেষঃ। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদি-ভাস্করীয়মতং "ব্রহ্মস্বরূপশক্ত্যাত্মনা পরিণামো জগৎ, সা চ শক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি"রিতি তদেব স্বাস্মমতমিতি লভ্যতে"। তত্ত্বসন্দর্ভের গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত টীকা। পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বসন্দর্ভ" পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরন্তু তিনিও পূর্ব্বে সূর্য্যের তেজ যেমন সূর্য্যের অংশ, তদ্রূপ জীবসমূহ ব্রহ্মের অংশ, এই কথা বলিয়া, পরশ্লোকে তত্ত্ববাদিমধ্বমতানুসারে সূর্য্যের কিরণকে সূর্য্য হইতে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি হইতে এবং সমুদ্রের তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিয়া, ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নিত্যসিদ্ধ জীবসমূহকে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন[১]। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অংশ দ্বিবিধ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। তন্মধ্যে জীবসমূহ যে ব্রহ্মের স্বাংশ নহে, বিভিন্নাংশ, ইহা মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জীবসমূহে যে ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ অভেদও আছে, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, যাহা বিভিন্নাংশ, তাহা অংশী হইতে তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভিন্ন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের তত্ত্বসন্দর্ভের উক্তির ব্যাখ্যায় টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং"। সেখানে দ্বিতীয় টীকাকার মহামনীষী গোস্বামিভট্টাচার্য্যও উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"তথাচ কচিচ্চেতনত্বেন ঐক্যবিবক্ষয়া কচিচ্চ ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবিবক্ষয়া অভেদবচনানি ব্যাখ্যেয়ানীতি ভাবঃ।" (পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসন্দর্ভ পুস্তক, ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহা কোন স্থলে চেতনত্বরূপে ঐ উভয়ের ঐক্য বিবক্ষা করিয়া, কোন স্থলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ বিবক্ষা করিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইঁহাদিগের মতে জীব ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সতত সংশ্লিষ্ট ঐ জীব ব্রহ্মের ধর্ম্মবিশেষ। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ কথিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন জীব ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ অভেদ সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ উভয়ের স্বরূপতঃ অভেদ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ শাস্ত্রে নানা স্থানে জীবকে যে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে এবং ঐ উভয়ের যে একত্বও বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ উভয়ের তত্ত্বতঃ অভেদ ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় মহামনীষী রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য ঐ "অংশে"র যেরূপ ব্যাখ্যা[২] করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মধ্বসম্মত দ্বৈতবাদই সমর্থিত হইয়াছে। পরন্তু নির্ব্বাণ মুক্তিতে ঐ মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মই হইলে তখন জীব ও ব্রহ্মের

১। তথাপি জীবতত্ত্বানি তস্যাংশা এব সম্মতাঃ।
ঘনতেজঃসমূহস্য তেজোজালং যথা রবেঃ ॥
নিত্যসিদ্ধাস্ততো জীবা ভিন্না এব যথা রবেঃ।
অংশবো বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ বহ্নের্ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ ॥—বৃহদ্ভাগ।—২য় অঃ. ১৮৩.৮৪।

তত্ত্ববাদিমতানুসারেণ ততঃ পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জীবা জীবতত্ত্বানি নিত্যসিদ্ধাঃ নিত্যমংশতয়া সিদ্ধাঃ, নতু মায়য়া ভ্রমেণোৎপাদিতাঃ। অতএব ভিন্নাস্ততো ভেদং প্রাপ্তাঃ। অত্র দৃষ্টান্তাঃ, যথা রবেরংশবস্তৎসমবেতা অপি ভিন্নত্বেন নিত্যং সিদ্ধাঃ, এবমেব। যথাচ বহ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ। যথাচ বারিধের্ভঙ্গাস্তথা ॥—সনাতন গোস্বামিকৃত টীকা।

২। তদংশত্বং তন্নিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাণুত্বং। তথাচ ব্রহ্মনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাণুত্বে সতি চেতনত্বমত্র সমানাকারত্বং সাদৃশ্যপর্য্যবসিতং।—গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত টীকা। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসন্দর্ভ পুস্তক, ১৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অভেদ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ না থাকিলে তখন ভেদ নষ্ট করিয়া অভেদ উৎপন্ন হইবে কিরূপে ? এই বিষয়ে গোস্বামিভট্টাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তখনও মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত বাস্তব অভেদ হয় না। যেমন জলে জল মিশ্রিত হইলে ঐ জল সেই পূর্ব্বস্থ জলই হয় না, কিন্তু মিশ্রিত হইয়া তাদৃশ জলই হয়, এ জন্য ঐ উভয়ের অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। তদ্রূপ মুক্ত জীব ব্রহ্মে লীন হইলেও ব্রহ্মের সহিত মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্য লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মই হন না। গোস্বামিভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন[১]। ফলকথা, ভগবদিচ্ছায় কোন অধিকারিবিশেষের নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখনও তাঁহার ব্রহ্মের সহিত বাস্তব অভেদ হয় না। শাস্ত্রে যে "একত্ব" ও "ঐকাত্ম্য" কথিত হইয়াছে, উহা স্বরূপতঃ বাস্তব অভেদ নহে—উহা জলে মিশ্রিত অন্য জলের ন্যায় মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্য, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করিতেন। তাই তিনি মুক্তির ব্যাখ্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্যত্রও তিনি অদ্বৈত মতে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভ ভট্টের নিকটে শ্রীধর স্বামীর যেরূপ মহত্ত্ব ও মান্যতার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন[২], তাহাতে বল্লভ ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন ও শ্রীধর স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজদৈন্য প্রকাশই উদ্দেশ্য বুঝা যায়। সে যাহা হউক, মূলকথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা মধ্বমতানুসারে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদমাত্রবাদী, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী নহেন। সর্ব্ব-সংবাদিনী গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ব্রহ্ম ও জগতের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ কেবল দ্বৈতবাদই সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের একজাতীয়ত্বাদিরূপে যে অভেদ তাঁহারা বলিয়াছেন, উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভেদাভেদবাদী বলা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্য্যের মতেও ঐরূপ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতেও চেতনত্ব বা আত্মত্বাদিরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে। কিন্তু ঐরূপ অভেদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কেহ জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদবাদী বলেন না কেন ? ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তগণ নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

১। তথাচ শ্রুতিঃ—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি" (কঠ, ৪—১৫) ইতি। স্কান্দে চ "উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে। এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্তোঽপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ" ॥ ইতি। তাদাত্ম্যং মিশ্রতাং। নাসৌ ভবতীতি ন পরমাত্মা ভবতি। স্বাতন্ত্র্যাদীতি আদিনা নির্ব্বিকারত্বাদিপরিগ্রহস্তেন তয়োর্ম্মিলনেন পদার্থান্তরতাপত্তিরপীতি। গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য টীকা। ঐ পুস্তক, ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥
শ্রীধর স্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি" ॥ ইত্যাদি —চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, ৭ম পঃ ॥

অধিকারিবিশেষের পক্ষে নির্ব্বাণমুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে সাধ্যভক্তি-প্রেমই পরমপুরুষার্থ। উহা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়াও কথিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তি হইতেও ঐ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্ ভাগবতামৃত গ্রন্থে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন যে, মুক্তিতে ব্রহ্মানন্দের অনুভব হইলেও ভক্তিতে উহা হইতেও অধিক অর্থাৎ অসীম আনন্দ ভোগ হয়। মুক্তির আনন্দ সসীম। ভক্তির আনন্দ অসীম। তিনি মুক্তি হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—"সুখস্য তু পরাকাষ্ঠা ভক্তাবেব স্বতো ভবেৎ।" (২য় অঃ, ১৯১)। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত ভোগস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে?[১] অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিস্পৃহা ভোগস্পৃহার ন্যায় ভক্তি-সুখভোগের অন্তরায়। অবশ্য যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ মুক্তিস্পৃহা পিশাচী নহে, কিন্তু দেবী। ঐ দেবীর কৃপা ব্যতীত তাঁহাদিগের মুক্তি লাভে অধিকারই জন্মে না। কারণ, ঐ মুক্তিস্পৃহা তাঁহাদিগের অধিকার-সম্পাদক সাধনচতুষ্টয়ের অন্যতম। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসুখলিপ্সু, যাঁহারা অনন্তকাল ভগবানের সেবাই চাহেন, তাঁহারা উহার অন্তরায় নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচী বলিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রের তত্ত্বব্যাখ্যাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধ্যভক্তি-প্রেমের সেবা করিয়া, নানা প্রকারে উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। বাক্যের দ্বারা উহা ব্যক্ত করা যায় না। মূক ব্যক্তি যেমন কোন রসের আস্বাদ করিয়াও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ প্রেমও ব্যক্ত করা যায় না। তাই ঐ প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পরমপ্রেমিক ঋষিও শেষে বলিয়া গিয়াছেন,—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং"। "মূকাস্বাদনবৎ"। (নারদভক্তিসূত্র, ৫১।৫২)। সুতরাং যাহা আস্বাদ করিয়াও ব্যক্ত করা যায় না, তাহার নামমাত্র শুনিয়া কিরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিব? ভক্তিহীন আমি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত ভক্তিলক্ষণেরই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব? কিন্তু শাস্ত্র সাহায্যে ইহা অবশ্য বলা যায় যে, যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সাধনার ফলে প্রেমলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তই। তাঁহাদিগেরও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহাদিগেরও আর কখনও পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সাধ্যভক্তিই এক প্রকার মুক্তি। তাই তাঁহাদিগের পক্ষে স্কন্দপুরাণে নিশ্চল ভক্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে এবং ভক্তগণকেও মুক্তই বলা হইয়াছে[২]। অর্থাৎ ভক্তি-

---

১। ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

২। নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জ্জনার্দ্দন।
মুক্তা এবহি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে।
—"হরিভক্তিবিলাসে"র দশম বিলাসে উদ্ধৃত (৭৩ম) বচন॥

লিপ্সু অধিকারীদিগের পক্ষে চরম ভক্তিই মুক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আবার শাস্ত্র সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করিয়া বলা হইয়াছে যে[১], মুক্তি দ্বিবিধ,—নির্ব্বাণ ও হরিভক্তি। তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরি-ভক্তিরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন। অন্য সাধুগণ নির্ব্বাণরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন। সেখানে নির্ব্বাণার্থীদিগকেও সাধু বলা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণ মুক্তিই ন্যায়-দর্শনের মুখ্য প্রয়োজন। তাই ঐ নির্ব্বাণার্থী অধিকারীদিগের জন্য নির্ব্বাণ মুক্তিরই কারণাদি কথিত ও সমর্থিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে ঐ মুক্তির কারণাদি বিচার পাওয়া যাইবে ॥ ৬৭ ॥

অপবর্গ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

এই আহ্নিকের প্রথমে দুই সূত্রে (১) প্রবৃত্তিদোষ-সামান্য-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৭ সূত্রে (২) দোষত্রৈরাশ্য-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (৩) প্রেত্যভাব-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্রে (৪) শূন্যতোপাদান-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্রে (৫) কেবলেশ্বরকারণতা-নিরাকরণ-প্রকরণ (মতান্তরে ঈশ্বরোপাদানতা-প্রকরণ)। তাহার পরে ৩ সূত্রে (৬) আকস্মিকত্ব নিরাকরণ প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (৭) সর্ব্বানিত্যত্বনিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্রে (৮) সর্ব্বনিত্যত্ব নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্রে (৯) সর্ব্বপৃথক্ত্ব নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (১০) সর্ব্বশূন্যতা নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্রে (১১) সংখ্যৈ-কান্তবাদ-নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্রে (১২) ফলপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (১৩) দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্রে (১৪) অপবর্গ-পরীক্ষা-প্রকরণ।

৬৭ সূত্র ও ১৪ প্রকরণে চতুর্থ অধ্যায়ের
প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

১। মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাং ॥
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ২২শ অঃ।
("শব্দকল্পদ্রুমে" মুক্তি শব্দ দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	"প্রবৃত্তির"র	"প্রবৃত্তি"র
৬	সেই দেষের	সেই দোষের
৭	লিম্নাছেন	লিখিয়াছেন
৮	কপির্ণ্যও	কার্পণ্যও
	উদ্দ্যোতকরে	উদ্দ্যোতকরের
	করিয়ও	করিয়াও
১০	রসাদ	রসাদি
১১	অথাৎ	অর্থাৎ
২৫	মর্হিষ	মহর্ষি
	নঞর্থ	নঞর্থ
৩৫	অঙ্কুরাথী	অঙ্কুরার্থী
৩৬	হহা	ইহা
৩৭	সর্ব্বশক্তমান্	সর্ব্বশক্তিমান্
৪১	নিম্পত্তিং ॥	লিম্পতি ॥
৫১	তাং যমধো	তং যমধো
৫৩	পরস্ত	পরন্ত
৬১	মশ্বৈর্য্যং	মৈশ্বর্য্যং
৬৩	জীবাত্ত্বা	জীবাত্মা
	আত্মজাতীয়	আত্মজাতীয়।
৬৪	এই বিবিধ	এই দ্বিবিধ
৬৯	শাস্ত্রবাকের	শাস্ত্রবাক্যের
৭১	সিসাধয়িষতা	সিসাধয়িষিতা
৭৮	বিশ্বস্ততুল্য	বিশ্বস্ততুল্য বা সুহৃত্তুল্য
	কিরাতার্জ্জনীয়	কিরাতার্জ্জুনীয়।
৮০	গ্রহ করিয়া	গ্রহণ করিয়া
৮১	ক্রীড়ার জন্য	ক্রীড়ার দ্বারা

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪	হরিনৈব	হরির্নৈব
	মর্ত্তস্থ	মত্তস্থ
৮৭	"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য	"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে
৮৯	মহামনীষা	মহামনীষী
৯২	সিদ্ধ হয়,	সিদ্ধ হওয়ায়
	উদয়নকৃত্য	উদয়নকৃত
৯৩	২।২৯)	২।২।৯)
১০২	জ্ঞাজ্ঞো	জ্ঞাজ্ঞৌ
১০৬	ব্যাখ্যা পাওয়ায়	ব্যাখ্যা পাওয়া যায়
১০৭	তস্য ত্বমিতিবা	তস্য ত্বমিতিবা
	জীবেনাত্মানা	জীবেনাত্মনা
	বাক্যশেষা ইত্যাদি।	বাক্যশেষাৎ" ইত্যাদি।
১১১	নিম্বার্কভাষ্য-ভূমিকায়	নিম্বার্কভাষ্যব্যাখ্যার ৩৬৫ পৃষ্ঠায়
১১৬	অভেদশাস্ত্রান্যভয়ো	অভেদশাস্ত্রাণ্যভয়ো
১১৭	ঐকাত্মদর্শন	ঐকাত্ম্যদর্শন
১২৭	ন্যায়মতের সমর্থনের জন্য	ন্যায়মতের সমর্থনের জন্যও
	সাধকের কোন্ অবস্থায়	সাধকের কোন অবস্থায়
১২৯	মনোযোগ করি	মনোযোগ করিযা
	ভিন্ন সিদ্ধান্তেরই	ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তেরই
১৩২	সাধর্ম্ম্যকেই তিনি	সাধর্ম্ম্যকেই
	ইহা উহার দ্বারা	ইহাও উহার দ্বারা
১৪৮	জেজ্জট	জেজ্ঝট
১৮৩	একন্যানুপ	একস্যানুপ
১৯০	প্রতিজ্ঞাবাক্য	প্রতিজ্ঞাবাক্যে
১৯৯	ভাববেধাক	ভাববোধক
২২৬	পুত্রপুষ্পাদি	পত্রপুষ্পাদি
২৩০	তত্ত্বে ত্বদ্ধ	তত্ত্বে ত্বদ্ধা
২৪৫	ফর্ম্মফলের	কর্ম্মফলের
২৪৬	জাভি অর্থ	জাতি অর্থ
২৫৯	করিতেছে।	করিতেছে,
	বিনিগ্রহে	বিনিগ্রহো

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬১	দুখমেব	দুঃখমেব
২৬২	প্রহণ করিতে	গ্রহণ করিতে
২৬৩	ব্রহ্মচারীবাসী	ব্রহ্মচারিবাসী
২৬৫	সিদ্ধ করা যায় না,	সিদ্ধ করা যায়,
২৭০	জর্থাৎ	অর্থাৎ
২৭৭	ঋণবাক্যাদুর্দ্ধ	ঋণবাক্যাদূর্দ্ধ
২৭৮	ইত্যাতি	ইত্যাদি
২৮০	তদ্ধতং	তদ্ধৃতং
২৮৪	অবশিষ্টস্বনুক্তঃ	অবশিষ্টস্বনুক্তঃ
২৯৭	যস্থাত্ম	যস্থাত্ম
২৯৮	প্রথম শ্রুতি	প্রথম শ্রুতির
২৯৯	পাত্রচয়াস্তং	পাত্রচয়াস্তত্বং
৩০২	নিশ্বনাথ	বিশ্বনাথ
৩০৩	"জ্ঞানাগ্নিঃ	(জ্ঞানাগ্নিঃ
৩১০	স্মৃতশীলে	স্মৃতিশীলে
৩১৩	লোক্ষ	মোক্ষ
৩১৮	বলিয়াছেন যে, না।	বলিয়াছেন যে,
	জাত্যায়ুর্ভোগঃ।	জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।
৩২৬	না থাকিলেও	না থাকিলে
৩৩৪	মুক্ষীয়	মুক্ষীয়ং
৩৪২	ৈ শেষিকোক্তমোক্ষাত্ত	বৈশেষিকোক্তমোক্ষাত্ত
৩৪৫	করিয়াছেন	করিয়াছেন
৩৪৭	উপহাস করার	উপহাস করায়
৩৫৬	স্মারম্মিদং	স্মরম্মিদং

—০—